"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত"।

১৩শ বর্ষ।

১৩১৭ মাঘ হইতে ১৩১৮ পৌষ পর্য্যন্ত।

কলিকাতা।

উদ্বোধন আফিস—১২, ১৩নং গোপালচন্দ্র নিয়োগীর লেন, বাগবাজার।

মাসিক পত্র। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য, সডাক ২৲ দুই টাকা।

সূচীপত্র।

১৩শ বর্ষ।

বিষয়		লেখক	পৃষ্ঠা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ।

[স্বামী সারদানন্দ]

গুরুভাবে তীর্থ-ভ্রমণ ও নানা সম্প্রদায়ের সাধু দর্শন।

গুরুভাবের প্রেরণায় ভাবমুখে অবস্থিত ঠাকুর কত স্থানে কত লোকের সহিত কত প্রকারে যে লীলা করিয়াছিলেন তাহার সমুদায় লিপিবদ্ধ করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। উহার ভিতর অনেকগুলি কথা ইতি পূর্ব্বেই আমরা পাঠককে উপহার দিয়াছি। ঠাকুরের তীর্থ ভ্রমণও ঐ ভাবেই হইয়াছিল। এখন আমরা ঐ সম্বন্ধেই পাঠককে যথা সম্ভব বলিবার চেষ্টা করিব।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি ঠাকুরের কোন কার্য্যটিই উদ্দেশ্যবিহীন বা নিরর্থক ছিল না। তাহার জীবনের অতি সামান্য সামান্য দৈনিক ব্যবহার গুলির ও পর্য্যালোচনা করিলে গভীর ভাবপূর্ণ বলিয়া দেখিতে পাওয়া যায়—বিশেষ ঘটনাগুলির তো কথাই নাই। আবার এমন অঘটন ঘটনাবলী পরিপূর্ণ জীবন বর্ত্তমান যুগে আধ্যাত্মিক জগতে আর একটিও দেখা যায় নাই। আজীবন তপস্যা ও চেষ্টার দ্বারা ঈশ্বরের অনন্তভাবের কোন একটির সম্যক উপলব্ধি মানুষ করিয়া উঠিতেই পারে না, ত নানা ভাবে তাঁহার উপলব্ধি ও দর্শন করা—সকল প্রকার ধর্ম্ম মত সাধনসহায়ে সত্য বলিয়া প্রত্যক্ষ করা এবং সকল মতের সাধকদিগকেই নিজ নিজ গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে সহায়তা করা। আধ্যাত্মিক জগতে এরূপ দৃষ্টান্ত দেখা দূরে থাকুক, কখনও কি আর শুনা গিয়াছে? প্রাচীন যুগের ঋষি আচার্য্য বা অবতার মহাপুরুষেরা বিশেষ বিশেষ এক একটি ভাবরূপ পথাবলম্বনে স্বয়ং ঈশ্বরোপলব্ধি করিয়া তত্তৎ ভাবকেই ঈশ্বর দর্শনের একমাত্র পথ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন; অপরাপর নানা ভাবাবলম্বনেও যে ঈশ্বরের উপলব্ধি করা যাইতে পারে, একথা উপলব্ধি করিবার অবসর পান নাই। অথবা নিজেরা ঐ [illegible]র অল্পবিশেষ প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হইলেও তৎ-প্রচারে জন সাধারণের ইষ্ট নিষ্ঠার দৃঢ়তা কমিয়া যাইয়া তাহাদের ধর্ম্মো-পলব্ধির অনিষ্ট সাধিত হইবে—এই ভাবিয়া সর্ব্বসমক্ষে ঐ বিষয়টির ঘোষণা করেন নাই। কিন্তু যাহা ভাবিয়াই তাঁহারা ঐ রূপ করিয়া থাকুন তাঁহারা যে

তাঁহাদের গুরুভাব সহায়ে একদেশী ধর্ম্মমত সমূহই প্রচার করিয়াছিলেন এবং কালে উহাই যে মানব মনে ঈর্ষা দ্বেষাদির বিপুল প্রসার আনয়ন করিয়া অনন্ত বিবাদ ও রক্তপাতের হেতু হইয়াছিল, ইতিহাস এ বিষয়ে নিঃসংশয় সাক্ষ্য দিতেছে।

শুধু তাহাই নহে, ঐ রূপ একঘেয়ে একদেশী ধর্ম্ম ভাব প্রচারে পরস্পর বিরোধী নানা মতের উৎপত্তি হইয়া ঈশ্বর লাভের পথকে এতই জটিল করিয়া তুলিয়াছিল যে, সে জটিলতা ভেদ করিয়া সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের দর্শন লাভ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব বলিয়াই সাধারণ বুদ্ধির প্রতীত হইতেছিল। ইহকালাবসায়ী ভৌতিকসর্ব্বস্ব পাশ্চাত্যের জড়বাদ আবার সময় বুঝিয়াই যেন দুর্দ্দমনীয় বেগে শিক্ষার ভিতর দিয়া এখন ভারতে প্রবিষ্ট হইয়া তরল মতি বালক ও যুবকদিগের মন কলুষিত করিয়া নাস্তিক্য, ভোগানুরাগ, প্রভৃতি নানা বৈদেশিক ভাবে দেশ প্লাবিত করিতেছিল। পবিত্রতা ত্যাগ ও ঈশ্বরানুরাগের জ্বলন্ত নিদর্শন স্বরূপ এ অলৌকিক ঠাকুরের আবির্ভাবে ধর্ম্ম পুনরায় প্রতিষ্ঠিত না হইলে দুর্দ্দশা কত দূর গড়াইত তাহা কে বলিতে পারে? ঠাকুর স্বয়ং অনুষ্ঠান করিয়া দেখাইলেন যে, ভারত এবং ভারতেতর দেশে প্রাচীন যুগে যত ঋষি, আচার্য্য, অবতার মহাপুরুষেরা জন্ম গ্রহণ করিয়া যত প্রকার ভাবে ঈশ্বরোপলব্ধি করিয়াছেন এবং ধর্ম্ম জগতে ঈশ্বরলাভের যত প্রকার মত প্রচার করিয়া গিয়াছেন তাহার কোনটিই মিথ্যা নহে—প্রত্যেকটিই সম্পূর্ণ সত্য।—বিশ্বাসী সাধক ঐ ঐ পথাবলম্বনে অগ্রসর হইয়া এখনও তাঁহাদের ন্যায় ঈশ্বর দর্শন করিয়া ধন্য হইতে পারেন। দেখাইলেন যে, পরস্পর বিরুদ্ধ সামাজিক আচার রীতি নীতি প্রভৃতি লইয়া ভারতীয় হিন্দু ও মুসলমানের ভিতর পর্ব্বত সদৃশ ব্যবধান বিদ্যমান থাকিলেও উভয়ের ধর্ম্মই সত্য; উভয়েই এক ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন ভাবের উপাসনা করিয়া, বিভিন্ন পথ দিয়া অগ্রসর হইয়া কালে সেই প্রেম-স্বরূপের সহিত প্রেমে এক হইয়া যায়। দেখাইলেন যে, কালে ঐ সত্যের ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হইয়াই উহারা উভয়ে উভয়কে সপ্রেম আলিঙ্গনে বদ্ধ করিবে এবং বহু কালের বিবাদ ভুলিয়া শান্তিলাভ করিবে; এবং দেখাইলেন যে, কালে ভোগলোলুপ পাশ্চাত্যও ত্যাগেই শান্তি,একথা হৃদয়ঙ্গম করিয়া ঈশাপ্রচারিত ধর্ম্ম মতের সহিত ভারত এবং অন্যান্য প্রদেশের ঋষি এবং অবতারকুল-প্রচারিত ধর্ম্ম মত সমূহের সত্যতা উপলব্ধি করিয়া নিজ কর্ম্ম জীবনের সহিত

ধর্ম্ম জীবনের সম্বন্ধ আনয়ন করিয়া ধন্য হইবে। এ অদ্ভুত ঠাকুরের জীবনালোচনায় আমরা যতই অগ্রসর হইব ততই দেখিতে পাইব, ইনি দেশ বিশেষ,জাতি বিশেষ, সম্প্রদায় বিশেষ, বা ধর্ম্ম বিশেষের সম্পত্তি নহেন। পৃথিবীর সমস্ত জাতিকেই একদিন শান্তিলাভের জন্য ইঁহার উদারমতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে—ভাবমুখে অবস্থিত ঠাকুর ভাবরূপে তাহাদের ভিতর প্রবিষ্ট হইয়া সমুদায় সঙ্কীর্ণতার গণ্ডী ভাঙ্গিয়া চুরিয়া তাঁহার নবীন ছাঁচে ফেলিয়া তাহাদিগকে এক অপূর্ব্ব একতাবন্ধনে আবদ্ধ করিবেন।

ভারতের পরস্পর বিরোধী চিরবিবদমান যাবতীয় প্রধান প্রধান ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের সাধককুল ঠাকুরের নিকট আগমন করিয়া যে তাঁহাতে নিজ নিজ ভাবের পূর্ণাদর্শ দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে নিজ নিজ গন্তব্য পথেরই পথিক বলিয়া স্থির ধারণা করিয়াছিলেন, ইহাতে পূর্ব্বোক্ত ভাবই সূচিত হইতেছে। ঠাকুরের গুরুভাবের যে কার্য্য এইরূপে ভারতে প্রথম প্রারব্ধ হইয়া ভারতীয় ধর্ম্ম সম্প্রদায় সমূহের ভিতর একতা আনিয়া দিবার সূত্রপাত করিয়া গিয়াছে, সে কার্য্য যে শুধু ভারতের ধর্ম্ম বিবাদ ঘুচাইয়াই নিরস্ত হইবে তাহা নহে—এসিয়ার ধর্ম্ম বিবাদ, ইয়ুরোপের ধর্ম্ম হীনতা ও ধর্ম্ম বিদ্বেষ সমস্তই ধীর স্থির পদ সঞ্চারে শনৈঃ শনৈঃ তিরোহিত করিয়া সমগ্র পৃথিবী ব্যাপিয়া এক অদৃষ্টপূর্ব্ব শান্তির রাজ্য স্থাপন করিবে। দেখিতেছ না, ঠাকুরের অন্তর্দ্ধানের পর হইতে ঐ কার্য্য কত দ্রুতপদসঞ্চারে অগ্রসর হইতেছে? দেখিতেছ না, কিরূপে গুরুগত প্রাণ পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দের ভিতর দিয়া আমেরিকা ও ইয়ুরোপে তাঁহার ভাব প্রবেশ লাভ করিয়া এই স্বল্পকালের মধ্যেই চিন্তাজগতে কি যুগান্তর আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে? দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর, যতই চলিয়া যাইবে ততই এ অমোঘ ভাবরাশি সকল জাতির ভিতর, সকল ধর্ম্মের ভিতর, সকল সমাজের ভিতর, আপন প্রভাব বিস্তার করিয়া অদ্ভুত যুগান্তর আনিয়া উপস্থিত করিবে। কাহার সাধ্য ইহার গতি রোধ করে? অদৃষ্টপূর্ব্ব তপস্যা ও পবিত্রতার সাত্ত্বিক তেজোদীপ্ত এ ভাবরাশির সীমা কে উল্লঙ্ঘন করিবে? যে সকল যন্ত্র সহায়ে উহা বর্ত্তমানে প্রসারিত হইতেছে, সে সকল ভগ্ন হইবে, কোথা হইতে ইহা প্রথম উত্থিত হইল তাহাও হয়ত পরে অনেকে ধরিতে বুঝিতে পারিবে না, কিন্তু এ অনন্ত মহিমোজ্জ্বল ভাবময়

ঠাকুরের স্নিগ্ধোদ্দীপ্ত ভাবরাশি হৃদয়ে যত্নে পোষণ করিয়া তাঁহারই ছাঁচে জীবন গঠিত করিয়া পৃথিবীর সকলকেই এক দিন ধন্য হইতে হইবে নিশ্চয়।

অতএব ভারতের বিভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায় ভুক্ত সাধককুলের ঠাকুরের নিকট আগমন ও যথার্থ ধর্ম্মলাভ করিয়া ধন্য হইবার যে সকল কথা আমরা তোমাকে উপহার দিতেছি হে পাঠক, কেবলমাত্র ভাসাভাসা ভাবে, গল্পের মত ঐ সকল পাঠ করিয়াই নিরস্ত থাকিও না। ভাবমুখে অবস্থিত এ অলৌকিক ঠাকুরের দিব্য ভাবরাশি প্রথম যথাসম্ভব ধরিবার বুঝিবার চেষ্টা কর; পরে, ঐ সকল কথার ভিতর তলাইয়া দেখিতে থাক কিরূপে ঐ ভাব রাশির প্রসার আরম্ভ হইল, কিরূপেই বা উহা পরিপুষ্ট হইয়া প্রথম পুরাতন, পরে নবীন ভাবের শিক্ষিত জনসমূহের ভিতর আপন প্রভাব বিস্তার করিতে থাকিল, এবং কিরূপেই বা পরে উহা ভারত হইতে ভারতেতর দেশে উপস্থিত হইয়া পৃথিবীর ভাবজগতে যুগান্তর আনিয়া উপস্থিত করিল।

ভারতীয় বিভিন্ন সম্প্রদায় ভুক্ত সাধককুলকে লইয়াই ঠাকুরের ভাবরাশির প্রথম বিস্তার। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ঠাকুর যখন যে যে ভাবে সিদ্ধ হইয়াছিলেন, তখন সেই সেই ভাবের ভাবুক সাধককুল তাঁহার নিকট স্বতঃ প্রেরিত হইয়া উপস্থিত হইয়া তত্তৎভাবের পূর্ণাদর্শ তাঁহাতে অবলোকন ও তাঁহার সহায়তা লাভ করিয়া অন্যত্র চলিয়া গিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন মথুর বাবু ও তৎপত্নী পরম ভক্তিমতী জগদম্বা দাসীর অনুরোধে ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবন পর্য্যন্ত তীর্থ পর্য্যটনে গমন করিয়াছিলেন। কাশী বৃন্দাবনাদি তীর্থে সাধু ভক্তের অভাব নাই। তত্তৎস্থানেও যে বিশিষ্ট বিশিষ্ট সাধকেরা ঠাকুরের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার গুরুভাব সহায়ে ধন্য হইয়াছিলেন একথা শুধু যে আমরা অনুমান করিতে পারি তাহাই নহে, কিন্তু উহার কিছু কিছু আভাষ তাঁহার শ্রীমুখেও শুনিতে পাইয়াছি। তাহারও কিছু কিছু এখানে লিপিবদ্ধ করা আবশ্যক।

ঠাকুর বলিতেন, "গুটি সব ঘর ঘুরে তবে চিকে উঠে; মেথর থেকে রাজা অবধি সংসারে যত রকম অবস্থা আছে সে সমুদয় দেখে, শুনে, ভোগ করে তুচ্ছ বলে ঠিক ঠিক ধারণা হলে তবে পরমহংস অবস্থা হয়, যথার্থ জ্ঞানী হয়!"—এত গেল সাধকের নিজের চরম জ্ঞানে উপনীত হইবার কথা। আবার লোকশিক্ষা বা জনসাধারণের যথার্থ শিক্ষক হইতে হইলে কিরূপ হওয়া আবশ্যক তৎসম্বন্ধে বলিতেন—"আত্মহত্যা একটা নরুন দিয়ে করা

যায়; কিন্তু পরকে মারতে হলে (শত্রু জয়ের জন্য) ঢাল খাঁড়ার দরকার হয়।" ঠিক ঠিক আচার্য্য হইতে গেলে তাঁহাকে সব রকম সংস্কারের ভিতর দিয়া নানা প্রকারে শিক্ষালাভ করিয়া অপর সাধারণাপেক্ষা সমধিক শক্তি সম্পন্ন হইতে হয়। "অবতার সিদ্ধপুরুষ এবং জীবে এই শক্তি লইয়াই প্রভেদ" ঠাকুর বারম্বার একথা আমাদের বলিয়াছেন। দেখনা, ব্যবহারিক রাজনৈতিকাদি জগতেই বিশ্‌মার্ক্‌, গ্লাড্‌-ষ্টোন্‌ প্রভৃতি প্রতিভাশালী ব্যক্তিদিগকে দেশের প্রাচীন ও বর্ত্তমান সমস্ত ইতিহাস ঘটনাদির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ইতর সাধারণাপেক্ষা কতদূর সম্পন্ন হইতে হয়; ঐরূপে শক্তিসম্পন্ন হওয়াতেই ত তাঁহারা, পঞ্চাশ বা ততোধিক বৎসর পরে দেশের বর্ত্তমান কোন ভাবটি কিরূপ আকার ধারণ করিয়া জনসাধারণের অহিত করিবে তাহা ধরিতে বুঝিতে পারেন এবং সেজন্য এখন হইতে এমন সকল তদ্বিপরীত ভাবের কার্য্যের সূচনা করিয়া যান যাহাতে ঐ দীর্ঘকাল পরে ঐ ভাব প্রবল হইয়া দেশে ঐরূপ অমঙ্গল আর আনিতে পারে না! আধ্যাত্মিক জগতেও ঠিক তদ্রূপ বুঝিতে হইবে। অবতার আচার্য্য পুরুষদিগকে, প্রাচীন যুগের ঋষিরা দেশে পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে কি কি আধ্যাত্মিক ভাবের প্রবর্ত্তনা করিয়া গিয়াছিলেন, এতদিন পরে ঐ সকল ভাব কিরূপ আকার ধারণ করিয়া জনসাধারণের কতটা ইষ্ট করিয়াছে ও করিতেছে এবং বিকৃত হইয়া কতটা অনিষ্টই বা করিতেছে ও করিবে, ঐ সকল ভাবের ঐরূপে বিকৃত হইবার কারণই বা কি, বর্ত্তমানে দেশে যে সকল আধ্যাত্মিক ভাব প্রবর্ত্তিত রহিয়াছে সে সকলও কালে বিকৃত হইতে হইতে দুই এক শতাব্দি পরে কিরূপ আকার ধারণ করিয়া কি ভাবে জনসাধারণের অধিকতর অহিতকর হইবে—এ সমস্ত কথা ঠিক ঠিক ধরিয়া বুঝিয়া নবীন ভাবের কার্য্য প্রবর্ত্তনা করিয়া যাইতে হয়। কারণ, ঐ সকল অবস্থা অনুভব করিতে না পারিলে সকলের অবস্থা ধরিবেন, বুঝিবেন কিরূপে এবং রোগ ঠিক ঠিক ধরিতে না পারিলে তাহার ঔষধ প্রয়োগই বা কিরূপে করিবেন? সে জন্য তীব্র তপস্যাদি ভিন্ন আচার্য্যদিগকে সংসারে নানা অবস্থায় পড়িয়াও শিক্ষালাভ করিতে হয়—ইতর সাধারণ সাধককে ততটা সেরূপ করিতে হয় না। দেখনা, স্বয়ং ঠাকুরকে কত প্রকার অবস্থার সহিত পরিচিত হইতে হইয়াছিল। দরিদ্রের কুটীরে জন্মগ্রহণ করিয়া বাল্যে কঠোর দারিদ্রের সহিত, কালীবাটীর পূজকের পদগ্রহণে স্বীকৃত হইয়া যৌবনে

পরের দাসত্ব করা রূপ হীনাবস্থার সহিত, সাধকাবস্থায় ভগবানের জন্য আত্মহারা হইয়া আত্মীয় কুটুম্বদিগের তীব্র তিরস্কার লাঞ্ছনা অথবা গভীর মনস্তাপ এবং সাংসারিক অপর সাধারণের, পাগল বলিয়া নিতান্ত উপেক্ষা বা করুণার সহিত, মথুর বাবুর তাঁহার উপর ভক্তি শ্রদ্ধার উদয়ে রাজতুল্য সম্মানের সহিত, বিশিষ্ট সাধককুলের ঈশ্বরাবতার বলিয়া তাঁহার পাদপদ্মে হৃদয়ের ভক্তি প্রীতি ঢালিয়া দেওয়া রূপ দেবতুল্য পরম সম্মানের সহিত—এইরূপ কতই না অবস্থার সহিত পরিচিত হইয়া ঐ সকল অবস্থাতে অবিচলিত থাকা রূপ বিষম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইয়াছিল! অনন্য অনুরাগ এক দিকে যেমন তাঁহাকে ঈশ্বর লাভের জন্য অদৃষ্টপূর্ব্ব তীব্র তপস্যায় লাগাইয়া তাঁহার যোগপ্রসূত অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্মদৃষ্টি সম্পূর্ণ খুলিয়া দিয়াছিল, সংসারের এই সকল নানা অবস্থার সহিত পরিচয়ও আবার অপরদিকে তেমনি তাঁহাকে বাহ্য বর্ত্তমান, জগতের সকল প্রকার অবস্থাপন্ন লোকের ভিতরের ভাব ঠিক ঠিক ধরিয়া বুঝিয়া তাহাদের সহিত ব্যবহারে কুশলী এবং তাহাদের সকল প্রকার সুখ দুঃখের সহিত সহানুভূতি সম্পন্ন করিয়া তুলিয়াছিল। কারণ, ভিতরের ও বাহিরের ঐ সকল অবস্থার ভিতর দিয়াই ঠাকুরের গুরুভাব আচার্য্যভাব দিন দিন অধিকতর বিকশিত ও পরিস্ফুট হইতে দেখা গিয়াছিল।

তীর্থ ভ্রমণও যে ঠাকুরের জীবনে ঐরূপ ফল উপস্থিত করিয়াছিল তাহার আর সন্দেহ নাই। যুগাচার্য্য ঠাকুরের দেশের ইতর সাধারণের আধ্যাত্মিক অবস্থার বিষয় জ্ঞাত হওয়ার আবশ্যক ছিল। মথুরের সহিত তীর্থভ্রমণে যাইয়া উহা যে অনেকটা সংসিদ্ধ হইয়াছিল এ বিষয় নিঃসন্দেহ। কারণ, অন্তর্জগতে ঠাকুরের যে প্রজ্ঞাচক্ষু মায়ার সমগ্র আবরণ ভেদ করিয়া সকলের অন্তর্নিহিত "একমেবা দ্বিতীয়ং" অখণ্ড সচ্চিদানন্দের দর্শন স্পর্শন সর্ব্বদা করিতে সমর্থ হইত, বহির্জগতে লৌকিক ব্যবহারের সম্পর্কে আসিয়া উহাই আবার এখন এক কথায় লোকের ভিতরের ভাব ধরিতে, দুই চারিটী ঘটনা দেখিয়াই সমাজের ও দেশের অবস্থা বুঝিতে বিশেষ পটু হইয়াছিল। অবশ্য বুঝিতে হইবে, ঠাকুরের সাধারণ অবস্থা লক্ষ্য করিয়াই আমরা একথা বলিতেছি, নতুবা যোগবলে উচ্চ ভূমিতে উঠিয়া যখন তিনি দিব্যদৃষ্টি সহায়ে ব্যক্তিগত, সমাজগত বা প্রদেশ গত অবস্থার দর্শন ও উপলব্ধি করিতেন এবং কি উপায়াবলম্বনে তাহাদের বর্ত্তমান দুর্দ্দশার অবসান হইবে তাহার সম্যক নির্দ্ধারণ করিতেন তখন ইতর সাধারণের ন্যায় বাহ্য দৃষ্টিতে দেখিয়া

শুনিয়া তুলনায় আলোচনা করিয়া কোন বিষয় জানিবার পারে তিনি চলিয়া যাইতেন এবং ঐরূপে ঐ বিষয়ের তত্ত্ব নিরূপণের তাঁহার আর প্রয়োজনই হইত না। দেব-মানব ঠাকুরকে আমরা সাধারণ বাহ্যদৃষ্টি এবং অসাধারণ যোগদৃষ্টি, উভয় দৃষ্টি সহায়েই সকল বিষয়ের তত্ত্ব নিরূপণ করিতে দেখিয়াছি। সেজন্য দেবভাব ও মনুষ্যভাব উভয়বিধ ভাবের সম্যক্ বিকাশের পরিচয় পাঠককে না দিতে পারিলে এ অলৌকিক চরিত্রের একদেশী ছবি মাত্রই পাঠকের মনে অঙ্কিত হইবে। তজ্জন্য ঐ উভয়বিধ ভাবে এ দেব-মানবের জীবনালোচনা করিতে আমাদের প্রয়াস।

শাস্ত্র দৃষ্টিতে ঠাকুরের তীর্থ ভ্রমণের আর একটি কারণও পাওয়া যায়। শাস্ত্রে বলেন ঈশ্বরের দর্শন লাভে সিদ্ধকাম পুরুষেরা তীর্থে যাইয়া ঐ সকল স্থানের তীর্থত্ব সম্পাদন করিয়া থাকেন। তাঁহারা ঐ সকল স্থানে ঈশ্বরের বিশেষ দর্শন লাভের জন্য ব্যাকুল অন্তরে আগমন ও অবস্থান করেন বলিয়াই সেখানে ঈশ্বরের বিশেষ প্রকাশ আসিয়া উপস্থিত হয় অথবা ঐ ভাবের পূর্ব্ব-প্রকাশ সমধিক বর্দ্ধিত হইয়া উঠে এবং মানব সাধারণ সেখানে উপস্থিত হইলে অতি সহজেই ঈশ্বরের ঐ ভাবের কিছু না কিছু উপলব্ধি করে। সিদ্ধ পুরুষদের সম্বন্ধেই যখন শাস্ত্র ঐ কথা বলিয়াছেন তখন তদপেক্ষা সমধিক শক্তিমান ঠাকুরের ন্যায় অবতার পুরুষদের তো কথাই নাই! তীর্থ সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত কথাটি ঠাকুর অনেক সময় আমাদিগকে তাঁহার সরল ভাষায় বুঝাইয়া বলিতেন। বলিতেন—"ওরে যেখানে অনেক লোকে অনেক দিন ধরে ঈশ্বরকে দর্শন করবে বলে তপ, জপ, ধ্যান, ধারণা, প্রার্থনা করেছে সেখানে তাঁর প্রকাশ নিশ্চয় আছে, জানবি। তাদের ভক্তিতে সেখানে ঈশ্বরীয় ভাবের একটা জমাট বেঁধে গেছে; তাই সেখানে সহজেই ঈশ্বরীয় ভাবের উদ্দীপন ও তাঁর দর্শন হয়। যুগ যুগান্তর থেকে কত সাধু, ভক্ত, সিদ্ধ পুরুষেরা এই সব তীর্থে ঈশ্বরকে দেখবে বলে এসেছে, অন্য সব বাসনা ছেড়ে তাঁকে প্রাণ ঢেলে ডেকেছে, সেজন্য, ঈশ্বর সব জায়গায় সমান ভাবে থাকলেও এই সব স্থানে তাঁর বিশেষ প্রকাশ; যেমন মাটি খুঁড়লে সব জায়গাতেই জল পাওয়া যায় কিন্তু যেখানে পাতকো ডোবা পুকুর বা হ্রদ আছে সেখানে আর জলের জন্য খুঁড়তে হয় না—যখনই ইচ্ছা জল পাওয়া যায়; সেই রকম।"

আবার ঈশ্বরের বিশেষ প্রকাশ যুক্ত ঐ সকল স্থান দর্শনাদির পর, ঠাকুর

আমাদিগকে 'জাবর কাটিতে' শিক্ষা দিতেন। বলিতেন—"গরু যেমন পেটভরে জাব খেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে এক জায়গায় বসে সেই সব খাবার উগ্‌রে আবার ভাল করে চিবাতে বা জাবর কাট্‌তে থাকে, সেই রকম দেবস্থান, তীর্থস্থান দেখবার পর সেখানে যে সব পবিত্র ঈশ্বরীয় ভাব মনে উঠে সেই সব নিয়ে একান্তে বসে ভাবতে হয় ও তাইতে ডুবে যেতে হয়, দেখে এসেই সে সব মন থেকে তাড়িয়ে বিষয়ে, রূপরসে, মন দিতে নাই, তা হলে ঐ ঈশ্বরীয় ভাবগুলি মনে স্থায়ী ফল আনে না।" কালীঘাটে শ্রীশ্রীজগদম্বাকে দর্শন করিতে ঠাকুরের সঙ্গে একবার আমাদের কেহ কেহ গমন করিয়াছিলেন। পিঠস্থানের বিশেষ বিকাশ এবং ঠাকুরের শরীর মনে শ্রীশ্রীজগন্মাতার জীবন্ত বিকাশ উভয় মিলিত হইয়া ভক্তদিগের প্রাণে যে এক অপূর্ব্ব উল্লাস আনয়ন করিল, তাহা আর বলিতে হইবে না। দর্শনাদি করিয়া প্রত্যাগমন কালে পথিমধ্যে ভক্তদিগের এক জনকে বিশেষ অনুরুদ্ধ হইয়া তাহার শ্বশুরালয়ে গমন এবং সে রাত্রি তথায় যাপন করিতে হইল। পরদিন তিনি যখন পুনরায় ঠাকুরের নিকট আগমন করিলেন তখন ঠাকুর তাঁহাকে পূর্ব্বরাত্রি কোথায় ছিলেন জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তাঁহার পূর্ব্বোক্ত রূপে শ্বশুরালয়ে থাকিবার কথা শুনিয়া বলিলেন—"সে কিরে? মাকে দর্শন করে এলি, কোথা তাঁর দর্শন, তাঁর ভাব নিয়ে জাবর কাট্‌বি তা না করে রাতটা কিনা বিষয়ীর মত শ্বশুর বাড়ীতে কাটিয়ে এলি? দেবস্থান তীর্থস্থানে দর্শনাদি করে এসে সেই সব ভাব নিয়ে থাকতে হয়, জাবর কাট্‌তে হয়, তা নইলে ও সব ঈশ্বরীয় ভাব প্রাণে দাঁড়াবে কেন?"

আবার ঈশ্বরীয় ভাব ভক্তিভরে হৃদয়ে পূর্ব্ব হইতে পোষণ না করিয়া তীর্থাদিতে যাইলে যে বিশেষ ফল পাওয়া যায় না সে সম্বন্ধেও ঠাকুর অনেক বার আমাদের বলিয়াছেন। তাঁহার বর্ত্তমান কালে আমাদের অনেকে অনেক সময়ে তীর্থাদি ভ্রমণে যাইবার বাসনা প্রকাশ করিতেন। তাহাতে তিনি অনেক সময় আমাদের বলিয়াছেন—"ওরে, যার হেথায় আছে তার সেথায় আছে, যার হেথায় নাই তার সেথায়ও নাই।" * আবার বলিতেন—

* অবতার পুরুষেরা অনেক সময় একই ভাবে শিক্ষা দিয়া থাকেন। মহামহিম ঈশা একসময়ে তাঁহার শিষ্যবর্গকে বলিয়াছিলেন,—"To him who hath more, more shall be given and from him who hath little, that little shall be taken away." অর্থাৎ যাহার অধিক ভক্তি বিশ্বাস আছে তাহাকে আরও ঐ ভাব দেওয়া হইবে, আর যাহার ভক্তি বিশ্বাস অল্প তাহার নিকট হইতে সেই অল্পটুকু কাড়িয়া লওয়া হইবে।

"যার প্রাণে ভক্তিভাব আছে তীর্থে উদ্দীপনা হয়ে তার সেই ভাব আরও বেড়ে যায়, আর যার প্রাণে ঐ ভাব নেই তার বিশেষ আর কি হবে ? অনেক সময়ে শুনা যায়, অমুকের ছেলে কাশীতে বা অন্য কোথাও পালিয়ে গিয়েছে ; তার পর আবার শুনতে পাওয়া যায় সে সেখানে চেষ্টা বেষ্টা করে একটা চাকরি জোগাড় করে নিয়ে বাড়ীতে চিঠি লিখেছে ও টাকা পাঠিয়েছে ! তীর্থে বাস করতে গিয়ে কত লোকে আবার সেখানে দোকান পাট ব্যবসা ফেঁদে বসে ! মথুরের সঙ্গে পশ্চিমে গিয়ে দেখি এখানেও যা সেখানেও তাই । এখানকার আমগাছ, তেঁতুলগাছ, বাঁশঝাড়টি যেমন, সেখানকার সে গুলিও তেমনি ! দেখে হৃদুকে বলেছিলাম, 'ওরে হৃদু, এখানে আর তবে কি দেখতে এলুম রে ? সেখানেও যা এখানেও তাই ! কেবল, মাঠে ঘাটের বিষ্ঠাগুলো দেখে মনে হয় এখানকার লোকের হজম শক্তিটা ওদেশের লোকের চেয়ে অধিক !" *

পূর্ব্বে একস্থানে বলিয়াছি গলরোগের চিকিৎসার জন্য ভক্তেরা ঠাকুরকে প্রথম কলিকাতায় শ্যামপুকুর নামক পল্লিস্থ একটি ভাড়াটিয়া বাটীতে এবং পরে কলিকাতার কিছু উত্তরে অবস্থিত কাশীপুর নামক স্থানে একটি বাগান বাটীতে আনিয়া রাখিয়াছিলেন। কাশীপুরের বাগানে আসিবার কয়েক দিন পরেই স্বামী বিবেকানন্দ একদিন কাহাকেও কিছু না বলিয়া কহিয়া, অপর দুইটি গুরুভ্রাতার সহিত, বুদ্ধগয়ায় গমন করেন। সে সময় আমাদের ভিতর ভগবান্ বুদ্ধদেবের অদ্ভুত জীবন এবং সংসার বৈরাগ্য,ত্যাগ ও তপস্যার আলোচনা দিবারাত্র চলিয়াছিল। বাগান বাটীর নিম্নতলের দক্ষিণ দিক্‌কার যে ছোট ঘরটিতে আমরা সর্ব্বদা উঠা বসা করিতাম তাহার দেওয়ালের গায়ে—যতদিন সত্যলাভ না হয় ততদিন একাসনে বসিয়া ধ্যান ধারণাদি করিব, ইহাতে শরীর যায় যাক—বুদ্ধদেবের এইরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞাব্যঞ্জক ললিত বিস্তরের একটি শ্লোক লিখিয়া রাখা হইয়াছিল। দিবারাত্র ঐ কথাগুলি চক্ষের সামনে থাকিয়া সর্ব্বদা আমাদের স্মরণ করাইয়া দিত, আমাদেরও সত্যস্বরূপ ঈশ্বরকে লাভের জন্য ঐরূপে প্রাণপাত করিতে হইবে ; আমাদেরও—

ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু ।
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্পদুর্লভাং নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে ॥

করিতে হইবে। দিবারাত্র ঐরূপ বৈরাগ্যালোচনা করিতে করিতে স্বামীজি

* ঠাকুর এ কথাগুলি অন্য ভাবে বলিয়াছিলেন।

সহসা বুদ্ধগয়ায় চলিয়া যাইলেন, কোথায় যাইবেন, কবে ফিরিবেন সে কথা কাহাকেও জানাইলেন না—কাজেই আমাদের কাহারও কাহারও মনে হইল তিনি বুঝি আর সংসারে ফিরিবেন না, আর বুঝি তাঁহাকে আমরা দেখিতে পাইব না! আমাদের সকলের মন তখন হইতে স্বামীজির প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হয়, একদণ্ড তাঁহাকে ছাড়িয়া থাকা বিষম যন্ত্রণাদায়ক ; কাজেই মন চঞ্চল হইয়া অনেকের অনুক্ষণ পশ্চিমে স্বামীজির নিকট যাইবার ইচ্ছা হইতে লাগিল। ক্রমে ঠাকুরের কাণেও সে কথা উঠিল। স্বামী ব্রহ্মানন্দ একদিন এক জনের ঐ বিষয়ে দৃঢ় সংকল্প জানিতে পারিয়া ঠাকুরকে তাহার কথা বলিয়াই দিলেন। ঠাকুর তাহাতে তাহাকে বলিলেন—"কেন ভাবছিস্? কোথায় যাবে সে (স্বামীজি)? ক দিন বাহিরে থাকতে পারবে? দেখ না এল বলে।" তার পর হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"চার খুঁট ঘুরে আয়, দেখবি কোথাও কিছু (যথার্থ ধর্ম) নাই; যা কিছু আছে সব (নিজের শরীর দেখাইয়া) এই খানে!" "এই খানে"—কথাটি ঠাকুর বোধ হয় দুই ভাবে ব্যবহার করিয়াছিলেন, যথা—তাঁহার নিজের ভিতরে ধর্মভাবের, ঈশ্বরীয় ভাবের বর্ত্তমানে যেরূপ বিশেষ প্রকাশ রহিয়াছে সেরূপ আর কোথাও নাই ; অথবা প্রত্যেকের নিজের ভিতরেই ঈশ্বর রহিয়াছেন—নিজের ভিতর তাঁহার প্রতি ভক্তি ভালবাসা প্রভৃতি ভাব উদ্দীপিত না করিতে পারিলে বাহিরে নানাস্থানে ঘুরিয়াও কিছুই লাভ হয় না। ঠাকুরের অনেক কথারই এইরূপ দুই বা ততোধিক ভাবের অর্থ পাওয়া যায়। শুধু ঠাকুরের কেন?—জগতে যত অবতার পুরুষ যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলের কথা-তেই ঐরূপ বহু ভাব পাওয়া যায় এবং মানব সাধারণ যাহার যেরূপ অভিরুচি, যাহার যেরূপ সংস্কার সেইরূপ অর্থই গ্রহণ করিয়া থাকে। যাহাকে সম্বোধন করিয়া ঠাকুর পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি বলিলেন তিনি কিন্তু এক্ষেত্রে ঐ গুলির প্রথম অর্থই বুঝিলেন এবং ঠাকুরের ভিতরে ঈশ্বরীয ভাবের যেরূপ প্রকাশ, এমনআর কুত্রাপি নাই এ কথা দৃঢ় ধারণা করিয়া নিশ্চিন্ত মনে তাঁহার নিকট অবস্থান করিতে লাগিলেন।

পরম ভক্তিমতী জনৈকা স্ত্রী ভক্তও এক সময়ে ঠাকুরের নিকটে শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিয়া কিছু কাল তপস্যাদি করিবার বাসনা প্রকাশ করেন। ঠাকুর সে সময় তাঁহাকে হাত নাড়িয়া বলিয়াছিলেন—"কেন যাবি গো? কি করতে যাবি? যার হেথায় আছে, তার সেথায় আছে—

যার হেথায় নাই, তার সেথায়ও নাই!" শ্রীভক্তটি মনের অনুরাগে তখন ঠাকুরের সে কথা গ্রহণ করিতে না পারিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু সেবার তীর্থে যাইয়া তিনি কোন বিশেষ ফল যে লাভ করিতে পারেন নাই একথা আমরা তাঁহার নিকট শ্রবণ করিয়াছি।

ভাবময় ঠাকুরের তীর্থে গমন বিশেষ ভাব লইয়া যে হইয়াছিল একথা আমরা তাঁহার নিকট বহুবার শুনিয়াছি। তিনি বলিতেন—ভেবেছিলাম, কাশীতে সকলে চব্বিশ ঘণ্টা শিবের ধ্যানে সমাধিতে আছে দেখতে পাব; বৃন্দাবনে, সকলে গোবিন্দকে নিয়ে ভাবে প্রেমে বিহ্বল হয়ে রয়েছে দেখ্‌ব! গিয়ে দেখি সবই বিপরীত! ঠাকুরের অদৃষ্ট পূর্ব্ব সরল মন সকল কথা পঞ্চম বর্ষীয় বালকের ন্যায় সরল ভাবে গ্রহণ ও বিশ্বাস করিত। আমরা সকল বস্তু ও ব্যক্তিকে সন্দেহের চক্ষে দেখিতেই বাল্যাবধি সংসারে শিক্ষালাভ করিয়াছি; আমাদের ক্রূর মনে সেরূপ সরল বিশ্বাসের উদয় কিরূপে হইবে? কোন কথা সরল ভাবে বিশ্বাস করিতে দেখিলে আমরা তাহাকে বোকা, নির্ব্বোধ বলিয়াই ধারণা করিয়া থাকি! ঠাকুরের নিকটেই প্রথম শুনিলাম—"ওরে অনেক তপস্যা, সাধনার ফলে তবে লোকে সরল, উদার হয়! সরল না হলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না; সরল বিশ্বাসীর কাছেই তিনি আপনার স্বরূপ প্রকাশ করেন।" আবার সরল বিশ্বাসী হইতে হইবে শুনিয়া কেহ পাছে বোকা বাঁদর হইতে হইবে ভাবিয়া বসে এজন্য ঠাকুর বলিতেন—'ভক্ত হবি, তা বলে বোকা হবি কেন?" আবার বলিতেন - "সর্ব্বদা মনে মনে বিচার করবি—কোনটা সৎ কোনটা অসৎ, কোনটা নিত্য কোনটা অনিত্য, আর অনিত্য জিনীস গুলো ত্যাগ করে নিত্য পদার্থে মন রাখবি।" এই দুই প্রকার কথার সামঞ্জস্য না করিতে পারিয়া আমাদের অনেকে অনেক সময় তাঁহার নিকট তিরস্কৃতও হইয়াছে। স্বামী যোগানন্দ তখন গৃহত্যাগ করেন নাই। বাটীতে একখানি কড়ার আবশ্যক থাকায় বড় বাজারে এক দিন এক খানি কড়া কিনিয়া আনিতে যাইলেন। দোকানীকে ধর্ম্মভয় দেখাইয়া বলিলেন,—'দেখো বাপু, ঠিক ঠিক দাম নিয়ে ভাল জিনীস দিও, ফাটা ফুটো না হয়।' দোকানীও আজ্ঞা মশায় তা দেব বৈকি, ইত্যাদি নানা কথা কহিয়া বাছিয়া বাছিয়া তাঁহাকে এক খানি কড়া দিল; তিনিও কিন্তু দোকানীর কথায় বিশ্বাস করিয়া উহা আর পরীক্ষা না করিয়াই লইয়া আসিলেন; কিন্তু দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া দেখিলেন কড়া খানি ফাটা!

ঠাকুর সে কথা শুনিয়াই বলিলেন "সে কি রে ? জিনীসটা আনলি তা দেখে আনলি না ? দোকানি ব্যবসা করতে বসেছে—সেত আর ধর্ম্ম করতে বসে নাই ? তার কথায় বিশ্বাস করে ঠকে এলি ? ভক্ত হবি ; তা বলে বোকা হবি ? লোকে তোকে ঠকিয়ে নেবে ? ঠিক ঠিক জিনীস দিলে কি না দেখে তবে দাম দিবি ; ওজনে কম দিলে কি না তা দেখে নিবি ; আবার যে সব জিনীসের ফাউ পাওয়া যায় সে সব জিনীস কিনতে গিয়ে ফাউটি পর্য্যন্ত ছেড়ে আসবি না।" এরূপ আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু ইহা তাহার স্থান নহে। এখানে আমরা ঠাকুরের অদৃষ্টপূর্ব্ব সরলতার সহিত অদ্ভুত বিচারশীলতার কথাটির উল্লেখ মাত্র করিয়াই পূর্ব্বানুসরণ করি।

ঠাকুরের নিকট শুনিযাছি এই তীর্থ ভ্রমণোপলক্ষে মথুর লক্ষ মুদ্রারও অধিক ব্যয় করিয়াছিলেন। মথুর কাশীতে আসিয়াই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে প্রথমে মাধুকরী দেন ; পরে এক দিন তাঁহাদিগকে সপরিবারে নিমন্ত্রণ করিযা আনিয়া পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন, প্রত্যেককে এক একখানি বস্ত্র ও এক এক টাকা দক্ষিণা দেন ; আবার শ্রীবৃন্দাবন দর্শন করিযা এখানে পুনরাগমন করিযা ঠাকুরের আজ্ঞায় এক দিন 'কল্পতরু' হইযা তৈজস, বস্ত্র, কম্বল, পাদুকা প্রভৃতি নিত্য আবশ্যকীয় ব্যবহার্য্য পদার্থ সকলের যে যাহা চাহিযাছিল তাহাকে তাহাই দান করেন। মাধুকরী দিবার দিনেই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের মধ্যে বিবাদ, গণ্ডগোল, এমন কি পরস্পর মারামারি পর্য্যন্ত হইয়া যাইতে দেখিয়া ঠাকুরের মনে বিষম বীতরাগ উপস্থিত হয় এবং বারাণসীতেও ইতর সাধারণকে অপর সকল স্থানের ন্যায় এইরূপে কামকাঞ্চনে রত থাকিতে দেখিযা তাঁহার মনে এক প্রকার হতাশ ভাব আসিয়াছিল। তিনি সজল নয়নে শ্রীশ্রীজগদম্বাকে বলিয়াছিলেন "মা তুই আমাকে এখানে কেন আনলি ? এর চেয়ে দক্ষিণেশ্বরে যে আমি ছিলাম ভাল !"

এইরূপে সাধারণের ভিতর বিষয়ানুরাগ প্রবল দেখিয়া ব্যথিত হইলেও এখানে অদ্ভুত দর্শনাদি হইয়া ঠাকুরের শিব মহিমা এবং কাশীর মাহাত্ম্য সম্বন্ধে দৃঢ় ধারণা হইয়াছিল। নৌকাযোগে বারাণসী প্রবেশ কাল হইতেই ঠাকুর ভাব নয়নে দেখিতে থাকেন শিবপুরী বাস্তবিকই স্বর্ণে নির্ম্মিত—বাস্তবিকই ইহাতে মৃত্তিকা প্রস্তরাদির একান্ত অভাব—বাস্তবিকই যুগ যুগান্তর ধরিয়া সাধু ভক্তগণের কাঞ্চন তুল্য সমুজ্জল, অমূল্য হৃদয়ের ভাবরাশি

স্তরে স্তরে পুঞ্জীকৃত ও ঘনীভূত হইয়া ইহার বর্ত্তমান আকারের প্রকাশ। সেই জ্যোতির্ম্ময় ভাবঘন মূর্ত্তিই ইহার নিত্য সত্য রূপ—আর বাহিরে যাহা দেখা যায় সেটা তাহারই ছায়ামাত্র।

স্থূল দৃষ্টি সহায়েও 'সুবর্ণ নির্ম্মিত বারাণসী,' কথাটির একটা মোটামুটি অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে বিশেষ চেষ্টার আবশ্যক হয় না। কাশীর অসংখ্য মন্দির ও সৌধাবলী, কাশীর প্রস্তর বাঁধান ক্রোশাধিক ব্যাপী গঙ্গাতট ও বিস্তীর্ণ সোপানাবলী সমন্বিত অগনিত স্নানের ঘাট, কাশীর প্রস্তর-মণ্ডিত তোরণ ভূষিত অসংখ্য পথ, পয়ঃপ্রণালী, বাপী, তড়াগ, কূপ, মঠ ও উদ্যান বাটিকা এবং সর্ব্বোপরি কাশীর ব্রাহ্মণ বিদ্যার্থী, সাধু ও দরিদ্রগণের পোষণার্থ অসংখ্য অন্ন সত্র সকল দেখিয়া কে না বলিবে বহু প্রাচীন কাল হইতে ভারতের সর্ব্ব প্রদেশ মিলিত হইয়া অজস্র সুবর্ণ বর্ষণেই এ বিচিত্র শিবপুরী নির্ম্মাণ করিয়াছে? ভারতের প্রায় ত্রিশ কোটি হৃদয়ের ভক্তি ভাব, এত কাল ধরিয়া এইরূপে এই নগরীতে যে সমভাবে মিলিত থাকিয়া ইহার এইরূপ বহিঃপ্রকাশ আনয়ন করিতেছে, এ কথা ভাবিয়া কাহার মন না স্তম্ভিত হইবে? কে না এই বিপুল ভাব প্রবাহের অদম্য বেগ দেখিয়া মোহিত এবং উহার উৎপত্তি নির্ণয় করিতে যাইয়া আত্মহারা হইবে? কে না বিস্মিত হইয়া ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে অবনত মস্তকে বলিবে এ সৃষ্টি বাস্তবিকই অতুলনীয়, বাস্তবিকই ইহা মনুষ্যকৃত নহে, বাস্তবিকই অসহায় জীবের প্রতি দীনশরণ আর্ত্তৈক ত্রাণ শ্রীবিশ্বনাথের অপার করুণাই ইহার জন্ম দিয়াছে এবং তাঁহার সাক্ষাৎ শক্তিই শ্রীঅন্নপূর্ণারূপে এখানে চিরাধিষ্ঠিতা থাকিয়া অন্ন বিতরণে জীবের অন্নময় প্রাণময় শরীরের এবং আধ্যাত্মিক ভাব বিতরণে তাহার মনোময় বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় শরীরের পূর্ণ পুষ্টি বিধান করিতেছেন এবং দ্রুতপদে তাহাকে মুক্তি বা শ্রীবিশ্বনাথের সহিত ঐকাত্ম্য বোধে আনয়ন করিতেছেন! ভাব মুখে অবস্থিত ঠাকুর এখানে আগমন মাত্রেই ঐ দিব্য হেমময় ভাব প্রবাহ শিবপুরী সর্ব্বত্র ওতঃপ্রোতঃ ভাবে পরিব্যপ্ত দেখিতে পাইবেন এবং উহারই জমাট প্রকাশ রূপে এ নগরীকে সুবর্ণময় বলিয়া উপলব্ধি করিবেন, ইহাতে আর বিচিত্র কি?

প্রকাশশীল পদার্থ মাত্রই হিন্দুর নয়নে সত্ত্বগুণ প্রসূত ও পবিত্র। আলোক হইতে পদার্থ সকলের প্রকাশ, সে জন্য আলোক বা উজ্জ্বলতাও আমাদের নিকট পবিত্র; দেবতার নিকটে জ্যোৎ প্রদীপ রাখা, দেব দেবীর সম্মুখে

দীপ নির্ব্বাণ না করা' এই সকল শাস্ত্রনিয়ম হইতেই আমরা এ কথা বুঝিতে পারি। এজন্যই বোধ হয় আবার উজ্জ্বল প্রকাশ যুক্ত সুবর্ণাদি পদার্থ সকল পবিত্র বলিয়া দেখিবার, শরীরের অধোভাগে সুবর্ণালঙ্কার ধারণ না করিবার বিধি সমূহের উৎপত্তি। বারাণসী সর্ব্বদা সুবর্ণময় দেখায় শৌচাদি করিয়া সুবর্ণকে অপবিত্র করিতে হইবে বলিয়া বালক স্বভাব ঠাকুর প্রথম প্রথম ভাবিয়া আকুল হইয়াছিলেন। তাঁহার শ্রীমুখে শুনিয়াছি এজন্য তিনি মথুরকে বলিয়া পাল্কির বন্দোবস্ত করিয়া কয়েকদিন অসির পারে গমন করিয়া শৌচাদি সারিয়া আসিতেন। পরে ঐ ভাবের বিরামে আর ঐরূপ করিতে হইত না।

কাশীতে আর একটি বিশেষ দর্শনের কথা আমরা ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছিলাম। বারাণসীর মণিকর্ণিকাদি পঞ্চতীর্থ দর্শন করিতে অনেকেই গঙ্গাবক্ষে নৌকাযোগে যাইয়া থাকেন। মথুরও ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া তদ্রূপে গমন করিয়াছিলেন। মণিকর্ণিকার পার্শ্বেই কাশীর প্রধান শ্মশান ভূমী। মথুরের নৌকা যখন মণিকর্ণিকা ঘাটের সম্মুখে আসিল তখন দেখা গেল শ্মশান চিতাধূমে ব্যাপ্ত—শব দেহ সকল সেখানে দাহ হইতেছে। ভাবময় ঠাকুর সহসা সে দিকে দেখিয়াই একেবারে আনন্দে উৎফুল্ল ও রোমাঞ্চিত কলেবর হইয়া নৌকার বাহিরে ছুটিয়া আসিলেন এবং একেবারে নৌকার কিনারায় দাঁড়াইয়া সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন! মথুরের পাণ্ডা ও নৌকার মাঝি মাল্লারা লোকটি জলে পড়িয়া স্রোতে ভাসিয়া যাইবে ভাবিয়া ঠাকুরকে ধরিতে ছুটিল। কিন্তু কাহাকেও আর ধরিতে হইল না; দেখা গেল ঠাকুর ধীর স্থির নিশ্চেষ্ট ভাবে দণ্ডায়মান আছেন এবং এক অদ্ভুত জ্যোতিঃ ও হাস্যে তাঁহার মুখমণ্ডল সমুদ্ভাসিত হইয়া যেন সে স্থানটিকে শুদ্ধ জ্যোতির্ম্ময় করিয়া তুলিয়াছে! মথুর ও ঠাকুরের ভাগিনেয় হৃদয় সাবধানে ঠাকুরের নিকট দাঁড়াইয়া রহিলেন, মাঝি মাল্লারাও বিস্ময়াপূর্ণ নয়নে ঠাকুরের অদ্ভুত ভাব দূরে দাঁড়াইয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। কতক্ষণ পরে ঠাকুরের সে দিব্য ভাবের বিরাম হইলে সকলে মণিকর্ণিকায় নামিয়া স্নান দানাদি যাহা করিবার করিয়া পুনরায় নৌকাযোগে অন্যত্র গমন করিলেন।

তখন ঠাকুর তাঁহার সেই অদ্ভুত দর্শনের কথা মথুর প্রভৃতিকে বলিতে লাগিলেন। বলিলেন—দেখিলাম, পিঙ্গলবর্ণ জটাধারী দীর্ঘাকার এক

শ্বেতকায় পুরুষ গম্ভীর পাদবিক্ষেপে শ্মশানে প্রত্যেক চিতার পার্শ্বে আগমন করিতেছেন এবং দেহের সহিত দেহীকে সযত্নে উত্তোলন করিয়া তাহার কর্ণে পরম ব্রহ্মমন্ত্র প্রদান করিতেছেন!—সর্ব্বশক্তিময়ী শ্রীশ্রীজগদম্বাও স্বয়ং মহাকালীরূপে সেই চিতার উপর জীবের অপর পার্শ্বে বসিয়া তাহার স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ প্রভৃতি সকল প্রকার সংস্কার বন্ধন খুলিয়া দিতেছেন এবং নির্ব্বাণের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া স্বহস্তে তাহাকে অখণ্ডের ঘরে প্রেরণ করিতেছেন! এইরূপে বহু কল্পের যোগ তপস্যায় যে অদ্বৈতানুভবে ভূমানন্দ জীবের আসিয়া উপস্থিত হয় তাহা তাহাকে সদ্যঃ সদ্যঃ প্রদান করিয়া কৃতার্থ করিতেছেন!

মথুরের সঙ্গে যে সকল শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন তাঁহারা ঠাকুরের পূর্ব্বোক্ত দর্শনের কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন—'কাশীখণ্ডে মোটামুটি ভাবে লেখা আছে, এখানে মৃত্যু হইলে ৺ বিশ্বনাথ জীবকে নির্ব্বাণ পদবী দিয়া থাকেন; কিন্তু কি ভাবে যে উহা দেন তাহা সবিস্তার লেখা নাই। আপনার দর্শনেই স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে উহা কিরূপে সম্পাদিত হয়। আপনার দর্শনাদি শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ কথারও পারে চলিয়া যায়!'

কাশীতে অবস্থান কালে ঠাকুর এখানকার খ্যাতনামা সাধুদেরও দর্শন করিতে যান। তন্মধ্যে ত্রৈলঙ্গ স্বামীজিকে দেখিয়াই তাঁহার বিশেষ প্রীতি হইয়াছিল। স্বামীজির অনেক কথা ঠাকুর অনেক সময় আমাদিগকে বলিতেন। বলিতেন—"দেখলাম, সাক্ষাৎ বিশ্বনাথ তাঁহার শরীরটা আশ্রয় করে প্রকাশিত হয়ে রয়েছেন! তাঁর থাকায় কাশী উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে! উচু জ্ঞানের অবস্থা! শরীরের কোন হুঁসই নাই; রোদে বালি এমনি তেতেছে যে পা দেয় কার সাধ্য—সেই বালির উপরেই সুখে শুয়ে আছেন! পায়েস রেঁধে নিয়ে গিয়ে খাইয়ে দিয়েছিলাম। তখন কথা কন না—মৌনী। ইসারায় জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ঈশ্বর এক না অনেক? তাতে ইসারা করে বুঝিয়ে দিলেন—সমাধিস্থ হয়ে দেখ তো, এক; নইলে যতক্ষণ আমি, তুমি জীব, জগৎ, ইত্যাদি নানা জ্ঞান রয়েছে ততক্ষণ, অনেক। তাঁকে দেখিয়ে হৃদেকে বলেছিলাম, 'একেই ঠিক ঠিক পরমহংস অবস্থা বলে।'

কাশীতে কিছু কাল থাকিয়া ঠাকুর মথুর বাবুর সহিত বৃন্দাবনে গমন করেন। শুনিয়াছি বাঁকা বিহারী মূর্ত্তি দর্শন করিয়া তথায় তাঁহার অদ্ভুত ভাবাবেশ হইয়াছিল—আত্মহারা হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে ছুটিয়া

ছিলেন! আবার সন্ধ্যাকালে রাখাল বালকগণ গরুর পাল লইয়া যমুনা পার হইয়া গোষ্ঠ হইতে ফিরিতেছে দেখিতে দেখিতে তাহাদের ভিতর শিখিপুচ্ছধারী নবনীরদশ্যাম গোপাল কৃষ্ণের দর্শন লাভ করিয়া তিনি প্রেমে বিভোর হইয়াছিলেন। ঠাকুর এখানে নিধুবন, গোবৰ্দ্ধন প্রভৃতি ব্রজের কয়েকটি স্থানও দর্শন করিতে যান। ব্রজের এই সকল স্থান তাঁহার বৃন্দাবন অপেক্ষা অধিক ভাল লাগিয়াছিল এবং ব্রজেশ্বরী শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের নানা ভাবে দর্শন করিয়া এই সকল স্থানেই তাঁহার বিশেষ প্রেমের উদয় হইয়াছিল। শুনিয়াছি গোবৰ্দ্ধনাদিদর্শন করিতে যাইবার কালে মথুর তাহাকে পাল্কীতে পাঠাইয়া দেন এবং দেবস্থানে ও দরিদ্রদিগকে দান করিতে করিতে যাইবেন বলিয়া পাল্কির এক পার্শ্বে একখানি বস্ত্র বিছাইয়া তাহার উপর টাকা আধুলি সিকি দুয়ানি ইত্যাদি কাঁড়ি করিয়া ঢালিয়া দিয়াছিলেন; কিন্তু ঐ সকল স্থানে যাইতে যাইতেই ঠাকুর ভাবে প্রেমে এতদূর বিহ্বল হইয়া পড়েন যে ঐ সকল আর হাতে করিয়া তুলিয়া দান করিতে পারেন নাই। অগত্যা ঐ বস্ত্রের এক কোন ধরিয়া টানিয়া ঐ সকল স্থানে স্থানে দরিদ্রদিগের ভিতর ছড়াইতে ছড়াইতে গিয়াছিলেন।

ব্রজের এই সকল স্থানে ঠাকুর সংসার বিরাগী অনেক সাধককে * কুপের ভিতর পশ্চাৎ ফিরিয়া বসিয়া বাহিরের সকল ভয় হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া জপ ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতে দেখিয়াছিলেন। ব্রজের প্রাকৃতিক শোভা. ফল ফুলে শোভিত ক্ষুদ্র গিরি গোবৰ্দ্ধন, মৃগ ও শিখিকুলের বন মধ্যে যথা তথা নিঃশঙ্ক বিচরণ, সাধু তপস্বীদের নিরন্তর ঈশ্বরের চিন্তায় দিন যাপন এবং সরল ব্রজবাসীদের কপটতাশূন্য সশ্রদ্ধ ব্যবহার ঠাকুরের চিত্ত বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল, তাহার উপর নিধুবনে সিদ্ধ প্রেমিকা বাবয়সী তপস্বিনী গঙ্গামাতার দর্শন ও মধুর সঙ্গ লাভ করিয়া ঠাকুর এতই মোহিত হইয়াছিলেন যে তাঁহার মনে হইয়াছিল ব্রজ ছাড়িয়া তিনি আর কোথাও যাইবেন না; এখানেই জীবনের অবশিষ্ট কাল কাটাইয়া দিবেন।

গঙ্গামাতার তখন প্রায় ষষ্ঠি বর্ষ বয়ঃক্রম হইবে। বহুকাল ধরিয়া ব্রজেশ্বরী শ্রীমতি রাধা ও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহার প্রেম বিহ্বল ব্যবহার

* বাঁশ খড়ে তৈয়ারি একজন মাত্র লোকের বাসোপযোগী ঘরকে এখানে কুপ বলে। একটি মোচার অগ্রভাগটি কাটিয়া জমীর উপর বসাইয়া রাখিলে যেরূপ দেখিতে হয় কুপও দেখিতে তদ্রূপ।

দেখিয়া এখানকায় লোকে তাঁহাকে শ্রীরাধিকার প্রধানা সঙ্গিনী ললিতা সখী, কোন কারণ বশতঃ স্বয়ং দেহ ধারণ করিয়া জীবকে প্রেমশিক্ষা দিবার নিমিত্ত অবতীর্ণা বলিয়া মনে করিত। ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছি ইনি দর্শন মাত্রেই ধরিতে পারিয়াছিলেন, ঠাকুরের শরীরে শ্রীমতি রাধিকার ন্যায় মহাভাবের প্রকাশ এবং সেজন্য ইনি ঠাকুরকে শ্রীমতি রাধিকাই স্বয়ং অবতীর্ণা ভাবিয়া 'দুলালি' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন। 'দুলালির' এই-রূপ অযত্ন লভ্য দর্শন পাইয়া গঙ্গামাতা আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিয়াছিলেন এবং ভাবিয়াছিলেন তাঁহার এত কালের হৃদয়ের সেবা ও ভালবাসা আজ সফল হইল! ঠাকুরও তাঁহাকে পাইয়া চির পরিচিতের ন্যায় তাঁহারই আশ্রমে সকল কথা ভুলিযা কিছু কাল অবস্থান করিয়া-ছিলেন। শুনিয়াছি, ইঁহারা উভয়ে পরস্পরের প্রেমে এতই মোহিত হইয়াছিলেন যে, মথুর প্রভৃতির মনে ভয় হইয়াছিল যে, ঠাকুর বুঝি আব তাঁহাদের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে ফিরিবেন না! পরম অনুগত মথুরের মন এই ভাবনায় যে কিরূপ আকুল হইয়াছিল তাহা আমরা বেশ অনুমান করিতে পারি। যাহা হউক ঠাকুরের মাতৃভক্তিই পরিশেষে জয়লাভ করিল এবং তাঁহার ব্রজে থাকিবার সংকল্প পরিবর্ত্তন করিয়া দিল। ঠাকুর এ সম্বন্ধে আমাদের বলিযাছিলেন—"ব্রজে গিয়ে সব ভুল হয় গিয়েছিল। মনে হয়েছিল আর ফির্'ব না। কিন্তু কিছুদিন বাদে মার কথা মনে পড়ল, মনে হল তাঁর কত কষ্ট হবে, কে তাঁকে বুড়ো বয়েসে দেখ্‌বে সেবা করবে। ঐ কথা মনে উঠে আর সেখানে থাকৃতে পারলুম না।"

বাস্তবিক যতই ভাবিয়া দেখা যায়, এ অলৌকিক পুরুষের সকল কথা ও চেষ্টা ততই অদ্ভুত বলিয়া প্রতীত হয়!—ততই আপাতঃ দৃষ্টিতে পরস্পর বিরুদ্ধ গুণ সকলের ইহাতে অপূর্ব্ব ভাবে সম্মিলন দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়! দেখনা, শ্রীশ্রীজগদম্বার পাদপদ্মে শরীর মন সর্ব্বস্ব অর্পণ করিলেও ঠাকুর সত্যটি তাঁহাকে দিতে পারিলেন না, জগতের সকল ব্যক্তির সহিত লৌকিক সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া ভুলিয়াও নিজ জননীর প্রতি ভালবাসা ও কর্ত্তব্য ভুলিতে পারিলেন না, পত্নীর সহিত শারীরিক সম্বন্ধের নামগন্ধ কোনকালে না রাখিলেও গুরুভাবে তাঁহার সহিত সর্ব্বকালে সপ্রেম সম্বন্ধ রাখিতে বিস্মৃত হই-লেন না!—ঠাকুরের এইরূপ অলৌকিক চেষ্টার কতই না দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের কোন আচার্য্য বা অবতার পুরুষের জীবনে এইরূপ

অদ্ভুত বিপরীত চেষ্টার একত্র সমাবেশ ও সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়? কে না বলিবে এরূপ আর কখনও কোথায়ও দেখা যায় নাই? ঈশ্বরাবতার বলিয়া ইঁহাকে ধারণা করুক আর নাই করুক, কে না স্বীকার করিবে এরূপ দৃষ্টান্ত আধ্যাত্মিক জগতে আর একটিও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না? ঠাকুরের বর্ষিয়সী মাতাঠাকুরাণী জীবনের শেষ কয়েক বৎসর দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকটেই বাস করিতেন এবং তাঁহার সকল প্রকার সেবা শুশ্রূষা ঠাকুর নিজ হস্তে নিত্য সম্পাদন করিয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতেন—এ কথা আমরা ঠাকুরের শ্রীমুখে বহুবার শ্রবণ করিয়াছি। আবার সেই আরাধ্যা মাতার যখন দেহান্ত হইল তখন ঠাকুরকে শোকসন্তপ্ত হইয়া এতই কাতর ও অজস্র অশ্রুবর্ষণ করিতে দেখা গিয়াছিল যে সংসারে বিরল কাহাকেও কাহাকেও ঐরূপ করিতে দেখা যায়! মাতৃবিয়োগে ঐরূপ কাতর হইলেও কিন্তু তিনি যে সন্ন্যাসী, একথা ঠাকুর এক ক্ষণের জন্য বিস্মৃত হন নাই। মাতার ঔর্দ্ধ-দেহিক ও শ্রাদ্ধাদি করিবার নিজের অধিকার নাই বলিয়া ভ্রাতুষ্পুত্র রাম-লালের দ্বারা উহা সম্পাদিত করাইয়াছিলেন এবং স্বয়ং বিজনে বসিয়া মাতার নিমিত্ত রোদন করিয়াই মাতৃঋণের যথাসম্ভব পরিশোধ করিয়া-ছিলেন। ঐ সম্বন্ধে ঠাকুর আমাদের কতদিন বলিয়াছেন—"ওরে, সংসারে বাপ মা পরম গুরু; যতদিন বেঁচে থাকেন যথাশক্তি উঁহাদের সেবা করতে হয়, আর মরে গেলে যথাসাধ্য শ্রাদ্ধ করতে হয়; যে দরিদ্র, কিছু নাই, শ্রাদ্ধ করিবার ক্ষমতা নাই তাকেও বনে গিয়ে তাঁদের স্মরণ করে কাঁদতে হয়; তবে তাঁদের ঋণশোধ হয়! কেবল ঈশ্বরের জন্য বাপ মার আজ্ঞা লঙ্ঘন করা চলে, তাতে দোষ হয় না; যেমন প্রহ্লাদ—বাপ বল্‌লেও কৃষ্ণনাম নিতে ছাড়ে নি; কি, ধ্রুব—মা বারণ করলেও তপস্যা করতে বনে গিয়েছিল; তাতে তাদের দোষ হয় নি।" এইরূপে ঠাকুরের মাতৃভক্তির ভিতর দিয়া ও গুরুভাবের অদ্ভুত বিকাশ ও লোকশিক্ষা দেখিয়া আমরা ধন্য হইয়াছি!

গঙ্গামাতার নিকট হইতে কষ্টে বিদায় গ্রহণ করিয়া ঠাকুর মথুরের সহিত পুনরায় কাশীতে প্রত্যাগমন করেন। আমরা শুনিয়াছি কয়েক দিন সেখানে থাকিবার পরে দীপান্বিতা অমাবস্যার দিনে শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা দেবীর সুবর্ণ প্রতিমা দর্শন করিয়া ঠাকুর ভাবে প্রেমে মোহিত হইয়াছিলেন। কাশী হইতে গয়া-ধামে যাইবার মথুরের ইচ্ছা হইয়াছিল। কিন্তু ঠাকুর সেখানে যাইতে অমত করায় মথুর সে সংকল্প পরিত্যাগ করেন। ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছি

ঠাকুরের পিতা গয়াধামে আগমন করিয়াই ঠাকুর যে তাঁহার গৃহে জন্মগ্রহণ করিবেন একথা স্বপ্নে জানিতে পারিয়াছিলেন এবং এজন্যই জন্মিবার পর তাঁহার নাম গদাধর রাখিয়াছিলেন। গয়াধামে ৺গদাধরের পাদপদ্ম দর্শনে প্রেমে বিহ্বল হইয়া পৃথক্‌ভাবে শরীর ধারণের কথা পাছে একেবারে ভুলিয়া যান এবং তাঁহার সহিত চিরকালের নিমিত্ত পুনরায় সম্মিলিত হন, এই ভয়েই ঠাকুর যে এখন মথুরের সহিত গয়ায় যাইতে অমত করিয়াছিলেন একথাও তিনি কখন কখন আমাদিগকে বলিযাছেন। ঠাকুরের ধ্রুব ধারণা ছিল, যিনিই পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভৃতি রূপে অবতীর্ণ হইযাছিলেন তিনিই এখন তাঁহার শরীর আশ্রয় করিয়া ধরায় আগমন করিয়াছেন। সেজন্য, পূর্ব্বোক্ত পিতৃস্বপ্নে পরিজ্ঞাত নিজ শরীর মনেব উৎপত্তি স্থল গযাধাম এবং যে যে স্থলে অবতার পুরুষেরা লীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন সেই সেই স্থান দর্শন করিতে যাইবার কথায় তাঁহার মনে কেমন একটা অব্যক্ত ভাবের সঞ্চার হইতে দেখিয়াছি। ঠাকুর বলিতেন ঐ সকল স্থানে যাইলে তাঁহার শরীর থাকিবে না, এমন গভীর সমাধিস্থ হইবেন যে তাহা হইতে তাঁহার মন আর নিম্নে, মনুষ্যলোকে ফিরিয়া আসিবে না। কারণ শ্রীগৌরাঙ্গদেবের লীলাসম্বরণ স্থল নীলাচল বা ৺পুরী-ধামে যাইবার কথাতেও ঠাকুর ঐরূপ ভাব অন্য সময়ে প্রকাশ করিয়াছিলেন। শুধু তাঁহার নিজেব সম্বন্ধে কেন ভক্তদের কাহাকেও যদি তিনি ভাবনয়নে কোন দেব বিশেষের অংশ বা বিকাশ বলিয়া বুঝিতে পারিতেন তবে তাহার সম্বন্ধেও ঐরূপ ভাব প্রকাশ করিতেন! ঐ ভাবটি পাঠককে বুঝান দুরূহ। উহাকে 'ভয়' বলিয়া নির্দ্দেশ করাটা যুক্তিসঙ্গত নহে, কারণ সামান্য সমাধি-বান্ পুরুষেরাই যখন কিরূপে দেহী মৃত্যুকালে শরীরটা ছাড়িয়া যায় জীবৎ-কালেই তাহার অনুভব করিয়া মৃত্যুকে কৌমার যৌবনাদি দেহের পরিবর্ত্তন সকলের ন্যায় একটা পরিবর্ত্তন বিশেষ বলিয়া দেখিতে পাইয়া নির্ভয় হইয়া থাকেন—তখন ইচ্ছামাত্রেই গভীর সমাধিবান্ অবতার পুরুষেরা যে একেবারে অভীঃ,মৃত্যুঞ্জয় হইয়া থাকেন ইহাতে আর বিচিত্র কি? উহাকে ইতরসাধারণের ন্যায শরীরটা রক্ষা কবিবাব বা বাঁচিবার আগ্রহও বলিতে পারি না। কারণ ইতরসাধারণে যে ঐরূপ আগ্রহ প্রকাশ করে সেটা স্বার্থসুখ বা ভোগের জন্য। যাঁহাদের মন হইতে স্বার্থপরতা চিরকালের মত ধুইয়া পুঁছিয়া গিয়াছে তাঁহাদের সম্বন্ধে আর ওকথা খাটে না। তবে ঠাকুরের মনের

পূর্ব্বোক্ত ভাব আমরা কেমন করিয়া বুঝাইব? আমাদের অভিধানে, আমাদের মনে যে সকল ভাব উঠে তাহাই বুঝাইবার, প্রকাশ করিবার উপযোগী শব্দ সমূহ পাওয়া যায়। ঠাকুরের ন্যায় মহাপুরুষদিগের মনের অত্যুচ্চ দিব্য ভাব সকল প্রকাশ করিবার, সে সকল শব্দের সামর্থ্য কোথায়? অতএব হে পাঠক, এখানে তর্কবুদ্ধি ছাড়িয়া দিয়া ঠাকুর ঐ সকল বিষয় যে ভাবে বলিয়া যাইতেন তাহা বিশ্বাসের সহিত শুনিয়া যাওয়া এবং কল্পনা সহায়ে ঐ উচ্চভাবের যথাসম্ভব ছবি মনে অঙ্কিত করিবার চেষ্টা করা ভিন্ন আমাদের আর গত্যন্তর নাই।

ঠাকুর বলিতেন এবং শাস্ত্রেও ইহার নানা দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় যে,যে প্রকাশ যেখান হইতে বা যে বস্তু বা ব্যক্তি হইতে উৎপন্ন হয়, সেই প্রকাশ পুনরায় সেই স্থলে বা সেই বস্তু বা ব্যক্তির বিশেষ সমীপাগত হইলে তাহাতেই লয় হইয়া যায়। ব্রহ্ম হইতে জীবের উৎপত্তি বা প্রকাশ; সেই জীব আবার জ্ঞান লাভ দ্বারা তাঁহার সমীপাগত হইলেই তাঁহাতে লীন হইয়া যায়। অনন্ত মন হইতে তোমার, আমার ও সকলের ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত মনের উৎপত্তি বা প্রকাশ; আমাদের ভিতর কাহারও সেই ক্ষুদ্র মন নির্লিপ্ততা, করুণা,পবিত্রতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ সমূহের বৃদ্ধি করিতে করিতে সেই অনন্ত মনের সমীপাগত বা সদৃশ হইলেই তাহাতে লীন হইয়া যায়। স্থূল জগ-তেও তদ্রূপ। সূর্য্য হইতে পৃথিবীর বিকাশ,পৃথিবী কোনরূপে সূর্য্যের সমীপাগত হইলেই তাহাতে লীন হইয়া যাইবে। অতএব বুঝিতে হইবে ঠাকুরের ঐরূপ ধারণার নিম্নে আমাদের অজ্ঞাত কি একটা ভাববিশেষ আছে; এবং বাস্তবিক যদি ৺গদাধর বলিয়া কোন বস্তু বা ব্যক্তিবিশেষ থাকেন ও ঠাকুরের শরীর মনটার বিকাশ তাঁহা হইতে কোন কারণে বিচ্ছিন্ন হইয়াই হইয়া থাকে তবে ঐ উভয় পদার্থ পুনরায় সমীপাগত হইলে যে পরস্পরের প্রতি প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া একত্র মিলিত হইবে, একথার যুক্তি বিরুদ্ধই বা কি আছে?

অবতার পুরুষেরা যে ইতরসাধারণ জীবের ন্যায় নহেন একথা আর যুক্তি তর্কদ্বারায় বুঝাইতে হয় না। তাঁহাদের ভিতর অচিন্ত্য কল্পনাতীত শক্তিপ্রকাশ দেখিয়াই জীব অবনত মস্তকে তাঁহাদের হৃদয়ের পূজা দান ও শরণ গ্রহণ করিয়া থাকে। মহর্ষি কপিলাদি ভারতের তীক্ষ্ণদৃষ্টি সম্পন্ন দার্শনিকগণ ঐরূপ অদৃষ্টপূর্ব্ব শক্তিমান্ পুরুষদিগের জীবনরহস্য ভেদ

করিবার অশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। কি কারণে তাঁহাদের ভিতর দিয়া ইতরসাধারণাপেক্ষা সমধিক শক্তিপ্রকাশ হয় এ বিষয়ের নির্ণয় করিতে যাইয়া তাঁহারা প্রথমেই দেখিলেন সাধারণ কর্ম্মবাদ ইহার মীমাংসায় সম্পূর্ণ অক্ষম। কারণ, ইতরসাধারণ পুরুষের অনুষ্ঠিত শুভাশুভ কর্ম্ম স্বার্থসুখান্বেষণেই হইয়া থাকে। ইঁহাদের কৃত কার্য্যের আলোচনায় দেখা যায় সে উদ্দেশ্যের একান্তাভাব। পরের দুঃখমোচনের বাসনাই ইঁহাদের ভিতর অদম্য উৎসাহ আনয়ন করিয়া ইঁহাদিগকে কার্য্যে প্রেরণ করিয়া থাকে এবং সে বাসনার সম্মুখে ইঁহারা নিজের সমস্ত ভোগসুখ এককালে বলি প্রদান করিয়া থাকেন। আবার পার্থিব মান যশ লাভ যে ঐ বাসনার মূলে বর্ত্তমান তাহাও দেখা যায় না; কারণ, লোকৈষণা, পার্থিব মান যশ ইঁহারা কাক বিষ্ঠার ন্যায় সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিয়াই থাকেন। দেখনা, নর ও নারায়ণ ঋষিদ্বয় বহুকাল বদরিকাশ্রমে তপস্যায় কাটাইলেন, জগতের কল্যাণোপায় নির্দ্ধারণের জন্য, শ্রীরামচন্দ্র প্রাণের প্রতিমা সীতাকে পর্য্যন্ত ত্যাগ করিলেন, প্রজাদিগের কল্যাণের জন্য; শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যেক কার্য্যানুষ্ঠান করিলেন, সত্য ও ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার জন্য; বুদ্ধদেব রাজ্যসম্পদ ত্যাগ করিলেন, জন্ম জরা মরণাদি দুঃখের হস্ত হইতে জীবকে উদ্ধার করিবেন বলিয়া; ঈশা প্রাণপাত করিলেন, দুঃখশোকাকুল পৃথিবীতে প্রেমস্বরূপ পরম পিতার প্রেমের রাজ্য স্থাপনার জন্য; মহম্মদ অধর্ম্মের বিরুদ্ধেই তরবারি ধারণ করিলেন; শঙ্কর, অদ্বৈতানুভবেই যথার্থ শান্তি, জীবকে একথা বুঝাইতেই আপন শক্তি নিয়োগ করিলেন; এবং শ্রীচৈতন্য, একমাত্র শ্রীহরির নামেই জীবের কল্যাণকারী সমস্ত শক্তি নিহিত রহিয়াছে জানিয়া সংসারের ভোগসুখে জলাঞ্জলি দিয়া উদ্দাম তাণ্ডবে হরিনাম প্রচারেই জীবনোৎসর্গ করিলেন। কোন স্বার্থ ইঁহাদিগকে এই সকল কার্য্যে প্রেরণ করিয়াছিল? কোন আত্মসুখলাভের জন্য ইঁহারা জীবনে এত কষ্ট স্বীকার করিয়া গিয়াছেন?

দার্শনিকগণ আরও দেখিলেন মুক্তপুরুষের যে সমস্ত লক্ষণ তাঁহারা শাস্ত্রদৃষ্টে স্বীকার করিয়া থাকেন, সে সমস্তও ইঁহাদের জীবনে বিশেষভাবে বিকশিত। কাজেই ঐ সকল পুরুষদিগকে বাধ্য হইয়াই এক নূতন শ্রেণীর অন্তর্গত করিতে হইল। সাংখ্যকার কপিল বলিলেন, ইঁহাদের ভিতর এক প্রকার মহদুদার লোকৈষণা বা লোককল্যাণ বাসনা থাকে। সে জন্য ইঁহারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের তপস্যা প্রভাবে মুক্ত হইয়াও নির্ব্বাণ পদবীতে

অবস্থান করেন না; প্রকৃতিতে লীন হইয়া থাকেন বা প্রকৃতিগত সমস্ত শক্তিই তাঁহাদের শক্তি এই প্রকার বোধে এক কল্পকাল অবস্থান করিয়া থাকেন; এবং এজন্যই ইঁহাদের মধ্যে যিনি যে যুগে ঐরূপ বোধ করেন তিনিই সে যুগে অপর সাধারণ মানবের নিকট ঈশ্বর বলিয়া প্রতীত হন। কারণ প্রকৃতিতে যাহা কিছু শক্তি আছে সে সমস্তই আমার বলিয়া যাঁহার বোধ হইবে তিনি সে সমস্ত শক্তিই ইচ্ছামত প্রযোগ করিতে পারিবেন। আমাদের প্রত্যেকের ক্ষুদ্র শরীর মনে প্রকৃতির যে সকল শক্তি রহিয়াছে সে সকলকে আমার বলিয়া বোধ করিতেছি বলিয়াই আমরা যেমন উহাদের ব্যবহার করিতে পারিতেছি, তাঁহারাও তদ্রূপ প্রকৃতির সমস্ত শক্তিসমূহ তাঁহাদের আপনার বলিয়া বোধ করায় সে সমস্তই ইচ্ছামত ব্যবহার করিতে পারেন। সাংখ্যকার কপিল এইরূপে সর্ব্বকালব্যাপী এক নিত্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার না করিলেও এককল্পব্যাপী সর্ব্বশক্তিমান্ পুরুষ সকলের অস্তিত্ব স্বীকার করিযা তাঁহাদিগের 'প্রকৃতি-লীন' আখ্যা প্রদান করিয়াছেন।

বেদান্তকার আবার একমাত্র ঈশ্বর পুরুষের নিত্য অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া এবং তিনিই জীব জগৎরূপে প্রকাশিত রহিয়াছেন বলিয়া ঐ সকল বিশেষ শক্তিমান্ পুরুষসকলকে নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব ঈশ্বরের বিশেষ অংশসম্ভূত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, এইরূপ পুরুষেরা লোক-কল্যাণকর এক একটি বিশেষ কার্য্যের জন্যই আবশ্যকমত জন্মগ্রহণ করেন এবং তদুপযোগী শক্তিসম্পন্নও হইয়া আসেন দেখিয়া ইঁহাদিগের "আধি কারিক" নাম প্রদান করিয়াছেন। "আধিকারিক" অর্থাৎ কোন একটি কার্য্য বিশেষের অধিকার বা সেই কার্য্যটি সম্পন্ন করিবার ভার ও ক্ষমতা প্রাপ্ত। এইরূপ পুরুষ সকলেও আবার উচ্চাবচ শক্তির প্রকাশ দেখিয়া এবং ইঁহাদের কাহারও কার্য্য সমগ্র পৃথিবীর সকল লোকের সর্ব্বকালে কল্যাণের জন্য অনুষ্ঠিত ও কাহারও কার্য্য একটি প্রদেশের বা তদন্তর্গত একটি দেশের লোকসমূহের কল্যাণের জন্য অনুষ্ঠিত দেখিয়া বেদান্তকার আবার এই সকল পুরুষসকলের ভিতর কতকগুলিকে ঈশ্বরাবতার এবং কতকগুলিকে সামান্য অধিকার প্রাপ্ত নিত্যমুক্ত ঈশ্বরকোটি বা পুরুষশ্রেণীয় বলিযা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। বেদান্তকারের এই ভিত্তি অবলম্বন করিয়াই আবার পুরাণ-কারেরা পরে কল্পনাসহায়ে অবতার পুরুষদিগের প্রত্যেকে কে কতটা

ঈশ্বরের অংশসম্ভূত ইহা নির্দ্ধারণের চেষ্টার একটু বাড়াবাড়ি করিয়াছেন এবং ভাগবৎকার—

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।

ইত্যাদি বচন প্রয়োগ করিয়াছেন।

আমরা ইতিপূর্ব্বে পাঠককে এক স্থলে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে গুরু ভাবটি স্বয়ং ঈশ্বরেরই ভাব। তিনিই অজ্ঞানমোহে পতিত জীবকে উহার পারে যাইতে স্বয়ং অক্ষম দেখিয়া অপার করুণায় তাহাকে উহা হইতে উদ্ধার করিতে আগ্রহবান্ হন। ঈশ্বরের সেই করুণাপূর্ণ আগ্রহ এবং তদ্‌ভাবাপন্ন হইবার চেষ্টাদিই শ্রীগুরু ও গুরুভাব। ইতর সাধারণ মানবের ধরিবার বুঝিবার সুবিধার জন্য সেই গুরুভাব কখন কখন বিশেষ বিশেষ নরাকারে আমাদের নিকট আবহমান কাল হইতে প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। সেই সকল পুরুষকেই জগৎ অবতার বলিয়া পূজা করিতেছে। অতএব বুঝা যাইতেছে অবতার পুরুষেরাই মানব সাধারণের যথার্থ গুরু।

আধিকারিক পুরুষদিগের শরীর মন সে জন্য এমন উপাদানে গঠিত দেখা যায় যে, তাহাতে ঐশ্বরিক ভাব প্রেম ও উচ্চাঙ্গের শক্তিপ্রকাশ ধারণ ও হজম করিবার সামর্থ্য থাকে। জীব এতটুকু আধ্যাত্মিক শক্তি ও লোকমান্য পাইলেই অহঙ্কৃত ও আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে; আধিকারিক পুরুষেরা ঐ সকল সহস্র সহস্র গুণে অধিক পরিমাণে পাইলেও কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ বা বুদ্ধিভ্রষ্ট ও অহঙ্কৃত হন না। জীব সকল প্রকার বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া সমাধিতে আত্মানুভবের পরম আনন্দ একবার কোনরূপে পাইলে আর সংসারে কোন কারণেই ফিরিতে চাহে না; আধিকারিক পুরুষদিগের জীবনে সে আনন্দ যেমনি অনুভব হয় অমনি মনে হয় অপর সকলকে কি উপায়ে এ আনন্দের ভাগী করিতে পারি! জীবের ঈশ্বর দর্শনের পরে আর কোন কার্য্যই থাকে না, আধিকারিক পুরুষদিগের সেই দর্শন লাভের পরেই, যে বিশেষ কার্য্য করিবার জন্য তাঁহারা আসিয়াছেন তাহা ধরিতে বুঝিতে পারেন এবং সেই কার্য্য আরম্ভ করেন। সেজন্য আধিকারিক পুরুষদিগের সম্বন্ধে নিয়মই এই যে যতদিন না তাঁহারা যে কার্য্য বিশেষ করিতে আসিয়াছেন তাহা সমাপ্ত করেন ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহাদের মনে সাধারণ মুক্ত পুরুষদিগের মত 'শরীরটা এখনি যায় যাক্, ক্ষতি নাই' এরূপ ভাবের উদয় কখনও হয় না—মনুষ্যলোকে বাঁচিয়া থাকিবার আগ্রহই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁহাদের ঐ আগ্রহে, ও

জীবের বাঁচিয়া থাকিবার আগ্রহে আকাশ পাতাল প্রভেদ বর্ত্তমান দেখিতে পাওয়া যায়। আবার কার্য্য শেষ হইলেই আধিকারিক পুরুষ উহা তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারেন এবং আর তিলার্দ্ধও সংসারে না থাকিয়া পরম আনন্দে সমাধিতে দেহত্যাগ করেন। জীবের ইচ্ছামাত্রেই সমাধিতে শরীর ত্যাগ তো দূরের কথা—জীবনের কার্য্য যে শেষ হইয়াছে এরূপ উপলব্ধিই হয় না; এজীবনে অনেক বাসনা পূর্ণ হইল না এইরূপ উপলব্ধিই হইয়া থাকে। অন্য সকল বিষয়েও তদ্রূপ প্রভেদ থাকে। সে জন্যই আমাদের মাপ কাটিতে অবতার বা আধিকারিক পুরুষদিগের জীবন ও কার্য্যের উদ্দেশ্য মাপিতে যাইয়া আমাদিগকে বিষম ভ্রমে পতিত হইতে হয়।

'গয়ায় যাইলে শরীর থাকিবে না','জগন্নাথে যাইলে চিরসমাধিস্থ হইবেন,' ঠাকুরের এই সকল কথাগুলির ভাব কিঞ্চিন্মাত্রও হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে শাস্ত্রের পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি পাঠকের কিছু কিছু জানা আবশ্যক। এজন্যই আমরা যত সহজে পারি সংক্ষেপে উহার আলোচনা এখানে করিলাম। ঠাকুরের কোন ভাবটিই যে শাস্ত্র বিরুদ্ধ নহে পূর্ব্বোক্ত আলোচনায় পাঠক ইহাও বুঝিতে পারিবেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি ঠাকুর মথুরের সহিত ৺গয়াধামে যাইতে অস্বীকার করেন। কাজেই সে যাত্রায় কাহারও আর গয়াদর্শন হইল না। বৈদ্যনাথ হইয়া কলিকাতায় সকলে প্রত্যাগমন করিলেন। বৈদ্যনাথের নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামের লোকসকলের দারিদ্র্য দেখিয়াই ঠাকুরের হৃদয় করুণাপূর্ণ হয় এবং মথুরকে বলিয়া তাহাদের পরিতোষপূর্ব্বক এক দিন খাওয়াইয়া প্রত্যেককে এক একখানি বস্ত্রপ্রদান করেন। একথার বিস্তার উল্লেখ আমরা লীলাপ্রসঙ্গে পূর্ব্বেই একস্থলে করিয়াছি।

কাশী বৃন্দাবনাদি তীর্থ ভিন্ন ঠাকুর একবার মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের জন্মস্থল নবদ্বীপ দর্শন করিতেও গমন করিয়াছিলেন। সেবারেও মথুর বাবু তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া যান। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সম্বন্ধে ঠাকুর আমাদের এক সময়ে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা হইতেই বেশ বুঝা যায় যে, অবতার পুরুষদিগের মনের সম্মুখেও সকল সময় সকল সত্য প্রকাশিত থাকে না। তবে আধ্যাত্মিক জগতের যে বিষয়ের তত্ত্ব তাঁহারা জানিতে বুঝিতে ইচ্ছা করেন অতি সহজেই তাহা তাঁহাদের মন বুদ্ধির গোচর হইয়া থাকে।

শ্রীগৌরাঙ্গের অবতারত্ব সম্বন্ধে আমাদের ভিতর অনেকেই তখন সন্দি-

বান্ ছিলেন, এমন কি 'বৈষ্ণব' অর্থে ছোটলোক এই কথাই বুঝিতেন এবং সন্দেহ নিরসনের নিমিত্ত ঠাকুরকে অনেক সময় ঐ বিষয় জিজ্ঞাসাও করিয়াছিলেন। ঠাকুর তদুত্তরে একদিন আমাদের বলিয়াছিলেন—"আমারও তখন তখন ঐ রকম মনে হ'ত রে, ভাবতুম পুরাণ ভাগবত কোথায়ও কোন নাম গন্ধ নেই—চৈতন্য আমার অবতার! ন্যাড়া নেড়িরা টেনে বুনে একটা বানিয়েচে আর কি!—কিছুতেই ওকথা বিশ্বাস হ'ত না। মথুরের সঙ্গে নবদ্বীপ গেলুম। ভাবলুম, যদি অবতারই হয় ত সেখানে কিছু না কিছু প্রকাশ থাক্‌বে, দেখ্‌লে বুঝতে পারব। একটু প্রকাশ (দেবভাবের) দেখবার জন্য এখানে, ওখানে, বড় গোঁসাইয়ের বাড়ি, ছোট গোঁসাইয়ের বাড়ি, ঢের জায়গায় ঘুরে ঘুরে ঠাকুর দেখে বেড়ালুম—কোথাও কিছু দেখতে পেলুম না! —সব জায়গাতেই এক এক কাটের মুরদ হাত তুলে খাড়া রয়েছে দেখলুম! দেখে প্রাণটা খারাপ হয়ে গেল, ভাবলুম, কেনই বা এখানে এলুম। তার পর ফিরে আস্‌ব বলে নৌকায় উঠ্‌চি এমন সময় দেখতে পেলুম! অদ্ভুত দর্শন! দুটি সুন্দর ছেলে—এমন রূপ কখন দেখিনি, তপ্ত কাঞ্চনের মত রং, কিশোর বয়স, মাথায় একটা করে জ্যোতির মণ্ডল, হাত তুলে আমার দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে আকাশ পথ দিয়ে ছুটে আস্‌চে! অমনি 'ঐ এলোরে, এলোরে' বলে চেঁচিয়ে উঠ্‌লুম। ঐ কথা গুলি বলতে না বলতে তারা নিকটে এসে (নিজের শরীর দেখাইয়া) এর ভিতর ঢুকে গেল, আর বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেলাম! জলেই পড়তুম, হৃদে নিকটে ছিল, ধরে ফেল্‌লে। এই রকম এই রকম, ঢের সব দেখিয়ে বুঝিয়ে দিলে বাস্তবিকই অবতার, ঐশ্বরিক শক্তির বিকাশ!" ঠাকুর, 'ঢের সব দেখিয়ে,' কথাগুলি এখানে ব্যবহার করিলেন, কারণ, পূর্ব্বেই একদিন শ্রীগৌরাঙ্গদেবের নগর-সঙ্কীর্ত্তন দর্শনের কথা আমাদের নিকট গল্প করিয়াছিলেন। সে দর্শনের কথা আমরা লীলাপ্রসঙ্গের অন্যত্র উল্লেখ করিয়াছি বলিয়া এখানে আর করিলাম না।

ভীমাক্ষেমাদশকং।

[শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এ]

(ভীমা) অমাবস্যারাত্রৌ স্তিমিততিমিরাগ্রস্ত ভুবনে
স্ফুরৎ বিদ্যুদ্দামে ঘন ঘন ঘটা ব্যাপ্তবিয়তি।
মহাধ্বংশাশংসি প্রলয় পবনোৎপাটিতনগে
মদোন্মত্তা কেয়ং বিহরতি খলু ভীতিরহিতা॥ ১॥

(ক্ষেমা) নবাম্বুদ শ্যামা গলিতবসনা মুক্তচিকুরা
ক্বণৎপাদাম্ভোজা মুখরিতমদোন্মত্ত ভ্রমরা।
সমস্তাদাপীনাস্তনযুগভর স্তোক নমিতা
লসৎকান্তি হস্তিভূশমখিলজনভ্রান্তিনিবহান্॥ ২॥

(ভীমা) মহাঘোরারাবাধ্বনিত গহনধ্বান্তগগনা
বহৎশ্বাসোচ্ছাসৈশ্চলিত প্রলযাশংসিঝটিকা।
ভ্রমৎ চন্দ্রাদিত্য গ্রহগণ পথভ্রষ্ট কলিতা
মহাবীর্য্যা কেয়ং তরুণতপনারক্তনয়না॥ ৩॥

(ক্ষেমা) সমস্তাদাকৃষ্টামরবরগণস্তুতিহসিতা
বরাভীতিহস্তধৃত পদনত ভক্তনিবহা।
মহাবিশ্বাচাপ্তা চিরমনবদ্যেন্দুবদনা
প্রসন্না তন্বীযং তপনতনয়ত্রাসনিহতা॥ ৪॥

(ভীমা) মহাভীমা শ্যামা বিকটদশনা দৈত্যবলহা
শিরোমাল্যা তুল্যা নরকরকৃতালম্বিরসনা।
বমদ্রক্তালিপ্ত নিশিতকরবালোদ্ধৃতকরা
মহারৌদ্রা রুদ্রোরসিরমণরসোৎফুল্লবদনা॥ ৫॥

(ক্ষেমা) সুরম্ভাস্তম্ভোরুর্ঘনজঘনধৃগম্বুজমুখী
নিতম্বাশম্ভূরুকমলনিবসদ্ধাহমঞ্জুরা।
মহামায়া ছায়াসম মদনহাস্যগমনা
বরাঢ্যা ব্রহ্মাদেরপি কলুষজাড্যপ্রমাথনী॥ ৬॥

(ভীমা) হুহুঙ্কারৈরুগ্রৈস্তলিতদশদিঙ্নাগনিলয়া
শিবানাং ফুৎকারৈর্মুখরিতচিতানর্ত্তনপরা।
প্রমত্তা দীপ্তেয়ং ত্রিভুবনতলোৎপাটনকরী
সমন্তাৎ ক্ষিপন্তী ক্ষয়িতভবজনব্যাধি নিবহান্ ॥ ৭ ॥

(ক্ষেমা) অপাঙ্গস্ফুলিঙ্গাহতমদনতনুঃসঙ্গনিবস
জবামাল্যালম্বিশতদলদলালক্তচরণা।
পুরন্ধ্রাস্যা বশ্যা জিতরতিকলা জ্যোতিকলনা
জগৎযন্ত্রী ক্ষান্তিঃ ক্ষয়িতভবমলা শান্তিনিলয়া ॥ ৮ ॥

(ভীমা) গ্রসচ্চন্দ্রাদিত্যাগ্নমিতবলবদ্ধম্বরসনা
মহাকালী খ্যাতা নমিতহরিহরশীর্ষমুকুটা।
বিধেবর্ন্দ্যা সন্ধ্যা মনসিজনসঙ্ঘপ্রসবিনী
কটাক্ষাৎ ক্ষিপন্তী জলদযুতরবিচন্দ্রকনিকান্ ॥ ৯ ॥

(ক্ষেমা) মহাক্ষেমা ক্ষেমঙ্করিহরপদপ্রান্তনমিতা
সতীলক্ষ্মী লক্ষ্মীপতিধৃতনিজোৎসঙ্গকমলা।
দধৎমুক্তিঃ শক্তিঃ সমিতনিখিলাসক্তিরচনা
প্রশান্তিং দেহেন্দুমতিকৃপণমহো মৃড়ললনে! ॥ ১০ ॥

ভীমাক্ষেমা স্তোত্রের বঙ্গানুবাদ।

ঘোর অমাবস্যারাত্র—তিমিরে আচ্ছন্ন ধরা।
নভোব্যাপ্ত মহা মেঘে দামিনীর কড়কড়া ॥
উৎপাটিত মেরু চূড়া প্রলয় সূচিত ঝড়ে।
মদোন্মত্তা কে ললনা ভয়হীনা নৃত্য করে ॥ ১ ॥

নবীননীরদশ্যামা মুক্তকেশী দিগম্বরা।
পদযুগ কোকনদে ঝঙ্কারে মত্ত ভোমরা ॥
ঈষৎ নমিত দেহা পীনপয়োধর ভরে।
সুকান্তি জীবের ভ্রান্তি কটাক্ষে হরণ করে ॥ ২ ॥

মার্ মার্ শব্দে যার ব্যোমতল নিনাদিত।
নিশ্বাসে প্রলয় বায়ু ভীমবেগে প্রবাহিত॥
নৃত্যে যার কক্ষ ভ্রষ্ট রবি চন্দ্র গ্রহতারা।
মহাবীর্য্যবতী বামা নয়নে অরুণ ধারা॥ ৩॥

দেবগণ স্তব তুষ্টা মৃদুমন্দ হাস্যপরা।
পদনত ভক্তগণে অভয়বরদকরা॥
মহাবিদ্যা অনবদ্যা শশীমুখী আদিভূতা।
সুন্দরী ষোড়শী শ্যামা যমভীতিনিবারিতা॥ ৪॥

মহাভীমা ঘোরতমা দন্তুরা দৈত্যনাশিনী।
নৃমুণ্ডমালিনী বামা নৃকরকাঞ্চী কটিনী॥
উদ্ধৃতভীষণ খড়্গে রুধির উদ্গার করে।
মহারৌদ্রা রুদ্রোরশি বিপরীত রতি ধরে॥ ৫॥

কদলী ঘনজঘনা প্রফুল্লকমলাননা।
সুনিতম্বা বিম্বাধরা শত্রুরুকমলাসনা॥
মহামায়া ছায়াসম মহাদেবানুগমনা।
বরাঢ্যা বিধিপ্রমুখ দেবজাড্য প্রশমনা॥ ৬॥

ঘোর হুহুঙ্কারে যার নাদিত দিগ্ গজগণ।
ফেরুফুৎকারিত চিতামাঝে নৃত্যনিমগন॥
মদমত্তা সুপ্রদীপ্তা ত্রিভুবনলয়করী।
মহামারী জরামৃত্যু বিতরে সংসার ভরি॥ ৭॥

মদনদহন ক্রোড়ে সদা যিনি অধিষ্ঠানা।
জবামাল্য প্রলম্বিত রাজীব রক্তচরণা॥
মৃদুহাস্যা জিতেন্দ্রিয়া ভক্তগণ বন্দ্যা যিনি।
শান্তিরূপা যন্ত্রী যিনি অশান্তিধ্বংশকারিনী॥ ৮॥

প্রধূমিত করালাস্যে গ্রাসিত ব্যোম মেদিনী।
মহাকালী হরিহর বিরিঞ্চি দর্পনাশিনী॥
বিধিবন্দ্যা সন্ধ্যা যিনি মননে-স্থজিত-ধরা।
নয়নস্ফুলিঙ্গে ছোটে কোটি চন্দ্র গ্রহ তারা॥ ৯॥

ক্ষেমঙ্করী হরপদপ্রান্তে যাঁর অধিষ্ঠান।
সতীলক্ষ্মী বিষ্ণু যাঁর ক্রোড়ে করে স্তনপান॥
মুক্তিপরা তমোহরা ছিন্ন করি মায়াজাল।
ইন্দুরে প্রশান্তি দে মা! ঘুচায়ে মম জঞ্জাল॥ ১০।

স্বামি-শিষ্য সংবাদ।

[শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বি,এ]

স্বামীজির নিকটে, আজ ৮।১০ দিন হইল শিষ্য—ঋগ্বেদের সায়নভাষ্য পাঠ করিতেছে। স্বামীজি এখন কয়েক দিন হইতে বাগবাজারে ৺বলরাম বসুর বাড়ীতেই অবস্থান করিতেছেন। Maxmuller (মোক্ষমূলর)এর মুদ্রিত বহুসংখ্যায় সম্পূর্ণ ঋগ্বেদ গ্রন্থখানি কোন বড়লোকের বাড়ী হইতে আনা হইয়াছে। নূতন গ্রন্থ, তাহাতে আবার বৈদিক ভাষা শিষ্যের পড়িতে পড়িতে অনেক স্থলে বাধিয়া যাইতেছে, তদ্দর্শনে স্বামীজি সস্নেহে তাহাকে কখন কখন বাঙ্গাল বলিয়া ঠাট্টা করিতেছেন এবং ঐ স্থলগুলির উচ্চারণ ও পাঠ বলিয়া দিতেছেন। বেদের অনাদিত্ব প্রমাণ করিতে সায়ন যে অদ্ভুত যুক্তি কৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন স্বামীজি তাহার ব্যাখ্যা করিতে করিতে কখনো ভাষ্যকারের ভূয়সী প্রশংসা করিতেছেন; আবার কখনো বা প্রমাণ প্রয়োগে ঐ পদের গূঢ়ার্থ সম্বন্ধে স্বয়ং ভিন্নমত প্রকাশ করিয়া সায়নের প্রতি কটাক্ষ করিতেছেন।

এইবার স্বামীজি Maxmuller (মোক্ষমূলর) এর কথা প্রসঙ্গে বলিতেছেন "মনে হয় কি জানিস্—সায়নই নিজের ভাষ্য নিজে উদ্ধার ক'ত্তে Maxmuller

(মোক্ষমূলর) রূপে পুনরায় জন্মেছেন, আমার অনেক দিন হতেই ঐ ধারণা। Maxmuller (মোক্ষমূলর)কে দেখে সে ধারণা আরও যেন বদ্ধমূল হয়ে গেছে! এমন অধ্যবসায়ী, এমন বেদ বেদান্তসিদ্ধ পণ্ডিত এ দেশেও দেখা যায় না; তার উপর আবার ঠাকুরের (শ্রীরামকৃষ্ণদেবের) প্রতি কি অগাধ ভক্তি!—তাঁকে অবতার বলে বিশ্বাস করে রে! বাড়ীতে অতিথি হয়েছিলুম—কি যত্নটাই করেছিল! বুড় বুড়ীকে দেখে আমার মনে হত যেন বশিষ্ঠ-অরুন্ধতীর মত তারা দুটিতে সংসার কচ্ছে।—আমায় বিদায় দেবার কালে বুড়োর চখে জল পড়েছিল!"

শিষ্য—তা হলে আপনি জন্মান্তর মানেন।

স্বামীজি—নিশ্চয়। চোখে দেখতে পাচ্ছি—মান্‌বো না?

শিষ্য—আচ্ছা সায়নই যদি Maxmuller (মোক্ষমূলর) হয়ে থাকেন তো ম্লেচ্ছ হয়ে জন্মালেন কেন?

স্বামীজি—তুই অজ্ঞানে থেকেই তো 'ইনি আর্য্য, উনি ম্লেচ্ছ ও চণ্ডাল, এই সব বিভাগ কচ্ছিস্। কিন্তু যিনি বেদের ভাষ্যকার, জ্ঞানের জ্বলন্ত মূর্ত্তি, তাঁর পক্ষে আবার বর্ণাশ্রম জাতিবিভাগ কি?—তাঁর কাছে ওসব একেবারে অর্থশূন্য। জীবের উপকারের জন্য তিনি যথা ইচ্ছা জন্মাতে পারেন। বিশেষতঃ যে দেশে বিদ্যা ও অর্থ উভয়ই আছে সেখানে না জন্মালে এই প্রকাণ্ড গ্রন্থ ছাপাবার খরচই বা কোথায় পেতেন। শুনিস্ নি?—East India Company (ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি) এই ঋগ্বেদ ছাপাতে নয়লক্ষ টাকা নগদ দিয়েছিল। তাতেও কুলোয় নি। এদেশের (ভারতের) শত শত বৈদিক পণ্ডিতকে মাসহারা দিয়ে এ কার্য্যে নিযুক্ত করা হয়েছিল। এই বিপুল অর্থব্যয় এই প্রবল জ্ঞানতৃষ্ণা এ দেশে এ যুগে কেউ কি কখনো দেখেছে?

শিষ্য—মশায় যা বলেছেন—সত্য। Maxmuller (মোক্ষমূলর) নিজেই ভূমিকায় লিখেছেন যে তিনি ২৫ বৎসর কাল কেবল Manuscript (হস্তলিপি) লিখেছেন; তার পর ছাপতে ২০ বৎসর লেগেছে! ৪৫ বৎসর একখানা বই নিয়ে এইরূপ লেগে পড়ে থাকা সামান্য মানুষের কার্য্য নয়।

স্বামীজি—এই বোঝ; সাধে কি আর বলি, তিনি সায়ন!

মোক্ষমূলর সম্বন্ধে ঐরূপ কথাবার্ত্তা চলিবার পর আবার গ্রন্থপাঠ চলিতে লাগিল। এইবার বেদকে অবলম্বন করিয়াই সৃষ্টির বিকাশ হইয়াছে সায়নের এই মত স্বামীজি সর্ব্বথা সমর্থন করিতে লাগিলেন। বলিলেন—

"বেদ মানে—অনাদি সত্যের সমষ্টি; বেদপারগ ঋষিগণ ঐ সকল সত্য প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন; আমাদের মত সাধারণ দৃষ্টিতে সে সকল প্রত্যক্ষ হয় না; তাই বেদে ঋষি শব্দের অর্থ মন্ত্রার্থদ্রষ্টা। পৈতা গলায় ব্রাহ্মণ নহে। ব্রাহ্মণাদি জাতি বিভাগ পরে হয়েছিল। বেদ, শব্দাত্মক। যখন প্রলয় হয় তখন ভাবী সৃষ্টির বীজ—বেদেই সম্পুটিত থাকে। তাই পুরাণে প্রথমেই মীনাবতারে—বেদের উদ্ধার দৃষ্ট হয়। প্রথমাবতারেই বেদের উদ্ধার সাধন হ'লো। তার পর সেই বেদ থেকে ক্রমে সৃষ্টির বিকাশ হতে লাগলো। অর্থাৎ বেদনিহিত শব্দাবলম্বনে বিশ্বের সকল পদার্থ একে একে তৈয়িরি হতে লাগলো। কারণ সকল স্থূল পদার্থেরই সূক্ষ্ম রূপ হচ্চে শব্দ বা ভাব। পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পেও এইরূপে সৃষ্টি হয়েছিল। একথা বৈদিক সন্ধ্যার মন্ত্রেই আছে "সূর্য্যচন্দ্রমসৌ ধাতা যথা পূর্ব্বমকল্পয়ৎ দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষ মথো স্বঃ।" বুঝলি?

শিষ্য—কিন্তু মশায়, কোন জিনীস না থাকলে কার উদ্দেশ্যে শব্দ প্রযুক্ত হবে? আর শব্দ সকলই বা কি করে তৈয়ারি হবে?

স্বামীজি—আপাততঃ তাই মনে হয় বটে। কিন্তু বোঝ; এই ঘটটা ভেঙ্গে গেলে ঘটত্বের নাশ হয় কি? না। কেন না, ঘটটা হচ্চে স্থূল; কিন্তু ঘটত্বটা হচ্চে ঘটের সূক্ষ্ম বা শব্দাবস্থা, শব্দটা হচ্চে—জিনীসের সূক্ষ্মাবস্থা। আর আমরা দেখি শুনি ধরি ছুঁই যে জিনীস গুলো, সেগুলো হচ্চে ঐরূপ সূক্ষ্ম বা শব্দাবস্থায় অবস্থিত পদার্থ সকলের স্থূল বিকাশ। যেমন কার্য্য আর তার কারণ জগদাদি ধ্বংশ হয়ে গেলেও এই জগদ্বোধাত্মক শব্দাদি বা স্থূল পদার্থ সকলের সূক্ষ্ম স্বরূপ সমূহ ব্রহ্মে কারণরূপে থাকে। জগৎবিকাশের প্রাক্কালে প্রথমেই সূক্ষ্ম স্বরূপ সমূহের সমষ্টিভূত ঐ পদার্থ উদ্বেলিত হয়ে উঠে ও উহারই প্রকৃতিস্বরূপ শব্দ গর্ভাত্মক অনাদি নাদ ওঁকার আপনাপনি উঠিতে থাকে। ক্রমে ঐ সমষ্টি হতে এক একটী বিশেষ বিশেষ পদার্থের প্রথমে সূক্ষ্ম প্রতিকৃতি বা শাব্দিক রূপ ও পরে স্থূলরূপ প্রকাশ পায়। ঐ শব্দই ব্রহ্ম—শব্দই বেদ। ইহাই সায়নের অভিপ্রায়। বুঝলি?

শিষ্য—মশায়, ভাল বুঝতে পাচ্ছিনা।

স্বামীজি—জগতে যত ঘট আছে সবগুলো নষ্ট হলেও ঘটশব্দ থাকতে যে পারে, তাত বুঝেছিস্? তবে জগৎ ধ্বংশ হলেও সে সব জিনীস গুলোকে নিয়ে জগৎ, সেগুলো সব ভেঙ্গে চুরে গেলেও তত্তৎ বোধাত্মক শব্দগুলি কেন

না থাকতে পারবে? আর তা থেকে পুনঃসৃষ্টি কেনই বা না হতে পারবে?

শিষ্য—কিন্তু মশায়, 'ঘট' 'ঘট' বলে চীৎকার করলেই ত আর ঘট তৈয়িরি হয় না।

স্বামীজি—তুই, আমি ঐরূপে চীৎকার করলে হয় না; কিন্তু সিদ্ধসঙ্কল্প ব্রহ্মে ঘটস্মৃতি হবামাত্র ঘট প্রকাশ হয়। দেখিস্‌নি সামান্য সাধকের ইচ্ছাতেই যখন নানা অঘটন ঘটন হতে পারে—তখন সিদ্ধসঙ্কল্প ব্রহ্মের কা কথা। সৃষ্টির প্রাক্কালে ব্রহ্ম প্রথম শব্দাত্মক হন; পরে ওঁকারাত্মক বা নাদাত্মক হয়ে যান। তার পর পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পের নানা বিশেষ বিশেষ শব্দ যথা ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, বা গো, মানব, ঘট, পট ইত্যাদি ঐ ওঁকার থেকে বেরুতে থাকে। সিদ্ধসঙ্কল্প ব্রহ্মে ঐ ঐ শব্দ ক্রমে এক একটা করে হবা মাত্র ঐ ঐ জিনীস গুলো অমনি তখনি বেরিয়ে ক্রমে বিচিত্র জগতের বিকাশ হয়ে পড়ে। এই-বার বুঝলি শব্দই কিরূপে সৃষ্টির মূল?

শিষ্য—হাঁ, এক প্রকারে বুঝলুম বটে। কিন্তু ঠিক ঠিক ধারণা হয় না।

স্বামীজি—ধারণা হওয়া—প্রত্যক্ষ অনুভব করাটা কি সোজা রে বাপ? মন যখন ব্রহ্মাবগাহী হতে থাকে তখন একটার পর একটা করে এই সব অবস্থার ভিতর দিয়ে গিয়ে, শেষে নির্ব্বিকল্পে উপস্থিত হয়। সমাধিমুখে প্রথম বুঝা যায় জগৎটা শব্দময়, তার পর গভীর ওঁকার ধ্বনিতে সব মিলিয়ে যায়!—তার পর তাও শুনা যায় না!—তাও আছে কি নাই এইরূপ বোধ হয়! ঐটেই হচ্চে অনাদি নাদ। তার পর প্রত্যক্‌ ব্রহ্মে মন মিলিয়ে যায়! বস্‌—সব চুপ!

স্বামীজির কথায় শিষ্যের পরিষ্কার বোধ হইতে লাগিল স্বামীজি ঐ সকল অবস্থার ভিতর দিয়া অনেকবার স্বয়ং সমাধি ভূমিতে গমনাগমন করিয়াছেন! নতুবা এমন বিশদ ভাবে এ সকল কথা কিরূপে বুঝাইয়া বলিতেছেন। শিষ্য অবাক্‌ হইয়া শুনিতে ও ভাবিতে লাগিল—নিজের দেখা শুনা জিনীস না হইলে কখন কেহ এরূপে বলিতে বুঝাইতে পারে না। স্বামীজি আবার বলিতে লাগিলেন অবতারকল্প মহাপুরুষেরা সমাধিভঙ্গের পর আবার যখন 'আমি আমার' রাজত্বে নেবে আসেন তখন প্রথমেই অব্যক্ত নাদের অনুভব করেন, ক্রমে নাদ সুস্পষ্ট হইয়া ওঁকারের অনুভব করেন, ওঁকার থেকে পরে শব্দময় জগতের প্রতীতি করেন, তার পর সর্ব্বশেষে স্থূল ভূত জগতের প্রত্যক্ষ করেন। সামান্য সাধকেরা কিন্তু অনেক কষ্টে

কোনরূপে নাদের পরে ব্রহ্মের সাক্ষাৎ উপলব্ধিতে উঠ্‌তে পারলে, আর পুনরায় স্থূল জগতের প্রত্যক্ষ হয় যে নিম্নভূমিতে সেখানে নাম্‌তে পারে না। ব্রহ্মেই মিলিয়ে যায়। "ক্ষীরে নীরবৎ।"

এই সকল কথা হইতেছে এমন সময় শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় ৺বলরাম বাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। স্বামীজি তাঁহাকে অভিবাদন ও কুশলপ্রশ্নাদি করিয়া পুনরায় শিষ্যকে পাঠ দিতে লাগিলেন। গিরিশ বাবুও তাহা নিবিষ্টচিত্তে শুনিতে লাগিলেন এবং স্বামীজির ঐরূপে অপূর্ব্ব বিশদভাবে বেদব্যাখ্যা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন।

পূর্ব্ব বিষয়ের অনুসরণ করিয়া স্বামীজি পুনরায় বলিতে লাগিলেন—"তবে বৈদিক ও লৌকিক ভেদে শব্দ আবার দ্বিধা বিভক্ত। 'শব্দশক্তি প্রকাশিকায়' (ন্যায় প্রস্থানের গ্রন্থ বিশেষ এ বিষয়ের বিচার দেখেছি। বিচার গুলি খুব চিন্তার পরিচায়ক বটে; কিন্তু Terminology (পরিভাষা)র চোটে মাথা গুলিয়ে উঠে!"

এইবার গিরিশ বাবুর দিকে চাহিয়া স্বামীজি বলিলেন—"কি, জি, সি, এসব ত কিছু পড়্‌লে না, কেবল কেষ্ট বিষ্টু নিয়েই দিন কাটালে।"

গিরিশ বাবু—"কি আর পড়্‌বো ভাই? অত অবসরও নাই, বুদ্ধিও নাই যে, ওতে সেঁধুবো। তবে ঠাকুরের কৃপায় ও সব বেদ বেদান্ত মাথায় রেখে এবার পাড়ি মার্‌বো। তোমাদের দিয়ে তাঁর ঢের কাজ করাবেন বলে ও সব পড়িয়ে নিয়েছেন, আমার ওসব দরকার নাই।" এই বলে গিরিশবাবু সেই প্রকাণ্ড ঋগ্বেদ খানিকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতে ও বলিতে লাগিলেন—'জয় বেদরূপী রামকৃষ্ণের জয়।'

স্বামীজি অন্যমনা হইয়া কি ভাবিতে ছিলেন ইতিমধ্যে গিরিশবাবু আবার বলিয়া উঠিলেন—"হাঁহে নরেন, একটা কথা বলি। বেদ বেদান্ত তো ঢের পড়লে, কিন্তু এই যে দেশে ঘোর হাহাকার, অন্নাভাব, ব্যভিচার, ভ্রূণহত্যা মহাপাতকাদি চোখের সাম্‌নে দিনরাত ঘুরচে এর উপায় তোমার বেদে কিছু বলেছে? ঐ অমুকের বাড়ীর গিন্নি, এককালে যার বাড়ীতে রোজ ৫০ খানি পাতা পড়তো সে আজ তিন দিন হাঁড়ি চাপায় নি; ঐ অমুকের বাড়ীর কুলস্ত্রীকে গুণ্ডাগুলো অত্যাচার করে মেরে ফেলেছে; ঐ অমুকের বাড়ীতে ভ্রূণহত্যা হয়েছে, অমুক জুয়োচুরী করে বিধবার সর্ব্বস্ব হরণ করেছে—এ সকল রহিত করবার কোনও উপায় তোমার বেদে আছে কি?" গিরিশ

বাবু এইরূপে দেশের বিভীষিকাপ্রদ ছবিগুলি উপর্য্যুপরি অঙ্কিত করিয়া দেখাইতে আরম্ভ করিলে স্বামীজি শুনিয়া একেবারে নির্ব্বাক হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। জগতের দুঃখ কষ্টের কথা ভাবিতে ভাবিতে স্বামীজির চক্ষে জল আসিল। তিনি তাঁহার মনের ঐরূপ ভাব আমাদের জানিতে দিবেন না বলিয়াই যেন উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন।

ইতিমধ্যে গিরিশবাবু শিষ্যকে উপলক্ষ করিয়া বলিতেছেন "ওরে বাঙ্গাল, তোর স্বামীজিকে কেবল বেদজ্ঞ পণ্ডিত বলে মানি না ; ঐ যে জীবের দুঃখে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে গেল এই মহাপ্রাণতার জন্য মানি। দেখ্ না, কথা গুলো শুনে বেদ বেদান্ত সব কোথায় উড়ে গেল।"

শিষ্য—মশায়, আমাদের বেশ বেদ পড়া হচ্ছিল, আপনি মাঝাব জগতের কি কতকগুলো ছাই ভস্ম কথা তুলে স্বামীজির মন খারাপ করে দিলেন।

গিরিশবাবু—জগতে এই দুঃখ কষ্ট, আর উনি সে দিকে না চেয়ে চুপ করে বসে বেদ পড়ছেন। রেখে দে তোর বেদ বেদান্ত। ও সব এখন মাথায় থাকুক।

শিষ্য—আপনি কেবল হৃদয়ের ভাষা শুনতেই ভালবাসেন ; নিজে হৃদয়বান্ কিনা? কিন্তু এই সব শাস্ত্র যার আলোচনায় জগৎ ভুল হয়ে যায় তাতে আপনার আদর দেখতে পাই না। নৈলে এমন করে আজ রসভঙ্গ কল্লেন না।

গিরিশবাবু—বলি জ্ঞান আর প্রেমের পৃথকত্বটা কোথায় আমায় বুঝিয়ে দে। এই ত্যাখ না, তোর গুরু (স্বামীজি) যেমন পণ্ডিত তেমনি প্রেমিক। তোর বেদও বল্‌ছেনা "সৎ-চিৎ-আনন্দ" তিনটে একই জিনীস? এই ত্যাখ্ না স্বামীজি অত পাণ্ডিত্য প্রকাশ কর্‌ছিলেন, কিন্তু যাই জগতের দুঃখের কথা শোনা, মনে পড়া অমনি জীবের দুঃখে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেন। জ্ঞানে আর প্রেমে যদি বেদ বেদান্ত বিভিন্নতা প্রমাণ করে থাকেন ত অমন বেদ আমার মাথায় থাকুন।

শিষ্য বুঝিল গিরিশবাবুর সিদ্ধান্তগুলি বেদের অবিরোধী।

ইতিমধ্যে স্বামীজি আবার ফিরিয়া আসিলেন এবং শিষ্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"কিরে তোদের কি কথা হচ্ছিল?" শিষ্য বলিল—'এই সব বেদের কথাই হইতেছিল। ইনি এ সকল গ্রন্থ পড়েন নাই, কিন্তু সিদ্ধান্ত গুলি বেশ ঠিক ঠিক ধরিতে পারিয়াছেন—বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়।'

স্বামীজি—শুনিস্ নি? গুরুভক্তি থাকলে সব সিদ্ধান্ত প্রত্যক্ষ হয়—পড়বার শুনবার দরকার হয় না। তবে সে ভক্তি, সে বিশ্বাস জগতে দুর্লভ। ওঁর মত যাঁদের ভক্তি বিশ্বাস তাঁদের শাস্ত্র পড়বার দরকার নাই। কিন্তু ওঁকে (জি, সি কে) Imitate (অনুকরণ) কত্তে গেলে অপরের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হবে। ওঁর কথা শুনে যাবি, কিন্তু কখন ওঁর দেখাদেখি কাজ করতে যাবি না—বুঝ্লি?

শিষ্য—আজ্ঞে হাঁ।

স্বামীজি—আজ্ঞে হাঁ—নয়! যা বলি সে সব কথাগুলি বুঝে নিবি—মূর্খের মত সব কথার কেবল সায় দিয়ে যাবিনি। আমি বল্‌লেও—বিশ্বাস কর্‌বিনি। বুঝে, তবে নিবি। আমাকে ঠাকুর তাঁর কথা সব বুঝে নিতে সর্ব্বদা বল্‌তেন। সৎযুক্তি তর্ক ও শাস্ত্রে যা বলেছে এই সব নিয়ে পথে চল্‌বি। বিচার কত্তে কত্তে বুদ্ধি পরিষ্কার হয়ে যাবে, তবে তাইতে ব্রহ্ম Reflected (প্রকাশিত) হবেন। বুঝলি?

শিষ্য—হঁা। কিন্তু নানা লোকের নানা কথায় মাথা ঠিক থাকে না। এই একজন (গিরিশবাবু) বল্‌লেন 'কি হবে ও সব পড়ে?' আবার এই আপনি বল্‌ছেন—বিচার কত্তে।

স্বামীজি—আমাদের উভয়ের কথাই সত্যি। তবে দুই Standpoint (বিপরীত দিক্) থেকে আমাদের দুজনের কথাগুলি বলা হচ্চে—এই পর্য্যন্ত। একটা অবস্থা আছে যেখানে যুক্তি তর্ক সব চুপ হয়ে যায় "মূকাস্বাদনবৎ।" আর একটা আছে যখন এই সব অনাদি সত্যের সমষ্টি—বেদাদি গ্রন্থের আলোচনা-পঠন পাঠনা কত্তে কত্তে সত্যবস্তু প্রত্যক্ষ হয়। তোকে এ সকল পড়ে শুনে যেতে হবে। তবে তোর প্রত্যক্ষ হবে। বুঝলি?

নির্ব্বোধ শিষ্য স্বামীজির তাহার প্রতি ঐরূপ আদেশে গিরিশবাবুর হার হইল মনে করিয়া খুসী হইয়া গিরিশবাবুর দিকে চাহিয়া বলিতেছে—"মহাশয়, শুনিলেন তো, স্বামীজি আমায় বেদ বেদান্ত পড়তে ও বিচার কত্তেই বল্‌লেন্।"

গিরিশবাবু—তুই তা করে যা। স্বামীজির আশীর্ব্বাদে তোর তাই করেই সব ঠিক হবে।

স্বামী সদানন্দ এই সময়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। স্বামীজি তাঁহাকে

দেখিয়াই বলিলেন—"ওরে এই জি. সির মুখে দেশের দুর্দশার কথা শুনে প্রাণটা আঁকু পাঁকু কচ্ছে। দেশের জন্য কিছু কত্তে পারিস্ ?

সদানন্দ—"মহারাজ ! যো হুকুম—বান্দা তৈয়ারি হ্যায়।"

স্বামীজি—ছোট খাট Scaleএ (হারে) এই খানেই একটা Relief Centre (সেবাশ্রম) খোল্, যাতে গরীব দুঃখীরা সব সাহায্য পাবে, রোগীদের সেবা করা হবে—যাদের কেউ দেখ্‌বার নাই এমন অসহায় লোকদের জাতি বর্ণ নির্ব্বিশেষে সেবা করা হবে—বুঝ্‌লি ?

সদানন্দ—যো হুকুম মহারাজ !

স্বামীজি—জীবসেবার চেয়ে আর ধর্ম্ম নাই। সেবাধর্ম্মের ঠিক ঠিক অনুষ্ঠান করতে পারলে অতি সহজেই সংসারবন্ধন কেটে যায়—"মুক্তিঃ করফলায়তে।" এইবার গিরিশবাবুকে সম্বোধন করিয়া স্বামীজি বলিলেন—"দেখ, মনে হয় এই জগতের দুঃখ দূর কর্ত্তে আমার যদি হাজারও জন্ম নিতে হয় তাও নেবো ! তাতে যদি কারও এতটুকু দুঃখ দূর হয় তো তা কোরবো। মনে হয়, খালি নিজের মুক্তি নিয়ে কি হবে ? সকলকে সঙ্গে নিয়ে ঐ পথে যেতে হবে। কেন বল দেখি এমন ভাব উঠে ?"

গিরিশবাবু—তা না হলে আর তিনি (ঠাকুর) তোমায় সকলের চেয়ে বড় আধার বল্‌তেন !—এই বলিয়া গিরিশবাবু কার্য্যান্তরে যাইবেন বলিয়া বিদায় লইলেন।

স্বামীজিও পুনরায় শিষ্যের সহিত শাস্ত্রালাপে প্রবৃত্ত হইলেন।

শ্রীরামানুজ-দর্শন।

[শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ]

(৪)

এইবার বিচার্য্য—"স্মৃতিকে" কেন প্রমাণ বলা হয় না, আর যদি ইহা প্রমাণপদবাচ্য হয় তাহা হইলে ইহা পূর্ব্বনির্দ্ধারিত ত্রিবিধ প্রমাণের কোন্ প্রমাণের অন্তর্গত ? বস্তুতঃ এরূপ আশঙ্কা খুব স্বাভাবিক। মনে করুন, আমি দেখিয়াছি আগুনে হাত দিলে হাত পুড়ে। এখন যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে আগুনে হাত দিলে হাত পুড়ে কিনা ? তাহা হইলে আমার পূর্ব্ব স্মৃতি

বলে আমি বলি যে, হাঁ, হাত পুড়ে। এখন সে যদি ইহার প্রমাণ জিজ্ঞাসা করে তাহা হইলে আমি বলিব যে, হাঁ, ইহা সত্য, কারণ এক সময় আমার হাত পুড়িয়াছিল, তাহা আমার বেশ মনে আছে। সুতরাং এই মনে থাকা-টাকে প্রমাণ বলা যাইবে না কেন? তাহার পর ইহাও দেখা যায় যে, আমাদের দার্শনিক পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ ইহাকে প্রত্যক্ষ অনুমান শাব্দ প্রভৃতি প্রমাণ হইতে পৃথক্ করিয়া ইহাকে চতুর্থ প্রমাণ মধ্যে পরিগণিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। সুতরাং এরূপ সংশয় উত্থাপন এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক নহে। অবশ্য একথাও এস্থলে আমাদের স্মরণ করা ভাল যে সকলেই প্রমাণকে ত্রিবিধ বা চতুর্ব্বিধ বলিয়াই যে ভাবিয়াছেন তাহা নহে। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় এক, দুই, তিন, চারি, পাঁচ, ছয় প্রভৃতি বহু সংখ্যাতে ইহাকে বিভক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এস্থলে তিন বা চার সংখ্যা লইয়াই সন্দেহ উত্থাপন করা হইয়াছে, কারণ রামানুজমত সাংখ্যমতের ন্যায় ত্রিবিধ প্রমাণ বাদী।

এরূপ আশঙ্কা য খুব স্বাভাবিক তাহা দেখা গেল, কিন্তু কোন্ বিশেষ যুক্তিবশতঃ ইহাকে প্রমাণ মধ্যে গণ্য করা হইতেছে তাহা এইবার দেখা যাউক। কোন একটা জিনাসকে কোন কিছুর অন্তর্গত করিতে হইলে, উভয়ের লক্ষণ বিচার করিয়া তাহা করিতে হয়। সুতরাং দেখা দরকার স্মৃতির লক্ষণ কি এবং প্রমাণেরই বা লক্ষণ কি? যদি প্রমাণের ভিতর স্মৃতির লক্ষণটা আসিয়া পড়ে তাহা হইলে স্মৃতিকে প্রমাণ বলা উচিত। আমরা দেখিয়াছি প্রমাণ বলিতে "যথাবস্থিত-ব্যবহারানুগুণ-জ্ঞান"-জনক বুঝায়। ইহার অর্থ ইতিপূর্ব্বে আমরা বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছি। এক কথায় যাহার দ্বারা ব্যবহারোপযোগী অথচ যথার্থ জ্ঞান জন্মে তাহাই প্রমাণ। এখন স্মৃতির লক্ষণ কি দেখা যাউক। স্মৃতি বলিতে পূর্ব্ব অনুভবের সংস্কার হইতে যে জ্ঞান জন্মে সেই জ্ঞান মাত্র, আর কিছু নহে। এই স্মৃতি জ্ঞান চারি প্রকারে উৎপন্ন হয় যথা;—প্রথম, সদৃশ দর্শন হইতে, দ্বিতীয়, অদৃষ্ট কারণ হইতে বা হঠাৎ, তৃতীয়, চিন্তা করিলে এবং চতুর্থ, সহচর পদার্থের জ্ঞান জন্মিলে। যেমন রাম ও শ্যাম দুইজনের একরকম চেহারা, এমনস্থলে রামকে দেখিলে শ্যামের কথাও মনে পড়ে। আবার কোথাও কিছু নাই হঠাৎ একটা পূর্ব্বদৃষ্ট বিষয়ের কথা মনে উদয় হইল। কখন বা কোন একটা কিছু মনে করিবার জন্য ভাবিয়া চিন্তিয়া মনে করা হয় আবার

কখন বা,যাহারা একসঙ্গে প্রায় থাকে তাহাদের একজনকে দেখিলে অপরের কথা মনে পড়ে। এই চারি প্রকারেই যখন যাহা মনে পড়ে তখন তাহা সেই পূর্ব্বদৃষ্ট বিষয়েরই কথা মনে পড়ে। পূর্ব্বদৃষ্ট বিষয়ের জ্ঞানের সহিতও মনে পড়ার পর যে জ্ঞান হয় সে জ্ঞানের কোন পার্থক্য থাকে না।

এখন এই প্রকার স্মৃতিরূপ জ্ঞান বাস্তবিক পক্ষে পূর্ব্বানুভূত জ্ঞানের মত যথার্থ জ্ঞান ও ব্যবহারোপযোগী বলা যাইতে পারে। কারণ পূর্ব্বানুভবস্থলে তাহা যেমন সত্য, যেমন যথার্থ, এখনও তাহাই, এবং তখন যেমন তাহাকে লইয়া ব্যবহার করা হইয়াছিল, ইচ্ছা হইলে এখনও সেই জ্ঞান লইয়া সেই রকম ব্যবহার করা চলিতে পারে। মনে করুন, যে রকম আগুনে পূর্ব্বে সোণা গলাইয়াছিলাম এখন যদি ঠিক সেই রকম আগুন করা যায় তাহা হইলে এখনও আবার সোনা গলিবে, ইহার কোন অন্যথা হইবে না। সুতরাং পূর্ব্বের আগুণের কথা মনে করিয়া পূর্ব্ববৎ আগুন করায় সোণা গলানরূপ ব্যবহারও সম্পন্ন হইতে পারিল এবং তাহা হইলে স্মৃতিজ্ঞানকে প্রমাণ বলাও চলিতে পারে।

বেশ কথা। স্মৃতি জ্ঞান যদি প্রমাণ হয়, এবং পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট প্রমাণ যদি প্রত্যক্ষ অনুমান ও আগম এই ত্রিবিধ মাত্র হয় তাহা হইলে স্মৃতি নিশ্চয়ই উক্ত তিনটীর কোনটীর মধ্যে আসিয়া পড়িবে। যদি উক্ত তিনটীর মধ্যে না আসিয়া পড়ে তাহা হইলে প্রমাণের সংখ্যা তিনটী না হইয়া চারিটী হইতে বাধ্য। এজন্য দেখা স্মৃতি প্রমাণটী প্রত্যক্ষাদি তিনটী প্রমাণের কোনটীর মধ্যে পড়া উচিত। গ্রন্থকার ইহার মীমাংসা করিয়া বলিতেছেন যে স্মৃতি প্রমাণটী প্রত্যক্ষ প্রমাণের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। কারণ তুমি যাহা দেখিয়াছ, তুমি যাহা অনুভব করিয়াছ, তাহারই কথা ত মনে কর ; আর তাহাকেইত বল স্মৃতি জ্ঞান , সুতরাং স্মৃতির মূল হইতেছে প্রত্যক্ষ। ইহা যদি মূল হইতে পৃথক্ হইত তাহা হইলে অন্য কথা উঠিতে পারিত। কিন্তু ইহা এতৎস্বরূপ প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতে পৃথক্ নহে, সেজন্য ইহাকে প্রত্যক্ষ প্রমাণের মধ্যে গণ্য করাই উচিত। যদি বল স্মৃতিও কখন কখন বিনষ্ট হইয়া যায়, তবে কেন ইহাকে প্রমাণ বলা হইতেছে? সত্য। কিন্তু দেখ দেখি স্মৃতি কেন বিনষ্ট হয়? স্মৃতি বিনাশের কারণ, প্রথম, কালের দীর্ঘতা, দ্বিতীয়, ব্যাধি প্রভৃতি এবং তৃতীয়, অন্য সংস্কার দ্বারা যখন একটা সংস্কার চাপা পড়িয়া যায়। এই সকল কারণে স্মৃতি নষ্ট হয়। এই সকল কারণ যতক্ষণ উপস্থিত না হয় ততক্ষণ

ইহার অভাব ঘটে না। কিন্তু যতক্ষণ ইহার অভাব হয় না ততক্ষণ ইহাতে বিপরীত বা মিথ্যা জ্ঞানও উৎপাদন করে না। যখনই তোমার স্মৃতির অভাব হইবে তুমিই তখন নিজে বলিবে যে তাইত ইহা কি সেই বস্তু? বোধ হয় ইহা আমার ভুল হইয়া গিয়াছে ইত্যাদি। কিন্তু যতক্ষণ তোমার স্মৃতি অবিকৃত থাকে ততক্ষণ তুমি উহাকে নিশ্চয় করিয়াই বলিয়া থাক যে, না আমি ঠিকই বলিতেছি, আমার মনে আছে ইত্যাদি। সুতরাং স্মৃতি নষ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত, ইহা সত্য জ্ঞানের জনক, ইহা মিথ্যা জ্ঞান উৎপাদন করে না, অন্য কথায় ইহাকে প্রমাণ বলাই উচিত।

ইহার পর গ্রন্থকার শ্রীনিবাস দাস একে একে "প্রত্যভিজ্ঞা," "অভাব," "উহ," "সংশয়," ও "প্রাতিভ জ্ঞানকে" পূর্ব্ববৎ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের মধ্যে পরিগণিত করিয়াছেন এবং সকল প্রকার জ্ঞানকেই সত্য বলিয়া প্রমাণ করিতে বসিয়াছেন। প্রত্যক্ষ প্রমাণের প্রসঙ্গে স্মৃতির কথা উত্থাপন করিয়া ঐ সকল প্রকার জ্ঞানের সত্যতা প্রমাণ করিবার চেষ্টা, প্রথমতঃ মনে হয় যেন একটু অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু ভাল করিয়া বিবেচনা করিলে এস্থলে এ প্রসঙ্গের উপযোগিতা বুঝা যাইবে। কারণ প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলিতে প্রত্যক্ষ জ্ঞানই বুঝায়, এবং সেই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের মধ্যে কোন্‌টী প্রমাণ পদবাচ্য হইতে পারে, ইহার আলোচনা করিলেই প্রত্যক্ষ প্রমাণের আলোচনা করা হইবে। অগত্যা প্রত্যক্ষ প্রমাণের কথায় যতপ্রকার প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতে পারে সে সকলের কথা উঠান প্রয়োজন। ইতি পূর্ব্বে (গত মাসে) প্রত্যক্ষ জ্ঞানের যে শ্রেণী বিভাগ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা সকলই প্রমাণপদবাচ্য কিন্তু এক্ষণে যাহা প্রমাণ নহে অথচ প্রত্যক্ষ জ্ঞান নামে অভিহিত হইয়া থাকে, তাহাদের কথাই উত্থাপন করা হইতেছে।

এখন দেখা যাউক "প্রত্যভিজ্ঞা" কাহাকে বলে। পূর্ব্বে যাহাকে দেখিয়াছি এখন যদি তাহাকে দেখিয়া "সেই" বলিয়া চিনিতে পারি, তাহা হইলে যে জ্ঞান হয়, সেই জ্ঞানের নাম প্রত্যভিজ্ঞা। পূর্ব্বে দেবদত্তকে দেখিয়াছিলাম, আজ আবার তাহাকে দেখিয়া চিনিতে পারিলাম, সুতরাং আজ যে দেবদত্তের জ্ঞান হইল ইহাই প্রত্যভিজ্ঞা। এই প্রত্যভিজ্ঞা, ঠিক স্মৃতিও নহে, ঠিক পূর্ণ প্রত্যক্ষও নহে। "এই দেবদত্ত" এই প্রকার জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ বলা যায়, কিন্তু "এই সেই দেবদত্ত" এ জ্ঞানকে কেন প্রত্যক্ষ বলা হইবে? "এই" ও "সেই" এই দুইটী শব্দ হইতে ইহাতে স্মৃতির অংশ ও প্রত্যক্ষের অংশ উভয়ই

বর্ত্তমান বলাই সঙ্গত; এবং তজ্জন্য পূর্ব্বে যেমন স্মৃতির কথা আলোচনা না করিয়া তাহাকে প্রত্যক্ষের মধ্যে ফেলা হইয়াছে, এস্থলে ইহাকেও সেইরূপ প্রত্যক্ষের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। কারণ স্মৃতিই নিজে যখন প্রত্যক্ষের অন্তর্গত এবং প্রত্যভিজ্ঞা যখন স্মৃতি ও প্রত্যক্ষ উভয় বিজড়িত,তখন ইহা প্রত্যক্ষ ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? একদল পণ্ডিত আছেন তাঁহারা স্মৃতি জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ বলিতে চাহেন না, এবং তজ্জন্য প্রত্যভিজ্ঞাকেও প্রত্যক্ষ না বলিয়া ইহাকে উভয় মিশ্র নামে একটা পৃথক্ জ্ঞানের মধ্যে ফেলিতে চাহেন। তাঁহারা বলেন, আমরা স্মৃতিতে মনশ্চক্ষে যাহা দেখি তাহাও একরূপ দেখা, তাহাতেও বিষয় বিষয়ী ভাব অথবা দ্রষ্টা দৃশ্য ভাব বর্ত্তমান থাকে। প্রত্যক্ষ কালে আমরা যেমন বিষয় দেখি, স্মৃতির সময় তদ্রূপ জ্ঞান-পদার্থ-রূপ উপ-করণে গড়া সেই বিষয়টাকে দেখি। প্রত্যক্ষের বিষয় পঞ্চভূত দিয়া গড়া, আর স্মৃতির বিষয় জ্ঞান-বস্তু দ্বারা গড়া, এই মাত্র প্রভেদ। বিষয় দেখা, উভয় স্থলেই সত্য। এ দলের পণ্ডিতগণও একথা প্রমাণের জন্য খুব বদ্ধ-পরিকর। তবে যাঁহারা ইহা মানিতে চাহেন না, তাঁহারা বলেন যে, উহা যখন পূর্ব্বদৃষ্ট বিষয়ের অনুরূপ ও অনুগামী, তখন ইহাকে পূর্ব্বের দর্শনের মধ্যে ফেলাই ভাল। ফলকথা স্মৃতিকে প্রত্যক্ষের মধ্যে ফেলিলেও একটু বিশেষত্ব থাকে। আর এই জন্যই অনেক দার্শনিক পণ্ডিত, প্রমাণের লক্ষণ করিতে বসিয়া স্মৃতিকে ধরিয়া এবং স্মৃতিকে ছাড়িয়া দুই রকম করিয়া প্রমাণের লক্ষণ করিয়াছেন। ইহার দৃষ্টান্ত সর্ব্বজন পরিচিত সেই "বেদান্ত পরিভাষা" গ্রন্থ। যাহা হউক স্মৃতি জ্ঞানের এইটুকু বিশেষত্ব আছে বলি। ইহাকে সাধারণতঃ অলৌকিক প্রত্যক্ষ বলা হয়, এবং উক্ত প্রত্যভিজ্ঞা জ্ঞান তাহা হইলে উক্ত অলৌকিক প্রত্যক্ষ এবং লৌকিক প্রত্যক্ষ এই দুইটীর সংমিশ্রণের ফল।

এইবার বিচার্য্য "অভাব"। রামানুজ মতে অভাব পদার্থটীও প্রত্যক্ষ জ্ঞান। অভাব বলিতে "কিছুই নাই" এরূপ যেন না বুঝা হয়। কারণ, "কিছুই নাই" এটাও কি একটা জ্ঞান নহে? জ্ঞান না হইলে আমরা বলি কি করিয়া? যদি বল, "অভাব" না হয় জ্ঞান হইল, কিন্তু উহা যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান তাহার প্রমাণ কি? উহাকে প্রত্যক্ষ হইতে পৃথক্ জ্ঞান বলাই কি উচিত নহে? কারণ, অভাব ত কেহ কখন দেখে না? ইত্যাদি। রামানুজ সম্প্রদায় এস্থলে বলেন যে, না, উহা প্রত্যক্ষ জ্ঞান। কারণ, "মাটীতে ঘট নাই," এস্থলে যে ঘটের অত্যন্তাভাব স্বীকার করা হয়, তাহার প্রত্যক্ষ হয়, মাটী

দেখিয়া। মাটীতে ঘট না দেখিয়া যখন তুমি কেবল মাটীই দেখ তখনই তুমি ঘটের অত্যন্তাভাব প্রত্যক্ষ কর। আর ঘট ভাঙ্গিয়া গেলে যে প্রকার অভাব হয়, সে প্রকার অভাবও তুমি যে প্রত্যক্ষ কর না, তাহা নহে। সেখানেও তুমি ঘটের কানা ও কুচি দেখিয়া, ঘট নাই বল। কানা কুচি না দেখিলে কি তুমি এই ঘটাভাব বলিতে পারিতে? সুতরাং এখানেও অভাব তোমার প্রত্যক্ষের বিষয়। আর যদি বল ঘট হইবার অগ্রে মাটীর পিণ্ডেতে যে ঘটাভাব স্বীকার হয়, সে অভাব প্রত্যক্ষের বিষয় নহে, তাহাও বলিতে পার না। কারণ, মাটীতে ঘট হইবার পূর্ব্বে যে ঘটাভাব তাহা ত সেই মাটীর পিণ্ডই, অন্য কিছু নহে। এখানেও সেই মাটীর পিণ্ড দেখিয়া ঘটাভাব বুঝিয়া থাক। সুতরাং উক্ত তিনপ্রকার অভাবই তোমার প্রত্যক্ষ হয়। ন্যায় শাস্ত্রে অভাব সম্বন্ধে আরও অনেক কথা আছে। "অভাবই" সে শাস্ত্রমতে চারি প্রকার। অবশ্য গ্রন্থকারও যে তাহা মানেন না তাহা নহে। তবে তিনি অভাবের কথা বলিতে বসিয়া কেবল তিন প্রকার অভাবের কথাই বলিলেন, এক প্রকারের কথা বলিলেন না। ইহার কারণ এই যে, সে প্রকার অভাবের প্রত্যক্ষতা সম্বন্ধে কোন মতভেদ নাই। যে জাতীয় অভাবের কথা গ্রন্থকার তুলেন নাই, তাহাকে ন্যায়ের ভাষায় "অন্যোন্যাভাব" বলে। ইহার অর্থ যেখানে ঘট আছে সেখানে পট নাই, অর্থাৎ এক স্থানে একটা জিনীস থাকিতে গেলে যে আর একটা জিনীসেব সেখানে থাকা চলে না এই ভাবটাকেই এখানে লক্ষ্য করা হইয়াছে, ইহাও একপ্রকার অভাব। এই প্রকার অভাবটী একটী জিনীস দেখিয়া জানা যায় বলিয়া ইহা ত প্রত্যক্ষই হইযা থাকে। এইজন্য গ্রন্থকার এস্থলে একথা আর উত্থাপন করিলেন না। ফল কথা অভাবও প্রত্যক্ষ জ্ঞান।

এইবার বিচার্য্য —"উহ"। এই উহ শব্দে এক প্রকার বিতর্ক বা অনুমান বুঝায়। "এ লোকটা -এইই হবে" এই প্রকার যে জ্ঞান, তাহাকে উহ বলে। ইহা নিশ্চয় জ্ঞান নহে, ইহা সংশয় জ্ঞানও নহে—ইহা উভয় ভিন্ন। গ্রন্থকার ইহাকেও প্রত্যক্ষের মধ্যে পরিগণিত করিলেন। অবশ্য ইহা যে ঠিক পূর্ণ প্রত্যক্ষ জ্ঞানেব সহিত মিলে তাহা নহে, তথাপি ইহাকেও প্রত্যক্ষের মধ্যে ফেলা হইল। কারণ "এ লোকটা এইই হবে" এই প্রকার জ্ঞানের মূল প্রত্যক্ষ ভিন্ন আর কিছু নহে।

সংশয় সম্বন্ধে আমরা গত মাসে আলোচনা করিয়া আসিয়াছি। এ স্থলে

পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। মোট কথা এ জ্ঞানও প্রত্যক্ষের মধ্যে পরিগণিত হয়। কারণ, একটা কিছু দেখিয়া যখন সেটাকে কোন একটা কিছু বলিয়া নিশ্চয় হয় না, তখনই সেই প্রকার মনোভাবের নাম সংশয় বলা হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে উক্ত সংশয় জ্ঞানের মূলও দেখা ক্রিয়া। পূর্ব্বে যেমন "উহ" জ্ঞানকে মূল ধরিয়া তাহাকে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের মধ্যে ফেলা হইল এ স্থলেও সেইরূপ ইহার মূল ধরিয়া ইহাকে প্রত্যক্ষের মধ্যে ফেলা হইল।

এইবার অবশিষ্ট "প্রাতিভজ্ঞান" এই জ্ঞানটী পুণ্যাত্মাদিগের সম্পত্তি, ইহা ইতর সাধারণে দেখা যায় না। যোগী বা সিদ্ধ ব্যক্তি, তাঁহাদের অদ্ভুত প্রতিভাবলে অতীত, অনাগত, দূরস্থ, ব্যবহিত, সকল প্রকার বাধার মধ্য দিয়াও আমাদের মত দেখিতে পান। অবশ্য তাঁহারা যাহা দেখিতে পান, তাহা একেবারে কোন আকারে বা কোন রূপে না থাকিলে যে দেখিতে পান, তাহা নহে। এজন্য তাঁহাদের "দেখাও" আমাদের "দেখার" মত দেখা বলিতে হইবে, ইহা দেখা ছাড়া আর কিছু নহে। সুতরাং এই প্রাতিভজ্ঞানকেও প্রত্যক্ষ জ্ঞানের মধ্যে পরিগণনা করা অসঙ্গত হইতে পারে না।

যাহা হউক জানা গেল যে, কি স্মৃতি, কি প্রত্যভিজ্ঞা, ইহারা "অভাব" "উহ" "সংশয় ও প্রাতিভজ্ঞানের" মত সকলেই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। প্রত্যক্ষ জ্ঞান বলিতে এসকলগুলিকেই বুঝাইতে পারে। প্রত্যক্ষ প্রমাণের সাহায্যে যে জ্ঞান হইবে তাহা এজাতীয়ও হইতে পারে। তবে বিশেষ এই যে, স্মৃতি, প্রত্যভিজ্ঞা, অভাব ও প্রাতিভজ্ঞানগুলি নিশ্চয় জ্ঞান, এবং উহ ও সংশয় —ইহারা অনিশ্চয় জ্ঞান।

গ্রন্থকার উক্ত বিচার স্থলে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের প্রকার ভেদ যতপ্রকার হইতে পারে সকলই দেখাইলেন; কিন্তু ভ্রমজ্ঞানের কথা উল্লেখ করেন নাই। বস্তুতঃ ভ্রমজ্ঞানও ত একপ্রকার জ্ঞান এবং উহাকেও ভ্রমকালে কখন কখন প্রত্যক্ষের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা চলে। কিন্তু এ ভ্রম অনুমানাদির স্থলেও হইতে পারে বলিয়া ইহাকে এস্থলে বিশেষ রূপে উল্লেখ করেন নাই। পূর্ব্বে যখন প্রমাজ্ঞানের কথা বিচার করা হইয়াছে, ইহা, তখনই প্রসঙ্গ ক্রমে কথিত হইয়াছে। কারণ, ভ্রমজ্ঞান, প্রমা বা সত্য জ্ঞানের বিপরীত। এক্ষণে গ্রন্থকার এই ভ্রমজ্ঞান সম্বন্ধে একটী অতি প্রয়োজনীয় বিচারের অবতারণা করিতেছেন। এই বিচারের উপর ইহাদের "মত" সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। এই স্থলটাই, ইহাদের সহিত অদ্বৈতবাদিগণের, একটী প্রধান অনৈক্য

স্থল। সুতরাং এ প্রসঙ্গে যতদূর সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত, তাহা গ্রন্থকার এস্থলে করিতে ত্রুটি করেন নাই। অদ্বৈতবাদিগণ ভ্রমজ্ঞানকে মিথ্যা বলেন, কিন্তু রামানুজমতে তাহাও যথার্থ জ্ঞান। ইহারা অদ্বৈতবাদি-গণের মত অর্থ বা বিষয় শূন্য কোন জ্ঞানই স্বীকার করেন না। সুতরাং গ্রন্থকার এই উপলক্ষে সর্ব্ববিধ জ্ঞানের যথার্থতা প্রমাণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। পরন্তু বিষয়টী অতি জটীল ও দীর্ঘ বলিয়া এ প্রবন্ধে আর সেকথা উত্থাপন করিব না, আগামী মাসে তাহা আলোচনা করিব। এক্ষণে যাহা অবলম্বন করিয়া উপরে এত কথা বলিলাম তাহার "মূল" যথাযথ অনুবাদ করিয়া পাঠকবর্গকে উপহার প্রদান করি।

"যদি বল, যথাবস্থিতব্যবহারানুগুণজ্ঞানকে যখন প্রমা বলা হইয়াছে, তখন স্মৃতিরও সেই লক্ষণ থাকায় তাহাকে প্রমাণ বলা উচিত; এবং তাহা হইলে প্রমাণ ত্রিবিধ একথা কি করিয়া বলা হয়? বলিতেছি শুন;—স্মৃতিকে প্রমাণ বলিয়া অঙ্গীকার করিলেও, তাহার সংস্কার সাপেক্ষতা থাকে বলিয়া, তাহার মূল প্রত্যক্ষ স্বীকার করিতে হইবে। আর তাহা প্রত্যক্ষমূলক বলিয়া তাহাকে প্রত্যক্ষের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করাই উচিত। এজন্য প্রমাণ তিনটীই সিদ্ধ হয়। স্মৃতি বলিতে পূর্ব্বানুভব-জন্য সংস্কার-মাত্র-জন্য জ্ঞান বুঝায়। এই স্মৃতির হেতু উদ্‌বুদ্ধ সংস্কার এবং তাহার উদ্বোধ,—সদৃশজ্ঞান, অদৃষ্ট কারণ এবং চিন্তাদি দ্বারা সাধিত হয়। এক কথায় এগুলিকে স্মৃতির বীজ বলা হয়। সদৃশ জ্ঞান হইতে কখন কখন স্মৃতি হয়, কখন কখন অজ্ঞাত কারণ-বশাৎও স্মৃতি হইতে দেখা যায়। আবার চিন্তাদির দ্বারাও কখন কখন তাহা উৎপন্ন হয়। চিন্তাদি শব্দের আদি পদে সাহচর্য্যকেও গ্রহণ করিতে হইবে। সদৃশজ্ঞান হইতে যে স্মৃতি উৎপন্ন হয় তাহার দৃষ্টান্ত এই;—দেবদত্ত ও যজ্ঞদত্ত একপ্রকার আকৃতি বিশিষ্ট। এজন্য দেবদত্তকে দেখিলে কখন কখন যজ্ঞ-দত্তের স্মৃতি উদয় হয়। অতঃপর দ্বিতীয় প্রকারের দৃষ্টান্ত কিরূপ দেখা যাউক। কোন কালে কেহ শ্রীরঙ্গম প্রভৃতি দিব্য দেশ দেখিয়াছে, এখন হঠাৎ তাহার সেই কথা মনে উদয় হইল, ইহার কোন কারণ বুঝা যায় না, কিন্তু হঠাৎ এরূপ স্মৃতি হয়। তৃতীয় প্রকারের দৃষ্টান্ত;—চিন্তা করিয়া লোকে শ্রীবেঙ্কটেশের কমনীয়, দিব্য, মঙ্গল, বিগ্রহের স্মরণ করিতে পারে, সুতরাং চিন্তাও স্মৃতির হেতু। শেষ বা চতুর্থ প্রকারের দৃষ্টান্ত;—সহচর দেবদত্ত বা যজ্ঞদত্তের একজনকে দেখিয়া অপরকে মনে পড়ে। স্মৃতিবিষয়মাত্রেই

সম্যক্‌রূপে পূর্ব্বের অনুভূত বিষয় হওয়া চাই। কখন কখন কালের দীর্ঘতা ও ব্যাধি বশতঃ অথবা সংস্কার বিশেষ দ্বারা প্রমৃষ্ট হইয়া স্মৃতির অভাব সংঘটিত হয়। স্মৃতি যেমন প্রত্যক্ষের অন্তর্ভুক্ত হইল, তদ্রূপ "এই সেই দেবদত্ত" এই প্রত্যভিজ্ঞাটীও প্রত্যক্ষের অন্তর্ভুক্ত হয়। আমাদিগের মতে অভাবও একপ্রকার ভাবান্তর রূপ বলিয়া অভাব জ্ঞানও প্রত্যক্ষের মধ্যে পরিগণিত করা হয়। ভূতলে যে ঘটের অত্যন্তাভাব তাহা ভূতলই; ঘটের যাহা প্রাগ্‌ভাব তাহা মাটীই; ঘট-ধ্বংস ভাবই প্রধ্বংসাভাব লোকে এক জনকে দেখিয়া যে মনে করে—"এ ব্যক্তি নিশ্চয়ই সেই ব্যক্তি হইবে" সেই জ্ঞানকে উহ বলা হয়। সম্মুখে অবস্থিত বৃক্ষটী কি বৃক্ষ এই প্রকার যে জ্ঞান, তাহাকে সংশয় বলা হয়। এই দুই প্রকার জ্ঞানই প্রত্যক্ষের অন্তর্ভুক্ত। পুণ্যাত্মাগণের যে প্রতিভা তাহাও প্রত্যক্ষের মধ্যে গণ্য করা হয়। কারণ বেদান্তজ্ঞগণ বলিয়া থাকেন যে, সকল বিজ্ঞানই যথার্থ।

এই মূল অবলম্বন করিয়া উপরের কথা গুলি লিখিয়াছি। উপরের সমস্ত কথা গুলিই ইহার ভিতরই আছে. কিন্তু প্রাচীন রীতিতে লিখিত বলিয়া, কেবল এই মূল পড়িয়াও সব কথা বুঝা যায় না। আবার আচার্য্যের নিকট পডিবার সুযোগ করিতে পারিলে এই টুকু মূল হইতে এত কথা শিক্ষা হইয়া থাকে যে তাহা, উপরে যাহা লিখিযাছি তাহারও চতুর্গুণ হয়। যাহা হউক উপরে যাহা লিখিত হইল যদি তাহার মধ্যে ত্রুটি হইয়া থাকে তাহা, এই মূল দ্বারা সংশোধিত হইবার সম্ভাবনা আছে। আগামী বারে রামানুজ-মতে, ভ্রম হইতে আরম্ভ করিয়া সকল জ্ঞানই যে যথার্থ, তাহাই আলোচনা করিব।

মণ্ডন-পরাজয়।

[শ্রীমতী—]

নর্ম্মদার উত্তর দিকে শস্যশ্যামল বিস্তীর্ণ ভূভাগমধ্যে পুণ্যতীর্থ মাহিষ্মতী-নগরী অবস্থিত। নগরীর পাদদেশ বিধৌত করিয়া পূত সলিলা প্রশস্তদেহা নর্ম্মদাদেবী সরল রেখায় তরতর বেগে প্রবাহিতা। এই মাহিষ্মতি নগরী দ্বিধা বিভক্ত করতঃ ক্ষুদ্র মাহিষ্মতী নদী নর্ম্মদা সহিত সম্মিলিতা হইয়াছে।

সঙ্গমস্থলে ইহার উভয় তীরে দুইটী অতি সুন্দর দেবমন্দির। অনতিদূরে শিলাময় দ্বীপ মধ্যে অভ্রভেদী মন্দির চূড়া, নর্ম্মদাবক্ষে শোভমান্। নগরীর সীমা অতিক্রম করিয়া নর্ম্মদা দর্শকের মনোমুগ্ধকর সুন্দর জলপ্রপাতরূপে পরিণত হইয়াছে এবং নীলাকাশে মেঘমালার ন্যায় সুদূরস্থিত পর্ব্বতশ্রেণী ভেদ করিয়া অনন্তের অভিমুখে যেন ছুটিয়াছে।

মাহিষ্মতী নগরী মধ্যে নানাস্থানে নানা দেবমন্দির, মন্দির গাত্র নানা কারুকার্য্য খচিত ; এবং চূড়া সমূহ বিচিত্র পতাকা শোভিত। চারিদিকে সুদৃশ্য মনোহর অট্টালিকা, সুরভিত পুষ্প কানন, সুরসালবৃক্ষপূর্ণ রমণীয় উদ্যান ; সুসজ্জিত অসংখ্য বিপনীশ্রেণী, প্রশস্ত রাজপথ, নগরীর উপকণ্ঠে হরিদ্বর্ণ ধান্যক্ষেত্র, কৃষকসমূহের সুপরিচ্ছন্ন মৃৎকুটীর নগরীকে যেন একটী চিত্রপট করিয়া রাখিয়াছে।

একদিন প্রাতঃকালে নর্ম্মদাতীরে তেজঃপুঞ্জ কলেবর এক সন্ন্যাসী গমন করিতেছেন। সন্ন্যাসীর অপরূপ রূপ, প্রসন্নবদন, সৌম্যগঠন, তপ্ত-কাঞ্চন বর্ণ, আয়তনেত্র, উন্নত নাসিকা, প্রশস্ত ললাট, দীর্ঘদেহ, মুখচন্দ্র অপূর্ব্ব জ্যোতিতে জ্যোতির্ম্ময়, বদনে দৃঢপ্রতিজ্ঞের চিহ্ন, ধীর গম্ভীর পদবিক্ষেপ দেখিয়া তাঁহাকে সামান্য মানব জ্ঞান হয় না। সন্ন্যাসীর মুণ্ডিত মস্তক, পরিধানে গৈরিক কৌপীন, অঙ্গে গৈরিক বহির্ব্বাস, ললাটে ত্রিপুণ্ড্র চিহ্ন, গলদেশে রুদ্রাক্ষ মালা, সুকুমার দেহ বিভূতি ভূষিত, বামহস্তে কমণ্ডলু, দক্ষিণ হস্তে দণ্ড। বয়ঃক্রম অষ্টাদশ বর্ষ মাত্র। সন্ন্যাসীকে দেখিলেই হৃদয়ে মহান্ ভাবের উদয় হয়, মস্তক যেন আপনা হইতেই সন্ন্যাসীচরণে অবনত হয়।

সন্ন্যাসীর পশ্চাতে কতিপয় সাধু। ইঁহাদেরও গৈরিক বাস প্রশান্ত বদন হস্তে দণ্ড কমণ্ডলু, দেখিলেই মনে হয় ইঁহারা উক্ত সন্ন্যাসীর শিষ্য সেবক।

প্রাতঃকালীন স্নানার্থ নর্ম্মদায় এক্ষণে অসংখ্য জনসমাগম হইয়াছে। নগরবাসীগণ সকলেই বিস্মিত হইয়া এই নবীন সন্ন্যাসীর প্রতি নির্নিমেষ নেত্রে চাহিয়া আছেন। কেহ ভাবিতেছেন—সাক্ষাৎ কৈলাসনাথ কি আজি কৈলাস পরিত্যাগ করিয়া নরবেশে নর্ম্মদা তীরে আবির্ভূত? কেহ কেহ বা ভক্তি ভাবে উদ্দেশে সন্ন্যাসী চরণে প্রণত, কেহ বা তাঁহার পশ্চাদগামী হইলেন।

বয়স্থা রমণীগণমধ্যে এই নবীন সন্ন্যাসী দেখিয়া যেন বাৎসল্য স্নেহ

উথলিত হইল, তাঁহারা পরস্পরে বলাবলি করিতে লাগিলেন—"আহা কার এই সুকুমার কুমার? বাছা কি দুঃখে এই নবীন বয়সে সন্ন্যাসী সাজিয়াছে! *কোন পাষাণী পাষাণপ্রাণে এমন সোনার বাছাকে বিদায় দিয়াছে!"* কোন বালিকা নদীতীরে মৃন্ময় শিবমূর্ত্তি গড়িয়া শিবপূজায় রত ছিল, সে এক্ষণে এই শিবতুল্য সন্ন্যাসী সম্মুখে দেখিয়া ভক্তিগদগদ চিত্তে তাঁহার উদ্দেশ্যে প্রণিপাত করিল। কাহারও বা বহুদিন গত নিরুদ্দিষ্ট পুত্রকে সহসা মনে পড়িল, তিনি যেন ছল ছল নেত্রে চক্ষু ফিরাইলেন। কোন পুত্রবিয়োগ বিধুরা জননী আজি এই বালক সন্ন্যাসী দেখিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস সহকারে দুই ফোঁটা অশ্রুজল বসনাঞ্চলে মুছিলেন। কেহ কেহ বা বিস্মিত নেত্রে সন্ন্যাসী পানে চাহিয়া রহিলেন।

সন্ন্যাসীর কিন্তু কোন দিকে দৃষ্টি নাই, কোন চাঞ্চল্য নাই, তিনি ধীর গম্ভীর ভাবে চলিয়াছেন; তাঁহার অপূর্ব্ব প্রতিভাসম্পন্ন প্রশান্ত বদন প্রতি চাহিলে মনে হয় তাঁহার হৃদয় যেন এ জগৎ ছাড়িয়া কোন্ অনন্ত রাজ্যে বিচরণ করিতেছে।

ক্রমে তিনি নগর মধ্যস্থ দেবমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। ইত্যবসরে এক ব্রাহ্মণ মণ্ডণ-মিশ্রের গৃহে এই সন্ন্যাসীর সংবাদ প্রদান করিতে চলিলেন। সন্ন্যাসীগণ পূজা অর্চ্চনা করুন। আমরা ততক্ষণ এই মণ্ডন মিশ্রের সহিত পরিচিত হইয়া আসি।

নর্ম্মদা ও মাহিষ্মতীর সঙ্গমস্থলে মাহিষ্মতা তীরে কতিপয় কদম্ববৃক্ষ মূলে মণ্ডনমিশ্রের বাস ভবন। তিনি মাহিষ্মতী নগরীর মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ যাজ্ঞিক ও নগরবাসীর গৌরব। তাঁহার উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, হৃষ্ট পুষ্ট গঠন, সুস্থ সবল সুকোমল দেহ, সরল নাসিকা, মধ্যম ললাট, তাহাতে চন্দনরেখা চক্ষু দুইটী একটু গোলাকার কিন্তু অতি তীক্ষ্ণ ও উজ্জ্বল, মস্তকটী সুগোল, মধ্যস্থলে দীর্ঘ শিখা তাহাতে একটী সচন্দন পুষ্প, গলদেশে যজ্ঞোপবীত। তাঁহাকে দেখিলেই মনে ভয় ভক্তি দুই ভাবেরই যুগপৎ উদয় হয়। তিনি অত্যন্ত বিচারচতুর ছিলেন। তাঁহার বয়ঃক্রম ত্রিংশবর্ষ হইবে। তিনি নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ। বেদবিহিত যজ্ঞকর্ম্মে সদা নিরত। তর্ক শাস্ত্রে নিপুণ। তাঁহার গৃহে নিত্য যাগ যজ্ঞ, পূজা পাঠ, বার ব্রত, ব্রাহ্মণ ভোজন, সদাব্রত অতিথিসেবা, দীনদুঃখী অতিথির তাঁহার গৃহে অবারিত দ্বার। এ কারণ তিনি সমগ্র নগরবাসীর পূজ্য ছিলেন। সকলেই তাঁহার বিশেষ অনুরক্ত। সর্ব্বোপরি মিশ্র-

পত্নী উভয়-ভারতীর ধনী নির্ধনে সমভাবে অযাচিত করুণারাশি নগরের তাবৎ লোককে মুগ্ধ করিয়াছিল।

মিশ্র মহাশয়ের মানসম্ভ্রমও যথেষ্ট ছিল। যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণের উপযোগী ধনেরও তাঁহার অভাব ছিল না। তাঁহার কতকগুলি ছাত্র ছিল, তিনি তাহাদের অধ্যাপনা করিতেন।

তাঁহার বাটী খানিও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সম্মুখে কিছু ফুলের বাগান, তৎপশ্চাৎ আটচালা, তথায় ছাত্রগণ পাঠ অভ্যাস করিত ও মিশ্রমহাশয় উপবেশন করিতেন। তাহার পর বৃহৎ প্রাঙ্গন ও দরদালান এই খানেই যাগযজ্ঞাদি হইয়া থাকে। পশ্চাতে অন্দরমহল, তথায়ও একটু বাগান আছে, তাহাতে নানারকম ফলের গাছ ও মিশ্রঠাকুরাণীর স্বহস্তে রোপিত লাউ কুমড়া শিম বেগুণ ইত্যাদি কতকগুলি গাছ। একপার্শ্বে কয়েকটী ধানের গোলা ও মরাই বাঁধা। তাঁহার বাটীখানি দেখিলেই নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণের গৃহ বলিয়া বোধ হয়।

এক কথায় মিশ্রমহাশয়ের গৃহখানি ধন ধান্যে পরিপূর্ণ, স্বয়ং লক্ষ্মী যেন বিরাজিতা। তাঁহার স্ত্রী অসামান্য রূপযৌবন সম্পন্না ছিলেন। তিনি গৃহ খানি আলো করিয়া থাকিতেন। তাঁহার চিত্রকলা ও অঙ্কশাস্ত্রে পারদর্শীতার কথা মাহিষ্মতীবাসী কাহারও অবিদিত ছিল না। সকলে বলিত মিশ্রগৃহিণী যেন রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী। এহেন মিশ্রদম্পতি নিঃসন্তান ছিলেন। কিন্তু সেজন্য তাঁহারা কেহই দুঃখিত ছিলেন না। মিশ্রঠাকুর কর্ম্মকাণ্ড ও তর্ক শাস্ত্র লইয়াই মহা সুখী, ঠাকুরাণীও চিত্রকলা লইয়াই সন্তুষ্টা ছিলেন।

মিশ্রগৃহিণীর আর একটী বড় সখের জিনীস ছিল। উহা কতকগুলি সুকণ্ঠ পক্ষী। তাঁহার দরদালানে অনেকগুলি পক্ষীর খাঁচা ও দাঁড় ঝুলিত। অনেক রকম সুন্দর সুন্দর পক্ষী তাহাতে থাকিত। পক্ষীগুলিকে তিনি স্বহস্তে পালন করিতেন ও তাহাদিগকে নিত্য বেদগান শিক্ষা দিতেন। ঠাকুরাণীর অসীম গুণপনায় প্রভাত হইলেই পক্ষীগণ সমস্বরে সুমিষ্ট বেদগান করিত।

পক্ষী জাতির এই অদ্ভুত কলাবিদ্যা নগরের সকলেই জানিত, এজন্য মিশ্রমহাশয়ের বাটীপরিচয়ের আর অন্য কোন নিদর্শন প্রয়োজন হইত না।

অদ্য মিশ্র মহাশয়ের পিতৃ শ্রাদ্ধ। বিস্তৃত দর দালানে শ্রাদ্ধের আয়োজন

প্রস্তুত। মিশ্র মহাশয় গরদের জোড় পরিয়া খড়ম পায়ে দিয়া তথায় পাইচারি করিতেছেন। পুরোহিত আসিলেই শ্রাদ্ধ কর্ম্ম আরম্ভ হইবে।

এমন সময় পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণ শশব্যস্তে মিশ্র মহাশয়ের নিকট আসিলেন. ব্রাহ্মণ স্নান করিয়া গৃহে ফিরিতেছেন. তাঁহার পরণে ভিজা কাপড়, কাঁধে ভিজা গামছা, গলায় পৈতা, কপালে চন্দনের ফোঁটা,মাথায় একটী লম্বা টিকী, তাহাতে একটী চন্দন মাখান ফুল গোঁজা, তাঁহার হাতে কোশাকুশী। মিশ্র মহাশয় ব্রাহ্মণকে দেখিয়া প্রণাম করিলেন।

ব্রা। মিশ্র মহাশয় একটা কথা শুনিযাছেন ?

ম। কি কথা মহাশয় ?

ব্রা। সে কি ? আপনি এখনও কিছু শুনেন নাই নাকি ?

ম। না মহাশয়! আমি ত নূতন কথা কিছু শুনি নাই।

ব্রা। কি আশ্চর্য্য! তবে শুনুন, শঙ্করাচার্য্য নামে এক সন্ন্যাসী আপনার সহিত বিচার করিতে নগরে আসিয়াছেন।

ম। সত্য নাকি ? কোথায় শুনিলেন ?

ব্রা। মহাশয়! নগর শুদ্ধ সকলেই এই কথা বল্‌ছে, সন্ন্যাসী এখন নগরের প্রধান শিবমন্দিরে গিয়াছেন। আমি সেখান থেকেই বিশেষ খবর আনিলাম।

ম। তার পর ?

ব্রা। তিনি নাকি প্রথমে প্রয়াগে কুমারিল ভট্টকে পরাজয় করিতে গিয়াছিলেন, কুমারিল কিন্তু তাঁকে আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন।

ম। বটে! বাঁচা গেল! অনেকদিন আর বড় বিচার হয নাই। সেই যে কুমারিল ভট্টের সহিত দিগ্বিজয় গমন করি, তারপর হতে আর তেমন লোক পাই নাই যে বিচার করি। এখন তবে কিছুদিন বিচার চলবে। তবে কি জানেন, এরা সব ভ্রষ্ট, এদের বুদ্ধি শুদ্ধি বড় কম।

ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন।

ব্রাহ্মণ বিদায় হইলে মণ্ডন ভাবিলেন, শঙ্করাচার্য্য আমার নিকটে বিচারে আসিয়াছে। হযত অদ্যই আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিবে। কিন্তু অদ্য আমার পিতৃশ্রাদ্ধ। শ্রাদ্ধে মুণ্ডীদর্শন নিষিদ্ধ। অতএব অদ্য কোন মতেই সাক্ষাৎ করা হইবেনা।

এই ভাবিয়া মণ্ডন ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন "দেখ, অদ্য বহির্দ্বার রুদ্ধ রাখ, কোনও সন্ন্যাসীকে প্রবেশ করিতে দিও না"।

ভৃত্য প্রভুর আদেশে যারপর নাই বিস্মিত হইল, কারণ তাহার প্রভুর গৃহে অতিথি সন্ন্যাসীর অবারিত দ্বার, অদ্য এরূপ আদেশ কেন তাহা ভাবিয়া পাইল না।

যাহা হউক সে তৎক্ষণাৎ তাঁহার আদেশ পালন করিল।

অনন্তর মিশ্র মহাশয় অন্তঃপুরে গিয়া গৃহিণীকে এই সংবাদ দিলেন। মিশ্রগৃহিণী শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন। মিশ্রঠাকুর বলিলেন "তুমি হাসিলে যে?" প্রত্যুত্তরে ঠাকুরাণী আবার হাসিলেন। মিশ্রমহাশয় কিছু অপ্রস্তুত হইলেন, কারণ তাঁহার এ সরস্বতী ঠাকুরাণীকে তিনি সব সময় বুঝিতে পারিতেন না। এমন সময় ভৃত্য আসিয়া পুরোহিতের আগমন সংবাদ জানাইল। মিশ্রমহাশয়ও ব্যস্তভাবে বহির্বাটীতে গমন করিলেন।

এদিকে সন্ন্যাসিগণ মন্দির হইতে বহির্গত হইয়া দ্বিপ্রহর কালে একে একে মণ্ডনের গৃহসন্নিকটে আসিলেন। আচার্য্য কিছুদূরে দণ্ডায়মান রহিলেন। শিষ্যগণ গৃহদ্বারে আসিয়া দেখেন দ্বার রুদ্ধ। দ্বারের উপর একজন ভৃত্য চক্ষু বুজিয়া বসিয়া আছে।

মণ্ডনের ভৃত্য প্রভুর আদেশে দ্বাররুদ্ধ করিয়া তথায় বসিয়াছিল। কিছুক্ষণ বসিয়া বসিয়া তাহার একটু তন্দ্রাবোধ হইয়াছিল। এক্ষণে নিকটে পদ শব্দ শুনিয়া সহসা সে চক্ষু চাহিল, তাহাকে চক্ষু চাহিতে দেখিয়া জনৈক শিষ্য কহিলেন "বৎস, বলিতে পার ইহাই কি মণ্ডন মিশ্রের গৃহ?"

ভৃত্য তখন উঠিয়া সন্ন্যাসী চরণে প্রণাম করিল এবং কহিল "আজ্ঞে হ্যাঁ, ইহাই আমার প্রভুর গৃহ"।

শি। তোমার প্রভুকে সংবাদ দাও, আমাদের আচার্য্য জগদ্গুরু শঙ্করাচার্য্য আসিয়াছেন।

ভৃ। মহাশয়! অদ্য তাঁহার সহিত আপনাদের সাক্ষাৎ হইবে না।

শি। কি কারণে অদ্য সাক্ষাৎ হইবে না তুমি বলিতে পার?

ভৃ। মহাশয়! অদ্য তিনি সন্ন্যাসী দর্শন করিবেন না, কারণ অদ্য তাঁহার পিতৃশ্রাদ্ধ। তাঁহার আদেশ, অদ্য যেন কোন সন্ন্যাসীকে গৃহে প্রবেশ করিতে দেওয়া না হয়।

শিষ্যগণ আচার্য্যকে সবিশেষ জানাইলেন। একজন কহিলেন "ভগবন্, অদ্য ফিরিয়া চলুন, মণ্ডন কোনমতেই অদ্য সাক্ষাৎ করিবেন না।

আচার্য্য গম্ভীর স্বরে কহিলেন "বৎস, অধীর হইও না। তোমরা মন্দিরে গমন কর, আমি অদ্যই মণ্ডনের সহিত সাক্ষাৎ করিব"।

অতঃপর আচার্য্য যোগবলে আকাশমার্গ অবলম্বন করিয়া একেবারে প্রাঙ্গণ মধ্যে আসিলেন।

দরদালানে মণ্ডন ও তাঁহার পুরোহিতদ্বয় শ্রাদ্ধকর্ম্মে নিবিষ্ট ছিলেন। সহসা প্রাঙ্গণ মধ্যে এক জ্যোতির্ম্ময় মুণ্ডিতমস্তক সন্ন্যাসীমূর্ত্তি দেখিয়া তিন-জনেই যুগপৎ ভয় ও বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন।

সে ভাব কতকটা অন্তর্হিত হইলে মণ্ডন ক্রোধে চীৎকার করিয়া বলিলেন—কোথা হইতে মুণ্ডী (মুণ্ডিত মস্তক) ?

আ। গলদেশ হইতে।

ম। কে তোকে এখানে আসিতে দিল ?

আ। আমি নিজেই এখানে আসিযাছি।

ম। তুই নিশ্চয় চোর, নচেৎ চোরের ন্যায় পরগৃহে প্রবেশ করিযাছিস্ কেন ?

আ। মহাশয়! চোর আমি না আপনি ? কারণ গৃহস্থের অন্নে সন্ন্যাসীর অংশ আছে। আপনি সন্ন্যাসীকে বঞ্চিত করিয়া তাহা গোপনে ভোগ করিতেছেন। অতএব বলুন দেখি, চোর কাহাকে বলা যাইতে পারে ?

ম। দেখিতেছি তোর যজ্ঞোপবীত ও শিখাধারণ ভার বোধ হইযাছে, কিন্তু কন্থাভার বহন করিস্ ত ?

আ। আপনারও বেদবিহিত নিবৃত্তিমার্গ ভার বোধ হইযাছে, তাই নারীসেবার জন্য গৃহস্থ সাজিয়াছেন।

এইরূপে মণ্ডনের কটূক্তি আচার্য্য পরিহাসোক্তিতে পরিশোধ করিলেন।

অনন্তর মণ্ডনের পুরোহিতদ্বয় কহিলেন "বৎস মণ্ডন, অদ্য তোমার পিতৃ-শ্রাদ্ধ। অদ্য তোমার ক্রোধ করা উচিত নহে, তুমি ক্রোধ সম্বরণ কর। একে তুমি অতিথিপ্রিয়, তাহাতে গৃহাগত সন্ন্যাসী অতিথি, তুমি অতিথির অব-মাননা করিও না। আর ইঁহাকে ত বেদ বহির্ভূত বৌদ্ধসন্ন্যাসী বলিযা বোধ হয় না। তুমি শীঘ্র পাদ্যঅর্ঘ দানে অতিথির সৎকার কর।"

পুরোহিতগণের বাক্য শুনিয়া মণ্ডন কৃতাঞ্জলিসহ কহিলেন "ভগবন্, আপনাদের আদেশ আমার শিরোধার্য্য।"

এই বলিয়া তিনি পাদ্যঅর্ঘ্য লইয়া আচার্য্যকে কহিলেন "আপনি যাহাই

হউন এবং যেরূপেই এখানে আগমন করুন না কেন, আমার পূজনীয়, কারণ অতিথি নারায়ণ তুল্য। আপনি পাদ্য অর্ঘ্য গ্রহণ করুন ও ক্ষণেক অপেক্ষা করুন, আমি শ্রাদ্ধ সমাপনান্তে আপনাকে ভিক্ষা প্রদান করিব।

আ। মহাশয়! আমি আপনার সহিত বাদ বিচার দ্বারা সত্য সংস্থাপন করিব, ইহাই আমার ভিক্ষা। অন্য ভিক্ষা আমি গ্রহণ করিব না।

ম। মহাত্মন্। বাদে আমার পরম আনন্দ। যে যাহা খণ্ডন করে আমি তাঁহার সে যুক্তিও আবার খণ্ডন করিয়া থাকি, এ জন্যই আমার নাম মণ্ডন।

আ। মহাশয়! এই সর্ত্তে কিন্তু আপনার সহিত আমি বিচারে প্রবৃত্ত হইব যে, আমাদের মধ্যে যিনি বাদে পরাজিত হইবেন তাঁহাকে নিজ মত ও আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া বিজয়ীর মত ও আশ্রম অবলম্বন করিতে হইবে। আপনি ইহাতে সম্মত?

ম। ভগবন্, আমি ইহাতেই সম্মত। কেন না আপনার ন্যায় যুবককে গৃহস্থাশ্রম গ্রহণ করাইতে পারিলে আমি অতুল আনন্দ লাভ করিব।

আ। মহাশয়! আমিও ঐরূপ উদ্দেশ্যেই আপনাকে বাদযুদ্ধে আহ্বান করিতেছি। কারণ আপনার ন্যায় যাজ্ঞিক কর্ম্মী চতুর্থ আশ্রম গ্রহণ করিলে জগতের মহা উপকার সাধিত হইবে।

ম। এক্ষণে আমাদের বাদে মধ্যস্থ হইবার জন্য কাহাকেও স্থির করুন।

আ। আপনার সহধর্ম্মিনী উভয়ভারতীই আমাদের মধ্যস্থা হইবেন।

ম। (সবিস্ময়ে) আপনি আমার সহধর্ম্মিনীর পরিচয় কিরূপে প্রাপ্ত হইলেন?

আ। আপনার বিদুষী পত্নীর প্রতিভা দেশ বিখ্যাত।

অনন্তর পরদিন প্রভাতে বাদের দিন স্থির হইল। আচার্য্যও ধীরে ধীরে মন্দিরে প্রস্থান করিলেন।

পুরোহিতদ্বয় পরস্পর বলিতে লাগিলেন "ইনিই শঙ্করাচার্য্য! এতদিন যাঁহার কথাই শুনিতাম আজ স্বচক্ষে তাঁহাকে দেখিলাম! কি সুন্দর তেজো-দীপ্ত মুখমণ্ডল, কি নির্ভীক ভাব, কি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বদন! অষ্টাদশ বর্ষীয় যুবক কিন্তু অদ্ভুত শক্তিমান্ বলিয়া মনে হয়। বাদে কে জয়ী হইবে তাহা বলা সুকঠিন।"

দেখিতে দেখিতে এই সংবাদ নগর মধ্যে প্রচারিত হইল। মণ্ডন মিশ্রের

সহিত বিচার বড় সহজ কথা নয়। এক যুবক সন্ন্যাসীর এত সাহস, সকলেই আশ্চর্য্য হইলেন। কেহ কেহ আবার সন্ন্যাসীর এতটা স্পর্দ্ধা অসহ্য বোধ করিলেন।

পরদিন প্রভাত হইতে না হইতে মণ্ডনের গৃহদ্বারে লোক সমাগম হইতে লাগিল।

মণ্ডনের গৃহদ্বার পত্র পুষ্পে সজ্জিত। প্রাঙ্গণতল সুবিস্তৃত শতরঞ্চ দ্বারা মণ্ডিত, উপরে চন্দ্রাতপ, এক পার্শ্বে একটী বেদী, তদুপরি তিন খানি বহুমূল্য কম্বলাসন বিস্তীর্ণ, চতুর্দ্দিকে পণ্ডিতগণের আসন শ্রেণীবদ্ধভাবে রক্ষিত। নিম্নে সাধারণ ব্যক্তিগণের উপবেশন স্থান। দরদালানে রমণীগণের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

যথা সময়ে একে একে পণ্ডিতগণ আসিয়া নিজ নিজ আসন গ্রহণ করিলে, ক্রমে অপরাপর সকলে উপবিষ্ট হইলেন।

অতঃপর মণ্ডন ও আচার্য্য বেদীর উপর আসনে বসিলেন তখন উভয়-ভারতী ঠাকুরাণী দুই গাছি ফুলের মালা হস্তে সভামধ্যে দেখা দিলেন।

তিনি সভাস্থ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে প্রণাম করিয়া কহিলেন "মহাশয়গণ, এই দুই জন তার্কিকের বাদবিচারে আমি মধ্যস্থা হইয়াছি, কিন্তু আমি রমণী, আমাকে সর্ব্বদা গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিতে হইবে, সুতরাং এই সভা মধ্যে বসিয়া ইঁহাদের তর্ক শুনিবার অবসর আমার অল্পই হইবে, এ জন্য আমি এই দুই গাছি ফুলের মালা ইঁহাদের দুইজনের গলদেশে পরাইয়া দিতেছি আপনারা দেখিবেন যাঁহার গলার মালা শুষ্ক হইবে তাঁহারই নিশ্চিত পরাজয় বুঝিবেন। এক্ষণে আপনারা অনুমতি করুন আমি অন্তঃপুরে গমন করি।

সাক্ষাৎ সরস্বতী তুল্য উভয়ভারতীর বাক্য শুনিয়া সভাস্থ সকলেই সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকে অন্তঃপুর গমনে অনুমতি দিলে তিনি ধীরে ধীরে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

এক্ষণে সমবেত লোক সমূহ আচার্য্যকে বিশেষভাবে দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন এক দিকে গৈরিক পরিহিত প্রসন্ন নয়ন, প্রশান্ত বদন, স্থির ধীর গম্ভীর অষ্টাদশ বর্ষীয় যুবক সন্ন্যাসী শঙ্কর; অপর দিকে কৌষেয় বসন পরিহিত, গম্ভীর বদন, তীক্ষ্ণ নয়ন, পাণ্ডিত্যাভিমানী সুচতুর, কর্ম্মীশ্রেষ্ঠ গৃহী ত্রিংশবর্ষীয় মণ্ডন মিশ্র।

এইবার বিচার আরম্ভ হইল। একজন বলেন কর্ম্মেই মুক্তি, অপরে বলেন জ্ঞানেই মুক্তি, উহা নিরূপণ করাই বিচারের বিষয়।

একাদিক্রমে সপ্তদশ দিন মণ্ডন সহ আচার্য্য শঙ্করের বিচার হইল। সভাস্থ ব্যক্তিগণ প্রতিদিন দেখিতেছেন মণ্ডনের গলদেশের মালা ম্লান হইতেছে কিন্তু আচার্য্যের মালা সমভাবেই অম্লান রহিয়াছে। আচার্য্যের যুক্তির ছিদ্র খুঁজিয়া পাইতেছেন না বলিয়া মণ্ডনের বদন কখন কখন রক্তবর্ণ ও তাঁহার নয়নে চাঞ্চল্য প্রকাশ পাইতেছে কিন্তু আচার্য্যের সেই পূর্ব্ববৎ ভাব, সে দিব্য মূর্ত্তিতে কোনই বিকার নাই। ক্রমে উপস্থিত সকলেই মণ্ডনের পরাজয় আশঙ্কা করিতে লাগিলেন। ভাবতীঠাকুরাণী মধ্যে মধ্যে আসিয়া বাদ শ্রবণ করিয়া থাকেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কাহারও নিকট নিজ মতামত প্রকাশ করেন নাই। এজন্য তাঁহার মনোগত ভাব স্ত্রীলোকগণেরও কেহ বুঝিতে পারেন নাই।

প্রত্যহ বিচার শেষ হইলে সকলেই আপন আপন গৃহে গিয়া ঐ আলোচনাই করিয়া থাকেন। প্রতিগৃহে এখন আর অন্য কথা নাই। মণ্ডনের জয় পরাজয় সকলেই যেন নিজের বলিয়া ভাবিতেছেন। সকলেই উদ্বিগ্ন।

আজি অষ্টাদশ দিন। আজি বিচার শেষ হইবে। আজি মণ্ডন অথবা আচার্য্য একজন বিজয়মাল্য ধারণ করিবেন। মণ্ডনের গৃহপ্রাঙ্গণে আজি আর লোক ধরিতেছে না। পণ্ডিতগণ সকলের পূর্ব্বেই আসিয়াছেন। সকলেই মহা উদ্বিগ্ন। সকলের হৃদয়ে আজ যুগপৎ আশা ও নৈরাশ্য দেখা দিতেছে।

যথারীতি বিচার বসিল। অদ্য উভয় ভারতী সভা মধ্যে আসীনা। তাঁহাকে দেখিয়া সভাস্থ ব্যক্তিগণের হৃদয়ে নূতন আশার সঞ্চার হইতেছে। মণ্ডনও নব উৎসাহে উৎসাহিত হইলেন।

কিয়ৎক্ষণ বিচারের পর ক্রমেই মণ্ডনের উদ্বেগ প্রকাশ পাইতে লাগিল। পণ্ডিতগণ কখন মণ্ডনের বিচারে দোষদর্শন করিয়া গভীর বিষাদে মগ্ন হইতেছেন, আবার কখন বা আচার্য্যের বিচারে দোষ দেখিয়া আনন্দিত হইতেছেন।

অতঃপর আচার্য্য সর্ব্বপ্রকারেই মণ্ডনের বাক্য খণ্ডন করিলেন। মণ্ডনের গলদেশের পুষ্প মাল্যও সর্ব্বসমক্ষে শুষ্ক হইয়া তাঁহার অন্তরের পরাজয় ঘোষিত করিল। মণ্ডন পরাজয় স্বীকার করিয়া অধোবদনে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সভাস্থ জন সমূহ মণ্ডনের পরাজয় দর্শনে মহা কোলাহল করিয়া উঠিল। স্থির সমুদ্র যেন সহসা ভীষণ বাত্যাঘাতে আন্দোলিত হইয়া উঠিল।

কোন কোন পণ্ডিত মণ্ডনের পরাজয় স্বীকার করিলেন। কতকগুলি আবার তাহা স্বীকার করিলেন না। এইরূপে পণ্ডিত মণ্ডলী দুই পক্ষ অবলম্বন করিয়া কতক মণ্ডন পক্ষে, কতক আচার্য্য পক্ষে হইলেন। কেহ কেহ আবার জয় পরাজয়ের কথা ভুলিয়া এই অদ্ভুত সন্ন্যাসীর প্রতিভা দর্শনে মুগ্ধ হইয়া সন্ন্যাসীর সহিত আলাপের জন্যই ব্যস্ত হইলেন। তাঁহাদের কেহ সন্ন্যাসীর অপরূপ রূপের, কেহ বা তাঁহার বিচার শক্তির আবার কেহ বা তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞানের প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

আপামর সাধারণ লঘুচেতা হীনান্তঃকরণ ব্যক্তিদিগের মধ্যে কিন্তু একই প্রকার মত প্রকাশ দেখা যাইতে লাগিল। আচার্য্য ও মণ্ডনের ভিতর বাদের তাহারা কিছুই বুঝিল না, কেবল মণ্ডনের পরাজয় হইয়াছে এই কথা শুনিয়াই একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিল এবং এই প্রকার কথাবার্ত্তায় গোলমাল করিতে লাগিল।

একজন বলিল "বেটা বুজরুক্! রোস্‌না ব্যাটাকে জব্দ কর্‌চি, মিশ্র ঠাকুরের বাড়ী থেকে একবার বাহির হলেই দেখে নিচ্চি ও কেমন।"

২য়। ব্যাটা নিশ্চিত একজন যাদুকর, যাদুবিদ্যের জোরেই মিশ্র ঠাকুরকে হারিয়ে দিয়েছে।

৩য়। কিন্তু ভাই সন্ন্যাসীর ক্ষমতাও কিছু আছে নহিলে মনে কর্ সেদিন কি করে মিশ্র মশায়ের বাড়ীর মধ্যে গেল বল দেকি?

৪র্থ। হাঁ, হে! আমি তোমার চেয়ে ও বিষয়ে আরও বেশী শুনেছি, সন্ন্যাসী ঠাকুর এক স্থানে চোক বুজে বস্‌ল আর অমনি পৈরাগ থেকে এখানে ঝুপ করে এসে পড়্‌ল।

৫ম। তোরা যাই বলিস্ আমার কিন্তু সন্ন্যেসী ঠাকুরের কাছ থেকে ২।৪টা মন্ত্র তন্ত্র শিখে নিয়ে তার পর নগরের বার করে দিতে ইচ্ছা হয়।

১ম। নে, নে, তোর আর বুদ্ধি বের করে কাজ নাই। আমরা থাক্‌তে দেশের মাথা মিশ্র ঠাকুরকে হারিয়ে দিলে, আর উনি কিনা তার কাছে মন্তর শিখবেন! একবার বেরুলে হয়, এই লাঠির চোটে ওর মাথাটা দুফাঁক করি তার পর তুই যত পারিস্ মন্তর শিখিস্।

এদিকে মণ্ডন মিশ্র যাহা ভবিতব্য তাহাই হইয়াছে ভাবিয়া প্রকৃতিস্থ হইলেন এবং সভাস্থ সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মহাশয়গণ, আমি সর্ব্বসমক্ষে এই মহাত্মার নিকট পরাজিত হইয়াছি, অতএব আমাদের পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞানুসারে আমি অদ্য হইতে গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া এই মহাত্মার মত ও পথ আশ্রয় করিলাম। একণে আপনারা সকলে আমায় বিদায় দিন।"

মণ্ডনের বাক্য শুনিয়া পণ্ডিত মণ্ডলী সকলে শোকে অভিভূত হইলেন। অনেকে "হায় কি হইল, মণ্ডনের পরাজয়ে আমাদেরও যে পরাজয় হইল, আমাদের সকলেরও সন্ন্যাসগ্রহণই কর্ত্তব্য তাহা না করিয়া এ মুখ আর লোক সমাজে দেখাইব কেমন করিয়া?" ইত্যাদি বলিতে লাগিলেন। কেহ বা মণ্ডনের সন্ন্যাস চক্ষে দেখা অসহ্য ভাবিয়া সভাপরিত্যাগে উদ্যত হইলেন। মণ্ডন বহু চেষ্টাতেও সেই অস্থির বুধ-মণ্ডলীকে সুস্থির করিতে পারিলেন না।

এমন সময় মিশ্রঠাকুরাণী আসিয়া সকলকে স্থির হইতে অনুরোধ করিলেন এবং আচার্য্যকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—

"মহাত্মন্! আমার পতিকে লইয়া কোথায় যাইতেছেন?"

আ। জননি, আপনার পতি বাদে পরাজিত। বাদের সর্ত্তানুসারে আমি তাঁহাকে লইয়া যাইতেছি।

উ। মহাত্মন! সত্য বটে, আমার পতি বাদে পরাজিত, পতির অর্দ্ধাঙ্গ পত্নী, আমি কিন্তু এখনও অপরাজিতা। অগ্রে আমায় পরাজয় করুন, তবেই পতির পরাজয় সিদ্ধ হইবে।

আ। জননি! আপনি নারী, আপনার সহিত বিচার কি রূপে সম্ভবে?

উ। কেন মহাশয়! নারীর সহিত বিচার ত নূতন কথা নহে। শুনেন নাই কি, পূর্ব্বে জনক রাজার সহিত সুলভা নাম্নী এক সন্ন্যাসিনীর এবং যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত বিদুষী গার্গীর বিচার হইয়াছিল।

আ। সত্য বটে তদ্রূপ ঘটিয়াছিল, কিন্তু জননি, পত্নীর পরাজয় না হওয়া পর্য্যন্ত পতির পরাজয় যে সিদ্ধ নহে এরূপ কোন বিধি নাই। যাহা হউক এ ক্ষেত্রে আপনি যেমন আজ্ঞা করিতেছেন সেই রূপই হউক। আপনার প্রশ্ন কি বলুন?

মণ্ডনপত্নী ভারতী তখন আচার্য্য শঙ্করকে পরীক্ষা করিবার জন্যই যেন একে একে কামশাস্ত্রীয় প্রশ্ন উত্থাপন করিলেন। প্রশ্ন শুনিয়া আচার্য্য যুগপৎ বিস্মিত ও চিন্তিত হইলেন। তিনি আকুমার সন্ন্যাসী,জীবনে তিনি কখন কাম চিন্তা করেন নাই। তিনি তখন উভয়ভারতীকে কহিলেন "জননি! আমি আকুমার সন্ন্যাসী, আমাকে এরূপ প্রশ্ন করা আপনার সঙ্গত হয় নাই। আপনি অন্য প্রশ্ন করুন।"

উ। মহাত্মন্! আমার অন্য কোন প্রশ্ন নাই, ইহাই আমার প্রশ্ন। হয় আপনি ইহার উত্তর দিন, নচেৎ পরাজয় স্বীকার করুন।

আ। মাতঃ! তাহা হইলে বাদের নিয়মানুসারে আমাকে একমাস কাল সময় দিন, আমি মাসান্তে আসিয়া আপনার প্রশ্নের উত্তর দিব।

ভারতী তথাস্তু বলিয়া তাহাতেই সম্মতি দিলেন। আচার্য্যও তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া শিষ্যসহ ধীরে ধীরে মণ্ডনের গৃহ হইতে রাজপথে আসিলেন।

ভারতীর বুদ্ধিচাতুর্য্যে সকলেই মোহিত হইল ও মহোল্লাসে তাঁহার জয়ধ্বনি করিতে করিতে নিজ নিজ গৃহাভিমুখে চলিল।

কেহ কেহ বলিতে লাগিল "আর ব্যাটা আসছে না, ঐ যে মাস খানেক বাদে আসবে বল্‌লে ঐ বলে পিট্‌টান দিলে আর কি। আর এ মুখো হচ্ছে না। ফাঁকতালে মিশ্রঠাকুরকে চেলা বানিয়ে চম্পট দিয়েছিল আর কি! ভাগ্যিস্ মিশ্রঠাকরুণ ছিলেন তাই সব দিক্ রক্ষা হল। আর একটু হলে সব নষ্ট হযেছিল। যা হক্ খুব মেযে বাবু!"

অন্তঃপুরে নারীগণ মধ্যেও উভয়ভারতীর রূপগুণ ও বিদ্যাবুদ্ধির নূতন করিয়া সমালোচনা হইতে লাগিল। সকলে তাঁহাকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। তিনিও মৃদুমধুর হাস্যে সকলকে আপ্যায়িত করিয়া বিদায় দিলেন। পরাজিত সন্ন্যাসীর কমনীয় কান্তি ও অসীম ক্ষমতার আলোচনাও সর্ব্বত্র চলিতে লাগিল। পুরুষদিগের অনেকের মন স্পষ্ট না বুঝিলেও সন্ন্যাসীর গমনে যেন কিছু ব্যাকুল। আর রমণীগণ অষ্টাদশ দিন যাবৎ তাঁহাকে দেখিয়া এবং তাঁহার অমৃতোপম বচন শুনিয়া হৃদয়ে তাঁহার প্রতি কে জানে, কেন একটা অভূতপূর্ব্ব স্নেহ ও বাৎসল্যের সঞ্চার হইয়াছিল। সকলেই সেই যুবক সন্ন্যাসীকে নিত্য ভিক্ষাদানে আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। মণ্ডনের পরাজয়ে প্রথমে দুঃখিতা এবং ভারতীর বুদ্ধিকৌশলে মণ্ডনের

পরাজয় স্থগিত হওয়াতে পরে আনন্দিতা হইলেও সেই সুকুমার সন্ন্যাসীকে আর দেখিতে বা ভিক্ষা দিতে পারিবেন না ভাবিয়া তাঁহাদের অন্তর মধ্যে মধ্যে কাঁদিয়া উঠিতেছিল।

সত্য সত্যই এ অপূর্ব্ব সন্ন্যাসীর কি এক মোহিনী শক্তি! মণ্ডন ও তৎ পত্নী উভয়ভারতীরও হৃদয় সন্ন্যাসীর অদর্শনে কাতর।

আচার্য্য যতক্ষণ মাহিষ্মতীর মধ্য দিয়া গমন করিতে লাগিলেন নগরের তাবৎ নরনারী অনিমেষ নেত্রে তাঁহাকে দেখিতে লাগিল। সে প্রশান্তোজ্জ্বল তপোদীপ্ত মূর্ত্তি দর্শনে যে সকল বীরপুঙ্গব মণ্ডনসভার চতুর্দ্দিকে জনতা করিয়া এতক্ষণ মহা আস্ফালন করিতেছিলেন তাঁহাদের হাতের লাঠি হাতেই রহিয়া গেল।

ক্রমে সশিষ্য আচার্য্য সকলের দৃষ্টিপথ বহির্ভূত হইলেন। তখন সকলে দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া নিজ নিজ গৃহে গমন করিলেন। কিন্তু গৃহে ফিরিযাও সকলে দেখিলেন সেই যাদুকর সন্ন্যাসী তাঁহাদের হৃদয়ের অনেকটা স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন।

ক্রমশঃ

সংবাদ ও মন্তব্য।

থিয়োসফি সম্প্রদায়ের মুখপত্র "আডিযার বুলেটিন," প্রেস নামক ইংরাজী পত্র হইতে নিম্নলিখিত সংবাদটি পাইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। আমরা উক্ত 'বুলেটিনের' বিগত আগষ্ট মাসের সংখ্যায় ইহা প্রাপ্ত হইয়াছি, সত্য মিথ্যা কতদূর বলিতে পারি না।

"খ্রীষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতে Houei-T'ze প্রায় ২০০ শত পুস্তকালয় চীন ও তুরস্ক দেশে, নিজ নামে স্থাপন করিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি চীনের উত্তর ব্যাঘ্র প্রদেশে একটী দরিদ্র বালক রূপে ব্যবসাকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া পরে মহা ধনী হইয়াছিলেন। ঐ অর্থ ব্যয় করিয়া ইনি পরে নানা দেশে ঐ প্রকারে পুস্তকালয় সকল স্থাপন করেন। ফরাসী ভ্রমণকারী M-Pelliof মধ্য আসিয়ায় Toueen-Houang নামক একটী ক্ষুদ্র গ্রামে একদিন বালুকা

ঝটিকার পর হঠাৎ একটী পাহাড়ের গায়ে একটি দ্বার দেখিতে পান। দ্বারটী খুলিয়া দেখা গেল এক প্রকাণ্ড পুস্তকাগার, প্রায় ২০,০০০ পুঁথি, বহু চিত্র ও প্রস্তরমূর্ত্তি বিদ্যমান। এই সকল জিনিষ প্রায় খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীর বলিয়া বোধ হয়। বিদেশীয় আক্রমণ হইতে রক্ষার জন্য ১০৩৫ খৃষ্টাব্দে ইহা প্রাচীর দ্বারা রুদ্ধ করা হয়। উক্ত গ্রন্থের মধ্যে বৌদ্ধ গ্রন্থই অধিক। এখানে অনেক শিলালিপিও পাওয়া গিয়াছে।

শ্যামবাজার ১০৮ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটস্থ ভারতশিল্পভাণ্ডারের কর্ত্তৃপক্ষগণ দেশী দ্রব্য কিনিবার উৎসাহ বৃদ্ধি করিবার জন্য ক্রীত দ্রব্যের আধিক্যানুসারে ছাত্রগ্রাহকগণকে ছয়টী এবং অন্যান্য গ্রাহকগণকে ছয়টী পারিতোষিক বৎসর বৎসর বিতরণ করিয়া থাকেন। গত ১লা আশ্বিন অপরাহ্ণে ইউনিয়ন-ক্লব-গৃহে ভাণ্ডারের চতুর্থ ও পঞ্চম বার্ষিক পারিতোষিক বিতরণ করা হইয়াছে।

সম্প্রতি বৃন্দাবন শ্রীরামকৃষ্ণমিশন সেবাশ্রমের একটী ত্রৈমাসিক রিপোর্ট (জুলাই হইতে সেপ্টেম্বর ১৯১০) আমরা পাইয়াছি। এই তিন মাসে ৫২৪৩ জন রোগী আশ্রম হইতে ঔষধ লইয়া গিয়াছে এবং ৪৩ জন আশ্রমে থাকিয়া ঔষধ, পথ্য ও সেবাদি দ্বারা চিকিৎসিত হইয়াছে। সর্ব্বশুদ্ধ আয়ঃ—গত মাসের জের—১৪৪৻১, মাসিক সাহায্য—১১৭৷৹, এবং এককালীন দান—২০৪৻১৫

এই আশ্রম সম্বন্ধীয় দান নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রেরিতব্যঃ—

সেক্রেটরী শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, বংশীবট, বৃন্দাবন পোঃ, জিলা মথুরা বা স্বামী ব্রহ্মানন্দ, প্রেসিডেণ্ট, রামকৃষ্ণ মিশন, বেলুড় পোঃ, জিলা হাবড়া অথবা কার্য্যাধ্যক্ষ, উদ্বোধন কার্য্যালয়।

আমরা আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, রুড়কির মাননীয় জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও হরিদ্বার মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান চেমিয়ার সাহেব কিছু দিন হইল কনখল রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি উক্ত সেবাশ্রমের কার্য্য দর্শন করিয়া পরম প্রীত হইয়াছেন এবং নবেম্বর মাস

হইতে মিউনিসিপ্যালিটির তহবিল হইতে মাসিক ১৫৲ টাকা উক্ত সেবাশ্রমের সাহায্যের জন্য বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন।

সিষ্টার অভাবমিয়া উক্ত সেবাশ্রমের জন্য অষ্ট্রেলিয়া হইতে সংগ্রহ করিয়া ৩৪৫ টাকা প্রেরণ করিয়াছেন।

আশা করি, সহৃদয় জনসাধারণ উক্ত সদ্দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিবেন।

গত ৭ই মাঘ ২১সে জানুয়ারি শনিবার কৃষ্ণাসপ্তমী তিথিতে বেলুড় রামকৃষ্ণ-মঠে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি পূজাদি হইয়াছে এবং ১৫ই মাঘ ২৯সে জানুয়ারি রবিবার তদুপলক্ষে সর্ব্বসাধারণের জন্য শাস্ত্রাদি পাঠ, সঙ্গীত ও প্রসাদ বিতরণ এবং দরিদ্র নারায়ণ গণের সেবা অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে, অতঃপর রামকৃষ্ণমিশনের কর্ত্তৃত্বাধীন সেবাশ্রম ও অনাথাশ্রম সমূহ কেবলমাত্র রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম বা রামকৃষ্ণ অনাথাশ্রম নামে পরিচিত না হইয়া রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম বা রামকৃষ্ণমিশন অনাথাশ্রম নামে পরিচিত হইবে।

আগামী ২৬সে ফেব্রুয়ারী রবিবার বেলুড় মঠে রামকৃষ্ণ মিশনের দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক অধিবেশন হইবে। সভ্যগণের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ গীতি।

(সিন্ধু—আড়াঠেকা।)

এত দয়া, দয়াময়! ভাবিলে পরাণ গলে।
ধরিলে নরের রূপ, নারকীরে উদ্ধারিলে॥
পাতকী মোহান্ধ যত, পরশিলে অবিরত,
অমৃত বিলালে কত, বিনিময়ে বিষ নিলে॥
শরীরে ধরিলে ব্যাধি, বিলায়ে জীবে সমাধি,
কল্পতরু! নিরবধি, কত খেলা খেলাইলে॥
ভাবিলে সে সব কথা, বাজে বুকে বড় ব্যাথা,
ভাগ্যবান্ যে ছিল যথা, সকলের সেবা নিলে॥
হারে অদৃষ্ট মম, না দেখিনু সে রতন,
চর্ম্ম চক্ষে একদিন, এ ক্ষোভ রবে মরিলে॥

শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত।

পূজা।

ওহে ভবধব, বসে আছি তব—
 পূজা আয়োজন করিয়া ;
উদয় হও হে হৃদয় মাঝারে
 হৃদয়ের তমঃ নাশিয়া।
পূজাত করিব ; কিন্তু কিদিয়ে
 পূজিব তোমারে বল না ?
এই বিশ্ব মাঝে তব পূজা যোগ্য
 খুজেত কিছুই মিলে না।
ফুল দিয়ে কিগো পূজা হয় তব
 সুরভি চন্দনে মাখিয়া ?
বহু উপচারে নৈবেদ্য সাজায়ে
 কি হবে তোমারে পুজিয়া ?
তোমাবে পূজিতে নাহি চাই ফুল,
 হৃদে চাই চিৎ-শকতি ;
না চাই তুলসী, না চাহি চন্দন,
 চাহি প্রাণ-ঢালা ভকতি !
তোমারই তরে রেখেছি হে দেব,
 হৃদয় আসন পাতিয়া,
সফল করগো জীবন আমার
 কৃপা করে তাহে বসিয়া।
অনুরাগধূপ জ্বালিয়া নীরবে
 করিব তোমার আরতি,
ষড়রিপু দিব বলি ও শ্রীপদে
 আর দিব প্রেম ভকতি!

শ্রীগোপেন্দ্র কুমার সরকার।

"প্রশ্ন"।

একি লীলা তব অয়ি লীলাময়ি!
　　　　জটিল রহস্য ভরা;
কেন মাগো, জীব জগতে আসিয়ে,
　　　　হয় গো আপন হারা?
দুদিনের তরে আসিয়ে এ ভবে,
পবিত্র স্বভাব কেন ভুলি সবে
অশান্তিজড়িত অনিত্য বিভবে
　　　　দেয় গো পরাণ ঢেলে?
জ্ঞান, বুদ্ধি, তুমি দিযাছ সকলি
তবুও কেন জীব বিবেক বিদলি
আশার কুহকে ধাইছে কেবলি
　　　　কামনা অনলে জ্বলে?
দাহিছে সতত অতৃপ্তি-গরলে,
ডুবিছে নিয়ত নিরাশা সলিলে,
মাযার বাঁধনে তথাপি সকলে
　　　　কেন ধরা দেয আসি?
যদিও বা কেহ তোমারি প্রসাদে
দেয ফেলে দূরে অসার সম্পদে
কে আসিয়া বাধা দেয পদে পদে
　　　　রচিয়া মোহের ফাঁসি?
একি খেলা তব অয়ি বিশ্বরমে,
　　　　নিখিল জগত ভরা;
হারাইয়ে পথ অজ্ঞান তিমিরে
　　　　ভাবিয়া হইগো সারা!

শ্রীসুরেশচন্দ্র ঠাকুর।

"ষোল আনাই যে যায়।"

বৈশাখ মাস। একদিন অপরাহ্নে জনৈক বিদ্যাভিমানী পণ্ডিত সান্ধ্য-বায়ু সেবনার্থ ভাগীরথীবক্ষে নৌকা বিহার করিতেছিলেন। সুনীল আকাশ পথে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল, অমনি তিনি মাঝিকে জিজ্ঞাসা করিলেন "মাঝি! তুমি জ্যোতিষ শিক্ষা করিযাছ?" মাঝি উত্তর করিল "না মহাশয়।" ইহাতে পণ্ডিত বলিলেন "তাহা হইলে তোমার জীবনের এক চতুর্থাংশ বৃথা অতিবাহিত হইয়াছে।" ভাগীরথীর উভয় তীরে শ্যামল শস্য ক্ষেত্রের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া পণ্ডিত প্রফুল্ল অন্তঃকরণে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাঝি, তুমি উদ্ভিদ্ বিদ্যা বিদিত আছ? মাঝি উত্তর করিল "না মহাশয়, আমি উহার নামও পূর্ব্বে শুনি নাই।" ইহা শ্রবণে পণ্ডিত বলিলেন, "মাঝি! তবে তোমার জীবনের আর এক চতুর্থাংশ বৃথা ব্যয়িত হইয়াছে। পুনরায় কিছুক্ষণ পরে স্রোতস্বতীর দ্রুত গতি দর্শন করিয়া পণ্ডিত আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাঝি, তুমি গণিত জান?" মাঝি উত্তর করিল "আমি ঐ বিদ্যাও শিক্ষা করি নাই।" ইহা শুনিয়া পণ্ডিত বলিলেন, তবে তোমার জীবনের আর এক চতুর্থাংশ অনর্থক চলিয়া গিয়াছে—অর্থাৎ সর্ব্বশুদ্ধ জীবনের বার আনা বৃথা গিয়াছে।" এই কথাবার্ত্তা চলিতেছে, এমন সময়ে বাতাস প্রবল বেগে বহিতে লাগিল, নৌকা জলমগ্ন প্রায় হইল। মাঝি প্রবল স্রোতে ঝাঁপ দিল এবং সন্তরণ করিতে করিতে পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়। সন্তরণ জানেন কি? পণ্ডিত বলিলেন "না।" ইহাতে মাঝি বলিল "তবে আপনার ষোল আনাই বুঝি যায়। এক্ষণে বিপদ পরিত্রাতা ভগবান্‌কে স্মরণ করুন এবং মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবার জন্য প্রস্তুত হউন।"

এই গল্পটীতে একটী অমূল্য উপদেশ নিহিত রহিয়াছে। মানুষকে মৃত্যু হইতে রক্ষা করিতে পারে না, এমন বিদ্যা শিক্ষা করিয়া অহঙ্কৃত হওয়া মূর্খতা মাত্র। যে আত্মতত্ত্ব বিদ্যালাভে মহাপুরুষেরা অগাধ সংসারজলধির শোক-তাপ-জরা-মৃত্যু-রূপ প্রবল তরঙ্গ অনায়াসে অতিক্রম করিতে সমর্থ হন তাহাই সর্ব্বাগ্রে সকলের শিক্ষা করা উচিত।

শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ ঘোষ

সার কথা।

[১]

শ্রীচৈতন্য দেব অনুরাগে উন্মত্ত হইয়া "হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ" বলিয়া নবদ্বীপে ভ্রমণ করিতেছিলেন। নিকটবর্ত্তী একজন লোক বলিলেন আপনি যে কৃষ্ণের জন্য পাগল হইতেছেন তিনি আপনার হৃদয়েই রহিয়াছেন।" ঐ কথা শুনিয়াই শ্রীচৈতন্যদেব নখাঘাতে নিজের বক্ষ বিদীর্ণ করিতে উদ্যত হইলেন। যথার্থ অনুরাগে শরীর জ্ঞানের লোপ হয়।

[২]

স্বামী বিবেকানন্দকে একদা একজন ভক্ত জিজ্ঞাসা করেন "মহাশয়, শুনিয়াছি যোগ ক্রিযাদির দ্বারা দীর্ঘ জীবন লাভ করা যায়—শরীর নিরোগ থাকে; তাই মনে হয় আপনাদের ন্যায় মহাপুরুষদিগকে রোগে ভুগিতে হয়, এ বড় আশ্চর্য্যের বিষয়। তদুত্তরে স্বামীজি বলেন—"শরীর ধারণ করিয়া চিরদিন সুস্থদেহে থাকিতে পারাটার অপেক্ষা আপনার কথাটা আরও আশ্চর্য্যজনক মনে হয়। কেন না ঐ রূপে বাঁচিয়া থাকিলেই বা কি?

পশু পক্ষী বৃক্ষ, লতা পাথর এদের কোন রোগ নাই এবং অনেক দিন বাঁচে, তাই বলিযা কি ইহারা মানুষের অপেক্ষা উন্নত? পাহাড়ে পর্ব্বতে অনেক সাধু যোগী যোগাবলম্বনে দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া অবস্থান করিতে পারেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের দ্বারা জীবের ও জগতের কি বিশেষ উপকার সাধিত হয়? পক্ষান্তরে যাঁহারা পরহিতায জীবন যাপন করেন, পরের রোগ শোক পাপ তাপ দূর করিয়া নিজেরা তাহা ভোগ করেন, তাঁহাদের শরীর বেশী দিন থাকে না সত্য, কারণ সেদিকে তাঁহাদের দৃষ্টি থাকে না। তাই বলিযা পরহিতের জন্য কিছু না করিযা খালি দীর্ঘকাল বাচাটাই কি বড়? মহাপুরুষগণের জীবন—দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না।

[৩]

দেওযানা (প্রেমোন্মাদ) হাফেজকে দর্শন করিতে সময সময বহু লোকের ভিড় হইত। এক সময় একটী পরমা সুন্দরী স্ত্রীলোক তাঁহাকে দর্শন করিতে উপস্থিত হন। তাহাকে দর্শন করিয়া হাফেজ্ কাঁদিতে লাগিলেন। স্ত্রীলোকটী হাফেজের মনোভাব অবগত হইতে না পারিয়া বলিলেন "মহাশয়, আপনি কি আমার রূপে মুগ্ধ হইয়া অশ্রুপাত করিতে

ছেন ?" তদুত্তরে হাফেজ্ বলিলেন "মা! আপনার রূপ দেখিয়া আপনার রূপ সৌন্দর্য্য যিনি সৃজন করিয়াছেন সেই পরমশিল্পীর সৌন্দর্য্য স্মরণ হওয়াতেই আমার অশ্রুপাত হইতেছে।

[৪]

স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন—গৃহীদের পরের দান গ্রহণ করা কখনো উচিত নহে। আরও বলিতেন প্রত্যহ অন্ততঃ একটীও দরিদ্র নারায়ণের সেবা না করিয়া নিজে অন্ন গ্রহণ করাও কদাপি কর্ত্তব্য নহে।

[৫]

পূর্ব্ববঙ্গে নারায়ণগঞ্জ বন্দরের অনতিদূর দেওভোগ গ্রামে দুর্গাচরণ নাগ নামে একজন সাধু বাস করিতেন। একদা বর্ষাকালে দুইজন অতিথি ব্রাহ্মণ তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হন। নাগ মহাশয়ের একখানি ভিন্ন বাসোপযোগী ঘর ছিল না। কাজেই অতিথিদ্বয়কে ভোজন করাইয়া সেই গৃহে শয়ন করাইলেন। আর সস্ত্রীক আপনি ঘরের কানাচে বসিয়া সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। শ্রাবণের জলধারায় সমস্ত রাত্রি ভিজিয়াও সে কথা তিনি অতিথিদিগকে জানিতে দিলেন না!

[৬]

একদিন স্বামী বিবেকানন্দ দক্ষিণেশ্বর হইতে কয়েক জন ভক্ত সঙ্গে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিতে ছিলেন। হঠাৎ নির্ম্মল আকাশের দিকে চাহিয়া একজন ভক্তকে বলিয়াছিলেন "মশায়, ঐ যে আকাশের গায়ে সাদা রাস্তার মত ছায়াপথ দেখা যাচ্ছে, ঐ থেকে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে কত কোটি কোটি চন্দ্রসূর্য্য তৈয়িরি হচ্চে—ঐ গুলি "তারার কাদা"। ভাবিয়া দেখুন,এই বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর কি ব্যাপার! আর ক্ষুদ্র মানুষের ক্ষুদ্র বুদ্ধি যা দিয়ে তাঁকে ধরতে বুঝতে চায় তা কি তুচ্ছ হেয় পদার্থ!" ভক্তটী বলেন যে স্বামীজির কথা শুনিয়া অনন্তের ভাবে অভিভূত হয়ে মানুষের পক্ষে ঈশ্বরলাভ একান্ত অসম্ভব মনে হয়ে অশান্তিতে তিন দিন পর্য্যন্ত তাহার নিদ্রা হয় নাই। অবশেষে বাবু গিরিশ চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া ঐ ভক্ত আপনার মনের উদ্‌বেগের কথা প্রকাশ করেন। গিরিশবাবু তাঁহাকে তদুত্তরে বলেন "কিন্তু আবার এ কথাও সত্য যে এই বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর—যাঁহা হইতে এই অনন্ত সৃষ্টি প্রবাহিত হইতেছে—তিনি আমাদের ন্যায় পাপী তাপীর উদ্ধারের জন্য আমাদের ন্যায় নরশরীর ধারণ করিয়া জগতে অবতীর্ণ হন।" গিরিশ বাবুর বাক্যে ভক্তটীর হৃদয় শান্ত হয়। ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য ভাবিয়া শান্তি পাওয়া যায় না, তাঁহার অপার অহেতুক করুণার কথা হৃদয়ে ধারণা হইলে তবে মানব শান্তিলাভ করে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ।

[স্বামী সারদানন্দ।]

গুরুভাবে তীর্থ ভ্রমণ ও নানা সম্প্রদায়ের সাধু দর্শন।

(২)
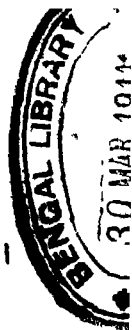
পূর্ব্বোক্ত তীর্থ সকল ভিন্ন ঠাকুর আর একবার মথুর বাবুর সহিত কালনা গমন করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের পাদস্পর্শে বাঙ্গলার গঙ্গাতীরবর্ত্তী অনেকগুলি গ্রাম যে তীর্থবিশেষ হইয়া উঠিয়াছে তাহা আর বলিতে হইবে না। কালনা তাহাদেরই ভিতর অন্যতম। আবার এখানে বর্দ্ধমান রাজ-বংশের অষ্টাধিকশত শিব-মন্দির প্রভৃতি নানা কীর্ত্তি বর্ত্তমান থাকিয়া কালনাকে একটি বেশ জমজমাট স্থান যে করিয়া তুলিয়াছে এ কথা দর্শনকারী মাত্রেই অনুভব করিয়াছেন। ঠাকুরের কিন্তু এবার কালনা দর্শন করিতে যাওয়ার ভিন্ন উদ্দেশ্য ছিল। এখানকার খ্যাতনামা সাধু ভগবান দাস বাবাজিকে দর্শন করাই তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় ছিল।

ভগবান দাস বাবাজির তখন অশীতি বৎসরেরও অধিক বয়ঃক্রম হইবে। তিনি কোন্ কুল পবিত্র করিয়াছিলেন তাহা আমাদের জানা নাই। কিন্তু তাঁহার জ্বলন্ত ত্যাগ, বৈরাগ্য ও ভগবদ্ভক্তির কথা বাঙ্গলার আবালবৃদ্ধ অনেকেরই তখন শ্রুতিগোচর হইয়াছিল। শুনিয়াছি একস্থানে একভাবে বসিয়া দিবারাত্র জপ তপ ধ্যান ধারণাদি করায় শেষ দশায় তাঁহার পদদ্বয় অসার ও অবশ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু অশীতি বর্ষেরও অধিক বয়স্ক হইয়া শরীর অপটু ও উত্থানশক্তি প্রায় রহিত হইলেও বৃদ্ধ বাবাজির হরিনামে উদ্দাম উৎসাহ, ভগবৎ প্রেমে অজস্র অশ্রুবর্ষণ ও আনন্দ কিছুমাত্র না কমিয়া বরং দিন দিন বর্দ্ধিতই হইয়াছিল! এখানকার বৈষ্ণবসমাজ তাঁহাকে পাইয়া তখন বিশেষ সজীব হইয়া উঠিয়াছিল এবং ত্যাগী বৈষ্ণব সাধুগণের অনেকে তাঁহারই উজ্জ্বল আদর্শ ও উপদেশে নিজ নিজ জীবন গঠিত করিয়া ধন্য হইবার অবসর পাইয়াছিলেন। শুনিয়াছি বাবাজির দর্শনে যিনিই তখন যাইতেন তিনিই তাঁহার বহুকালানুষ্ঠিত ত্যাগ, তপস্যা, পবিত্রতা ও ভক্তির সঞ্চিত প্রভাব প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া এক অপূর্ব্ব আনন্দের উপলব্ধি করিয়া আসিতেন; এবং মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্ম্মসম্বন্ধীয় কোন বিষয়ে তিনি যে মতামত প্রকাশ করিতেন তাহাই তখন লোকে অভ্রান্ত সত্য

বলিয়া ধারণা করিয়া তদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইত। কাজেই সিদ্ধ বাবাজি তখন কেবল নিজের সাধনাতেই ব্যস্ত থাকিতেন না কিন্তু বৈষ্ণব সমাজের কিসে কল্যাণ হইবে, কিসে ত্যাগী বৈষ্ণবগণ ঠিক ঠিক ত্যাগের অনুষ্ঠানে ধন্য হইবে, কিসে ইতর সাধারণ সংসারী জীব শ্রীচৈতন্য প্রদর্শিত প্রেমধর্ম্মের আশ্রয়ে আসিয়া শান্তিলাভ করিবে—এ সকলের আলোচনা ও অনুষ্ঠানে অনেক কাল কাটাইতেন। বৈষ্ণব সমাজের কোথায় কি হইতেছে, কোথায় কোন্ সাধু ভাল বা মন্দ আচরণ করিতেছে—সকল কথাই লোকে বাবাজির নিকট আনিয়া উপস্থিত করিত এবং তিনিও সে সকল শুনিয়া বুঝিয়া তত্তৎ বিষয়ে যাহা করা উচিত তাহার উপদেশ করিতেন। ত্যাগ, তপস্যা ও প্রেমের জগতে চিরকালই কি যে এক অদৃশ্য সুদৃঢ় বন্ধন, লোকে বাবাজির উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করিতে স্বতঃপ্রেরিত হইয়া ছুটিত। এইরূপে গুপ্তচরাদি সহায় না থাকিলেও সিদ্ধ বাবাজির সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি বৈষ্ণব সমাজের সর্ব্বত্রানুষ্ঠিত কার্য্যেই পতিত হইত এবং ঐ সমাজগত প্রত্যেক ব্যক্তিই তাঁহার প্রভাব অনুভব করিত! আর সে দৃষ্টি ও প্রভাবের সম্মুখে সরল বিশ্বাসীর উৎসাহ যেমন দিন দিন বর্দ্ধিত হইয়া উঠিত, কপটাচারী আবার তেমনি ভীত কুণ্ঠিত হইয়া আপন স্বভাব পরিবর্ত্তনের চেষ্টা পাইত।

অনুরাগের তীব্র প্রেরণায় ঠাকুর যখন ঈশ্বর লাভের জন্য দ্বাদশবর্ষব্যাপী কঠোর তপস্যায় লাগিয়াছিলেন এবং তাঁহাতে গুরুভাবের অদৃষ্টপূর্ব্ব বিকাশ হইতেছিল তখন উত্তর ভারতবর্ষের অনেক স্থলেই ধর্ম্মের একটা বিশেষ আন্দোলন যে চলিয়াছিল একথার উল্লেখ আমরা লীলাপ্রসঙ্গের স্থলে স্থলে করিয়াছি। কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী নানা স্থানের হরিসভা সকল এবং ব্রাহ্মসমাজের আন্দোলন, উত্তর পশ্চিম ও পঞ্জাব অঞ্চলে শ্রীযুত দয়ানন্দ স্বামীজির বেদধর্ম্মের আন্দোলন—যাহা এখন আর্য্যসমাজে পরিণত হইয়াছে, বাঙ্গালায় বিশুদ্ধ বৈদান্তিক ভাবের, কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ের ও রাধাস্বামী মতের, গুজরাতে নারায়ণ স্বামী মতের—এইরূপে নানাস্থলে নানা ধর্ম্মমতের উৎপত্তি ও আন্দোলন এই সময়েরই কিছু অগ্র পশ্চাৎ উপস্থিত হইয়াছিল। ঐ আন্দোলনের সবিস্তার আলোচনা এখানে আমাদের উদ্দেশ্য নয়; কেবল কলিকাতায় কলুটোলা নামক পল্লীতে প্রতিষ্ঠিত ঐরূপ একটি হরিসভায় ঠাকুরকে লইয়া যে ঘটনা হইয়াছিল তাহাই এখানে আমরা পাঠককে বলিব।

ঠাকুর নিমন্ত্রিত হইয়া একদিন ঐ হরিসভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন;

ভাগিনেয় হৃদয় তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিল। কেহ কেহ বলেন পণ্ডিত বৈষ্ণব চরণ যাঁহার কথা আমরা পূর্ব্বে পাঠককে বলিয়াছি, সেদিন সেখানে শ্রীমদ্ভাগবৎ পাঠে ব্রতী ছিলেন এবং তাঁহার মুখ হইতে ভাগবৎ শুনিবার জন্যই ঠাকুর তথায় গমন করিয়াছিলেন; এ কথা কিন্তু আমরা ঠাকুরের শ্রীমুখ হইতে শুনিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। সে যাহাই হউক ঠাকুর যখন সেখানে উপস্থিত হইলেন তখন ভাগবৎ পাঠ হইতেছিল এবং উপস্থিত সকলে তন্ময় হইয়া সেই পাঠ শ্রবণ করিতেছিল। ঠাকুরও তদ্দর্শনে শ্রোতৃমণ্ডলীর ভিতর এক স্থানে উপবিষ্ট হইয়া পাঠ শুনিতে লাগিলেন।

কলুটোলার হরিসভার সভ্যগণ আপনাদিগকে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের একান্ত পদাশ্রিত মনে করিতেন; এবং ঐকথাটি অনুক্ষণ স্মরণ রাখিবার জন্য তাঁহারা একখানি আসন বিস্তৃত রাখিয়া উহাতে মহাপ্রভুর আবির্ভাব কল্পনা করিয়া পূজা পাঠ প্রভৃতি সভার সমুদায় অনুষ্ঠান ঐ আসনের সম্মুখেই করিতেন। ঐ আসন 'শ্রীচৈতন্যের আসন' বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইত। সকলে ভক্তিভরে উহার সম্মুখে প্রণাম করিতেন এবং উহাতে কাহাকেও কখন বসিতে দিতেন না। অন্য সকল দিবসের ন্যায় আজও পুষ্পমাল্যাদি ভূষিত ঐ আসনের সম্মুখেই ভাগবৎ পাঠ হইতেছিল। পাঠক শ্রীশ্রীমহাপ্রভুকেই হরিকথা শুনাইতেছেন ভাবিয়া ভক্তিভরে পাঠ করিতেছিলেন এবং শ্রোতৃবৃন্দও, তাঁহারই দিব্যাবির্ভাবের সম্মুখে বসিয়া হরিকথামৃত পান করিয়া ধন্য হইতেছি ভাবিয়া উল্লসিত হইতেছিলেন। ঠাকুরের আগমনে শ্রোতা ও পাঠকের সে উল্লাস ও ভক্তিভাব যে শতগুণে সজীব হইয়া উঠিল, ইহা আর বলিতে হইবে না।

ভাগবতের অমৃতোপম কথা শুনিতে শুনিতে ঠাকুর আত্মহারা হইয়া পড়িলেন এবং 'শ্রীচৈতন্যাসনের' অভিমুখে সহসা ছুটিয়া যাইয়া তাহার উপর দাঁড়াইয়া এমন গভীর সমাধিমগ্ন হইলেন যে তাঁহাতে আর কিছুমাত্র প্রাণসঞ্চার লক্ষিত হইল না! কিন্তু তাঁহার জ্যোতির্ম্ময় মুখের সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব প্রেমপূর্ণ হাসি এবং উর্দ্ধোত্তোলিত হস্তের সেই পরিচিত অঙ্গুলী নির্দ্দেশ দেখিয়া বিশিষ্ট ভক্তেরা প্রাণে প্রাণে বুঝিলেন ঠাকুর ভাবমুখে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সহিত একেবারে তন্ময় হইয়া গিয়াছেন,তাঁহার শরীর মন এবং ভগবান্ শ্রীচৈতন্যের শরীর মনের মধ্যে স্থূলদৃষ্টে দেশ কাল এবং অন্য নানা বিষয়ের বিস্তর ব্যবধান যে রহিয়াছে ভাবমুখে উর্দ্ধে উঠিয়া সে বিষয়ের কিছুমাত্র প্রত্যক্ষই তিনি আর করিতেছেন না! পাঠক পাঠ ভুলিয়া ঠাকুরের দিকে চাহিয়া স্তম্ভিত

হইয়া রহিলেন; শ্রোতারাও, ঠাকুরের ঐরূপ ভাবাবেশ ধরিতে বুঝিতে না পারিলেও একটা অব্যক্ত দিব্য ভয়বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া মুগ্ধ, শান্ত হইয়া রহিলেন!—ভাল মন্দ কোন কথাই সে সময়ে কেহ আর বলিতে সমর্থ হইলেন না! ঠাকুরের প্রবল ভাবপ্রবাহে সকলেই তৎকালের নিমিত্ত অবশ হইয়া অনির্দ্দেশ্য কোন এক প্রদেশে যেন ভাসিয়া চলিয়াছি এইরূপ একটা অনির্ব্বচনীয় আনন্দের উপলব্ধি করিয়া প্রথম কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিলেন, পরে ঐ অব্যক্ত ভাবপ্রেরিত হইয়া সকলে মিলিয়া উচ্চরবে হরি ধ্বনি করিয়া নাম সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন! সমাধিতত্ত্বের আলোচনায় পূর্ব্বে একস্থলে আমরা বলিয়াছি যে, ঈশ্বরের যে নামবিশেষের ভিতর অনন্ত দিব্য ভাবরাশির উপলব্ধি করিয়া মন সমাধিলীন হয়, সেই নামাবলম্বনেই আবার সে নিম্নে নামিয়া বহির্জগতের উপলব্ধি করিয়া থাকে—ঠাকুরের দিব্য সঙ্গে আমরা প্রত্যহ বারম্বার ইহা বিশেষ ভাবে দেখিয়াছি। এখনও তাহাই হইল; সঙ্কীর্ত্তনে হরি নাম শ্রবণ করিতে করিতে ঠাকুরের নিজ শরীরের কতকটা হুঁস আসিল এবং ভাবে প্রেমে বিভোর অবস্থায় কীর্ত্তন সম্প্রদায়ের সহিত মিলিত হইয়া তিনি কখনও উদ্দাম মধুর নৃত্য করিতে লাগিলেন, আবার কখনও বা ভাবের আতিশয্যে সমাধিমগ্ন হইয়া স্থির নিশ্চেষ্ট ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ঠাকুরের ঐরূপ চেষ্টায় উপস্থিত জন সাধারণের ভিতর উৎসাহ শতগুণে বাড়িয়া উঠিয়া সকলেই কীর্ত্তনে উন্মত্ত হইয়া উঠিল। তখন, 'শ্রীচৈতন্যের আসন' ঠাকুরের ঐরূপে অধিকার করাটা ন্যায়সঙ্গত বা অন্যায় হইয়াছে এ সকল কথার বিচার আর করে কে? এইরূপে উদ্দাম তাণ্ডবে বহুক্ষণ শ্রীহরির ও শ্রীমহাপ্রভুর গুণাবলী কীর্ত্তনের পর সকলে জয়ধ্বনি উচ্চারণ করিয়া সেদিনকার সে দিব্য অভিনয় সাঙ্গ করিলেন এবং ঠাকুরও অল্পক্ষণ পরেই সেখান হইতে দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাগমন করিলেন।

ঠাকুরের দিব্যপ্রভাবে হরিনাম তাণ্ডবে উচ্চভাবপ্রবাহে উঠিয়া কিছুক্ষণের জন্য মানবের দোষদৃষ্টি স্তব্ধীভূত হইয়া থাকিলেও ঠাকুরের সেখান হইতে চলিয়া আসিবার পর আবার সকলে পূর্ব্বের ন্যায় 'পুনর্মূষিক'ভাব প্রাপ্ত হইল। বাস্তবিক, জ্ঞানকে উপেক্ষা করিয়া কেবলমাত্র ভক্তিসহায়ে ঈশ্বরপথে অগ্রসর হইতে যে সকল ধর্ম্ম শিক্ষা দেয়, তাহাদের উহাই দোষ। ঐ সকল ধর্ম্মপথের পথিকগণ শ্রীহরির নামসঙ্কীর্ত্তনাদি সহায়ে কিছুক্ষণের জন্য আধ্যাত্মিক ভাবের উচ্চ আনন্দাবস্থায় অতি সহজেই উঠিলেও পরক্ষণেই

আবার তেমনি নিম্নে নামিয়া পড়েন। উহাতে তাঁহাদের বিশেষ দোষ নাই; কারণ উত্তেজনার পর অবসাদ আসাটা প্রকৃতির অন্তর্গত শরীর মনের ধর্ম্ম। তরঙ্গের পরেই 'গোড়', উত্তেজনার পরেই অবসাদ আসাটা প্রকৃতিরই নিয়ম। হরিসভার সভ্যগণও উচ্চ ভাব প্রবাহের অবসাদে এখন নিজ নিজ পূর্ব্ব প্রকৃতি ও সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া ঠাকুরের ক্রিয়াকলাপের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। একদল, ঠাকুরের ভাবমুখে 'শ্রীচৈতন্যাসন' ঐরূপে গ্রহণ করার পক্ষ সমর্থন করিতে এবং অন্যদল ঐ কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ করিতে নিযুক্ত হইলেন। উভয়দলে ঘোরতর দ্বন্দ্ব ও বাক্‌বিতণ্ডা উপস্থিত হইল, কিন্তু কিছুই মীমাংসা হইল না।

ক্রমে ঐ কথা লোকমুখে বৈষ্ণব সমাজের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। ভগবান দাস বাবাজিও উহা শুনিতে পাইলেন। শুধু শুনাই নহে, ভবিষ্যতে আবার ঐরূপ হইতে পারে—ভগবদ্ভাবের ভাণ করিয়া নাম-যশঃপ্রার্থী ধূর্ত্ত ভণ্ডেরাও ঐ আসন স্বার্থসিদ্ধির জন্য ঐরূপে অধিকার করিয়া বসিতে পারে ভাবিয়া হরিসভার সভ্যগণের কেহ কেহ তাঁহার নিকটে ঐ আসন ভবিষ্যতে কি ভাবে রক্ষা করা কর্ত্তব্য সে বিষয় মীমাংসা করিয়া লইবার জন্য উপস্থিত হইলেন।

শ্রীচৈতন্যপদাশ্রিত সিদ্ধ বাবাজি নিজ ইষ্টদেবতার আসন অজ্ঞাতামান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দ্বারা অধিকৃত হইয়াছে শুনা অবধি বিশেষ বিরক্ত হইয়াছিলেন। এমন কি ক্রোধান্ধ হইয়া তাঁহার উদ্দেশ্যে কটুকাটব্য বলিতে এবং তাঁহাকে ভণ্ড বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। হরিসভার সভ্যগণের দর্শনে বাবাজির সেই বিরক্তি ও ক্রোধ যে এখন দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল এবং ঐরূপ বিসদৃশ কার্য্য সম্মুখে অনুষ্ঠিত হইতে দেওয়ায় তাঁহাদিগকেও যে বাবাজি দোষী সাব্যস্ত করিয়া বিশেষ ভৎর্সনা করিলেন, এ কথা আমরা বেশ বুঝিতে পারি। পরে ক্রোধ শান্তি হইলে ভবিষ্যতে আর যাহাতে কেহ ঐরূপ আচরণ না করিতে পারে বাবাজি সে বিষয়ে সকল বন্দোবস্ত নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। কিন্তু যাহাকে লইয়া হরিসভার এত গণ্ডগোল উপস্থিত হইল তিনি ঐ সকল কথা বিশেষ কিছু জানিতে পারিলেন না।

ঐ ঘটনার কয়েক দিন পরেই শ্রীরামকৃষ্ণদেব স্বতঃপ্রেরিত হইয়া ভাগিনেয় হৃদয় ও মথুর বাবুকে সঙ্গে লইয়া কালনায় উপস্থিত হইলেন। প্রত্যূষে নৌকা ঘাটে আসিয়া লাগিলে মথুর থাকিবার স্থান প্রভৃতির বন্দোবস্তে

ব্যস্ত হইলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব ইত্যবসরে হৃদয়কে সঙ্গে লইয়া সহর দেখিতে বহির্গত হইলেন এবং লোকমুখে ঠিকানা জানিয়া ক্রমে ভগবান দাস বাবাজির আশ্রম সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন।

বালকস্বভাব ঠাকুর পূর্ব্বাপরিচিত কোনও ব্যক্তির সম্মুখীন হইতে হইলে সকল সময়েই একটা অব্যক্ত ভয়লজ্জাদি ভাবে প্রথম অভিভূত হইয়া পড়িতেন। ঠাকুরের এ ভাবটি আমরা অনেক সময়ে লক্ষ্য করিয়াছি। বাবাজির সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবার সময়ও ঠিক তদ্রূপ হইল। হৃদয়কে অগ্রে যাইতে বলিয়া আপনি প্রায় আপাদমস্তক বস্ত্রাবৃত করিয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। হৃদয় ক্রমে বাবাজির নিকটে উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিয়া নিবেদন করিলেন—"আমার মামা ঈশ্বরের নামে কেমন বিহ্বল হইয়া পড়েন; অনেক দিন হতেই ঐরূপ অবস্থা; আপনাকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন।"

হৃদয় বলেন বাবাজির সাধনসম্ভূত একটি শক্তির পরিচয় নিকটে উপস্থিত হইবামাত্র তিনি পাইয়াছিলেন। কারণ, প্রণাম করিয়া উপরোক্ত কথাগুলি বলিবার পূর্ব্বেই তিনি বাবাজিকে বলিতে শুনিয়াছিলেন—"আশ্রমে যেন কোনও মহাপুরুষের আগমন হইয়াছে, বোধ হইতেছে!" কথাগুলি বলিয়া বাবাজি নাকি ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিয়াও দেখিয়াছিলেন; কিন্তু হৃদয় ভিন্ন অপর কাহাকেও সে সময়ে আগমন করিতে না দেখিয়া সন্মুখাবস্থিত ব্যক্তি সকলের সহিত উপস্থিত প্রসঙ্গেই মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। জনৈক বৈষ্ণব সাধু কি অন্যায় কার্য্য করিয়াছিলেন, তাঁহার সম্বন্ধে কি করা কর্ত্তব্য—এই প্রসঙ্গই তখন চলিতেছিল; এবং বাবাজি সাধুর ঐরূপ বিসদৃশ কার্য্যে বিষম বিরক্ত হইয়া—তাহার কণ্ঠী (মালা) কাড়িয়া লইয়া সম্প্রদায় হইতে তাড়াইয়া দিবেন, ইত্যাদি বলিয়া তাহাকে তিরস্কার করিতেছিলেন। এমন সময় শ্রীরামকৃষ্ণদেব তথায় উপস্থিত হইয়া তাহাকে প্রণাম করিয়া উপস্থিত মণ্ডলীর এক পার্শ্বে দীনভাবে উপবিষ্ট হইলেন। সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রাবৃত থাকায় তাঁহার মুখমণ্ডলও ভাল করিয়া কাহারও নয়নগোচর হইল না। তিনি ঐরূপে আসিয়া বসিবামাত্র হৃদয় তাঁহার পরিচায়ক পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি বাবাজিকে নিবেদন করিলেন। হৃদয়ের কথায় বাবাজি উপস্থিত কথায় বিরত হইয়া ঠাকুরকে এবং তাঁহাকে প্রতি নমস্কার করিয়া কোথা হইতে তাঁহাদের আগমন হইল, ইত্যাদি প্রশ্ন করিতে লাগিলেন।

বাবাজি হৃদয়ের সহিত কথার অবসরে মালা ফিরাইতেছেন দেখিয়া হৃদয় বলিলেন—"আপনি এখনও মালা রাখিয়াছেন কেন? আপনি সিদ্ধ হইয়াছেন, আপনার উহা এখন আর রাখিবার প্রয়োজন তো নাই?" ঠাকুরের অভিপ্রায়ানুসারে হৃদয় বাবাজিকে ঐরূপ প্রশ্ন করেন বা স্বতঃ প্রণোদিত হইয়া করেন, তাহা আমাদের জানা নাই। বোধ হয় শেষোক্ত ভাবেই ঐরূপ করিয়াছিলেন। কারণ, ঠাকুরের সেবায় সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিয়া এবং তাঁহার সহিত সমাজের উচ্চাবচ নানা লোকের সঙ্গে মিশিয়া হৃদয়েরও তখন তখন উপস্থিত বুদ্ধিমত্তা এবং যখন যেমন তখন তেমন কথা কহিবার প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিবার ক্ষমতা বেশ পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। বাবাজি হৃদয়ের ঐরূপ প্রশ্নে প্রথম দীনতা প্রকাশ করিয়া পরে বলিলেন—"নিজের প্রয়োজন না থাকিলেও লোকশিক্ষার জন্য ও-সকল রাখা নিতান্ত প্রয়োজন; নতুবা আমার দেখাদেখি লোকে ঐরূপ করিয়া ভ্রষ্ট হইয়া যাইবে।"

চিরকাল শ্রীশ্রীজগন্মাতার উপর সকল বিষয়ে বালকের ন্যায় সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া আসায়, ঠাকুরের নির্ভরশীলতা এত সহজ স্বাভাবিক ও মজ্জাগত হইয়া গিয়াছিল যে নিজে অহঙ্কারের প্রেরণায় কোনও কাজ করা দূরে থাকুক, অপর কেহ ঐরূপ করিতেছে বা করিব বলিতেছে দেখিলে ও শুনিলে তাঁহার মনে একটা বিষম যন্ত্রণা উপস্থিত হইত। সে জন্যই তিনি ঈশ্বরের দাসভাবে কখন কখন অতি বিরল সময়ে 'আমি' কথাটির প্রয়োগ করা ছাড়া অপর কোনও ভাবে আমাদের ন্যায় ঐ শব্দের উচ্চারণ করিতেই পারিতেন না! অল্প সময়ের জন্যও যে ঠাকুরকে দেখিয়াছে সেও তাঁহার ঐরূপ স্বভাব দেখিয়া বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়াছে অথবা অন্য কেহ কোনও কর্ম্মটা 'আমি করিব' বলায় তাঁহার বিষম বিরক্তি প্রকাশ দেখিয়া অবাক্ হইয়া ভাবিয়াছে—ঐ লোকটা কি এমন কুকাজ করিয়াছে যাহাতে তিনি এতটা বিরক্ত হইতেছেন! ভগবান দাসের নিকটে আসিয়াই ঠাকুর প্রথম শুনিলেন তিনি কণ্ঠী ছিঁড়িয়া লইয়া একজনকে তাড়াইয়া দিব বলিতেছেন। আবার অল্পক্ষণ পরেই শুনিলেন তিনি লোকশিক্ষা দিবার জন্যই এখনও মালা তিলকাদি ব্যবহার ত্যাগ করেন নাই। বাবাজির ঐরূপে বারম্বার 'আমি তাড়াইব, আমি লোক শিক্ষা দিব, আমি মালা তিলকাদি ত্যাগ করি-নাই'—ইত্যাদি বলায় সরলস্বভাব ঠাকুর আর মনের বিরক্তি আমাদের

ন্যায় চাপিয়া সভ্যভব্য হইয়া উপবিষ্ট হইয়া থাকিতে পারিলেন না। একবারে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বাবাজিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"কি? তুমি এখনও এত অহঙ্কার রাখ? তুমি লোক শিক্ষা দিবে? তুমি তাড়াইবে? তুমি ত্যাগ ও গ্রহণ করিবে? তুমি লোকশিক্ষা দিবার কে? যাঁহার জগৎ তিনি না শিখাইলে তুমি শিখাইবে?"—ঠাকুরের তখন সে অঙ্গাবরণ পড়িয়া গিয়াছে, কটিদেশ হইতে বস্ত্রও শিথিল হইয়া খসিয়া পড়িয়াছে এবং মুখমণ্ডল এক অপূর্ব্ব দিব্য তেজে উদ্ভাসিত হইযা উঠিয়াছে!—তিনি তখন একেবারে আত্মহারা হইয়া পড়িযাছেন, কাহাকে কি বলিতেছেন তাহার কিছুমাত্র যেন বোধ নাই! আবার ঐ কয়েকটি কথা মাত্র বলিয়াই ভাবের আতিশয্যে তিনি একেবারে নিশ্চেষ্ট নিস্পন্দ হইয়া সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন।

সিদ্ধ বাবাজিকে এপর্য্যন্ত সকলে মান্য ভক্তিই করিয়া আসিয়াছে। তাঁহার বাক্যের প্রতিবাদ করিতে বা তাঁহার দোষ দেখাইয়া দিতে এ পর্য্যন্ত কাহারও সামর্থ্যে বা সাহসে কুলায় নাই। ঠাকুরের ঐরূপ চেষ্টা দেখিয়া তিনি প্রথম বিস্মিত হইলেন; কিন্তু ইতরসাধারণ মানব যেমন ঐরূপ অবস্থায় পড়িলে ক্রোধপরবশ হইয়া প্রতিহিংসা লইতেই প্রবৃত্ত হয় বাবাজির মনে সেরূপ ভাবের উদয় হইল না! তপস্যাপ্রসূত সরলতা তাঁহার সহায় হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথাগুলির যাথার্থ্য হৃদয়ঙ্গম করাইযা দিল। তিনি বুঝিলেন, বাস্তবিকই এজগতে ঈশ্বর ভিন্ন আর দ্বিতীয় কর্ত্তা নাই। অহঙ্কৃত মানব যতই কেন ভাবুক না, সে সকল কার্য্য করিতেছে; বাস্তবিক কিন্তু সে অবস্থার দাস মাত্র; যতটুকু অধিকার তাহাকে দেওয়া হইয়াছে ততটুকু মাত্রই সে বুঝিতে ও করিতে পারে। সংসারী মানব যাহা করে করুক্, ভক্ত সাধকের তিলেকের জন্যও ঐ কথা বিস্মৃত হইয়া থাকা উচিত নহে। উহাতে তাঁহার পথভ্রষ্ট হইয়া পতনের সম্ভাবনা। এইরূপে ঠাকুরের শক্তিপূর্ণ-কথাগুলিতে বাবাজির অন্তর্দৃষ্টি অধিকতর প্রস্ফুটিত হইয়া তাঁহাকে নিজের দোষ দেখাইয়া বিনীত ও নম্র করিল। আবার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শরীরে অপূর্ব্ব ভাববিকাশ দেখিয়া তাঁহার ধারণা হইল ইনি সামান্য পুরুষ নহেন।

পরে ভগবৎপ্রসঙ্গে সেখানে যে এক অপূর্ব্ব দিব্যানন্দের প্রবাহ ছুটিল একথা আমাদের সহজেই অনুমিত হয়। ঐ প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মুহুর্মুহুঃ ভাবাবেশ ও উদ্দাম আনন্দে বাবাজি মোহিত হইয়া দেখিলেন যে

মহাভাবের শাস্ত্রীয় আলোচনা ও ধারণায় তিনি এতকাল কাটাইয়াছেন তাহাই শ্রীরামকৃষ্ণ-শরীরে নিত্য প্রকাশিত। কাজেই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপর তাঁহার ভক্তিশ্রদ্ধা ক্রমে গাঢ় গাঢ়তর হইয়া উঠিল। পরে যখন বাবাজি শুনিলেন ইনিই সেই দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস যিনি কলুটোলার হরিসভায় ভাবাবেশে আত্মহারা হইয়া শ্রীচৈতন্যাসন অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন, তখন—ইঁহাকেই আমি অযথা কটু কাটব্য বলিয়াছি—ভাবিয়া তাঁহার মনে ক্ষোভ ও পরিতাপের অবধি রহিল না। তিনি বিনীত ভাবে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে প্রণাম করিয়া তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। এইরূপে ঠাকুর ও বাবাজির সেদিনকার প্রেমাভিনয় সাঙ্গ হইল, এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবও হৃদয়কে সঙ্গে লইয়া কিছুক্ষণ পরে মথুরের সন্নিধানে আগমন করিয়া ঐ ঘটনার আদ্যোপান্ত তাঁহাকে শুনাইয়া বাবাজির উচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থার অনেক প্রশংসা করিলেন। মথুর বাবুও উহা শুনিয়া বাবাজিকে দর্শন করিতে যাইলেন এবং আশ্রমস্থ দেববিগ্রহের সেবা ও একদিন মহোৎসবাদির জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

স্বামি-শিষ্য-সংবাদ।

[শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এ।]

বেলুড়মঠে।

স্বামীজির এখনো একটু অসুখ আছে। কবিরেজী ঔষধে অনেক উপকার হইয়াছে। সুধু দুধ খেয়ে থাকায় স্বামীজির শরীরে যেন শুভ্র চন্দ্রকান্তি ফুটিয়া বাহির হইতেছে। মুখে যেন শতদল শোভা বিস্তার করিতেছে; সুবিশাল নয়নে যেন স্বর্গের পবিত্র জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইতেছে। পাঠক! সেই অনুপম রূপের ধ্যান করিয়া তোমার কি ত্রিতাপজ্বালা দূর করিবার ইচ্ছা হয় না?

শিষ্য আজ দুদিন হইল মঠেই আছে। স্বামিজীর যথাসাধ্য সেবা করিতেছে।

আজ অমাবস্যা। শিষ্য কানাই মহারাজের সঙ্গে একত্রে স্বামীজির রাত্রি সেবার ভার লইবে স্থির হইয়াছে।

স্বামীজির সেবা করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিল—মশায়, যে আত্মা সর্ব্বগ, সর্ব্বব্যাপী, অণুপরমাণুতে অনুস্যূত তাহার অনুভূতি হয় না কেন?

স্বামীজি—তোর যে চোক আছে তাকি তুই জানিস্? যখন কেহ চোকের কথা বলে তখন'আমার চোক্ আছে'বলে কতকটা ধারণা হয়; আবার চোকে বালি পড়ে যখন চোক কর্ কর্ করে,তখন চোক্ যে আছে তা ঠিক ঠিক ধারণা হয়। সেইরূপ অন্তর হইতে অন্তরতম এই বিরাট্ আত্মার বিষয় সহজে বোধগম্য হয় না। শাস্ত্র বা গুরুমুখে শুনে খানিকটা ধারণা হয় বটে, কিন্তু যখন সংসারের তীব্র শোক দুঃখের কঠোর কশাঘাতে হৃদয় ব্যথিত হয়, যখন আত্মীয় স্বজনের বিয়োগে জীব আপনাকে অবলম্বনশূন্য জ্ঞান করে, যখন ভাবী জীবনের দুরতিক্রমণীয় দুর্ভেদ্য অন্ধকারে তার প্রাণ আকুল হয়, তখনি জীব এই আত্মার দর্শনে উন্মুখ হয়। দুঃখ—আত্মজ্ঞানের অনুকূল, এই জন্য। কিন্তু জ্ঞান থাকা চাই। দুঃখ পেতে পেতে কুকুর বেড়ালের মত যারা মরে তারা কি আর মানুষ? মানুষ হচ্ছে, সেই—যে, এই সুখ দুঃখের দ্বন্দ্ব প্রতিঘাতে অস্থির হয়েও বিচার বলে ঐ সকলকে নশ্বর ধারণা করে আত্মরতিপর হয়। মানুষে ও অন্য জীব জানোয়ারে এইটুকু প্রভেদ। যে জিনীসটা যত নিকটে হয় তার তত কম অনুভূতি হয়। আত্মা তোর অন্তর হ'তে অন্তরতম, তাই অমনস্ক চঞ্চলচিত্ত জীব তার সন্ধান পায় না। কিন্তু সমনস্ক শান্ত ও জিতেন্দ্রিয় বিচারশীল জীব বহির্জগৎ উপেক্ষা করে অন্তর্জগতে প্রবেশ করিতে করিতে কালে এই আত্মার মহিমা উপলব্ধি ক'রে গৌরবান্বিত হয়। তখনি সে আত্মজ্ঞান লাভ করে; আমিই সেই আত্মা—"তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো" একথা প্রত্যক্ষ অনুভব করে, বুঝলি?

শিষ্য—হাঁ। কিন্তু এ দুঃখ কষ্ট তাড়নার মধ্য দিয়া আত্মজ্ঞান লাভের ব্যবস্থা কেন? সৃষ্টি না হলেই তো বেশ ছিল। আমরা সকলেই তো এককালে ব্রহ্মে বর্ত্তমান ছিলাম। ব্রহ্মের এইরূপ সিসৃক্ষাই বা কেন? আর, এই দ্বন্দ্ব ঘাতপ্রতিঘাতে সাক্ষাৎ ব্রহ্মরূপ জীবের এই জনম-মরণ-সঙ্কুল পথে গতাগতিই বা কেন?

স্বামীজি—লোকে মাতাল হলে কত খেয়াল দেখে। কিন্তু নেশা যখন ছুটে যায় তখন সেগুলো মাথার ভুল বলে বুঝ্‌তে পারে। অনাদি অথচ

শাস্ত্র এই অজ্ঞান বিলসিত সৃষ্টি ফৃষ্টি যা কিছু দেখছিস্ তা তোর মাতাল অবস্থার কথা; নেশা ছুটে গেলে তোর ঐ সব প্রশ্নই থাক্‌বেনা।

শিষ্য—মশায়, তবে কি সৃষ্টি স্থিত্যাদি কিছুই নাই?

স্বামীজি—থাক্‌বে না কেন রে? যতক্ষণ তুই এই দেহবুদ্ধি ধরে 'আমি আমি' কচ্ছিস্ ততক্ষণ এ সবই আছে। আর, যখন তুই বিদেহ, আত্মরতি, আত্মক্রীড়—তখন তোর পক্ষে এ সব কিছু থাক্‌বে না; সৃষ্টি, জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতি আছে কিনা—এ প্রশ্নেও তখন আর অবসর থাকবে না। তখন তোকে বল্‌তে হবে।

ক্ক গতং কেন বা নীতং কুত্রলীনমিদং জগৎ
অধুনৈব প্রতিভাতি নাস্তি কিমহদদ্ভুতং॥

শিষ্য—জগতের জ্ঞান একেবারে না থাক্‌লে "কুত্রলীনমিদং জগৎ" কথাই বা কিরূপে বলা যেতে পারে?

স্বামীজি—ওরে 'ওটা যে ভাষায় প্রকাশ কত্তে হচ্ছে। যেখানে ভাব ভাষার প্রবেশাধিকার নাই তাই তুই ভাব ভাষায় প্রকাশ কত্তে যাচ্ছিস্ কিনা; তাই জগৎ কথা যা নিঃশেষ মিথ্যা তাই ব্যাবহারিকরূপে বল্‌ছিস্; পারমার্থিক সত্বা নয়; সে এক "ব্রহ্ম অবাঙ্ মনসগোচরম্"।

শিষ্য বুঝিয়া অবাক্ হইয়াছে। স্বামীজি বল্‌ছেন "বল্, তোর আর কি বল্‌বার আছে। আজ তোর তর্ক নিরস্ত করে দেবো।" শিষ্য কোন কথা কহিতেছে না দেখিয়া বলিলেন "তবে তামাক নিয়ে আয়"।

শিষ্য উঠিয়া তামাক সাজিতে যাইতেছে এমন সময় স্বামীজি আবার বারণ করে বল্‌লেন "না তুই বো'স্। আর কেউ যাক্। তোদের আবার কর্ম্ম ফর্ম্ম কি? অনেক জন্মে অনেক কর্ম্ম করে এসে এবার তোদের আত্মার দিকে নজর পড়েছে। তোকে আর কর্ম্ম কত্তে হবে না। যারে কানাই, তামাক সেজে নিয়ে আয়।

স্বামী নির্ভয়ানন্দ কল্‌কে লইয়া তামাক সাজিতে গেলেন। স্বামীজি শিষ্যের পানে স্নেহ দৃষ্টিতে দেখিতে দেখিতে বলিতেছেন 'তোর যা ইচ্ছা হয় এই বেলা ভোগ করে নে। আমার আশীর্ব্বাদে তুই নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত হয়ে এবার বিদ্যাঅবিদ্যার পারে চলে যাবি।

শিষ্য স্বামীজির কথা ঠিক হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া স্বামীজির মুখ

পানে তাকাইয়া রহিয়াছে। এই সৌম্যমূর্ত্তির ধ্যানে আপনাকে সফল-জন্মা বলিয়া মনে করিতেছে।

সন্ধ্যার আরাত্রিকের ঘণ্টা ঠাকুর ঘরে বাজিয়া উঠিয়াছে। সকলেই ঠাকুর ঘরে গিয়াছেন। কেবল শিষ্য স্বামীজির ঘরে বসিয়া আছে। স্বামীজি বল্লেন "ঠাকুরঘরে গেলিনি?"

শিষ্য—আমার এখানে থাকিতেই বেশ ভাল লাগিতেছে।

স্বামীজি—তবে থাক, যেয়ে কাজ নাই।

শিষ্য—আজ অমাবস্যা; আঁধারে চারিদিক্ ছাইয়া ফেলিয়াছে। আজ কালী পূজার দিন।

স্বামীজি শিষ্যের ঐ কথায় কিছু না বলিয়া জানালা দিয়া পূর্ব্বাকাশের পানে এক দৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকাইয়া বল্লেন "দেখ্‌ছিস্, অন্ধকারের কি এক অদ্ভুত গম্ভীর শোভা!"

শিষ্য তাঁহার কথা ভাল বুঝিতে না পারিয়া নির্ব্বাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, স্বামীজিও সেই গভীর তিমির রাশির মধ্যে কি যেন দেখিতে দেখিতে এমন স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন, যেন জড়!—হস্ত পদের স্পন্দন নাই। মহাযোগী মহেশ্বর যেন লীলাময়ী মহাকালীর ভাবে আত্মহারা হইয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিয়াছেন!

স্বামীজির এই অদৃষ্ট-পূর্ব্ব গাম্ভীর্য্য দেখিয়া শিষ্য ভয় পাইয়া স্বামীজিকে ডাকিতেছে কিন্তু কোন সাড়া শব্দ নাই! কেবল দূরে ঠাকুরঘরে ভক্তগণ পঠিত শ্রীরামকৃষ্ণ-স্তব শিষ্যের কর্ণগোচর হইতেছে মাত্র। কিছুক্ষণ এইরূপে গত হইবার পর স্বামীজি কিন্নরকণ্ঠে আস্তে আস্তে গাহিতে লাগিলেন—"নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে অরূপ রাশি" ইত্যাদি।

গীত সাঙ্গ হইলে স্বামীজি ঘরে প্রবেশ করিয়া উপবিষ্ট হইলেন এবং মধ্যে মধ্যে 'মা' 'মা' 'কালী' 'কালী' বলিতে লাগিলেন। ঘরে, তখন আর কেহই নাই। কেবল শিষ্য স্বামীজির আজ্ঞা পালনের জন্য সাবহিত হইয়া অবস্থান করিতেছে।

স্বামীজির সে সময়ের মুখ দেখিয়া শিষ্যের বোধ হইতেছে তিনি যেন কোন অগাধ সমুদ্রের ভিতর হইতে সবে মাত্র উত্থিত হইয়াছেন—ঘন ঘন শ্বাস বহিতেছে। মুখে অন্য কোন কথাই নাই। অমাবস্যার অন্ধকার যেন স্বামীজির মুখের গাম্ভীর্য্যের সহিত মিশিয়া স্বামীজির গৃহাভ্যন্তরস্থ আকাশকে

"স্তিমিত সলিল রাশি প্রখ্যমাখ্যাবিহীনং" করিয়া তুলিয়াছে। শিষ্য চঞ্চল। স্বামীজির এই অদৃষ্টপূর্ব্ব গাম্ভীর্য্যে শিষ্যের হৃদয় বিচলিত হইয়াছে। শিষ্য ভীত হইয়া বলিল—"মশায়, এইবার কথাবার্ত্তা ক'ন; গল্প টল্প করুন। আমাদের কালী ফালীতে কাজ নাই।"

স্বামীজি তাহাতে মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে সস্নেহে শিষ্যকে বল্লেন,"যার লীলাই এত মধুর, সেই আত্মার সৌন্দর্য্য ও গাম্ভীর্য্য কত দূর বল্ দিকি? শিষ্য কিছু হৃদয়ঙ্গম না করিতে পারিয়া বলিল—"মশায়, ও সবে এখন আর দরকার নাই; কেনই বা আজ আপনাকে অমাবস্যা ও কালীপূজার কথা বলিলাম—সেই অবধি আপনার যেন কেমন একটা পরিবর্ত্তন হয়ে গেল।"

স্বামীজি শিষ্যের ভাবগতিক দেখিয়া বলিলেন—ওসব কিছু নয়, গান শুন্‌বি? এই বলিয়া গান ধরিলেন—

"কখন কি রঙ্গে থাক মা শ্যামা সুধা তরঙ্গিনি" ইত্যাদি।

গানসমাপ্তি হইলে স্বামীজি বলিতে লাগিলেন—"এই কালীই লীলারূপি ব্রহ্ম। ঠাকুরের কথা সাপ চলা আর সাপের স্থির ভাব' শুনিস্ নি?"

শিষ্য—আজ্ঞে হাঁ।

স্বামীজি—এবার ভাল হয়ে মাকে রুধির দিয়ে পূজা করবো। তোর রঘুনন্দন না বলেছেন "নবম্যাং পূজয়েৎ দেবীং কৃত্বা রুধির কর্দ্দমং"। এবার তাই করবো। রুধির নইলে কি মার তৃপ্তি হয়? মাকে বুকের রক্ত দিয়ে পূজা কত্তে হয়; তবে যদি তিনি প্রসন্না হন। একি আলোচাল আর কাঁচকলার কর্ম্ম। মার ছেলে বীর হবে—মহাবীর হবে। নিরানন্দে, দুঃখে, প্রলয়ে, মহালয়ে মায়ের ছেলে অতি নির্ভীক হয়ে থাক্‌বে। আর তোর ফুলের মালা, স্রক্ চন্দন গন্ধমাল্য মায়ের পূজায় ছায়া মাত্র বুঝ্‌লি?

এইরূপ কথা হইতেছে এমন সময় নীচে প্রসাদের ঘণ্টা বাজিল। স্বামীজি শুনিয়া বলিলেন—"যা নীচে প্রসাদ পেয়ে শীগ্‌গির আসিস্, শিষ্যও নীচে গেল।

আচার্য্য শঙ্কর ও চৈতন্যদেবের মত তুলনা

[শ্রীরাজেন্দ্র নাথ ঘোষ।]

আচার্য্য শঙ্করের জ্ঞানের যাহা চরম ফল এবং গৌড়ীয় গোস্বামী প্রভু পাদগণের ভক্তির যাহা অন্তিম ভাব এই দুইটী মিলাইয়া দেখিলে কিরূপ বোধ হয় এই প্রবন্ধে তাহাই আলোচ্য। এ প্রসঙ্গে পাশ্চাত্য পণ্ডিত হেগেলের মতানুযায়ী অদ্বৈত বাদের বিরুদ্ধে কতিপয় আপত্তিও বিচারিত হইবে। কারণ আজ কাল এই ভাবের কথা অনেকেরই মুখে শুনা যায়। যাহা হউক এই বিষয়টী আমরা দুই প্রকারে আলোচনা করিব। প্রথম, শাস্ত্র দৃষ্টিতে; দ্বিতীয়, বিচার দৃষ্টিতে। তন্মধ্যে শাস্ত্র দৃষ্টিতে যেরূপ বোধ হয় তাহা এই;—

গৌড়ীয় সিদ্ধান্তে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে যাহা নির্গত তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম প্রমাণ। এ মতটী তাঁহারই উপদেশ ও ইঙ্গিতের উপর নির্ভর করে, এ মতের যাহা কিছু সবই তিনি। তাঁহার কথাতেই দেখা যায় যে, জীবের সহিত ভগবান্‌কে অভিন্ন জ্ঞান করা মহা পাপ, জীব প্রাণান্তে ভগবৎ সকাশে সাযুজ্য প্রার্থী হইতে চাহিবে না। যথা;—

সাযুজ্য শুনিতে ভক্তের হয় ঘৃণা ভয়। নরক বাঞ্ছয়ে তবু সাযুজ্য না লয়॥ চ, চ, মধ্য ৬ষ্ঠ। এবং ভক্তের যিনি ভগবান্ তিনি জ্ঞানীর ব্রহ্মের অভ্যন্তরে ব্রহ্ম অপেক্ষা উৎকৃষ্টতত্ত্ব সেই আনন্দ-ঘন রসময় মূর্ত্তি। ব্রহ্ম তাঁহার অঙ্গের কান্তি। সূর্য্যের যেমন মণ্ডল ও কিরণ, তদ্রূপ সেই রসময় মূর্ত্তি সূর্য্যমণ্ডল, এবং ব্রহ্ম তাহার কিরণ। যথা;—

> যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা।
> য আত্মান্তর্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবিভবঃ॥
> ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ম্।
> ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ॥

স্বরূপ দামোদর করচা।

> যস্য ব্রহ্মেতি সংজ্ঞাং ক্বচিদপি নিগমে যাতি চিন্মাত্র সত্তা
> প্যংশো যস্যাংশকৈঃ স্বৈর্বিভবতি বশয়ন্নেব মায়াং পুমাংশ্চ
> একং যস্যৈব রূপং বিলসতি পরমব্যোম্নি নারায়ণাখ্যং
> স শ্রীকৃষ্ণো বিধত্তাং স্বয়মিহ ভগবান্ প্রেমতৎ পাদভাজাম্॥

তত্ত্ব সন্দর্ভ।

যস্য প্রভা, প্রভবতো জগদণ্ড কোটি,
কোটিষ্বশেষ বসুধাদি বিভূতি ভিন্নম্।
তদ্ ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

ব্রহ্ম সংহিতা।

কিন্তু যদি ঐক্য দৃষ্টিতে দেখা যায় তাহা হইলে সম্ভবতঃ যেরূপ প্রতীত হইবে তাহা এই ;—শঙ্করের জ্ঞানের শেষ ব্রহ্ম বস্তুতে একেবারে মিশিয়া যাওয়া। তবে যতদিন দেহ থাকিবে ততদিন সবিকল্পক সমাধিতে সর্ব্ব বস্তুতে ব্রহ্ম দর্শন হইয়া থাকে। যথা ,—জ্ঞাত জ্ঞানাদি-বিকল্পালয়ানপেক্ষয়াদ্বিতীয় বস্তুনি তদাকারা কারিতায়া শ্চিত্তবৃত্তেরবস্থানম্ ॥ অর্থাৎ সবিকল্প সমাধিতে জ্ঞাতা-জ্ঞান-জ্ঞেয় এই বিকল্প ত্রয়ের জ্ঞান সত্বেও অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বস্তুতে অখণ্ডাকারে আকারিত চিত্তবৃত্তির অবস্থান বুঝায়। "তদামৃন্ময় গজাদি ভাণেঽপি মৃদ্-ভাণবৎ দ্বৈতভাণেঽপি অদ্বৈতং বস্তু ভাসতে ॥" অর্থাৎ তখন মৃন্ময় হস্তীতে হস্তিজ্ঞান সত্বেও মৃত্তিকা জ্ঞান যেমন থাকে তদ্রূপ দ্বৈতজ্ঞান সত্বেও অদ্বৈত জ্ঞান স্ফূর্ত্তি পায়। (বেদান্তসার)

নির্ব্বিকল্পক সমাধিতে আত্যন্তিক ঐক্য স্বীকৃত হইয়া থাকে। যথা ;—"জ্ঞাতৃ জ্ঞানাদি ভেদলয়াপেক্ষয়াঽদ্বিতীয় বস্তুনি তদাকারাকারিতায়া বুদ্ধি বৃত্তেরতিতরা মেকীভাবেনাবস্থানম্ ॥" অর্থাৎ তখন জ্ঞাতা-জ্ঞান-জ্ঞেয় এই বিকল্পত্রয় জ্ঞানের অভাবে অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুতে অত্যন্ত একীভূত হইয়া অবস্থান করে। (বেদান্তসার)

তৎপরে দেহান্তে, ব্রহ্মে নির্ব্বাণ লাভ হইয়া থাকে। যথা ;—

এষা ব্রাহ্মীস্থিতী পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাস্যামন্ত কালেঽপি ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি ॥ গীতা ২ অঃ, ৭১ শ্লোকে।

অর্থাৎ হে পার্থ! ইহাই ব্রাহ্মীস্থিতি। লোকে ইহাকে পাইয়া বিমুগ্ধ হয়না। এই ভাবে অন্তকাল পর্য্যন্ত থাকিতে পারিলে ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ লাভ হয়।

পক্ষান্তরে গৌড়ীয় সিদ্ধান্তানুসারে জীবের যাহা চরম লক্ষ্য তাহা ব্রজ-গোপীগণের ভাবানুকরণে শ্রীকৃষ্ণপ্রেম লাভ। ব্রজগোপীগণের মধ্যে শ্রীরাধাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সুতরাং তাঁহার ভাবই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণসহ কখন মিলিত হন কখন বা আবার অমিলিত হন। মিলন বা সম্ভোগ কালে

শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণসহ এক হইয়া যান, যেন দুইটী মনকে পিশিয়া মিশাইয়া ফেলা হয়। যথা ;—

না সো রমণ না হাম্ রমণী। দুহুঁ মন মনোভব পেষল মানি॥" চৈতন্য চরিতামৃত, মধ্যলীলা, রায় রামানন্দ প্রসঙ্গ।

"রামানন্দ চরণৌ ধৃত্বা—সখি ন স রমণো নাহং রমণীতি ভিদাবয়োরাস্তে প্রেমরসেনোভয় মন ইব মদনো নিষ্পিপেষ বলাৎ। অথবা ;—

অহং কান্তাকান্তস্ত্বমিতি নতদানীং মতিরভূন্মনোবৃত্তিলুপ্তা ত্বমহমিতি নৌ ধীরপিহতা। ভবান্ ভর্ত্তা ভার্য্যাহমিতি যদিদানীং ব্যবসিতি স্তথাপি প্রাণানাং স্থিতিরিতিবিচিত্রং কিমপরম্॥ চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক,৭ অঙ্ক, ১৫।১৬ সংখ্যক অংশ দ্রষ্টব্য।

অর্থাৎ তিনি পুরুষও নহেন আর আমি রমণীও নহি। দুটী মনকে মদন পিশিয়া যেন এক করিয়া দিযাছে। অথবা আমি কান্তা, তুমি কান্ত, তখন এরূপ বুদ্ধি থাকে না, তখন মনোবৃত্তি লুপ্ত হয, তখন "তুমি আমি" আমাদের এ বুদ্ধি অপহৃত হয়। কিন্তু এখনও যে আপনি ভর্ত্তা ও আমি ভার্য্যা অথবা আমাদের প্রাণ যে এখনও রহিযাছে, ইহাই অত্যন্ত বিচিত্র ব্যাপার।

বিরহ কালে তিনি যাহা দেখেন তাহাতেই তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি হয়, কখন বা নিজেই নিজেকে শ্রীকৃষ্ণ বলিযা জ্ঞান করিয়া থাকেন। যথা ;—

"কৃষ্ণময়ী"—কৃষ্ণ যাঁর ভিতরে বাহিরে। যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে॥ উদঘূর্ণা বিরহ চেষ্টা দিব্যোন্মাদ নাম। বিরহে কৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি আপনাকে কৃষ্ণ জ্ঞান। মধ্য, ২৩ অঃ।

অন্যান্য গোপীগণ, রাধা কৃষ্ণের ভাবের সহায়তা করিয়া চরিতার্থতা লাভ করেন। কিন্তু আত্ম চরিতার্থতা তাঁহাদের লক্ষ্য নহে, উহা তাঁহারা না চাহিলেও হইয়া থাকে।

জীব, এই গোপী ভাবের অনুকরণে শ্রীকৃষ্ণভজন করিতে করিতে ব্রজে সিদ্ধ দেহ লাভ করিয়া চিরকাল শ্রীকৃষ্ণসেবা করিতে থাকেন। জীবের ইহাই পরম পুরুষার্থ। যথা ;—

সেই গোপীভাবামৃতে যার লোভ হয়। বেদধর্ম্ম সর্ব্বত্যজি সেই কৃষ্ণে ভজয়॥
রাগানুগমার্গে তারে ভজে যেই জন। সেই জন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্র নন্দন॥
ব্রজলোকের কোন ভাব লইয়া যেই ভজে। ভাবযোগ্য দেহ পাইয়া কৃষ্ণে পায় ব্রজে॥

অতএব গোপীভাব করি অঙ্গীকার। রাত্রি দিন চিন্তে রাধাকৃষ্ণের বিহার॥
সিদ্ধ দেহ চিন্তি করে তাঁহাই সেবন। সখীভাবে পায় রাধা কৃষ্ণের চরণ॥

মধ্য, ৮ম।

এই গোপীগণ শ্রীরাধার কায়ব্যূহরূপ। যথা;—

মহাভাব চিন্তামণি রাধার স্বরূপ। ললিতাদি সখি তার কায়ব্যূহরূপ॥

মধ্য, ৮ম।

কায়ব্যূহ শব্দটী একটু অপ্রচলিত। ইহার অর্থ—একজন যদি একই কালে বিভিন্ন প্রকারের বহু ভিন্ন দেহ ধারণ করে তাহা হইলে সেই ভিন্ন দেহগুলি কায়ব্যূহ শব্দে অভিহিত করা হইয়া থাকে। জীবের উন্নতির গতি এই পর্য্যন্ত, জীব চরমে শ্রীরাধিকার কায়ব্যূহত্ব পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারে।

যাহা হউক এক্ষণে জীবভাব ও রাধাভাব কি জানিতে পারিলে বুঝা যাইবে জীবের উক্ত উন্নতির সীমার সহিত শ্রীকৃষ্ণের কি সম্বন্ধ। সুতরাং অগ্রে দেখা যাউক শ্রীরাধার স্বরূপ কি? কিন্তু শ্রীরাধার স্বরূপ বর্ণনা করিতে হইলে অগ্রে শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ কি বর্ণনা করা প্রয়োজন। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপ হইতে আরম্ভ করিয়া একে একে শ্রীরাধা ও জীবের স্বরূপ-তত্ত্ব আলোচনা করা যাউক। চরিতামৃতে শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ নানাস্থলে নানা প্রকারে কথিত হইয়াছে, তন্মধ্যে কতিপয় যথা;—

ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্। সর্ব্ব অবতারী সর্ব্ব কারণ প্রধান॥
অনন্ত বৈকুণ্ঠ আর অনন্ত অবতার। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ইহা সবার আধার॥
সচ্চিদানন্দ তনু ব্রজেন্দ্রনন্দন। সর্ব্বৈশ্বর্য্য সর্ব্বশক্তি সর্ব্বরস পূর্ণ॥
বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন। কামগায়ত্রী কামবীজে যার উপাসন॥
পুরুষ যোষিৎ কিবা স্থাবর জঙ্গম। সর্ব্বচিত্তাকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথ মদন॥
নানা ভক্তের রসামৃত নানাবিধ হয়। সেই সব রসামৃতের বিষয় আশ্রয়॥
শৃঙ্গার রসরাজময় মূর্ত্তিধর। অতএব আত্ম পর্য্যন্ত সর্ব্ব চিত্ত হর॥
লক্ষ্মী কান্তাদি অবতারের হরে মন; লক্ষ্মী আদি নারীগণের করে আকর্ষণ॥
আপন মাধুর্য্যে হরে আপনার মন। আপনা আপনি চাহে করিতে আলিঙ্গন॥

এইত সংক্ষেপে কহিল কৃষ্ণের স্বরূপ।
এবে সংক্ষেপে কহি রাধার তত্ত্বরূপ॥

এইবার শ্রীরাধার স্বরূপ কি দেখা যাউক;—

কৃষ্ণের অনন্ত শক্তি তাতে তিন প্রধান। চিচ্ছক্তি মায়াশক্তি জীবশক্তি নাম॥
অন্তরঙ্গা বহিরঙ্গা তটস্থা কহি যারে। অন্তরঙ্গাস্বরূপ শক্তি সবার উপরে॥
সচ্চিৎআনন্দময় কৃষ্ণের স্বরূপ। অতএব স্বরূপশক্তি হয় তিন রূপ॥
আনন্দাংশে হলাদিনী সদংশে সন্ধিনী। চিদংশে সম্বিৎ যারে জ্ঞান করি মানি॥
কৃষ্ণকে আহ্লাদে তাতে নাম হ্লাদিনী। সেই শক্তিদ্বারে সুখ আস্বাদে আপনি॥
সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন। ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ॥
হ্লাদিনীর সার অংশ তার প্রেম নাম। আনন্দ চিন্ময় রস তার প্রেমের আখ্যান॥
প্রেমের পরম সার মহাভাব জানি। সেই মহাভাব রূপা রাধা ঠাকুরাণী॥
কৃষ্ণ বাঞ্ছা পূর্ণ করে এই কার্য্য যার। সেই মহা ভাব হয় চিন্তামণি সার॥
মহাভাবচিন্তামণি রাধার স্বরূপ॥

তাহার পর জীবের স্বরূপ যথা;—

জীবশক্তি তটস্থাখ্য নাহি যার অন্ত। সভার আশ্রয় কৃষ্ণ কৃষ্ণে সভার স্থিতি॥
জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস। কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ॥
সূর্য্যাংশ কিরণ যৈছে অগ্নি জ্বালাময়। স্বাভাবিক কৃষ্ণের তিন শক্তি হয়॥

সুতরাং দেখা যাইতেছে সেই অদ্বয় তত্ত্বের ত্রিবিধ শক্তি; যথা, প্রথম—অন্তরঙ্গা, দ্বিতীয়—তটস্থা ও তৃতীয়—বহিরঙ্গা শক্তি। শ্রীরাধা ও গোপীগণ অন্তরঙ্গা শক্তি, জীবনিচয় তটস্থা শক্তি, এবং জড় জগৎ বহিরঙ্গা শক্তি। তটস্থা শক্তি জীব, গোপীভাবের অনুগামী সাধনাবলে অন্তিমে গোপীভাব বা অন্তরঙ্গা শক্তির ন্যায় অপার নিত্য আনন্দ ভোগ করিতে থাকে। এ সময় শ্রীরাধিকার ন্যায় জীব সর্ব্বত্র ভগবান্‌কেই দর্শন করিয়া থাকে, ভগবদ্ভিন্ন অন্য বস্তু তাহার ইন্দ্রিয়গোচর হয় না। যথা;—

মহাভাগবত দেখে স্থাবর জঙ্গম। তাহা তাহা হয় তাঁর শ্রীকৃষ্ণ স্ফুরণ॥
স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তাঁর মূর্ত্তি। সর্ব্বত্রে হয় নিজ ইষ্টদেব স্ফূর্ত্তি॥
সিদ্ধ দেহ চিন্তি করে তাঁহাই সেবন। সখী ভাবে পায় রাধাকৃষ্ণের চরণ॥

মধ্য, ৮ম।

অন্য সময়ে জীব ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির অভিমুখী হইয়া সংসার করে এবং ভক্তিসাধনবলে অন্তরঙ্গা শক্তির অভিমুখী হইয়া অনন্ত সুখ ভোগ করে। এই মাত্র প্রভেদ। সুতরাং উভয় সম্প্রদায়ের ঐক্য পক্ষে দেখা গেল, শঙ্করমতে সবিকল্পক সমাধিতে যেমন সাধক সর্ব্ব

বস্তুতে ব্রহ্মবস্তুকে অনুস্যূত দর্শন করেন, তদ্রূপ গৌড়ীয় সিদ্ধান্তেও মহা-ভাগবত সর্ব্বত্র ব্রহ্ম দর্শন করিয়া থাকেন, এবং অনৈক্য পক্ষে দেখা যায় যে, তাঁহার ইষ্টদেব উক্ত সর্ব্ব বস্তুতে অনুস্যূত শঙ্করের মতের ব্রহ্মবস্তুরও মধ্যে আনন্দ ঘন রসময় মূর্ত্তি। দেহান্তে শঙ্করমতে যেমন ব্রহ্মতত্বে মিশিয়া যাওয়া বুঝায় গৌড়ীয় মতে তদ্রূপ সিদ্ধ দেহে তটস্থাশক্তি জীব অন্তরঙ্গা শক্তির ন্যায় চিরকাল ভগবৎ সমীপে থাকিয়া ভগবৎ সেবা করিয়া থাকে। সাধা-রণতঃ গোস্বামীপাদগণ, জীবের চরম এই পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু অনেকেই আবার সিদ্ধ দেহে জীবের তটস্থা শক্তিত্ব ঘুচাইয়া অন্তরঙ্গা শক্তি স্বীকার করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে জীব এই অন্তরঙ্গাশক্তিত্ব লাভ করিলে শ্রীরাধাঠাকুরাণীর সখী হইয়া যান। কিন্তু আবার কেহ কেহ জীবের শ্রীরাধাত্ব প্রাপ্তি পর্য্যন্ত সম্ভব বলিয়া বিবেচনা করেন। বস্তুতঃ এই শেষ পক্ষটী, বোধ হয়, শঙ্করমতের খুব নিকটবর্ত্তী। গৌড়ীয় মতের আচার্য্য শ্রীরূপের গ্রন্থমধ্যেই এ কথার আভাস পাওয়া যায়। উজ্জ্বল নীলমণি গ্রন্থে যথায় শ্রীপাদ রূপগোস্বামী মহাশয় সমর্থা রতির পরিচয় প্রদান করি-তেছেন তথায় বলিতেছেন যে,

ইয়মেবরতিঃ প্রৌঢ়া মহাভাব দশাং ব্রজেৎ।
যা মৃগ্যা স্যাদ্বিমুক্তাণাং ভক্তানাং চ বরীয়সাম্। ৪২
(স্থায়ী ভাব প্রকরণ)

অর্থাৎ—এই প্রৌঢ়া রতি মহাভাব দশায় লইয়া যায়। শ্রেষ্ঠ ভক্ত ও মুক্তগণের ইহা মৃগ্যা অর্থাৎ অন্বেষণীয় বিষয়। ও দিকে শ্রীরাধাই যে মাহাভাব স্বরূ-পিণী তাহা সকলেই অবগত আছেন। এজন্য এরতি শ্রীরাধাঠাকুরাণীর ভাব। এখানে ইহা জীবের হয় না একথা বলা হয় নাই, কিন্তু শ্রীজীব গোস্বামী মহাশয় মৃগ্যা শব্দের অন্বেষণীয় অর্থ স্বীকার করিয়াও ন তু প্রাপ্যা এই কথাটুকু যোগ করিয়া দিয়াছেন। আচার্য্য শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় এস্থলে"ও কথা শ্রীজীব বলেন"বলিয়া স্বয়ং নিস্তব্ধ রহিলেন; যেন মনে তাঁহার অন্য কিছু ভাব লুকাইয়া রহিল। তিনি তাঁহার টীকামধ্যে এ বিষয়ে এই ভাবে লিখিয়াছেন যথা;—মৃগ্যেব ন তু প্রাপ্যা তন্মার্গণ পরিপাটীনাং দুর্ব্বোধত্বাৎ ইতি শ্রীজীব গোস্বামী চরণাঃ। সাধারণতঃ গোস্বামী প্রভু-পাদগণ জীবের শ্রীরাধাত্ব প্রাপ্তি স্বীকার না করিলেও শ্রীরূপের লেখায় এ কথা প্রকাশ পায় নাই। তাঁহার গ্রন্থের অস্থিমজ্জায় বরং তদ্বিপরীত

কথাই আছে বলিয়া বোধ হয়। তাহার পর বিশ্বনাথ নিজ গ্রন্থ ভক্তি-রসামৃত-সিন্ধু-বিন্দুতে স্পষ্ট ভাবেই লিখিয়াছেন যে "তদা দ্বারকায়াং রুক্মিণ্যাদিত্ব প্রাপ্নোতি" অর্থাৎ তখন দ্বারকাতে জীব রুক্মিণী আদির পদবী লাভ করেন। সুতরাং বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে যে,শ্রীজীবের সময় হইতে জীবের শ্রীরাধাপ্রাপ্তি ঘটে কি না এবিষয়ে একটী মত ভেদের সূত্রপাত হইয়াছিল, এবং এই মত ভেদের এক পক্ষে শ্রীজীবের কিছু পরে শ্রীবিশ্বনাথ ছিলেন। কিন্তু শ্রীজীবের ইহা অন্তরের কথা কি না তাহা বলিবার পক্ষে সন্দেহও যথেষ্ট বিদ্যমান। কারণ বিশ্বনাথ স্বকীয় ও পরকীয় রস বিচারে শ্রীজীবের লেখা হইতে এমন এক কথা বাহির করিয়াছেন যাহাতে স্পষ্ট প্রতীত হয় যে. শ্রীজীবের অনেক কথা যে পরেচ্ছা প্রণোদিত তাহাতে আর সন্দেহ নাই। শ্রীজীবের সে কথাটী এই ;—

"স্বেচ্ছয়া লিখিতঃ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদত্র পরেচ্ছয়া।
যৎ পূর্ব্বোপরসম্বন্ধং তৎ পূর্ব্বমপরং পরমিতি।"

অধিক কি শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয়ও চরিতামৃতে কোথাও এমন কথা লেখেন নাই যে, জীব শ্রীরাধা হয় না অথবা শ্রীরাধায় মিশিয়া যায় না। তাঁহার লেখার ভিতর—

"সিদ্ধ দেহ চিন্তি করে তাঁহাই সেবন।
সখীভাবে পায় রাধা কৃষ্ণের চরণ॥

চ, চ, মধ্য, ৮ম।

একথা আছে সত্য কিন্তু এতদ্দ্বারা শ্রীরাধাভাব জীবের হয় না, এ কথা প্রমাণ হয় না। বরং "সাযুজ্য শুনিতে ভক্তের হয় ঘৃণা ভয়। নরক বাঞ্ছয়ে তবু সাযুজ্য না লয়" এই কথায় এইই প্রমাণ হয় যে সাযুজ্য অসম্ভব পদার্থ নয়। আবার যদি সর্ব্বজননমস্য শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের "কবে বৃষভানুপুরে, আহিরী গোপের ঘরে, তনয়া হইয়া জনমিব" কথাটী স্মরণ করা যায় তাহা হইলে ও সন্দেহ আদৌ স্থান পাইবার যোগ্য নহে বলিয়া বোধ হয়।

যাহা হউক এক্ষণে আমরা বিচার দৃষ্টিতে দেখিব এই উভয় মতের যাহা প্রধান অনৈক্য অংশ তাহার অবস্থা কিরূপ। এ বিষয়টী একে একে ধীর ভাবে আলোচনা করা উচিত। এ জন্য নিয়ে আমরা প্রধান অনৈক্য অংশের পূর্ণমাত্রা অবলম্বনে একটী তালিকা সঙ্কলন এবং তদনুসারে এ বিষয়টী বিচার করিব।

১ম। জীবতটস্থাশক্তি, কখন অন্তরঙ্গা শক্তিত্ব লাভ করিবে না।

২য়। শক্তি ও শক্তিমানের ভেদাভেদ সম্বন্ধ সাহায্যে ভগবৎ সেবা প্রভৃতি স্বীকার্য্য।

৩য়। শঙ্করমতের যে ব্রহ্ম বস্তু, গৌড়ীয় মতে তাহারও অভ্যন্তরে আনন্দ-ঘনমূর্ত্তি বিরাজমান।

এক্ষণে আমরা এতদনুসারে একে একে এই তিনটী বিষয় আলোচনা করিয়া দেখিব এই উভয়মতের পার্থক্য কিরূপ।

১ম, জীবের তটস্থাশক্তিত্ব। উভয় সম্প্রদায়ই মূলতত্ত্বের অদ্বয়ত্ব লইয়া কোন বিবাদ করেন না। কিন্তু শঙ্করমতে জীবের সহিত ব্রহ্মের যেরূপ অভেদ সম্বন্ধ স্বীকার করা হয় মহাপ্রভুমতে তাহা স্বীকৃত হয় না। তাঁহার মতে জীব ভগবানের নিত্য তটস্থাশক্তি বলিয়া কোন কালে ভগবানে অন্তরঙ্গা শক্তির ন্যায় মিশিয়া যাইবে না। ইহা চিরকাল, শক্তি ও শক্তিমানের যেরূপ ভেদাভেদ সম্বন্ধ, সেই ভাবে ভিন্নাভিন্নরূপে তটস্থা হইয়া থাকিতে বাধ্য। এখন এস্থলে, প্রথমতঃ, অদ্বৈতবাদিগণ সেই অদ্বয় তত্ত্বে তটস্থা, বহিরঙ্গা ও অন্তরঙ্গা প্রভৃতি শক্তিভেদ স্বীকার করিতে চাহেন না এবং তৎপরে পরমার্থিক অবস্থায় শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ সম্বন্ধ গ্রহণ করিতে চাহেন। তাঁহারা বলেন অদ্বয়তত্ত্বে শক্তিভেদ অসম্ভব, কারণ "তটস্থা" এই শব্দটীর প্রতিই যদি লক্ষ্য করা যায় তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, ইহা নদীর তটের ন্যায় সেই অদ্বয় তত্ত্বের সহিত চিরসংলগ্ন,এবং সন্নিহিত প্রদেশে স্থিত। "তট", "জলপ্রবাহ"এবং"তটভিন্ন বহির্দ্দেশ" ব্যতীত যেমন নদীর নদীত্বই সম্ভব নহে, এস্থলেও তদ্রূপ ব্রহ্মে তটস্থা শব্দটী প্রযুক্ত হওয়াতে, সেই অদ্বয় ব্রহ্ম বস্তুর "মধ্য", "সন্নিহিত" এবং "বহির্দ্দেশ"—এই তিনটী পদার্থই সিদ্ধ হইতে বাধ্য। কিন্তু অদ্বয়তত্ত্বে এরূপ "দেশ" কল্পনা করিলে অদ্বয়ত্বের হানি হইবে। কারণ তখন "অদ্বয় তত্ত্ব" ও "দেশ" এই দুইটী বস্তু সিদ্ধ হইয়া পড়িবে। আর তাহা হইলে সেই অদ্বয় তত্ত্বটী সসীম হইয়া পড়িতে বাধ্য এবং বেদান্তমতে সসীম বস্তুর যে সকল দোষ স্বীকার করা হইয়া থাকে সে সকল দোষও তাহা হইলে উক্ত ব্রহ্মবস্তুতে আসিয়া উপস্থিত হইবে। এখন, যদি ব্রহ্মবস্তুকে নির্দ্দোষ প্রমাণ করিবার ইচ্ছা হয়, যদি ব্রহ্মবস্তুকে অদ্বয় তত্ত্ব বলিয়া স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে জীবকে ব্রহ্মের তটস্থা শক্তি বলিয়া ব্রহ্মের অন্তরঙ্গা শক্তি হইতে একটু দূরে রাখিবার চেষ্টা সিদ্ধ হইতে পারে

না। জীবকে অদ্বয় ব্রহ্মের শক্তি বলিয়া, শক্তি ও শক্তিমানের যে সাধারণ সম্বন্ধ, জীবের সহিত ব্রহ্মের সেই সম্বন্ধ মাত্র স্বীকার করিতে হইবে। অন্তরঙ্গা ও তটস্থা প্রভৃতি বিশেষণ দ্বারা অদ্বয় তত্ত্বের শক্তির তারতম্য সাধন করা চলিতে পারিবে না। ইহা করিলেই অদ্বয়ত্বের হানি অনিবার্য্য হইবে।

গৌড়ীয় সম্প্রদায় কিন্তু একথার প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে, সূর্য্য বলিতে যেমন সূর্য্যমণ্ডল ও কিরণ এই দুইটী বস্তুই বুঝায় এবং মণ্ডলের শক্তি ও কিরণের শক্তি যেমন এক প্রকার নহে—উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট তারতম্য আছে—তদ্রূপ অদ্বয় ব্রহ্মবস্তুরও শক্তির তারতম্য অসঙ্গত নহে।

অদ্বৈতবাদী এস্থলে বলিবেন যে, এ দৃষ্টান্তের দ্বারা ও কথা সিদ্ধ হয় না। কারণ এ স্থলে সূর্য্যমণ্ডল ও সূর্য্যকিরণ, এই দুই পদার্থের ভেদের কারণ সেই "দেশ" পদার্থ। মণ্ডল হইতে যতদূরে যাইবে কিরণ ততই তরল হইতে থাকিবে এবং এই দূরত্বের কারণ দেশ ভিন্ন আর কিছু নহে। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত নদীর দৃষ্টান্তের ন্যায় এ দৃষ্টান্তেও দোষ আসিয়া উপস্থিত হইল।

গৌড়ীয় মতে ইহার উত্তরে বলা হয় যে, দৃষ্টান্তের সর্ব্বাংশ গ্রহণ করা উচিত নহে। যে অংশে দৃষ্টান্ত কেবল সেই অংশটুকু মাত্র লইতে হয়। নচেৎ চাঁদের মত মুখখানি বলিলে কি মুখখানি চাঁদের মত গোলাকার বুঝিতে হইবে? তাহা যেমন কদাচ লোকে বুঝে না, এ স্থলেও তদ্রূপ সূর্য্য দৃষ্টান্তের মধ্যে "দেশের" অংশটুকু আনিলে চলিবে না। কিরণ ও মণ্ডল উভয়ই সূর্য্যপদবাচ্য হইয়া, যেমন তাহাদের শক্তির তারতম্যজন্য সূর্য্যের শক্তির তারতম্য স্বীকৃত হয়, এস্থলেও তাহাই করিতে হইবে।

অদ্বৈতবাদিগণ বলেন যে, দৃষ্টান্তের সর্ব্বাংশ গ্রাহ্য নহে, এ কথা সত্য; কিন্তু যে অংশ দৃষ্টান্তের মধ্যে, অভিপ্রেত অংশের সহিত অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে সম্বন্ধ, তাহা গ্রহণ করা প্রয়োজন; নচেৎ সকলেই দৃষ্টান্তের দ্বারা অসম্ভব বিষয়ও প্রমাণ করিতে পারে। দৃষ্টান্তের অভিপ্রেত অংশের সহিত যদি দৃষ্টান্তের অপরাংশের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ না থাকে, তাহা হইলে অপরাংশ ত্যাগ করিয়া লোকে বক্তার কথা বুঝিতে পারে।

অদ্বৈতবাদীর এই কথা শুনিয়া গৌড়ীয়গণ বলেন যে তাহা হইলে তোমাদের (অদ্বৈতবাদীর) রজ্জুসর্প দৃষ্টান্তের দ্বারা জগৎকে মিথ্যা প্রমাণ করিবার প্রয়াসও ব্যর্থ হয়। কারণ সত্য-সর্প দেখিয়াই যখন রজ্জুতে সর্পজ্ঞান হয় তখন ব্রহ্মবস্তুতে জগদ্দর্শন ব্যাপারও সত্য-জগতের বোধক।

ইহাতে জগতের মিথ্যাত্ব প্রমাণ করে না। যদি বল দৃষ্টান্তের এ অংশ গ্রাহ্য নহে তাহা হইলে বলিব আমাদের সূর্য্যমণ্ডল ও কিরণের সহিত যেমন দেশের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ এ স্থলেও রজ্জুসর্পের দৃষ্টান্তে সর্পের সত্যতারও সেইরূপ অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ।

ইহার উত্তরে অদ্বৈতবাদিগণ বলেন যে, না তোমাদের ওকথা ঠিক নহে। কারণ, প্রথমতঃ, ইহাতে দৃষ্টান্তের উদ্দেশ্যের সহিত বিরোধ হয়, এবং দ্বিতীয়তঃ, এ স্থলে অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ নাই। আমাদের দৃষ্টান্তের উদ্দেশ্য জগতের মিথ্যাত্ব প্রমাণ করা, আর তুমি যদি সেই দৃষ্টান্তের অপরাংশ লইয়া জগতের সত্যত্ব প্রমাণ করিতে যাও, তাহা হইলে উদ্দেশ্যে বিরোধ ঘটিল। তোমরা দৃষ্টান্তের অপরাংশের দ্বারা খুব জোর আমাদের অন্য সিদ্ধান্তের দোষ দেখাইতে পার, প্রস্তাবিত সিদ্ধান্তের বিপরীত কথা আনিতে পার না। ইহা শিষ্টাচার বিরুদ্ধ। আমরা তোমাদের সূর্য্য কিরণে "দেশ" সম্বন্ধ আনিয়া সেরূপ করি নাই। সুতরাং তোমার কথা অসঙ্গত।

তাহার পর, "সূর্য্যকিরণ" ও "দেশে" যেরূপ অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, রজ্জুসর্পে সেরূপ অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ নাই। কারণ, "কিরণ" ও "দেশের" সম্বন্ধ নিত্য বা সর্ব্বকালিক, কিন্তু আমাদের রজ্জুতে যে সর্পজ্ঞান হয়, সে সর্পজ্ঞান পূর্ব্বদৃষ্ট সর্পজ্ঞানমূলক। তৎকালে সে সর্প থাকিতেও পারে নাও পারে। সুতরাং তোমাদের "সূর্য্য" ও "কিরণে"কালগত ব্যবধান নাই, এবং আমাদের রজ্জুসর্পে কালগত ব্যবধান আছে। এজন্য আমাদের রজ্জুসর্পের সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ নহে। আর তাহার পর আমরা রজ্জুসর্পে যে সর্পজ্ঞান স্বীকার করি তাহা সত্যসর্পমূলক বলিয়াই স্বীকার করি না। তোমরা যদি আমাদের দৃষ্টান্তের ওরূপ অন্যায় করিয়া অন্য অংশ ধরিয়া আমাদের কথার বিপরীত কথা প্রমাণ করিবার জন্য আগ্রহ করিতে চাহ তাহা হইলে তোমাদের আগ্রহ শান্তির জন্য তোমাদিগকে অন্য অংশের কথা তুলিতে দিলাম,কিন্তু তথাপি এরূপ দৃষ্টান্তের সাহায্যে আমাদের বিপরীত কথা প্রমাণ করিতে দিব না। কারণ রজ্জুতে যে সর্প দেখা হয় সে সর্প তোমরা পূর্ব্বে কখন দেখ নাই, ইহাও নিশ্চিত। ইহা তোমাদের সর্পজাতিজ্ঞানের অসঙ্গত প্রয়োগ, সুতরাং ভ্রম। সর্প-জাতি-জ্ঞান দ্বারা যে কোন একটা যথার্থ সর্পে সর্প-জ্ঞান হইবার কথা; রজ্জুতে সর্পজ্ঞান হইবার ত কোন কথা নাই। সুতরাং রজ্জুসর্পের দৃষ্টান্তেও যে সর্প তাহা সত্য সর্প নহে। যদি আমরা তোমাদিগকে আমাদের

দৃষ্টান্তের অপর অংশ গ্রহণ করিতে অনুমতি দিই, তাহাতে আমাদের কোন ক্ষতি নাই, কিন্তু তোমরা,তদ্রূপ করিতে আমাদিগকে অনুমতি দিলে তোমার অদ্বয় ব্রহ্মের অদ্বয়ত্ব হানি হইতে বাধ্য। অগত্যা তোমার সূর্য্য ও তাহার কিরণ দৃষ্টান্ত দ্বারা অদ্বয় তত্ত্বের শক্তির তারতম্য প্রমাণিত হয় না। (এ বিষয়ে অন্য কথা পরে দ্রষ্টব্য।)

কিন্তু অদ্বৈতবাদের বিরোধীগণ ছাড়িবার পাত্র নহেন। তাঁহারা বলেন সর্পজাতি-জ্ঞানের রজ্জুতে প্রয়োগই যদি রজ্জুতে সর্প ভ্রমের হেতু হয়, তাহা হইলেও সর্পজাতি জ্ঞানের জন্যও ত সর্পবস্তু দর্শনের প্রয়োজন, সুতরাং এতদ্দারা সর্পের সত্তা নিবারিত হয় না। অদ্বৈতবাদী ইহার উত্তরে আর একটু অগ্রসর হইয়া বলেন যে শুধু প্রয়োগের ভুলই আমরা বলি না, আমরা সর্পজাতি-জ্ঞানকেও মিথ্যা জ্ঞানের মধ্যে গণ্য করি; কারণ তুমি যে পাঁচটা সর্প দেখিয়া সর্পজাতি-জ্ঞান গঠন কর তাহা যাবতীয় সর্প সম্বন্ধীয় সত্য জ্ঞান নহে—পাঁচটা বা পাঁচ লক্ষ সর্প দেখিয়াও যাহা সর্পজাতি বলিয়া স্থির করা হয়, তাহা হয়ত এক কোটী সর্প দেখিতে দেখিতে অন্যথা হইয়া যাইবে, এবং বস্তুতঃ ব্যবহারেও এই প্রকার জাতিজ্ঞানের পরিবর্ত্তনই হইতে দেখা যায়। বাস্তবিক সর্পজাতিজ্ঞান একটা মনগড়া পদার্থ। আর কেবল তাহাই নহে জগতের সকল লোকেরই সর্পজাতি-জ্ঞান এক প্রকারও নহে। সুতরাং সর্পজাতিজ্ঞান ও যথার্থ সর্প মধ্যে যথেষ্ট ভেদ আছে। এজন্য রজ্জুতে যে সর্পজ্ঞান হয় সে সর্পজ্ঞান—সত্য-সর্পজ্ঞান নহে।

এখন একথাও যে আপত্তিশূন্য—তাহা নহে। প্রতিবাদী বলিয়া থাকেন—না; ও কথা স্বীকার্য্য নহে—কারণ রজ্জুতে সর্প ভ্রম হয়, হস্তী ভ্রম ত হয় না, যে সর্প দেখিয়াছে রজ্জু ও সর্পের সাদৃশ্য উপলব্ধি করিয়াছে তাহারইত রজ্জুতে সর্প ভ্রম হয়, অন্যের নহে। সুতরাং যে সর্পত্ব, রজ্জুতে আরোপ করা হয়, তাহার বিষয় বা আধার যে সর্প তাহা সত্য। অদ্বৈতবাদী ইহার উত্তরে বলেন—না—ও আপত্তি ঠিক নহে, কারণ ভ্রম জ্ঞান হইতেও ভ্রম হইয়া থাকে। ভ্রম হইতে গেলেই যে তাহার আধার সত্য হওয়া চাই তাহার কোন নিয়ম নাই। যাহার সত্য-বিষয় নাই এমন জ্ঞান হইতেও অন্য ভ্রমের উৎপত্তি সম্ভব। যেমন ভূত দর্শন।

বস্তুতঃ একথার উপর আর কোন কথা উঠিতে পারে না, কারণ ভ্রমজ্ঞান হইতে যখন অন্য ভ্রমজ্ঞান জন্মে সিদ্ধ হয় তখন রজ্জুসর্পজ্ঞানে সর্পের সত্যতার

জন্য আর ভেদ করা চলে না। কিন্তু এস্থলেও প্রতিপক্ষকে বলিতে শুনা যায় যে সত্য বিষয়ক জ্ঞান হইতে যে ভ্রম জ্ঞান হয় তাহাতেও যেমন পঞ্চভূত বর্ত্তমান তদ্রূপ অসত্য বিষয়ক জ্ঞান বা ভ্রমজ্ঞান হইতে যে ভ্রমজ্ঞান জন্মে তাহাতেও সেই পঞ্চভূত বর্ত্তমান ; সুতরাং ভ্রমজ্ঞানেরও বিষয় সত্য – মিথ্যা নহে। অদ্বৈতবাদিগণ একথারও উত্তর দিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন এ পঞ্চভূতে বিষয়তাই সত্যের নিদর্শন নহে, কারণ তাহা হইলে বন্ধ্যাপুত্র ও আকাশকুসুমও সত্য ; যে হেতু উহাদিগকে পঞ্চভূতাতিরিক্ত বলা কাহার ইচ্ছা নহে। দেখ মানুষ মনে মনে যদি কোন একটা জিনিষ গঠন করে, বা কোন একটা মূর্ত্তি কল্পনা করে এবং সেই জিনিষের মত যদি অন্য একটা বস্তু দেখিয়া তাহার ভ্রম হয়, তাহা হইলে সে ভ্রমের অসম্ভাবনা দেখা যায় না ; ধরুন মনে মনে আমি একটা পক্ষবিশিষ্ট বানর কল্পনা করিয়াছি এবং ঘটনা চক্রে কোন এক দূর দেশে একটা মাটীর ঐরূপ মূর্ত্তি দেখিয়া তাহাকে যদি জীবন্ত মূর্ত্তি বলিয়া মনে হইল, তাহা হইলে কি এই ভ্রমটা আধার বা বিষয় শূন্য ভ্রম নহে? সুতরাং কোন মতেই প্রমাণ হয় না—যে ভ্রমজ্ঞান মাত্রই সত্য বিষয়ক। অন্য কথায় রজ্জুসর্পের দৃষ্টান্তেও কোন দোষ নাই, পরন্তু সূর্য্য ও সূর্য্যমণ্ডলদৃষ্টান্তে যে দোষ ঘটে তাহাতে অদ্বৈততত্ত্বের অদ্বৈতত্ব হানি রক্ষা পায় না। অদ্বৈত মতে ভ্রমজ্ঞান দ্বারা সত্যজ্ঞানের বাধ অসম্ভব, সুতরাং ভ্রমজ্ঞান দ্বারা অদ্বৈতভাবের হানি অসম্ভব। অন্ধকার আলোককে হটাইতে পারে না কিন্তু একখণ্ড কাষ্ঠ তাহা পারে।

যাহা হউক এক্ষণে দ্বিতীয় বিষয়টী বিচার্য্য। এই দ্বিতীয় বিষয়টী বলিতে শক্তি ও শক্তিমানের সম্বন্ধ নির্ণয়, অপর কিছু নহে। গৌড়ীয় সম্প্রদায় বলেন শক্তি ও শক্তিমানের সম্বন্ধ ভেদাভেদ সম্বন্ধ ; কিন্তু অদ্বৈতবাদিগণ বলেন, যে, না, তাহা নহে। শক্তিমানের কার্য্যাবস্থায়, শক্তির সহিত তাহার ভেদাভেদসম্বন্ধ সত্য ; কিন্তু শক্তিমানের কারণাবস্থায় তাহা নহে। কারণাবস্থায় উহাদের তাদাত্ম্য সম্বন্ধ বা অভেদ সম্বন্ধই সত্য।

এই বিষয়টী বিচার করিতে হইলে শক্তি ও শক্তিমান কাহাকে বলে দেখা আবশ্যক। দেখা যায় মাটী হইতে ঘট উৎপন্ন হয়, তন্তু হইতে পট নির্ম্মিত হয় ও অগ্নি হইতে জ্বালা জন্মে। এ জন্য মাটীতে ঘট জননী শক্তি, তন্তুতে পটোৎপাদিনী শক্তি এবং অগ্নিতে জ্বালা-জননী শক্তি স্বীকার করা

হয়, এই শক্তি মাটী বা ঘট নহে, তন্তু বা পট নহে, অগ্নি বা জ্বালা নহে। তবে উহা মাটী, তন্তু বা অগ্নিতে থাকে মাত্র। এ জন্য উক্ত মাটী, তন্তু ও অগ্নিকে শক্তিমান বলা হয়, এবং তাহাদের ঘট পট ও জ্বালা জনন সামর্থ্যকে শক্তি নামে অভিহিত করা হয়। এখন দেখা যাউক ইহাদের সম্বন্ধ কি? দেখা যায় এই শক্তিমান পদার্থটী দুই প্রকারে অবস্থান করে। মাটী, তন্তু ও অগ্নি এক সময় মাটীর পিণ্ড, সূত্রাকার, ও অগ্নিশিখামাত্র আকারে থাকিতে পারে এবং কখন বা ঘট পট ও জ্বালা আকারে থাকিতে পারে। কারণ মাটী ঘট হইলে তাহার মাটীত্ব নষ্ট হয় না, এখন এই মাটীকে যদি কারণ নামে অভিহিত করা হয় এবং ঘটকে কার্য্য নামে পরিচিত করা যায়, তাহা হইলে শক্তিমান পদার্থটী কারণ এবং কার্য্য এই দুই আকারে থাকিতে পারে—স্বীকার করিতে হইবে। এজন্য শক্তিমানের সহিত শক্তির সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে হইলে শক্তিমানের কার্য্য ও কারণ এই দুই অবস্থাতেই তাহার যেরূপ সম্বন্ধ তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। সুবিধার জন্য এক্ষণে আমরা উক্ত তিনটী দৃষ্টান্তের পরিবর্ত্তে কেবল মাটীর দৃষ্টান্তটাই গ্রহণ করি। প্রথম শক্তিমানের কার্য্যাবস্থায় শক্তির সহিত শক্তিমানের কি সম্বন্ধ দেখা যাউক।

মাটী যখন ঘটাকারে অবস্থিতি করে তখন তাহা কার্য্যাবস্থা এবং সেই মাটী যখন পিণ্ড বা যদৃচ্ছা বা ঘট-ভিন্নাকারে অবস্থিতি করে তখন তাহা কারণাবস্থা নামে কথিত হয়। এখন কার্য্যাবস্থায় অর্থাৎ মাটী যে সময় ঘটাকার ধারণ করিয়াছে সে সময় ঘট-রূপকার্য্য দেখিয়া সেই মাটীর যে ঘট-জননী শক্তি আছে তাহা অনুমান করিতে কাহারো কষ্ট হইতে পারে না। কারণ মাটীর সে শক্তি না থাকিলে মাটী হইতে ঘটই উৎপন্ন হইতে পারিত না। বালুকাতে সে শক্তি নাই এজন্য বালুকার ঘট হয় না। সুতরাং দেখা যাইতেছে কার্য্যাবস্থায় শক্তিমানের শক্তি স্বীকার করিতে আমরা বাধ্য। আর এই শক্তি শক্তিমানে থাকে বলিয়া শক্তিমান পদার্থ ও শক্তি পদার্থ এক বা অভিন্ন হইতে পারে না। যাহা, কোন কিছুতে থাকে, তাহা তাহার সহিত ভিন্ন হইতে বাধ্য। আবার ভিন্ন হইয়াও যেহেতু শক্তিমানের দেশ বিশেষে বা কাল বিশেষে ঐ শক্তির তারতম্য হয় না, সেই হেতু তাহা অভিন্নও বটে। কারণ কোন কিছু দেশ বা কালের দ্বারা যদি পরিচ্ছিন্ন না হয় তাহা হইলে তাহা কখনই ভিন্ন বা বহু আখ্যা পাইতে পারে না। সুতরাং

শক্তিমানের কার্য্যাবস্থায় শক্তি ও শক্তিমানে ভেদাভেদ উভয় সম্বন্ধ বিদ্যমান।

এইবার শক্তিমানের কারণাবস্থার শক্তির সহিত শক্তিমানের কি সম্বন্ধ দেখা যাউক। উপরে দেখিয়াছি মাটীর ঘটভিন্নাবস্থাই ঘটের পক্ষে মাটীর কারণাবস্থা। এখন দেখা দরকার উক্ত কারণাবস্থায় ঘট-জননী শক্তি তাহাতে কি ভাবে বর্ত্তমান। মাটীর ঘট দেখিয়া যেমন সেই ঘটের মাটীর ঘট-জননী-শক্তি স্বীকার করা হয়, তদ্রূপ আমরা ঘট ভিন্ন মাটী দেখিলেই বলিতে পারি যে তাহারও ঘট-জননী শক্তি আছে। যে মাটী দেখিয়া একথা বলি তাহাতে কেহ কখনও ঘট নির্ম্মাণ করুক আর নাই করুক তাহাতে ঘট গড়িলেই ঘট হইবে আমাদের অনুমান ঠিক হইবে। সুতরাং মাটী দেখিয়াই তাহাতে শক্তি আছে বলিলে সঙ্গত কথাই বলা হইল আর তাহা হইলে শক্তিমানের কারণাবস্থাতেও কার্য্যাবস্থার ন্যায় শক্তিমানের ভেদাভেদ সম্বন্ধ সিদ্ধ হইল। কিন্তু ইহার ভিতরে একটা কথা আছে। আমরা যে ঘটভিন্ন মাটীর বা মাটী মাত্রেই ঐরূপ শক্তির অনুমান করি,তাহা আমরা অন্যত্র বা ভিন্নকালে মাটী হইতে ঘট হয় দেখিয়াই করি। অন্য মাটীতে বা অন্য সময় সেই মাটীতে ঘট হওয়া না দেখিয়া কখনই তাহা করিতে পারিতাম না। সুতরাং এস্থলেও মাটীর ঘটাবস্থার জ্ঞানদ্বারাই ঐ মাটীর ঘট জননী-শক্তি স্বীকার করা হয়। এস্থলে মাটী কোন কালে ঘট হইয়া অথবা মাটীর কোন অংশ ঘট হইয়া আমাদিগকে মাটীর ঘটাবস্থার জ্ঞান শিক্ষা দেয়, তাহাতেই মাটীর ঐ শক্তি স্বীকার করা হয়। কিন্তু মাটী যদি কোন কালে বা কোন অংশে তাহার ঘটাবস্থার জ্ঞান আমাদিগকে না শিক্ষা দিত, তাহা হইলে কি ঘটাবস্থার জ্ঞান আমাদিগের হইত, এবং তাহা হইলে কি তাহাদ্বারা মাটীর ঐ শক্তি আছে স্বীকার করা সম্ভব হইত? এজন্য ঘটভিন্নাবস্থার মাটী দেখিয়াই তাহাতে ঘটজননী শক্তি স্বীকার করিলে প্রকারান্তরে ঘটাবস্থার মাটীরই ঘটজননী শক্তি স্বীকার করা হয়; ঘটভিন্নাবস্থার মাটীর পক্ষে তাহা স্বীকার করা হয় না। সুতরাং মাটীর ঘটভিন্নাবস্থার ঘট জননী শক্তি স্বীকারের কোন উপায় নাই। স্বীকারের উপায় নাই বলিয়া তখন মাটী ও শক্তি, হয় এক, অথবা শক্তি নাই অথবা কেবল মাটীই আছে এই কথা বলিতে হয়। এখন মাটী যদি শক্তিমান পদার্থ হয় মাটীর ঘট ভিন্নাবস্থা যদি শক্তিমানের কারণাবস্থা হয় এবং মাটীর

ঘটাবস্থা যদি শক্তিমানের কার্য্যাবস্থা হয় তাহা হইলে বলা চলে শক্তিমানের কারণাবস্থায় শক্তি ও শক্তিমান এক বা অভিন্ন। এ স্থলে যদি আপত্তি করা যায় যে, কারণ বলিলেই কার্য্য এবং কার্য্য বলিলেই কারণও বুঝাইয়া যায়, সুতরাং কার্য্য সাহায্যে কারণে শক্তি স্বীকার করিলেইত ভাল। যাহার সহিত যাহার অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ তাহাকে ছাড়িয়া তাহার লক্ষণ করিবার প্রয়াস কেন? বরং তাহাকে লইয়াইত লক্ষণ করিলে, লক্ষণ সম্পূর্ণ হইবার কথা। সত্য, কিন্তু এ স্থলে একটু কথা আছে। দেখ "মাটীও কারণ" এবং ঘট ও ঘটকার্য্য ইহারা ঠিক এক পদার্থ নহে। মাটী ও কারণ একার্থক নহে, কার্য্য ও ঘট সমানার্থক নহে। যে হেতু মাটী, ঘট হইলেও তাহা মাটীই থাকে, মাটীর কোন একটা ভাব বিনষ্ট হইয়া ঘট হয় মাত্র; কিন্তু ঘট, মাটী হইয়া গেলে ঘট আর ঘট থাকে না। তাহার সবটাই বিনষ্ট হয়। সুতরাং কারণ শব্দে মাটী ও কার্য্যাবস্থাবিশিষ্ট মাটী এই দুইটী অর্থই বুঝাইতে পারে এবং কার্য্য শব্দে ঘট ও ঘটের মাটী এই দুইটীই বুঝাইয়া থাকে। এখন কারণ শব্দে যদি কার্য্যাবস্থা পরিশূন্য কেবল মাটী অর্থই গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে তাহাও আমরা গ্রহণ করিতে পারি। ইহা তখন বস্তুবোধক শব্দের ন্যায় মাটী মাত্রই বুঝাইবে, সম্বন্ধসূচক শব্দের ন্যায় তাহার সহিত আর কিছু বুঝাইবে না, অর্থাৎ মাটীর কোন অবস্থা বিশেষের প্রতি চিত্তকে পরিচালিত করিবে না। "কারণ" শব্দ সম্বন্ধসূচক শব্দ, ইহা বলিলেই যেমন ইহার সহিত সম্বন্ধ কার্য্যকে বুঝায়, এস্থলে আর সেরূপ হইবে না। এখন দেখ, কারণ শব্দে কার্য্যাবস্থাপরিশূন্য বস্তু মাত্র বুঝায় বলিয়া শক্তিমানের কারণাবস্থা বলিলে কার্য্যাবস্থা পরিশূন্য শক্তিমানকে বুঝাইতে পারে। শক্তিমানের কারণাবস্থা বলিলেই যে কার্য্যাবস্থা সম্পর্কীয় শক্তিমান বুঝিতে হইবে, তাহার কোন নিয়ম নাই। নিয়ম নাই বলিয়াই তোমার আপত্তি স্থান পাইতে পারে না। অগত্যা, এখন যদি, শক্তিমানের কারণাবস্থায় শক্তি ও শক্তি-মানের সম্বন্ধ স্থির করিতে হয়, তাহা হইলে তোমার দুই রকম করিয়া তাহা করা উচিত। অর্থাৎ একবার কার্য্যাবস্থাপরিশূন্য ভাবে এবং আর একবার কার্য্যাবস্থাবিশিষ্ট ভাবে করা উচিত। আর তাহা হইলে যখন তুমি কার্য্যাবস্থাপরিশূন্য শক্তিমানের কারণাবস্থায় শক্তি ও শক্তিমানের সম্বন্ধ নির্ণয় করিবে, তখন তোমার অগত্যা তাহাদের তাদাত্ম্য বা অত্যন্ত অভেদ সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হইবে। অপর পক্ষে অর্থাৎ কার্য্যাবস্থাবিশিষ্ট শক্তি-

মানের কারণাবস্থায় শক্তি ও শক্তিমানের সম্বন্ধ নির্ণয়কালে তুমি পূর্ব্বের ন্যায় তাহাদের সম্বন্ধকে ভেদাভেদ সম্বন্ধ বল আমার তাহাতে আপত্তি নাই। তুমি আমার লক্ষণকে ভুল বলিতে পার না।

স্বামিজীর স্মৃতি।

[শ্রীপ্রিয় নাথ সিংহ।]

নরেন্দ্র নাথ হেদোর ধারে জেনারেল এসেম্‌ব্লির কলেজে পড়েন। এফ, এ, সেই খান হইতেই পাশ করিয়াছেন। তাঁহার অসংখ্য গুণে সহপাঠীরা অনেকে বড়ই বশীভূত। তাঁহারা তাঁহার গান শুনিতে,মিষ্ট কথাবার্ত্তা, সুযুক্তিপূর্ণ তর্ক শুনিতে এতই ভাল বাসিতেন যে অবকাশ পাইলেই নরেনের বাটী যাইয়া উপস্থিত হইতেন। তথায় বসিয়া একবার তাঁহার তর্ক যুক্তি বা গান বাজনা আরম্ভ হইলে সময় যে কোথা দিয়া চলিয়া যাইত তাহা বুঝিতে পারিতেন না।

নরেন্দ্র এখন তাঁহার পিত্রালয়ে দুই বেলা কেবল আহার করিতে যান, আর সমস্ত দিবা রাত্র নিকটে রামতনু বসুর গলিতে মাতামহীর বাটীতে থাকিয়া পাঠাভ্যাস করেন। পাঠাভ্যাসের খাতিরেই যে এখানে থাকেন তাহা নহে। নরেন্দ্র নিভৃতে থাকিতে ভালবাসেন। বাড়ীতে অনেক লোক, বড় গোলমাল, নিশীথে ধ্যান জপের বড়ই ব্যাঘাত। মাতামহীর বাটীতে লোক বেশী নয়, দুই একজন যাঁহারা আছেন তাঁহাদের দ্বারা নরেনের কোন ব্যাঘাত ঘটে না। কচি কাচা ছেলে যাহাদের দ্বারাই অধিক গোলমাল হয় এখানে একটীও নাই। যে ঘরটীতে নরেন থাকেন তাহা বার বাড়ীর দোতলায়। ঘরের সম্মুখেই ঘরে উঠিবার সিঁড়ী। অন্দরমহলের সঙ্গে কোন প্রকার সংশ্রব নাই। সুতরাং তাঁহার বন্ধু বান্ধবের যাহার যখন ইচ্ছা আসিয়া উপস্থিত হন। নরেন নিজের এই অপূর্ব্ব ছোট ঘরটীর নাম রাখিয়াছিলেন 'টঙ'। কাহাকেও সঙ্গে লইয়া সেখানে যাইতে হইলে বলিতেন, "চল টঙে যাই"। ঘরটী বড়ই ছোট, প্রস্থে চারি হাত, দৈর্ঘ্যে প্রায় তাহার দ্বিগুণ। ঘরে আসবাবের মধ্যে একটী ক্যাম্বিসের খাট, তাহার উপর ময়লা

একটী ক্ষুদ্র বালিশ। মেঝের উপর একটী ছেঁড়া সপ পাতা। এক কোণে একটী তম্বুরা। তাহারই নিকট একটী সেতারা ও একটী বাঁয়া। বাঁয়া কখন ঐ মাদুরের উপর পড়িয়া থাকে, কখন বা ঐ খাটিয়ার নীচে পড়িয়া থাকে, কখন বা তাহার উপর চড়িয়া বসিয়া থাকে। ঘরের এক পার্শ্বে একটী থেল হুঁক, তাহার নিকট একটী তামাকের গুল আর ছাই ঢালিবার একখানি সরা। তাহারই কাছে তামাক টিকে ও দেশালাই রাখিবার একটী মৃত্তিকা পাত্র। আর কুলুঙ্গিতে খাটের উপর, মাদুরের উপর হেথা সেথা ছড়ান পড়িবার পুস্তক। একটী দেওয়ালে একটী দড়ি খাটান, তাহাতে কাপড় পিরান ও একখানি চাদর ঝুলিতেছে। ঘরে দুটী একটী ভাঙ্গা শিশিও রহিয়াছে, সম্প্রতি তাঁহার পীড়া হইয়াছিল তাহারই নজির। নরেন মনে করিলেই বাড়ী হইতে পরিষ্কার বালিশ, উত্তম বিছানা, ও একটু ভাল ভাল দ্রব্যাদি আনিয়া দুই এক খানি ছবি প্রভৃতি দিয়া আপনার ঘরটী বেশ সাজাইতে পারিতেন। করিতেন না যে, তাহার একমাত্র কারণ তাঁহার ওসমস্ত দিকে কোন প্রকার খেয়ালই ছিল না। সে জন্য ঘরের সর্ব্বত্র একটা যেন বাসাড়ে বাসাড়ে ভাব। প্রকৃত কথা আত্মতৃপ্তির বাসনা তাঁহার বাল্যাবস্থা হইতে কোন বিষয়ে দেখা যাইত না।

নরেন্দ্র আজ মনোনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিতেছেন এমন সময় কোন বন্ধুর আগমন হইল, বেলা এগারটা। আহারাদি করিয়া নরেন্দ্র পাঠ করিতেছেন। বন্ধু আসিয়া নরেনকে বলিলেন "ভাই রাত্তিরে পড়িস, এখন দুটো গান গা।" অমনি নরেন পড়িবার বই মুড়িয়া এক ধারে ঠেলিয়া রাখিলেন তানপুরার জুড়ির তার ছিঁড়িয়া গিয়াছে, সেতারের সুর বাঁধিয়া নরেন গান ধরিবার আগে বন্ধুকে বলিলেন, "তবে বাঁয়াটা নে।" বন্ধু কহিলেন, "ভাই, আমিত বাজাতে জানি নি। ইস্কুলে টেবিল চাপড়ে বাজাই বলে কি তোমার সঙ্গে বাঁয়া বাজাতে পারব?" অমনি নরেন আপনি একটু বাজাইয়া দেখাইলেন ও বলিলেন "বেশ করে দেখে নে দিখি। পারবি বই কি, কেন পারবিনি? কিছু শক্ত কাজ নয়। এমনি করে কেবল ঠেকা দিয়ে যা, তা হলেই হবে।" সঙ্গে সঙ্গে বাজনার বোলটাও বলিয়া দিলেন। বন্ধু দুই একবার চেষ্টা করিয়া কোন রকমে ঠেকা দিতে লাগিলেন, গান চলিল। তান লয়ে উন্মত্ত হইয়া ও উন্মত্ত করিয়া নরেনের হৃদয়স্পর্শী গান চলিল, টপ্পা, টপ্‌খেয়াল, খেয়াল ধ্রুপদ, বাংলা হিন্দী সংস্কৃত। নূতন ঠেকার সময়

নরেন এমনি সহজ ভাবে বোল সহ ঠেকাটী দেখাইয়া দেন যে, এক দিনে কাওয়ালি, একতালা, আড়াঠেকা, মধ্যমান এমন কি সুরফাঁক তাল পর্য্যন্ত তাহার দ্বারা বাজাইয়া লইলেন। বন্ধু মধ্যে মধ্যে তামাক সাজিয়া নরেনকে খাওয়াইতেছেন ও আপনি খাইতেছেন; সেটা কেবল বাজান কার্য্য হইতে একটু অবসর না লইলে হাত যে যায়। নরেন্দ্রের কিন্তু গানের কামাই নাই, হিন্দি গান হইলে নরেন তাহার মানে বলিতেছেন ও তাহার অন্তর্নিহিত ভাবতরঙ্গের সহিত সুর লয়ে অপূর্ব্ব ঐক্যতা দর্শাইয়া বন্ধুকে বিমোহিত করিতেছেন। দিন কোথা দিয়া চলিয়া গেল। সন্ধ্যা আসিল, বাড়ীর চাকর আসিয়া একটী মিট্‌-মিটে প্রদীপ দিয়া গেল। ক্রমে রাত্রি দশটার সময় দুই জনের হুঁস হইলে সে দিনকার মত পরস্পর বিদায় লইয়া নরেন্দ্র পিত্রালয়ে ভোজনার্থ চলিয়া গেলেন, বন্ধু স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

এই প্রকারে নরেনের পাঠে কতই যে ব্যাঘাত ঘটিত তাহা বলা যায় না। নরেনের সহিত এই সময়ে যাঁহারই ঘনিষ্ঠতা হইয়াছে তিনিই এই ব্যাপার চাক্ষুষ দেখিয়াছেন। কিন্তু ব্যাঘাত যতই হউক না কেন নরেন্দ্র নির্ব্বিকার।

এক দিন সকালে শ্রীরামকৃষ্ণদেব, নরেন অনেক দিন তাঁহার নিকট না যাওয়ায়, তাঁহাকে দেখিবার জন্য রামলালের সঙ্গে কলিকাতায় নরেনের 'টঙে' আগমন করেন। সে দিন সকালে নরেনের ঘরে দুই সহপাঠী বন্ধু হরিদাস চট্টোপাধ্যায় ও দাশরথি সান্ন্যাল বসিয়া কখন পাঠ করিতেছেন আবার কখন বা কথাবার্ত্তা কহিতেছেন এমন সময় বহির্দ্বারে 'নরেন, নরেন' শব্দ শুনা গেল। স্বর শুনিয়াই নরেন অতীব ব্যস্ত হইয়া দ্রুত নীচে চলিয়া গেলেন। তাঁহার বন্ধুরাও বুঝিলেন পরমহংস দেব আসিয়াছেন, তাই নরেন এত ব্যস্ত হইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া আনিতে গেলেন। বন্ধুরা দেখিলেন সিঁড়ীর মধ্য স্থলেই পরস্পরের সাক্ষাৎ হইল। শ্রীরামকৃষ্ণ নরেনকে দেখিয়াই অশ্রুপূর্ণ লোচনে গদগদ স্বরে বলিতে লাগিলেন, "তুই এত দিন যাস্‌নি কেন? তুই এত দিন যাস্‌নি কেন?" বারম্বার এই বলিতে বলিতে ঘরে আসিয়া বসিলেন, পরে আপনার গামছায় বাঁধা সন্দেশ ছিল খুলিয়া নরেনকে 'খা, খা' বলিয়া খাওয়াইতে লাগিলেন। নরেনকে দেখিতে যখনি আসেন তখনি কিছু না কিছু অতি উত্তম খাদ্য দ্রব্য তাঁহার জন্য বাঁধিয়া আনেন; মধ্যে মধ্যে লোক দ্বারা পাঠাইয়াও দেন। নরেন একেলা খাইবার পাত্র নহে, তাহা হইতে কতকগুলি সন্দেশ লইয়া অগ্রে তাঁহার বন্ধুদের দিয়া

তবে খাইলেন। রামকৃষ্ণ তৎপরে বলিলেন, "ওরে, তোর গান অনেক দিন শুনিনি, গান গা।" অমনি তানপূরা লইয়া তাহার কাণ মলিয়া সুর বাঁধিয়া নরেন্দ্র গান আরম্ভ করিলেন।

ভৈরবী—একতালা।

জাগ মা কুল কুণ্ডলিনি,
(তুমি) ব্রহ্মানন্দ স্বরূপিনী।
(তুমি নিত্যানন্দ স্বরূপিনী)
প্রসুপ্ত ভুজগাকারা আধার-পদ্ম-বাসিনী॥
ত্রিকোণে জ্বলে কৃশাণু, তাপিতা হইল তনু।
মূলাধার ত্যজ শিবে, স্বয়ম্ভু-শিব-বেষ্টিনি॥
গচ্ছ সুষুম্নারি পথ, স্বাধিষ্ঠান হও অতীত।
মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধাজ্ঞা-সঞ্চারিণী॥
শিরষী সহস্রদলে, পরম শিবেতে মিলে।
ক্রীড়া কর কুতুহলে, সচ্চিদানন্দ দায়িনি॥

গানও আরম্ভ হইল শ্রীরামকৃষ্ণও ভাবস্থ হইতে লাগিলেন। গানের স্তরে স্তরে মন ঊর্দ্ধে উঠিল, চক্ষে পলক নাই, অঙ্গে স্পন্দন নাই, মুখাবয়বে অমানুসী ভাব ধারণ করিল, ক্রমে মর্ম্মর মূর্ত্তির ন্যায় নিস্পন্দ হইয়া নির্ব্বিকল্প সমাধিস্থ হইলেন। নরেনের বন্ধুরা পূর্ব্বে কোন মানুষে এরূপ ভাব দেখেন নাই। তাঁহারা এই ব্যাপার দেখিযা মনে করিলেন বুঝি বা তিনি শরীরে সহসা কোন পীড়া হওয়ায় অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহারা মহা ভীত হইলেন। দাশরথি তাড়াতাড়ি জল আনিয়া তাঁহার মুখে সিঞ্চন করিবার উদ্যোগ করিতেছেন দেখিয়া নরেন্দ্র তাঁহাকে নিবারণ করিয়া কহিলেন, "জল দেবার দরকার নেই। উনি অজ্ঞান হন্‌নি, ওঁর ভাব হয়েছে। আবার গান শুন্‌তে শুন্‌তেই জ্ঞান হবে এখন।" নরেন্দ্র এইবার শ্যামা বিষয়ক গান ধরিলেন, "একবার তেমনি তেমনি তেমনি করে নাচ্‌ মা শ্যামা," শ্যামা বিষয়ক অনেক গান হইল। কৃষ্ণ-বিষয়ক গানও অনেক হইল। গান শুনিতে শুনিতে রামকৃষ্ণ কখন ভাবাবিষ্ট হইতেছেন, আবার কখন বা সহজাবস্থা প্রাপ্ত হইতেছেন। নরেন্দ্র অনেকক্ষণ ধরিয়া গান গাহিলেন। অবশেষে গান শেষ হইলে রামকৃষ্ণ কহিলেন, "দক্ষিণেশ্বর যাবি? কদিন ত যাস্‌নি। চল্‌ না, আবার এখনি ফিরে আসিস্‌।"-নরেন্দ্র

তখনি সম্মত হইলেন। পুস্তকাদি যেমন অবস্থায় পড়িয়াছিল তেমনি পড়িয়া রহিল, কেবল মাত্র তানপূরাটী যত্নপূর্ব্বক তুলিয়া রাখিয়া গুরুদেবের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বর গমন করিলেন, বন্ধুরা স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

নরেন্দ্রনাথের পড়া শুনায় এবম্বিধ বহু অন্তরায় তাঁহার অনেক বন্ধুই দেখিয়াছেন, কিন্তু সাহস করিয়া তাঁহাকে কেহ কখন কিছু বলিতে পারেন নাই। একদিন উক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে বৃথা সময় নষ্ট হয় ভাবিয়া তৎপ্রতি ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন, "ভাই, ধর্ম্মের জন্যে তোমার যে রকম আবেগ তাতে তুমি নিশ্চয়ই শীঘ্র উৎকৃষ্ট গুরু পাবে।" নরেন্দ্র বেশ বুঝিলেন যে বন্ধুটী রামকৃষ্ণকে একজন সামান্য ব্যক্তি মনে করিয়াই এরূপ কহিয়াছেন। নরেন্দ্র বন্ধুর কথায় মর্ম্মাহত হইলেন। কিন্তু কোন উত্তর করিলেন না। কিন্তু অন্য এক বন্ধুর সঙ্গে একদিন কথায় কথায় বলিয়া ফেলিলেন, "ভাই, হরিদাস আমার গুরুদেবকে সামান্য লোক মনে করে। তা সে যা হোগ্ 'যদ্যপি আমার গুরু শুঁড়ি বাড়ী যায় তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়'।" ইহার বহুকাল পরে লেখকের নিকট হরিদাস এই সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "ভাই, তখন কি আমরা পরমহংস দেবকে চিন্‌তে পেরেছিলুম? ভাগ্যগুণে নরেন তাঁহাকে চিনেছেলেন, আর আমরা দুর্ভাগ্য বশতঃ কিছুই তখন বুঝতে পারিনি।" হরিদাস এইরূপ কত দুঃখ প্রকাশ করিতেন ও তাঁহার নয়ন আর্দ্র হইয়া আসিত।

বি, এ পরীক্ষার জন্য টাকা জমা দিবার সময় আসিল, সকলেই আপনআপন বেতন ও পরীক্ষার ফি জমা দিল। হরিদাসের অবস্থা ভাল নয়, তাহার উপর এক বৎসর কাল বিদ্যালয়ের বেতন দেওয়া হয় নাই। তখন এ প্রকার ধারে পড়াশুনা জেনারেল এসেম্‌ব্লিতে চলিত। পরীক্ষার সময় সমস্ত টাকা আদায় করা হইত। যাহারা নেহাত সমস্ত বেতন দিতে অপারগ তাহাদের কিছু কিছু আবার তেমন তেমন স্থলে সমস্তই ছাড়িয়া দেওয়া হইত। এই সমস্ত ছাড় ছুড়ের ভার রাজকুমার নামক একজন বৃদ্ধ কেরাণীর উপর সম্পূর্ণ ন্যস্ত। রাজকুমার সাদাসিদে লোক, একটু আধটু নেশাটা আশটা করেন, কিন্তু গরিব ছাত্রদের প্রতি তাঁহার বিশেষ দয়া। তাঁহার দয়ার গুণেই অক্ষম ছাত্রেরা বিনা বেতনেই পড়িতে পায়। বেতন সম্বন্ধে রাজকুমারের উপর কর্ত্তৃপক্ষের বিশ্বাস প্রগাঢ়। রাজকুমার—স্বয়ং তদন্ত করিয়া কাহাকেও অর্দ্ধ বেতন কাহাকে বা বিনা বেতনে ভর্ত্তি করেন। রাজকুমার যাহা করেন

কর্ত্তৃপক্ষ তাহাই মঞ্জুর করেন। কাজেই ছাত্রমহলে রাজকুমারের বেজায় প্রতিপত্তি। সকলেই বুড়ো কেরাণিকে বড়ই ভালবাসে, রাজকুমারও ছেলের জহুরী, কে কেমন ছেলে বেশ পাকা রকম জানেন। নরেনের অক্ষম বন্ধু হরিদাস চট্টোপাধ্যায় কোনও উপায়ে ফির টাকা যোগাড় করিয়াছেন, সম্বৎসরের বেতনের টাকার কিন্তু যোগাড় করিতে না পারিয়া একদিন নরেন্দ্রকে সে কথা জানাইলেন। নরেন্দ্র কহিলেন "তুই ভাবিস্নি, একজামিনের জন্যে নিশ্চিন্ত হয়ে প্রস্তুত হ। আমি রাজকুমারকে বলে সব ঠিক করে দেব। তোর মাহিনাটা মাপ করিয়ে দেব। কেবল ফির যোগাড়টা করিস্।"

বন্ধু উত্তর করিলেন, "ভাই, ফির যোগাড় আছে। মাইনেটা মাপ হলে সব গোল মিটে যায়।"

নরেন কহিলেন, "তবে ভাবনা কি, সব ঠিক হবে এখন।" দুই একদিন পরে তাঁহারা দুই বন্ধু একত্রে কেরাণি রাজকুমারের ঘরের সম্মুখে পদচারণ করিতে করিতে গল্প করিতেছেন এমন সময় সেখানে আরও অনেক ছাত্র আসিয়া উপস্থিত হইল। ক্রমে রাজকুমার আসিলেন। অনেক ছেলে একত্রে দেখিয়া রাজকুমার একবার সকলের বাকী বকেয়া বেতনের তাগাদা করিলেন, একটু জোর তাগাদা, "অমুক দিনের মধ্যে যে মাইনের টাকা না দেবে এবার তাকে পাঠান হবে না।" ছেলেরা রাজকুমারকে ঘেরিয়া আপন আপন দুঃখ কাহিনী বলিয়া বকেয়া বেতনের ক্ষমার জন্য আব্দার করিতে লাগিল। কতকগুলি ভাল ছেলে রাজকুমারের প্রিয় পাত্র। অন্য ছেলেদের বিষয় তদন্ত করিতে হইলে রাজকুমার অনেক সময় তাহাদের দ্বারাই করেন। নরেন তাহাদের মধ্যে এক জন এবং নরেন্দ্র বেশ জানিতেন যে তাঁহার উপরোধ রাজকুমার এড়াইতে পারিবেন না। রাজকুমারের মাথায় পাকায় কাঁচায় চুল, গোঁফও তদ্রূপ; কেবল তাহার উপর তামাকের ছোপের দাগ দুই পার্শ্বে; কখন তাঁহার চাপ্‌কানের বা জামার বোতাম দেবার অবকাশ হইত না, কাঁধে চাদর খানি জাহাজি কাছির মত পাকান। রাজকুমার যাইয়া আপনার চেয়ারের হাতলে চাদর খানি বাঁধিয়া তদুপরি উপবিষ্ট হইলেন। অমনি ঝন্ ঝন্ শব্দে ছেলেরা টাকা জমা দিতে আরম্ভ করিল। রাজকুমারের চারিধারে বেজায় ভিড়। নরেন্দ্র ভিড় ঠেলিয়া তাঁহার নিকট যাইয়া কহিলেন, "মশাই, অমুক দেখ্‌ছি মাইনেটা দিতে পারবে না। তা আপনি একটু

অনুগ্রহ করে তাকে মাপ করে দিন। তাকে পাঠালে সে ভাল রকম পাশ হবে। আর না পাঠালে তার সব মাটি হয়।"

রাজকুমার দাঁত মুখ খিচাইয়া "তোকে জ্যাঠামি করে সুপারিস করতে হবে না, তুই যা, নিজের চরকায় তেল দিগে যা। আমি ওকে মাইনে না দিলে পাঠাব না।" নরেন্দ্র তাড়া খাইয়া অপ্রতিভ হইয়া চলিয়া আসিলেন; তাঁহার বন্ধুর মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল, অতীব বিমর্ষ হইয়া নরেনের সঙ্গে সঙ্গে নিঃশব্দে ক্লাসে চলিলেন। নরেন্দ্র অপদস্থ হইবার পাত্র নহেন, বন্ধুর ভাব দেখিয়া তাঁহাকে অন্তরালে লইয়া কহিলেন, "তুই হতাশ হচ্ছিস্ কেন? ও বুড়ো অমন তাড়া তুড়ি দেয়। আমি বলছি তোর একটা উপায় করে দেব, তুই নিশ্চিন্ত হ। আমি যেমন করে পারি তোর একটা উপায় করব। তোর একজামিন দিতে পেলেইত হ'ল? ভাবিস্‌নি ভাই, নিশ্চয় বলছি তোর উপায় করব এই আমার প্রতিজ্ঞা।" বন্ধুর মুখের অন্ধকার ঘুচিয়া পুনরায় তাহাতে আশার আলোক দেখা দিল। বন্ধু ভাবিল নরেন বড়লোকের ছেলে, বাপ উকিল তাহার গান শিখিবার জন্য বেতন দিয়া ওস্তাদ রাখেন, নরেন হয়ত বাপকে বলিয়াই অক্ষম বন্ধুর কোন উপায় করিয়া লইবেন তাই তাঁহার এত আত্মপ্রত্যয়। রাজকুমার যখন বকেয়া বেতন না দিলে পরীক্ষা দিতে পাঠাইবেন না তখন নরেন নিশ্চয়ই টাকার যোগাড়ই করিবেন। বন্ধু এই রূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। নরেন্দ্র কলেজ হইতে বাটী আসিয়া হেদোর ধারে একটু আধটু বেড়াইয়া বাটী ফিরিয়া আসিলেন। অন্য দিন সন্ধ্যের পরে আসেন, আজ একটু ব্যস্ত হইয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আসিলেন। কিন্তু বাটী না যাইয়া সিমুলিয়ার বাজারের সম্মুখে পদচারণ করিতে লাগিলেন, আর মধ্যে মধ্যে হেদোর দিকে সতৃষ্ণ নয়নে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। বাজারের একটু পশ্চিমে যাইয়া দক্ষিণে একটী গলি, গলির মোড়ের উপরেই একটী বৃহৎ গুলির আড্ডা। ইতিমধ্যে আড্ডায় যাইয়া নরেন আড্ডাধারির সহিত চুপি চুপি দুই একটী কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, আড্ডাধারি বিনা বাক্যব্যয়ে ঘাড় নাড়িয়া 'না' বলিল। নরেন আবার হেদোর দিকে দুই চারি পদ অগ্রসর হইয়াই পার্শ্বের আর একটী গলির ভিতর যাইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার অন্ধকার চারিদিকে ঘেরিয়াছে, বেশ গাঢাকা মত হইয়াছে এমন সময় গলির সম্মুখে রাজকুমার আসিয়া উপস্থিত, অমনি

নরেন্দ্রনাথ তাঁহার পথরোধ করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইলেন, নরেন্দ্রনাথের দাঁড়াইবার ভঙ্গি দেখিয়াই রাজকুমারের মুখ শুকাইয়া গেল, নিজ ভাব চাপিয়া কহিলেন "কিরে দত্ত, এখানে কেন ?"

নরেন্দ্র গম্ভীর স্বরে কহিলেন "কেন আর কি, আপনার জন্য দাঁড়িয়ে আছি। দেখুন মশাই আমি বেশ জানি হরিদাসের অবস্থা বড়ই খারাপ, সে টাকা দিতে পারবে না, তাকে কিন্তু পাঠাতেই হবে, নইলে ছাড়বনা। যদি আমার কথাটী না রাখেন ত আমিও ইস্কুলে আপনার কথা রটাব ; ইস্কুলে টেঁকা দায় করে তুলব। এত ছেলের টাকা মাপ করলেন আর ও বেচারার কেন করবেন না ?" স্থির-প্রতিজ্ঞ নরেন্দ্রনাথের মুখের ভঙ্গি দেখিয়া রাজকুমারের মুখ শুকাইয়া গেল, তাড়াতাড়ি আদর করিয়া নরেন্দ্রের গলদেশে হস্ত জড়াইয়া কহিলেন, "বাবা। রাগ কচ্ছিস্ কেন ? তুই যা বল্‌ছিস তাই হবে, তাই হবে। তুই যখন বলছিস্ আমি কি তা করব না ?"

নরেন্দ্র একটু বিরক্তির ভাণ করিয়া কহিলেন, তবে কেন সকাল বেলা আমার কথাটা একেবারে উড়িয়ে দিলেন ?

রাজকুমার "কি জানিস তোর দেখাদেখি সব ছোঁড়াগুলো ঐ বায়না ধরবে তখন কাকে রেখে কাকে দেব বাবা ? আমি তখন এক বিষম বিপদে পড়্‌ব। আমায় আড়ালে বলতে হয়। তুই ছেলে মানুষ, ওসব ত বুঝিস্‌নি, কারুর সামনে কি ও কথা বলে ? তুই নিশ্চিন্ত হ। মাহিনের টাকাটা মাপ হবে, তবে ফির টাকা ত আর মাপ হয় না, সেটা দেবে ত ?"

নরেন্দ্র, "সেটার উপায় হতে পারে, তবে মাইনেটা আপনাকে ছেড়ে দিতে হবে, সে এক পয়সা দিতে পারবে না।"

'আচ্ছা, আচ্ছা, তাই হবে' বলিয়া রাজকুমার আড্ডার আসে পাশে বেড়াইয়া, নরেন চলিয়া গেলে আড্ডায় ঢুকিলেন।

নরেন্দ্র বুড়োর ভাবগতিক দেখিয়া যাইতে যাইতে মুখে কাপড় চাপিয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতে লাগিলেন। সহপাঠী বন্ধুটীর বাসা নরেন্দ্রনাথের বাটী হইতে বেশী দূর নহে—চোরবাগানে ভুবনমোহন সরকারের গলিতে। পরদিন প্রত্যুষে বন্ধুর বাসায় সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই উপস্থিত হইয়া বন্ধুর ঘরের দ্বারে করাঘাত করিতে করিতে গান ধরিলেন,—

গান ।

ভয়রোঁ—ঝাঁপতাল ।

অনুপম মহিম পূর্ণ ব্রহ্ম কর ধ্যান
নিরমল পবিত্র উষা-কালে ।
ভানু নব তাঁর প্রেমমুখছায়া
দেখ ঐ উদয় গিরি শুভ্র ভালে ॥
মধু সমীরণ বহিছে আজি শুভদিনে
তাঁর নাম গান করি অমৃত ঢালে,
চল সবে ভক্তিভাবে ভগবত নিকেতনে
প্রেমউপহার লয়ে হৃদয়থালে ॥

নরেনের মধুর কণ্ঠস্বর শুনিয়া সহপাঠীরা শয্যা পরিত্যাগ করিয়া তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া দিলেন। নরেন্দ্র কহিলেন, "ওরে, খুব ফূর্ত্তি কর, তোর কাজ ফতে হয়েছে, তোর মাইনের টাকাটা আর দিতে হবে না।" এই বলিয়া পূর্ব্বদিনের সমস্ত ঘটনা—রাজকুমারকে ভয় দেখান, ভয়ে তাঁহার কি প্রকার মুখের বিকৃতি হইয়াছিল তাহার নকল, তাহার পর কেমন করিয়া প্রতিদিন এদিক ওদিক উঁকি মারিয়া ফস্ করিয়া গুলির আড্ডায় প্রবেশ করেন ইত্যাদি নকলের সঙ্গে গল্প করায় সকলের মধ্যে মহা হাসির রোল উঠিল।

পরীক্ষার আর বেশী দেরী নাই, বোধ হয় মাস খানেকও নাই। বিপুল কলেবর ইংলণ্ডের ইতিহাস (Green's History of England) নরেন্দ্রনাথের একবারও পড়া হয় নাই। পরীক্ষায় পাশ হইতে হইবে বলিয়া নরেন্দ্রনাথের বিশেষ কোন চেষ্টাই তাঁহার সহপাঠী বন্ধুরা দেখেন না, মধ্যে মধ্যে নরেন্দ্র পূর্ব্বোক্ত বন্ধুদের বাসায় চোরবাগানে একটু আধটু পড়া শুনা করিতে যাইতেন বটে, কিন্তু তথায় যাইলে অধিক সময় কথাবার্ত্তা বা গান গাওয়াই হইত। তাঁহার মাতুলালয়ে যে ছোট ঘরটীতে থাকিতেন তাহার উত্তরে দ্বিতলে তদপেক্ষা একটী বড় ঘর। এই ঘরের পশ্চিমে একটী চোর কুঠরি বা দোছত্রির ঘর ছিল। ঐ বড় ঘরের ভিতর দিয়াই তন্মধ্যে প্রবেশের একটী মাত্র ক্ষুদ্র দ্বার ছিল। হামাগুড়ি দিয়া তাহার মধ্যে ঢুকিতে হয়, এত ছোট। তাহার দক্ষিণ দিকে একটী ক্ষুদ্র জানালা। এই সময় এক দিন

প্রাতে তাঁহার জনৈক বন্ধু তাঁহার নিকট যাইয়া 'নরেন' বলিয়া ডাকিলে নরেন উত্তর দিলেন বটে, কিন্তু বন্ধুটী তাঁহাকে ঘরের মধ্যে চারিদিক খুঁজিয়া না পাইয়া একটু আশ্চর্য্য হইলেন। এমন সময় নরেন কহিলেন, "এই চোর কুঠরির ভেতর আছি।" সেইখান হইতেই বন্ধুর সহিত কথাবার্ত্তা কওয়া হইল। পরে বন্ধু শুনিলেন বিগত দুই দিন ঐ কুঠরির মধ্যে বসিয়া নরেন ইংলণ্ডের ইতিহাস পাঠ করিতেছেন, সংকল্প করিয়া বসিয়াছেন যে একাসনে বসিয়া পাঠ শেষ করিয়া তবে কুঠরি হইতে বাহির হইবেন। নরেন্দ্র কার্য্যতও তাহাই করিলেন। তিন দিনে ঐ বিপুলকায় পুস্তকখানি পূর্ণ আয়ত্ত করিয়া বাহিরে আসিলেন। পরীক্ষার দিন আসিল, নরেনের কোন উদ্বেগ বা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য কোন উৎকণ্ঠা দেখা গেল না।

আজ পরীক্ষার প্রথম দিন, সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই নরেন শয্যা ত্যাগ করিয়া ইতস্ততঃ পদচারণ করিতে করিতে চোরবাগানে হরিদাস ও দাশরথির বাসায় উপস্থিত। বন্ধুরা এখনও শয্যায় শায়ীত। তাঁহাদের ঘরের দ্বারে আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে গান ধরিলেন,—

ভৈরবী—ঝাঁপতাল।

মহাসিংহাসনে বসি শুনিছ হে বিশ্ব পিতঃ,
তোমারি রচিত ছন্দ মহান্ বিশ্বের গীত।
মর্ত্তের মৃত্তিকা হয়ে, ক্ষুদ্র এই কণ্ঠলয়ে,
আমিও দুয়ারে তব হয়েছি হে উপনীত।
কিছু নাহি চাহি দেব, কেবল দর্শন মাগি,
তোমারে শুনাব গীত, এসেছি তাহারি লাগি।
গাহে যথা রবিশশী, সেই সভামাঝে বসি,
একান্তে গাহিতে চাহে, এই ভকতের চিত।"

নরেনের গলার আওয়াজ পাইয়া বন্ধুরা শশব্যস্তে উঠিয়া দরজা খুলিলেন, দেখিলেন নরেন আনন্দ-প্রদীপ্ত বদনে একখানি পুস্তক হস্তে দাঁড়াইয়া গান গাইতেছেন। হয়ত একটু পাঠ করিবেন ভাবিয়া বন্ধুর বাসায় আসিয়া উপস্থিত, কিন্তু ঘরের দ্বারে দাঁড়াইয়া গান ধরিয়া যে ভাবোচ্ছ্বাসের বন্যা ছুটাই-লেন, তাহার অবরোধ করিয়া পড়াশুনা করা আর সে দিন হইল না। বেলা নয়টা পর্য্যন্ত, "আমরা যে শিশু অতি," "অচল ঘন গাহন গুণ গাও

তাঁহারি” প্রভৃতি গান ও গল্প চলিল। পাশের ঘরে নরেনের অপর একটী সহপাঠী বাস করিতেন। নরেনের গান প্রথম আরম্ভ হইলেই তিনি তথায় আসিয়া জুটিলেন, কিন্তু অল্পক্ষণ শুনিবার পর পরীক্ষার কথা তাঁহার মনে হইল। তিনি গানের সভা পরিত্যাগ কালে বন্ধুভাবে নরেনকে পরীক্ষার কথা স্মরণ করাইযা দিলেন, নরেন্দ্র একটু হাসিলেন মাত্র, কিন্তু গানের স্রোত থামিল না দেখিযা বন্ধু তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। একজন বন্ধু আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “নরেন, একজামিনের দিন কোথায় একটু আধটু খুঁৎ খাঁৎ যা আছে সে টুকু সেরে নেবে, না তোমার দেখছি সকলি বিপরীত, বেড়ে ফূর্ত্তি কচ্ছ।”

নরেন উত্তর করিলেন, “হ্যাঁ তাইত করছি, মাথাটা সাফ রাখছি, মগজটাকে একটু জিরেন দেওয়া চাই, নইলে এই দু ঘণ্টা যা মাথায় ঢোকাবে সেটা ঢুকে আগেকার গুলোকে গুলিয়ে দেবে বইত নয়। এত দিন পড়ে পড়ে যা হল না তা কি আর দু এক ঘণ্টায় হয়? হয় না। একজামিনের দিন সকাল বেলাটা কেবল ফূর্ত্তি, কেবল ফূর্ত্তি করে শরীর মনকে একটু শান্তি দিতে হয়, ঘোড়াটা খেটে এলে তাকে ডলাই মলাই করে তাজা করে নিতে হয়। মগজটাকেও তাই করতে হয়।”

সমাজ ও সংস্কার।

[পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ।]

ইংরাজী শিক্ষার প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে সমাজসংস্কার এই কথাটী আমাদের কর্ণগোচর হইতে আরম্ভ করিয়াছে। বেদে, ধর্ম্মশাস্ত্রে, পুরাণে বা ইতিহাসে এই শব্দটী খুঁজিয়া পাওয়া যায় না,—তাহা স্থির, তাই বলিয়া ইহা বুঝায় না যে বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া এই সময় পর্য্যন্ত আমাদের সমাজের কোন প্রকার পরিবর্ত্তনই হয় নাই। পরিবর্ত্তন প্রতিদিনই হইতেছে ও যতদিন সমাজ থাকিবে, ততদিন ধারাবাহিক পরিবর্ত্তন হইবেই হইবে। ব্যক্তি সমষ্টির নামই সমাজ, প্রত্যেক ব্যক্তিরই পরিবর্ত্তন যখন অবশ্যম্ভাবী

তখন সমাজ পরিবর্ত্তিত বা সংস্কৃত হইবেই হইবে, সেই পরিবর্ত্তনে বাধা দিলে চলিবে কেন? তাই বলি, পরিবর্ত্তন বা সংস্কার সমাজশরীরের অবশ্যম্ভাবী—ইহা কেনা স্বীকার করিবে?—কিন্তু এই সমাজসংস্কার শব্দটী—বর্ত্তমান আস্তিক হিন্দু সন্তানের নিকট এত অসহনীয় কেন,—ইহা কি ভাবিবার বিষয় নহে?

প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনে যতপ্রকার পরিবর্ত্তন হয়—মোটামুটী তাহা দুই ভাগে বিভক্ত, যথা জ্ঞানসাধ্য ও স্বয়ম্ভাবী; এইরূপ সমাজশরীরেও যতপ্রকার পরিবর্ত্তন হয় তাহাও দুইপ্রকার—যথা জ্ঞানসাধ্য ও স্বয়ম্ভাবী।

ব্যক্তিবিশেষের জ্ঞানসাধ্য পরিবর্ত্তন, যথা—নখ বাড়িয়াছে কাটিয়া ফলা, চুল বাড়িয়াছে ছাঁটিয়া ফেলা, শীত নিবারণের জন্য শরীরে বস্ত্রধারণ, গ্রীষ্মকাল আসিলে আবার তাহার পরিত্যাগ, দুষ্ট প্রতিবাসী অত্যাচার করিতেছে, তাহার জন্য আদালতের আশ্রয় গ্রহণ, আহারে অরুচি হইয়াছে উপবাস বা ঔষধ সেবন ইত্যাদি এইপ্রকার পরিবর্ত্তনগুলি আমরা ভাবিয়া চিন্তিয়া করিয়া থাকি। এইজন্য এইগুলিকে জ্ঞানসাধ্য পরিবর্ত্তন বলা যায়। স্বয়ম্ভাবী পরিবর্ত্তন, যথা—বাল্য, যৌবন, বার্দ্ধক্য, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য প্রভৃতি—তুমি জান আর নাই জান, তুমি ইচ্ছা কর বা নাই কর, এই সকল স্বাভাবিক বা স্বয়ম্ভাবী পরিবর্ত্তন তোমার হইবেই হইবে।

ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে কোন্‌টী জ্ঞানসাধ্য পরিবর্ত্তন, আর কোন্‌টী স্বয়ম্ভাবী পরিবর্ত্তন, তাহা বুঝিয়া লইতে বড় একটা বেগ পাইতে হয় না, সেইজন্য এই পরিবর্ত্তন যথাসময়ে অনায়াসেই সংঘটিত হইতে পারে, এই জন্য এই পরিবর্ত্তনের জন্য কোন আন্দোলন বা কোলাহলের আবশ্যকতা নাই, চন্দ্র সূর্য্যের উদয় বা ঋতু পরিবর্ত্তনের ন্যায় উহা যথাসময়ে বিনা বাধায় হইয়া থাকে!

সমাজের পক্ষে কিন্তু এই দ্বিবিধ পরিবর্ত্তনের মধ্যে প্রকৃত পার্থক্য কতটুকু তাহা বুঝিবার সামর্থ্য অতি অল্প লোকেরই আছে। এই পার্থক্য জানিতে হইলে সমাজের পূর্ব্বাপর ইতিহাস ভাল করিয়া জানিতে হয়, অন্যান্য দেশের মনুষ্যসমাজের গতিবিধির প্রতি বিলক্ষণ দৃষ্টি থাকা চাই। কোন্ উপাদানের উপর নির্ভর করিলে সমাজের উন্নতি দিন দিন প্রসার পায় তাহাও ভাল করিয়া জানা চাই। এই সকল সামাজিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য না

করিয়া আমাদের পাশ্চাত্যভাবপ্রণোদিত নব্য শিক্ষিতবৃন্দ সমাজের জ্ঞান-সাধ্য পরিবর্ত্তন করিতে উদ্যত হইয়া আসিতেছেন, সমাজের কোন্ পরিবর্ত্তন স্বয়ম্ভাবী এবং কোন্‌টী জ্ঞানসাধ্য তাহার পরস্পর বিভাগ ভাল করিয়া না বুঝিয়া সমাজসংস্কার কার্য্যে তাঁহারা অগ্রসর হইয়া থাকেন বলিয়াই আজ স্থিতিশীল আস্তিক হিন্দুগণ তাঁহাদের সমাজসংস্কারের নামে শঙ্কিত হইয়া থাকেন এবং সমাজসংস্কারের কথা শুনিলে ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠেন।

যাঁহারা আমাদের সমাজসংস্কারের পক্ষপাতী এবং যাঁহারা বিরোধী, উভয় পক্ষের নিকট আমার বিনীত নিবেদন এই যে দেশের যে দুরন্ত সময় উপস্থিত হইতেছে, তাহাতে এখন পরস্পরের প্রতি পরস্পরের বিশ্বাস ও প্রীতি ব্যতিরেকে আমরা কেহই সমাজের হিতকর কোন কার্য্যই করিতে সমর্থ হইব না। ইহা যখন স্থির, তখন রাগারাগি, দলাদলি ও গালাগালি ছাড়িয়া একবার প্রকৃত কর্ত্তব্য বিষয়ে মিলিয়া মিশিয়া একটা নির্ণয় করাই উচিত, বিবাদে মনোমালিন্য এবং পরস্পরের ক্ষতি ছাড়া আর কি লাভ থাকিতে পারে?

আমি বলিতে চাহি যে আমাদের সমাজে পূর্ব্বোক্ত দ্বিবিধ পরিবর্ত্তনের প্রকৃত স্বরূপ পৃথক্ ভাবে প্রথম বুঝিতে হইবে, তাহার পর যে গুলি স্বয়ম্ভাবী পরিবর্ত্তন তাহার প্রতি বাধা দিবার চেষ্টা হইতে সম্পূর্ণ ভাবে বিরত হইতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, যে পরিবর্ত্তন গুলি জ্ঞানসাধ্য সেই গুলিকে বাছিয়া লইতে হইবে এবং যে উপায়ে সেই জ্ঞানসাধ্য পরিবর্ত্তনগুলি সমাজের হিতকর বলিয়া বিবেচিত হইলে সত্বর অনুষ্ঠিত হইতে পারে, তাহার জন্য যাহাতে সাধারণের সমবেত চেষ্টা হয় সেই পক্ষে সমাজ নেতৃ-গণের যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে।

প্রথম, সমাজের স্বয়ম্ভাবী পরিবর্ত্তন। ব্যক্তিগত স্বয়ম্ভাবী পরিবর্ত্তনের ন্যায় সমাজ শরীরেরও স্বয়ম্ভাবী পরিবর্ত্তন সাময়িক অবস্থার অধীন। সুবিস্তৃত ভূখণ্ডব্যাপী একপ্রকার রাজপ্রবর্ত্তিত নিয়ম বা আইন কানুন পূর্ব্বতন কাল প্রচলিত রাজপ্রবর্ত্তিত নিয়মের বসে প্রতিষ্ঠিত সামাজিক নিয়মের পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে ইহা অস্বীকার করিবার যো নাই। কয়েকটী উদাহরণ দেখিলেই ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। ব্রিটীশ সাম্রাজ্যের অধীনস্থ প্রজাবর্গের মধ্যে রাজনৈতিক অধিকার—সকলেরই পক্ষে একরূপ

হওয়াতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের—ব্যবহার মার্গে—সমতারূপ ফল যে অবশ্যম্ভাবী তাহা আমাদের কাহারও অবিদিত নহে। পূর্ব্বে আমাদের সমাজে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের মধ্যে একাসনে উপবেশনাদি নিষিদ্ধ ছিল, এক্ষণে এক গাড়ীতে (রেল বা ট্রাম) একই ক্লাসে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, ডোম,চামার প্রভৃতি সকলেই উপবেশন করিতেছে, আভিজাত্যাভিমানী গুরুঠাকুরের পক্ষে এই প্রকার উপবেশন ক্লেশকর হইলেও তাঁহার সে অভিমানের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিতে কেহই কুণ্ঠা বোধ করেন না। আমাদের ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য-পরিচালিত সমাজ-শরীরে এই পরিবর্ত্তনটী বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থানুসারে স্বয়ম্ভাবী পরিবর্ত্তন। সহস্র চেষ্টা করিলেও এই পরিবর্ত্তনে বাধা দিতে পারেন এরূপ ক্ষমতাশালী ব্যক্তি আমাদের সমাজে কেহই নাই।

আমাদের সমাজে চির প্রচলিত নিয়ম ছিল যে, দ্বিজাতিগণই বেদ পাঠে অধিকারী, শূদ্রের বেদ পাঠ করাত দূরের কথা, সে যদি বৈদিক মন্ত্র কর্ণে শ্রবণ করে তাহা হইলে তাহার কর্ণে অগ্নিবর্ণ উত্তপ্ত তৈল ঢালিয়া তাহার ঐহিক জ্বালা যন্ত্রণার নিবৃত্তি করিতে হইবে। বর্ত্তমান সময়ে এই বিধি চলিতে পারে না এবং চলিতেছেও না তাহা আমরা স্বচক্ষেই দেখিতেছি। বঙ্গমাতার কৃতী সন্তান স্বর্গগত রমেশচন্দ্র শূদ্র হইয়াও বেদের অনুবাদ করিয়াছেন। অনেক ব্রাহ্মণ সন্তান সেই অনুবাদের সাহায্যে আংশিক ভাবেও বেদার্থের উপলব্ধি করিয়া আত্মাকে কৃতার্থ বোধ করিয়া থাকেন। ব্যবসায়ের খাতিরে অসম্ভব গোঁড়ামীর পক্ষপাতী অশিক্ষিত সম্পাদিত দুই একখানা খবরের কাগজের পলিসি প্রণোদিত কটূক্তিরূপ কদুষ্ণ তৈল বিন্দুপাত ব্যতিরেকে হিন্দু সমাজ সেই রমেশচন্দ্রের দণ্ডের জন্য কটাহপূর্ণ তৈল উত্তপ্ত করিবার জন্য তখন ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল তাহার কোন প্রমাণ আমরা এখনও পাই নাই। প্রত্যুত সেরূপ কার্য্যে অগ্রসর হইবার চিন্তা এখন উন্মত্ত ব্যতিরেকে অন্য কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নহে।

দ্বিতীয় স্বয়ম্ভাবী পরিবর্ত্তন—যথা এতদিন পর্য্যন্ত দুর্নীতি পরিচালিত ব্রাহ্মণ প্রাধান্যের বশে যে সকল জাতি সৌভাগ্য ও সম্পদের অধিকারী হইয়াও দাসরূপে, অস্পৃশ্যরূপে ও অনাচরণীয় জল রূপে থাকিতে বাধ্য হইয়াছিল, ব্রাহ্মণপ্রাধান্যের এই শোচনীয় অধঃপতনের দিনে সেই সকল

হিন্দু সমাজের অধঃপতিত এবং নিপীড়িত জাতিগণের—সমাজের চক্ষে উচ্চবর্ণের সহিত সমতালাভের সাগ্রহ অনুষ্ঠান, নমঃশূদ্রগণের অদম্য অধ্যবসায়, তাম্রজীবিগণের নীতিপূর্ণ একতাবন্ধন, কায়স্থগণের অর্থ ও মনস্বিতা পরিচালিত সম্প্রদায় গঠন প্রভৃতি বর্ত্তমান সময়োচিত কার্য্য-গুলি এই সামাজিক স্বয়ম্ভাবী পরিবর্ত্তনের অন্তঃপাতি। জাত্যভিমান ও অহমিকার স্বার্থ প্রণোদিত সহস্র চেষ্টা সহস্র কেন্দ্র হইতে উত্থিত হইয়াও এই—এতদিন পর্য্যন্ত অন্যায় ভাবে নিপীড়িত জাতি বৃন্দকে আত্মোৎ-কর্ষ স্থাপনের নৈসর্গিক পথ হইতে কখনই বিমুখ করিতে পারিবে না, তোমরা তাহাদিগকে দল বাঁধিয়া উপনয়ন গ্রহণ করিতে বাধা দিতে পার বা নাই পার তাহাতে তাহাদের কিছুই আসিয়া যাইবে না—তোমার ন্যায় জাত্যভিমানদৃপ্ত উপবীতধারী হইতে ব্যবহার জগতে তাহারা যে কোন অংশে ন্যূন নহে তাহা তাহারা নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণের সাহায্যে ব্যবস্থাপিত করিবেই করিবে। তাহাতে বাধা দিতে তুমি কে? তুমি তাহার সম্মুখে প্রলয় ঝটিকার মুখে তৃণ, প্রতিপদের কোটালের মুখে জীর্ণ তরণী ছাড়া আর কি হইতে পার বল দেখি?

আমাদের সমাজের জ্ঞান-সাধ্য সংস্কার বা পরিবর্ত্তন যে গুলি এক্ষণে নিতান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া অনেকে বিবেচনা করিয়া থাকেন তাহার মধ্যে যে কয়টী প্রধান আপাততঃ সেই কয়টীর উল্লেখ করিতেছি। ১ম, বালিকা বিবাহ নিবারণ। একদল বলেন বেদে এবং কল্পসূত্রসমূহে আমরা দেখিতে পাই যে কন্যা বয়ঃপ্রাপ্তা হইলেই তাহার বিবাহ হইবার বিধি ছিল। কল্পসূত্র সমূহে স্পষ্টই বলিয়া দিতেছে যে বিবাহের চারিদিন পরেই গর্ভাধান হওয়াই প্রশস্ত, এরূপ অবস্থায় আট বৎসর হইতে আরম্ভ করিয়া ১২ বৎসরের মধ্যে কন্যার বিবাহ দিয়া নানা কারণে সমাজশরীরকে দুর্ব্বল করিবার আবশ্যকতা কি? জগতের অন্যান্য সকল সভ্যজাতির মধ্যেই কন্যা বয়স্থা হইলে বিবাহ দিবার বিধান আছে ইহা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছি এবং ঐ সকল সভ্য জাতির মধ্যে অল্প বয়সে কন্যা বিবাহ দেওয়ার যে সকল অবশ্যম্ভাবী বিষময় পরিণাম তাহাও দেখিতে পাওয়া যায় না—এরূপ স্থলে আমরাই বা কেন বালিকা কন্যা গুলিকে অপরের ভাগ্যের সহিত জুটাইয়া দিয়া অকালে সহস্র সহস্র লক্ষ লক্ষ বালবিধবার সৃষ্টি করি? আরও একটী কথা এই যে, আমরা যদি আমাদের সমাজে বালিকা কন্যার বিবাহ বন্ধ করিতে পারি তাহা হইলে

খুব সম্ভব যে আমাদের সমাজে আর বিধবার বিবাহ দিবার আবশ্যকতাও থাকে না। এ দেশের রীতি নীতি ও প্রকৃতির প্রতি প্রণিধান সহকারে পর্য্যবেক্ষণ করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় এ দেশের রমণী জ্ঞানপূর্ব্বক এক জনকে পতি বলিয়া অঙ্গীকার করিলে তাহার মৃত্যুর পর অন্য ব্যক্তিকে সেইরূপ পতি ভাবে অঙ্গীকার করিতে নিতান্তই বিমুখ হইয়া থাকে, এরূপ অবস্থায় পতি কি বস্তু তাহা জানিবার অধিকার যখন কন্যার হইবে সেই সময় হইতে যদি তাহার বিবাহের ব্যবস্থা করিতে পারা যায় তাহা হইলে দুর্ভাগ্য বশতঃ যদি তাহার বৈধব্যও ঘটে সে কখনই অন্য ব্যক্তিকে পতি বলিয়া অঙ্গীকার করিতে অভিলাষিণী হইবে না।.শতকরা নিরানব্বই স্থানে যে এই প্রকার ঘটিবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু যে দুগ্ধপোষ্য বালিকা তাহার যদি বিবাহ দেওয়া হয় এবং দুর্ভাগ্য বশতঃ তাহার পতি কি বস্তু এই প্রকার জ্ঞান হইবার যোগ্য বয়ঃক্রমপ্রাপ্তির পূর্ব্বেই যদি পতি বিয়োগ ঘটে তাহা হইলে চারিদিকে বিলাসের বন্যায় ভাসমান সমাজের বক্ষের মধ্যে বাস করিয়া উদ্দীপনার সহস্র সহস্র হেতুর সহিত নিত্য সংশ্রবে আসিয়া সে যে আত্মসংযম অবলম্বন পূর্ব্বক পবিত্র বৈধব্য ব্রত রক্ষা করিয়া এই পাপ-তাপ-সঙ্কুল অধঃপতিত সমাজে অনিন্দ্য দেবী প্রতিমার ন্যায় সর্ব্বদা বিশুদ্ধ ভাবে বিচরণ করিবে তাহার সম্ভাবনা যে দিন দিন ক্রমশঃ ক্ষীণতর হইয়া আসিতেছে ইহা কে অস্বীকার করিতে পারে? এইত গেল বালিকা-বিবাহের বিরোধী দলের কথা—যাঁহারা কিন্তু বালিকা বিবাহের বিরোধী নহেন প্রত্যুত বালিকা বিবাহের সমর্থন করিয়া থাকেন—তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে আমাদের সমাজ মহর্ষিগণের আর্য্য প্রতিভা দ্বারাই পরিচালিত হইয়া থাকে, সেই মহর্ষিগণ যখন "অষ্টবর্ষা ভবেদ্ গৌরী নববর্ষা তু রোহিণী" ইত্যাদি বচনের দ্বারা আমাদের সমাজে বালিকা বিবাহের বিধান দিয়াছেন তখন আমাদের সমাজ হইতে কখনও বালিকা বিবাহ বন্ধ হওয়া উচিত নহে। অবশ্য স্বীকার করি শ্রুতি ও গৃহ্যসূত্রে সমূহে যুবতীবিবাহবিষয়ে বিধান আছে কিন্তু মনু প্রভৃতি সংহিতাকার ঋষিগণ কি শ্রুতি ও গৃহ্যসূত্রের খবর রাখিতেন না? খবর রাখিয়াও তাঁহারা যখন কন্যার ঋতু দর্শনের পূর্ব্বেই বিবাহ দিবার সনির্ব্বন্ধ ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন তখন আমরা অজ্ঞ মোহান্ধ জীব হইয়া সেই সর্ব্বজ্ঞ মহর্ষিগণের ব্যবস্থার বিরোধে চলিব? আরও এক কথা এই যে, মনু হইতে আরম্ভ করিয়া আমাদের পিতৃপুরুষ পর্য্যন্ত আমাদের

সমাজে এই বালিকাবিবাহ প্রচলিত আছে কিন্তু এখন বালিকা বিবাহের উপর তোমরা যে সকল দোষারোপ করিতেছ পূর্ব্বে আমাদের পিতৃ পিতামহগণের আমলে বালিকাবিবাহের উপর সেইরূপ দোষারোপ করিতে কেহই সাহসী হইত না; প্রত্যুত যুবতিবিবাহেই ব্যভিচার প্রভৃতি বহুতর সমাজ বিধ্বংসকর দোষের সম্ভাবনা আছে,বালিকা বিবাহে সেইরূপ দোষের সম্ভাবনা অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। আরও একটী কথা এই যে বালিকা বিবাহে সন্তান দুর্ব্বল ও অল্পায়ুঃ হয় ইত্যাদি দোষের কথা এখনই শুনা যায়। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যেরূপ বলিষ্ঠ, সুস্থকায় ও দীর্ঘায়ু হইতেন এখন আমরা সেইরূপ বলিষ্ঠ, সুস্থকায় ও দীর্ঘায়ু হই না ইহা এক্ষণে সকলেরই মুখে শুনিতে পাই; এখন কিন্তু পূর্ব্বাপেক্ষা বালিকা বিবাহ অনেক পরিমাণে কমিয়াছে, তখন কিন্তু বালিকা বয়সেই সকল কন্যার বিবাহ হইত, তবে এখন আমাদের মধ্যে এই দুর্ব্বলতা, রোগবাহুল্য এবং অল্পায়ুষ্কতা হইবার কারণ কি? বালিকা বিবাহ বা বাল্য বিবাহ যে ইহার কারণ তাহা ত নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে প্রমাণ হইতেছে না; এরূপ অবস্থায় ভিন্ন দেশীয় সভ্যসমাজের আদর্শে সমাজ হইতে বালিকা বিবাহ বন্ধ করিবার চেষ্টা করা কি উচিত?

এই ভাবে বালিকা বিবাহের অনুকূল ও প্রতিকূল নানা প্রকার যুক্তির উল্লেখ করা যাইতে পারে। এরূপ স্থলে সমাজ-নেতৃগণের কি কর্ত্তব্য তাহা বলিবার পূর্ব্বে আমি আর একটী গুরুতর জ্ঞানসাধ্য সমাজসংস্কার বা পরিবর্ত্তনের উল্লেখ করিতেছি। জ্ঞানার্জ্জনের জন্য আমাদের সমাজের শিক্ষার্থী যুবকবৃন্দের বিলাত প্রভৃতি দূরতর দেশে গমন উচিত কিনা ইহা লইয়া আমাদের সমাজে কয়েক বৎসর হইতে একটা বেশ আন্দোলন চলিতেছে। এই প্রকার বিদেশযাত্রাও সমাজের জ্ঞানসাধ্য সংস্কার বা পরিবর্ত্তনের মধ্যে উল্লিখিত হইবার যোগ্য।

বিলাত যাত্রা প্রকৃত পক্ষে দেশে যে চলিয়া গেল তাহা আর অস্বীকার করিবার যো নাই. কায়স্থ এবং বৈদ্য সমাজের মধ্যে এখন বিলাত প্রত্যাগত ব্যক্তিকে ব্যবহার্য্য বলিয়া অঙ্গীকার করিতে বড় একটা আপত্তি নাই বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না—কেবল মাত্র ব্রাহ্মণ সমাজেই এক্ষণে বিলাত প্রত্যাগত কৃতপ্রায়শ্চিত্ত ব্যক্তির ব্যবহার্য্যতা বিষয়ে এবং তাহার বিরুদ্ধে খুব আন্দোলন চলিতেছে, প্রকৃত পক্ষে এক্ষণে যে ভাবে বিলাতে

যাইয়া আহার ও ব্যবহার করিতে হয় তাহাতে ব্রাহ্মণ্য রক্ষা করিয়া বিলাত হইতে প্রত্যাগমন করা কোন ব্রাহ্মণ সন্তানের পক্ষেই সম্ভবপর নহে। আহারের বিশুদ্ধির উপরই বর্ত্তমান হিন্দু সমাজ ও বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ্য নির্ভর করিয়া থাকে ইহাই হইল আস্তিক হিন্দু মাত্রেরই বিশ্বাস। ম্লেচ্ছ জাতির অন্ন যদি জ্ঞানপূর্ব্বক আটচল্লিশ বার ভক্ষণ হয় তাহা হইলে ভক্ষণকর্ত্তা ব্রাহ্মণ হইলে তাহার পাতিত্য হয় এবং সেই পতিত ব্রাহ্মণের প্রায়শ্চিত্ত করিলেও ব্যবহার্য্যতা হয় না, ইহাই হইল এতদ্দেশ প্রচলিত ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবস্থা, কিন্তু আমাদের বঙ্গদেশ প্রচলিত ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবস্থাই যে ভারতের সমগ্র হিন্দু-সমাজের সম্মত ব্যবস্থা তাহা বলা যায় না। মিতাক্ষরা ও মদন পারিজাত প্রভৃতি প্রামাণিক স্মৃতি নিবন্ধকারগণ কিন্তু অন্য প্রকার বলিয়া থাকেন, তাঁহারা বলেন ব্রাহ্মণে জ্ঞান পূর্ব্বক ৪৮বার বা তদধিক বার ম্লেচ্ছান্ন ভক্ষণ করিলে তাহার পাতিত্য হয় ইহা সত্য, কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত করিলে সে সমাজে পূর্ব্বের ন্যায় ব্যবহার্য্য হইতে পারে। এই বিষয় লইয়া অনেক দিন হইতে বাদানুবাদ চলিতেছে বটে কিন্তু আমাদের সমাজের নেতৃ শক্তির ঐকান্তিক অভাব বশতঃ কোন নির্ণয় হইতেছে না, অথচ যাহার সামর্থ্য আছে সে সমাজপতিগণের একঘরে করিবার ভয় প্রদর্শনের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া বিলাত যাইতেছে এবং অকুতোভয়ে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক সমাজের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে, জন কয়েক লোক তাহার বিরুদ্ধে গোলযোগ করিতেছে এই মাত্র, প্রকৃত পক্ষে সে যে আমাদের সমাজে চলিতেছে সে বিষয় বোধ করি প্রতিকূল বা স্বমাবলম্বীগণ সংশয় করেন না।

এই প্রকার আরও অনেকগুলি জ্ঞানসাধ্য সমাজ সংস্কার আছে, যেমন বরের অভিভাবকগণ কন্যার পক্ষ হইতে জিদ করিয়া অত্যধিক মাত্রায় পণ গ্রহণ করেন। এই পণ-গ্রহণ-ব্যাপারে বঙ্গদেশের মধ্যবিত্ত গৃহস্থকুল সর্ব্বনাশের পথে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে অথচ ইহার প্রতিকারের জন্য সমাজের নেতৃবর্গের মধ্যে যেরূপ চেষ্টা হওয়া উচিত তাহার কোন চিহ্নই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না।

এই সকল জ্ঞানসাধ্য প্রধান প্রধান সংস্কার গুলি যদি অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয় তাহা হইলে কি উপায়ে তাহার আরম্ভ করিতে হইবে এবং কি উপায়েই বা ঐ সকল সংস্কার বর্ত্তমান সময়ে সর্ব্ববাদিসম্মত না হউক অধিকাংশ লোকের সম্মত যেরূপে হইবার সম্ভাবনা আছে তাহা আগামী বারে আলোচনা করিব।

ফলকথা এই যে হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজ চিন্ময় ব্রহ্মের ন্যায় সর্ব্বদা এক স্বরূপ নহে। সময় ভেদে সামাজিক গণের শিক্ষা ও আচার ভেদে ধর্ম্ম ও এই সমাজ চিরদিনই পরিবর্ত্তন প্রাপ্ত হইতেছে এবং হইবে। আত্মার ঐহিক ও পারত্রিক উন্নতির পথ যাহাতে কণ্টকিত ও সঙ্কীর্ণ না হয় সেই ভাবে দৃষ্টি রাখিয়া এই বিরাট সমাজশরীরের যে গুলি জ্ঞানসাধ্য সংস্কার সে গুলি যথা সময়ে আমাদিগকে করিতেই হইবে। গোঁড়ামি বা দলাদলি করিয়া এই জীর্ণ সমাজের শুষ্ক দেহে ঈর্ষা ও বিদ্বেষের বহ্নি প্রজ্জ্বলিত করিলে কালে সে অগ্নিতে যিনি অগ্নিপ্রজ্জ্বলনে সহায়তা করিবেন তাঁহাকেও দগ্ধ হইতে হইবে। আমাদের ধর্ম্মের ন্যায় উদার ধর্ম্ম জগতে আর নাই। সেই ধর্ম্মের স্বরূপ জানিতে হইলে কেবল অন্ধ বিশ্বাস ও একদেশদর্শিতার উপর নির্ভর করিলে চলিবে না,—অধিকারভেদে ধর্ম্মাচরণের ভেদ এই মাহামন্ত্র যিনি বুঝিবেন না এবং ইহাতে যাঁহার বিশ্বাস নাই তিনি ধর্ম্ম ও সমাজের স্বরূপ কিছুই বুঝেন না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যাহার যতটুকু অধিকার সে সেই অধিকার অনুসারে—যাহাতে আত্মার ঐহিক ও পারত্রিক উন্নতির পথ প্রশস্ত হয় এবং জাতি ও বর্ণের চিরন্তন উৎকর্ষ ও অপকর্ষের কথা ভুলিয়া গিয়া সেই উপায়ের অনুষ্ঠান যাহাতে বিনা বাধায় সমাজের ভিতর হইতে পারে তাহার জন্যই সমাজের নেতাগণ মিলিয়া মিশিয়া চেষ্টা করুন।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের এই সুশীতল শান্তিময় অঙ্কে বিশ্রাম লাভ করিবার অবসর পাইয়াও আমরা যদি রাগ ও দ্বেষ বিস্মরণ পূর্ব্বক এই পতনোন্মুখ জীর্ণ সমাজের আবশ্যকীয় সংস্কার করিবার জন্য বদ্ধ পরিকর না হই তাহা হইলে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত যে আমরাই হইব, তাহা কি এখনও আমাদের বুঝিতে বাকী আছে?

সর্ব্বোপনিষদের সারভূত সত্য জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের সত্তায় জীব আত্মসত্তা যাহাতে ক্রমে ক্রমে সাধনার বলে মিশাইতে পারে তাহাই হইল আমাদের ধর্ম্মের সর্ব্ব প্রধান সাধনা মার্গ। এই সাধনামার্গের যাহা অনুকূল তাহাই আমাদের গ্রাহ্য,যাহা প্রতিকূল তাহাই আমাদের পরিহার্য্য—এই মহাসত্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তোমরা সমাজের রীতি নীতি সংশোধিত করিতে প্রস্তুত হও, দেখিবে ভগবান্ তোমাদের সহায় হইবেন, তোমরা আবার এক হইতে পারিবে, আবার তোমরা এই মর

জগতে তোমাদের পুণ্যশ্লোক পূর্ব্বপুরুষগণের অমর কীর্ত্তিসমূহের ন্যায় সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাইয়া সমাজে অমরধামের সুখ-শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যের ত্রিধারা বহাইতে পারিবে। ভুলিও না ভাই, তোমরা অমৃতের সন্তান, অমৃত তোমাদের লক্ষ্য, অজ্ঞানই তোমাদের শত্রু, জ্ঞানই তোমাদের আত্মোৎকর্ষের একমাত্র পথ। ইতি

সমালোচনা।

১।

আশ্রম চতুষ্টয়। শ্রীভূপেন্দ্র নাথ সান্যাল প্রণীত; ইণ্ডিয়ান্ পাব্-লিসিং হাউস হইতে প্রকাশিত; মূল্য ॥০ আট আনা মাত্র।—

পুস্তকের ভূমিকায় লেখক বলিতেছেন "ব্রহ্ম যদি সত্য হন এবং ব্রহ্মের সহিত অবিচ্ছিন্ন মিলনই যদি জীবনের ব্রত হয়—তাহা হইলে জীবনযাপনের এতদপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর-সুন্দরতর ব্যবস্থা অসম্ভব।" লেখকের এই কথা পুস্তকে সুললিত ভাষায় সমর্থিত হইয়াছে ইহা পাঠকমাত্রেই স্বীকার করিবেন। এই সফলতার জন্য ভূপেন্দ্র বাবু পাঠকবর্গের প্রশংসাভাজন। কিন্তু আশ্রম-ধর্ম্মরূপ ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠতা ও সৌন্দর্য্য প্রতিপন্ন করিয়াই থামিয়া গেলে চলিবে না। এমন ব্যবস্থার উৎপত্তিস্থান কি তাহা বুঝা আবশ্যক। আচার ত গাছের ফুল-ফল, কি গাছে এমন ফলে,—তাহা জানা দরকার। আচারের বহিরঙ্গ—পরিবর্ত্তনশীল, দেশকালের অতীত নহে; দেহ-মন-বুদ্ধির অপেক্ষায় আচার, দেহ-মন-বুদ্ধি জড় ও পরিবর্ত্তনশীল। অতএব আচারেরও একটা পরিণাম আছে। গাছের ফুল ফল, যদি একটা জাতিগত বিশেষত্ব বজায় রাখিয়া বদলায়, তাতে ক্ষতি নাই। কিন্তু গাছটা যদি মরিতে বসে, তবে ফুল-ফলের প্রত্যাশা করিতে হইলে গাছটাকে আগে বাঁচাইতে হয়। প্রাচীন ভারতে ভগবল্লাভরূপ বৃক্ষে আশ্রমধর্ম্মরূপ ফল প্রসূত হইয়াছিল; আমাদের দেশে আবার যদি একটা সামাজিক ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে হয়, তবে মূলে যাইতে হইবে, আমাদের সনাতন শক্তিভাণ্ডার আবার সমাজের দখলে

আনিতে হইবে। সর্ব্বাগ্রে সমাজের শীর্ষস্থানে এই মহান্ ব্রতে আমাদিগকে ব্রতী হইতে হইবে। যদি সেই সনাতন কল্পতরু একবার সজীব হইয়া দাঁড়ায়, তবে আশ্রমধর্ম্মপ্রবর্ত্তন সহজসাধ্য হইবে,—সর্ব্ববিধ ব্যবস্থাই গড়িয়া উঠিবে,—এখনকার মত নিস্ফল মস্তিষ্কালোড়ন ঘুচিয়া যাইবে।

২

উপনিষদের উপদেশ। (ঈশ, কেন, প্রশ্ন, ঐতরেয় ও তৈত্তিরীয়।) তৃতীয় খণ্ড। শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন, এম, এ, প্রণীত। মূল্য ২৲ মাত্র।

গ্রন্থকার সুপণ্ডিত, যোগ্যের হস্তে যোগ্যভার সংন্যস্ত। আমরা ১ম খণ্ড ও ২য় খণ্ড পড়ি নাই, ৩য় খণ্ড পড়িয়া আনন্দলাভ করিলাম ও উপকৃত হইলাম। অবতরণিকাটী বিশেষ ভাবে প্রশংসার্হ। প্রাঞ্জল যুক্তিসহকারে লেখক বৈদিক দেববাদের ব্যাখ্যা দিয়াছেন। ব্যাখ্যাও নির্দ্দোষ, তবে অনেক স্থলে কারণ-সত্তা ও ব্রহ্ম-সত্তার ভেদ রক্ষিত হয় নাই; অভিপ্রায় কি তাহা তৃতীয় খণ্ড হইতে বুঝিলাম না। মূল গ্রন্থে উপনিষদের উপদেশ বুঝাইতে গিয়া লেখক আচার্য্য শঙ্করের পথে চলিলেও ঠিক তাঁহার পদাঙ্কানুসরণ করেন নাই; যদি তাহা করিতেন, তবে তাঁহার পুস্তক পড়িতে পড়িতে মূল শাঙ্করভাষ্য মিলাইয়া লইবার আবশ্যকতা এত বেশী অনুভব করিতাম না,—ছত্রে ছত্রে আচার্য্যের লিপি কৌশলই প্রতিবিম্বিত দেখিতাম। লেখক যে নিজের ছাঁচে সবল করিয়া গড়িয়াছেন সে জন্য দোষ দিইনা, ভালই বলি; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে, অন্ততঃ "ফুট-নোটে" ভাষ্যটী দিয়া গেলে, বড়ই সুবিধা হইত। তবে এখন যে আকারে উপনিষদের উপদেশ বাহির হইল, তাহাতে অনেকের বিশেষ উপকার হইবে, সন্দেহ নাই। শাঙ্করভাষ্য পড়িয়া উপনিষদ কয় জন বুঝিতে যায়? কিন্তু মৌলিক ছাঁচে বৈদিক তত্ত্ব-সন্দেশ বিকাইবার অধিকারী—পাণ্ডিত্য থাকিলেই হওয়া যায় না; তা যদি হ'ত তবে ভাষ্যের উপর যুগে যুগে টীকা চড়িত না। সোজা সরল বাঙ্গালা ভাষায় উপনিষদের উপদেশপ্রসঙ্গে শাঙ্করভাষ্যের ব্যাখ্যা প্রকাশ হইলে আরও উপকার সাধিত হইত।

———

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

১। ভ্রমবশতঃ মাঘ মাসের উদ্বোধনে রামকৃষ্ণ মিশনের দ্বিতীয় বাৎসরিক সাধারণ সভার অধিবেশন ২৬শে ফেব্রুয়ারি তারিখে হইবে এইরূপ লেখা হইয়াছে। এতদ্দ্বারা সভ্যগণকে আমরা জানাইতেছি যে আগামী মার্চ্চ মাসের ১৯শে তারিখে ঐ সভার অধিবেশন হইবে এবং ঐ দিবস তাঁহাদের উপস্থিতি প্রার্থনীয়। আশা করি এই ত্রুটি তাঁহারা মার্জ্জনা করিবেন।

২। "আচার্য্য শঙ্কর ও চৈতন্যদেবের মত তুলনা" প্রবন্ধটী বারান্তরে সমাপ্ত হইবে।

আবশ্যকীয় বিজ্ঞাপন।

উদ্বোধন শাস্ত্র-প্রকাশ।

বেদান্ত আমাদের ধর্ম্মের অস্থিমজ্জা, বেদান্ত আমাদের নীতির মেরুদণ্ড, বেদান্ত আমাদের জাতীয় জীবন। আমাদের জাতীয় ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, এই বেদান্তকে আমরা যখনই ভুলিয়াছি, তখনই আমাদের ধর্ম্মমধ্যে মহা বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে, এই বেদান্তকে যখনই আমরা অনাদর করিয়াছি, তখনই আমাদের সমাজে ভয়ঙ্কর অবনতি ঘটিয়াছে। আবার যখনই এই বেদান্তকে আমরা অবলম্বন করিয়াছি তখনই সর্ব্বত্র শান্তির সুশীতল ছায়ায় জীবন সুখময় হইয়াছে—তখনই পাপ-তাপ, অসুখ-অশান্তি দূর হইয়া গিয়াছে।

রাম-রাজত্বের সুখের মূলে এই বেদান্ত, কৃষ্ণাবির্ভাবের শান্তির মূলে এই বেদান্ত, বুদ্ধের জ্ঞানে এই বেদান্ত, শঙ্করের সোঽহং ভাবে এই বেদান্ত—রামানুজের ভক্তিতে এই বেদান্ত—সর্ব্বত্রই এই বেদান্ত আমাদের উন্নতি ও শান্তির মূল। কি জানি কাহার করুণায় আজকাল আবার সেই বেদান্ত-মার্ত্তণ্ড পূর্ব্ব-গগণে অরুণ বরণে উদীয়মান, কি জানি কাহার কৃপাকটাক্ষে আজকাল সেই বেদান্তের স্নিগ্ধ সমীরণে প্রাণ-মন মধুময় হইবে বলিয়া আশার সঞ্চার হইতেছে।

যে রাম, যে কৃষ্ণ একদিন এই বেদান্ত প্রচার দ্বারা জগতে সুখ ও শান্তি স্রোত-প্রবাহিত করিয়াছিলেন, ইদানীং সেই রামকৃষ্ণ এই বেদান্ত-প্রচার দ্বারা জগতে আবার সুখ ও শান্তির সূচনা করিয়াছেন, আজ সেই বেদান্ত প্রচারে বিবেক ও আনন্দের প্রচার, এবং বিবেকানন্দের প্রচারে সেই বেদান্তপ্রচার দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে। ইহার প্রচার দেখিলে বোধ হয় যেন ইহার রাজ্য দিন দিন বিস্তৃত হইতেছে, ইহা যেন বিশ্ব-বিজয়ে উদ্যত হইয়াছে। সুদূর প্রাচ্যে জাপান হইতে সুদূর প্রতীচ্যে মার্কিন পর্য্যন্ত আজ ইহার বিজয় দুন্দুভিনিনাদে নিনাদিত। উন্মত্ত ধর্ম্মধ্বজী জাতি হইতে বিচক্ষণ ধর্ম্মানুরাগী জাতি পর্য্যন্ত আজ ইহার আশ্রয়-লাভে প্রমোদিত। মুসলমান, পারসী, চিন, জৈন, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, আজ সকলে ইহার আলোকে নিজ নিজ ধর্ম্মমতের

গুপ্ত অন্ধকার বিদূরিত করিতেছে—পাঠক শুনুন, আজ বাইবেলের বেদান্ত সম্মত নূতন ব্যাখ্যা জন্ম গ্রহণ করিয়াছে।

আমাদের উদ্বোধন আজ ত্রয়োদশ বর্ষে পদার্পন করিল। ইহা এই ত্রয়োদশ বৎসর পাঠকবর্গের সমীপে এই বেদান্ত প্রচার করিয়া আসিতেছে। এক্ষণে কতিপয় বেদান্তানুরাগী পাঠকের আগ্রহে ইহা এই বেদান্তের মূল ও আকার গ্রন্থ সমূহ প্রচারে অভিলাষী হইয়াছে। বেদান্তের এই সকল মূল ও আকার গ্রন্থ, প্রকৃত পণ্ডিত ও মনীষি সন্ন্যাসী-সমাজে আবদ্ধ, এবং ইহাদের পঠন পাঠনের সামর্থ্য লাভই সাধারণ পণ্ডিত সমাজেজীবনের চরম লক্ষ্য বিবেচিত হইয়া থাকে। এই সকল গ্রন্থ ভারতের উন্নত মস্তিষ্কের নিদর্শন, এই সকল গ্রন্থ ভারতের অতুলনীয় কীর্ত্তিস্তম্ভ, এবং ইহারাই এখনও এ দেশের অক্ষয় গৌরবের নিশান। বস্তুতঃ এ গ্রন্থগুলি এতই দুরূহ ও এতই সূক্ষ্মতত্ত্বে পরিপূর্ণ যে সাধারণ বুদ্ধি ইহা গ্রহণ বা ধারণ করিতে অসমর্থ এবং এই জন্যই এ পর্য্যন্ত কেহই ইহাদের বঙ্গানুবাদে প্রবৃত্ত হয়েন নাই। এজন্য আমরা ইচ্ছা করিতেছি, দেশের বিখ্যাত পণ্ডিত মণ্ডলীর সাহায্যে আগামী বৎসরে এই সকল গ্রন্থ বঙ্গানুবাদ সহ প্রচার করিব। আশা করি উদ্বোধনের এই শাস্ত্র-প্রকাশে সকলে সহায়তা করিবেন। যাঁহারা এ কার্য্যে আমাদিগকে উৎসাহিত করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাদের নাম ধাম প্রদান করিয়া বাধিত করিবেন; মুদ্রন ব্যয়মাত্র নির্ব্বাহোপযোগী তিন শত গ্রাহক সংখ্যা হইলেই এঁকার্য্যে আমরা প্রবৃত্ত হইব।

এই "উদ্বোধন শাস্ত্র-প্রকাশ" উদ্বোধন পত্রিকার ন্যায় মাসে ৮ ফরমা ৬৪ পৃষ্ঠা হিসাবে বাহির হইতে থাকিবে এবং উপস্থিত ইহার মধ্যে নিম্নলিখিত গ্রন্থ সমূহের মধ্যে দুই খানি মাত্র প্রকাশিত হইতে থাকিবে।

১। মহামতি অপ্যয়দীক্ষিত বিরচিত টীকাদ্বয় বিশিষ্ট সিদ্ধান্তলেশ।

২। কুটতার্কিককেশরী শ্রীহর্ষ বিরচিত টীকাত্রয়বিশিষ্ট খণ্ডনখণ্ডখাদ্য।

৩। দার্শনিকশিরোমণি মধুসূদন সরস্বতী বিরচিত টীকাদ্বয়বিশিষ্ট অদ্বৈতসিদ্ধি।

৪। আচার্য্য চিৎসুখ মুনি বিরচিত সটীক চিৎসুখী।

৫। শ্রীবেঙ্কটনাথ দেশিকেন্দ্র বিরচিত সটীক তত্ত্বমুক্তাকলাপ।

৬। শবর ভাষ্য সহিত মীমাংসা দর্শন।

গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহাতে অন্যান্য সাম্প্রদায়িক ও প্রকরণ-গ্রন্থ সকল প্রকাশিত হইবে। দ্বাদশ খণ্ডের মূল্য ৪৲ অগ্রিম দেয়। নির্দ্দিষ্ট গ্রাহক সখ্যা পূর্ণ না হইলে এ পত্রিকা প্রকাশিত হইবে না, নির্দ্দিষ্ট গ্রাহকের জন্য এক বৎসর কাল অপেক্ষা করিয়া ইতিমধ্যে যাহারা গ্রাহক হইয়া অর্থ প্রদান করিবেন তাহাদের প্রদত্ত অর্থ প্রত্যর্পিত হইবে।

প্রথম গ্রন্থখানি অদ্বৈতবাদের বিশ্বকোষ স্বরূপ। ইহা আচার্য্য শঙ্করের পর আজ হইতে চারি শত বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অদ্বৈতবাদের যত প্রকার

রূপরূপান্তর হইয়া গিয়াছে, সে সকলপ্রকারই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় গ্রন্থখানিতে তর্কবুদ্ধির গতি কতদূর, তাহা অতি অদ্ভুত কৌশলে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে যত প্রকার মত হইতে পারে, সকল প্রকারে কি কি দোষগুণ থাকে, তাহা প্রদর্শন করিয়া একমাত্র অনির্ব্বচনীয়বাদই যে, যুক্তিসহ তাহাই প্রমাণিত হইয়াছে।

তৃতীয় গ্রন্থখানিতে ভারতের অত্যদ্ভুত প্রতিভা "নব্যন্যায়ের" সাহায্যে অদ্বৈতবাদের সত্যতা প্রমাণ করা হইয়াছে। ইহাতে যত প্রকার অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে দোষ কল্পনা করা যাইতে পারে,সমস্ত মীমাংসা করিয়া সিদ্ধান্ত স্থাপন করা হইয়াছে।

চতুর্থ গ্রন্থখানিতে প্রাচীন ন্যায়ের সাহায্যে অদ্বৈতবাদের রহস্য উদ্ঘাটন করা হইয়াছে। ন্যায়ের বেশভূষায় ভূষিত করিয়া অদ্বৈতবাদের পূর্ণতঃ সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে এই গ্রন্থই সমর্থ হইয়াছিলেন।

পঞ্চম গ্রন্থে আচার্য্য রামানুজ প্রচারিত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের যাবতীয় রহস্য, বিশুদ্ধ দার্শনিক পদ্ধতিতে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। রামানুজ মতের পূর্ণবিকাশ এই গ্রন্থে দ্রষ্টব্য, এতদপেক্ষা বিশদ গ্রন্থ রামানুজ মতে আর নাই।

ষষ্ঠ গ্রন্থখানি অদ্যাবধি কোন ভাষাতেই অনুবাদিত হয় নাই, অথচ ইহারই উপর আমাদের ধর্ম্মের আচার-ব্যবহার নির্ভর করে। বেদান্তজ্ঞের পক্ষে এখানিরও উপযোগিতা অত্যধিক।

এই সকল শাস্ত্র অনুবাদিত হইলেও যে সকলের পক্ষে সুগম হইবে তাহা আশা করা যায় না, কারণ কঠিন বিষয় যত সহজ ভাষাতেই লিখিত হউক না কেন, ভাবের কাঠিন্য দূর করা অসম্ভব। এজন্য যাহাতে সকলে এই সকল গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে পারেন, তজ্জন্য বেদান্ত-শিক্ষার্থীর পক্ষে যাহা প্রথম পাঠ্য এরূপ কতিপয় গ্রন্থও আমরা এই পত্রিকার মধ্যে প্রকাশিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। আমাদের আশা যাঁহারা মনোযোগ সহকারে আমাদের এই পত্রিকা পাঠ করিবেন,তাঁহারা যেন বিনা গুরুর সাহায্যে বেদান্তের নিগূঢ় তত্ত্ব জানিতে পারেন। এজন্য নিম্নলিখিত কয়েকখানি উপক্রমণিকা স্থানীয় গ্রন্থের মধ্যে তিনখানি উপস্থিত এই পত্রিকায় প্রকাশিত হইতে থাকিবে।

১। সিদ্ধান্তমুক্তাবলী। এতদ্দ্বারা ন্যায়শাস্ত্র ও বিচার পদ্ধতি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ হইবে। কারণ বেদান্ত শিক্ষার্থীর পক্ষে ইহার জ্ঞান ব্যতীত সকলই বিড়ম্বনা।

২। সিদ্ধান্তকৌমুদী। ইহা ব্যাকরণ শাস্ত্র। ইহাদ্বারা সংস্কৃত ভাষার অধিকার জন্মিবে।

৩। বেদান্তপরিভাষা। ইহা বেদান্তের প্রথম পাঠ্য গ্রন্থ। এতদ্ব্যতীত ভিত্তি সুদৃঢ় হইবার আশা করা যায় না।

৪। যতীন্দ্র মতদীপিকা। ইহা বিশিষ্টাদ্বৈত মতের প্রথম পাঠ্য গ্রন্থ।

৫। তত্ত্বত্রয়। ইহাও যতীন্দ্রমতদীপিকার অনুরূপ গ্রন্থ।

পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থদ্বয়ের সঙ্গে এই সকল গ্রন্থের দুই বা তিনখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইতে থাকিবে। সুতরাং বর্ত্তমান ক্ষেত্রে মোট চারি বা পাঁচ খানি মাত্র গ্রন্থ আমরা উদ্বোধন শাস্ত্র প্রকাশ পত্রিকাতে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা করিতেছি।

সম্পাদক।

ভাগীরথীবক্ষে দুই দিন।

(২৬শে ও ২৭শে আগষ্ট ১৯১০)

[শ্রীযুক্ত শিশির কুমার বর্দ্ধন এম, এ।]

আমাদের মত সাধারণ লোকের দৈনিক জীবনে নূতনত্বের নিতান্ত অভাব। কোন প্রকার উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন সহজে ঘটিয়া উঠে না। শয্যাত্যাগ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাত্যহিক কার্য্যগুলি যথাসময়ে আমাদিগকে সংযত রাখে এবং জীবনটাকে অচিরে ঘড়ির মত বাঁধাধরা ও একঘেয়ে করিয়া তোলে। বন্দোবস্তের এমনই মহিমা যে, আমাদের স্বাধীন চিন্তা ও কার্য্যকারিতার আবশ্যকতা মোটেই প্রকাশ পায় না। ক্রমে এমন অবস্থা উপস্থিত হয় যে, তখন 'বন্দোবস্ত আমাদের, কি আমরা বন্দোবস্তের হাতে' ইহা সিদ্ধান্ত করা দুরূহ হইয়া উঠে। নিয়মের প্রাধান্য যতই বাড়িতে থাকে আমাদের বিশেষত্ব ততই হ্রাস হইয়া আসে। যাহা প্রয়োজন তাহা যদি হাত বাড়াইলেই পাওয়া যায়, তাহা হইলে নড়িতে চায় কয় জন? সুনিয়মের ফলে প্রথমতঃ আমরা ভাবনা চিন্তা একপ্রকার ছাড়িয়া দিতে থাকি, অথবা সেগুলি কালে নিষ্প্রয়োজন হইয়া পড়ে। তখন অনর্থক মাথা ঘামান কেবল মূর্খতার পরিচয় বলিয়া মনে হয়। এই সঙ্গে সঙ্গে নূতন কিছু করিবার ইচ্ছা মনে প্রবল হয় না—আত্মনির্ভর লোপ পাইবার উপক্রম করে। সাহস কেবল বাক্যে শোভা পায়—কার্য্যে তাহার বড় একটা প্রমাণ পাওয়া যায় না। অনিশ্চিত সকল বিষয়ে এক অভূতপূর্ব্ব আশঙ্কার উদ্রেক হয়। মনে হয় যেন চতুর্দ্দিকে বিপদ আমাদিগকে গ্রাস করিবার জন্য মুখব্যাদান করিয়া আছে। এই প্রকারে ধীরে ধীরে পাছে আমাদের সাধের মনুষ্যত্ব কোটরান্তর্গত হইয়া পড়ে, এই ভয়ে একবার অনিয়মে খাওয়া অথবা উপবাস এবং যেথা সেথা শুইয়া ঘুমানর ব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত ধুলিয়ান যাইবার প্রস্তাব আমাদের বহরমপুরের বাসায় উত্থাপিত হয়। বাসাস্থ অধিকাংশ সে প্রস্তাব গ্রহণ করে ও জন্মাষ্টমীর বন্ধের মধ্যে এই উচ্ছৃঙ্খলতার অভিনয় হইবে ধার্য্য হইয়া গেল।

বিগত ২৬শে আগষ্ট শুক্রবার ভোর চারিটার ট্রেণে রহনা হইয়া জিয়াগঞ্জে যাওয়া এবং তথা হইতে আজিমগঞ্জ গিয়া ধুলিয়ানের ষ্টীমার ধরা

সকলের মত হইল। তৎপূর্ব্বদিন বৃহস্পতিবার; কোন বিশেষ উপলক্ষ বশতঃ আমাদের বাসায় এক প্রীতিভোজের আয়োজন হইয়াছিল। খাওয়া দাওয়া মিটিতে রাত্রি এগারটারও অধিক হয়। তারপর একটু বিশ্রামের আশায় শয়ন করি। সেদিন সন্ধ্যার সময় ষ্টেশনে যথাসময়ে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য একখানি ঘোড়ার গাড়ী নিযুক্ত হইয়াছিল। গাড়োয়ান রাত্রি বুঝিতে না পারিয়া একটার সময় আসিয়া ডাকাডাকি করিতে থাকে। সারাদিন হট্ট-গোল করিয়া মোটে একঘণ্টা ঘুমের পর উঠিতে যে কি আরাম তাহা আর বাক্যে প্রকাশ করা যায় না। উঠিয়া ঘড়ি খুলিয়া দেখিলাম সময় যথেষ্ট রহিয়াছে। কাজেই গাড়োয়ানকে ঘুমাইতে বলিয়া আমরা পুনরায় শুইলাম। কিন্তু দুইটার অল্পক্ষণ পরে আবার নিদ্রাভঙ্গ হইল। এবার জনৈক বন্ধু প্রভাত হইয়াছে আন্দাজ করিয়া সংবাদ দিল। শুনিবামাত্র তাহাকে যথোচিত আশীর্ব্বাদ করিয়া শেষে বিছানা ছাড়িলাম; এবং কিয়ৎকাল পরে প্রস্তুত হইয়া আমরা সর্ব্বসমেত পাঁচজনে বাহির হইলাম। ইহার মধ্যে একজন সাহেবগঞ্জ যাইবেন—বাকি চারিজন ধুলিয়ান যাত্রী।

যখন জিয়াগঞ্জে পৌঁছিলাম তখন মাত্র পাঁচটা বাজিয়াছে। তথা হইতে ঘোড়ার গাড়ীতে নদীতীরে আসিয়া পরপারে যাইবার জন্য খেয়া নৌকায় উঠিলাম। আজিমগঞ্জ গঙ্গার ওপারে। নৌকায় উঠিবার সময় শুনিলাম ষ্টীমার এপারে আসিয়া ধুলিয়ান যাত্রা করিবে। অতএব পার না হইলেও চলিতে পারে। কিন্তু যখন নৌকায় উঠিয়াছি তখন নামা হইতে পারে না —ওপারে গিয়াই ষ্টীমার ধরিব বলিয়া নৌকা ছাড়িয়া দিবার আদেশ দেওয়া হইল। নৌকা মাঝ নদীতে আসিয়াছে এমন সময়ে দেখিলাম ষ্টীমার আজিমগঞ্জ ঘাট পরিত্যাগ করিয়া আমাদেরদিকে অগ্রসর হইতেছে। অগত্যা জিদ ভুলিয়া ঘাটে ফিরিতে বাধ্য হইলাম এবং তাড়াতাড়ি ষ্টীমারে গিয়া উঠিলাম। এখানি কলিকাতা হোরমিলার কোম্পানীর ষ্টীমার। নাম চঞ্চলা। আকারে নিতান্ত ছোট। তাই কিছু স্থানাভাব হইয়াছিল বটে কিন্তু উহারই মধ্যে আমরা একটু বিছানা পাতিয়া কতক শুইলাম ও কতক বসিয়া রহিলাম।

অর্দ্ধঘণ্টা বাদে ষ্টীমার চলিতে আরম্ভ করিল। তখন ষ্টীমারের সেই ধুপ ধুপ শব্দ জলের কলকসানির সহিত মিশ্রিত হইয়া মনে এক অভিনব আনন্দ উৎপাদন করিতে লাগিল; এবং আমরা সেই আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া পার্শ্ব-

স্থিত মনোরম দৃশ্য উপভোগ করিতে করিতে বহুদূর চলিয়া গেলাম। ভাদ্র মাসের গঙ্গা লোহিতজলে পরিপূর্ণ হইয়াছে। জল এবার কিছু অতিরিক্ত, এবং আমরা যেদিন রওনা হই, সেদিন নাকি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছিল। ভরা নদীর সৌন্দর্য্য কি চমৎকার! যৌবন কোথায় না মন-মুগ্ধ করে! চতুর্দ্দিকে জল—কেবল জল। মাঝে মাঝে উন্নত ভূমি দ্বীপের মত দাঁড়াইয়া আছে। কোথাওবা মাটী একেবারেই দেখা যায় না। কেবল কতকগুলি বৃক্ষ জলের উপর আপন মস্তক উত্তোলন করিয়া লুক্কায়িত ভূমির সাক্ষীস্বরূপ চাহিয়া রহিয়াছে। যেখানে কূল ভাসিয়া যায় নাই সেখানকার দৃশ্য অন্য প্রকার। ছোট বড় কত রকমের গাছে ঢাকা তীর দূর হইতে দেখায় যেন সবুজ ভেল্‌ভেটে মোড়া। কাছে আসিলে গাছগুলি আপন শাখাপ্রশাখা বিস্তার করিয়া পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়।

গাছগুলির রং সাধারণতঃ দুই প্রকার—খুব গাঢ় ও ঈষৎ সবুজ। ঘন সবুজ গাছগুলি দেখিয়া পুরাতন তীর নির্ণয় করিতে পারা যায়। যে সমস্ত জমিতে ঈষৎ সবুজবর্ণের গাছ—সেগুলি চর ভূমি। এই চর অত্যন্ত উর্ব্বরা। সেই জন্য চাষীরা স্থানে স্থানে আবাদও করিয়াছে; এবং ইহাতে যে তাহাদের পরিশ্রম সম্পূর্ণ সুফললাভ করিয়াছে, তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। তবে এই দারুণ বর্ষাকালে এ সকল জমি কতক পরিমাণে জলমগ্নও হইয়াছে। দেখিলে মনে হয় জলে-স্থলে এক নূতন খেলা খেলিতেছে। কোথাও জল স্থলকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে—কোথাও আবার স্থল জলকে উপেক্ষা করিয়া হাসিতেছে। কখন বা জল তীর ভাঙ্গিয়া প্রবলবেগে বহিয়া যাইতেছে, কখন আবার সেই প্রবল স্রোত রোধ করিয়া তীরভূমি জলকে দূরে নিক্ষেপ করিতেছে। হতবল অম্বুরাশি তখন শান্তভাব ধারণ করিয়া ধীরে প্রবাহিত হইতেছে; বোধ হয় যেন একখানি কাচের বা মার্ব্বেলের আস্তরণ পড়িয়া রহিয়াছে, কখন আপন মনে বাতাসের সঙ্গে তালে তালে নৃত্য করিতেছে। আবার বিকট আকারে ঘোর গর্জ্জন করিয়া মেদিনী কাঁপাইয়া দিতেছে। নদীর এই চঞ্চল-প্রকৃতি দেখিয়া মানুষের কথা মনে পড়ে। পূর্ণ নদী মনুষ্য-জীবনের প্রতিকৃতি। নদীর মত মানুষ হাসিতেছে কখন বা কাঁদিতেছে। কখন বা উন্মাদের মত লক্ষ্যহীন ছুটিয়াছে। কখন তাহার উদ্যমে বহুল হিতকর কার্য্য সাধিত হইতেছে। আবার সেই উদ্যম অনেক সময়ে অমঙ্গলও

ঘটাইয়াছে। মনুষ্য চরিত্র নদীর মত বিচিত্র। এমন বিপরীত ভাব ও গুণের সমাবেশ আর কুত্রাপি পরিলক্ষিত হয় না।

নদীর রূপের ও গুণের কথা কিঞ্চিৎ বলিয়াছি, কিন্তু বলিবার অনেক আছে—বিশেষ পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর। পবিত্র গঙ্গোদকের মাহাত্ম্যে তীর-ভূমি প্রায় বরাবর লোকালয়ে পূর্ণ হইয়া উঠিযাছিল। কত ধর্ম্মপ্রাণ বঙ্গ-বাসী জীবনের শেষ কযটা দিন যাহাতে আপনার দেহ শুদ্ধ রাখিয়া স্বচ্ছন্দ-চিত্তে অন্তিমের চিন্তা করিতে পারে, এই উদ্দেশ্যে গঙ্গাতীরে অ শ্রয লইয়াছিল—কত দেবদেবী মূর্ত্তি, কত দেবালয় যে স্থাপিত হইযাছিল, তাহা বলিতে পারি না। আজিমগঞ্জের নিকটবর্ত্তী বড় নগরের ভগ্ন জীর্ণ ও পরিত্যক্ত মন্দির সমূহ আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের এই আন্তরিক ধর্ম্মপ্রিযতার দৃষ্টান্ত স্বরূপ আজিও বর্ত্তমান রহিয়াছে। শুধু পারত্রিক কারণ কেন, অনেকে ত ঐহিক সুখ স্বচ্ছন্দতার জন্যও নদীতীরে আসিযা বাস করে। পানীয় জল নদীতীরে যত সুলভ তত অন্যত্র নহে। বিশেষ যাতায়াতের পক্ষে নদী মন্দ পথ নহে। ব্যবসা বাণিজ্যের সহাযতাও যথেষ্ট হয। মৎস্যভোজীদিগের আহার্য্যের কতকাংশ নদীতেই পাওযা যায। এইরূপ নানা সুবিধার জন্য লোকে নদীর উপকূলে কুটীর বাঁধিয়া অথবা অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া সুখে দিন পাত করিতে প্রয়াসী হইয়াছিল; এবং তাহাদের চেষ্টার ফলে কত গ্রাম ও নগরের যে স্থাপনা হইয়াছিল তাহার ইয়ত্তা নাই।

কিন্তু নদী যেমন একদিকে মানব জাতীর প্রভূত উপকার-সাধনে প্রবৃত্ত, তেমনি অপরদিকে ইহার অত্যাচারও নিতান্ত কম নহে। মানবের শতাব্দী-ব্যাপী পরিশ্রম দুইদিনে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দেয। কত সহর ধ্বংস করিয়াছে, কত গ্রাম গ্রাস করিযা ফেলিযাছে, তাহা নদীর দুই পার্শ্বে দৃষ্টিপাত করিলে সহজে অনুমান করা যায়। কত নর-নারী গৃহ-শূন্য হইয়াছে, তাহা গণনা করা দুঃসাধ্য। দেখিতে পাওয়া যায়, অনেক স্থলে বাস ভূমি নিমজ্জিত হইয়াছে। গ্রামবাসীরা নিজ নিজ গরু বাছুর লইয়া উচ্চ জমিতে আশ্রয় লইয়াছে। ইহারা দরিদ্র ও সম্পূর্ণ অসহায়। রৌদ্র, বৃষ্টি হইতে আপনাদের শরীর রক্ষা করিতে একান্ত অক্ষম। পরিধানে স্বল্প বস্ত্র। গাত্রাবরণ আর কিছু আছে বলিয়া মনে হয় না। আহারের সংস্থান নাই বলিলেও চলে। কেবল ভাগ্যের উপর নির্ভর করিয়া ইহারা ভবিষ্যতের ভীষণ ছবির দিকে চাহিয়া আছে। এই শেষ আশ্রয় যদি তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে হয়

তাহা হইলে তাহারা আর কোথায় যাইবে, এই মহা চিন্তায় তাহাদিগকে অভিভূত করিয়াছে।

অধিকাংশ কুটীর ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। বাকি ধ্বংসের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। পতনোন্মুখ এই সকল কুটীর এক প্রকার জনশূন্য হইয়াছে। কেবল মাঝে মাঝে দুই চারিজন লোক দেখিতে পাইলাম। বোধ হয় হতভাগ্য দিগের পলাইবার উপায় বা সামর্থ্য নাই। কিম্বা পৈতৃক বাসস্থানের প্রতি খুব মমতা তাই এখনও ছাড়িয়াও ছাড়িতে পারে নাই। প্রাঙ্গন জলে পরিপূর্ণ হইয়াছে। কুটীরের কতকাংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তথাপি অবশিষ্ট অংশে কায়ক্লেশে পড়িয়া আছে। কবে বিধাতা তাহাদের দুঃখের অবসান করিবেন এইমাত্র ভরসায় তাহারা সকল প্রকার কষ্ট সহ্য করিতেছে। একমাত্র আশা—জল কমিলে পুনরায় স্ত্রী-পুত্র লইয়া সংসার পাতিয়া বাস করিবে। কিন্তু এত আশা হয়ত তাহাদিগকে একরাত্রেই পরিত্যাগ করিয়া নৈরাশ্যের গভীর অন্ধকারে ডুবিয়া যাইতে হইবে! ইহাদের দুর্দ্দশা দেখিলে কার না হৃদয় ব্যথিত হয়!!

ষ্টীমার পথে কয়েক স্থলে থামিয়া বেলা দুইটা নাগাৎ জঙ্গীপুরে আসিয়া পৌঁছিল। এইখানে দুই ঘণ্টা থামিবার কথা। আমাদের ইচ্ছা ছিল এই খানে নামিয়া স্নান করিব ও কিছু জলখাবার কিনিয়া লইব। কিন্তু পথিমধ্যে আমাদের কলেজের দুইটী ছাত্র আমাদিগকে জঙ্গীপুরে থাকিবার জন্য অনুরোধ করে। পরে বারম্বার অস্বীকার করায় আমাদের জন্য কিছু খাবার আনিয়া দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করে। ইহারা এই অঞ্চলে থাকে। কাজেই ইহাদের আগ্রহ আমরা আর অবহেলা করিতে পারিলাম না। ষ্টীমার ঘাটে লাগিবার পর আমরা দুইজনে সহর পরিদর্শন করিতে গেলাম। বাকি দুইজন ষ্টীমারেই রহিল। জঙ্গীপুর ছোট সহর, তবে পুরাতন বলিয়া মনে হয়। শুনিলাম পূর্ব্বে সহরের আয়তন এত অল্প ছিল না। অনেক লোক জনের বসতি ছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্যও ইহার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। এখনও কুঠীয়াল সাহেবদিগের রেশমের কারবার কিছু কিছু চলিতেছে। এখনও আদালতাদি জঙ্গীপুরেই বসিতেছে। তবে সহরের অধিকাংশ এখন গঙ্গাগর্ভে স্থান পাইয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে নদীর গতি এরূপ হইয়াছিল যে, অনেকেই সহরটীর আশা একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছিল। কিন্তু এখন ভাগ্যক্রমে স্রোত ফিরিয়া গিয়াছে। শুনিলাম গ্রীষ্মকালে নদী প্রায় এক মাইল তফাতে চলিয়া যায়।

এদিক ওদিক ঘুরিয়া শেষ আমরা স্থানীয় হাইস্কুলে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তথায় শিক্ষকদিগের সহিত আলাপ করিতেছি, এমন সময় বাঁশীর শব্দে বুঝিলাম ষ্টীমার ছাড়িয়া দিল। ইতঃপূর্ব্বে সারেঙ্গের সহিত কথাবার্ত্তায় জানিয়াছিলাম যে ষ্টীমার জঙ্গীপুরে অন্ততঃ একঘণ্টা থাকিবে এবং তৎপরে পর-পারস্থিত রঘুনাথ-গঞ্জ নামক সহরে আর একঘণ্টা ধরিবে। কিন্তু অসময়ে বন্ধুদ্বয়কে লইয়া ষ্টীমার চলিয়া গেল এবং আমরা কিং-কর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া স্কুলেই বসিয়া রহিলাম।

খেয়া নৌকার বিশেষ সুবিধা না থাকায় স্কুলের হেড্ মাষ্টার বিহারী বাবু আমাদের জন্য টোল আফিসের একখানি বোট যোগাড় করিয়া দিলেন। পারে যাইব বলিয়া ঘাটে আসিয়া দেখি বহরমপুরের দুর্ল্লভ বাবু নামে জনৈক ভদ্রলোক বোটে বর্ত্তমান। ইনি টোল আফিসের প্রধান কর্ম্মচারি। ইহাঁর সহিত আমাদের আগেই পরিচয় ছিল। তিনি আমাদিগকে দেখিবা-মাত্র মহা আনন্দিত হইয়া আহারের জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। সময়ে কুলাইবে না বলিয়া আপত্তি করায় তিনি আমাদের সহিত ষ্টীমারে আসিয়া জানিলেন ষ্টীমার আরও এক ঘণ্টা কাল থাকিবে। এই কথা শুনিয়াই তিনি পারে গিয়া তাঁহার বড় বোটে ভাত ও মাছের ঝোল ইত্যাদি প্রস্তুত করাইয়া অতি অল্প ক্ষণে ষ্টীমারের ধারে পুনরায় আসিলেন। আমরা ইতিমধ্যে স্নানাদি সারিয়া লইয়াছিলাম। তাই তিনি পৌঁছিবামাত্র তাঁহাকে বাধিত করিবার জন্য সদলে তাঁহার বোটের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তখনকার মত কার্য্য সমাপ্ত করিলাম। ষ্টীমারে ফিরিবার পরক্ষণেই ষ্টীমার রঘুনাথগঞ্জ ছাড়িয়া দিল। দুর্ল্লভ বলিয়া রাখিলেন ফিরিবার কালে পর-দিন যেন পুনরায় আমরা তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করি। তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া আমরা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলাম যে, বাস্তবিক এ জগতে দুর্ল্লভ বাবুর মত লোক অতিশয় দুর্ল্লভ। তাহা না হইলে জীবনটা বড়ই আরামের হইত। এই কথা ভাবিতে ভাবিতে একটু তন্দ্রান্বিত হওয়া গেল।

কিছু কাল এই অবস্থায় কাটিবার পর হঠাৎ শুনিলাম ভাগীরথী ও পদ্মার মোহনা সন্নিকটে। চাহিয়া দেখি ষ্টীমার ধীরে ধীরে যেন এক প্রকাণ্ড হ্রদের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। দুই দিকে তীর লক্ষ্য হইতেছে বটে, কিন্তু সম্মুখে অসীম জলরাশি ধূ ধূ করিতেছে। আকাশ যেন নামিয়া আসিয়া নদী তীর ঢাকিয়া রাখিয়াছে। এ এক মহান্ দৃশ্য। অনন্তের ছায়া মনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। মানবের ক্ষুদ্রত্ব ব্যাকুল হইয়া জাগিয়া উঠে। সম্মুখে দৃষ্টি-

পাত করিলে প্রাণ শিহরিতে থাকে। মনে হয় যেন কালের ভীষণ মুখ মধ্যে চলিয়াছি। তরঙ্গমালা বিশৃঙ্খল ভাবে ছুটিয়াছে—যেন প্রতি মুহূর্ত্তেই আমাদিগকে বিচলিত করিতে চায়। এই ভয়মিশ্রিত আনন্দে মাতিয়া চতুর্দ্দিক অবলোকন করিতে করিতে বিশ্বনাথপুরের এই মোহনা পরিত্যাগ করিয়া আমরা ভাগীরথীর পূর্ব্ব অনুসৃত পথে প্রবেশ করিলাম।

পূর্ব্ব অনুসৃত বলিবার কারণ এই যে,পূর্ব্বে ছাপঘাটী নামক স্থানে মোহনা ছিল। ক্রমে চর পড়িয়া সে সংযোগ বন্ধ হইয়া যায়। প্রবাদ বার মাস পদ্মার সহিত ভাগীরথীর এই সংযোগ বজায় রাখিবার জন্য নদীতলে পূর্ব্বে সীসার পাত ঢালা ছিল। এ প্রবাদের সত্যাসত্য সম্বন্ধে আমরা দায়ী নহি। যাহা শুনিয়াছি তাহাই লিখিতেছি মাত্র। তবে কথাটী মুরসিদাবাদ জেলার অনেকেই বলে বলিয়া সম্পূর্ণ মিথ্যা নাও হইতে পারে। নবাবী আমলে এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছিল। কিন্তু ইংরাজ বাহাদুরের হস্তে বঙ্গ দেশের অদৃষ্ট ন্যস্ত হইলে এই সীসার পাতের সার্থকতা উপেক্ষা করা হয়। ইংরাজ ব্যবসায়ী লোক। এতটা সম্পত্তি অপচয় হইতেছে তাহাদের প্রাণে লাগিল। সুতরাং শীঘ্রই ইহার পুনরুদ্ধার সংঘটিত হইল। ফলে ভাগীরথী শুখাইতে আরম্ভ করিল। পদ্মা মনের দুঃখে মুখ ফিরাইয়া দূরে সরিয়া গেল। কিন্তু বহুদিনের প্রণয় ভুলিতে না পারিয়া আবার মিলনের চেষ্টা করিতে লাগিল। এখন ভাগীরথীর সহিত পদ্মার দুই স্থলে যোগ হইযাছে। এক বিশ্বনাথপুরে আর এক ফরক্কায়। ফরক্কার সঙ্গম পর্য্যন্ত আমরা যাই নাই। ধুলিয়ান হইতে প্রায় আট দশ মাইল পশ্চিমে বিশ্বনাথপুরের সঙ্গম আমাদের পথে পড়িয়াছিল। আমরা বরাবর ভাগীরথীর উপর দিয়া গিয়াছিলাম। ভাগীরথী ও পদ্মার মধ্যে ব্যবধান একটী সঙ্কীর্ণ লম্বা চর। ইহা আবার মাঝে মাঝে ভাসিয়া গিয়াছে। এই সমস্ত স্থলে পদ্মা ও ভাগীরথী এক হইয়া প্রস্থে ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছে। কাজেই পদ্মার উপর দিয়া ষ্টীমার না চলিলেও বস্তুতঃ আমাদের দুই-ই দেখা হইল।

ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। ছাত্রেরা জঙ্গীপুরে যে খাবার ও দুধ ইত্যাদি দিয়াছিল তাহার অবশিষ্ট যৎকিঞ্চিতের সদ্ব্যবহার করিয়া ধুলিয়ানের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। রাত্রি ৮॥০ টার সময় ষ্টীমার ঘাটে লাগিল। ষ্টীমারের বাবু ও ঘাট-ষ্টেশন মাষ্টার মহাশয় এবং তাঁহার অধীনস্থ আমাদের পরিচিত আর একটী বাবু আমাদের থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন—

ষ্টিমারের উপরেই। সুতরাং জিনিষ পত্র লইয়া আমাদের নামিবার আবশ্যক হয় নাই। খাওয়া দাওয়ার জন্য ভদ্র লোকেরা প্রচুর পুরি, তরকারি ও মিষ্টান্ন আনাইয়া দেন। ভোজনান্তে নিদ্রার জন্য শুইলাম বটে কিন্তু নানাপ্রকার উদ্ভট চিন্তা আসিয়া কিছুক্ষণ ঘুমাইতে দিল না। ভাবিলাম এরূপ নদীবক্ষে ষ্টীমারের উপর ফাঁকায় শুইয়া থাকা এতাবধি ঘটে নাই। আজ কি আনন্দের দিন। দরজা জানালা বন্ধ করিয়া ঘরের কোনে নিশ্চিন্ত মনে শয়ন করা অপেক্ষা এরূপ শয়নে যে কি আমোদ হইয়াছিল তাহা বর্ণনা করা আমার সাধ্য নয়। চারিদিকে ঘোর অন্ধকার। একে একে বন্ধুরা নিদ্রামগ্ন হইল। প্রায় সমস্ত নিস্তব্ধ হইয়া আসিল। কেবল শোঁ শোঁ করিয়া বায়ু বহিতেছিল ও নদী থাকিয়া থাকিয়া কল্লোলিয়া উঠিতে লাগিল। এই শব্দ শুনিয়া মনে হইতে লাগিল প্রকৃতি দেবী যেন তখন নির্জ্জন নিশীথে আপনাকে একাকিনী ভাবিয়া বিশ্বনিয়ন্তার স্তুতি বাদ গাহিতেছেন। সে এক স্বর্গীয় সুর! অতীতের সকল জ্বালা ভুলাইয়া দেয়। শুনিতে শুনিতে কখন যে চক্ষু মুদ্রিত হইয়াছিল জানি না।

অতি প্রত্যুষে উঠিয়া প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। কিন্তু ষ্টীমার ছাড়িবার বিলম্ব থাকায় একবার ধুলিয়ান দেখিবার ইচ্ছা হইল। জন দুই তিন মিলিয়া বাহির হইলাম। ধুলিয়ান একটী মুসলমান প্রধান বড় গ্রাম বিশেষ। বাজার হাট আছে। রাস্তাগুলি কর্দ্দমে পরিপূর্ণ। নুতনত্ব কিছুই নাই। তাই শীঘ্র শীঘ্র ফিরিয়া আসিলাম; এবং দেখিতে দেখিতে ষ্টীমার ছাড়িয়া দিল। তখন একটী কথা মনে হইতে লাগিল যাহা এ স্থলে উল্লেখ করিলে বোধ হয় বিশেষ দোষ হইবে না। ধুলিয়ানে যে কয়খানি ইষ্টক নির্ম্মিত বাটী লক্ষ্য করিয়াছিলাম, তন্মধ্যে অধিকাংশ মাড়োয়ারীদিগের। এখানকার ব্যবসা বাণিজ্য প্রধানতঃ তাহাদেরই পরিচালিত। তাহাদের উত্তম ও অধ্যবসায় দেখিলে তাহাদিগকে প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না; এবং তৎসঙ্গে নিজেদের অবস্থা ভাবিয়া আমাদিগকে লজ্জিত হইতে হয়। ইহারা কত দুর হইতে আসিয়া কোন্ অজানা দেশে কেমন আপনাদের উন্নতি পথ উন্মুক্ত করিতেছে। আর আমরা ঘরে বসিয়া সকল রকম সুবিধা পাইয়াও কোনরূপ চেষ্টা করি না। বলিতে কি আমাদের চেষ্টা করিবার ইচ্ছাও হয় না। কেন আমাদের এমন দুর্ম্মতি হইল তাহার কারণ নির্দ্দেশ করা নিতান্ত সহজ নহে। তবে এ সম্বন্ধে মোটামুটী এই মনে

হইয়াছিল যে, আমাদের সমাজে যে নৈতিক অবনতি সংঘটিত হইযাছে তাহাই প্রধানতঃ আমাদের এই উদ্যমহীনতার জন্য দায়ী। সমাজের নৈতিক উৎকর্ষ বা অনুৎকর্ষের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্যের কি সম্পর্ক তাহা অনায়াসে দেখিতে পাওয়া যায়। ইংরাজীতে যাহাকে Dignity of labour বলে অর্থাৎ কোন কার্য্যই কার্য্য হিসাবে নিকৃষ্ট নহে—এইটী ব্যবসার প্রথমশিক্ষা। আমাদের মধ্যে এই শিক্ষার বিশেষ অভাব। ছোট বড় বাছিয়া আমাদের অনেক কাজই বাদ পড়িয়া যায়। কোন সামান্য কাজ করিতে হইলে মাথায় যেন বজ্রাঘাত হয। তখন পরমুখাপেক্ষী হওয়া ছাড়া আর উপায় থাকে না। অপরের উপর নির্ভর করার ফলে নিজের উপর নির্ভর কমিয়া যায এবং সঙ্গে সঙ্গে বাধা-বিঘ্ন-গুলি অনতিক্রম্য হইয়া উঠে। উদ্যম-উৎসাহ একেবারে লোপ হইযা আসে। কাজেই ব্যবসাব উন্নতি লাভ করা সম্ভবপর হয না। অগত্যা জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য অন্য পথ অবলম্বন করিতে হয। যাহাতে বেশী ভাবনা চিন্তা নাই, কোনরূপ গোলযোগ নাই এবং ইজ্জত বজায থাকে—এই প্রকার পেশা মাত্র সম্বল হইযা দাঁডায। দেখিযা শুনিযা তাই বাঙ্গালী কলম ধরিযাছে। এখন চেষ্টা কেবল কোন প্রকাবে বিশ্ববিদ্যালযেব একখণ্ড চাপরাস সংগ্রহ করিযা, সওদাগরী আফিসে অথবা গভর্ণমেণ্টের যে কোন বিভাগে হউক, একটী চাকুবী পাওযা। ইহারই মধ্যে যাহাবা একটু স্বাধীন বৃত্তির পক্ষপাতী তাহাদের চরম উদ্দেশ্য ওকালতী কিম্বা ডাক্তাবী করা। তবে নিতান্ত যাহাদের বরাত মন্দ,কেবল তাহারা দোকন পাট করিযা খাইবে। মধ্যবিত্তের পক্ষে ব্যবসা বাণিজ্য সুবিধা জনক নহে বলিযা আমাদের অনেকেব ধারণা। কারণ প্রথমতঃ ইহাতে মান-সম্ভ্রম বাচাইয়া চলা মুস্কিল—যেহেতু ভদ্রসন্তানের উপযোগী ব্যবসা নাই বলিলেও চলে। তারপব মূলধনেব কথা। যা-তা রকমে ত আর কারবাব কবা চলে না। বড ধরণে দোকান না খুলিলে সমাজে খাতিব থাকিবে না, কিন্তু তাহাতে আবার অনেক টাকার প্রযোজন। শেষ যদি টাকারও যোগাড় হয, তখন দক্ষ অথচ বিশ্বাসী লোকের অভাব আছে। যে কযজনকে পাওযা যায তাহাদের মধ্যে ছোট লোকের সংখ্যাই অধিক। ইহাব উপব ইহাদেব বেজায গুমোর। পয়সা দিয়াও ইহাদিগকে হাত করা যায না। এ অবস্থায কেনাবেচার হাঙ্গামা ছাড়িয়া দিলেও ব্যবসা চালান বড় সহজ ব্যাপার নয়। তাই "বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী"

—বাক্যের সার্থকতা বঙ্গদেশে অপ্রতিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। আজ পর্য্যন্ত যে কয়জন আধুনিক ধরণে ব্যবসায়প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাঁহাদের অধিকাংশ এই কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। তবে ইহাই যে একমাত্র কারণ, তাহা আমি বলি না। অন্যান্য কারণও যথেষ্ট আছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর সমাজিক জীবনের কি প্রভাব,তাহা দেখাইবার জন্য এইটীর উল্লেখ করিলাম মাত্র। একের উপর অন্যের অবিশ্বাস ও সন্দেহ, পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ ও হিংসাভাব এবং সহানুভূতি ও সহযোগীতার একান্ত অভাব প্রভৃতি সম্বন্ধে অধিক উচ্চবাচ্য না করাই ভাল;

এই ধরণের কতকগুলা কি ভাবিতে ভাবিতে রঘুনাথগঞ্জে ফিরিলাম। তখন বেলা আন্দাজ দশটা হইবে। পৌঁছিবামাত্র দেখি জঙ্গীপুর স্কুলের হেডমাষ্টার, আমাদের অসময়ের বন্ধু বিহারী বাবু আমাদের অভ্যর্থনার জন্য ঘাটে দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি ইতিপূর্ব্বে দুর্লভ বাবুর নিকট হইতে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আমাদের আতিথ্যের ভার লইয়াছিলেন। তিনি আমাদিগকে তাঁহার অভিপ্রায় জানাইলে আমরা রঘুনাথগঞ্জেই নামিতে বাধ্য হইলাম। ষ্টীমার পরপারে চলিয়া গেল। আমরা রঘুনাথগঞ্জের পথ দিয়া চলিলাম; এবং এটী কি—ওটী কি জিজ্ঞাসা করিতে করিতে তাঁহার বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। ভাদ্র মাসের রৌদ্রের প্রখরতার জন্যই হউক, অথবা নিজেদের কোন বিশেষ প্রয়োজন বশতঃ হউক, আমাদের কপালে ভাল করিয়া সহর দেখা ঘটিল না। তবে যেটুকু দেখিলাম তাহাতে বোধ হইল রঘুনাথগঞ্জ জঙ্গীপুর অপেক্ষা কোন প্রকারেই হীন নহে। বাড়ী, ঘর অনেক, এবং প্রায়ই ইষ্টক-নির্ম্মিত। রাস্তাগুলি পাকা কিন্তু সঙ্কীর্ণ। বাজার, হাট, পোষ্ট আফিস, থানা প্রভৃতি আমাদের আসিবার পথেই পড়িয়াছিল। শুনিলাম আদালতাদি জঙ্গীপুর হইতে রঘুনাথগঞ্জে উঠাইয়া আনিবার প্রস্তাব হইয়াছে। জঙ্গীপুর অপেক্ষা এখানকার স্বাস্থ্য ভাল। সেই জন্য জঙ্গীপুর কার্য্যক্ষেত্র হইলেও অনেকে রঘুনাথগঞ্জে বাসা করিয়াছেন। বিহারী বাবুও এই দলের একজন। তাঁহার বাসায় যখন বিশ্রাম করিতেছিলাম, তখন এই প্রসঙ্গে অনেক কথাবার্ত্তা হইল। তারপর আমরা স্নান করিয়া আহারে বসিলাম। ভদ্রলোক নানাপ্রকার ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করাইয়া স্বয়ং আমাদের পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। আমরা প্রত্যেকেই তাঁহার খাতিরে শরীরকে অযথা ক্লেশ দিতে ক্রটী করিলাম না। আহারান্তে তিনি আমাদের সহিত

ঘাট পর্য্যন্ত আসিলেন। দুর্লভ বাবুর কৃপায় আমাদের জন্য একখানি বোটের বন্দোবস্ত ছিল। বোট আসিলে আমরা তাঁহাকে মিষ্টকথায় আপ্যায়িত করিয়া ষ্টীমারে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। ফিরিয়া আসিয়া দেখি পূর্ব্বোক্ত ছাত্র দুইটী তাহাদের অভিভাবকদিগকে লইয়া আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। সঙ্গে পুনরায় জিনিষপত্রও প্রচুর পরিমাণে আনাইয়াছিল। সে গুলির আবশ্যকতা বুঝিবার অবস্থা হইতে তখন বহুদূরে বলিয়া আমরা অপরিগ্রহ অভ্যাস করিবার ইচ্ছা করিলাম। কিন্তু তাহাদের অভিভাবকদিগের অনুরোধ এড়াইতে সাহস হইল না। পরিশেষে আবার অবসর মত আসিব বলিয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম।

জঙ্গীপুর ও আজিমগঞ্জের প্রায় মধ্যবর্ত্তী একস্থানে ষ্টিমার আসিয়া থামিল। এটী একটী বড় রকমের ষ্টেশন। নাম—গাদি; ভাগীরথীর পশ্চিমপারে অবস্থিত। এখানে রেশম ব্যবসায়ী সাহেবদিগের একটী প্রধান আড্ডা আছে। নদীর ধারে তাহাদের এক সুবৃহৎ কারখানা রহিয়াছে। কলকব্জা অনেক ষ্টীমার হইতে দেখা গেল। বাষ্পের সাহায্যে এ সব পরিচালিত হয়। আসিবার কালে ষ্টীমার ইহাদের জন্য এক-বোট কয়লা আনিয়াছিল। এখন সেই খালি বোটখানি লইয়া ফিরিবার উদ্যোগ হইতে লাগিল।

অনুসন্ধানে জানা গেল নিকটস্থ নানাস্থান হইতে গুটী সংগ্রহ করিয়া এখানে সূতা প্রস্তুত করা হয় এবং তৎপরে সেই সমস্ত সূতা বিদেশে চালান দেওয়া হয়। তন্মধ্যে অধিকাংশ ফরাশি দেশে যায় ও তথায় রূপান্তরিত হইয়া সভ্য জাতির ব্যবহারে আসে। শুধু তাহাই নহে, আমাদের দেশেও এই সমস্ত দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে আমদানী করা হয় এবং তৎসমুদয় অনেক গুণ অধিক মূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে। এ ব্যাপার যে কেবল রেশম সম্বন্ধে হয় তাহা নহে। আমাদের দেশজাত অনেক বস্তুর এরূপ পরিণাম দেখিতে পাওয়া যায়। চামড়া পাট প্রভৃতির কথা সর্ব্বজনবিদিত। আমাদের জিনিষ আমাদের ঘরে ফিরিয়া আসে। কেবল বিদেশী অর্থে ও নৈপুণ্যের গুণে ইহাদের অবস্থা ও মূল্যের এত প্রভেদ হইয়া যায় যে, তখন আমরা এগুলি আমাদের বলিয়াও চিনিতে পারি না। কি প্রণালীতে এ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয় সে বিষয়ে আমরা নিতান্ত অজ্ঞ; এবং সেই অজ্ঞতার দণ্ডস্বরূপ আমরা এতাবধি প্রতিবৎসর বহু অর্থ বিদেশী বণিকদিগের হস্তে তুলিয়া দিতেছি। ধিক্ আমাদিগকে—আমাদের চেষ্টা, উদ্যম, ও অধ্যবসায়কেও

ধিক্! আমাদের আর্থিক অবনতির জন্য আমরা মাত্র দায়ী। অপরাপর জাতিরা যে বৈষয়িক ব্যাপারে আমাদিগের অপেক্ষা কেন শ্রেষ্ঠ তাহা কাহাকেও বুঝাইয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। ধন্য ইহাদের বানিজ্য বুদ্ধি! কেবল বুদ্ধি বলে ইহারা আমাদের দেশ হইতে আমাদেরই সাহায্যে কত ধন উপার্জ্জন করিতেছে তাহা আমরা দেখিয়াও দেখি না।

গাদি পরিত্যাগ করিবার অল্পক্ষণ পরে ষ্টীমারের এক পার্শ্বে গানবাজনার শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল। আমরা অগ্রসর হইয়া দেখি কতকগুলি ভদ্রযুবক সঙ্গীত আরম্ভ করিয়াছেন। ক্রমে ইহাদের সহিত আলাপে জানিলাম ইহারা কলিকাতা হইতে আমাদের ন্যায় বেড়াইবার অভিপ্রায়ে এদিকে আসেন। সেই দিন মধ্যাহ্নে গাদিতে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। ইচ্ছা ছিল নিকটবর্ত্তী কোন একটী নির্দ্ধারিত গ্রামে যাইয়া আমোদ প্রমোদ করিবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ তথায় যাইবার কোন রকম বন্দোবস্ত ছিল না। গাদিতে নামিয়া তাঁহারা দেখিলেন তাঁহাদের গন্তব্যস্থানে যাওয়া একপ্রকার অসম্ভব। পথ ঘাট জলে ডুবিয়া গিয়াছে। নৌকা ব্যতীত যাইবার কোন উপায় নাই। অথচ নৌকা পাওয়া গেল না। কাজেই বাধ্য হইয়া তাহারা এ ষ্টীমারে [illegible]ছেন—কলিকাতায় ফিরিবার জন্য অনিদ্রায়, অল্পাহারে ইহারা বিশেষ ক্লান্ত হইয়াছেন দেখিয়া এবং আমাদের একজনের সহিত ইহাদের দুইএকজনের পূর্ব্ব-পরিচয় প্রকাশ পাওয়ায় আমরা ইহাদিগকে আমাদিগের সহিত বহরমপুরে বিশ্রাম লইতে অনুরোধ করিলাম। কিন্তু ইহারা জিয়াগঞ্জে অবস্থান করা মত করিলেন। সে যাহা হইক ইহাঁদের অবস্থা দেখিয়া আমরা একটু ঈর্ষান্বিত হইয়াছিলাম। তাহার কারণ এই যে ইহারা যে অবস্থায় পড়িয়াছিলেন সে অবস্থায় পড়া আমাদেরই উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু ফলে অন্য প্রকার ঘটিয়া গেল।

বেলা সাড়ে তিনটা নাগাৎ জিয়াগঞ্জে আসিয়া পৌঁছিলাম। ট্রেন ধরিবারও তখনও সময় ছিল, কিন্তু অন্য প্রকার সুবিধা থাকায় আজিমগঞ্জ হইতে বহরমপুর পর্য্যন্ত যে ষ্টীমার চলে তাহাতে ফিরিয়া আসা ঠিক হইল। আমরা এই ষ্টীমারে উঠিয়া সন্ধ্যা প্রায় ছয়টার সময় খাগড়ার ঘাটে অবতরণ করিয়া যাতায়াতে প্রায় দেড় শত মাইল নদী ভ্রমণ সমাপ্ত করিলাম। বিশেষ ক্লান্ত না হইয়া বাসায় ফিরিলাম এবং তৎপরে পুনরায় সেই একঘেয়ে জীবনের পালা আরম্ভ হইল।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ

(স্বামী সারদানন্দ)

তীর্থাদি দর্শনে ঠাকুরের অনুভব ॥

(৩)

বেদপ্রমুখ শাস্ত্র বলেন, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ সর্ব্বজ্ঞ হন। সাধারণ মানবের ন্যায় তাঁহার মনে কোনওরূপ মিথ্যাসঙ্কল্পের কখন উদয় হয় না। তাঁহারা যখনই যে বিষয় জানিতে বুঝিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের অন্তর্দৃষ্টির সম্মুখে সে বিষয় তখনই প্রকাশিত হয়, অথবা তদ্বিষয়ের তত্ত্ব তাঁহারা বুঝিতে পারেন। কথাগুলি শুনিয়া ভাব বুঝিতে না পারিয়া আমরা পূর্ব্বে শাস্ত্রের বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন করিয়া কতই না মিথ্যা তর্কের অবতারণা করিয়াছি! বলিয়াছি, ঐ কথা যদি সত্য হয়, তবে ভারতের পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের ব্রহ্মজ্ঞেরা জড়বিজ্ঞান সম্বন্ধে এত অজ্ঞ ছিলেন কেন? হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন একত্র মিলিত হইয়া যে জল হয়, একথা ভারতের কোন্ ব্রহ্মজ্ঞ বলিয়া গিয়াছেন? তড়িৎশক্তির সহায়ে চারি পাঁচ ঘণ্টার ভিতরেই যে ছয়মাসের পথ আমেরিকাপ্রদেশের সংবাদ আমরা এখানে-বসিয়া পাইতে পারি একথা তাঁহারা বলিয়া যান্ নাই কেন? অথবা যন্ত্রসাহায্যে মানুষ যে বিহঙ্গমের ন্যায় আকাশচারী হইতে পারে, এ কথাই বা জানিতে পারেন নাই কেন? ইত্যাদি—

ঠাকুরের নিকট আসিয়াই শুনিলাম, শাস্ত্রের ঐকথা ঐভাবে বুঝিতে যাইলে তাহার কোনও অর্থই পাওয়া যাইবে না; অথচ শাস্ত্র যে ভাবে ঐ কথা বলিয়াছেন, সে ভাবে দেখিলে উহা সত্য বলিয়া নিশ্চয় প্রতীতি হইবে। এই বলিয়া ঠাকুর শাস্ত্রের ঐ কথা দুই একটি গ্রাম্য দৃষ্টান্ত সহায়ে বুঝাইয়া বলিতেন—"হাঁড়িতে ভাত ফুট্‌ছে; চালগুলি সুসিদ্ধ হয়েছে কি না জান্‌তে তুই তার ভিতর থেকে একটা ভাত তুলে টিপে দেখ্‌লি যে, হয়েছে—আর অম্‌নি বুঝতে পার্‌লি যে, সব চালগুলিই সিদ্ধ হয়েছে। কেন? তুই তো ভাতগুলির সব এক একটি ক'রে টিপে টিপে দেখ্‌লি না—তবে কি ক'রে বুঝ্‌লি? ঐ কথা যেমন বোঝা যায়, তেমনি জগৎসংসারটা নিত্য কি অনিত্য, সৎ কি অসৎ, একথাও সংসারের দুটো চারটে জিনীস পরক (পরীক্ষা) ক'রে দেখেই বুঝা যায়। মানুষটা জন্মাল, কিছুদিন বেঁচে রইল, তার পর

মোলো ; গোরুটাও—তাই ; গাছটাও—তাই ; এইরূপে দেখে দেখে বুঝ্‌লি যে, যে জিনীসেরই নাম আছে, রূপ আছে, সেগুলোরই এই ধারা। পৃথিবী, সূর্য্যলোক, চন্দ্রলোক, সকলেরই নাম রূপ আছে,অতএব তাদেরও এই ধারা। এইরূপে জান্‌তে পার্‌লি, সমস্ত জগৎসংসারটারই এই স্বভাব। তখন জগতের ভিতরের সব জিনীসেরই স্বভাবটা জান্‌লি—কি না? এইরূপে তখনি সংসারটাকে ঠিক ঠিক অনিত্য, অসৎ বলে বুঝ্‌বি, অমনি সেটাকে আর ভালবাস্‌তে পার্‌বি না—মন থেকে ত্যাগ করে নির্ব্বাসনা হবি। আর যখনি ত্যাগ কর্‌বি, তখনি জগৎকারণ ঈশ্বরের দেখা পাবি। ঐরূপে যার ঈশ্বর দর্শন হ'ল সে সর্ব্বজ্ঞ হ'ল না, তো কি হ'ল তা বল্‌।"

ঠাকুরের এত কথার পরে আমরা বুঝিতে পারিলাম—ঠিক কথাই তো, এক ভাবে সর্ব্বজ্ঞই তো সে হইল বটে! কোন একটা পদার্থের আদি, মধ্য ও অন্ত দেখিতে পাওয়া এবং ঐ পদার্থটার উৎপত্তি যাহা হইতে হইয়াছে তাহা দেখিতে বা জানিতে পারাকেই তো আমরা সেই পদার্থের জ্ঞান বলিয়া থাকি?—তবে পূর্ব্বোক্তভাবে জগৎ-সংসারটাকে জানা বা বুঝাকেও জ্ঞান বলিতে হইবে। আবার ঐ জ্ঞান জগদন্তর্গত সকল পদার্থ সম্বন্ধেই সমভাবে সত্য। কাজেই উহাকে জগদন্তর্গত সর্ব্ব পদার্থের জ্ঞান বলিতে হয় এবং যাঁহার ঐরূপ জ্ঞান হয়, তাঁহাকে সর্ব্বজ্ঞ তো বাস্তবিকই বলা যায়! শাস্ত্র তো তবে ঠিকই বলিয়াছে!

ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ সত্যসংকল্প হন, সিদ্ধসংকল্প হন, শাস্ত্রীয় ঐ বচনেরও তখন একটা মোটামুটি অর্থ খুঁজিয়া পাইলাম। বুঝিতে পারিলাম যে, এক একটা বিষয়ে মনের সমগ্র চিন্তাশক্তি একত্রিত করিয়া অনুসন্ধানেই আমাদের তত্তদ্বিষয়ে জ্ঞান আসিয়া উপস্থিত হয়—ইহা নিত্য-প্রত্যক্ষ। তবে ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ, যিনি আপন মনকে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত এবং আয়ত্ত করিয়াছেন, তিনি যখনই যে কোনও বিষয় জানিবার জন্য মনের সর্ব্বশক্তি একত্রিত করিয়া অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবেন, তখনই অতি সহজে যে তিনি ঐ বিষয়ের জ্ঞানলাভ করিতে পারিবেন, এ কথা তো বিচিত্র নহে। তবে উহার ভিতর একটা কথা আছে—যিনি সমগ্র জগৎ-সংসারটাকে অনিত্য বলিয়া ধ্রুব ধারণা করিয়াছেন, এবং সর্ব্বশক্তির আকরস্বরূপ জগৎকারণ ঈশ্বরকে প্রেমে সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে ধরিতে পারিয়াছেন, তাঁহার রেলগাড়ি চালাইতে, মানুষ মারা কল কারখানা নির্ম্মাণ করিতে সংকল্প বা প্রবৃত্তি হইবে—কি, না। যদি ঐরূপ

সংকল্প তাঁহাদের মনে উদয় হওয়া অসম্ভব হয়, তাহা হইলেই তো আর ঐরূপ কল কারখানা নির্ম্মিত হইল না। ঠাকুরের দিব্যসঙ্গলাভে দেখিলাম, বাস্তবিকই ঐরূপ হয়। বাস্তবিকই তাঁহাদের ভিতর ঐরূপ প্রবৃত্তির উদয় হওয়া অসম্ভব হইয়া উঠে। ঠাকুর কাশীপুরে দারুণ ব্যাধিতে ভুগিতেছেন, এমন সময়ে স্বামীবিবেকানন্দ প্রমুখ আমরা, আমাদের কল্যাণের নিমিত্ত, মনঃশক্তি প্রয়োগে রোগমুক্ত হইতে সজলনয়নে তাঁহাকে অনুরোধ করিলেও তিনি ঐরূপ চেষ্টা বা সংকল্প করিতে পারিলেন না! বলিলেন, ঐরূপ করিতে যাইয়া সংকল্পের একটা দৃঢ়তা বা আঁট কিছুতেই মনে আনিতে পারিলেন না! বলিলেন, "এ হাড় মাসের খাঁচাটার উপর মনকে সচ্চিদানন্দ হ'তে ফিরিয়ে কিছুতেই আন্‌তে পারলুমনা! সর্ব্বদা শরীরটাকে তুচ্ছ, হেয় জ্ঞান ক'রে, যে মনটা জগদম্বার পাদপদ্মে চিরকালের জন্য দিয়েছি, সেটাকে এখন তাঁ-থেকে ফিরিয়ে শরীরটাতে আন্‌তে পারি কিরে?"

আর একটী ঘটনার উল্লেখ এখানে করিলে পাঠকের ঐ বিষয়টী বুঝা সহজ হইবে। বাগবাজারে শ্রীযুক্ত বলরাম বসু মহাশয়ের বাটীতে ঠাকুর একদিন আসিয়াছেন। বেলা তখন দশটা হইবে। ঠাকুরের এখানে সেদিন আসাটা পূর্ব্ব হইতেই স্থির ছিল। কাজেই শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথ প্রমুখ অনেকগুলি যুবক-ভক্ত তাঁহার দর্শন লাভের জন্য সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং কখন ঠাকুরের সহিত এবং কখন তাঁহাদের পরস্পরের ভিতরে নানাপ্রসঙ্গ চলিতে লাগিল। সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়াতীত বিষয় দেখার কথায় ক্রমে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের কথা আসিয়া পড়িল, স্থূল চক্ষে যাহা দেখা যায় না, ঐরূপ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পদার্থও উহার সহায়ে দেখিতে পাওয়া যায়; একগাছি অতি ক্ষুদ্র রোমকে ঐ যন্ত্রের ভিতর দিয়া দেখিলে একগাছা লাঠির মত দেখায় এবং দেহের প্রত্যেক রোমগাছটি পেঁপের ডালের মত ফাঁপা ইহাও দেখিতে পাওয়া যায়, ইত্যাদি নানা কথা শুনিয়া ঠাকুর ঐ যন্ত্র সহায়ে দুই একটি পদার্থ দেখিতে বালকের ন্যায় আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কাজেই ভক্তগণ স্থির করিলেন সেদিন অপরাহ্ণেই কাহারও নিকট হইতে ঐ যন্ত্র চাহিয়া আনিয়া ঠাকুরকে দেখাইবেন।

তখন অনুসন্ধানে জানা গেল, শ্রীযুত প্রেমানন্দ স্বামীজির ভ্রাতা, আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু ডাক্তার বিপিন বিহারী ঘোষ—তিনি তখন অল্পদিন মাত্রই ডাক্তারী পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন—ঐরূপ একটি যন্ত্র মেডিকেল

কলেজ হইতে পুরস্কারস্বরূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন। ঐ যন্ত্রটি আনয়ন করিয়া ঠাকুরকে দেখাইবার জন্য তাঁহার নিকট লোক প্রেরিত হইল। তিনিও সংবাদ পাইয়া কয়েক ঘণ্টা পরে, বেলা চারিটা আন্দাজ, যন্ত্রটি লইয়া আসিলেন এবং উহা ঠিক্ ঠাক্ করিয়া খাটাইয়া ঠাকুরকে তন্মধ্য দিয়া দেখিবার জন্য আহ্বান করিলেন।

ঠাকুর উঠিলেন, দেখিতে যাইলেন, কিন্তু না দেখিয়াই আবার ফিরিয়া আসিলেন! সকলে কারণ জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন—"মন এখন এত উঁচুতে উঠে রয়েছে যে, কিছুতেই এখন তাকে নামিয়ে নীচের দিকে দেখতে পারচি না।" আমরা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিলাম—ঠাকুরের মন যদি নামিয়া আসে, তজ্জন্য। কিন্তু কিছুতেই সেদিন আর ঠাকুরের মন ঐ উচ্চ ভাবভূমি হইতে নামিল না—কাজেই তাঁহার আর সেদিন অনুবীক্ষণ সহায়ে কোন পদার্থই দেখা হইল না! বিপিন বাবু আমাদের কয়েক জনকে ঐ সকল দেখাইয়া অগত্যা যন্ত্রটি ফিরিয়া লইয়া যাইলেন।

দেহাদি ভাব ছাড়াইয়া ঠাকুরের মন যখন যত উচ্চ—উচ্চতর ভাবভূমিতে বিচরণ করিত, তখন তাঁহার তত্তৎ ভূমি হইতে লব্ধ তত অসাধারণ দিব্যদর্শন-সমূহ আসিয়া উপস্থিত হইত, এবং দেহ হইতে সম্পূর্ণ বিযুক্ত হইয়া যখন তিনি সর্ব্বোচ্চ অদ্বৈতভাবভূমিকায় বিচরণ করিতেন, তখন তাঁহার হৃদয়ের স্পন্দনাদি দেহের সমস্ত ইন্দ্রিয়ব্যাপার কিছু কালের জন্য রুদ্ধ হইয়া দেহটা মৃতবৎ পড়িয়া থাকিত এবং মনের চিন্তা-কল্পনাদি সমস্ত ব্যাপারও সম্পূর্ণরূপে স্থির হইয়া যাইয়া তিনি অখণ্ড সচ্চিদানন্দের সহিত এককালে অপৃথক্‌ভাবে অবস্থান করিতেন। আবার ঐ সর্ব্বোচ্চ ভাবভূমি হইতে নিম্নে নিম্নতর ভূমিতে ক্রমে ক্রমে নামিতে নামিতে যখন ঠাকুরের মানব সাধারণের ন্যায় 'এই দেহটা আমার'—পুনরায় এইরূপ ভাবের উদয় হইত, তখন তিনি আবার আমাদের ন্যায় চক্ষু দ্বারা দর্শন, কর্ণ দ্বারা শ্রবণ, ত্বক্ দ্বারা স্পর্শ এবং মনের দ্বারা চিন্তা সংকল্পাদি করিতেন।

পাশ্চাত্যের একজন প্রধান দার্শনিক*, মানবমনের সমাধিভূমিতে ঐ প্রকারে আরোহণ অবরোহণের কিঞ্চিৎ আভাষ পাইয়াই সাধারণ মানবের দেহান্তর্গত চৈতন্যও যে সকল সময় একাবস্থায় থাকে না, এই প্রকার মত

* Ralph Waldo Emerson—"Consciousness ever moves along a graded plane."

প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ মতই যে যুক্তিযুক্ত এবং ভারতের পূর্ব্ব পূর্ব্ব সকল ঋষিগণের অনুমোদিত, একথা আর বলিতে হইবে না। তবে সাধারণ মানব ঐ উচ্চতম অদ্বৈতভাবভূমিতে বহুকাল আরোহণ না করিয়া উহার কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছে এবং ইন্দ্রিয়াদি সহায়েই কেবলমাত্র জ্ঞানলাভ করা যায়, এই কথাটায় একেবারে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, সংসারে এক প্রকার নোঙ্গর ফেলিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছে। নিজ জীবনে তদ্বিপরীত করিয়া দেখাইয়া তাহার ঐ ভ্রম দূর করিতেই ঠাকুরের ন্যায় অবতারপ্রথিত জগদ্‌গুরু আধিকারিক পুরুষ সকলের কালে কালে উদয়—এ কথাই বেদপ্রমুখ শাস্ত্র আমাদের শিক্ষা দিতেছেন।

সে যাহাই হউক, এখন বুঝা যাইতেছে যে, ঠাকুর সংসারের সকল বস্তু ও ব্যক্তিকে আমাদের মত কেবল এক ভাবেই দেখিতেন না। উচ্চ উচ্চতর ভাবভূমি সকলে আরোহণ করিয়া ঐ সকল বস্তু ও ব্যক্তিকে যেমন দেখায়, তাহাও সর্ব্বদা দেখিতে পাইতেন এবং তজ্জন্যই তাঁহার সংসারের কোন বিষয়েই আমাদের ন্যায় একদেশী মত ও ভাবাবলম্বী হওয়া অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল; এবং সেজন্যই তিনি আমাদের কথা ও ভাব ধরিতে বুঝিতে পারিলেও, আমরা তাঁহার কথা ও ভাব বুঝিতে পারিতাম না। আমরা মানুষটাকে—মানুষ বলিয়া,গোরুটাকে—গোরু বলিয়া,পাহাড়টাকে—পাহাড় বলিয়াই কেবল জানি। তিনি দেখিতেন, মানুষটা গোরুটা পাহাড়টা—মানুষ, গোরু ও পাহাড় বটে; অধিকন্তু আবার দেখিতেন, সেই মানুষ গোরু ও পাহাড়ের ভিতর হইতে সেই জগৎকারণ অখণ্ড সচ্চিদানন্দ উঁকি মারিতেছেন! মানুষ গরু ও পাহাড়-রূপ আবরণে আবৃত হওয়ায় কোথাও তাঁহারই অঙ্গ (প্রকাশ) অধিক দেখা যাইতেছে এবং কোথাও বা কম দেখা যাইতেছে এই মাত্র প্রভেদ। সেজন্যই ঠাকুরকে বলিতে শুনিয়াছি—

"দেখি কি? যেন, গাছপালা, মানুষ, গোরু, ঘাস, জল সব ভিন্ন ভিন্ন রকমের খোলগুলো! বালিসের খোল যেমন হয়, দেখিস্ নি?—কোনওটা খেরোর, কোনওটা ছিটের,কোনওটা বা অন্য কাপড়ের, কোনওটা চারকোণা, কোনওটা গোল সেই রকম। আর বালিসের ঐ সব রকম খোলের ভিতরেই যেমন একই জিনিস তুলো ভরা থাকে—সেই রকম, ঐ মানুষ, গোরু, ঘাস, জল, পাহাড় পর্ব্বত সব খোলগুলোর ভিতরেই সেই এক অখণ্ড

সচ্চিদানন্দ রয়েছেন! ঠিক্ ঠিক্ দেখ্‌তে পাই রে, মা যেন নানা রকমের চাদর মুড়ি দিয়ে নানা রকম সেজে ভিতর থেকে উঁকি মারচেন! একটা অবস্থা হয়েছিল, যখন সদা সর্ব্বক্ষণ ঐ রকম দেখ্‌তুম। ঐ রকম অবস্থা দেখে বুঝতে না পেরে সকলে বোঝাতে, শান্ত করতে এল; রামলালের মা-টা সব কত কি ব'লে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো; তাদের দিকে চেয়ে দেখ্‌ছি কি—যে, (কালীমন্দির দেখাইয়া) ঐ মা—ই নানা রকমে সেজে এসে ঐ রকম কর্‌চে! ঢং দেখে হেসে গড়াগড়ি দিতে লাগ্‌লুম্ আর বল্‌তে লাগ্‌লুম্, 'বেশ সেজেচ!' একদিন কালীঘরে আসনে ব'সে মাকে চিন্তা করচি; কিছুতেই মার মূর্ত্তি মনে আন্‌তে পারলুম্ না! তার পর দেখি কি—রমণী ব'লে একটা বেশ্যা ঘাটে চান্ করতে আস্‌ত, তার মত হয়ে ঘাটের পাশ থেকে উঁকি মার্‌চে! দেখে হাসি আর বলি—'ওমা আজ তোর রমণী হ'তে ইচ্ছে হয়েছে—তা বেশ, ঐরূপেই আজ পূজো নে!' ঐ রকম ক'রে বুঝিয়ে দিলে—'বেশ্যাও আমি—আমা ছাড়া কিছু নেই!' আর এক দিন গাড়ী ক'রে মেছোবাজারের রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে দেখি কি—সেজে, গুজে, খোঁপা বেঁধে, টিপ্ প'রে বারাণ্ডায় দাঁড়িয়ে বাঁধা হুঁকোয় তামাক খাচ্চে, আর মোহিনী হ'য়ে লোকের মন ভুলাচ্চে! দেখে অবাক্ হ'য়ে বল্লুম্—'মা! তুই এখানে এই ভাবে রয়েছিস্?'—ব'লে প্রণাম কর্‌লুম!" উচ্চ ভাবভূমিতে উঠিয়া ঐরূপে সকল বস্তু ও ব্যক্তিকে দেখিতে আমরা ভুলিয়াই গিয়াছি। অতএব ঠাকুরের ঐ সকল উপলব্ধির কথা বুঝিব কিরূপে?

আবার দেহাদি ভাব লইয়া ঠাকুর যখন আমাদের ন্যায় সাধারণ ভাবভূমিতে থাকিতেন, তখনও স্বার্থ-ভোগসুখ-স্পৃহার বিন্দুমাত্রও মনেতে না থাকায় ঠাকুরের বুদ্ধি ও দৃষ্টি আমাদিগের অপেক্ষা কত বিষয় অধিক ধরিতে এবং তলাইয়া বুঝিতেই না সক্ষম হইত! যে ভোগসুখটা লাভ করিবার প্রবল কামনা আমাদের প্রত্যেকের ভিতরে রহিয়াছে, খাইতে শুইতে, দেখিতে শুনিতে, বেড়াইতে ঘুমাইতে বা অপরের সহিত আলাপাদি করিতে—সকল সময়ে উহারই অনুকূল বিষয়সমূহ আমাদের নয়নে উজ্জ্বল বর্ণে প্রতিভাসিত হয় এবং তজ্জন্য আমাদের মন উহার প্রতিকূল বস্তু ও ব্যক্তিসকলকে উপেক্ষা করিয়া পূর্ব্বোক্ত বিষয় সকলের দিকেই অধিকতর আকৃষ্ট হইয়া থাকে। ঐরূপে উপেক্ষিত প্রতিকূল ব্যক্তি ও বিষয় সকলের স্বভাব জানিবার আর আমাদের অবসর হইয়া উঠে না। কতকগুলি বস্তু ও ব্যক্তিকেই আপনার করিয়া

লইয়া বা নিজস্ব করিয়া লইবার চেষ্টাতেই আমরা জীবনটা কাটাইয়া দিয়া থাকি। এইজন্যই ইতর সাধারণ মানবের ভিতর জ্ঞানলাভ করিবার ক্ষমতার এত তারতম্য দেখা যায়। আমাদের সকলেরই চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয় থাকিলেও ঐ সকলের সমভাবে সকল বিষয়ে চালনা করিয়া জ্ঞানোপার্জ্জন করিতে আমরা সকলে পারি কৈ? এইজন্যই আমাদের ভিতরে যাহাদের স্বার্থপরতা এবং ভোগস্পৃহা অল্প তাহারাই অন্য সকলের অপেক্ষা সহজে সকল বিষয়ে জ্ঞানলাভে সক্ষম হয়।

সাধারণ ভাবভূমিতে অবস্থানকালেও ঠাকুরের দৃষ্টি যে কি তীক্ষ্ণ ছিল, তাহার দুই একটী দৃষ্টান্ত এখানে দিলে মন্দ হইবে না! আধ্যাত্মিক জটিল তত্ত্ব সকল বুঝাইতে ঠাকুর সাধারণতঃ যে সকল দৃষ্টান্ত ও রূপকাদি ব্যবহার করিতেন, তাহাতে ঐ তীক্ষ্ণদৃষ্টিমত্তার কতদূর পরিচয় যে পাওয়া যাইত, তাহা বলিবার নহে। উহার প্রত্যেকটির সহায়ে ঠাকুর যেন এক একটি জলন্ত চিত্র দেখাইয়া ঐ জটিল বিষয় যে সম্ভবপর, একথা শ্রোতার হৃদয়ে একেবারে প্রবিষ্ট করাইয়া দিতেন।

ধর, জটিল সাংখ্যদর্শনের কথা চলিয়াছে। ঠাকুর আমাদিগকে পুরুষ ও প্রকৃতি হইতে জগতের উৎপত্তির কথা বলিতে বলিতে বলিলেন—"ওতে বলে পুরুষ অকর্ত্তা, কিছু করেন না; প্রকৃতিই সকল কাজ করেন; পুরুষ, প্রকৃতির ঐ সকল কাজ সাক্ষিস্বরূপ হ'য়ে দেখেন; প্রকৃতিও আবার পুরুষকে ছেড়ে আপনি কোনও কাজ কর্‌তে পারেন না।" শ্রোতারা তা সকলেই পণ্ডিত—আফিসের চাকুরে বাবু বা মচ্ছুদ্দি, না হয় বড় জোর ডাক্তার, উকিল বা ডেপুটি, আর ইস্কুল কলেজের ছোঁড়া—কাজেই ঠাকুরের কথাগুলি শুনিয়া সকলে মুখ চাওয়া চাওয়ি করিতেছে। ভাবগতিক দেখিয়া ঠাকুর বলিলেন—"ওই যে গো দেখনি, বে-বাড়ীতে? কর্ত্তা হুকুম দিয়ে নিজে ব'সে ব'সে আলবোলায় তামাক টান্‌চে। গিন্নি কিন্তু কাপড়ে হলুদ মেখে একবার এখানে একবার ওখানে বাড়ীময় ছুটোছুটি ক'রে এ কাজটা হ'ল কি না, ও কাজটা কর্‌লে কি না সব দেখচেন, শুন্‌চেন, বাড়ীতে যত মেয়ে ছেলে আস্‌ছে, তাদের আদর অভ্যর্থনা কর্‌চেন—আর মাঝে মাঝে কর্ত্তার কাছে এসে হাতমুখ নেড়ে শুনিয়ে যাচ্চেন—'এটা এই রকম করা হ'ল, ওটা এই রকম হ'ল, এটা কর্‌তে হবে, ওটা করা হবে না'—ইত্যাদি। কর্ত্তা তামাক টান্‌তে টান্‌তে সব শুন্‌চেন আর 'হুঁ' 'হুঁ' করে ঘাড় নেড়ে সব কথায় সায় দিচ্ছেন। সেই রকম আর

কি।" ঠাকুরের কথা শুনিয়া সকলে হাসিতে লাগিল এবং সাংখ্যদর্শনের কথাও বুঝিতে পারিল।

পরে আবার কথা উঠিল—"বেদান্তে বলে ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি, পুরুষ ও প্রকৃতি অভেদ, অর্থাৎ পুরুষ ও প্রকৃতি দুইটি পৃথক্ পদার্থ নহে ; একই পদার্থ, কখন পুরুষভাবে এবং কখন বা প্রকৃতিভাবে থাকে।" আমরা বুঝিতে পারিতেছি না দেখিয়া ঠাকুর বলিলেন—"সেটা কি রকম জানিস্? যেমন সাপ্‌টা কখন চল্‌ছে,আবার কখন বা স্থির হ'য়ে পড়ে আছে। যখন স্থির হ'য়ে আছে তখন হ'ল পুরুষভাব—প্রকৃতি তখন পুরুষের সঙ্গে মিশে এক হ'য়ে আছে। আর যখন সাপ্‌টা চল্‌চে, তখন যেন প্রকৃতি পুরুষ থেকে আলাদা হ'য়ে কাজ কর্‌চে।" ঐ চিত্রটি হইতে কথাটি বুঝিয়া সকলে ভাবিতে লাগিল, এত সোজা কথাটা বুঝিতে পারি নাই!

আবার হয়ত পরে কথা উঠিল, মায়া ঈশ্বরেরই শক্তি, ঈশ্বরেতেই রহিয়াছেন, তবে কি ঈশ্বরও আমাদের ন্যায় মায়াবদ্ধ? ঠাকুর শুনিয়া বলিলেন —"নারে, ঈশ্বরের মায়া হ'লেও এবং মায়া ঈশ্বরে সর্ব্বদা থাক্‌লেও, ঈশ্বর কখনও মায়াবদ্ধ হন না। এই দেখ্ না—সাপ্ যাকে কামড়ায় সেই মরে ; সাপের মুখে বিষ সর্ব্বদা রয়েছে ; সাপ সর্ব্বদা সেই মুখ দিয়ে খাচ্চে, ঢোক্ গিল্‌ছে, কিন্তু সাপ নিজে মরে না—সেই রকম।" সকলে বুঝিল, উহা সম্ভবপর বটে।

ঐ সকল দৃষ্টান্ত হইতেই বেশ বুঝা যায়, সাধারণ ভাবভূমিতে ঠাকুর যখন থাকিতেন তখন তাঁহার তীক্ষ্ণদৃষ্টির সম্মুখে কোনও পদার্থের কোনও প্রকার ভাবই লুক্কায়িত থাকিতে পারিত না। মানবপ্রকৃতির ত কথাই নাই, বাহ্য প্রকৃতির অন্তর্গত যত কিছু পরিবর্ত্তন ও তাঁহার দৃষ্টিসম্মুখে আপন রূপ অপ্রকাশিত রাখিতে পারিত না। অবশ্য, যন্ত্রাদি সহায়ে বাহ্যপ্রকৃতির যে সকল পরিবর্ত্তন ধরা বুঝা যায়, আমরা সে সকলের কথা এখানে বলিতেছি না।

আর এক আশ্চর্য্যের বিষয়, সাধারণ ভাবভূমিতে থাকিয়া বাহ্যপ্রকৃতির অন্তর্গত পদার্থনিচয়ের যে সকল অসাধারণ পরিবর্ত্তন বা বিকাশ লোকনয়নে সচরাচর পতিত হয় না, সেইগুলিই যেন অগ্রে ঠাকুরের নয়নের গোচরীভূত হইত! ঈশ্বরেচ্ছাতেই সৃষ্ট্যন্তর্গত সকল পদার্থের সকল প্রকার বিকাশ আসিয়া উপস্থিত হয়, অথবা তিনিই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জগদন্তর্গত বস্তু ও ব্যক্তিসকলের ভাগ্যচক্রের নিয়ামক—এই ভাবটি ঠাকুরের প্রাণে প্রাণে প্রবিষ্ট করাইয়া

দিবার জন্যই যেন জগদম্বা ঠাকুরের সম্মুখে ঐ অসাধারণ প্রাকৃতিক বিকাশগুলি-(exceptions) যখন তখন আনিয়া ধরিতেন। "যাঁহার আইন (Law), অথবা যিনি আইন করিয়াছেন, তিনি ইচ্ছা হইলে সে আইন পাল্টাইয়া আবার অন্যরূপ আইন করিতে পারেন"—ঠাকুরের ঐ কথাগুলির অর্থ আমরা তাঁহার বাল্যাবধি ঐরূপ দর্শন হইতেই স্পষ্ট পাইয়া থাকি! দৃষ্টান্তস্বরূপ ঐ বিষয়ের কয়েকটি ঘটনা এখানে বলিলে মন্দ হইবে না।

আমরা তখন কলেজে তাড়িৎশক্তি সম্বন্ধে জড়বিজ্ঞানের বর্ত্তমান যুগে আবিষ্কৃত বিষয়গুলির কিছু কিছু পড়িয়া মুগ্ধ হইতেছি। বালচপলতাবশে ঠাকুরের নিকটে একদিন ঐ প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিয়া পরস্পর নানা কথা কহিতেছি। Electricity (তড়িৎ) কথাটির বারম্বার উচ্চারণ লক্ষ্য করিয়া ঠাকুর বালকের ন্যায় ঔৎসুক্য প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"হ্যাঁরে, তোরা ও কি বল্‌ছিস্? ইলেক্‌টিক্‌টিক্ মানে কি?" ইংরাজী কথাটির ঐরূপ বালকের ন্যায় উচ্চারণ ঠাকুরের মুখে শুনিয়া আমরা হাসিতে লাগিলাম। পরে তড়িৎশক্তি সম্বন্ধীয় সাধারণ নিয়মগুলি তাঁহাকে বলিয়া বজ্রনিবারকদণ্ডের (Lightning Conductor) উপকারিতা, সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ পদার্থের উপরেই বজ্রপতন হয় এজন্য ঐ দণ্ডের উচ্চতা বাটীর উচ্চতাপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক হওয়া উচিত—ইত্যাদি নানা কথা তাঁহাকে শুনাইতে লাগিলাম। ঠাকুর আমাদের সকল কথাগুলি মন দিয়া শুনিয়া বলিলেন—"কিন্তু আমি যে দেখেছি, তেতালা বাড়ীর পাশে ছোট চালা ঘর—শালার বাজ্ তেতালায় না প'ড়ে তাইতে এসে ঢুক্‌লো! তার কি কর্‌লি বল? ওসব কি একেবারে ঠিক্‌ঠাক্ বলা যায় রে। তাঁর (ঈশ্বরের বা জগদম্বার) ইচ্ছাতেই আইন, আবার তাঁর ইচ্ছাতেই উল্টে পাল্টে যায়।" আমরাও সে বার মথুর বাবুর ন্যায় ঠাকুরকে প্রাকৃতিক নিয়ম (Natural Laws) বুঝাইতে যাইয়া ঠাকুরের ঐ প্রশ্নের উত্তর দানে অসমর্থ হইয়া কি বলিব, কিছুই খুঁজিয়া পাইলাম না। বাজ্‌টা তেতালার দিকেই আকৃষ্ট হইয়াছিল, কি একটা অপরিজ্ঞাত কারণে সহসা তাহার গতির পরিবর্ত্তন হইয়া চালায় গিয়া পড়িয়াছে, অথবা ঐরূপ নিয়মের ব্যতিক্রম একটি আধটিই হইতে দেখা যায়—অন্যত্র সহস্র স্থলে আমরা যেরূপ বলিতেছি সেইভাবে উচ্চ পদার্থেই বজ্রপতন হইয়া থাকে। ইত্যাদি নানা কথা আমরা ঠাকুরকে বলিলেও ঠাকুর প্রাকৃতিক ঘটনাবলী যে অনুল্লঙ্ঘনীয় নিয়মবশে ঘটিয়া থাকে, একথা বুঝিলেন

না!—বলিলেন, "হাজার জায়গায় তোরা যেমন বলচিস্ তেমনি না হয় হোলো, কিন্তু, দুচারজায়গায় ঐ রকম না হওয়াতেই ঐ আইন যে পাল্টে যায় এটা বুঝা যাচ্চে!"

উদ্ভিদ্‌প্রকৃতির আলোচকেরা, সর্ব্বদা শ্বেত বা রক্ত বর্ণের পুষ্পপ্রসবকারী উদ্ভিদ্‌সমূহে কখন কখন তদ্‌ব্যতিক্রমও হইয়া থাকে বলিয়া গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ঐরূপ হওয়া এত অসাধারণ যে, সাধারণ মানব উহা কখন দেখে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ঠাকুরের জীবনে ঘটনা দেখ—মথুর বাবুর সহিত, প্রাকৃতিক নিয়ম সব সময় ঠিক থাকে না, ঈশ্বরেচ্ছায় অন্যরূপ হইয়া থাকে—এই বিষয় লইয়া যখন ঠাকুরের বাদানুবাদ হইয়াছে, সেই সময়েই ঐ রূপ একটি দৃষ্টান্ত তাঁহার দৃষ্টিগোচর হওয়া এবং মথুর বাবুকে উহা দেখাইয়া দেওয়া!

ঐ রূপ জীবন্ত প্রস্তর দেখা, মনুষ্য শরীরের মেরুদণ্ডের শেষভাগের অস্থি (Coccyx) পশুপুচ্ছের মত অল্প স্বল্প বাড়িয়া যাইতে দেখা, স্ত্রীভাবের প্রাবল্যে পুরুষশরীরকে স্ত্রীশরীরের ন্যায় যথাকালে সামান্য ভাবে পুষ্পিত হইতে দেখা, প্রেতযোনি এবং দেবযোনি-গত পুরুষ সকলের সন্দর্শন করা প্রভৃতি ঠাকুরের জীবনে অনেক ঘটনা শুনিয়াছি। জগৎপ্রসূতি প্রকৃতিকে (Nature) আমরা পাশ্চাত্যের অনুকরণে একবারে বুদ্ধিশক্তিরহিত জড় বলিয়া ধারণা করিয়াছি বলিয়াই ঐ সকল অসাধারণ ঘটনাবলীকে প্রকৃতির অন্তর্গত কার্য্যকারণসম্বন্ধ-বিচ্যুত সহসোৎপন্ন ঘটনাবলী (Natural aberrations) নাম দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসি এবং মনে করি, প্রকৃতি যে সকল নিয়মে পরিচালিত, তাহার সকল-গুলিইবুঝিতে পারিয়াছি। ঠাকুরের অন্যরূপ ধারণা ছিল। তিনি দেখিতেন—সমগ্র বাহ্যান্তঃপ্রকৃতি জীবন্ত প্রত্যক্ষ জগদম্বার লীলাবিলাস ভিন্ন আর কিছুই নহে। কাজেই ঐ সকল অসাধারণ ঘটনাবলীকে তাঁহারই বিশেষ-ইচ্ছা-সম্ভূত বলিয়া মনে করিতেন। আর কিছু না হইলেও ঠাকুরের মনে যে ঐরূপ ধারণায় আমাদের অপেক্ষা শান্তি ও আনন্দ অনেক পরিমাণে অধিক থাকিত, একথা আর বুঝাইতে হইবে না। ঠাকুরের জীবনে ঐরূপ দৃষ্টান্তের কিছু কিছু উল্লেখ আমরা পূর্ব্বে করিয়াছি এবং পরেও করিব। এখন যাহা করা হইল, তাহা হইতেই পাঠক আমাদের বক্তব্য বিষয় বুঝিতে পারিবেন। অতএব আমরা পূর্ব্বানুসরণ করি।

প্রত্যেক বস্তু এবং ব্যক্তিকে ঠাকুর পূর্ব্বোক্ত প্রকারে দুই ভাবে দেখিয়া

তবে তৎসম্বন্ধে একটা স্থির ধারণা করিতেন। আমাদের ন্যায় কেবলমাত্র সাধারণ ভাবভূমি (ordinary plane of consciousness) হইতে দেখিয়াই যাহা হয় একটা মতামত স্থির করিতেন না। অতএব তীর্থ ভ্রমণ এবং সাধুদর্শনও যে ঠাকুরের ঐ প্রকারে দুই ভাবে হইয়াছিল, একথা আর বলিতে হইবে না। উচ্চ ভাবভূমিকা (higher plane of consciousness or super-consciousness) হইতে দেখিয়াই ঠাকুর কোন্ তীর্থে কতটা পরিমাণে উচ্চ ভাবের জমাট আছে. অথবা মানবমনকে উচ্চ ভাবে আরোহণ করাইবার শক্তি কোন্ তীর্থের কতটা পরিমাণে আছে, তদ্বিষয় অনুভব করিতেন। ঠাকুরের রূপরসাদি বিষয়সম্পর্কশূন্য সর্ব্বদা দেবতুল্য পবিত্র মন ঐ সূক্ষ্ম বিষয় স্থির করিবার একটি অপূর্ব্ব পরিচায়ক ও পরিমাপক যন্ত্র (detector)-স্বরূপ ছিল। তীর্থে বা দেবস্থানে গমন করিলেই উহা উচ্চ ভাবভূমিতে উঠিয়া সেই সকল স্থানের দিব্য প্রকাশ ঠাকুরের সম্মুখে প্রকাশিত করিত। উচ্চ ভাবভূমি হইতেই ঠাকুর কাশী স্বর্ণময় দেখিয়াছিলেন, কাশীতে মৃত্যু হইলে কি প্রকারে জীব সর্ব্ববন্ধনবিমুক্ত হয়, তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, শ্রীবৃন্দাবনে দিব্যভাবের বিশেষ প্রকাশ অনুভব করিয়াছিলেন এবং নবদ্বীপে যে আজ পর্য্যন্ত শ্রীগৌরাঙ্গের সূক্ষ্মাবির্ভাব বর্ত্তমান তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।

কথিত আছে, বৃন্দাবনের দিব্যভাবপ্রকাশ শ্রীচৈতন্যদেবই প্রথম অনুভব করেন। ব্রজের তীর্থাস্পদ স্থান সকল তাঁহার আবির্ভাবের পূর্ব্বে লুপ্ত প্রায় হইয়া গিয়াছিল। ঐ সকল স্থানে ভ্রমণকালে উচ্চ ভাবভূমিকায় উঠিয়া তাঁহার মন যেখানে যেরূপ শ্রীকৃষ্ণের দিব্য প্রকাশ সকল অনুভব বা প্রত্যক্ষ করিত, সে খানেই যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বহু পূর্ব্ব যুগে সেইরূপ লীলা করিয়াছিলেন—একথায় রূপসনাতনাদি তাঁহার শিষ্যগণ প্রথম বিশ্বাসস্থাপন করেন এবং পরে তাঁহাদিগের মুখ হইতে শুনিয়া সমগ্র ভারতবাসী উহাতেবিশ্বাসী হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যদেবের পূর্ব্বোক্ত ভাবে বৃন্দাবনাবিষ্কারের কথাআমরা কিছুই বুঝিতে পারিতাম না। ঐ প্রকার হওয়া যে সম্ভবপর, একথা একেবারেই মনে স্থান দিতাম না। উচ্চ ভাবভূমিকায় উঠিয়া ঠাকুরের মনের বস্তু ও ব্যক্তি সকলকে ঐরূপে যথাযথ ধরিবার বুঝিবার ক্ষমতা দেখিয়াই এখন আমরা ঐ কথায় কিঞ্চিৎ

মাত্র বিশ্বাসী হইতে পারিয়াছি। ঠাকুরের জীবন হইতে ঐ বিষয়ের দুই একটী দৃষ্টান্ত এখানে প্রদান করিলেই পাঠক আমাদের কথা বুঝিতে পারিবেন।

ঠাকুরের ভাগিনেয় হৃদয়ের বাটী কামারপুকুরের অনতিদূর সিহড় গ্রামে ছিল। ঠাকুর যে তথায় মধ্যে মধ্যে গমন করিয়া সময়ে সময়ে কিছু কাল কাটাইয়া অসিতেন, একথা আমরা ইতিপূর্ব্বেই পাঠককে জানাইয়াছি। একবার ঐ স্থানে ঠাকুর রহিয়াছেন এমন সময়ে হৃদয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাজা রামের সহিত গ্রামের এক ব্যক্তির বিষয়কর্ম্ম লইয়া বচসা উপস্থিত হইল। বকাবকি ক্রমে হাতাহাতিতে পরিণত হইল এবং রাজারাম হাতের নিকটেই একটি হুঁকা পাইয়া তদ্দারা ঐ ব্যক্তির মস্তকে আঘাত করিল। আহত ব্যক্তি ফৌজদারী মকদ্দমা রুজু করিল এবং ঠাকুরের সম্মুখেই ঐ ঘটনা হওয়ায় এবং তাঁহাকে সাধু সত্যবাদী বলিয়া পূর্ব্ব হইতে জানা থাকায় সে ব্যক্তি ঠাকুরকেই সাক্ষিস্বরূপে নির্ব্বাচিত করিল। কাজেই সাক্ষ্য দিবার জন্য ঠাকুরকে বন-বিষ্ণুপুরে আসিতে হইল। পূর্ব্ব হইতেই ঠাকুর রাজারামকে ঐরূপে ক্রোধান্ধ হইবার জন্য বিশেষরূপে ভৎর্সনা করিতেছিলেন; এখানে আসিয়া আবার বলিলেন—"ওকে (বাদীকে) টাকা কড়িদিয়ে যেমন করে পারিস্ মকদ্দমা মিটিয়ে নে; নয়ত তোর ভাল হবে না; আমি তো আর মিথ্যা বল্‌তে পার্‌ব না। জিজ্ঞাসা কর্‌লেই যা জানি ও দেখেচি সব কথা বলে দেব।" কাজেই রাজারাম ভয় পাইয়া মাম্‌লা আপোসে মিটাইয়া ফেলিতে লাগিল।

ঠাকুরও সেই অবসরে বন্-বিষ্ণুপুর সহরটি দেখিতে বাহির হইলেন।

এক কালে ঐ স্থান বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল। লাল বাঁধ, কৃষ্ণ বাঁধ প্রভৃতি বড় বড় দীঘি, অসংখ্য দেবমন্দির, গতায়াতের সুবিধার জন্য পরিষ্কার প্রশস্ত বাঁধান পথ সকল, বহুসংখ্যক বিপনি-পূর্ণ বাজার, অসংখ্য ভগ্নমন্দিরস্তূপ এবং বহুসংখ্যক লোকের বাস এবং ব্যবসায়াদি করিতে গমনাগমনেই ঐ কথা স্পষ্ট বুঝা যায়। বিষ্ণুপুরের রাজারা এককালে বেশ প্রতাপশালী ধর্ম্মপরায়ণ এবং বিদ্যানুরাগী ছিলেন। সেজন্য বিষ্ণুপুর এককালে সঙ্গীতবিদ্যার চর্চ্চাতেও প্রসিদ্ধ ছিল। রূপসনাতনাদি শ্রীচৈতন্যদেবের প্রধান সাঙ্গোপাঙ্গগণের তিরোভাবের কিছু কাল পর হইতেই রাজবংশীয়েরা বৈষ্ণব-মতাবলম্বী হন। কলিকাতার বাগবাজার পল্লীতে প্রতিষ্ঠিত ৺ মদনমোহন

বিগ্রহ পূর্ব্বে এখানকার রাজাদেরই ঠাকুর ছিলেন। ৺গোকুলচন্দ্র মিত্র এখানকার রাজাদের এক সময়ে অনেক টাকা ধার দিয়াছিলেন এবং ঠাকুরটি দেখিয়া মোহিত হইয়া ঋণ পরিশোধ কালে টাকা না লইয়া ঠাকুরটিই চাহিয়া লইয়াছিলেন, এইরূপ প্রসিদ্ধি।

৺মদনমোহন ভিন্ন রাজাদের প্রতিষ্ঠিত ৺মৃন্ময়ী নাম্নী এক বহু প্রাচীন দেবীমূর্ত্তিও ছিলেন। লোকে বলিত ৺মৃন্ময়ী দেবী বড় জাগ্রতা। রাজবংশীয়দের ভগ্নদশায় ঐ মূর্ত্তি এক সময়ে এক ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক অপহৃত হয়। রাখিবার স্থান না পাওয়ায় এবং কার্য্য প্রকাশ হইবার ভয়ে ব্রাহ্মণ দেবীর অলঙ্কারাদি আত্মসাৎ করিয়া মূর্ত্তিটি তিন অংশে ভঙ্গ করিয়া এক স্থানে পুঁতিয়া রাখিয়া পলায়ন করে। রাজবংশীয়েরা পূর্ব্ব মূর্ত্তির সন্ধান না পাইয়া অন্য একটি নূতন মূর্ত্তির পুনঃ স্থাপনা করেন।

ঠাকুর এখানকার অপর দেবস্থান সকল দেখিয়া ৺মৃন্ময়ী দেবীকে দর্শন করিতে যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে একস্থানে ভাবাবেশে ৺মৃন্ময়ীর মুখ এবং বক্ষঃস্থল পর্য্যন্ত দেখিতে পাইলেন। মন্দিরে যাইয়া নবপ্রতিষ্ঠিত মূর্ত্তিটি দেখিবার কালে দেখিলেন, ঐ মূর্ত্তিটি তাঁহার ভাবকালে দৃষ্ট মূর্ত্তিটির সদৃশ নহে। ঐরূপ হইবার কারণ কিছুই বুঝিলেন না। পরে অনুসন্ধানে জানা গেল, বাস্তবিকই নূতন মূর্ত্তিটি পুরাতন মূর্ত্তিটির মত হয় নাই। আবার ঠাকুরের যেস্থলে ঐরূপ ভাবাবেশ হইয়াছিল, কিছুকাল পরে বাস্তবিকই ঐ স্থল হইতে পূর্ব্ব মূর্ত্তিটির আবক্ষ এক অংশ খনন করিতে করিতে পাওয়া গিয়াছিল। ঐ ভগ্ন মূর্ত্তিটি এখন লাল বাঁধ দীঘির নিকটেই এক রমণীয় স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যিনি উহা পাইয়াছিলেন, তিনিই ঐ মূর্ত্তিটিকে ঐ স্থানে রাখিয়া নিত্যপূজাদি করিতেছেন।

সমীপাগত ব্যক্তিগণের আগমনের উদ্দেশ্য ও ভাব ধরিবার ক্ষমতা সম্বন্ধে একটি দৃষ্টান্তেরও এখানে উল্লেখ করা ভাল। পূজনীয় স্বামী ব্রহ্মানন্দকে ঠাকুর নিজের পুত্রের মত ভালবাসিতেন, একথার উল্লেখ আমরা পূর্ব্বেই করিয়াছি। একদিন দক্ষিণেশ্বরে তিনি ঠাকুরের সহিত, ঠাকুরের ঘরের পূর্ব্ব দিকের লম্বা বারাণ্ডার উত্তরাংশে দাঁড়াইয়া নানা কথা কহিতেছেন, এমন সময় দেখিতে পাইলেন, বাগানের ফটকের দিক্ হইতে একখানি জুড়ি গাড়ী তাঁহাদের দিকে আসিতেছে। গাড়ীখানি ফিটন্; মধ্যে কয়েকটি বাবু বসিয়া আছেন। দেখিয়াই কলিকাতার জনৈক

প্রসিদ্ধ ধনী ব্যক্তির গাড়ী বলিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন। ঠাকুরকে দর্শন করিতে সে সময় কলিকাতা হইতে অনেকে আসিয়া থাকেন। ইঁহারাও সেজন্যই আসিয়াছেন ভাবিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন না।

ঠাকুরের দৃষ্টি কিন্তু গাড়ীর দিকে পড়িবামাত্র তিনি ভয়ে জড়সড় হইয়া শশব্যস্তে অন্তরালে, আপন ঘরে যাইয়া বসিলেন। তাঁহার ঐ প্রকার ভাব দেখিয়া বিস্মিত হইয়া ব্রহ্মানন্দ স্বামীও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘরে ঢুকিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে দেখিয়াই বলিলেন—"যা—যা, ওরা এখানে আসতে চাহিলে বলিস্, 'এখন দেখা হবে না'।" ঠাকুরের ঐ কথা শুনিয়া তিনি পুনরায় বাহিরে আসিলেন। ইতিমধ্যে আগন্তুকেরাও নিকটে আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এখানে একজন সাধু থাকেন, না?" ব্রহ্মানন্দ স্বামী শুনিয়া ঠাকুরের নাম করিয়া বলিলেন—'হাঁ, তিনি এখানে থাকেন। আপনারা তাঁহার নিকট কি প্রয়োজনে আসিয়াছেন?' তাঁহাদের ভিতর এক ব্যক্তি বলিলেন—'আমাদের এক আত্মীয়ের বিষম পীড়া হইয়াছে, কিছুতেই সারিতেছে না। তাই ইনি (সাধু) যদি কোন ঔষধ দয়া করিয়া দেন, সেজন্য আসিয়াছি।' স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলিলেন—'আপনারা ভুল শুনিয়াছেন। ইনি তো কখন কাহাকেও ঔষধ দেন না। বোধ হয় আপনারা দুর্গানন্দ ব্রহ্মচারীর কথা শুনিয়াছেন। তিনি ঔষধ দিয়া থাকেন বটে। তিনি ঐ পঞ্চবটীতে কুটীরে আছেন। যাইলেই দেখা হইবে।'

আগন্তুকেরা ঐ কথা শুনিয়া চলিয়া গেলে ঠাকুর ব্রহ্মানন্দ স্বামীকে বলিলেন—"ওদের ভিতর কি যে একটা তমোভাব দেখ্‌লুম, দেখেই আর সেদিকে চাইতে পারলুম না, তা কথা কইব কি! ভয়ে পালিয়ে এলুম!"

এইরূপে উচ্চ ভাবভূমিকায় উঠিয়া ঠাকুরকে প্রত্যেক স্থান, বস্তু বা ব্যক্তির অন্তর্গত উচ্চাবচ ভাবপ্রকাশ উপলব্ধি করিতে আমরা নিত্য প্রত্যক্ষ করিতাম। অনুসন্ধানে ঐ সকলের ভিতরে বাস্তবিকই ঠাকুর যেরূপ দেখিতেন, সেইরূপ ভাব যে বিদ্যমান, ইহা বারম্বার দেখিয়াই আমরা তাঁহার কথায় বিশ্বাসী হইয়াছি। সাধারণ ভাবভূমিতে থাকিয়া ঠাকুর তীর্থাদিতে কি অনুভব করিয়াছিলেন, সেই কথাই এইবার আমরা পাঠককে বলিবার উপক্রম করিব।

স্বামি-শিষ্য-সংবাদ।

বেলুড়ে।

শিষ্য আজ প্রাতে মঠে আসিয়াছে। স্বামীজির পাদপদ্ম বন্দনা করিয়া দাঁড়াইবামাত্র স্বামীজি বলিলেন, "কি হবে আর চাকরী করে? না হয় একটা ব্যবসা কর্।" শিষ্য তখন এক স্থানে একটি প্রাইভেট্ মাষ্টারী করে মাত্র। সংসারের ভারও তখন তাহার ঘাড়ে পড়ে নাই। আনন্দে দিন কাটায়। শিক্ষকতা-কার্য্য-সম্বন্ধে শিষ্য জিজ্ঞাসা করায় স্বামীজি বলিলেন, "অনেক দিন মাষ্টারী কর্‌লে বুদ্ধি খারাপ্ হয়ে যায়; জ্ঞানের বিকাশ হয় না। দিন রাত ছেলের দলে থেকে থেকে ক্রমে জড়বৎ হয়ে যায়। আর মাষ্টারী করিস্ নি।"

শিষ্য :—তবে কি কর্‌বো?

স্বামীজি :—কেন? যদি তোর্ সংসারই করতে হয়, যদি অর্থ উপায়ের স্পৃহাই থাকে, তবে, যা—এমেরিকায় চলে যা। আমি ব্যবসায়ের বুদ্ধি দিব। দেখ্‌বি পাঁচ বছরে কত টাকা এনে ফেল্‌তে পারবি।

শিষ্য :—কি ব্যবসায় করবো? টাকা কোথেকে পাবো?

স্বামীজি :—পাগলের মত কি বক্‌ছিস্? ভেতরে অদম্য শক্তি রয়েছে। 'শুধু আমি কিছু নয়' ভেবে ভেবে বীর্য্যহীন হয়ে পড়েছিস্। তুই কেন?—সব জাত্‌টা তাই হয়ে পড়েছে! একবার বেড়িয়ে আয়,—দেখ্‌বি ভারতেতর দেশে লোকের জীবনপ্রবাহ কেমন্ তর্ তর্ করে প্রবল বেগে বয়ে যাচ্ছে। আর, তোরা কি কচ্ছিস্? এত বিদ্যা শিখে পরের দোরে ভিখারীর মত "চাকরী দাও চাকরী দাও" বলে চেঁচাচ্ছিস্। ঝাঁটা জুতো খেয়ে খেয়ে—দাসত্ব করে করে—তোরা কি আর মানুষ আছিস্ রে বাপ? তোদের মূল্য এক কাণাকড়াও নয়। এমন সজলা সফলা দেশে জন্মে যেখানে প্রকৃতি অন্য সকল দেশের চেয়ে কোটিগুণে ধন-ধান্য প্রসব কর্‌ছেন সেখানে দেহ ধারণ করে তোদের পেটে অন্ন নেই—পিঠে কাপড় নাই! যে দেশের ধন-ধান্য পৃথিবীর অপর সকল দেশে civilisation (সভ্যতা) বিস্তার করেছে সেই অন্নপূর্ণার দেশে তোদের এমন দুর্দ্দশা? ঘৃণিত কুকুর অপেক্ষা যে তোদের দুর্দ্দশা হয়েছে। তোরা আবার তোদের বেদ

বেদান্তের বড়াই করিস্! যে জাত সামান্য অন্ন বস্ত্রের সংস্থান করতে পারে না—পরের মুখাপেক্ষী হয়ে জীবন ধারণ করে সে জাতের আবার বড়াই! ধর্ম্ম কর্ম্ম এখন গঙ্গায় ভাসিয়ে আগে জীবনসংগ্রামে অগ্রসর হ। ভারতে কত জিনিস্ জন্মায়। বিদেশী লোক্ সেই raw material (পণ্যদ্রব্য) নিয়ে তার সাহায্যে সোণা ফলাচ্ছে। আর তোরা ভারবহী গর্দ্দভের মত তাদের মাল টেনে মর্‌ছিস্। ভারতে যে সব পণ্য উৎপণ্য হয় দেশ বিদেশের লোক্ তাই নিয়ে তার উপর বুদ্ধি খরচ করে, নানা জিনীস তৈয়ার করে বড় হয়ে গেল; আর তোরা তোদের বুদ্ধিটাকে সিন্দুকে পুরে রেখে ঘরের ধন পরকে বিলিয়ে "হা অন্ন" "হা অন্ন" করে বেড়াচ্ছিস্!

শিষ্য—কি উপায়ে অন্ন সংস্থান হতে পারে, মশায়?

স্বামিজী—উপায় তোদেরই হাতে রয়েছে। চোকে কাপড় বেঁধে বল্‌ছিস্ 'আমি অন্ধ কিছুই দেখতে পাই না!' চোকের বাঁধন ছিঁড়ে ফেল্‌না। দেখবি মধ্যাহ্ন সূর্য্যের কিরণে জগৎ আলো হয়ে রয়েছে। টাকা না জোটে ত জাহাজের খালাসী হয়ে বিদেশে চলে যা। এ দিশি কাপড় গামছা কুলো ঝাঁটা মাথায় করে এমেরিকা ইয়ুরোপে পথে পথে ফিরি করগে। দেখ্‌বি ভারত-জাত জিনিসের এখনো কত কদর্। এমেরিকায় দেখ্‌লুম এই হুগ্‌লি জেলার কতকগুলি মুসলমান ঐরূপে ফিরি ক'রে ক'রে ধনবান্ হয়ে পড়েছে। বলি, তাদের চেয়েও কি তোদের বিদ্যা বুদ্ধি কম? এই দেখনা—এদেশে যে বেনারসী শাড়ী হয় এমন উৎকৃষ্ট কাপড় পৃথিবীর আর কোথাও জন্মায় না। এই কাপড় নিয়ে এমেরিকায় চলে যা না। সে দেশে এর গাউন তৈয়িরি করে বিক্রী করতে লেগে যা, দেখ্‌বি কত টাকা আসে।

শিষ্য—মশায়, তারা বেনারসী সাড়ীর গাউন নেবে কেন? এমন চিত্র বিচিত্র কাপড় ও সভ্যদেশের মেয়েরা পছন্দ কর্‌বে কি?

স্বামিজী—নেবে—কি—না, তা আমি বুঝ'ব এখন। তুই উদ্যম করে চলে যা দেখি। আমার বহু বন্ধু বান্ধব সে দেশে আছে। আমি তোকে তাদের কাছে introduce (পরিচয়) করে দিচ্চি। তাদের ভেতর ঐ গুলি অনুরোধ করে প্রথমটা চালিয়ে দিব। তার পর দেখ্‌বি কত লোক তাদের follow (অনুকরণ) কর্‌বে। তুই তখন মাল দিয়ে- কুলিয়ে উঠতে পার্‌বিনি।

শিষ্য—Capital কোথায় পাব?

স্বামীজি ঃ—আমি যে কোরে হোক্ প্রথম তোকে Start (কার্য্যারম্ভ) করিয়ে দিব। তার পর কিন্তু তোর নিজের উদ্যমের উপর সব নির্ভর করবে। "হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীং"। এই চেষ্টায় যদি ম'রে যাস্ তাও ভাল—তোকে দেখে আরও দশ জন অগ্রসর হবে। আর যদি success (সফল) হয় তো মহাভোগে জীবন কাটবে বুঝ্লি ?

শিষ্য ঃ—আজ্ঞে হাঁ। কিন্তু সাহসে কুলায় না।

স্বামীজি ঃ—তাই ত বল্‌ছি বাবা, তোদের শ্রদ্ধা নাই—আত্মপ্রত্যয়ও নাই। কি হবে তোদের ? না হবে সংসার, না হবে ধর্ম্ম। হয় ঐ প্রকার উদ্যোগ, উদ্যম করে সংসারে successful (গণ্য মান্য, শ্রীমান্) হ—নয় তো সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে আমাদের পথে আয়। দেশ বিদেশের লোককে ধর্ম্ম উপদেশ দিয়ে তাদের উপকার কর্। তবে তো আমাদের মত ভিক্ষা মিল্‌বে। আদান প্রদান না থাক্‌লে কেউ কারোর দিকে চায় না। দেখ্‌ছিস্ তো আমরা দুটো ধর্ম্মকথা শুনাই—তাই গৃহস্থেরা আমাদের দুমুটো অন্ন দিচ্ছে। তোরা কিছুই কর্‌বিনি, তোদের লোকে অন্ন দিবে কেন ?

শিষ্য ঃ—ঠিক কথা মশায়; চাকরীতে, গোলামীতে এত দুঃখ দেখেও আমাদের চেতনা হচ্ছে না!—কাজেই দুঃখও দূর হচ্ছে না। ইহা নিশ্চয়ই দৈবী মায়ার খেলা!

স্বামীজি ঃ—ওদেশে দেখলুম—যারা চাকরী করে, parliamentএ (জাতীয় সমিতিতে) তাদের স্থান পেছনে নির্দ্দিষ্ট আছে। যারা—নিজের উদ্যমে বিদ্যায় বুদ্ধিতে স্বনামধন্য হয়েছে, তাদের বস্‌বার জন্যই front seats (সাম্‌নের আসন গুলি)। ও সব দেশে জাত ফাতের উৎপাত নাই। উদ্যম ও পরিশ্রমে ভাগ্যলক্ষ্মী যাঁদের প্রতি প্রসন্না, তাঁরাই দেশের নেতা ও নিয়ন্তা বলে গণ্য হন। আর তোদের দেশে জাতের বড়াই ক'রে ক'রে—তোদের অন্ন পর্য্যন্ত জুট্‌ছে না। একটা ছুঁচ গড়্‌বার ক্ষমতা নাই—তোরা আবার ইংরেজদের criticise (দোষ গুণ বিচার) কর্ত্তে যাস্—আহাম্মক্! ওদের পায়ে ধরে জীবনসংগ্রামোপযোগী বিদ্যা শিল্পবিজ্ঞান কর্ম্মতৎপরতা শিখ্‌গে। যখন উপযুক্ত হবি, তখন তোদের আবার আদর হবে। ওরাও তখন তোদের কথা রাখ্‌বে। কোথাও কিছু নেই কেবল congrerss করে চেঁচামিচি করলে কি হবে ?

শিষ্য।—তবে কি এদেশে ঐরূপ সভা-সমিতির কোন উপকারিতা নাই? দেশের সমস্ত শিক্ষিত লোকইত এতে যোগ দিচ্ছে।

স্বামীজি।—কয়েকটা পাশ দিলে বা ভাল বক্তৃতা কর্ত্তে পারলেই কি শিক্ষিত হলো? যে বিদ্যার উন্মেষে ইতর সাধারণকে জীবনসংগ্রামে সমর্থ কত্তে পারা যায়, যাতে মানুষের চরিত্রবল পরার্থতৎপরতা সিংহসাহসিকতা এনে দেয়, সেই ত শিক্ষা। যে শিক্ষায় জীবনে নিজের পায়ের উপরে দাঁড়াতে পারা যায়, সেইত শিক্ষা। আজকালকার এই সব ইস্কুল কলেজে পড়ে, তোরা কেমন এক প্রকারের একটা dyspeptic (অজীর্ণরোগাক্রান্ত) জাত তৈয়ির হচ্ছিস্। কেবল machineএর (কলের) মত খাটছিস্; আর "জায়স্ব" ম্রিয়স্ব এই বাক্যের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়েছিস্। এই যে চাষা ভুষা, মুদি মুদ্দ-ফরাস্—আমি জানি এদের কর্ম্মতৎপরতা আত্মনিষ্ঠা তোদের চেয়ে ঢের বেশী। এরা নীরবে চিরকাল কাজ করে যাচ্ছে—দেশের ধন-ধান্য উৎপন্ন করছে—মুখে কথাটী নেই। এরা শীঘ্রই তোদের উপরে উঠে যাবে। capital (পয়সা) তাদের হাতে গিয়ে পড়ছে—তোদের মত তাদের অভাবের জন্য তাড়না নাই। বর্ত্তমান শিক্ষায় তোদের বাহ্যিক হাল চাল্ বদ্‌লে দিচ্ছে; অথচ নূতন নূতন উদ্ভাবনী শক্তির অভাবে তোদের অর্থা-গমের উপায় হচ্ছে না। তোরা এই সব সহিষ্ণু নীচ জাতদের উপর এতদিন অত্যাচার করেছিস্—এখন এরা তার প্রতিশোধ দিবে। আর তোরা "হা চাকুরী যো চাকুরী" করে লোপ পেয়ে যাবি।

শিষ্য।—মশায়, এই সব বেনে, মুদি, মুটে যাহাদের আপনি এত সুখ্যাতি করিতেছেন, তাহাদের ভিতর এখনও তো শিক্ষার বিস্তার হয় নাই। কি করিয়া তাহারা বড় হইবে?

স্বামীজি।—তোদের মত তারা কতকগুলো বই-ই না হয় না পড়েছে। তোদের মত সার্ট কোট পরে সভ্য না হয় না-ই হ'তে শিখেছে। তাতে আর কি এলো গেলো। কিন্তু এরাই হচ্ছে জাতের মেরুদণ্ড। সব দেশে। এই ইতরশ্রেণীর লোক কার্য্য বন্ধ কর্‌লে তোরা অন্নবস্ত্র কোথায় পাবি? একদিন মেথররা কলকাতায় কাজ বন্ধ কর্‌লে হাহুতাশ লেগে যায়—তিন দিন ওরা কাজ বন্ধ করলে মহামারীতে সহর উজোড় হয়ে যায়। শ্রমজীবীরা কার্য্য বন্ধ কর্‌লে তোদের অন্নবস্ত্র জোটেনা। এদের তোরা ছোটলোক ভাবছিস্? আর নিজেদের শিক্ষিত বলে বড়াই কচ্ছিস্।

শিষ্য।—মশায়, জগতের সর্ব্বত্রই ত দেখা যায়, এই ভদ্রেতর জাতিবিভাগ রয়েছে। সর্ব্বদা জীবনসংগ্রামে ব্যস্ত থাকাতে এই নিম্ন শ্রেণীর লোকদিগের জ্ঞানোন্মেষ হয় না। ইহারা একই ভাবে মানববুদ্ধি-নিয়ন্ত্রিত কলের ন্যায় কার্য্যই করিয়া যায়; আর বুদ্ধিমান চতুর লোকেরা ইহাদের পরিশ্রম ও উপার্জ্জনের সারাংশ গ্রহণ করিয়া থাকে।

স্বামীজি।—তাই ত বলি, তোরা এই massর (সাধারণ শ্রেণীর) ভেতর বিদ্যার উন্মেষ যাতে হয়, তাইতে লেগে যা। এদের বুঝিয়ে বলুগে "তোমরা আমাদের ভাই—শরীরের একাঙ্গ—আমরা তোমাদের ভালবাসি—ঘৃণা করি না"। তোদের এই sympathy (সহানুভূতি) পেলে এরা শতগুণ উৎসাহে কার্য্যতৎপর হবে। আধুনিক বিজ্ঞান সহায়ে এদের জ্ঞানোন্মেষ করে দে। ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, সাহিত্য—সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মের গূঢ়তত্ত্ব-গুলি এদের শেখা। ঐ শিক্ষার বিনিময়ে শিক্ষকগণেরও দারিদ্র্য ঘুচে যাবে। আদান প্রদানে উভয়েই উভয়ের বন্ধুস্থানীয় হয়ে দাঁড়াবে।

শিষ্য।—কিন্তু মশায়, ইহাদের ভিতর শিক্ষার বিস্তার হইলে ইহারাও তো আবার কালে আমাদের মত উর্ব্বরমস্তিষ্ক অথচ উদ্যমহীন, অলস হইয়া দাঁড়াইবে?

স্বামীজি।—আমি বলি, জ্ঞানোন্মেষ হলেও কুমোর কুমোরই থাকবে—জেলে জেলেই থাকবে—চাষা চাষই করবে। জাত-ব্যবসা ছাড়বে কেন? "সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয়! সদোষমপিনত্যজেৎ" এই ভাবে শিক্ষা পেলে এরা নিজ নিজ বৃত্তি ছাড়বে কেন? জ্ঞানবলে নিজের সহজাত কর্ম্ম যাতে আরো ভাল করে কত্তে পারে, সেই চেষ্টা করবে। দু দশ জন প্রতিভাশালী লোক কালে তাদের ভেতর থেকে উঠবেই উঠবে। তাদের তোদের শ্রেণীর ভিতর করে নিবি। তেজস্বী বিশ্বামিত্রকে ব্রাহ্মণেরা যে ব্রাহ্মণ ব'লে স্বীকার করে নিয়েছিল, তাতে ক্ষত্রিয় জাতটা ব্রাহ্মণদের কাছে তখন কতদূর কৃতজ্ঞ হয়েছিল বল্ দেখি? ঐরূপ sympathy পেলে মানুষ তো দূরের কথা, পশুপক্ষীও আপনার হয়ে যায়।

শিষ্য।—আপনি যতই কেন বলুন না মশায়, কিন্তু এই ভদ্রেতর শ্রেণীর ভিতর এখনো যেন বহু ব্যবধান রয়েছে বলে বোধ হয়। ভারতবর্ষে ইহাদের সহিত ভদ্রলোকদিগের সহানুভূতি আনয়ন করা বড় কঠিন ব্যাপার বলিয়া মনে হয়।

স্বামীজি।—তা না হলে কিন্তু তোদের কল্যাণ নাই। তোরা চিরকাল যা করে আস্‌ছিস্—ঘরাঘরি লাঠালাঠি করে, সব ধ্বংস হয়ে যাবি। এই mass (ভদ্রেতর সাধারণ) যখন জেগে উঠ্‌বে—আর তাদের উপর তোদের (ভদ্রলোকদের) অত্যাচার বুঝ্‌তে পার্‌বে—তখন তাদের ফুৎকারে তোরা কোথায় উড়ে যাবি! তারাই তোদের ভিতর civilizatin (সভ্যতা) এনে দিয়েছে; আবার তারাই সব ভেঙ্গে দিবে। ভেবে দেখ—গল্ জাতের হাতে অমন যে প্রাচীন রোমক সভ্যতা কোথায় ধ্বংস হয়ে গেল! এই জন্য বলি, এই সব নীচজাতদের ভিতর বিদ্যাদান, জ্ঞানদান করে এদের ঘুম ভাঙ্গাতে যত্নশীল হ। এরা যখন জাগ্‌বে—একদিন নিশ্চয়ই জাগ্‌বে—তখন তারাও তোদের কৃতোপকার বিস্মৃত হবে না। তোদের নিকট কৃতজ্ঞ হয়ে থাক্‌বে।

এইরূপ কথোপকথনের পর স্বামীজি শিষ্যকে বলিলেন—"ও সব কথা এখন থাক্—তুই এখন কি স্থির কর্‌লি তা বল্। যা হয় একটা কর্। হয়, কোন ব্যবসায়ের চেষ্টা দেখ্; নয়তো আমাদের মত "আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায়" যথার্থ সন্ন্যাসের পথে চলে আয়। এই শেষ পন্থাই অবশ্য শ্রেষ্ঠ পন্থা। কি হবে ছাই সংসারী হয়ে? বুঝেত দেখেছিস্ সবই ক্ষণিক্—"নলিনীদলগতজলবত্তরলং তদ্বজ্জীবনমতিশয়চপলং"। অতএব যদি এই আত্মপ্রত্যয় লাভ কর্‌তে উৎসাহ হয়ে থাকে ত আর কালবিলম্ব করিস্ না। এখুনি অগ্রসর হ। "যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ"। পরার্থে নিজ জীবন বলি দিয়ে লোকের দোরে দোরে গিয়ে অভয়বাণী শুনা "উত্তিষ্ঠত—জাগ্রত—প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।"

———

আচার্য্য শঙ্কর ও চৈতন্যদেবের মত তুলনা।

শ্রীরাজেন্দ্র নাথ ঘোষ।

অদ্বৈতবাদিগণ শক্তি ও শক্তিমানের অভেদত্ব সমর্থন করিবার জন্য আরও প্রবল যুক্তি প্রদর্শন করেন। তাঁহারা বলেন,—"সর্ব্বকারণকারণ" সেই এক মূল কারণে, কারণাবস্থায় শক্তি ও শক্তি মানের ভিন্নাভিন্ন সম্বন্ধ স্বীকারের উপায় নাই। পূর্ব্বোক্ত ঘট ও মাটীর দৃষ্টান্তে "আমরা" "ঘট" এবং "মাটী" এই তিনটী বস্তু থাকে। ঘট—কার্য্য, মাটী—কারণ, আমরা সেই দুইটী বস্তু ছাড়া তৃতীয় বস্তু। কিন্তু প্রস্তাবিত যুক্তিতে সমগ্র জগৎ ও আমরা—কার্য্য, এবং সেই অদ্বয়তত্ত্ব—মূল কারণ। যদি সেই মূল কারণ হইতে আমাদের সকলের জন্ম হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমরা সকলে যখন তাহাতে বিলীন হইব, তখন সেই কারণ-বস্তুতে শক্তিস্বীকারের জন্য থাকিবে কে? ঘট মাটীর দৃষ্টান্তে, মাটী হইতে ঘট হয়, এই সংস্কার আসিয়া মাটীর কারণাবস্থায় ঘটজননী শক্তি স্বীকারে অলক্ষিত ভাবে আমাদের হৃদয়ে একটা প্রবৃত্তি আসে। কিন্তু এস্থলে সে আশঙ্কা নাই। জগতাদি আমরা সকলে, সেই মূল কারণে লীন হইলে, সেই কারণবস্তুতে শক্তি স্বীকার, কর্ত্তাভাবে অসম্ভব হয়। তখন—"কারণ বলিলে কার্য্য বুঝায়, সুতরাং কার্য্যদ্বারা কারণে কেন শক্তি স্বীকার করা হইবে না" এরূপ কথা বলিবারও কেহ থাকে না। যদি বলা যায়, আমরা সেই মূল কারণে লীন হইলেও তাহার সহিত আমাদের পার্থক্য থাকে। তাহাও বলিবার উপায় নাই। কারণ, কোন বস্তু দেখিবার কালে "আমরা দেখি" এ জ্ঞান সর্ব্বপ্রথমে হয় না, উহা দেখা ক্রিয়ার পর হয়। সর্ব্বপ্রথমে যাহা দেখি, তাহা প্রথমে আমরা হই; তাহার পর তাহাকে আমাদিগ হইতে পৃথক্ করিয়া দেখি; সুতরাং দেখ, জ্ঞানের প্রথম মুহূর্ত্তে ভেদ নাই, তখন সবই একাকার। এখন কৌশলবলে যদি এ অবস্থাটী রক্ষা করিতে পারা যায়, তাহা হইলে ভেদজ্ঞানের সম্ভাবনাই রহিল না। বস্তুতঃ এ কৌশলও জ্ঞানী সাধকগণের অবিদিত নাই। তাহার পর একথা দৃষ্টান্তের দ্বারাও বুঝা যায়। দেখ সুষুপ্তি বা মূর্চ্ছাকালে আমাদের কোন পার্থক্য-জ্ঞান থাকে না। তখন আমরা থাকি, কিন্তু কি ভাবে থাকি তাহা বুঝিবার উপায় নাই।

যদি বলা যায় যে, সুষুপ্তি বা মূর্চ্ছাকালে আমাদের নিজত্বজ্ঞান না থাকিলে জাগ্রতকালে সেই পূর্ব্বের "আমি" বলিয়া স্মরণ হয় কোথা হইতে? তাহা হইলে বলিব যে, যাহা স্মরণ হয়, তাহা পূর্ব্বের জাগ্রতের "আমি" বলিয়া স্মরণ হয়, সুষুপ্তিতে সেই আমি ছিলাম এ অনুভূতি স্মরণ হয় না। সুষুপ্ত থাকাটা অনুমান করিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। যদি বল, সুষুপ্তিতে কি তবে আমি ছিলাম না? আমরা বলিব যে, না তাহাও নহে, আমরা ছিলাম। কিন্তু অব্যক্ত, অবস্থায় অর্থাৎ সত্তামাত্রাবস্থায় ছিলাম। মনে কর, বরফের ঘটী, জল শুদ্ধ জলে ডুবাইয়া রাখিলে, বরফ যদি গলিয়া যায়, তাহা হইলে যেমনটী হয়, এস্থলেও তদ্রূপ হয়। জলের ভিতর জল-শুদ্ধ বরফের ঘটী গলিয়া যাওয়া সুষুপ্তি, এবং আবার সেই ঘটী হওয়া জাগ্রতাদি ব্যক্তাবস্থা। বরফের ঘটী গলিয়া গিয়া যদি আবার সেইরূপ একটী ঘটী হয়, তাহা হইলে যেমন সেই জলই আবার আসে, জাগ্রতেও তদ্রূপ সেই "আমি" আবার আসে। সুষুপ্তিতে "আমি" এমনভাবে স্বকারণে মিশে যাই যে, সে সময় কোন পার্থক্য থাকে না। সত্তা-সামান্যে প্রত্যভিজ্ঞা হয় মাত্র। এ সময় জ্ঞান ও সত্তা এক পদার্থ।

তাহার পর আর এক কথা—সুষুপ্তিকালে যদি আমাদের এই অভিব্যক্ত 'আমি'র স্থিতি স্বীকার কর, তাহা হইলে বীজভূত সংস্কারগুলিও আমাদের তখন অনুভবগোচর হইত। ঐ সংস্কারগুলিই ত আমাদের নিজত্বের হেতু, উহারা আমাদের সেই চরম অব্যক্ত দেহে ত থাকিতে বাধ্য। কিন্তু আমরা তাহা অনুভব করি না, সুতরাং বলিতে হইবে; এই অনুভবকর্ত্তা আমি তথায় থাকিয়াও ছিলাম না। আর বাস্তবিক এমন মূর্চ্ছাও ত আছে, যাহা হইতে আর উত্থিতও হইতে হয় না; অথবা সে মূর্চ্ছা হইতে উত্থিত হইয়া সে মূর্চ্ছার সংস্কারমাত্রও থাকে না। সে ব্যক্তি যে মূর্চ্ছিত ছিল, তাহাও তাহার মনে হয় না। সুতরাং তখনও কোনরূপ বোদ্ধা ও বুদ্ধির পার্থক্য থাকে, তাহা বলিবার উপায় নাই। কোনরূপ পার্থক্য স্বীকার না করিতে পারিলে ভেদাভেদ সম্বন্ধেও স্বীকার করা অসম্ভব। এজন্য শক্তিমানের কার্য্যাবস্থায় শক্তির সহিত শক্তিমানের ভেদাভেদ-সম্বন্ধ এবং কারণাবস্থায় অভেদ বা তাদাত্ম্য-সম্বন্ধ স্বীকার করিতে সকলকেই বাধ্য হইতে হইবে।

যদি বলা যায় যে, মনঃসংযোগকালে যেমন অন্য বস্তু প্রতীতি হয় না, অথচ বিষয়বিষয়িভাব থাকে, সুষুপ্তিতেও কেন তাহাই হউক না; তাহা

বলিতে পারা যায় না। কারণ, মনঃসংযোগ যে বিষয়ে করা হয়, সে বিষয় আমার অজ্ঞাত থাকে না, অন্য বিষয় অজ্ঞাত থাকে। আবার যদি বল যে, সুষুপ্তিতে অজ্ঞানই বিষয় হয়,—অজ্ঞানে মনঃসংযোগ হয়, তাহাও ঠিক নহে। কারণ, জাগ্রতকালে অজ্ঞানে মনঃসংযোগ-চেষ্টা করিয়া যেরূপটী হয়, সুষুপ্তিতে সেরূপ হয় না; সকলেই জানেন, সে সময় তাহা হইতে পৃথক্ ব্যাপার ঘটে। আর অজ্ঞানে মনঃসংযোগ মানেই বা কি? অন্য বস্তুতে মনঃসংযোগই তদ্ভিন্ন বিষয়ে অজ্ঞান নাম গ্রহণ করে। কেবল অজ্ঞানকে বিষয় করা অসম্ভব। সুতরাং অজ্ঞানের বিষয়তা নাই। যদি বল, তবে সুষুপ্তির অজ্ঞান, কোন্ বিষয়ের মনঃসংযোগের ফল? তাহা হইলে বলিব, উহা আত্মবিষয়ে মনঃসংযোগের ফল। যদি বল, আত্মা বিষয় হইলেও ত বিষয়বিষয়িভাব সিদ্ধ হইল, তাহা হইলে বলিব যে, উহাই নির্ব্বিষয়। নিজের দ্বারা নিজের পরিচ্ছেদ অসম্ভব। ইহা জগতে দেখা যায় না, এজন্যই নির্ব্বিষয় নামে অভিহিত হয়। আর যদি ইহাকে নির্ব্বিষয় বলিতে আপত্তি হয়, তাহা হইলে অনির্ব্বচনীয় বল, আমাদের কোন আপত্তি নাই। যদি বল, তবে তুরীয় ও সুষুপ্তিতে ভেদ কি? তাহা হইলে বলি, শঙ্করের বিবেক-চূড়ামণির সেই কথাটী স্মরণ কর। যথা :—

"মোহেন বিস্মৃতে দৃশ্যে সুষুপ্তিরনুভূয়তে।
বোধেন বিস্মৃতে দৃশ্যে তুরীয়মনুভূয়তে॥"

মোহ দ্বারা দৃশ্য বিস্মরণ সুষুপ্তি, আর বোধের দ্বারা দৃশ্য বিস্মরণ তুরীয়।

এখন যদি বল যে—যেহেতু শক্তিমানের কার্য্যাবস্থায় শক্তি ও শক্তিমানের ভেদাভেদ সম্বন্ধ বিদ্যমান, সে-হেতু তাহা কারণাবস্থাতেও সূক্ষ্মরূপে থাকিতে বাধ্য। কার্য্যে যাহা থাকে, তাহা কারণে থাকিতে বাধ্য। কারণে যাহা থাকে না, তাহা যদি কার্য্যে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে জল হইতে ঘৃত উৎপন্ন হউক না কেন? কিন্তু তাহা কখন হয় না, তখন কার্য্যভাবের ধর্ম্মাধর্ম্ম যাহা কিছু সকলই সূক্ষ্মভাবে কারণেও থাকিতে বাধ্য। আমরা স্থূলদর্শী ও বহির্ম্মুখ, তাই সুষুপ্তি প্রভৃতি কালে তাহা অনুভব করিতে পারি না। অদ্বৈতবাদী এ কথাতেও আপত্তি করেন। তাঁহারা বলেন, কার্য্যের ভেদাভেদ-সম্বন্ধ বা বৈচিত্র্য ভাব প্রভৃতি দেখিয়া, তাহা যেমন কারণ-পদার্থে অনুমান করা হইবে, তদ্রূপ কার্য্য মধ্যে যে অভেদ-সম্বন্ধ বা নির্ব্বিশেষ অথবা অবৈচিত্র্য ভাব প্রভৃতি দেখা যায়, তদ্দ্বারা কারণেও সেগুলি স্বীকার করিতে

হইবে। ঐ দেখ, সুষুপ্তি ও মূর্চ্ছা-মধ্যে অবৈচিত্র্য ও নির্ব্বিশেষ-ভাব বিদ্যমান। ঐ দেখ, পূর্ব্বে যে মুড়া গাছটাকে ভূত মনে করিতাম, আর তাহাকে ভূত মনে করি না, ঐ দেখ, বাল্যের কত ভুল ধারণা একেবারে মন হইতে অপসৃত হইয়াছে, আর এখনও যাহারা পূর্ব্বের ভুল বলিয়া আমাদের মনে এক এক বার জাগিয়া উঠে, কালে তাহারাও একেবারে অজ্ঞাত অপরিচিত হইয়া যাইতেছে। এ ভাবগুলিও ত তাহা হইলে মূল কারণে বা তাহার আশ্রয়ে স্বীকার করিতে হইবে। আর যদি তাই স্বীকার করা যায় তাহা হইলেত পূর্ব্বোক্ত ভেদাভেদ ভাবটী সিদ্ধ হইতে পারে না। শক্তির একভাবে যদি শক্তি অজ্ঞাত অপরিচিত হইতে পারে, তাহা হইলে এক সময় তাহা সর্ব্বতোভাবে কেন তদ্রূপ হইব না? ভুল ভাঙ্গা ও ভুলবিস্মৃতির মত সমস্তটাই যদি হইয়া যায়? আর এরূপ হওয়াওত অসম্ভব নহে? কার্য্যভাবের মধ্যেই যখন নির্ব্বিশেষ ভাব রহিয়াছে এবং নির্ব্বিশেষ ভাবই যখন সবিশেষ ভাবের পূর্ব্ব বা শেষ ভাব তখন এইরূপ হওয়াইত সম্ভব। পূর্ব্বোক্ত মূর্চ্ছা ও সুষুপ্তিই ত ইহার দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। যদি বল মূর্চ্ছাদিও ত আবার ভাঙ্গে, কিন্তু তাহার উত্তরেও বলিতে পারা যায় যে, এমন মূর্চ্ছাও আছে যাহা আর ভাঙ্গে না। সুতরাং এই ভুল ভাঙ্গা, ভুল বিস্মৃতি, মূর্চ্ছাও সুষুপ্তি প্রভৃতি স্বীকার করিলে তাহা আমাদিগকে অদ্বয় বা অনির্ব্বচনীয় পক্ষেই আনিয়া ফেলে। অন্য কথায় কার্য্যকালে ভেদাভেদ এবং কারণ কালে অভেদ পক্ষেই স্বীকার করিতে বাধ্য করিবে।

যদি বল, সেই অব্যক্ত অদ্বয়তত্ত্বে উক্ত দুটী অবস্থাই থাকুক না, বৈচিত্র্য-অবৈচিত্র্য, সংসার-অসংসার, নির্ব্বিশেষ-সবিশেষ দুই কেন থাকুক না; তাহা হইলে বলিব, উক্ত দুই অবস্থা এক বিষয়ে এককালে থাকা অসম্ভব। জগতেও যেমন উহা নাই, তদ্রূপ তাহার কারণেও থাকিবে না। পরস্পর-বিরোধি-ভাব বুদ্ধির অগোচর।

আর মূল কারণের সম্বন্ধে ওরূপ ব্যক্তাব্যক্ত দুই অবস্থার কল্পনা করা চলে না। কারণ, যে অবস্থাতেই দুই থাকিবে, তাহা মূল-কারণ-পদবাচ্য হইতে পারে না। মূল কারণে একত্ব এবং সকলই অব্যক্ত হয়, এইরূপ জ্ঞান করিতে স্বাভাবিক একটা প্রবৃত্তি হয়। বিচারবলে যদি এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তি হয়, তাহা হইলে তাহা অগ্রাহ্য করিবার হেতু কি? আর

যদি এইরূপই মূল কারণ কল্পনা করা হয় যে, তাহাতে ব্যক্তাব্যক্ত দুই আছে, তাহা হইলে বলিব, একই জিনীষের একই কালে এরূপ দুই অবস্থা অসম্ভব, কারণ ইহারা পরস্পর-বিরোধী। আর যদি এরূপ বলা হয় যে, ব্যক্ত মানে স্থূল-ব্যক্ত, আর অব্যক্ত মানে সূক্ষ্ম-ব্যক্ত; যেমন জাগ্রত ও স্বপ্ন, তাহা হইলে বলিব যে, আমরা সূক্ষ্মব্যক্তেরও কারণ অনুসন্ধান করিতেছি এবং তাহাই আমাদের প্রয়োজন, তাহাই আমাদের ব্রহ্ম, তাহাই যথার্থ অব্যক্ত-পদবাচ্য পদার্থ। আর যেহেতু তাহা আমাদের যুক্তিতে সম্ভব, সেইহেতুই তোমার মূল কারণ অপেক্ষা আমাদের মূল কারণ আরও সূক্ষ্ম। যদি বল, এরূপ সম্পূর্ণ অব্যক্ত প্রকৃত পদার্থ নহে, ইহা কল্পনা কেবল, কারণ কেহ ইহা কখন দেখে নাই, ইহা চির অজ্ঞেয় বিষয়, ইহা বুদ্ধির বিষয় হওয়া অসম্ভব। ব্যক্ত বলিলেই যেমন অব্যক্ত বুঝায়, তদ্রূপ অব্যক্ত বলিলেই ব্যক্ত বুঝায়; আর বুঝায় বলিয়া ইহার বিষয়ও আছে। তাহা হইলে বলিব, যেমন তোমরা কার্য্য বলিলে কারণ বুঝ, কারণ বলিলে কার্য্য স্মরণ কর, হাঁ বলিলে না মনে কর, তদ্রূপ ব্যক্তাব্যক্ত বলিলেই এতদুভয় ভিন্ন অবস্থাও কেন বুঝিবে না? ইহাত সকলের বুদ্ধিতেই আরূঢ় হয়। যেমন তুমি যমক কল্পনা করিবে, অমনি তদ্ভিন্ন অবস্থা মনে উদয় হইবে। সুতরাং ইহা বুদ্ধির আরূঢ়যোগ্য বিষয় নহে -বলিতে পার না। এখনও যদি তুমি ইহার উপর আবার উক্তরূপে উভয়-ভিন্নকে উহাদের সহিত সম্বন্ধ কর, তাহা হইলে অনবস্থা দোষ ঘটিবে। অনবস্থাদোষ তুমিও পছন্দ কর না। সুতরাং কার্য্যাবস্থার বৈচিত্র্য দেখিয়া কারণে তাহা স্বীকার করা অসম্ভব।

এস্থলে প্রতিপক্ষ আবার আপত্তি উত্থাপন করেন যে, সেই অদ্বয়তত্ত্বে শক্তি বা ধর্ম্ম অথবা একটা "বিশেষ" স্বীকার না করিলে কি করিয়া আমরা তাহাকে নির্ব্বিশেষ প্রভৃতি শব্দদ্বারা নির্দ্দেশ করিতে পারি। যাহার দ্বারাই নির্দ্দেশ করিবে, যেরূপেই গুরু শিষ্যকে শিক্ষা দিবে, একজন অপরকে বুঝাইবে, তাহাতেই ত লক্ষণ প্রয়োজন হইবে, এবং সেই লক্ষণই ত তাহা হইলে তাহার ধর্ম্ম, শক্তি বা বিশেষ মধ্যে গণ্য হইতে বাধ্য। যাহাকেই জ্ঞানগোচর করা হয়, তাহারই ত জ্ঞানগোচরত্ব-ধর্ম্ম স্বীকার করিতে হইবে? অদ্বয়তত্ত্ব যদি তোমার জ্ঞানগোচর না হইবে, উহা যদি না জানিতে পার, তাহা হইলে কি তুমি তজ্জন্য প্রযত্ন কর? এই যুক্তিটী নানাকারে কত প্রাচীনকাল হইতে যে চলিয়া আসিতেছে, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। কিন্তু অদ্বৈতবাদিগণ

সমানভাবে ইহার বিরুদ্ধে যুক্তি প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা বলেন, নির্ব্বিশেষ-পদার্থকে নির্ব্বিশেষ বলা হয় বলিয়াই, তাহার নির্ব্বিশেষত্ব-রূপ সবিশেষত্ব প্রমাণ হয় না। মাটীতে ঘটজননী শক্তি স্বীকার করিয়া কোন্ সবিশেষবাদী মৃৎপিণ্ড দ্বারা জল আনয়ন করিতে যা'ন? মরীচিকাতে জলভ্রান্তি দূর হইলে, তৃষ্ণানিবৃত্তির জন্য তথায় যাইতে আর কাহারও প্রবৃত্তি হয় না। হীরকখণ্ডকে কাচ বলিলে তাহার হীরকত্ব বিদূরিত হয় না। যিনি নির্ব্বিশেষকে সবিশেষ বলেন, কৈ তিনি সুষুপ্তি বা মূর্চ্ছাবস্থায় থাকিয়া একটু তর্ক করুন না, আমাদের কথার উত্তর প্রদান করুন না। মিথ্যাজ্ঞান সত্যজ্ঞানের বাধা উৎপাদন করিতে পারে না। অন্ধকার কখন আলোককে বিতাড়িত করিতে পারে না, ইহাও তদ্রূপ নির্ব্বিশেষ বলিলে বিশেষ-রহিতই বুঝায়, বিশেষরহিতত্বরূপ সবিশেষ ভাব বুঝায় না। যেমন সতী স্ত্রী অসতীত্বের আস্বাদ গ্রহণ করিয়া সতীত্বরত্ন রক্ষা করিতে পারে না, এস্থলেও তদ্রূপ বিশেষরাহিত্যরূপ সবিশেষ ভাব বুদ্ধিতে যেমন উৎপন্ন হইবে, অমনি আবার নির্ব্বিশেষ বুদ্ধি তাহাকে বাধা দিবে। নির্ব্বিশেষ মানেই যাহা বর্ত্তমান, অতীত, অনাগত সকল কালেরই কল্পিত, অকল্পিত, কল্পনাযোগ্য সকল অবস্থারই বিশেষকে নিষেধ করিয়া থাকে। নির্ব্বিশেষ শব্দের মধ্যে বিশেষ শব্দ এবং সবিশেষ শব্দের মধ্যে বিশেষ শব্দ যদি একার্থক হয়, তাহা হইলে নির্ উপসর্গ দ্বারা যে বিশেষকে নিষেধ করা হইল, সেই বিশেষকে আবার গ্রহণ করা যায় কিরূপে? ইহা বদতোব্যাঘাত দোষ ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? আর যদি বল, নির্ব্বিশেষ বলিলে জ্ঞানগোচরত্ব সিদ্ধ হয় না, কিন্তু তাহা অন্য কথা। কারণ, জ্ঞানগোচরত্ব ও সবিশেষভাব এক পদার্থ নহে। ইহাদের পরস্পর সম্বন্ধ আছে সত্য, কিন্তু তথাপি এক পদার্থ নহে। তাহার পর অদ্বৈতবাদিগণের মতে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকে লোকে জ্ঞানগোচর করিতে পারে না, লোকে ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্ব জানিয়া ব্রহ্মই হইয়া যাইবে। এই কথাই তাঁহাদের উপদেশ—ইহাই তাঁহাদের আশয়। অদ্বৈতবাদী নির্ব্বিশেষ বোধ, বুদ্ধি বা জ্ঞানকেই ব্রহ্ম বলেন, ব্রহ্মকে নির্ব্বিশেষ বলিয়া ব্রহ্মের উহা ধর্ম্ম বলিয়া ধরা দিতে চাহেন না। নির্ব্বিশেষ বুদ্ধিকে কোন আধার কল্পনা করিয়া সেই আধারের সহিত সম্বন্ধ করিলে তবে উহা সবিশেষত্বের সাধক হয়, নচেৎ নহে। নির্ব্বিশেষ শব্দ দ্বারা যদি শ্রোতার মধ্যে তাঁহারা বিশেষরাহিত্য-বুদ্ধি উৎপাদন করিতে পারেন, তাহা হইলেই তাঁহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল।

সুতরাং সকল দিক্ দিয়াই প্রমাণ হইতেছে যে, শক্তিমানের কারণাবস্থায় শক্তি ও শক্তিমান্ এক অভিন্ন পদার্থ।

অনেকেই বলেন, "চিনি হতে ভাল বাসি না চিনি খেতে ভালবাসি" কিন্তু যে চিনি নিজে নিজের আস্বাদ পাইয়া থাকে, সে চিনি হইতে কি পৃথক্ থাকিয়া কেহ সে চিনি খাইতে চায়? সকলেই বোধ হয় এই চিনি হইয়া এই চিনি খাইতে চান; যাঁহারা একথা বলেন, তাঁহারা ভাবেন না যে, এ চিনি নিজেই নিজের আস্বাদে ভরপুর। ইহা চৈতন্যময় চিনি।

এস্থলে কেহ কেহ বলেন, এই জগদাদি সকলই বীজাকারে তাহার ভিতরে ছিল। তাহা হইলে বলিব যে, বীজাকারে কোন কিছুর ভিতরে থাকা ও কেবল বীজাকারে থাকা কোন্ কথাটী এস্থলে তোমাদের অভিপ্রেত? যদি কোন কিছুর মধ্যে থাকা অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে বলিব, সে বস্তু ও বীজ ভিন্ন পদার্থ,আর যদি কেবল বীজাকারে থাকা এই পক্ষই অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে বীজের অঙ্কুর-উৎপাদিকা শক্তি নষ্ট করার মত মোক্ষ সাধন করিলেই নির্ব্বিশেষ অদ্বৈত সিদ্ধ হইবে। বীজ বৃক্ষ হইলেই সবিশেষ, নচেৎ নির্ব্বিশেষ। বীজাকারে ছিল, একথা বৃক্ষাবস্থার কথা, বীজের বীজাবস্থার কথা নহে।

এখন যদি শক্তি ও শক্তিমানের সম্বন্ধ নির্দ্ধারিত হইল, যদি জানা গেল, কার্য্যাবস্থায় শক্তি ও শক্তিমানের সম্বন্ধ ভেদাভেদ, এবং কারণাবস্থায় অভেদ, তাহা হইলে, সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, জীব কার্য্যাবস্থায় অর্থাৎ বর্ত্তমান দেহাদি-সম্পন্ন অবস্থায় ভগবানের সহিত ভিন্ন ও অভিন্ন দুইই, এবং কারণাবস্থায় ভগবানের সহিত অভিন্ন হইয়া থাকে। গৌড়ীয় শাস্ত্রসিদ্ধান্তানুসারে যাহা নিরূপিত হইয়াছিল যে, জীব পরিশেষে ভগবানে শক্তিমানে শক্তির ন্যায় সম্বন্ধযুক্ত হইয়া থাকে, তাহার অর্থ সুতরাং মিশিয়া যাওয়াই স্থির হইল। আচার্য্য রামানুজ কারণাবস্থায় জীবকে শক্তিমান ভগবানের শক্তিস্বরূপ স্বীকার করিয়াও তাহাদের ভেদ-সম্বন্ধ স্বীকার করেন, কিন্তু গৌড়ীয় সম্প্রদায় রামানুজের কথার দ্বারাই রামানুজমতকে স্বমতের অন্তর্ভুক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

সুতরাং বিচার-দৃষ্টিতে যাহা জানা গেল—তাহা শাস্ত্র দৃষ্টি অবিরোধী হইল।

* সর্ব্বসম্বাদিনী দ্রষ্টব্য।

এখন যদি আমরা আচার্য্য-শঙ্কর-সম্প্রদায় ও গোস্বামিপাদগণের নিজ নিজ কথা তুলনা করি, তাহা হইলে দেখিতে পাই—আচার্য্য শঙ্কর শক্তিমানের কারণাবস্থায় শক্তি ও শক্তিমানে অভেদ-সম্বন্ধ এবং কার্য্যাবস্থায় ভিন্নাভিন্ন সম্বন্ধ স্বীকার করেন এবং গোস্বামিপাদগণ শক্তিমানের কার্য্য ও কারণ উভয় অবস্থায়ই ভিন্ন ভিন্ন সম্বন্ধ স্বীকার করেন; এবং কারণাবস্থায় ভিন্নাভিন্ন সম্বন্ধ স্বীকার করায় যে দোষ উপস্থিত হয়, সেই দোষক্ষালনের জন্য তাঁহারা তাঁহাদের অভীষ্ট ভেদাভেদ-বাদের মূলে এক অচিন্ত্য শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। বাস্তবিক ইহা না করিলে বড়ই গোলযোগ উপস্থিত হইত; কারণ, অদ্বয় বস্তুতে ভেদাভেদ-সম্বন্ধই অসম্ভব কথা; ইহা প্রকৃত পক্ষে অভেদ বা অনির্ব্বচনীয় তত্ত্ব। ভেদাভেদ মানে কি? মনে কর, সর্ব্বপ্রথমে একজন একটা গরু দেখিল, এসময় গরু বলিতে সে ব্যক্তি কেবল সেই গরুর দেহটাকেই বুঝে। তাহার পর কিছুদিন বাদে সে ব্যক্তি আর একটা গরু দেখিল। এসময় সে কি করিল? সে এটাকেও গরু বলিয়া যখন বুঝিল, তখনই সে সেই প্রথম গরুর দেহ ও গোত্ব এই দুইটিকে আলাদা করিয়া বুঝিতে সক্ষম হইল। এ সময় তাহার যে গরুর জ্ঞান, তাহাতে গোত্বধর্ম্ম ও গরু এই দুইটা জিনাস একও বটে আলাদাও বটে। ভেদাভেদ বলিতে এই প্রকার সম্বন্ধ বুঝাইয়া থাকে। এখন দেখ, এই যে ভেদাভেদ—সম্বন্ধ-এটা আসলে জিনিসটা কি? যে মুহূর্ত্তে তুমি গোত্ব স্মরণ কর, সে মুহূর্ত্তে তুমি কিছু গোদেহটা ভাব না, এবং যে সময় তুমি গোদেহটা ভাব, ঠিক সে সময় গোত্ব স্মরণ কর না। তুমি ভিন্ন মুহূর্ত্তে দুইটীর মূল অন্য-এক-বস্তুনিষ্ঠ বলিয়া দেখ, সেজন্য বল যে, মূল বস্তুতে ভেদ অভেদ দুই বর্ত্তমান। আর এ কার্য্যটা তুমি প্রত্যক্ষ কর না, তুমি অনুমান কর মাত্র এবং এ অনুমান প্রত্যক্ষ-বিরোধী। তাহার পর তুমি যে ভেদাভেদ বল, তাহাতে ভেদকেই তুমি অভেদ বা অভেদকেই ভেদ বল না। তুমি উহা তৃতীয় বস্তু সম্বন্ধে বলিয়া থাক। কিন্তু যখন কেহ একই কালে ভেদ ও অভেদ দুইটী ধারণা করিতে পারে না, তখন উহাকে ভেদাভেদ বলা বৃথা। যাহা একই কালে বলা যাইতে পারে, তাহাই বলিলে সত্য কথা বলা হইবে। ভিন্নকালের কথা যদি বলিতে হয় ত ভিন্নকালের নাম করিয়াই বলা উচিত। যদি বল, একই কালে ভেদ ও অভেদকে তোমরা কি বলিতে চাহ? আমরা বলি, উহা অদ্বয় বা অনির্ব্বচনীয়। কারণ, বুদ্ধি একই কালে দুই বিরুদ্ধ ভাব ধারণা করিতে পারে না।

যদি বল, না উহাদিগকে একই কালে বুদ্ধি ধারণ করিয়া থাকে, কেননা বুদ্ধির সকলস্থলে কার্য্যই এই; যখন কোন কিছুর আমরা জ্ঞান লাভ করিয়া থাকি, তখন তাহাতেই "তাহা" ও "তাহা ভিন্ন" পদার্থের জ্ঞান জড়িত থাকে। একখানা পুস্তকের জ্ঞানে টেবিলের সহিত উহার পার্থক্য ও অন্য পুস্তকের সহিত উহার ঐক্য জ্ঞান না হইলে উহাকে আমরা পুস্তক বলিতে পারি না; সুতরাং সকল পদার্থের জ্ঞানেই "তাহা" ও "তাহা ভিন্ন" জ্ঞান বিজড়িত। ইহা যতক্ষণ না হইবে, ততক্ষণ আমাদের কোন জ্ঞানই হইল না, বলিতে হইবে। সুতরাং সকল জ্ঞানেই এই ব্যাপারটা চলিবে। আজকাল. পাশ্চাত্য পণ্ডিত কুলভূষণ মহামতি হেগেল মতাবলম্বি-গণ প্রায়ই এই প্রকার যুক্তির অবতারণা করিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা বলি—না, ওকথা বলিতে পারা যায় না। তুমি পুস্তক জ্ঞানে যে ঐক্যানৈক্য পর্য্যালোচনা কর, তাহা তোমার পুস্তকাকৃতি কোন একটা কিছুর জ্ঞানকে হৃদয়ে ধরিয়া রাখিয়া তবে তুমি তাহা কর। উহা যদি "কোন একটা কিছু" রূপে তোমার হৃদয়ে না থাকে, তাহা হইলে তুমি কাহার সহিত ঐক্যানৈক্য সম্বন্ধ আবিষ্কার করিতে প্রবৃত্ত হও? সুতরাং প্রথম মুহূর্ত্তে "কোন একটা কিছু" বলিয়া একটা জ্ঞান স্বীকার্য্য, এবং পর মুহূর্ত্তে পর্য্যালোচনাজন্য তোমার অভিপ্রেত জ্ঞান জন্মিয়া থাকে, বলিতে হয়। যদি বল, উক্ত "একটা কিছু" জ্ঞান "একটা কিছু নয়" জ্ঞানের সহিত তুলনা করিয়া সিদ্ধ হয়, সুতরাং একটা কিছু জ্ঞানেও তুলনা করা হইয়া গিয়াছে, এবং তজ্জন্য জ্ঞানমাত্রেই তুলনাসিদ্ধ। তাহাও বলিতে পার না, কারণ, আমরা "একটা কিছু" জ্ঞানের স্থলে প্রকৃত পক্ষে ওরূপ করি না। আমরা অন্য বিষয় হইতে চিত্তটাকে ফিরাইয়া কেবল মাত্র নূতন দৃশ্যের আকারে তাহাকে আকারিত করি মাত্র। আমরা অভাবের ধারণা করিতে পারি না, আমাদের অভাবজ্ঞানও ভাবজ্ঞানেরই প্রকারান্তর। আমরা সর্ব্ববিষয়শূন্য হইলে নিজেকেই বিষয় করিয়া কেবল নিজেকেই ভাবরূপে ভাবিয়া থাকি, কস্মিনকালেও অভাবকে বিষয় করি না। অভাবজ্ঞান কল্পিত বা অনুমিতব্যাপার ও লক্ষণামাত্র। অভাবস্বরূপ ভাবরূপী আমাদের চির অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। যদি বল, প্রথম মুহূর্ত্তের জ্ঞানে অজ্ঞানের সহিত তুলনা-ব্যাপার বুঝাইয়া দেয়; কারণ, যখনই "জানিলাম" বলি, তখনই উহা "না জানার" সহিত সম্বন্ধ করিল, সুতরাং জ্ঞানমাত্রেই অজ্ঞানসম্বন্ধী। আমরা

বলি,—না, তাহাও বলিতে পার না। কারণ, অজ্ঞান কখন জ্ঞানের বিষয় হয় না। ইহা কল্পিত বা অনুমেয় মাত্র; জ্ঞান, অজ্ঞান-বিরোধী পদার্থ। ইহা চিরকালই পলাইয়া পলাইয়া বেড়াইয়া থাকে। আলোকের দুরে দুরে যেমন অন্ধকার থাকে, ইহাও তদ্রূপ। অন্ধকারের স্থানে যেমন আলোক আনিবে, অমনি অন্ধকার পলাইবে। যাহার নিকট আলোক থাকে, তাহার নিকট অন্ধকার থাকে না। তাহার নিকট আলোক থাকিতে থাকিতে, কেহ তাহাকে অন্ধকার দেখাইতে পারিবে না। আমরা যে অজ্ঞানকে বিষয় করি, তাহা একটা বিষয়-জ্ঞান-কালে অন্য বিষয় সম্বন্ধে; কিন্তু যেমন সেই "অপরের" কথা মনে আসিল, আর তাহার অজ্ঞানতা ঘুচিয়া গেল। যাহা এখনও মনে আসে নাই, তাহাই অজ্ঞান; কিন্তু একথাও অসম্ভব। কারণ, যেমন আমরা ঐ কথা বলি, অমনি "যাহা" রূপে তাহা আমাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়। এই "যাহা" রূপ এসময় আর কিছু নহে, ইহা আকাশ বা অন্ধকারের আকারে আমাদের সমক্ষে আসিয়া থাকে। যদি বল, প্রথম মুহূর্ত্তের জ্ঞানমধ্যে তুলনার যোগ্যতা থাকে, নচেৎ তুমি তাহাকে লইয়া তুলনা কর কি করিয়া, এবং তুমি সেই যোগ্যতাবশতঃ তুলনা না করিয়াও স্থির থাকিবে না, সুতরাং ঐ জ্ঞানে তুলনা ব্যাপার, বীজভাবে নিহত রহিয়াছে। তাহা হইলে বলিব, বীজভাবে নিহিত থাকা ও তুলনা করিয়া জ্ঞান হওয়া এক কথা নহে। যাহা বীজভাবে থাকে, তদ্দ্বারা কার্য্য হয় না। মৃৎপিণ্ডদ্বারা জলানয়ন হয় না, ঘটদ্বারাই হয়। বট বীজে পথিককে ছায়া দান করে না। এখানে মৃৎপিণ্ড ও বটবীজ বীজাবস্থা, ঘট ও বটবৃক্ষ তুলনাজন্য জ্ঞানের অবস্থা। দেখ, এমন ত কত জ্ঞান হয়, যাহা তুলনার অভাবে ক্রমে বিলীন হইয়া যায়। স্বপ্নদৃষ্ট অনেক মনোভাব, অনুরূপ বিষয়াভাবে আমরা প্রায় ত নিত্যই ভুলিয়া যাই; এবং এখনও এমন কত জ্ঞান হইতেছে, যাহার তুলনার এখনও সমাধা হয় নাই। সুতরাং যোগ্যতা ও আবশ্যকতা-জন্য সকল জ্ঞানকেই তুলনাসিদ্ধ, অথবা ভেদাভেদ-সম্বন্ধাত্মক বলা ঠিক নহে। যদি বল, বিষয়জ্ঞানে বিষয়ীর সহিত তুলনা বুঝায়। কারণ, "আমি ভিন্ন" বোধ না হইলে, বিষয়জ্ঞান সম্ভব নহে, অগত্যা এস্থলে আমার প্রথম মুহূর্ত্তের জ্ঞানও তুলনাজন্য জ্ঞান বলিতে হইবে। আমরা বলিব যে—না, তাহাও নহে। কারণ, আমিই বিষয়াকার ধারণ করিয়া পরে, তাহাকে যখন আমা হইতে পৃথক্ করি, তখন সেই বিষয়টী

আমার নিকট বিষয় বলিয়া প্রতীত হয়, তৎপূর্ব্বে নহে। প্রথম ক্ষণে আমিই বিষয় হই, সুতরাং প্রথম ক্ষণের জ্ঞানে তুলনা নাই। যদি বল, তাহা হইলে আমি আমাকে বোধ করিবার কালে আমাতেও বিষয়বিষয়ীভাব স্বীকার্য্য। আমরা বলি, তাহাতে তুলনা বা ভেদাভেদ-ভাব নাই; কারণ, নিজে নিজের পরিচ্ছেদক হইতে পারে না, এজন্য বুদ্ধির স্বভাবের দোহাই দিয়া, জ্ঞান-মাত্রেরই ভেদাভেদ-সম্বন্ধ সিদ্ধ হয় না। আর ভেদাভেদ-সম্বন্ধ এককক্ষণ বা একবিষয়ক নহে। পরক্ষণেও যে, ভেদাভেদের মূলে উহা স্বীকার করা হয়, তাহাও ভেদ ও অভেদকে নহে, তাহা তাহার আশ্রয়কে লক্ষ্য করিয়া করা হয়। ঐ আশ্রয় তখন অদ্বৈতভাবে স্বগত-ভেদরহিত এবং বিরোধশূন্য-রূপে প্রতিভাত হয়। মন কখন এক কালে দুইটী বিষয় চিন্তা করিতে পারে না। বহু বিষয়কে দেখিলেও এক করিয়াই দেখে। মনের এই প্রকৃতিই জাতিজ্ঞানের জনক বা হেতু আর এই জাতিজ্ঞান আবার ব্যক্তি-জ্ঞানের উপকরণ।

তাহার পর আর এক কথা। ভেদাভেদ-সম্বন্ধ মানেই দ্বৈতবাদ। দুইটী বিষয় না হইলে সম্বন্ধই সিদ্ধ হয় না; এবং দুইটী বিষয় হইতে গেলেই ব্যব-ধান ভিন্ন তাহা হইতে পারে না। আর সেই ব্যবধানই বিজাতীয় বস্তু হইতে বাধ্য। যদি বল, সমুদায় জ্ঞানপদার্থ-দ্বারা-গড়া বিষয় মধ্যে বিজাতীয় ভেদ কি করিয়া সম্ভব? তাহা হইলে বলিব, তুমি জ্ঞানের বহুত্ব স্বীকার কর কি দিয়া? বহুত্ব না হইলে সম্বন্ধই অসম্ভব। যাহা বহুত্বসাধক, তাহাই জ্ঞানভিন্ন হইতে বাধ্য। "দেশ" "কাল" উভয়ই মান, বা কেবল কালকেই মান, একটাকে জ্ঞানভিন্ন না মানিলে পার্থক্য করিবে কি করিয়া? যদি বল "কাল", চিন্তা বা জ্ঞানের স্বভাব, সুতরাং তাহাকে ছাড়িলে চলিবে কেন, এবং তাহা জ্ঞানের স্বভাব বলিয়া পৃথক্ নহে। তাহা হইলে বলিব যে, এমন চিন্তা আছে যে সময় কালবোধ থাকে না,—যেমন মূর্চ্ছা। আর কালের কালত্ব, পরিণাম লইয়া। যদি সকলই "জ্ঞান" হয়, তাহা হইলে জ্ঞানের পরিণাম "জ্ঞান" বলিয়া কালের সত্তাই উপলব্ধ হইবার কথা নহে। ওদিকে পরিণামে যদি বৈসাদৃশ্য না থাকে, তাহা হইলে তাহা পরিণামও নহে। তোমার জ্ঞান, জ্ঞানেই পরিণত হওয়ায় বৈসাদৃশ্য স্বীকার করাও চলিবে না। তাহার পর আরও এক কথা আছে। কালজন্য বহুত্ব এক বস্তুরই অবস্থাগত বহুত্ব, সংখ্যাগত নহে। সংখ্যাগত বহুত্ব দেশ ভিন্ন অসম্ভব। সুতরাং তোমার জ্ঞানের

বহুত্ব অসম্ভব। যদি বল, দেশ ও কাল এই উভয়ই চিন্তার প্রক্রিয়া। ইহারা ত বিষয় নহে যে জ্ঞানকে পরিচ্ছিন্ন করিবে। তাহাও বলিতে পার না; কারণ, চিন্তা-ক্রিয়ার ভিতর দেশকালের সহিত জ্ঞানের বা চিন্তার পূর্ব্বাপর্য্য সম্বন্ধ নির্ণয় অসম্ভব। আমরাও প্রত্যক্ষ দেখি যে, বিষয় অনুসারে আমরা যেমন চিন্তা করিতে পারি, তদ্রূপ চিন্তা অনুসারে বিষয় লাভও করিতে পারি। পা নাচান স্বভাব হইলে, প্রথম পা নাচান ক্রিয়া যেমন ঐ স্বভাবের কারণ, এবং প্রথম নাচাবার প্রবৃত্তি যেমন প্রথম নাচানর কারণ, তদ্রূপ আমি যদি বলি "দেশকাল," "জ্ঞান" সহ নিত্য, তাহা হইলে উপায় কি? যাহা বিষয়ীর ধর্ম্ম বলিবে, তাহাতে তদ্দণ্ডেই বিষয়েরই ধর্ম্ম হইবে। কারণ, বিষয়-বিষয়ী সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য। সুতরাং দেখ, ভেদাভেদ স্বীকার করিলেই দ্বৈতবাদ আসিতে বাধ্য। যদি বল, তাহা হইলে আমার অদ্বৈতবাদই বা সিদ্ধ হয় কি করিয়া? তাহা হইলে বলিব যে, আমরা "জ্ঞান" স্বরূপে, সর্ব্ব-সম্বন্ধ-রাহিত্য স্বীকার করি, সুতরাং আমাদের এ বিপত্তি ঘটিতে পারে না। যদি বল, তাহা হইলে আমরা কি দেশকালকে বিষয়িনিষ্ঠ স্বীকার করি না, তাহা হইলে বলিব যে, হাঁ তাহা করি; কিন্তু সেই বিষয়কে "জ্ঞান-স্বরূপ" বলিয়া স্বীকার করি না। জ্ঞান স্বরূপ বিষয়-বিষয়ী উভয় গ্রাহী পদার্থ। বিষয়ীনিষ্ঠ বলাতেই বিষয়নিষ্ঠতাও স্বীকার করিতে সকলকেই বাধ্য হইতে হইবে। সুতরাং "দেশকালের" বিষয়ত্ব অনিবার্য্য। আমাদের বোধ হয়, এই প্রকার অগণ্য বিপত্তি বিনাশের জন্য মহামতি জীবগোস্বামী ভেদাভেদের মূলে এক অচিন্ত্য শব্দ বসাইয়া দিয়াছেন। শ্রীজীবগোস্বামী মহাশয় তাঁহার সর্ব্বসম্বাদিনী নামক শেষ গ্রন্থে এই অচিন্ত্যভেদাভেদ-বাদের যে অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আমাদের এই কথাই সমর্থন করিয়া থাকে। তিনি বলেন, "তস্মাদ্ স্বরূপাদভিন্নত্বেন চিন্তয়িতুমশক্যত্বাৎ ভেদ এবং স্বরূপাদ্ ভিন্নত্বেন চিন্তয়িতুমশক্যত্বাৎ অভেদঃ, তৌ চ ভেদাভেদৌ অচিন্ত্যৌইতি।" অর্থাৎ স্বরূপ হইতে ভিন্ন করিয়া চিন্তা করা যায় না বলিয়া অভেদ এবং স্বরূপ সহ অভিন্ন ভাবা যায় না বলিয়া ভেদ, তাহা অবার অচিন্ত্য। শঙ্করের অনির্ব্বচনীয়-বাদ বা অদ্বয়-বাদ এবং গোস্বামী প্রভুপাদগণের অচিন্ত্যভেদা-ভেদ-বাদের মধ্যে বিশেষত্ব কি, তাহা পাঠকই বিবেচনা করুন। অন্যত্র শ্রীজীব-গোস্বামী মহাশয় আবার যাহা বলিয়াছেন, তাহাও দেখা যাউক। "তস্মাৎ একত্বেব তত্বস্য স্বরূপত্বং, স্বরূপত্বাপরিত্যাগেনৈব শক্তিত্বঞ্চ সিদ্ধম্"। অর্থাৎ

একতত্ত্বেরই স্বরূপত্ব, এবং স্বরূপত্ব পরিত্যাগ না করিয়া তাহার শক্তিত্ব এই উভয়ই সিদ্ধ হইল। পাঠক ভাবিয়া দেখুন, এই উভয় স্থলেই কেন ওরূপ সিদ্ধান্ত স্বীকার করা হইতেছে? ইহার কারণ কি এই নহে যে, আমরা তাঁহাকে ভাবিব বা চিন্তা করিব? ভাবিতে পারি না বলিয়াই যখন এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করা প্রয়োজন হইতেছে, তখন ভাবিবার জন্যই উহা স্বীকৃত হইয়াছে বলা কি অসঙ্গত? আচ্ছা, আর ভাবুন দেখি ভাবে কে? যে ভাবে, সে কি কার্য্যাবস্থায় থাকিয়াই ভাবে না? সমাধি, মূর্চ্ছা বা প্রলয়ে কি ভাবনা সম্ভব? সুতরাং গোস্বামী প্রভুপাদের ঐ শক্তি স্বীকারে পুনরায় সেই শক্তিমানের কার্য্যাবস্থার কথাই আসিয়া পড়িল। একথা কারণাবস্থার কথাই নহে—কারণাবস্থার দৃষ্টিতেও নহে। সুতরাং শাঙ্করমত ও গোস্বামী প্রভুপাদগণের মতের বিরোধে, মনে হয়, বিষয়ের ভিন্নতা আসিয়া পড়িল এবং তজ্জন্য এ বিরোধ যথার্থ বিরোধই হইতে পারে না। আমরা যদি এই কথাটীর প্রতি লক্ষ্য রাখিতে পারি, তাহা হইলে গোস্বামি-সম্প্রদায়-ভক্তগণের অগণ্য-তীক্ষ্ণযুক্তি-শররাশি সহাস্যে সহ্য করিতে পারিব।

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় শ্রীজীবের অচিন্ত্য ভেদাভেদ পক্ষেও অসন্তুষ্ট হইয়া কারণাবস্থার শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ পক্ষই স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু অভেদ পক্ষ স্বীকার করিলে জীবের নিত্য সেবাধিকার বিলুপ্ত হয়, এজন্য তিনি বিশেষ নামক এক পদার্থ স্বীকার করিয়া তাহার দ্বারা তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন। তিনি 'বিশেষ' সম্বন্ধে বলেন, "বিশেষ ভেদপ্রতিনিধিঃ ন তু ভেদঃ * * * অভেদেঽপি ভেদপ্রত্যায়কো ধর্ম্মবিশেষঃ—বিশেষঃ। যথা সত্তা সতী, কালঃ সর্ব্বদা অস্তি, ভেদো ভিন্নঃ ইত্যাদি"। অর্থাৎ অভেদেও ভেদ-প্রত্যায়ক ধর্ম্মই বিশেষ। যেমন সত্তা আছে, কাল সদাই আছে, ভেদ ভিন্ন ইত্যাদি। কাল বলিলেই তাহা সদা আছে বুঝায়, সদা আছে বলিলেও কাল বুঝায়; এবং কাল পদার্থটীও বস্তুতঃ অভেদ পদার্থ, তাহার আবার ভেদ কোথায়? কিন্তু তথাপি যখন ব্যবহার নিমিত্ত সেই কালের ভেদকল্পনা করিয়া তাহাকে "সর্ব্বদা আছে" এইরূপ বিশেষণে বিশেষিত করিয়া থাকি, তখন সেই মূল অভেদতত্ত্বেও ভেদ স্বীকার করিয়া শাস্ত্র ও যুক্তির ভিতরে বিরোধ পরিহার করিলে ভালই হইবার কথা। অভেদতত্ত্বেও এই ভেদকল্পনা যখন আমাদের না করিলে নয়, তখন "সর্ব্বকারণকারণে" তাহার স্বীকার

করাই ত স্বাভাবিক। সুতরাং জীব অন্তিমে এই ভাবেই ভগবানের সহিত এক হইয়াও তাঁহার সেবা দ্বারা কৃতকৃতার্থ হইয়া থাকে।

এখানেও পাঠক দেখুন, সেই এক কথাই বিভিন্নরূপে আসিয়া উপস্থিত হইল। "কাল সদা আছে" একথা কার্য্যাবস্থার কথা; একথা ব্যবহার-দশার কথা। একথার দ্বারা কারণাবস্থায় "বিশেষ" পদার্থ স্বীকার করায় প্রকৃত প্রস্তাবে কার্য্যাবস্থার কথাই বলা হইতেছে। কারণাবস্থায় কার্য্যাবস্থার কোন সংস্কার আনিলে তাহা কার্য্যাবস্থারই কথা হইয়া পড়িবে। আচার্য্য শঙ্কর ব্যবহারিক দশায় অর্থাৎ যতক্ষণ জীবের দেহাদি ব্যবহার থাকে ততক্ষণ একথা সত্য বলিয়াই স্বীকার করেন। নির্ব্বিকল্প-সমাধি-দশায় বা পারমার্থিক দৃষ্টিতে, কে—কি দিয়া স্বীকার করিবে বলিয়া স্বীকারের উপকরণাভাবে তিনি তাহা অস্বীকার করেন। এক্ষণে কি শাস্ত্র, কি বিচার উভয় দৃষ্টিতে উভয় মতের সম্বন্ধে যাহা ভাবিতে ইচ্ছা হয়, তাহা সুধী পাঠকবর্গের নিকট নিবেদন করিলাম, এক্ষণে বিজ্ঞ পাঠকবর্গ সিদ্ধান্ত করুন।

পূর্ব্বোক্ত পথ ছাড়িয়া যদি শঙ্করের বিবর্ত্তবাদ এবং গোস্বামিপাদগণের পরিণামবাদের প্রতি দৃষ্টি করা যায়, তাহা হইলে এ বিষয়ের আর একটা দিক্ আমাদের দৃষ্টিগোচর হইবে। শঙ্করের বিবর্ত্তবাদের উদ্দেশ্য যে, মূল কারণ ব্রহ্ম অবিকৃত থাকিয়াও জগৎ উৎপন্ন হয়; মহাপ্রভুর পরিণামবাদেরও উদ্দেশ্য তাহাই। তিনিও বলেন, ব্রহ্ম হইতে জগৎ উৎপন্ন হয় কিন্তু ব্রহ্ম অবিকৃত থাকে। তবে পার্থক্য এই যে, বিবর্ত্তবাদ স্বীকার করায় উৎপন্ন জগতাদি রজ্জুতে সর্প-সম মিথ্যা হইয়া যায়, পরিণামবাদে দুগ্ধের দধির ন্যায় জগৎ সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়। এই বৈলক্ষণ্য স্বীকারের তাৎপর্য্য এই যে, শঙ্করমতে ব্রহ্মই সত্য জগৎ মিথ্যা, জীব ব্রহ্মই অপর কিছু নহে। কিন্তু গোস্বামিপাদ বলেন যে, জগতাদি যদি মিথ্যা হয়, তবে মুক্তি কাহার, পূজা কাহার, উপদেশ কাহার এবং কেই বা তাহা পালন করে, কেই বা বলে—ব্রহ্মই মূল কারণ, অথচ নির্ব্বিকার? এ সব যখন না মানিলে চলে না, তখন বিবর্ত্তবাদে দোষ রহিয়াছে। বস্তুতঃ বিবর্ত্তবাদের এ দোষ অনিবার্য্য না হউক—দুর্নিবার্য্য বটে। আবার পরিণামবাদ স্বীকার করায়, জগতাদি সত্য হইল, এবং বিবর্ত্তবাদের ঐ দোষ মোচন হইল, কিন্তু অন্য দোষ আসিয়া উপস্থিত হইল। কে ধারণা করিতে পারে যে, একটা পদার্থ হইতে একটা পদার্থ জন্মিল, কিন্তু মূল পদার্থ কমিয়া গেল না, বা বিকৃত হইল না।

এখন এই দোষ নিবারণ মানসে প্রভুপাদগণমতে বলা হইল যে, চিন্তামণি হইতে সুবর্ণের উৎপত্তি হয়, কিন্তু চিন্তামণি যেমন তেমনিই থাকে, অথচ সুবর্ণও সত্য। যথা,—

"মণি যৈছে অবিকৃত প্রসবে হেমভার।
জগদ্রূপ হয় ঈশ্বর তবু অবিকার।"

মধ্য ৮ম, চরিতামৃত।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এ চিন্তামণি কেহ দেখে নাই, দেখিতেও পায় না; এ চিন্তামণির কথা কেবল শুনাই যায়। শাস্ত্রে ইহার কথা আছে, সত্য। কিন্তু তথাপি ইহা যে অপ্রসিদ্ধ, তাহাও নিশ্চিত। প্রসিদ্ধ বিষয়েই দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়, অপ্রসিদ্ধ বিষয়ে দৃষ্টান্ত দেওয়া অসঙ্গত। শাস্ত্রে আছে বলিয়াও ইহাকে প্রসিদ্ধ বলা চলে না, কারণ, এক ভাগবত গ্রন্থ ব্যতীত ইহার কথা অন্য কোন শাস্ত্র বা বেদবেদান্তে, অথবা ইতিহাস মধ্যে তাদৃশ দৃষ্টিগোচর হয় না।

তাহার পর, এ চিন্তামণির দৃষ্টান্তে আরও গোল আছে। কোন কোন বৈষ্ণব পণ্ডিত বলেন যে, ইহা নিজ উদর হইতে হেমভার প্রসব করে না, পরন্তু লৌহসংসর্গে লৌহকে সুবর্ণ করিয়া দেয়। কিন্তু শেষ অর্থ গ্রহণ করিলে মূলে অদ্বৈততত্ত্বের হানি হয়। কারণ, উৎপত্তির পূর্ব্বে কারণরূপে তাহা হইলে লৌহ ও চিন্তামণি দুইটী পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয় তাহার পর, দ্বিতীয় দোষ এই যে, কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় এস্থলে যে "প্রসব" শব্দটী ব্যবহার করিয়াছেন, লৌহকে সুবর্ণ করিলে সে শব্দটীর সার্থকতাও থাকে না। এজন্য মনে হয়, ভাগবতের কথানুসারে ইহাকে হেমভারের প্রসূতি বলাই ঠিক। কারণ ভাগবতের মণিহরণ-প্রকরণে লৌহসংসর্গের কোন কথাই নাই। কিন্তু তাহা হইলে সেই পূর্ব্ব কথাই কেবল মনে আসে যে, যাহা হইতে কোন কিছু উৎপন্ন হয়, তাহা পরে কমিয়া যাইতে বাধ্য।

যাহা হউক, দৃষ্টান্তের দোষ ছাড়িয়া দিয়া, যদি দৃষ্টান্তের উদ্দেশ্য ধরা যায়, তাহা হইলে বিষয়টী অপেক্ষাকৃত সহজ হইবে। উপায়ের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি করিলে উভয় মতের প্রকৃত সম্বন্ধ নির্দ্ধারণ হইবে। গোস্বামিপাদগণের উদ্দেশ্য নহে যে, জগৎ সত্য হউক; শঙ্করসম্প্রদায়েরও উদ্দেশ্য নহে যে, জগৎ মিথ্যা হউক। গোস্বামিপাদগণ জগতের সত্যতা প্রমাণের জন্য যে আগ্রহ করিয়াছেন,তাহা ভগবৎসেবার সত্যতার জন্য। শঙ্কর-

সম্প্রদায় জগৎ মিথ্যা প্রমাণ করিতে যে আগ্রহ করিয়াছেন, তাহা ব্রহ্ম সত্য প্রমাণের জন্য। এজন্য উভয়েরই ঐ উভয় বিচারই প্রাসঙ্গিক বিচার মাত্র।

সুতরাং উভয়ের অভীষ্টবাদ বিশ্লেষণ করিলেও দেখা যায়, পূর্ব্বে যাহা বুঝা গিয়াছে, এস্থলেও তাহার বিরোধ নাই। যদি ভাবা যায়—শঙ্কর শিবাবতার, এবং মহাপ্রভু রাধাকৃষ্ণের যুগল প্রকাশ, তাহা হইলে উভয়েই ভ্রমপ্রমাদ-শূন্য। উভয়ের প্রবর্ত্তিত মার্গ পৃথক্ হইলেও গন্তব্য স্থান একই। বলিতে কি, কি এখানে, কি বৃন্দাবনে, আমি এমন কতিপয় বৈষ্ণবকুলভূষণ সুপণ্ডিত ভক্ত সাধক দেখিয়াছি, যাঁহাদের হৃদয়ের বিশ্বাস যে, জীব পরিণামে সেই শ্রীরাধাঠাকুরাণীর পদবী পর্য্যন্ত লাভ করিয়া থাকেন। তাঁহারা কেবল সাধকের বুদ্ধিভেদভয়ে এ কথা জনসমাজে প্রকাশ করেন না এই মাত্র।

সুতরাং এই দুই মতের চরম ফলে পার্থক্য কোথায়, তাহা বিজ্ঞ পাঠক-বর্গই মীমাংসা করুন। শঙ্করমতের মিশিয়া যাওয়া মানে যদি একেবারে সর্ব্বতোভাবে "তাই" হইয়া যাওয়া হয়, এবং গৌড়ীয় সিদ্ধান্তের মতে বস্তুর শক্তির মধ্যে, শক্তির যে বস্তুর প্রতি ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক তদ্গত ভাব, জীব যদি ভগবানের সম্বন্ধে সেই ভাব প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে, উভয় মতের ঐক্য কি অনৈক্য, এস্থলে তাহা বলাই বাহুল্য।

এইবার উভয় মতের তৃতীয় বিরোধটী আলোচ্য। ইহা, গৌড়ীয় বৈষ্ণব-মতে উপনিষদের ব্রহ্মের অভ্যন্তরে চিন্ময় আনন্দঘন মূর্ত্তি থাকা সম্ভব, কি না? ইহার উত্তরের জন্য পাঠকবর্গকে আর প্রসঙ্গান্তরে আনয়ন করিব না। ইহার উত্তর দুই এক কথাতেই দিব। শঙ্করের অদ্বয় ব্রহ্মের উপর যদি আর কিছু ধারণা করা সম্ভব না হয়, এবং উপনিষদের ব্রহ্ম যদি এরূপ ব্রহ্ম হন, যাঁহার অভ্যন্তরে ভেদাভেদ-সম্বন্ধ ধারণা করা সম্ভব হয়, তাহা হইলে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-মতের ব্রহ্ম ও শঙ্করমতের ব্রহ্ম এক পদার্থ নহে। আর এক পদার্থ নহে বলিয়া উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ নাই। দুই জন যদি ভিন্ন বিষয়ের সম্বন্ধে ভিন্নমতাবলম্বী হন, তাহা হইলে তাঁহাদের বিরোধ কখন বিরোধ-পদবাচ্য হইতে পারে না। এজন্য আমাদের বোধ হয় উভয় সম্প্রদায়ই আসলে অভিন্নমতাবলম্বী।

মণ্ডন-পরাজয়।

[শ্রীমতী—]

(২)

বিন্ধ্যাচলের পার্ব্বত্যপ্রদেশে অমরক রাজার রাজধানী। তাঁহার রাজ্যটী অতি ক্ষুদ্র ; কতিপয় পার্ব্বত্যভূমি মাত্র তাঁহার অধিকার ভুক্ত। শৌর্য্য বীর্য্যে তাঁহার বিশেষ খ্যাতি ছিল না। বিলাসবর্জ্জিত ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য রাজ্য বলিয়া এস্থানে বিপক্ষরাজগণের লোলুপ দৃষ্টি কখন পতিত হয় নাই। এনিমিত্ত এস্থানের অধিবাসিগণ একরূপ নির্ব্বিবাদে দিনযাপন করিত। এদেশবাসীরা প্রায়ই কৃষ্ণবর্ণ। মহারাজ অপুত্রক। তদ্দেশের প্রথানুসারে তাঁহার একাধিক পত্নী ছিল।

অদ্য মহারাজ মৃগয়ায় গমন করিবেন। 'রাজদর্শন দেবদর্শনতুল্য' এই শাস্ত্রবাক্যানুসারে নগরের আবালবৃদ্ধবনিতা রাজদর্শনাশায় গৃহছাদে, প্রাচীরে, বহির্দ্বারে দণ্ডায়মান। যাহার নিতান্ত স্থানাভাব, সে বৃক্ষোপরি উপবিষ্ট। রাজপথ পথিক ও নাগরিকগণে লোকারণ্য।

যথাসময়ে অমরকরাজ সৈন্যপরিবৃত হইয়া রাজপথে বহির্গত হইলেন। প্রথমেই কতকগুলি অশ্বারোহী তরবারি ও শরাসনে সজ্জিত হইয়া পতাকা-শোভিত বর্শা হস্তে দেখা দিল তৎপরেই পদাতিক সৈন্যগণ আশাসোঁটা লইয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। পদাতিক সৈন্যগণের শ্রেণী শেষ হইতে না হইতে অশ্বপৃষ্ঠে রাজামাত্য ও বয়স্যদিগের অপূর্ব্ব শোভা দর্শকের চিত্ত আকর্ষণ করিল। সকলেই বলাবলি করিতে লাগিল, এইবার মহারাজকে দেখিতে পাইব। বলিতে বলিতে দেখা গেল, মহারাজ অমরক একটী সুবৃহৎ হস্তি-পৃষ্ঠে আসীন। তাঁহার বাম হস্তে শরাসন, পৃষ্ঠে শরপূর্ণ তূণ, দক্ষিণ হস্তে বর্শা, কটীবন্ধে তরবারি।

তাঁহাকে দেখিয়া সমবেত প্রজামণ্ডলী আনন্দে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল এবং অবনত শিরে প্রণাম করিতে লাগিল। মহারাজের পশ্চাতে সুসজ্জিত শিবিকা। তন্মধ্যে একখানি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ শিবিকায় সখীসহ রাজমহিষী-দ্বয় অবস্থিত। শিবিকার পার্শ্বে ও পশ্চাতে কতিপয় বিশ্বস্ত অনুচর তরবারি হস্তে শিবিকা-রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত। ইহাদের পশ্চাতে পুনরায় রাজবৈদ্য অশ্বপৃষ্ঠে ধীরে ধীরে গমন করিতেছেন। মন্ত্রীর পশ্চাতে পুনরায় কতিপয়

অশ্বারোহী সৈন্য এবং নানা আহার্য্যদ্রব্যাদিপূর্ণ কয়েকখানি শকট, পদাতিক সৈন্য ও রাজভৃত্যবর্গ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া চলিয়াছে।

ক্রমে মহারাজের মৃগয়া-বাহিনী নগর অতিক্রম করিয়া নগরবাসীর দৃষ্টি-বহির্ভূত হইল। মহারাজ আজ সুক্ষণে কি কুক্ষণে মৃগয়া-যাত্রা করিলেন, তাহা সেই সর্ব্বদর্শীই জানিতেন।

তাঁহারা কয়েকটা পার্ব্বত্যগ্রাম ও বহু কৃষিক্ষেত্রাদি অতিক্রম করিয়া অপরাহ্নের প্রাক্কালে নিবিড়-অরণ্য-মধ্যস্থ সমতল ভূমিতে উপস্থিত হইলেন। মহারাজ তথায় শিবির সংস্থাপন করিতে অনুচরদিগকে আদেশ দিলেন।

এই স্থানের দৃশ্য অতি মনোহর। চতুর্দ্দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বতমালা-বেষ্টিত এক খণ্ড সমতল ক্ষেত্র, ঠিক যেন নানাবর্ণের পত্রপুষ্পাদিতে চিত্রিত একখানি সবুজ রংয়ের গালিচার দ্বারা আবৃত। একদিকে একটি ক্ষুদ্র নদী যেন ক্ষেত্রটীর নানা ঋতুর নানা আবর্জ্জনা ধৌত করিবার জন্য নিঃশব্দে প্রবাহিত। কোথাও বা পর্ব্বতগাত্র ভেদ করিয়া দুই একটী ক্ষীণকায় প্রস্রবণ যেন অরণ্যবাসীর পিপাসা মাত্র দূর করিবার জন্য নদীতে আসিয়া চুপি চুপি মিলিতেছে। পর্ব্বতোপরি হরীতকী, আমলকী, শাল, তাল, তমাল প্রভৃতি বৃক্ষশ্রেণী প্রায়ই ক্ষুদ্রবল্ললতাসমূহে বেষ্টিত হইয়া ব্যাধ ও ব্যাঘ্রকুল হইতে মৃগশিশু ও ময়ূরশাবকদিগকে রক্ষার জন্য দুর্গমভাব ধারণ করিয়া রহিয়াছে। পার্ব্বত্য পুষ্পপাদপগণ মধ্যাহ্নে দিনমণির পূজা করিয়া এক্ষণে যেন তাঁহার প্রসাদ বিতরণছলে দিব্য সৌরভভার লইয়া কাননবাসীকে বিতরণ করিতেছে। মধ্যে মধ্যে সুকণ্ঠ বিহগের সুললিত গীতধ্বনি-মধ্যে কখনও বা অরণ্য-মধ্যগত বহুদূরস্থিত দুই একটা হিংস্র পশুর গম্ভীর ভীষণ শব্দ যেন কোমলে কঠিনে মিলিত হইয়া সেই স্থানকে এক অভিনব ভাবে ভাবান্বিত করিয়াছে।

সহসা সেই জনহীন অরণ্য জনতাপূর্ণ দেখিয়া পক্ষীরা বৃক্ষ ছাড়িয়া আকাশে উড়িতে লাগিল। নৃত্যশীল ময়ূর কেকাধ্বনি করিতে করিতে বৃক্ষডালে বসিল, ক্রীড়াশীল মৃগ সভয়ে পলায়নপর হইল। কেবল সুচতুর মার্জ্জারকুল নির্ভয়ে অর্দ্ধমুদিত চক্ষে বসিয়া রহিল। অদূরে কতকগুলি গ্রাম্য মেষ, মহিষ, গাভী বিচরণ করিতেছিল, তাহারাও সভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়নের চেষ্টা করিল, কিন্তু নিকটস্থ রাখাল-বালকের উত্তোলিত যষ্টি দেখিয়া বিরত হইল।

মহারাজ তথায় কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম ও আহারাদি করিয়া অমাত্য বয়স্য ও কতকগুলি অনুচরসহ অশ্বপৃষ্ঠে মৃগয়ার উদ্দেশ্যে গভীর অরণ্যে গমন করিলেন।

মন্ত্রী বিজ্ঞ ও বয়োবৃদ্ধ; তিনি রাজাজ্ঞায় রাজমহিলাদের রক্ষণাবেক্ষণে তৎপর রহিলেন। রাজমহিষীদের বনভ্রমণ ও আমোদপ্রমোদের সুবিধার জন্য স্থানে স্থানে বস্ত্র দ্বারা ঘিরিয়া দেওয়া হইয়াছিল। সৈন্য সকল শিবিরের চতুর্দ্দিকে অবস্থান করিয়া শিবির রক্ষা করিতে লাগিল।

রাজমহিষীরা সখী ও পরিচারিকাদিগকে লইয়া ইচ্ছামত নানা স্থানে বেড়াইতে লাগিলেন। কেহ বা সুদৃশ্য পক্ষী ধরিবার জন্য নানা চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কেহ কেহ নবীন তৃণ হস্তে মৃগ-শাবকের পশ্চাদ্ধাবনে ব্যস্ত, আবার কোন রমণী ময়ূরের নৃত্য দেখিবার জন্য ময়ূর-দম্পতীকে আহ্বান করিতে থাকিলেন। কখন বা তাঁহারা নদীজলে অবতরণ করিয়া জলক্রীড়ায় নিরত। কেহ বা প্রকৃতির মাধুর্য্য দেখিতে দেখিতে আনন্দে আত্মহারা হইলেন।

অপরাহ্ণে রাজমহিষীরা নদীতটে এক শিলাখণ্ডে বসিয়া সখীগণ সঙ্গে মাল্যরচনা ও গল্প-গুজব করিতেছেন।

কয়েকটী কৃষকরমণী কলসী কক্ষে মন্থর গতিতে নদীতটে আসিল। তাহারা নিত্য দূর পল্লী হইতে আসিয়া জল লইয়া যায়। আজ দূর হইতে তাহারা রাজমহিষীদের দেখিয়া বিস্মিত নেত্রে চাহিয়া রহিল; রাজার শিবির-সন্নিবেশ এবং সৈন্যসমূহ দেখিয়া তাহারা ভীত হইয়া জলগ্রহণে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল।

তাহা বুঝিতে পারিয়া রাণীরা তাহাদিগকে নিকটে ডাকিয়া আশ্বাস প্রদান করিলেন। তখন তাহারা সভয়ে ধীরে ধীরে জলগ্রহণ করিয়া কম্পিত পদে দুই চারিবার পশ্চাতে চাহিতে চাহিতে পল্লী অভিমুখে গমন করিল।

দিবা অবসান। পশ্চিম গগণ সিন্দূরবর্ণে রঞ্জিত করিয়া সূর্য্যদেব তখন অস্তগমনোন্মুখ। নদীর জল স্বর্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছে। পক্ষীরা কলরবসহকারে নীড়মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। অরণ্যচারী পশু নিজ নিজ বাসস্থানে গমন করিতেছে। গোচারণ-রত রাখাল গোধূলি দেখিয়া গোপাল-সহ গোঠে ফিরিতেছে। চন্দ্রদেব ধীরে ধীরে উদিত হইতেছেন। মৃদুমন্দ পবন কুসুমগন্ধে দিঙ্মণ্ডল আমোদিত করিতেছে।

সহসা প্রথমা রাণীর দক্ষিণ নেত্র ঘন ঘন স্পন্দিত হইতে লাগিল, মস্তকের উপর একটা পেচক কর্কশ ধ্বনি করিল। কি জানি কেন, রাণীর অন্তর' অজানিত আশঙ্কায় কাঁপিয়া উঠিল। চিত্ত চঞ্চল হইল। তিনি অসমাপ্ত পুষ্পমাল্য ভূমিতে ফেলিয়া উঠিযা দাঁড়াইলেন। তাঁহার ভাব দেখিয়া সকলে বিস্মিতভাবে তাঁহার দিকে চাহিলেন।

দূরে অশ্বপদশব্দ শ্রুত হইল, শত শত দীপালোকে শিবির আলোকিত হইল। সৈন্য-কোলাহল এবং অশ্বধ্বনি ক্রমে নিকট হইতে নিকটতর হইল।

মহারাজ আসিতেছেন বুঝিযা মহিষী ও অন্যান্য সকলে সত্বর শিবিরদ্বারে আসিলেন। আসিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহাদের বাক্‌শক্তি রহিত হইল।

দেখিলেন, মহারাজের বদন বিবর্ণ, সর্ব্ব দেহ থর থর করিয়া কাঁপিতেছে দারুণ যন্ত্রণায় তিনি অভিভূত। মূর্চ্ছিতের ন্যায় অনুচরবর্গ তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া শয্যায় শয়ন করাইয়া দিল।

অবিলম্বে রাজবৈদ্য আসিয়া নাড়ী পরীক্ষা করিয়া মুখ বিকৃত করিলেন; তাঁহার বদনে গভীর চিন্তা প্রকাশ পাইল। তিনি অসুস্থতার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া শুনিলেন, মহারাজ অদ্য মৃগয়ায় গমন করিয়া এক ব্যাঘ্রের পশ্চাদ্ধাবন করিতে করিতে সহসা এক শিলাখণ্ডে বাধা প্রাপ্ত হইয়া ভূপতিত হন, তাহাতেই তিনি বক্ষে আঘাত প্রাপ্ত হন ও বক্ষে দারুণ যন্ত্রণা অনুভব করেন।

বৈদ্য সাবধানে রাজাব দেহ পরীক্ষা করিয়া ঔষধ প্রয়োগ কবিলেন। তিনি সসম্মানে মহারাজকে দুই চারিবার আহ্বান করিলেন, কিন্তু বক্ষঃ-বেদনায় মহারাজ বাক্‌শক্তিহীন, একবার চাহিয়া দেখিলেন, মাত্র। অনন্তর চিকিৎসক রমণীদিগকে মহারাজের সেবায নিযুক্ত রাখিযা কিয়দ্দূরে অবস্থান করিলেন।

চিকিৎসক মুহুর্মুহু আসিয়া নাড়ী পরীক্ষা ও ঔষধ প্রদান করিতেছেন। মহারাজ ক্রমেই অবসন্ন ও নিস্তেজ হইয়া পড়িলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস ও বক্ষঃস্পন্দন রহিত হইল, চক্ষের তারা ঊর্দ্ধে উঠিল ও মৃত্যু-লক্ষণ দেখা দিল। তখন হাহাকার উঠিল।

রাজমহিষীরা ললাটে করাঘাত করিতে করিতে মহারাজের বক্ষে ও চরণে পতিত, কখন বা মূর্চ্ছিত হইতেছেন। তাঁহাদের সযত্ন-রচিত পুষ্পমাল্য এক পার্শ্বে ছিন্ন ভিন্ন ভাবে পতিত রহিয়াছে। ক্ষণকাল পূর্ব্বে যে অরণ্যভূমি

বরাঙ্গনাগণের উচ্চহাস্য-তরঙ্গে তরঙ্গায়িত হইতেছিল, মুহূর্ত্তমধ্যে তাহা রাজলক্ষ্মীগণের আকুল রোদনে পরিপূরিত হইল।

কিয়ৎক্ষণ পরে রাজবৈদ্যের আদেশে মন্ত্রী বহু কষ্টে একবার রমণীদিগকে শান্ত করিলেন। তখন বৈদ্য কহিলেন, মন্ত্রি! মহারাজের দেহে আমি এখনও জীবনসঞ্চারের আশা করিতেছি, কারণ, বৈদ্যশাস্ত্রমতে কাহারও সহসা মৃত্যু হইলে দ্বাদশ দণ্ড অপেক্ষা করিতে হয়।

এই বলিয়া তিনি প্রধানা মহিষীকে সসম্ভ্রমে কহিলেন, জননি! আপনারা একটু স্থির হউন।

তাঁহার আশ্বাসবাক্যে সকলে একটু স্থির হইলেন এবং দ্বাদশ দণ্ড অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

এদিকে আচার্য্য শঙ্কর শিষ্যদের লইয়া মাহিষ্মতী হইতে নর্ম্মদার তীরে তীরে গমন করিয়া ক্রমে পূর্ব্বদিকে আসিলেন। এখানে প্রশস্তকায়া নর্ম্মদা ক্ষীণকায়া হইয়া পর্ব্বতভূমিতে প্রবেশ করিয়াছে। তাঁহারা এই স্থানে পদব্রজে নর্ম্মদা উত্তীর্ণ হইলেন।

তথায় একটী বৃহৎ তিন্তিড়ীবৃক্ষমূলে আচার্য্য উপবেশন করিলেন। আচার্য্যকে বসিতে দেখিয়া পদ্মপাদাদিও বসিলেন।

পথে আচার্য্য কাহারও সহিত কোন কথা কহেন নাই। পদ্মপাদও তাঁহার ভাব দেখিয়া কিছু বলিতে সাহস করেন নাই। এক্ষণে আচার্য্যকে নীরব দেখিয়া পদ্মপাদ ধীরে ধীরে বিনয়নম্র স্বরে কহিলেন—

ভগবন্! আপনাকে ত নিশ্চিন্ত দেখিতেছি, আমরা কিন্তু বড় চিন্তিত হইয়াছি।

আ। কেন বৎস! চিন্তার কারণ কি?

পদ্ম। ভগবন্! মণ্ডন-পত্নীর প্রশ্নই আমাদের চিন্তার হেতু।

আ। (মৃদুহাস্যে) বৎস! তজ্জন্য চিন্তার কোন কারণ নাই। যাঁহার ইচ্ছায় এ কার্য্য করিতেছি, তিনিই ইহার উপায় করিতেছেন।

পদ্মপাদ বুঝিলেন, আচার্য্য ইতিমধ্যে তাহার উপায় স্থির করিয়াছেন। তিনি পুনরায় সাগ্রহে কহিলেন—

দেব! আপনার ভাবে বুঝিতেছি, আপনি তাহার উপায় স্থির করিয়াছেন। এক্ষণে সে উপায় কি, বলিয়া আমাদিগের চিত্ত সুস্থির করুন।

আ। বৎস! শুন, নিকটস্থ অরণ্যমধ্যে এক মৃত রাজদেহ পতিত

রহিয়াছে, রাজা অদ্য মৃগয়ায় আসিয়া দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। আমি স্থির করিয়াছি, স্বদেহ পরিত্যাগ করিয়া এই সদ্যমৃত রাজদেহে প্রবেশ করিব এবং কামশাস্ত্র রচনা করিব। আমার পরিত্যক্ত দেহ গুহামধ্যে রক্ষিত হইবে। পরে মাসান্ত হইলে রাজদেহ পরিত্যাগ করিয়া স্বদেহে আগমন করিব এবং মণ্ডনপত্নীর নিকট কামশাস্ত্র গ্রন্থ প্রদান করিব।

আচার্য্যের অভূতপূর্ব্ব বাক্য ও আশ্চর্য্য বুদ্ধিকৌশল শুনিয়া পদ্মপাদাদি কিয়ৎক্ষণ বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হইলেন।

আচার্য্য তাঁহাদিগকে নীরব দেখিয়া পুনরায় কহিলেন, 'বৎস! ইহাই আমি স্থির করিয়াছি। এক্ষণে এ বিষয়ে তোমাদের কি মত, নির্ভয়ে প্রকাশ কর।

পদ্ম। ভগবন্! আপনি মহাশক্তিমান্! আপনাতে সকলই সম্ভবে। কিন্তু দেব. কিরূপে আপনার দেহ রক্ষা হইবে, এই চিন্তায় আমাদের হৃদয় ব্যাকুল হইতেছে।

আ। বৎস! কোন চিন্তা নাই। এক্ষণে আইস, অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করি।

নর্ম্মদার পরপারে ভীষণ অরণ্য। দুইপার্শ্বে পর্ব্বতসমূহ গভীর শাল ও বাঁশবনে পরিপূর্ণ। মধ্যে সুদীর্ঘ বন্যবৃক্ষশ্রেণী। পর্ব্বতগাত্র প্রায়ই কঠিন শিলাময়। কোমল তৃণ কোথাও দেখা যায় না। মধ্যে মধ্যে গুহা ও প্রস্রবণ। বহুদূরে ২।১ খানি ক্ষুদ্র গ্রাম; পর্ব্বতের আশপাশ দিয়া বক্রভাবে একটী সরু পথ গিয়াছে; তাহার সাহায্যে গ্রামে যাওয়া যায়। সেই অরণ্য সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র-জন্তু-পূর্ণ। মৃগয়ার্থী ও যোগী সন্ন্যাসী ভিন্ন সে স্থানে দিবাভাগেও বড় কেহ যায় না। কেবল কখন কখন কাঠুরিয়াগণ কাষ্ঠ আহরণের জন্য দিবাভাগে দলবদ্ধ হইয়া গমন করিয়া থাকে। কিন্তু যিনি হিংসাদ্বেষবিহীন, ব্রাহ্মণ-চণ্ডালে যাঁহার সমজ্ঞান, সমুদায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যাঁহার 'ব্রহ্ম', এক অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্বে যিনি দিবানিশি বিরাজমান, তাঁহার পবিত্রচরণ-প্রান্তে হিংস্র পশু এবং খল বিষধর সর্পও ভক্তিতে অবনত হয়; তাঁহার ভয় কি? আচার্য্য নির্ভয়ে সেই গহন কাননে প্রবেশ করিয়া এক গুহামধ্যে উপবিষ্ট হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি পদ্মপাদকে কহিলেন—

বৎস পদ্মপাদ! আমি স্বদেহ ত্যাগ করিতেছি, তোমরা গোপনে এই গুহামধ্যে আমার দেহ রক্ষা করিও। মাসান্তে আমি স্বদেহে প্রবেশ করিব।

আচার্য্যের কথা শুনিয়া পদ্মপাদাদি গুরুদেবের বিরহাশঙ্কায় কিঞ্চিৎ ম্রিয়মাণ হইলেন। তাঁহাদের ভয় হইল, পাছে তাঁহার আত্মবিস্মৃতি ঘটে। কিন্তু গুরুদেবকে নিষেধ করিতেও পারেন না।

আচার্য্য তাঁহাদের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া সস্নেহে কহিলেন—

বৎস! মনে রাখিও, সেই সর্ব্বকারণের কারণই সকল ইচ্ছার কারণ স্মৃতি বিস্মৃতি সকলই সেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা।

তাঁহার বাক্যে পদ্মপাদাদি লজ্জিত হইলেন। অনন্তর আচার্য্য যোগ অবলম্বনে ধীরে ধীরে স্বদেহ পরিত্যাগ করিলেন। পদ্মপাদ আচার্য্যের বক্ষে হস্তস্থাপন করিয়া বুঝিলেন যে, তিনি দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। তখন তাঁহারা আচার্য্যের দেহ বস্ত্রাবৃত করিয়া বিমর্ষচিত্তে গুরুপাদপদ্মে প্রণিপাত করিলেন।

দ্বাদশদণ্ড অতীত প্রায়, মহারাজা অমরুক তদবস্থাতেই পতিত আছেন। তাঁহার পুনর্জ্জীবন-আশায় সকলেই নিরাশ হইতেছেন, তথাপি চিকিৎসকের আশ্বাসবাণীতে মহিষীরা আশ্বাসিত হইয়া আছেন।

বৈদ্য ক্ষণে ক্ষণে নাড়ী পরীক্ষা করিতেছেন. তাঁহার বদন কখন প্রফুল্ল, কখন বা বিষণ্ণ হইতেছে।

মন্ত্রী বয়স্য অমাত্য প্রভৃতি অন্তরালে গমন করিয়া রাজদেহ সৎকারের পরামর্শ করিতেছেন।

১ম অমাত্য। মন্ত্রী মহাশয়, আপনি কি বলেন, এইবার মহারাজের সৎকারের ব্যবস্থা করিলে ভাল হয় না?

২য় অ। দ্বাদশ দণ্ড অতীত হয়, আর বৃথা আশা।

মন্ত্রী। মহাশয়! রাজবৈদ্য একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি, তাঁহার বাক্যে আমি এখনও হতাশ হইতেছি না।

১ম বয়স্য। মন্ত্রিবর! বৈদ্য যাহাই বলুন না কেন, ইহা কি কখন সম্ভব হয়? আমাদের একথা মোটেই বিশ্বাস হয় না।

২য় বয়স্য। মহাশয়! চিকিৎসকেরা ওরূপ বৃথা আশ্বাস দিয়া থাকেন। আমার মতে আর অপেক্ষার প্রয়োজন নাই।

মন্ত্রী। মহাশয়গণ! আপনারা কিয়ৎক্ষণ স্থির হউন। দ্বাদশদণ্ড অতীত হইল, এইবার একবার দেখা যাউক।

বৈদ্য সাগ্রহে স্থিরভাবে নাড়ী দেখিতেছিলেন। সহসা তিনি মন্ত্রীকে আহ্বান করিয়া একবার নাড়ী পরীক্ষা করিতে বলিলেন, মন্ত্রী আনন্দে

চীৎকার করিয়া উঠিলেন। অতি ধীরে ধীরে মহারাজের বক্ষঃস্পন্দন হই-তেছে, সূক্ষ্ম সুতার সঞ্চারে নাড়ী চলিতেছে।

মন্ত্রিবরের আনন্দধ্বনিতে সকলেই ব্যস্তভাবে মহারাজের নিকট উপস্থিত হইলেন।

ক্রমে ক্রমে মহারাজের নাড়ীর গতি দ্রুত হইল, ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস পড়িতে লাগিল, বিবর্ণ বদনে রক্তাভা প্রকাশ পাইল। মহিষীরা যথোচিত সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে মহারাজ ধীরে ধীরে চক্ষু চাহিলেন। তাহা দেখিয়া সমগ্র মৃগয়া-বাহিনী মহোল্লাসে চীৎকার করিয়া "জয় মহারাজ অমরক রাজের জয়" ধ্বনি করিতে লাগিল। সমগ্র বনস্থলী রাজবাহিনীর মহান্ হর্ষকোলাহলে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

রমণীগণ যেন তখনও বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না। হর্ষাবেগে তাঁহাদের আনন্দাশ্রু নির্গত হইল, কিছুক্ষণ বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। অনন্তর তাঁহারা আনন্দে অধীর হইয়া পুনঃপুনঃ করযোড়ে সেই দুর্গতিনাশিনী মা দুর্গাকে স্মরণ করিয়া তাঁহার চরণ উদ্দেশে প্রণিপাত করিতে লাগিলেন।

চিকিৎসকের নানারূপ উত্তেজক ঔষধ ও রাণীদের সেবা শুশ্রূষায় মহারাজ ক্রমেই সুস্থ হইতে লাগিলেন।

বৈদ্যের আদেশে সকলেই শিবির বাহিরে আসিয়া মৃদুস্বরে কথোপকথন করিতেছেন। কারণ, বহুলোক-সমাগমে মহারাজের পুনরায় অসুস্থতার সম্ভাবনা।

এইরূপে নিশা অবসান হইল। প্রভাতে মহারাজ শয্যায় উঠিয়া বসিলেন। প্রথমতঃ তিনি বিস্মিতের ন্যায় চারিদিকে চাহিলেন।

তাঁহার ভাব দেখিয়া রাণী কহিলেন—

মহারাজ! আপনি মৃগযা করিতে আসিয়া সহসা মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এক্ষণে মা সর্ব্বমঙ্গলার কৃপায় সুস্থ হইয়াছেন। চলুন, গৃহে গিয়া আমরা মায়ের পূজা দিব।

রাণীর কথা শুনিয়া মহারাজ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, অতঃপর যেন কিছু স্মরণ হইল। তিনি ব্যস্তভাবে কহিলেন—

মহিষি! সত্য বটে আমি বড় অসুস্থ হইয়াছিলাম, এক্ষণে সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছি। চল, রাজধানীতে গমন করি।

মহারাজকে সুস্থ দেখিয়া বৈদ্য মন্ত্রীকে নগরে ফিরিতে বলিলেন। তাহা শুনিয়া মন্ত্রী অনুচরদিগকে শিবির ভঙ্গ করিতে আদেশ দিলেন।

তাঁহার আদেশে শিবির ভঙ্গ হইল। তখন মহারাজকে লইয়া মৃগয়া-বাহিনী ধীরে ধীরে রাজধানী অভিমুখে চলিল। সৈন্যসমূহ মহোৎসাহে মহারাজের জয়ধ্বনি করিতে করিতে নগরে প্রত্যাগমন করিল।

ক্রমশঃ।

মহর্ষি ফ্র্যান্‌সিস্।

[শ্রীহরিদাস দত্ত, বি, এ।]

প্রথম অধ্যায়।

জন্ম ও যৌবন—১১৮২—১২০৪ খৃঃ অব্দ।

ইটালির মধ্যস্থলে আন্‌ব্রিয়া নামে একটী বিভাগ আছে। উহার অন্তর্গত পেরুজিয়া প্রদেশে এ্যাসিসি নামে একটী নগর অবস্থিত। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে তথায় ধর্ম্মসম্বন্ধীয় মহা আন্দোলন প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। যে প্রাতঃস্মরণীয় ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ সে আন্দোলনের মূলে অবস্থিত ছিলেন, তাঁহার সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করাই আমাদের উদ্দেশ্য।

ছয় বা সাত শত বৎসর পূর্ব্বে এ্যাসিসি নগরের দৃশ্য যেরূপ ছিল, আজও প্রায় তদনুরূপ। বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। স্থানীয় প্রাচীন দুর্গটী এখন ভগ্নাবশেষ। পার্শ্বে 'সুবাসিত' নামে শৈলমালা ৩৬২৪ ফুট উন্নত। ইহার গাত্রে অধিবাসিগণের ঘনসন্নিবিষ্ট বাসস্থান। পথগুলি বহুকাল হইতে জনহীন ও একপ্রকার পরিত্যক্ত এবং খাড়া পাহাড়ের গাত্র-দেশে অর্দ্ধভাগ অবধি সোপানাবলীর ন্যায় স্তরে স্তরে অবস্থিত। বাসস্থান-গুলির অবস্থিতি এত সুন্দর যে, প্রত্যেকটীর জানালা হইতে তথাকার সমগ্র প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক বাটীতে পাঁচ ছয় খানি করিয়া ছোট ছোট ঘর আছে। বাড়ীগুলি লোহিতবর্ণ প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত বলিয়া বড়ই মনোজ্ঞ-দর্শন। এইরূপ প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যস্থিত একখানি বাড়ীতে মহাপুরুষ ফ্রান্‌সিসের জন্ম হয়। প্রবাদ, যে বাড়ীতে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল, এখন আর তাহার চিহ্নমাত্র নাই এবং তথায় একটী উপাসনা-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

এ্যাসিসি নগরে বার্নার্ডন্ নামে একজন ধনবান্ বস্ত্রব্যবসায়ী সপরিবারে বাস করিতেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণীর নাম পিকা। ইনি অতিশয় বিনীতস্বভাবা ও ধীরপ্রকৃতি ছিলেন: ব্যাবসায় উপলক্ষে বার্নার্ডানকে নানা দূরদেশে যাইতে হইত। এমন কি,সময় সময় তিনি ফ্রান্সের উত্তরাংশেও গমন করিতেন। যখন ফ্র্যান্সিসের জন্ম হয়, তখন ইনি ফ্রান্স্ দেশের উত্তরপূর্ব্বাংশে অবস্থিত শ্যাম্পেন্ নামক স্থানে ছিলেন। জননী পুত্রকে স্থানীয় প্রধান উপাসনা-মন্দিরে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করেন এবং তাঁহার নাম 'জন্' রাখেন। কিন্তু পিতা প্রবাস হইতে ফিরিয়া আসিয়া পুত্রকে ফ্র্যান্সিস্ নামে অভিহিত করেন। কি নিমিত্ত তিনি পুত্রের নাম ঐরূপে পরিবর্ত্তন করেন, তাহা ঠিক জানা যায় না। তবে অনুমানে এইমাত্র বলা যায় যে, পুত্রকে ফরাসী ধরণে মানুষ করিবার অভিপ্রায় তাঁহার ছিল বলিয়াই হউক অথবা আল্পস্ পর্ব্বতের উত্তরভাগস্থ তাঁহার সম্ভ্রান্ত ফরাসী ক্রেতাগণের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যেই হউক, তিনি ঐরূপ করেন। যাহা হউক, তিনি পুত্রকে বাল্যাবধি ফরাসী ভাষায় শিক্ষিত করিতে আরম্ভ করেন এবং ফ্র্যান্সিসেরও তজ্জন্য ফরাসী ভাষা ও ফ্রান্সের প্রতি কালে বিশেষ অনুরাগ জন্মে।

পূর্ব্বে ব্যবসায়িগণ একদেশের সংবাদ অন্যদেশে লইয়া যাইয়া তথায় উহা প্রচার করিত। ইহার কারণও ছিল। কর্ম্মোপলক্ষে তাহারা দেশান্তরে উপস্থিত হইলে তথাকার অধিবাসিগণ তাহাদিগকে নানা বিষয়ে বিশেষতঃ ধর্ম্মবিষয়ে অনেক প্রশ্ন করিত; ব্যবসায়িগণও তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য বিবিধ সংবাদ সংগ্রহে বিশেষ যত্ন করিত। এইরূপে তাহারা ক্রমে একটি ছোট খাট প্রচারকের কার্য্যে প্রায় অভ্যস্ত হইয়া উঠিত। ফ্র্যান্সিস্ও এই প্রকারে পিতার নকট হইতে নানাবিধ ধর্ম্মবিষয়ক কথা শ্রবণ করিতেন। প্রবাস হইতে বার্নার্ডন্ ঐ প্রকারে যে সমুদয় ধর্ম্মবিষয়ক নূতন সংবাদ আনিতেন, তৎসমুদয় প্রথম প্রথম ফ্র্যান্সিসের মনের উপর তেমন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। কিন্তু বহুদিন পর্য্যন্ত ঐ সকল তত্ত্ব প্রচ্ছন্নভাবে বীজাকারে তাঁহার হৃদয়মধ্যে নিহিত থাকিলেও সূর্য্যালোক প্রভাবে সহসা অঙ্কুরিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া কালে অভাবনীয় সুফল প্রসব করিয়াছিল।

বালক ফ্র্যান্সিসের বিদ্যালাভ বড় অধিক হয় নাই। সে সময়ে বিদ্যালয়ে ধর্ম্মযাজকদের যথেষ্ট প্রভুত্ব ছিল। স্যান্ জর্জ্জিওর ধর্ম্মযাজকগণই তাঁহার

শিক্ষক ছিলেন। তাঁহাদের নিকট হইতে তিনি অল্প পরিমাণে ল্যাটিন্ ভাষা শিক্ষা করেন। তিনি লিখিতেও শিখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু উহাতে বিশেষ কৃতকার্য্য হন নাই। তাঁহার সমগ্র জীবনে তাঁহাকে লেখনী ধারণ করিতে অতি অল্পই দেখা গিয়াছে এবং যাহা লিখিতেন, তাহাও অতি সামান্য। সাধারণতঃ তিনি উহা বলিতেন, অপরে লিখিত; এবং লেখা শেষ হইলে স্বাক্ষর না করিয়া তৎপরিবর্ত্তে ক্রুশ অঙ্কিত করিয়া দিতেন। বাড়ীতে তিনি ফরাসী ভাষাতেই কথাবার্ত্তা কহিতেন। ঐ ভাষা তাঁহার জীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ফরাসী ভাষার যৌবনাবস্থার কবিতাবলী পাঠ করিয়া তিনি মুগ্ধ হইতেন এবং তাঁহার মন যেন কি এক অজ্ঞাত ও বিচিত্র শক্তি প্রভাবে ফরাসী-বীরবৃন্দের বীরত্বসূচক কার্য্যের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তদনুসরণে উত্তেজিত হইয়া উঠিত। তাঁহার বাল্যজীবন সাধারণ বালকের ন্যায়ই ছিল। যেস্থানে তাঁহাদের বাড়ী ছিল, তথায় গাড়ী ঘোড়ার ভয় না থাকায় বালকেরা প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত নিঃশঙ্কচিত্তে পথে পথে খেলিয়া বেড়াইত। ছোট ছোট দল বাঁধিয়া তাহারা এমন মধুরভাবে খেলা করিত যে, উহা দর্শন করিয়া দর্শকমাত্রেই মুগ্ধ হইয়া যাইত। কখন কখন ছয় সাত জন মিলিয়া স্তম্ভের পার্শ্বে উপু হইয়া বসিয়া পাশা খেলিত এবং খেলার হার জিত লইয়া নানারূপ উত্তেজনা প্রকাশ করিত। আম্ব্রিয়া বিভাগের বালকদের ইহা একটী বিশেষত্ব ছিল যে, তাহারা সকল খেলা অপেক্ষা সৈনিক পুরুষদের গতিবিধি অনুকরণে অতিশয় আনন্দ অনুভব করিত এবং মিছিল বাহির করা তাহাদের একটি অতি প্রিয় অনুষ্ঠান ছিল। দিবাভাগে ছোটখাট গলিতে খেলিয়া বেড়াইয়া সন্ধ্যার সময় একত্রে মিলিত হইয়া নৃত্য গীত করিতে করিতে তাহারা সদর রাস্তার উপর পরিভ্রমণ করিত। এই সকল ব্যাপারে ফ্র্যান্সিস্ প্রায়ই অধিনেতার কার্য্য করিতেন। কথিত আছে, সে সময় সেখানকার পিতামাতারা নিজ নিজ সন্তানদিগকে দুর্নীতিপূর্ণ ছোটখাট কার্য্যেও উৎসাহিত করিতেন; এবং কোনও বালক ঐ সকল করিতে অস্বীকার করিলে বল প্রয়োগ করিতেও তাঁহারা কুণ্ঠা বোধ করিতেন না। এই নিমিত্ত বালক ফ্র্যান্সিস্ অতি শীঘ্রই অসৎকার্য্যে অভ্যস্ত হইয়া উঠেন।

পিতার সঞ্চিত অর্থ ও সমৃদ্ধ ব্যবসায় এবং মাতার সম্রান্তবংশ মর্য্যাদা এই দুই কারণে ফ্র্যান্সিস্ দেশের গণ্য মান্য ব্যক্তিদিগের সন্তানগণের মধ্যে অন্যতম

বলিয়া পরিগণিত হইয়া উঠেন। আবার মুক্তহস্তে অজস্র অর্থব্যয়ের জন্য তিনি সমধিক আদর অভ্যর্থনা পাইতেন। তাঁহার ব্যয়ে নানারূপ আমোদপ্রমোদ চলিত বলিয়া ভদ্রবংশীয় যুবকবৃন্দ তাঁহাকে বিশেষ সম্মান দানে কুণ্ঠিত হইতেন না। বার্নার্ডান্ যদিও কৃপণ-প্রকৃতি ছিলেন, তথাপি পুত্রের আমোদ-প্রমোদের ব্যয়সঙ্কোচে তাঁহার আদৌ ইচ্ছা ছিল না। কারণ, অহঙ্কার ও আত্মাভিমান অপেক্ষা কাঞ্চনের লোভ তাঁহার হৃদয়ে অধিকতর বলবান্ ছিল না। ফ্র্যান্সিসের জননী পুত্রের ঐরূপ বৃথা অর্থব্যয় এবং উচ্ছৃঙ্খল স্বভাব দেখিয়া কষ্ট পাইতেন। কিন্তু কোন কথা না বলিয়া উহা নীরবে সহ্য করিয়া থাকিতেন। পুত্রের ভাবী উন্নতি বিষয়ে কিন্তু তিনি কখন নিরাশ হইতেন না। যখন প্রতিবেশিগণ ফ্র্যান্সিসের উচ্ছৃঙ্খলতার বিষয় তাঁহার নিকট কখন কখন উত্থাপন করিতেন তখন উত্তরে তিনি ধীর ভাবে বলিতেন—"আপনারা কি মনে করেন বলিতে পারি না, আমার কিন্তু দৃঢ় বিশ্বাস জগদীশ্বরের ইচ্ছায় ফ্র্যান্সিস্ একজন নিষ্ঠাবান্ সাধু হইবে"। স্নেহময়ী জননীর মুখ হইতে নিজ পুত্র সম্বন্ধে ঐরূপ কথা বাহির হওয়া স্বাভাবিক হইলেও ঐ সকল কথাই পরে ফ্র্যান্সিসের উচ্চ জীবনাদর্শ সম্বন্ধীয় ভবিষ্যদ্বাণী বলিয়া জন-সাধারণ কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছিল।

ফ্র্যান্সিস্ অন্যান্য যুবকের ন্যায় আচরণ করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন না। ভাল বা মন্দ সকল বিষযেই তাঁহাদের কার্য্যাবলী অতিক্রম করাটাকেই তিনি গৌরবের বিষয় বিবেচনা করিতেন। কি খেয়াল, কি ঠাট্টা তামাসা, কি অযথা ব্যয়, কি দুষ্টামি বুদ্ধি, সকল বিষযেই তিনি চূড়ান্ত না করিয়া কখন ছাড়িতেন না। দিবসের অধিকাংশ সময় তিনি বন্ধু বান্ধবদের সহিত পথে পথেই থাকিতেন এবং পরিচ্ছদ বৈচিত্র্যে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেন। দিবাবসানেও তাঁহার আমোদ প্রমোদের অবসান হইত না। তখনও তাঁহার ও তদীয় বন্ধুবর্গের আনন্দ ধ্বনিতে চারিদিক প্রতিধ্বনিত হইতে থাকিত।

ইটালির উত্তর ভাগস্থ সহর গুলিতে জন কতক কবি এই সময়ে পর্য্যটন অভিপ্রায় উপস্থিত হইয়া নানাবিধ আমোদ প্রমোদ ও উৎসবে জন সাধা-রণের মন আকৃষ্ট করিতেছিলেন। তাঁহাদের আচরণ দর্শনে একদিকে যেমন তত্রত্য অধিবাসীগণের হীন মনোবৃত্তিগুলি উত্তেজিত হইতেছিল অপর দিকে আবার তাঁহাদের সভ্যতা ও শীলতা দর্শনে তদনুকরণ ইচ্ছাও তাহাদের অন্তরে জাগরূক হইয়া উঠিতে ছিল। ঐ শেষোক্ত বিষয়ে ফ্রান্সিস্ তাঁহাদের

দৃষ্টান্তে বিশেষ উপকৃত হইয়াছিলেন। অমিতাচারিতার মধ্যেও শীলতা ও শিষ্টতা রক্ষা করিয়া চলিতে এবং অভদ্রোচিত বাক্য যাহাতে মুখ হইতে কখন বাহির না হয় সে বিষয়ে তিনি ইঁহাদের নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি জনসাধারণকে সকল বিষয়ে অতিক্রম করাটা তাঁহার জীবনের একটী প্রধান লক্ষ্য ছিল। হৃদয়ের ঐ অভিলাষ আকাঙ্ক্ষাতেই বীরজনোচিত কার্য্যের প্রতি স্বভাবতঃ তাঁহার অনুরাগ জন্মে, এবং চরিত্র-হীনতাই তাদৃশ জীবনের প্রধান নিদর্শন ভাবিয়া উচ্ছৃঙ্খলভাবে জীবনযাপনে তিনি একপ্রকার দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া উঠেন।

বিংশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে যখন তিনি প্রমোদ-তরঙ্গে ঐরূপে সন্তরণ দিতে-ছিলেন, তখনও তাঁহার হৃদয় সদ্বিষয়ের প্রতি একেবারে রুদ্ধ অথবা উদাসীন হইয়া পড়ে নাই। নানারূপ আমোদপ্রমোদের মধ্যেও সময়ে সময়ে তাঁহার *মনে হইত যে, দুই চারি ঘণ্টার অমিতাচারিতায় তিনি যে অর্থ ব্যয় করিতে-ছেন,* তাহাতে কত ক্ষুধার্ত্ত দরিদ্রের বহুদিন সুখ-স্বচ্ছন্দে অতিবাহিত হইতে পারে। কোমলহৃদয় ফ্র্যান্সিস্ যখন দরিদ্রদিগকে স্বচক্ষে দেখিতেন, তখন তাহাদের দুরবস্থার কথা মনে করিয়া তিনি আত্মহারা হইয়া পড়িতেন এবং নিজের নিকট যাহা কিছু থাকিত, এমন কি পরিহিত বস্ত্রাদি পর্য্যন্তও দান করিয়া বসিতেন। একদিন তিনি তাঁহার দোকানে ক্রয়বিক্রয়কার্য্যে ক্রেতাগণের সহিত ব্যস্ত আছেন, এমন সময় তথায় একজন লোক আসিয়া ভগবানের নাম করিয়া কিছু ভিক্ষা প্রার্থনা করে। ফ্র্যান্সিস্ তাহাকে রূঢ় বাক্যে প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই নিজ কার্য্যের জন্য ক্ষুণ্ণ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, "যদি এই লোকটী কোন বড়লোকের নাম করিয়া আমার নিকট উপস্থিত হইত,তাহা হইলে ইহার জন্য আমি কি না করিতাম! অতএব ভগবানের নামে যখন সে আমার নিকট ঐরূপ প্রার্থনা করিল, তখন উহার সম্বন্ধে আরও কত অধিক করা কর্ত্তব্য?" এইরূপ ভাবনায় অভিভূত হইয়া তিনি সেই দরিদ্রের অনুসন্ধানে তৎক্ষণাৎ দ্রুতপদে বাহির হইয়া পড়িলেন।

পিতার ব্যবসায়কার্য্যে যখন তিনি প্রথম নিযুক্ত হন, সে সময় তাঁহার পিতা তাঁহার ব্যবসায-বুদ্ধির পরিচয়ে অতিশয় সন্তোষ লাভ করেন। পিতা ভাবিতেন পুত্র যে কেবলমাত্র অর্থ ব্যয় করিতেই সিদ্ধ, তাহা নহে, অর্থ উপার্জ্জ-নেও তাহার সামর্থ্য আছে। কিন্তু তাঁহার এই ধারণা অধিক দিন স্থায়ী হয়

নাই। কারণ অসৎসঙ্গ পুত্রের উপর অত্যধিক আধিপত্য বিস্তার করিতেছিল। ক্রমে উহা এতটা দাঁড়াইল যে, তিনি ঐ সকল সঙ্গীদের ছাড়িয়া অধিকক্ষণ কোথাও থাকিতে পারিতেন না! তাহাদিগকে দেখিলেই তিনি সকল কাজ কর্ম্ম ফেলিয়া তাহাদের সহিত বাহির হইয়া পড়িতেন।

বহু পূর্ব্ব হইতে ইটালি স্বাধীনতা-সুখে বঞ্চিত হইয়া দাসত্ব-শৃঙ্খলে নিগড়িত হইয়াছিল। পুনরায় স্বাধীনতা লাভের প্রত্যাশায় একটী দেশব্যাপী রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনও এই সময়ে চলিতেছিল। উহার ফলে দেশবাসী সকলেই যেন এক অভিনব উদ্যমে উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছিল। সকলেরই মনে হইতেছিল, এইবার ইটালি পুনরায় একতাসূত্রে বদ্ধ হইয়া বিদেশী বিজেতাকে বিতাড়িত করিয়া দিবে। কিন্তু অন্তর্ব্বিবাদই ঐপথে বিঘ্নস্বরূপ হইয়া উঠে। বিজেতা যতই কেন নিজ প্রভুত্ব বিস্তারে সক্ষম হউন না, ইটালির জাতীয় চিন্তার উপর এপর্য্যন্ত কোনরূপ আধিপত্য স্থাপনে সমর্থ হন নাই।

এ্যাসিসির অধিবাসিগণও এই আন্দোলনে যোগদানে পরাঙ্মুখ হয় নাই। কিন্তু নিম্ন ও উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হওয়ায় বিপক্ষ-পক্ষীয়গণ সেই সুযোগে তাহাদিগকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া তাহাদের মধ্যে অনেককে বন্দী করে। অন্যান্য সম্ভ্রান্তবংশীয়দের সহিত ফ্র্যান্সিস্‌ও কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন। তাঁহাকে একবৎসর কাল তথায় বাস করিতে হইয়াছিল। এই অবস্থায় তিনি দুঃখ প্রকাশ অথবা নিজ অদৃষ্টকে নিন্দা করিতেন না। বরং সে সময় তাঁহার আমোদপ্রিয়তা এত বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, তাহা দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইতেন এবং ঈদৃশ আচরণের জন্য তাঁহাকে উন্মত্ত বিবেচনা করিতেন। কারাগারে অবস্থানকালে নিজ ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে নানাবিধ চিন্তা ও সংকল্পাদি তাঁহার মনোমধ্যে উদয় হইত এবং যিনিই ঐ সময়ে তাঁহার নিকটে আসিতেন, তাঁহারই নিকট সে বিষয় আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেন। নিজ অসমসাহসিক কার্য্য সম্বন্ধে তিনি স্বপ্ন দেখিতেন এবং প্রায়ই এই কথা বলিতেন, "দেখিবেন, একদিন আমি জগৎপূজ্য হইব!" অভিজাতবংশীয় যে সকল যুবকদের প্রতি পূর্ব্বে তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল, তাহাদের সহিত দীর্ঘকাল একত্র কারাবাসে তাহাদের গুণাগুণের বিশেষ পরিচয় পাইবার ফলে এখন তাহা অন্তর্হিত হইয়া যায়। বিপৎকালেও ফ্র্যান্সিসের কথাবার্ত্তায় হৃদয়ের সরলতা ও স্বাধীন চিত্তের পরিচয় পাওয়া যাইত। অহঙ্কার ও উগ্র

প্রকৃতির জন্য একজন বীর এই সময়ে কারাবাসে কাহারও সহিত মিশিতেন না; একা একাই থাকিতেন। ফ্র্যান্‌সিস্ তাঁহাকে একা থাকিতে দিতেন না এবং নিজ অমিয় প্রকৃতিগুণে তাঁহাকে অপর সকলের সহিত মিলিত করিয়া দেন। এইরূপে এক বৎসর গত হইলে বিজেতা ও বিজিতের মধ্যে সন্ধি স্থাপনের পর বন্দিগণকে মুক্তি দেওয়া হয়। তখন ফ্র্যান্‌সিসের বয়স ২২ বৎসর। (ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীকালী।

ভীমা।

পাশব বল নাশ করিতে, নাচত কালী খড়্গহস্তা।
তরলতপ্ত, রুধিরদীপ্ত, কলিতমাল্য অসুরমস্তা॥
করাল আস্য, অট্টহাস্য, লাস্য-চকিত কূর্ম্মশেষ।
ছন্নগগন,—অম্বুদ ঘন,—চরণচুম্বি মুক্তকেশ॥
অযুতবজ্রে, জলদ গর্জ্জে, তিমিরগর্ভে বিশ্ব লীন।
ঝটিকাদর্পে তুঙ্গসুমেরু নমিতশীর্ষ কেন্দ্রহীন॥
চ্যুতকক্ষ লক্ষ লক্ষ চন্দ্র-সূর্য্য-কিরণকুঞ্জ।
গগনগঙ্গা খরতরঙ্গা উগরে তারকা-ফেনপুঞ্জ॥
বারিধি বায়ু অগ্নি পৃথ্বী ব্যোম পঞ্চ তিমির স্তোম।
গর্জ্জে কালী, মুণ্ডমালী, প্রলয়নাদে পূরিত ব্যোম্॥
ব্যাধি মড়ক, ব্যাদিত-মুখ কলিত-জীবজন্তু-গ্রাসা।
ধ্বংসমূর্ত্তি, প্রলয়কর্ত্রী, অগ্রবর্ত্তী, অট্টহাসা॥
রোদনশব্দে স্তব্ধ ধরণী শ্মশান-অগ্নি গগন ছায়।
রুধিরে মগ্না, নাচত নগ্না শ্মশানকালী জলদকায়॥১॥

ক্ষেমা।

রজতশুভ্র, মিলিত অভ্র তুঙ্গ অচলে ধ্যানাসীন।
গিরিশ-অঙ্কে, গিরিজা রঙ্গে রাজিত শিবকণ্ঠলীন॥
নয়নাপাঙ্গে দহিতানঙ্গ চরণপদ্মে ভ্রমর গুঞ্জে।
মধুর হাস্যে, মেদুর লাস্যে চমকে দামিনী আঁধারপুঞ্জে॥

অলকা তিলকা চন্দ্রবদনে, ভাতি দীপ্তভারকাতুল্য।
পীন-পীযুষ-পূরিত-বক্ষ-লম্বিত-জবা-মাল-দোতুল্য॥
চরণলম্বি চিকুরদামে নবীন-নীল-পয়োদদীপ্তি।
কোটিচন্দ্র রজতধারে করিছে বিমানে অমৃতবৃষ্টি॥
ক্ষান্তি, শান্তি, নিহতভ্রান্তি, স্নেহবিগলিত নংনাসার।
প্রেমফুল্ল অঙ্কসরোজে চিরধৃতাখিলধরণীভার॥
জগতধাত্রী, প্রতুলকর্ত্রী, পূতসাবিত্রী লক্ষ্মী বাণী।
ভিন্নকলনা, ভক্তরমণা, ভ্রান্তিদলনা, অভয়পাণি॥
দ্বাদশদলকমলপদ্মে রাজিত শিবকণ্ঠলগ্না।
আদিবিদ্যা ভক্তারাধ্যা, চিরানবদ্যা, ভীতিভগ্না॥
করুণাপাঙ্গে শমিতানঙ্গ, প্রেমতরঙ্গে লাস্যমানা।
মুক্তকেশা মধুরহাসা তিমিরনাশা ক্রটিতকামা॥
গগনব্যাপ্ত, স্বরূপনিত্য, সত্যচেতনানন্দমূর্ত্তি।
স্বরূপমর্ম্ম, অভাবে ব্রহ্ম, ভাবে জ্যোতিঘনরূপস্ফূর্ত্তি॥

শিবভাবে জীবসেবা।

[শ্রীয—]

ভাই সকল, আবহমান কাল হইতে জগতে যে ধর্ম্ম কর্ম্ম প্রচলিত রহিয়াছে, তাহার সাধন প্রণালী গুলি চিরকালই আমার কেমন একঘেয়ে একল ষেঁড়ে গোছ মনে হয়। মনে কর, যদি কাহারো সাধু হবার বাসনা হয়, ভগবান্ লাভ করিতে যদি মন প্রাণ বড় ব্যাকুল হয়, তবে তাহাকে চিরন্তন পদ্ধতি অনুসারে এই গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়া কৌপিন আঁটিয়া নিবিড় অরণ্য মধ্যে তাঁহার ইষ্টদেবের সন্ধানে ফিরিতে হইবে। সাধু যোগী বা সন্ন্যাসী বলিলেই লোকে বুঝে অসার অনিত্য সংসার ত্যাগ করিয়া লোকালয়শূন্য গভীর অরণ্যে অথবা নির্জ্জন গিরিগুহায় ধ্যানে মগ্ন একটী জীব যাঁহার সঙ্গে সংসারী নর নরনারীর আদা ও কাঁচকলার মত সম্বন্ধ! বিষয়প্রসঙ্গ এবং নারীমূর্ত্তি যাঁহার পক্ষে নরকের দ্বার স্বরূপ, এবং চতুর্দ্দিকে

* কলিকাতা বিবেকানন্দ সমিতির সভ্যগণের সাপ্তাহিক অধিবেশনে ইং ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯১০ সালের শ্রীমান্ 'য' কর্ত্তৃক ইহা পঠিত হয়।

পবিত্র পুণ্যের জ্যোতিঃ যাঁহাকে সাবধানে পাপ-পঙ্কিলময় সংসার হইতে রক্ষা করিতেছে! তাঁহার সাধন প্রণালী হইল—সমস্ত ভোগ্যবস্তু হইতে বিরত হইয়া চিত্তবৃত্তিকে একেবারে নাশ করা অথবা কোন একটী বিশিষ্ট বিষয়ে নিরুদ্ধ করিয়া ইন্দ্রিয়াদিদ্বার গুলো একেবারে আঁটিয়া সাটিয়া নিবাত নিষ্কম্প প্রদীপের মত নির্জ্জনে স্থির ধীর, জড় পাষাণবৎ নিশ্চেষ্ট হইয়া উপবেশন! এই ভাবে বহুকাল লোকসঙ্গ ত্যাগ করিয়া কঠোর যোগের দ্বারা তাঁহার ভগবদ্বস্তু প্রাপ্তি ঘটে—অর্থাৎ একটী ভগবান্ (দেবতা বিশেষ?) প্রাপ্ত হন, যাঁহাকে তিনি গোপনে হৃদিমন্দিরে যত্নে আটকাইয়া রাখিয়া দেন; যদি কখনো কোন ভাগ্যবান অধিকারী সমিৎপানি হইয়া তাঁহার সামনে গিয়া পড়েন তবেই ইষ্টনিষ্ঠাটী গোপনে কাণে কাণে বলিয়া দেন। তাঁহার সঙ্গে সংসারী জীবের সম্বন্ধ কতটুকু? তিনি মুক্তির প্রবল বাসনা অন্তরে ধারণ করিয়া আজীবন কঠোর চেষ্টার ফলে, যে অমৃত আস্বাদন করেন তাহা যে তাঁহার বড় আদরের, বড় নিজস্ব ধন তাহা বুঝিতে পারি। কিন্তু জীবনের শেষ সময়ে সকল শক্তির অবসানে, যখন তিনি বাহ্যব্যাপার হইতে একরকম মন তুলিয়া লইয়া, অবসর গ্রহণ করিয়া প্রায় সমাধি মগ্নই থাকেন, তখন তাঁহার নিকট, ক্ষুদ্র জীব আমরা, কি প্রকারে অগ্রসর হইবার প্রত্যাশা করিতে পারি? আমরা বদ্ধজীব—সংসারের কোলাহল মধ্যে থাকিয়া কোন শুভ মুহূর্ত্তে হয়ত তাঁহার ছবিখানি দেখিয়া অথবা জীবনী-খানি পড়িয়া একটু জ্ঞানলাভ করি, আর ভাগ্য যদি অতি প্রসন্ন হয়, মন যদি বড় ব্যাকুল হয়, তবে অনেক কষ্টে তাঁহার তপোজ্জল তনুখানি দেখিয়া নরজন্ম সার্থক করিতে পারি—এই মাত্র সম্বন্ধ তাঁহার সঙ্গে এই বিরাট্ জগতের।

দেখ ভাই, 'ভগবান্' মনে করিলেই আমাদের দৃষ্টি আকাশের দিকে উঠে, মনের ভিতর একখানি প্রেমময়, জ্ঞানময়, আনন্দঘন,—কেতাবে পড়া—কেমন কেমন মূর্ত্তির কল্পনা আসে; বুদ্ধি বেচারা কেমন হতভম্ব ও স্তব্ধ হইয়া পড়ে, আর কে যেন বলে, 'ও ধর্‌বার ছোঁবার বস্তু নয়; বড় মহান্ স্বর্গীয়, বৃহৎ ব্যাপার, অনেক তপস্যার ফলে তবে মিলে—সে বড় ভাগ্যের কথা!' চিরকালই শুনিয়া আসিতেছি, আমরা বড় ক্ষুদ্র, বড় হতভাগা, সংসারের কীট, কীটস্য কীট, মহাপুরুষের কৃপা ভিন্ন আমাদের কোন উপায় নাই। কিন্তু মহাপুরুষ এ জগতে কালে ভদ্রে আসেন; আর ভগবান্

আছেন, সেই বহুদূরে মহাপবিত্র গোলকধামে! কেউ বলেন, আরো উর্দ্ধে—সপ্তর্ষিলোকের মাথায়! কাজেই তাঁহাদের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ কেবল কেতাবের মারফৎ, তা বুক ফাটিয়া কাঁদিয়াই মরি, আর অন্নাভাবে পথে নির্জ্জীব হইয়া পড়িয়াই থাকি।

কিন্তু সত্যই কি আমার ঈশ্বর, আমার প্রাণারাম, জীবনসর্ব্বস্ব, দূরে দূরে, বহুদূরে কোনও এক দিব্যলোকে বসিয়া আছেন? সত্যই কি তাঁহাকে চতুর্দ্দশ বৎসর কঠোর তপস্যা ভিন্ন পাইব না? আমার এ পর্ণকুটীরে এ ভগ্ন হৃদয়ে, বুকভরা অশ্রুরাশি মধ্যে আমার দয়িত আমার নয়নমণি কি নাই? তবে আমি তাঁহার অন্বেষণে কোথায় যাইব? আমার প্রাণ যে বলিয়া দিতেছে, আমার সর্ব্বস্ব প্রতি গৃহকোণে, প্রাঙ্গণে, প্রতি হৃদয়ে খেলা করিয়া বেড়াইতেছেন! প্রতি নিশ্বাসে প্রতি প্রাণস্পন্দনে আমি যে তাঁহাকে অনুভব করি! আমি তাঁহাকে ছাড়িয়া কোন্ নির্জ্জন বনে যাইব? আমার এ খেলাঘরের সাথীকে ছাড়িয়া আমি কোন্ অন্ধকারে যাইব? সাথী যে আমার কখনো ভিখারীর বেশে আমারই বেড়ার ধারে—ভিক্ষা দাও—বলিয়া ত্রিভঙ্গিমঠামে দাঁড়ান! আহা! তখন তাঁর নয়নে কি কাতর ভাব মাখান!—কখনো আবার লক্ষপতি বণিক্‌সাজে কামকাঞ্চনে বেষ্টিত হইয়া আমায় কত ছলনা করেন! আমার হৃদয়মণি কখন দুঃখিনী রমণীর বেশে কত করুণ রসের অবতারণা করেন—আবার কখনো বা আমারই গলা ধরিয়া তুমি আমার বলিয়া যে কত আদর করেন! আমার এ খেলাঘর আমি ভাঙ্গিতে পারিব না—তা তোমরা যাহাই বলনা কেন। শ্রীরামচন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া সকল মহাপুরুষই 'সর্ব্বভূতে নারায়ণ বিরাজ করিতেছেন', 'সকল জীবই জগৎপিতার সন্তান', 'সকল হৃদি-কন্দরেই অঙ্গুষ্ঠমাত্র অন্তরাত্মাপুরুষ সর্ব্বদা সন্নিবিষ্ট,' এই শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তুমি, আমি, রাম, শ্যাম কখনো তাহা বুঝিতে ও ধরিতে পারি নাই। শাস্ত্র চিরকালই উচ্চস্বরে বলিতেছেন 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম', সব ভাই ভাই, কিন্তু যখনই সেই ব্রহ্মপ্রাপ্তির কথা উঠে, অমনি 'নেতি', 'নেতি', অথবা গোলক, দ্যুলোকের ভাব ফুটিয়া উঠে। অমনি আসিয়া পড়ে কৌপিন, চিম্‌টা, করঙ্গ, নির্জ্জন গিরিগুহা, আমাদের চক্ষু দুইটা অমনি শিবনেত্র হইয়া যায়! জীব জন্তু জগৎ দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া যায়! আর মনটা কোথায় এক অচেনা, অজানা ভাবরাজ্যে ভাসিয়া যায়। বুদ্ধদেব জীবের জন্য যত বেশী কাতর হইয়াছিলেন, তাঁহার সেবক-

মণ্ডলী তত বড় বড় মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া সেগুলোকে তত বেশী অন্ধকারাবৃত ও আরশুলার আবাসভূমি করিয়া একটা মহা গাম্ভীর্য্য ও ভয়ের ভাব আনিয়া দিলেন! তিনি সকলের জন্য নহেন—এই ভাবটাই যেন প্রত্যেক দৃশ্যে ফুটাইয়া তোলা হইল! খ্রীষ্ট স্বর্গরাজ্যকে পৃথিবীতে আনিবার যত চেষ্টা করিলেন, তাঁহার শিষ্য-প্রশিষ্যেরা সেটাকে তত বেশী দূরে ঠেলিয়া দিতে চেষ্টা করিলেন ও করিতেছেন। চৈতন্যদেব আচণ্ডালকে যেমন প্রেমে কোল দিয়াছিলেন, আধুনিক তিলক-ছাপা-অঙ্কিত বৈষ্ণবের দল, তেমনি সকলকে অস্পৃশ্য অবৈষ্ণব পাষণ্ড ও কৃপার পাত্র মনে করিয়া নিজেদের মধ্যে একটা পবিত্রতার সঙ্কীর্ণ গণ্ডী টানিয়া বিচরণ করিতে থাকিলেন। সে শ্রীচৈতন্য-প্রচারিত 'জীবে দয়া'র মধ্যে এখন পড়ে কেবল স্বজন এবং স্বসম্প্রদায়! অপর ব্যক্তি যদি অনাহারে অনাশ্রয়ে অবিচারে সর্ব্বস্বান্ত হয়, তথাপি হায় হায়! বর্ত্তমান বৈষ্ণবের করুণার স্রোত সে গণ্ডী ভাঙ্গিয়া অগ্রসর হয় না!

কিন্তু আমার দেবতা যে এই বিরাট্ বিশ্ব ব্যাপিয়া বিরাজিত! ক্ষুদ্র তৃণকীট হইতে বৃহৎ গ্রহ নক্ষত্র, দৃশ্য, অদৃশ্য সমস্ত বস্তু আমার দয়িতের দ্বারা ওতপ্রোতভাবে যে পরিপূর্ণ! এই পূর্ণ, এই বিরাট্, আমার ঈশ্বর! পূর্ণের প্রত্যেক ক্ষুদ্রাংশ, বিরাটের প্রতি অণু, আমার নিকট অতি পবিত্র, অতি মহান্, অতি পূজ্য। আমার ধর্ম্ম এই বিরাট্ চৈতন্যের উপাসনা, আমার সাধনপ্রণালী—এই বিরাট্ ব্রহ্মের পূজা! আমার উদ্দেশ্য—জন্মজন্ম এই পূজাব্রতে ব্রতী থাকা, আমার যথাসর্ব্বস্ব দয়িতের কার্য্যে নিয়োজিত রাখা। আমার লক্ষ্য বিরাট্ ব্রহ্মচৈতন্যের প্রতি অণুপরমাণুর সহিত চিরমিলন! মিশিয়া থাকিতে চাই—জগতের সকল দুঃখ কষ্ট জ্বালা-যন্ত্রণা আপনার করিয়া লইব বলিয়া আমি ত্রিবিধ দুঃখের পারে যাইবার আকাঙ্ক্ষা করি না। থাকুক তোমার ইন্দ্রত্ব, ব্রহ্মত্ব, রসের রাজত্ব; তোমার কঠোর তপস্যার ফল তোমাতেই থাকুক—আমি, আমার এই বিরাট্ সর্ব্বস্ব ছেড়ে কোনো প্রকার মুক্তি কামনা করি না। আমি চাই—এই বিরাট্ ব্রহ্ম-চৈতন্যের প্রতি অণুতে কল্প কল্প মিশিয়া থাকিতে, যদি তোমার শিব ত্রিশূলের দ্বারা আমার এই পাঞ্চভৌতিক দেহ ভাঙ্গিয়া দেন, তবে আমি এই বিরাট্ প্রপঞ্চ ব্যোম্ ব্যোম্ রবে কাঁপাইয়া তুলিব! কত ভূত প্রেত, দানা দৈত্যের কর্ণে এই বীজমন্ত্র প্রদান করিব এবং সেখানেও এই সেবা-যজ্ঞ প্রতিষ্ঠা

করিব। যদি মুরলীধর বাঁশরী বাজাইয়া আমার চৈতন্য হরণ করেন, তবে আমি সেই মুরলীর তানে তানে মিশিয়া প্রতি জীবের হৃদিকন্দরে এই জীব-সেবার ভাব উদয় করিয়া বিচরণ করিতে থাকিব। আমার সাধ হয়, অনন্ত অনন্ত অংশে বিভক্ত হইয়া যুগ যুগ ধরিয়া এই বিরাট্ প্রপঞ্চের প্রতি অঙ্গ পূজা করি!

পূজা কথাটা আমি কি অর্থে ব্যবহার করিতেছি,তাহাই এখন তোমাদের বলিব। দুরদৃষ্ট বশতঃ বর্ত্তমানকালে পূজা বা সেবা বলিতে আমরা কেবল কান্নাকাটি, পদসেবা ও ঘণ্টা নাড়াই বুঝি। অর্থাৎ শূদ্রভাবের সেবা ব্যতীত অন্য কোন প্রকারের পূজা আমাদের মাথায় আসে না। যখন তুমি বুভুক্ষিতকে অন্ন দাও, অনাশ্রিতকে আশ্রয় দাও, কূপ, জলাশয়, হাসপাতাল স্থাপন কর, আমি বলি, তখন তুমি অজ্ঞাতসারে আমার জীবরূপধারী শিবকে বৈশ্যভাবে পূজা কর। যখন তুমি দুর্ব্বলকে দুর্দ্দান্ত সবলের কবল হইতে প্রহারের দ্বারা রক্ষা কর, দস্যু-তস্করকে ফাঁসিকাষ্ঠে টাঙ্গাইয়া মার অথবা বিপদে পতিত, শরণাগত জীবকে সশস্ত্র হইয়া আশ্রয় প্রদান কর, তখন তোমার ক্ষত্রিয়ভাবের পূজা সিদ্ধ হয়। আর যখন তুমি জীবকে আত্মতত্ত্বোপদেশ প্রদান করিয়া মোহভ্রান্তি, মিথ্যাজ্ঞান দূর করিতে প্রয়াস পাও, চারিদিকে মঙ্গল-চিন্তা প্রেরণ কর, সকল প্রাণীর 'শুভ হউক' প্রার্থনা কর, তখনি তুমি প্রকৃত ব্রাহ্মণের মত পূজা কর।

দেহে যখন আমার আত্মবুদ্ধি বিরাজ করিবে, তখন সকলদেহ আমার সেব্য,—নারায়ণের মন্দিরজ্ঞানে সেব্য। তখন আমি অতিথিপরায়ণ প্রভুভক্ত ভৃত্যের ন্যায় সেবারত। তখন আমার ঐ বিষয়ে উচ্চাবচ পাত্রা-পাত্রের ভেদ বিচার নাই। যে সম্মুখে কাতর হইয়া আসিয়া পড়িবে, যে শরীর-মনরূপ মন্দিরের সংস্কার প্রয়োজন হইবে, সেই তখন আমার উপাস্য, তাহাতে আমার ঘৃণা নাই, লজ্জা নাই, দ্বেষ নাই, হিংসা নাই; কারণ ও সকলি যে আমার প্রাণেশ্বরের মন্দির। শুধু তাহাই নয়, আমার দয়িত যে আবার ঐ মন্দিররূপেই অবস্থিত! তিনি ছাড়া আর কিছু আছে কি?

প্রাণে যখন আমার আত্মবুদ্ধি অবস্থিত থাকে, তখন জগতের কাতরধ্বনি আমাকে বড়ই মথিত করে! কোথাও একটু ব্যথা লাগিলে আমিও ব্যথা পাই, সমস্ত প্রাণের সহিত যে আমার সংযোগ রহিয়াছে। আমার এ প্রাণের উপাসনা বড় বৃহৎ ব্যাপার, বড় নিগূঢ় রহস্য, বড় সাবধানে ষোল আনা

মনে প্রাণে অনুষ্ঠেয়! সেজন্য আমাকে কখনও নয়নাশ্রু মুছাইয়া মধুর মাতৃ-নাম শুনাইয়া সান্ত্বনা দিতে হয়, কখনও রুদ্রমূর্ত্তিতে ঘৃণিত পশ্বাচার দমন করিতে হয়, কখনও ফল ফুল বিল্ব গঙ্গাজল ভোগ দিয়া জীবপ্রাণে বিরাটের ভালবাসা জাগাইয়া দিতে হয়, আবার কখন বা প্রচণ্ড বিক্রমে পাপে ভরা কোন জীর্ণ মন্দির নূতন করিয়া গড়িবার জন্য ধূলিসাৎ করিয়া পূজা সমাপ্ত করিতে হয়। আমার এ প্রাণের পূজা কি একঘেয়ে,এক রকমের? আমার এ প্রাণের ভালবাসার কথা কথায় বলিবার বুঝাইবার নয়। দু একটী জীবকে ভাল বসিয়া তুমি মনে কত আনন্দ পাও—ভাব দেখি. সকল প্রাণীর এই অনন্ত সৃষ্টির সকল হৃদয়ের সহিত তোমার হৃদয় যদি এক হইয়া যায়, যদি তোমার ভালবাসা দিকে দিকে উত্তরে দক্ষিণে পূর্ব্বে পশ্চিমে, ঊর্দ্ধে অধে চন্দ্রে সূর্য্যে, গ্রহে গ্রহে, তারায় তারায়, অনন্ত অনন্ত হৃদয়প্রস্রবণে ছড়াইয়া পড়ে, তবে,—কত আনন্দ হয়?

বুদ্ধিতে যখন আমার আত্মা প্রতিষ্ঠিত থাকে অর্থাৎ যখন আমি আপনাকে বিশুদ্ধমনবুদ্ধিময় পুরুষমাত্র বলিয়া দেখি, তখন এই বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ড শত সহস্র দীপ্তিতে আমার দিব্যদৃষ্টিতে প্রকাশিত, তখন সর্ব্ববস্তু এক চৈতন্যে ডুবিতেছে ভাসিতেছে অন্তর্ব্বহির্ব্যাপ্ত রহিয়াছে এবং আমার আত্মারামই সর্ব্বভূতে বিরাজিত এই কথাটী বোধে বোধ হয়। তখন সম্মুখে বিরাট্ প্রতিমা স্থাপন করিয়া সাধক আমি তন্মধ্যে বিলীন হইয়া যাই—আমার বহু যুগের কল্পিত প্রতিমা তখন চিন্ময় জ্যোতিতে জীবন্ত ভাবে পরিগণিত হয়।

আমি এই ভাবে দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর, জন্মের পর জন্ম বিরাট্ চৈতন্যের সেবায় রত থাকি,—এই আমার সাধন-প্রণালী। আমি জন্মিয়াছি যে আশ্রমে, বর্দ্ধিত হইয়াছি যাহাদের সঙ্গে, যাহাদের সুখদুঃখ আমি চিরদিন সমান ভাগ করিয়া লইয়াছি,আজ আমার এই পূর্ণ ভালবাসার দিনে প্রাণের পূর্ণ আবেগের মুহূর্ত্তে সে আশ্রম, সে সাথীদের ত্যাগ করিয়া কোন্ অরণ্যে, লোকালয়শূন্য গিরিগুহায় কি স্বার্থের উদ্দেশ্যে কোন্ অপরিচিতের সন্ধানে ঘুরিতে যাইব? জীবজগৎ বিশিষ্ট ব্রহ্ম—সবটা লইয়া তিনি—এ ভাবটা বরং একটু কল্পনার মধ্যে আমি আনিতে পারি, কিন্তু 'নেতি' 'নেতি,' কিছু নাই, সব মায়া, ভ্রান্তিমাত্র, এ প্রহেলিকা—জেগে ঘুমানর মত—আমি মোটেই ধরিতে পারি না। তাই গৃহ, ধন, জন, কাম, ক্রোধ, লোভ, একটী

একটী করিয়া ক্রমে সমস্ত ত্যাগ করা আমার আর হইল না, সবটাকেই আঁকড়ে ধরিয়া ভোগ করিবার চেষ্টাতে আছি। যখন আপনাকে সঙ্কুচিত করিয়া নির্জ্জনে বসিয়া ব্রহ্মে চিত্ত সমাধান করিতে অক্ষম হইলাম, তখন মন-প্রাণ এই প্রণালীতে আমি জগৎ-সংসারে ছড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম। এই সাধনায় দেখিলাম, কাম, ক্রোধ, লোভকে দমন করিতে হয় না, কেবল রাস ধরিয়া মোড় ফিরাইয়া দিতে হয়! ক্রমে ধন, জন, গৃহ, বন্ধনের কারণ না হইয়া আমার নিকট করুণারাণীর আবাসভূমি, ভালবাসার রঙ্গস্থল হইয়া উঠিল। দেখিলাম, দুঃখের মধ্যে মহামঙ্গল-চিহ্ন বর্ত্তমান, হাহাকারের আবর্ত্তের মধ্যে স্বর্গীয় আনন্দরাশি—মহাশান্তি বিরাজমান! কিন্তু এ পথও বড় কঠোর, বড় অন্ধকারময়, বড় বিভীষিকাপরিপূর্ণ। সারা জগতের মধ্যে থেকেও সময়ে সময়ে আপনাকে নিঃসঙ্গ বোধ হয়; সমস্ত বন্ধন, সকল হৃদয়গ্রন্থী যেন ছিন্ন ভিন্ন হ'য়ে যায়। কিন্তু এই পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই একটু সাধনার ফলেই এমন এক মহাতেজ শক্তি আনন্দ অনুভূত হয় যে, আর শুষ্ক বা হতাশ ভাব আসে না। একদিকে যেমন ভালবাসিতে যাইয়া সংসারের রক্তনেত্রের ক্রূর অবজ্ঞাদৃষ্টি সহ্য করিতে হয়, তেমনি আবার ভালবাসার সামগ্রীর প্রেমপ্রতিদান এবং প্রাণটা সকলকে ঢালিয়া দিবার আনন্দ ফলস্বরূপ পাওয়া যায়। সময়ে সময়ে একলা বসিয়া সারা জগতের সঙ্গে যখন প্রাণটা মিলাইয়া মজা করা যায়, তখনকার এক মুহূর্ত্তের নেশা কি শত সহস্র বৎসরেরও জ্বালাযন্ত্রণার সঙ্গে তুলনা হয়? এই পথের সাধক যখন হাসিমুখে সংসারের সহস্র বিপদের মুখে এগিয়ে যান, তাঁহার তখনকার তেজ ও আনন্দের সঙ্গে পার্থিব কোন কর্ম্মের কি তুলনা হয়, আমি শুনিয়াছি, এবং বুঝিয়াছি যে সাধনার পদে পদে শক্তির উপলব্ধি হয়, প্রমাদ বিনষ্ট হয়, বুদ্ধি অবিচলিত ও প্রসন্ন থাকে, তাহাই প্রশস্ত পথ। এই আশ্বাস ও বিশ্বাসেই এই প্রণালীর আমি এত পক্ষপাতী।

ভাই, এই ভাবের জীব-শিবের পূজা জগতে এক নূতন ব্যাপার। গুরু, সাধু, সন্ন্যাসী অবতার ইঁহারা চিরদিনই দেবতাজ্ঞানে পূজা পাইয়া আসিয়াছেন। তাঁহারা বসিয়া থাকেন খুব উচ্চ আসনে। ভয় ও সংস্কার—ভক্তের ঘাড়টী ধরিয়া তাঁহাদের ভোগ ও পূজা দেওয়ান। কিন্তু বিজাতি বিধর্ম্মী অস্পৃশ্যকে 'গোপাল' বলিয়া আদর করা, রাস্তার মুটে মজুরকে

ঠাকুরের আসনে বসাইয়া ফুলবিল্বে পূজা করা, কুষ্ঠরোগীকে শিবজ্ঞানে বুকে করিয়া শুশ্রূষা করা, আর কখনো কি শুনিয়াছ? এ পূজা করিতে করিতে ভক্তের হৃদয়ে প্রেম-প্রবাহ উথলিয়া উঠে, করুণা-অশ্রুতে বুক ভাসিয়া যায়, সেব্য সেবক উভয়ই এক ভালবাসার সাগরে ডুবিয়া যায়। এ ত শুধু জীবে দয়া নহে, এ যে ব্রহ্মজ্ঞানে জীবের পূজা। এখানে দাতা সেবক; দয়ার পাত্র! আর সেব্য, স্বয়ং প্রভু পূজাপ্রার্থী। এখানে দাতা করযোড়ে হেটমুণ্ডে পূজা প্রদান করিয়া আপনাকে সৌভাগ্যবান মনে করিতেছে!

ভাই, এবারকার যুগাবতার প্রেম-ভালবাসার জোরে ভগবান্‌কে তাঁহার গুপ্ত আসন হইতে টানিয়া আনিয়া সারা জগৎময় ছড়াইয়া দিয়াছেন, যে যত পার প্রাণ ভরিয়া পূজা কর! ঐ দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচী, মেথর, তোমার ভাই, তোমার নারায়ণ পূজা প্রার্থী হইয়া আসিয়াছেন, তোমার নিকটে। ভাগ্যবান তুমি শীঘ্র তাঁহাকে আদর করিয়া ডাকিয়া লও। তোমার মনুষ্যজন্ম সার্থক কর। ঘরে ঘরে, পথে ঘাটে, হাটে মাঠে, নারায়ণ বিরাজ করিতেছেন, যে যে ভাবে পার, তাঁহার সেবা কর।

———o———
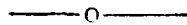
সায়ংকাল।

(১)

পশ্চিম আকাশ ওই সিন্দূরে রঞ্জিয়া,
ধীরে ধীরে, দিনমণি অস্তাচলে গেল,
শান্তি, প্রেম, পবিত্রতা গায়েতে মাখিয়া,—
হীরকের হার পরি সন্ধ্যা দেবী এল!

(২)

বালক, যে ধূলা-খেলা করিতে তৎপর,
মানেনা শোনেনা কথা কাহারও কখন,
অবাধ্যতা পরিহরি, প্রফুল্ল অন্তর,
সেও এবে গৃহমুখে করিছে গমন!

(৩)

উচ্চ-কোলাহলপূর্ণ যে পৃথিবী ছিল.
ঘাত-প্রতিঘাতে যার শ্রবণ বধির,
কি সুন্দর শান্ত ভাব এবে সে ধরিল ,—
ফুল্ল কমনীয় ভাসা বদনে মহীর !

(৪)

দূরে গেল গুরুতর কার্য্য দিবসের,
ভক্তি স্নেহ সাম্যভাব উদিল অন্তরে,
অস্থায়িত্ব নশ্বরতা এই জীবনের,
বুঝিল মনুষ্য যেন ক্ষণিকের তরে !

শ্রীশরচ্চন্দ্র চৌধুরী

স্তোত্র

জয় নারায়ণ নিখিল কারণ
হরি রাধিকারমণ।
পতিতপাবন মদনমোহন
বিভু পরম শরণ ॥
জয় গদাধর অমৃত সাগর
প্রেমময় প্রাণাধার।
করুণা-নিধান সর্ব্বশক্তিমান্,
অন্তহীন নিরাকার ॥
জগদ্‌-বিহারী ভবভয়হারী
তুমি মঙ্গল-নিদান।
অসীম অক্ষয় অচিন্ত্য অভয়
তুমি পুরুষ পুরাণ ॥
আমি অভাজন না জানি পূজন
তার অধম-তারণ।
এস প্রাণসখা হৃদে দাও দেখা
ওহে হৃদয়-রঞ্জন ॥

মায়া অন্ধকারে ঘিরেছে আমারে
হ'য়ে আছি হতজ্ঞান।
এ ভব দুস্পারে কে তারিবে মোরে
কর নাথ পরিত্রাণ॥
ওহে বিশ্বপতি! এ মম মিনতি—
দাও অভয় চরণ।
শেষের সে দিনে দীন হীন জনে
দেখো ভকতজীবন।

শ্রীঅন্নদা প্রসাদ ঘোষ।

সার কথা।

(১)

একদিন মহম্মদের নিকট কয়েক জন উন্নত সাধু আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন বলিলেন, আমি সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া নমাজ পড়ি। দ্বিতীয় জন বলিলেন, আমি সমস্ত দিন উপবাস করিয়া ঈশ্বরের ভজনা করি। তৃতীয় জন বলিলেন, আমি চিরজীবন কুমারভাবে অবস্থান করিতেছি। এইরূপ নানা জনে নানারূপ বলায় পরে মহম্মদ বলিলেন ভাই সকল, আমার তোমাদের মত তপস্যা করা ভাগ্যে নাই; আমি যত-টুকু পারি ঈশ্বরকে হৃদয়ের সহিত প্রেম করিবারই চেষ্টা করি। আমার মত ক্ষুদ্র মানব ইহা অপেক্ষা অধিক আর কি করিতে পারে। দেখনা আমি, কোনরূপ নিঃমই চিরদিন রাখিতে পারি না। আমি রোজাও করি—রোজা ভঙ্গও করি—নমাজও পড়ি—নিদ্রাও যাই। বিবাহও করিযাছি।

(২)

হজরতের সহচর আবুজহম তাঁহাকে একদা একখানি খসিমা (কারুকার্য্য-যুক্ত উৎকৃষ্ট কৃষ্ণ কম্বল) উপহার দেন। তাহা গায়ে দিয়া মহম্মদ উপা-সনা করিবার কালে কম্বলের কারুকার্য্যে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। উপা-সনান্তে ঐ খসিমা ফিরাইয়া দিয়া আবুজহমের নিকট হইতে মহম্মদ একখানি নিকৃষ্ট কম্বল চাহিয়া লইলেন।

(৩)

মহম্মদ একজন জ্বররোগে প্রপীড়িত লোকের নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "তুমি কাঁপিতেছ কেন"? তাহাতে রোগী বলিল, ঈশ্বর আমার মঙ্গল বিধান করিতেছেন না—জ্বর হইয়াছে। তদুত্তরে মহম্মদ বলিলেন, "তুমি ঈশ্বরের নিন্দা করিও না, জ্বরের নিন্দা করিও না, লৌহকার যেমন লৌহের মলিনতা অপনয়ন করে, তদ্রূপ রোগাদিদ্বারা জীবের পাপ খণ্ডিত হয়।"

(৪)

কথিত আছে, একজন কৃষ্ণাঙ্গনারী কাবামন্দিরে ঝাড়ু দিত। একদিন মহম্মদ তাহার দর্শন না পাইয়া উপস্থিত মণ্ডলীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ঐ স্ত্রীলোকটী কোথায়? তদুত্তরে তাহার মৃত্যু হইয়াছে শ্রবণ করিয়া মহম্মদ তৎক্ষণাৎ তাহার গোরস্থানে গিয়ে নমাজ পড়িলেন এবং তদুপরি এক প্রকাণ্ড মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন।

(৫)

একদিন মহম্মদের নিকট একজন দরিদ্র ভিক্ষার্থী হয়। তাহাকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল "আমার একখানি মাত্র ছেঁড়া কম্বল আছে; তাহাব অর্দ্ধেকে দেহাচ্ছাদন করি;—আর অর্দ্ধেকে শুইয়া থাকি—আর এক দারুপাত্রে জল খাই।" মহম্মদ তাহাকে তৎক্ষণাৎ ঐ কম্বল ও জলপাত্র আনিতে আদেশ করিলেন। উহা প্রকাশ্যে নিজে নিলাম করিয়া দুইমুদ্রা প্রাপ্ত হইয়া ঐ দরিদ্রকে বলেন, তুমি এই দুই মুদ্রা দ্বারা কাষ্ঠছেদন করিয়া বিক্রয় কর। আর ১৫ দিন আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও না। পনর দিন পরে ঐ দরিদ্র ১০ মুদ্রা লাভ করিয়া মহম্মদের সঙ্গে দেখা করায় তিনি বলেন, তুমি এইরূপেই জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। কখন সামর্থ্য সত্ত্বে পরমুখাপেক্ষী হইও না।

(৬)

একদা কোন এক মুসল্‌মান্ মহম্মদের স্ত্রী ওম্মসেলমাকে এক খণ্ড মাংস উপহার দেয়। মহম্মদ মাংসপ্রিয় ছিলেন বলিয়া তাঁহার স্ত্রী যত্ন করিয়া তাহা রাখিয়া দেন। ইতিমধ্যে এক ক্ষুধার্ত্ত ভিক্ষুক মহম্মদের গৃহে ভিক্ষার্থী হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হয়। মহম্মদ গৃহে আসিলে তাঁহার স্ত্রী ঐ মাংস আনিতে গিয়া দেখেন, তাহা একখানি শ্বেত প্রস্তরে পরিণত হইয়াছে। ঐ

ঘটনা শ্রবণ করিয়া হজ্‌রত বলিলেন "নিশ্চয় ঐ মাংস প্রস্তরে পরিণত হইয়াছে—কারণ, উহা ভিক্ষার্থীকে দান না করিয়া আমার জন্য রাখা হইয়াছিল।"

(৭)

একজন এস্রাইলবংশীয় লোক ৯৯ জন লোককে বধ করিয়া নিজের পরিণাম চিন্তা করিয়া নিতান্ত বিষন্ন হন। এবং একজন সন্ন্যাসীকে প্রাপ্ত হইয়া নিজের পাপমুক্তির জন্য প্রার্থনা করেন।

সাধু তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন "ওহে এস্রাইল! তোমার ভয় নাই! ঈশ্বরের এত দয়া যে তিনি জীবের সকল পাপের এক মুহূর্ত্তে খণ্ডন করিয়া দেন। ভক্তিপূর্ণ চিত্তে এই কথা শুনিতে শুনিতে ঐ দস্যুর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পর দেখা গেল, দেবদূতগণ তাহাকে স্বর্গলোকে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে।"

(৮)

একদা একজন যুবক বৃদ্ধ পিতামাতা বর্ত্তমান থাকিতেও জেহাদ প্রস্থানে মোহম্মদের অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তাহাতে মোহম্মদ বলেন তুমি বৃদ্ধ পিতামাতার সেবাতে নিযুক্ত থাক উহাই যথার্থ জেহাদ (ধর্ম্মযুদ্ধ)।

(৯)

কালে একখানা রুটীর দাম একটী পেনি (প্রায় তিন পয়সা) লইয়া গৃহের বাহির হইয়াছেন, এমন সময় আবার দৈববাণী শুনিতে পাইলেন "Still with a penny ?" এখানও একটী পেনির মমতা ছাড়িতে পারিলে না ? ঐ দৈবাদেশ শ্রবণ করিয়া স্ত্রীলোকটী পেনিটী দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন , এবং যিশুর নাম করিতে করিতে যে কোথায় চলিয়া গেলেন, তাহার আর ঠিকানা হইল না।

(১০)

শ্রীরামানুজ স্বামী যখন গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেন, তখন তাঁহার গুরু বলিয়া দেন "বৎস! এই মন্ত্র একবার যাহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয়, সে তৎক্ষণাৎ মুক্ত হইয়া যায়। কিন্তু তুমি মন্ত্র প্রকাশ করিয়া যেন গুরুশাপগ্রস্ত ও নরকস্থ হইও না। রামানুজ স্বামী যখন শ্রীরঙ্গমে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন বহুলোক তাঁহার কৃপাপ্রার্থী হয়। একদিন বহুলোকসমক্ষে গুরুদত্ত ঐ মন্ত্র তিনি উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়া বলেন, এই মন্ত্র যাহাদের কর্ণে প্রবেশ করিবে, তাহারাই মুক্ত হইয়া যাইবে।" গুরু আজ্ঞার লঙ্ঘনজনিত পাপের কথা স্মরণ করিয়া রামানুজ স্বামী বলিয়াছিলেন "আমার ন্যায় একজন সামান্য

মানুষের নরক ভোগ হইয়াও যদি এতগুলি লোকের মুক্তি সাধন হয় ত সে নরকভোগ আমার অভিপ্সীত স্বর্গ।"

(১১)

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভ্রাতষ্পুত্র পূজনীয় শ্রীযুক্ত রামলাল চট্টোপাধ্যায়ের নিকট অবগত হওয়া যায়, দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ীর ফটকের উত্তরাংশে যে কতকগুলি বাঁশের ঝাড় অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে, তথায় উস্তাগর নামে একজন বৃদ্ধ মুসলমান্ সাধু বাস করিতেন। তাঁহাকে প্রায়ই রামকৃষ্ণদেবের নিকট আগমন করিতে দেখা যাইত। ঐ বৃদ্ধ মুসলমান্ আসিয়া ঠাকুর যে ঘরে থাকিতেন তার উত্তরের বারেন্দায় বসিয়া থাকিতেন। ঠাকুর তাঁহাকে দেখিয়া উঠিয়া আসিতেন; এবং মুসলমান্ ধর্ম্ম সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিতেন। রামলাল দাদা বলেন, ঠাকুর তাঁহাকে প্রতিদিনই কিছু না কিছু খাবার দিতেন; তিনি সেলাম্ করিতে করিতে তাহা মাথায় করিয়া লইয়া যাইতেন। ঠাকুরের কথা শুনিয়া তিনি কখনো বা অশ্রুপাত করিতেন; কখনো বা বলিতেন, "তুমিই আমাদের আল্লা। দেহ ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছ।"

——o——

সংবাদ ও মন্তব্য।

গত ১৮ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার, বেলুড় মঠে ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের অষ্টসপ্ততিতম জন্মতিথি উপলক্ষে তিথি পূজা ও হোমাদি হইয়াছিল এবং বহু অন্তরঙ্গ ভক্তগণের সমাগম হইয়াছিল। পরে ২১শে ফাল্গুন রবিবারের দিন সাধারণের জন্য জন্মমহোৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছিল। প্রায় ৬০ হাজার লোকের সমাগম হইয়াছিল। হোর মিলার কোম্পানির ৪ খানি ষ্টীমার রাত্র ৯টা পর্য্যন্ত কলিকাতা হইতে ক্রমাগত যাতায়াত করিয়াছিল। অন্যান্য বৎসরের মত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের প্রতিমূর্ত্তি নানাবিধ পত্র পুষ্পে সুশোভিত করিয়া একটি মণ্ডপে রাখা হইয়াছিল। স্থানে স্থানে সামিযানার ভিতর বসিয়া বিবিধ গায়ক মণ্ডলী ও কনসার্ট পার্টিরা ভগবৎগুণানুকীর্ত্তন ও সঙ্গীতালাপে আগন্তুক জনসাধারণকে ভক্তিরসাপ্লুত করিতেছিলেন। চারিদিকেই যেন আনন্দের মহান্ উৎস ছুটিয়াছিল। সকলের প্রাণেই সেই অদ্ভুত দেবমানবের বিচিত্র লীলার কথা জাগিতেছিল দর্শক মাত্রেই সেদিন তাঁহার মহিয়সী শক্তির আভাস প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়াছিলেন সারা দিন ধরিয়া সমাগত জনসাধারণকে প্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

উক্ত ২১শে ফাল্গুন রবিবার, রামকৃষ্ণ মিশনের যাবতীয় কেন্দ্রে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের জন্ম মহোৎসব মহা সমারোহে সম্পাদিত হইয়াছিল।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ

গুরুভাব সম্বন্ধে শেষ কথা

[স্বামী সারদানন্দ]
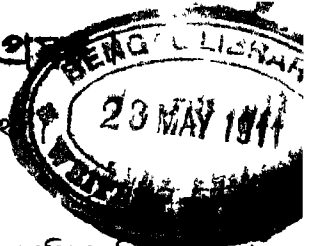
উচ্চ ভাবভূমিকায় উঠিয়া প্রত্যেক স্থান, বস্তু বা ব্যক্তির ভিতরের ভাব পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ধরা এবং বুঝা সম্বন্ধে ঠাকুরের মনের যে অদ্ভুত শক্তি আমরা নিত্য প্রত্যক্ষ করিতাম, তন্মধ্যে আরও দুই একটির এখানে উল্লেখ করিয়া আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধ আরম্ভ করিব।

উদারচেতা স্বামী বিবেকানন্দের মন বাল্যকালাবধি পরদুঃখে কাতর হইত। সেজন্য তিনি যাহাতে বা যাঁহার সাহায্যে আপনাকে কোনও বিষয়ে উপকৃত বোধ করিতেন, তাহা করিতে বা তাঁহার নিকটে ঐরূপ সাহায্য পাইবার জন্য গমন করিতে আপন আত্মীয় বন্ধু বান্ধব সকলকে সর্ব্বদা উৎসাহিত করিতেন। লেখাপড়া ধর্ম্ম কর্ম্ম সকল বিষয়েই স্বামীজির মনের ঐ প্রকার রীতি ছিল। কলেজে পড়িবার সময় সহপাঠীদিগকে লইয়া নানাস্থানে নিয়মিত দিনে প্রার্থনা ও ধ্যানাদি অনুষ্ঠানের জন্য সভা সমিতি গঠন করা, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও ভক্ত্যাচার্য্য কেশবের সহিত স্বয়ং পরিচিত হইবার পরেই সহপাঠীদিগের ভিতর অনেককে উঁহাদের দর্শনের জন্য লইয়া যাওয়া প্রভৃতি যৌবনে পদার্পণ করিয়াই স্বামীজির জীবনে অনুষ্ঠিত কার্য্যগুলি দেখিয়া আমরা পূর্ব্বোক্ত বিষয়ের পরিচয় পাইয়া থাকি।

ঠাকুরের পুণ্য দর্শন লাভ করিয়া তাঁহার অদৃষ্টপূর্ব্ব ত্যাগ বৈরাগ্য ও ঈশ্বর-প্রেমের পরিচয় পাওয়া অবধি নিজ সহপাঠী বন্ধুদিগকে তাঁহার নিকটে লইয়া যাইয়া তাঁহার সহিত পরিচিত করিয়া দেওয়া স্বামীজির জীবনে একটা ব্রত-বিশেষ হইয়া উঠিয়াছিল। আমরা একথা বলিতেছি বলিয়া কেহ যেন না ভাবিয়া বসেন যে, বুদ্ধিমান স্বামীজি একদিনের আলাপে কাহারও প্রতি আকৃষ্ট হইলেই তাহাকে ঠাকুরের নিকট লইয়া যাইতেন। অনেক দিন পরিচয়ের ফলে যাহাদিগকে সৎস্বভাববিশিষ্ট এবং ধর্ম্মানুরাগী বলিয়া বুঝিতেন, তাহাদিগকেই সঙ্গে করিয়া দক্ষিণেশ্বরে লইয়া যাইতেন।

স্বামীজি ঐরূপে অনেকগুলি বন্ধুবান্ধবকেই তখন ঠাকুরের নিকট লইয়া গিয়াছিলেন; কিন্তু ঠাকুরের দিব্যদৃষ্টি তাহাদের অন্তর দেখিয়া অন্যরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিল, একথা আমরা ঠাকুর ও স্বামীজি উভয়েরই

মুখে সময়ে সময়ে শুনিয়াছি। স্বামীজি বলিতেন—"ঠাকুর আমাকে গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মসম্বন্ধীয় শিক্ষাদি দানে আমার উপর যেরূপ কৃপা করিতেন, সেরূপ কৃপা তাহাদিগকে না করায় আমি তাঁহাকে ঐরূপ করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিয়া বসিতাম। বালস্বভাব বশতঃ অনেক সময় তাঁহার সহিত কোমর বাঁধিয়া তর্ক করিতেও উদ্যত হইতাম! বলিতাম—'কেন মশায়, ঈশ্বর তো আর পক্ষপাতী নন যে, এক জনকে কৃপা কর্‌বেন এবং আর এক জনকে কৃপা কর্‌বেন না? তবে কেন আপনি উহাদের আমার ন্যায় গ্রহণ কর্‌বেন না? ইচ্ছা ও চেষ্টা করলে সকলেই যেমন বিদ্বান্ পণ্ডিত হ'তে পারে, ধর্ম্মলাভ, ঈশ্বরলাভও যে তেমনি করতে পারে, এ কথা তো নিশ্চয়?' তাহাতে ঠাকুর বলিতেন—'কি কোর্‌বো রে—আমাকে মা যে দেখিয়ে দিচ্চে, ওদের ভিতর ষাঁড়ের মত পশুভাব রয়েছে, ওদের এ জন্মে ধর্ম্মলাভ হবে না - তা আমি কি কোর্‌বো? তোর্ ও কি কথা? ইচ্ছা ও চেষ্টা কর্‌লেই কি লোকে এ জন্মে যা ইচ্ছা তাই হ'তে পারে?' ঠাকুরের ওকথা তখন শোনে কে? আমি বলিতাম—'সে কি মশায়, ইচ্ছা ও চেষ্টা করলে যার যা ইচ্ছা তা হতে পারে না? নিশ্চয়ই পারে। আমি আপনার ওকথায় বিশ্বাস কর্‌তে পাচ্চি না।' ঠাকুরের তাহাতেও ঐ কথা—'তুই বিশ্বাস করিস্ আর নাই করিস্, মা যে আমায় দেখিয়ে দিচ্চে!' আমিও তখন তাঁর কথা কিছুতেই স্বীকার করতুম না। তার পর যত দিন যেতে লাগ্‌লো, দেখে শুনে তত বুঝতে লাগ্‌লুম—ঠাকুর যা বলেছেন তাই সত্য, আমার ধারণাই মিথ্যা!"

স্বামীজি বলিতেন—এইরূপে যাচাইয়া বাজাইয়া লইয়া তবে তিনি ঠাকুরের সকল কথায় ক্রমে ক্রমে বিশ্বাসী হইতে পারিয়াছিলেন। ঠাকুরের প্রত্যেক কথা ও ব্যবহার ঐরূপে পরীক্ষা করিয়া লওয়া সম্বন্ধে আর একটি ঘটনার কথা আমরা স্বামীজির নিকট হইতে যেরূপ শুনিয়াছি, এখানে দিলে মন্দ হইবে না। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের রথযাত্রার দিনে ঠাকুর স্বামীজির নিকট হইতে শুনিয়া পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণিকে দেখিতে গিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীজগদম্বার নিকট হইতে সাক্ষাৎ ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিই যথার্থ ধর্ম্মপ্রচারে সক্ষম, অপর সকল প্রচারক-নামধারীর বাগাড়ম্বর বৃথা—পণ্ডিতজিকে ঐরূপ নানা উপদেশ দানের পর ঠাকুর পান করিবার জন্য এক গেলাস জল চাহিলেন। ঠাকুর যথার্থ তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া ঐরূপে জল চাহিলেন অথবা তাঁহার

অন্য উদ্দেশ্য ছিল তাহা আমরা ঠিক্ বলিতে পারি না। কারণ, ঠাকুর অন্য এক সময়ে আমাদের বলিয়াছিলেন যে, সাধু, সন্ন্যাসী, অতিথি, ফকিরেরা কোন গৃহস্থের বাটীতে যাইয়া যাহা হয় কিছু খাইয়া না আসিলে তাহাতে গৃহস্থের অকল্যাণ হয় এবং সেজন্য তিনি যাহার বাটীতেই যান না কেন, তাহারা না বলিলে বা ভুলিয়া গেলেও স্বয়ং তাহার নিকট হইতে চাহিয়া লইয়া কিছু না কিছু খাইয়া আসেন।

সে যাহা হউক, এখানে জল চাহিবামাত্র তিলক কণ্ঠী প্রভৃতি ধর্ম্মলিঙ্গ-ধারী এক ব্যক্তি সসম্ভ্রমে ঠাকুরকে এক গেলাস জল আনিয়া দিলেন। ঠাকুর কিন্তু ঐ জল পান করিতে যাইয়া উহা পান করিতে পারিলেন না। নিকটস্থ অপর এক ব্যক্তিকে গেলাসের জলটি ফেলিযা দিয়া আর এক গেলাস জল আনিতে বলিলেন এবং সে ব্যক্তি উহা আনিবামাত্র উহার কিঞ্চিৎ পান করিয়া পণ্ডিতজির নিকট হইতে সেদিনকার মত বিদায় গ্রহণ করিলেন। সকলে বুঝিল, পূর্ব্বানীত জলে কিছু পড়িয়াছিল বলিয়াই ঠাকুর উহা পান করিলেন না।

স্বামীজি বলিতেন—তিনি তখন ঠাকুরের অতি নিকটেই বসিয়াছিলেন, সেজন্য বিশেষ করিয়া দেখিয়াছিলেন, গেলাসের জলে কুটো-কাটা কিছুই পড়ে নাই, অথচ ঠাকুর উহা পান করিতে আপত্তি করিয়া অন্য জল আনা-ইলেন। ঐ বিষয়ের কারণানুসন্ধান করিতে যাইয়া স্বামীজি মনে মনে স্থির করিলেন, তবে বোধ হয় জল-গেলাসটি স্পর্শদোষদুষ্ট হইয়াছে। কারণ, ইতিপূর্ব্বেই তিনি ঠাকুরকে বলিতে শুনিযাছিলেন যে, যাহাদের ভিতর বিষয়বুদ্ধি অত্যন্ত প্রবল, যাহারা জুয়াচুরি বাটপাড়ি এবং অপরের অনিষ্ট সাধন করিয়া অসদুপায়ে উপার্জ্জন করে এবং যাহারা কাম-কাঞ্চন-লাভের সহায় হইবে বলিয়া বাহিরে ধর্ম্মের ভেক ধারণ করিয়া লোককে প্রতারিত করে, তাহারা কোনওরূপ খাদ্য পানীয় আনিযা দিলে তাঁহার হস্ত উহা গ্রহণ করিতে যাইলেও কিছুদূর যাইয়া আর অগ্রসর হয় না, পশ্চাতে গুটাইয়া আসে এবং তিনি উহা তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারেন!

স্বামীজি বলিতেন, ঐ কথা মনে উদয় হইবামাত্র তিনি ঐ বিষয়ের সত্যাসত্য নির্দ্ধারণের জন্য দৃঢ়সংকল্প করিলেন এবং ঠাকুর স্বয়ং তাঁহাকে সেদিন তাঁহার সহিত আসিতে অনুরোধ করিলেও 'বিশেষ কোনও আবশ্যক আছে, সেজন্য যাইতে পারিতেছি না' বলিয়া বুঝাইয়া তাঁহাকে গাড়ীতে

উঠাইয়া দিলেন। ঠাকুর চলিয়া যাইলে স্বামীজি পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মলিঙ্গধারী ব্যক্তির কনিষ্ঠ ভ্রাতার সহিত পূর্ব্ব হইতে পরিচয় থাকায় তাহাকে একান্তে ডাকিয়া তাহার অগ্রজের চরিত্র সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। ঐরূপে জিজ্ঞাসিত হইলে সে ব্যক্তি বিশেষ ইতস্ততঃ করিয়া অবশেষে বলিল, 'জ্যেষ্ঠের দোষের কথা কেমন করিয়া বলি' ইত্যাদি! স্বামীজি বলিতেন—"আমি তাহাতেই বুঝিয়া লইলাম। পরে ঐ বাটীর অপর একজন পরিচিত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিয়া সকল কথা জানিয়া ঐ বিষয়ে নিঃসংশয় হইলাম এবং অবাক্ হইয়া ভাবিতে লাগিলাম—ঠাকুর কেমন করিয়া লোকের অন্তরের কথা ঐরূপে জানিতে পারেন!"

সাধারণ ভাবভূমিতে থাকিবার কালে ঠাকুর যেরূপে সকল পদার্থের অন্তর্নিহিত গুণাগুণ ধরিতেন ও বুঝিতেন, তাহার পরিচয় পাইতে হইলে আমাদিগকে প্রথমে তাঁহার মানসিক গঠন কি প্রকারের ছিল, তাহা বুঝিতে হইবে এবং পরে কোন্ পদার্থটিকে পরিমাপক-স্বরূপে সর্ব্বদা স্থির রাখিয়া তিনি অপর সকল বস্তু ও বিষয় সকল পরিমাণ করিয়া তৎসম্বন্ধে একটা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেন, তাহাও ধরিতে হইবে। লীলাপ্রসঙ্গে স্থানে স্থানে ঐ বিষয়ের কিছু কিছু আভাষ আমরা পাঠককে ইতিপূর্ব্বেই দিয়াছি। অতএব এখন উহার সংক্ষেপ উল্লেখমাত্র করিলেই চলিবে। আমরা দেখিয়াছি, ঠাকুরের মন পার্থিব কোন পদার্থে আসক্ত না থাকায় তিনি যখনই যাহা গ্রহণ বা ত্যাগ করিবেন মনে করিযাছেন, তখনি উহা ঐ বিষয়ে সম্যক্ যুক্ত বা উহা হইতে সম্যক্ পৃথক্ হইযা দাঁড়াইযাছে। পৃথক্ হইবার পর আজীবন আর ঐ বিষয়ের প্রতি এক বারও ফিরিয়া দেখেন নাই। আবার ঠাকুরের অদৃষ্টপূর্ব্ব নিষ্ঠা, অদ্ভুত বিচারশীলতা এবং ঐকান্তিক একাগ্রতা তাঁহার মনের হস্ত সর্ব্বদা ধারণ করিযা উহাকে যাহাতে ইচ্ছা, যতদিন ইচ্ছা এবং যেখানে ইচ্ছা স্থিরভাবে রাখিয়াছে। এক ক্ষণের জন্যও উহাকে ঐ বিষয়ের বিপরীত চিন্তা বা কল্পনা করিতে দেয় নাই। কোনও বিষয় ত্যাগ বা গ্রহণ করিতে যাইবামাত্র এ মনের এক ভাগ বলিয়া উঠিত, কেন ঐরূপ করিতেছ তাহা বল; আর যদি ঐ প্রশ্নের যথাযথ যুক্তিসহ মীমাংসা পাইত তবেই বলিত, বেশ কথা, ঐরূপ কর। আবার ঐরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবামাত্র ঐ মনের অন্য এক ভাগ বলিয়া উঠিত—তবে পাকা করিয়া উহা ধর, শয়নে স্বপনে ভোজনে বিরামে কখন উহার বিপরীত-

অনুষ্ঠান আর করিতে পারিবে না। তৎপরে তাঁহার সমগ্র মন একতানে ঐ বিষয় গ্রহণ করিয়া তদনুকূল অনুষ্ঠান করিতে থাকিত এবং নিষ্ঠা প্রহরি-স্বরূপে এরূপ সতর্কভাবে উহার ঐ বিষয়ক কার্য্যকলাপ সর্ব্বদা দেখিত যে, সহসা ভুলিয়া ঠাকুর তদ্বিপরীতানুষ্ঠান করিতে যাইলে স্পষ্ট বোধ করিতেন, ভিতর হইতে কে যেন তাঁহার ইন্দ্রিয়নিচয়কে বাঁধিয়া রাখিয়াছে—ঐরূপ অনুষ্ঠান করিতে দিতেছে না। ঠাকুরের আজীবন সকল বস্তু ও ব্যক্তির সহিত ব্যবহারের আলোচনা করিলেই আমাদের পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি হৃদয়ঙ্গম হইবে।

দেখনা—বালক গদাধর কয়েকদিন পাঠশালে যাইতে না যাইতে বলিয়া বসিলেন, 'ও চাল কলা বাঁধা বিদ্যাতে আমার কাজ নাই, ও বিদ্যা আমি শিখ্‌ব না!' ঠাকুরের অগ্রজ রামকুমার,ভ্রাতা উচ্ছৃঙ্খল হইয়া যাইতেছে ভাবিয়া কিছুকাল পরে বুঝাইয়া সুঝাইয়া কলিকাতায় আপনার টোলে, নিজের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া ঐ বিদ্যা শিখাইবার প্রয়াস পাইলেও ঠাকুরের অর্থকরী বিদ্যা সম্বন্ধে বাল্যকালের ঐ মত ঘুরাইতে পারিলেন না! শুধু তাহাই নহে. নিষ্ঠাচারী পণ্ডিত হইয়া টোল খুলিয়া যথাসাধ্য শিক্ষাদান করিয়াও পরিবারবর্গের অন্নবস্ত্রের অভাব মিটাইতে পারিলেন না বলিয়াই যে অনন্যোপায় অগ্রজের রাণী রাসমণির দেবালয়ে পৌরোহিত্য স্বীকার—এ কথাও ঠাকুরের নিকট লুক্কায়িত রহিল না এবং ধনীদিগের তোষামোদ করিয়া উপার্জ্জনাপেক্ষা অগ্রজের ঐরূপ করা অনেক ভাল বুঝিয়া উহাতে তিনি অনুমোদনও করিলেন।

দেখনা—সাধনকালে ঠাকুর ধ্যান করিতে বসিবামাত্র তাঁহার অনুভব হইতে লাগিল, তাঁহার শরীরের প্রত্যেক সন্ধিস্থানগুলিতে খট্ খট্ করিয়া আওয়াজ হইয়া বন্ধ হইয়া গেল। তিনি যে ভাবে আসন করিয়া বসিয়াছেন, সেই ভাবে অনেক ক্ষণ তাঁহাকে বসাইয়া রাখিবার জন্য কে যেন ভিতর হইতে ঐ সকল স্থানে চাবি লাগাইয়া দিল। যতক্ষণ না আবার সে খুলিয়া দিল, ততক্ষণ হাত পা গ্রীবা কোমর প্রভৃতি স্থানের সন্ধিগুলি তিনি আমাদের মত ফিরাইতে ঘুরাইতে যথা ইচ্ছা ব্যবহার করিতে চেষ্টা করিলেও কিছুকাল আর তদ্রূপ করিতে পারিলেন না!—অথবা দেখিলেন, শূল হস্তে এক ব্যক্তি নিকটে বসিয়া রহিয়াছে এবং বলিতেছে 'যদি ঈশ্বরচিন্তা ভিন্ন অপর চিন্তা করিবি, তো এই শূল তোর বুকে বসাইয়া দিব!'

দেখনা—পূজা করিতে বসিয়া আপনাকে জগদম্বার সহিত অভেদজ্ঞান করিতে বলিবামাত্র মন তাহাই করিতে লাগিল জগদম্বার পাদপদ্মে বিল্বজবা দিতে যাইলেও ঠাকুরের হাত কে যেন ঘুরাইয়া নিজ মস্তকের দিকেই টানিয়া লইয়া চলিল! অথবা দেখ—সন্ন্যাস দীক্ষা গ্রহণ করিবামাত্র মন সর্ব্বভূতে এক অদ্বৈত ব্রহ্মদর্শন করিতেই থাকিল। অভ্যাস বশতঃ ঠাকুর ঐ কালে পিতৃ তর্পণ করিতে যাইলেও হাত আড়ষ্ট হইয়া গেল, অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া হাতে জল তুলিতেই পারিলেন না! অগত্যা বুঝিলেন, সন্ন্যাস গ্রহণে তাঁহার কর্ম্ম উঠিয়া গিয়াছে।

ঐরূপ ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে, যাহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, অনাসক্তি, বিচারশীলতা, একাগ্রতা ও নিষ্ঠা এ মনের কত সহজ, কত স্বাভাবিক ছিল। আর বুঝা যায় যে, ঠাকুরের ঐরূপ দর্শনগুলি শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ কথার অনুরূপ হওয়ায় শাস্ত্র যাহা বলেন তাহা সত্য। পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন—এবার ঠাকুরের নিরক্ষর হইয়া আগমনের কারণ উহাই; হিন্দুর বেদ বেদান্ত হইতে অপরাপর জাতির যাবতীয় ধর্ম্মগ্রন্থে নিবদ্ধ আধ্যাত্মিক অবস্থা সকলের কথা যে সত্য এবং বাস্তবিকই যে মানুষ ঐ সকল পথ দিয়া চলিয়া ঐরূপ অবস্থা সকল লাভ করিতে পারে, ইহাই প্রমাণিত করিবেন বলিয়া।

ঠাকুরের মনের স্বভাব আলোচনা করিতে যাইয়া একথা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, নির্ব্বিকল্প ভূমিতে উঠিয়া অদ্বৈত ভাবে ঈশ্বরোপলব্ধিই মানব-জীবনের চরমে আসিয়া উপস্থিত হয়। আবার ঐ ভূমিলব্ধ আধ্যাত্মিক দর্শন সম্বন্ধে ঠাকুর নিজ গ্রাম্য ভাষায় বলিতেন—'সব শেয়ালের এক রা'; অর্থাৎ সকল শিয়ালই যেমন এক ভাবে শব্দ করে, তেমনি নির্ব্বিকল্পভূমিতে যাহারাই উঠিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারা প্রত্যেকেই ঐ ভূমি হইতে দর্শন করিয়া জগৎকারণ ঈশ্বর সম্বন্ধে এক কথাই বলিয়া গিয়াছেন। প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যের সম্বন্ধেও ঠাকুর বলিতেন "হাতির বাহিরের দাঁত যেমন শত্রুকে মারবার জন্য এবং ভিতরের দাঁত নিজের খাবার জন্য, সেই রকম মহাপ্রভুর দ্বৈতভাব বাহিরের ও অদ্বৈতভাব ভিতরের জিনীস ছিল।" অতএব সর্ব্বদা একরূপ অদ্বৈতভাবই যে ঠাকুরের সকল বিষয়ের পরিমাপক স্বরূপ ছিল, একথা আর বলিতে হইবে না। ব্যক্তি ও ব্যক্তির সমষ্টি সমাজকে যে ভাব ও অনুষ্ঠান ঐ ভূমির দিকে যত অগ্রসর করাইয়া দিত;

ততই ঠাকুর ঐ ভাব ও অনুষ্ঠানকে অপর সকল ভাব ও অনুষ্ঠান হইতে উচ্চ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতেন।

আবার ঠাকুরের আধ্যাত্মিক ভাবপ্রসূত দর্শনগুলির আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, উহাদের কতকগুলি স্বসংবেদ্য এবং কতকগুলি পর-সংবেদ্য। অর্থাৎ উহাদের কতকগুলি ঠাকুরের নিজ শরীরাবদ্ধ মনের চিন্তা সকল নিষ্ঠা ও অভ্যাস সহায়ে ঘনীভূত হইয়া মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহার নিকট ঐরূপে প্রকাশিত হইত এবং ঠাকুর উহাদের নিজেই দেখিতে পাইতেন, এবং কতকগুলি তিনি উচ্চ-উচ্চতর ভাবভূমিতে উঠিয়া নির্ব্বিকল্প ভাবভূমির নিকটস্থ হইবারকালে বা ভাবমুখে অবস্থিত হইয়া দেখিয়া অপরের উহা অপরিজ্ঞাত হইলেও বর্ত্তমানে বিদ্যমান বা ভবিষ্যতে ঘটিবে বলিয়া প্রকাশ করিতেন এবং অপরে ঐ সকলকে কালে বাস্তবিকই ঘটিতে দেখিত। ঠাকুরের প্রথম শ্রেণীর দর্শনগুলি সত্য বলিয়া উপলব্ধি করিতে হইলে অপরকে তাঁহার ন্যায় বিশ্বাস শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠাদি-সম্পন্ন হইতে বা ঠাকুর যে ভূমিতে উঠিয়া ঐরূপ দর্শন করিয়াছেন, সেই ভূমিতে উঠিতে হইত, এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর গুলিকে সত্য বলিয়া বুঝিতে হইলে লোকের বিশ্বাস বা অন্য কোনরূপ সাধনাদির আবশ্যক হইত না—ঐ সকল যে সত্য, তাহা ফল দেখিয়া লোককে বিশ্বাস করিতেই হইত।

সে যাহা হউক, ঠাকুরের মানসিক প্রকৃতি সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, এবং এখন যে সকল কথা উপরে বলিয়া আসিলাম, তাহা হইতেই আমরা বুঝিতে পারি, সাধারণ ভাবভূমিতে থাকিবার কালেও ঐরূপ মন নিশ্চিন্ত থাকিবার নহে। যে সকল বস্তু ও ব্যক্তির সম্পর্কে উহা একক্ষণের জন্যও উপস্থিত হইত, তৎসকলের স্বভাব রীতি নীতি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া একটা বিশেষ সিদ্ধান্তে উপনীত না হইয়া উহা স্থির থাকিতে পারিত না। বাল্যকালে যে মন অর্থের জন্যই পণ্ডিতদিগের শাস্ত্রালোচনা ধরিয়া 'চাল কলা বাঁধা' বিদ্যা শিখিল না, ঠাকুরের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নানা স্থানের নানা লোকের সম্পর্কে আসিয়া ঐ মন তাহাদের সম্বন্ধে যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিল, অতঃপর তাহাই আমাদের আলোচনীয়।

শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের পর হইতে আরব্ধ হইয়া বঙ্গদেশে শাক্ত ও বৈষ্ণবগণের পরস্পর বিদ্বেষ যে সমভাবেই চলিয়া আসিতেছিল, একথা আর বলিতে হইবে না। শ্রীরামপ্রসাদাদি বিরল কতিপয় শক্তিসাধকেরা নিজ

নিজ সাধন সহায়ে কালী ও কৃষ্ণকে এক বলিয়া প্রত্যক্ষ করিয়া ঐ বিদ্বেষ ভ্রান্ত বলিয়া প্রচার করিলেও সর্ব্ব সাধারণে তাঁহাদের কথা বড় একটা গ্রহণ না করিয়া বিদ্বেষ-তরঙ্গেই যে গা ঢালিয়া রহিয়াছে, একথা উভয় পক্ষের পরস্পরের দেবনিন্দাসূচক হাস্যকৌতুকাদিতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। বাল্যাবধি ঠাকুর ঐ বিষয়ের সহিত যে পরিচিত ছিলেন, ইহা বলা বাহুল্য। আবার উভয় পক্ষের শাস্ত্রনিবদ্ধ সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া সিদ্ধি লাভ করিয়া ঠাকুর যখন উভয় পন্থাই সমান সত্য বলিয়া উপলব্ধি করিলেন, তখন শাক্ত-বৈষ্ণবে ঐ বিদ্বেষের কারণ যে ধর্ম্মহীনতাপ্রসূত অভিমান বা অহংকার, একথা বুঝিতে তাঁহার বাকি রহিল না।

ঠাকুরের পিতা শ্রীরামচন্দ্রের উপাসক ছিলেন এবং শ্রীশ্রীরঘুবীর শিলাকে দৈবযোগে লাভ করিয়া বাটীতে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ঠাকুর ঐরূপে বৈষ্ণববংশে জন্মগ্রহণ করিলেও কিন্তু বাল্যকাল হইতে তাঁহার শিব ও বিষ্ণু উভয়ের উপরে সমান অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যাইত। বাল্যকালে এক সময়ে শিব সাজিয়া তাঁহার ঐ ভাবে সমাধিস্থ হইয়া কয়েক ঘণ্টা কাল থাকার কথা প্রতিবেশিগণ এখনও বলিয়া ঐ স্থান দেখাইয়া দেয়। ঐ বিষয়ের পরিচায়কস্বরূপ আর একটি কথারও এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে ; ঠাকুর আপন পরিবারবর্গের প্রত্যেককে এক সময়ে বিষ্ণুমন্ত্র ও শক্তিমন্ত্র উভয় মন্ত্রেই দীক্ষাগ্রহণ করাইয়াছিলেন। তাঁহাদের মন হইতে বিদ্বেষভাব সম্যক্ দূরীভূত করিবার জন্যই ঠাকুরের ঐরূপ আচরণ, একথাই আমাদের অনুমিত হয়।

বহু প্রাচীন যুগে মহারাজ ধর্ম্মাশোক মানব সাধারণের কল্যাণের নিমিত্ত ধর্ম্ম ও বিদ্যা বিস্তারে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন, একথা এখন সকলেই জানেন। মানব এবং গ্রাম্য পশু সকলের শারীরিক রোগ নিবারণের জন্য তিনি হাস-পাতাল, পিঁজরাপোলাদি ভারতের নানা স্থানে প্রতিষ্ঠা করেন, ভেষজ সকলের সংগ্রহ ও চাস করিয়া সাধারণের সহজ-প্রাপ্য করেন এবং বৌদ্ধ যতী-দিগের সহায়ে ঔষধ ও ওষধি সকলের দেশ দেশান্তরে প্রেরণ ও প্রচার করিয়া-ছিলেন। সাধুদিগের ঔষধ সংগ্রহ করিয়া রাখা বোধ হয় ঐ কাল হইতেই অনুষ্ঠিত হয় এবং তন্ত্রযুগে ভারতে ঐ প্রথা বিশেষ বৃদ্ধি পায়। পরবর্ত্তী যুগের সংহিতাকারেরা সাধুদের উহাতে আধ্যাত্মিক অবনতি দেখিয়া ঐ বিষয়ে বিশেষ প্রতিবাদ করিলেও রক্ষণশীল ভারতে ঐ প্রথার এখনও উচ্ছেদ হয়

নাই। দক্ষিণেশ্বরে থাকিবার কালে এবং তীর্থ ভ্রমণ করিবার সময় ঠাকুর অনেক সাধু-সন্ন্যাসীকে ঐভাবে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া ভোগসুখে চিরকালের নিমিত্ত পতিত হইতে দেখিয়া সাধুদের ভিতরেও যে ধর্ম্মহীনতা অনুভব করেন, ইহা আমাদের স্পষ্ট বোধ হয়। কারণ, ঠাকুর আমাদের অনেককে অনেক সময়ে বলিতেন—'যে সাধু ঔষধ দেয়, যে সাধু ঝাড়্ ফুঁক করে, যে সাধু টাকা নেয়, যে সাধু বিভূতি তিলকের বিশেষ আড়ম্বর ক'রে খড়ম পায়ে দিয়ে যেন সাঁইবোর্ট (sign board) মেরে নিজেকে বড় সাধু ব'লে অপরকে জানায়, তাদের কদাচ বিশ্বাস করবি না।'

উপরোক্ত কথাটীতে কেহ যেন না ভাবিয়া বসেন, ঠাকুর ভণ্ড ও ভ্রষ্ট সাধুদিগকে দেখিয়া পাশ্চাত্যের জনসাধারণের মত সাধুসম্প্রদায় সকল উঠাইয়া দেওয়াই উচিৎ বলিয়া মনে করিতেন। কারণ, ঠাকুরকে আমরা ঐ কথাপ্রসঙ্গে সময়ে সময়ে বলিতে শুনিয়াছি যে, 'একটা ভেকধারী সাধারণ পেট-বৈরাগী ও একজন চরিত্রবান গৃহীর ভিতর তুলনা করিলে পূর্ব্বোক্তকেই বড় বলিতে হয়। কারণ, ঐ ব্যক্তি যোগ যাগ কিছু না করিয়া কেবলমাত্র চরিত্রবান থাকিয়া যদি জন্মটা ভিক্ষা করিয়া কাটাইয়া যায়, তাহা হইলেও সাধারণ গৃহী ব্যক্তি অপেক্ষা এজন্মে কত অধিক ত্যাগের পথে অগ্রসর হইয়া রহিল।' ঈশ্বরের জন্য সর্ব্বস্বত্যাগ করাই যে ঠাকুরের নিকট ব্যক্তিগত চরিত্রের ও অনুষ্ঠানের পরিমাপক ছিল, এ সম্বন্ধে ঠাকুরের উপরোক্ত কথা-গুলিই অন্যতম দৃষ্টান্ত।

যথার্থ নিষ্ঠাবান্ প্রেমিক বা জ্ঞানী সাধু, যে সম্প্রদায়েরই হউন না কেন, ঠাকুরের নিকট যে বিশেষ সম্মান পাইতেন, তাহার দৃষ্টান্ত আমরা লীলা-প্রসঙ্গে ইতিপূর্ব্বে ভূরি ভূরি দিয়াছি। ভারতে সনাতন ধর্ম্ম উঁহাদের উপলব্ধি সহায়েই সঞ্জীবিত রহিয়াছে। উঁহাদের ভিতরে যাঁহারা ঈশ্বর-দর্শনে সিদ্ধকাম হইয়া সর্ব্বপ্রকার মায়াবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করেন, তাঁহা-দের দ্বারাই বেদাদিশাস্ত্র সপ্রমাণিত হইয়া থাকেন। কারণ, আপ্তপুরুষেই যে বেদের প্রকাশ, একথা বৈশেষিকাদি ভারতের সকল দর্শনকারেরাই এক বাক্যে বলিয়া গিয়াছেন। অতএব গভীর-অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্ন ঠাকুরের তাঁহাদের সম্বন্ধে ঐকথা বুঝিয়া তাঁহাদের ঐরূপে সম্মান দেওয়াটা কিছু বিচিত্র ব্যাপার নহে।

নিজ নিজ পথে নিষ্ঠা-ভক্তির সহিত অগ্রসর সাধুদিগকে ঠাকুর বিশেষ

প্রীতির চক্ষে দেখিয়া তাঁহাদের সঙ্গে স্বয়ং সর্ব্বদা বিশেষ আনন্দানুভব করিলেও এক বিষয়ের অভাব তিনি তাঁহাদের ভিতর সর্ব্বদা দেখিতে পাইয়া সময়ে সময়ে নিতান্ত দুঃখিত হইতেন। দেখিতেন যে, তিনি সমান অনুরাগে সকল সম্প্রদায়ের সহিত সমভাবে যোগদান করিলেও তাঁহারা সেরূপ পারিতেন না। ভক্তিমার্গের সাধক সকলের তো কথাই নাই, অদ্বৈতপন্থায় অগ্রসর সন্ন্যাসী সাধকদিগের ভিতরেও তিনি ঐরূপ একদেশী ভাব দেখিতে পাইতেন। অদ্বৈতভূমির উদার সমভাব লাভ করিবার বহু পূর্ব্বেই তাঁহারা অন্য সকল পন্থার লোকদিগকে হীনাধিকারী বলিয়া সমভাবে ঘৃণা বা বড় জোর একপ্রকার অহঙ্কৃত করুণার চক্ষে দেখিতে শিখিতেন। উদারবুদ্ধি ঠাকুরের একই লক্ষ্যে অগ্রসর ঐ সকল ব্যক্তিদিগের ঐ প্রকার পরস্পর বিদ্বেষ দেখিয়া যে বিশেষ কষ্ট হইত, একথা আর বলিতে হইবে না, এবং ঐ একদেশিতা যে ধর্ম্মহীনতা হইতে উৎপন্ন একথা বুঝিতে বাকি থাকিত না।

দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে বসিয়া ঠাকুর যে ধর্ম্মহীনতা ও একদেশিতার পরিচয় গৃহী ও সন্ন্যাসী, সকলেরই ভিতর প্রতিদিন পাইতেছিলেন, তীর্থে দেবস্থানে গমন করিয়া উহার কিছুই কম না দেখিয়া বরং সমধিক প্রতাপই দেখিতে পাইলেন। মথুরের দান গ্রহণ করিবার সময় ব্রাহ্মণদিগের বিবাদ, কাশীস্থ কতকগুলি তান্ত্রিক সাধকের পূজানুষ্ঠান দেখিতে তাঁহাকে আহ্বান করিয়া জগদম্বার পূজা নামমাত্র সম্পন্ন করিয়া কেবল কারণপানে ঢলাঢলি, দণ্ডী স্বামীদের প্রতিষ্ঠা ও নাম যশ লাভের জন্য প্রাণপণ প্রয়াস, বৃন্দাবনে বৈষ্ণব বাবাজিদের সাধনার ভাণে যোষিৎসঙ্গে কালযাপন প্রভৃতি সকল ঘটনাই ঠাকুরের তীক্ষ্ণদৃষ্টির সম্মুখে নিজ যথাযথরূপ প্রকাশ করিয়া সমাজ এবং দেশের প্রকৃত অবস্থার কথা বুঝিতে তাঁহাকে সহায়তা করিয়াছিল। অবশ্য নিজের ভিতর অতি গভীর নির্বিকল্প অদ্বৈত তত্ত্বের উপলব্ধি না থাকিলে শুদ্ধ ঐ সকল ঘটনা দেখাটা ঐ বিষয়ে বিশেষ সহায়তা করিতে পারিত না। ঐ ভাবোপলব্ধি ইতিপূর্ব্বে করাতেই ঠাকুরের মনে ব্যক্তিগত ও সমাজগত মনুষ্যজীবনের চরমলক্ষ্য সম্বন্ধে ধারণা স্থির ছিল এবং উহার সহিত তুলনায় সকল বিষয় ধরা বুঝা সহজসাধ্য হইয়াছিল। অতএব যথার্থ উন্নতি, সভ্যতা, ধর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি, নিষ্ঠা, যোগ, কর্ম্ম প্রভৃতি প্রেরক-ভাবসমূহ কোন্ লক্ষ্যে মানবকে অগ্রসর করাইতেছে, অথবা উহাদের পরিসমাপ্তিতে মানব কোথায় যাইয়া কিরূপ অবস্থায় দাঁড়াইবে, তদ্বিষয় নিঃসংশয়রূপে

জানাতেই ঠাকুরের সাধারণভাবভূমিতে থাকিবার কালে ব্যক্তিগত এবং সমাজগত জীবনের দৈনন্দিন ঘটনাবলীর ঐরূপে দেখা ও আলোচনা তাঁহাকে সকল বিষয়ে সত্যাসত্য নির্দ্ধারণে সহায়তা করিয়াছিল। বুঝনা—যথার্থ সাধুতার জ্ঞান না থাকিলে তিনি কোন্ সাধু কতদূর অগ্রসর তাহা ধরিতেন কিরূপে ; তীর্থে ও দেবমূর্ত্তিদর্শনে বাস্তবিকই ধর্ম্মভাব বহুলোকের চিন্তাশক্তি সহায়ে ঘনীভূত হইয়া প্রকাশিত রহিয়াছে, একথা পূর্ব্বে নিঃসংশয়রূপে না দেখিলে মহাসত্যনিষ্ঠ ঠাকুর জনসাধারণকে তীর্থাটন ও সাকারোপাসনায় অতি দৃঢ়তার সহিত প্রোৎসাহিত করিতেন কিরূপে ; নানা ধর্ম্ম সকলের কোনদিকে গতি এবং কোথায় পরিসমাপ্তি তাহা জানা না থাকিলে, ঐ সকলের এক দেশিতাটিই দূষণীয়, একথা ধরিতেন কিরূপে ? আমরাও নিত্য সাধু, তীর্থ, দেবদেবীর মূর্ত্তি দেখি, ধর্ম্ম ও শাস্ত্র-মত সকলের অনন্ত কোলাহল শুনিয়া বধির হই, বুদ্ধিকৌশল এবং বাক্‌বিতণ্ডায় কখন এ মতটি, কখন ও মতটি সত্য বলিয়া মনে করি, জীবনের দৈনন্দিন ঘটনাবলী পর্য্যালোচনা করিয়া মানবের লক্ষ্য কখন এটা কখন ওটা হওয়া উচিৎ বলিয়া মনে করি—অথচ কোনও বিষয়েই একটা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে না পারিয়া নিরন্তর সন্দেহে দোলায়মান থাকি এবং কখন কখন নাস্তিক হইয়া ভোগসুখলাভটাই জীবনে সারকথা ভাবিয়া বসিয়া থাকি !

আমাদের ঐরূপ দেখাশুনায়, আমাদের ঐরূপ আজ একপ্রকার কাল অন্যপ্রকার সিদ্ধান্তে আমাদিগকে কি এমন বিশেষ সহায়তা করে ? ঠাকুরের পূর্ব্বোক্তরূপ অদ্ভুত গঠন ও স্বভাববিশিষ্ট মন ছিল বলিয়া তিনি যাহা একবার মাত্র দেখিয়া ধরিতে বুঝিতে সক্ষম হইয়াছিলেন আমাদের পশুভাবাপন্ন মন শত জন্মেও তাহা জগদ্‌গুরু মহাপুরুষদিগের সহায়তা ব্যতীত বুঝিতে পারিবে কি না, বলিতে পারি না। জাতিগত সৌসাদৃশ্য উভয়ে সামান্যভাবে লক্ষিত হইলেও ঠাকুরের মনে ও আমাদের মনে যে কত প্রভেদ, তাহা প্রতি কার্য্য-কলাপেই বেশ অনুমিত হয়। ভক্তিশাস্ত্র ঐজন্যই অবতারপুরুষদিগের মন সাধারণাপেক্ষা ভিন্ন উপাদানে রজস্তমোরহিত শুদ্ধ সত্ত্বগুণে গঠিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

এইরূপে দিব্য ও সাধারণ উভয় ভাবভূমি হইতে দর্শন করিয়াই দেশের বর্ত্তমান ধর্ম্মহীনতা, প্রচলিত ধর্ম্মমত সকলের একদেশিতা, প্রত্যেক ধর্ম্মমত সমভাবে সত্য হইলেও এবং বিভিন্ন প্রকৃতির

অনেককে ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়া চরমে একই লক্ষ্যে পৌঁছাইয়া দিলেও পূর্ব্বপূর্ব্বাচার্য্যগণের তদ্বিষয়ে অনভিজ্ঞতা বা দেশকালপাত্র বিবেচনায় অপ্রচার ইত্যাদি অভিনব মহাসত্য সকলের ধারণা ঠাকুর তীর্থাদি দর্শন হইতেই বিশেষরূপে অনুভব করিয়াছিলেন। আর অনুভব করিয়াছিলেন যে, একদেশিত্বের গন্ধমাত্ররহিত, বিদ্বেষসম্পর্কমাত্রশূন্য তাঁহার নিজভাব জগতের পক্ষে এক অদৃষ্টপূর্ব্ব ব্যাপার। উহা তাঁহারই নিজস্ব সম্পত্তি। তাঁহাকেই উহা জগৎকে দান করিতে হইবে।

"সর্ব্ব ধর্ম্মমতই সত্য—যত মত তত পথ"—এই মহদুদার কথা জগৎ ঠাকুরের শ্রীমুখেই প্রথম শুনিয়া যে মোহিত হইয়াছে, একথা আমাদের অনেকে এখন জানিতে পারিয়াছেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের ঋষি ও ধর্ম্মাচার্য্যগণের কাহার কাহার ভিতরে ঐরূপ উদার ভাবের অন্ততঃ আংশিক বিকাশ তো দেখা গিয়াছে বলিয়া কেহ কেহ আপত্তি উত্থাপিত করিতে পারেন; কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলেই বুঝা যায়, ঐ সকল আচার্য্যও নিজ নিজ বুদ্ধি সহায়ে প্রত্যেক মতের কতক কতককাটিয়া ছাঁটিয়া ঐ সকলের ভিতর যতটুকু সারাংশ বলিয়া স্বয়ং বুঝিতেন তৎসকলেরমধ্যেই একটা সমন্বয়েরভাব টানাটানি করিয়া দেখিবার ও দেখাইবার প্রয়াস করিযাছেন। ঠাকুর যেমন প্রত্যেক মতের কিছুমাত্র ত্যাগ না করিয়া সমান অনুরাগ নিজ জীবনে উহাদের প্রত্যেকের সাধনা করিয়া তত্তৎ মত-নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছিযা ঐ বিষয় প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, সে ভাবে পূর্ব্বের কোন আচার্য্যই ঐ সত্য উপলব্ধি করেন নাই। সে যাহাই হউক, ঐ বিষয়ের বিস্তারালোচনা এখানে করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। আমরা কেবল এই কথাই পাঠককে এখানে বলিতে চাহি যে, ঐ উদার ভাবের পরিচয় ঠাকুরের জীবনে আমরা বাল্যাবধিই পাইয়া থাকি। তবে তীর্থ দর্শন করিয়া আসিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ঠাকুর এ কথাটি নিশ্চয় করিয়া ধরিতে পারেন নাই যে, আধ্যাত্মিক রাজ্যে ঐরূপ উদারতা একমাত্র তিনিই উপলব্ধি করিয়াছেন! পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঋষি আচার্য্য বা অবতারখ্যাত পুরুষ সকলে এক একটি বিশেষ পথ দিয়া কেমন করিয়া লক্ষ্যস্থানে পৌঁছিতে হয়, তদ্বিষয়ই জনসমাজে প্রচার করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়া যে একই লক্ষ্যে পৌঁছন যায়, এ সংবাদ তাঁহাদের কেহই এ পর্য্যন্ত প্রচার করেন নাই। ঠাকুর বুঝিলেন, সাধনকালে তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে সকল প্রকার বাসনা কামনা শ্রীশ্রীজগন্মাতার পাদপদ্মে সমর্পণ করিয়া সংসারে,

মায়ার রাজ্যে আর কখন ফিরিবেন না বলিয়া দৃঢ় সংকল্প করিয়া অদ্বৈত ভাব-ভূমিতে অবস্থান করিলেও যে, জগদম্বা তাঁহাকে তখন তাহা করিতে দেন নাই. নানা অসম্ভাবিত উপায়ে তাঁহার শরীরটা এখনও রাখিয়া দিয়াছেন —তাহা এই কার্য্যের জন্য—যতদূর সম্ভব একদেশী ভাব জগৎ হইতে দূর করিবার জন্য, এবং জগৎও ঐ অশেষ কল্যাণকর ভাব গ্রহণ করিবার জন্য তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া রহিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তে কিরূপে আমরা উপনীত হইয়াছি, তাহাই এখন পাঠককে বলিবার আমরা প্রয়াস পাইব।

ধর্ম্মবস্তুর উপলব্ধি যে বাক্যের বিষয় নহে, অনুষ্ঠানসাপেক্ষ, এ কথা ঠাকুরের বাল্যাবধিই ধারণা ছিল। আবার ঐ বস্তু যে বহুকালানুষ্ঠানে সঞ্চিত করিয়া অপরে সংক্রমিত করিতে বা অপরকে যথার্থই প্রদান করিতে পারা যায় ইহাও ঠাকুর সাধনকালে সময়ে সময়ে এবং সিদ্ধিলাভ করিবার পরে অনেক সময় অনুভব করিতেছিলেন। ঐ কথার আমরা ইতিপূর্ব্বে অনেক স্থলে আভাষ দিয়া আসিয়াছি। জগদম্বা কৃপা করিয়া তাঁহাতে যে ঐ শক্তি বিশেষভাবে সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছেন এবং মথুরপ্রমুখ বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিদিগের প্রতি কৃপায় তাঁহাকে সময়ে সময়ে সম্পূর্ণ আত্মহারা করিয়া ঐ শক্তি ব্যবহার করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে প্রমাণও ঠাকুর এ পর্য্যন্ত অনেকবার আপন জীবনে পাইয়াছিলেন। উহাতে তাঁহার ইতি-পূর্ব্বে এই ধারণামাত্রই হইয়াছিল যে, শ্রীশ্রীজগন্মাতা তাঁহার শরীর ও মনকে যন্ত্রস্বরূপ করিয়া কতকগুলি ভাগ্যবানকেই কৃপা করিবেন—কি ভাবে বা কখন ঐ কৃপা করিবেন, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই এবং শিশুর ন্যায় মাতার উপর নিঃসঙ্কোচে নির্ভরশীল ঠাকুরের মন উহা বুঝিতে চেষ্টাও করে নাই। কিন্তু ভারতকে ধর্ম্মদান করিতে হইবে, জগতে ধর্ম্ম-বন্যা খরস্রোতে প্রবাহিত করিতে হইবে, এ কথা তাঁহার মনে স্বপ্নেও উদিত হয় নাই। এখন হইতে জগদম্বা তাঁহার শরীর-মনকে আশ্রয় করিয়া ঐ নূতন লীলার আরম্ভ যে করিতেছেন, ঠাকুর এ কথা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতে লাগিলেন। কিন্তু করিলেই বা উপায় কি, কোন্ দিক্ দিয়া কি করাইয়া কোথায় লইয়া যাইতেছেন, তাহা না বুঝিতে দিলেই বা তিনি কি করিবেন? 'মা আমার, আমি মার' একথা সত্য সত্যই সর্ব্বকালের জন্য বলিয়া তিনি যে বাস্তবিকই জগদম্বার বালক হইয়া গিয়াছেন! মার ইচ্ছা ব্যতীত তাঁহাতে যে বাস্তবিকই অপর কোনরূপ ইচ্ছার উদয় হয় নাই! এক ইচ্ছা

যাহা সময়ে সময়ে উদিত হইত—মাকে নানা ভাবে, নানা পথ দিয়া জানিবেন, তাহাও যে ঐ মাই নানা সময়ে তাঁহার মনে তুলিয়া দিয়াছিলেন, একথাও মা তাঁহাকে ইতিপূর্ব্বে বিলক্ষণ রূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। অতএব এখনকার অভিনব অনুভবে মার বালক সানন্দে মার মুখের প্রতিই চাহিয়া রহিল—মাই পূর্ব্বের ন্যায় এখনও তাহাকে লইয়া খেলিতে লাগিলেন!

তীর্থাদি দর্শনে পূর্ব্বোক্ত সত্য সকলের অনুভবে ঠাকুর যে আমাদের ন্যায় অহংকারের বশবর্ত্তী হইয়া আচার্য্য পদবী লয়েন নাই, একথা আমরা দিব্যপ্রেমিকা, তপস্বিনী গঙ্গামাতার সহিত শ্রীবৃন্দাবনে তাঁহার জীবনের অবশিষ্ট কাল কাটাইয়া দিবার ইচ্ছাতেই বেশ বুঝিতে পারি। 'মার কাজ মা করেন, আমি জগতের কাজ করিবার, লোক শিক্ষা দিবার কোথাকার কে?'—এই ভাবটি ঠাকুরের মনে আজীবন যে কি বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল, তাহা আমরা কল্পনা সহায়েও এতটুকু বুঝিতে পারি না। কিন্তু ঐরূপ হওয়াতেই তাঁহার জগদম্বার কার্য্যের যথার্থ যন্ত্রস্বরূপ হওয়া, ঐরূপ হওয়াতেই তাঁহার ভাবমুখে নিরন্তর স্থিতি, ঐরূপ হওয়াতেই তাঁহাতে শ্রীগুরুভাবের প্রকাশ এবং ঐরূপ হওয়াতেই তাঁহার মনে ঐ গুরুভাব ঘণীভূত হইয়া এক অপূর্ব্ব অভিনবাকার ধারণ করিয়া এখন পূর্ব্বোক্তরূপে প্রকাশ পাইতে লাগিল। এতদিন গুরুভাবের আবেশকালে ঠাকুর আত্মহারা হইয়া পড়িয়া তাঁহার শরীরমনাশ্রয়ে যে কার্য্য হইত তাহা নিষ্পন্ন হইয়া যাইবার পর তবে ধরিতে বুঝিতে পারিতেন। এখন তাঁহার শরীর মন ঐ ভাবের নিরন্তর ধারণ ও প্রকাশে অভ্যস্ত হইয়া আসিল এবং গুরুভাব তাঁহার মনের সহজ স্বাভাবিক অবস্থা হইয়া দাঁড়াইয়া তিনি না চাহিলেও তাঁহাকে যথার্থ আচার্য্য পদবীতে সর্ব্বদা প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিল। পূর্ব্বে দীন সাধক বা বালক ভাবই ঠাকুরের মনের সহজাবস্থা ছিল। ঐ ভাবাবলম্বনেই তিনি অনেককাল অবস্থিতি করিতেন এবং গুরুভাবের প্রকাশ তাঁহাতে স্বল্পকালই হইত। এখন তদ্বিপরীত হইয়া গুরু ভাবেরই অধিক কাল অবস্থিতি এবং দীন সাধক বা বালক ভাবের তাঁহাতে অল্পকাল স্থিতি হইতে লাগিল।

অহঙ্কৃত হইয়া আচার্য্যপদবী গ্রহণ যে ঠাকুরের মনের এককালে অসম্ভব ছিল তাহার পরিচয় আমরা অনেক দিন ঠাকুরের ভাবাবেশে জগদম্বার সহিত বালকের ন্যায় কলহে পাইয়াছি। ফুল্ল শতদলের সৌরভে মধুকরপংক্তির ন্যায় ঠাকুরের আধ্যাত্মিক প্রকাশে আকৃষ্ট হইয়া দক্ষিণেশ্বরে যখন অশেষ

জনতা হইতেছিল তখন একদিন আমরা যাইয়া দেখি ঠাকুর ভাবাবস্থায় মার সহিত কথা কহিতেছেন। বলিতেছেন—"কচ্চিস্ কি? এত লোকের ভিড় কি আনতে হয়? (আমার) নাইবার খাবার সময় নেই! (ঠাকুরের তখন গলদেশে ব্যথা হইয়াছে। নিজের শরীর লক্ষ্য করিয়া) একটা তো ভাঙ্গা ঢাক। এত করে বাজালে কোন্‌দিন ফুটো হয়ে যাবে যে! তখন কি কর্‌বি?"

আবার একদিন দক্ষিণেশ্বরে আমরা তাঁহার নিকট বসিয়া আছি। সেটা ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাস। ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীযুৎ প্রতাপ হাজরার মাতার পীড়ার সংবাদ আসায় ঠাকুর তাহাকে অনেক বুঝাইয়া সুঝাইয়া মাতার সেবা করিতে দেশে পাঠাইয়া দিয়াছেন—সে দিনও আমরা উপস্থিত ছিলাম। অদ্য সংবাদ আসিয়াছে প্রতাপচন্দ্র দেশে না যাইয়া বৈদ্যনাথ দেওঘরে চলিয়া গিয়াছে। ঠাকুর ঐ সংবাদে একটু বিরক্তও হইয়াছেন। একথা সেকথার পর ঠাকুর আমাদিগকে একটি সংগীত গাহিতে বলিলেন এবং কিছুক্ষণ পরে ঠাকুরের ভাবাবেশ হইল। সে দিনও ঠাকুর ঐ ভাবাবেশে জগদম্বার সহিত বালকের ন্যায় বিবাদ আরম্ভ করিলেন। বলিলেন—"অমন সব আদাড়ে লোককে এখানে আনিস্ কেন?" (একটু চুপ করিয়া) "আমি অত পারবো না। একসের দুধে এক আধপো জলই থাক—তা নয়, একসের দুধে পাঁচসের জল! জ্বাল ঠেল্‌তে ঠেল্‌তে ধোঁয়ায় চোখ জ্বলে গেল! তোর ইচ্ছে হয় তুই দিগে যা। আমি অত জ্বাল ঠেল্‌তে পারবো না। অমন সব লোককে আর আনিস্ নি।" আমরা, কাহাকে লক্ষ্য করিয়া ঠাকুর ঐ কথা মাকে বলিতেছেন, তাহার কি দুরদৃষ্ট—এ কথা ভাবিতে ভাবিতে ভয়ে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া স্থির হইয়া বসিয়া রহিলাম! মার সহিত ঐরূপ বিবাদ ঠাকুরের নিত্য উপস্থিত হইত; তাহাতে দেখা যাইত যে যে আচার্য্য-পদবীর সম্মানের জন্য অন্য সকলে লালায়িত, ঠাকুর তাহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর জ্ঞানে মাকে নিত্য তাঁহার নিকট হইতে ফিরাইয়া লইতে বলিতেন।

এইরূপে ইচ্ছাময়ী জগদম্বা নিজ অচিন্ত্য লীলায় তাঁহাকে অদৃষ্টপূর্ব্ব অদ্ভুত উপলব্ধি সকল আজীবন করাইয়া তাঁহার ভিতর যে মহদুদার আধ্যাত্মিক ভাবের অবতারণা করাইয়াছেন তাহা ইতিপূর্ব্বে জগতে অন্য কোনও আচার্য্য মহাপুরুষেই আর করেন নাই একথাটি ঠাকুরকে বুঝাইবার সঙ্গে সঙ্গে অপরকে কৃতার্থ করিবার জন্য তিনি ঠাকুরের ভিতরে ধর্ম্মশক্তি যে

কতদূর সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছেন এবং ঐ শক্তি অপরে সংক্রমণের জন্য তাঁহাকে যে কি অদ্ভুত যন্ত্রস্বরূপ করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন তদ্বিষয়ও জগন্মাতা ঠাকুরকে এই সময়ে দেখাইয়া দেন! ঠাকুর সবিস্ময়ে দেখিলেন—বাহিরে চতুর্দ্দিকে ধর্ম্মাভাব,আর ভিতরে মার লীলায় ঐ অভাব পুরণের জন্য অদৃষ্টপূর্ব্ব শক্তি সঞ্চয়! দেখিয়াই বুঝিতে বাকি রহিল না যে, আবার মা এযুগে অজ্ঞান মোহরূপ দুর্দ্দান্ত রক্তবীজ বধে রণরঙ্গে অবতীর্ণা!—আবার জগৎ মার অহেতুকী করুণার খেলা দেখিয়া নয়ন সার্থক করিবে এবং অনন্ত গুণময়ী কোটি-ব্রহ্মাণ্ড-নায়িকার জয়স্তুতি করিতে যাইয়া বাক্য খুঁজিয়া পাইবে না! উত্তাপের আতিশয্যে মেঘের উদয়, হ্রাসের শেষে স্ফীতের উদয়, দুর্দ্দিনের অবসানে সুদিনের উদয় এবং বহুলোকের বহুকালে সঞ্চিত প্রাণের অভাবে জগদম্বার অহেতুকী করুণা ঘণীভূত হইয়া এইরূপেই গুরুভাবের জীবন্ত সচল বিগ্রহরূপে অবতীর্ণ হয়! জগদম্বা-কৃপায় ঠাকুরকে ঐ কথা বুঝাইয়া, আবার কৃপা করিয়া দেখাইলেন ঠাকুরকে লইয়া তাঁহার ঐরূপ লীলা বহুযুগে বহুবার হইয়াছে!—পরেও আবার বহুবার হইবে! সাধারণ জীবের ন্যায় তাঁহার মুক্তি নাই! 'সরকারি লোক তাঁহাকে জগদম্বার জমীদারীর যেখানে যখনই কোন গোলমাল উপস্থিত হইবে সেখানেই তখন গোল থামাইতে ছুটিতে হইবে'।—ঠাকুরের ঐ সকল কথার অনুভব এখন হইতেই যে হইয়াছিল এ বিষয় আমরা ঐরূপে বেশ বুঝিতে পারি।

'যত মত, তত পথ'রূপে উদার মতের উদয় জগদম্বাই লোকহিতায় কৃপায় তাঁহাতে করিয়াছেন একথা বুঝিবার সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরের বিচারশীল মন আর একটি বিষয় অনুসন্ধানে যে এখন হইতে অগ্রসর হইয়াছিল একথা স্পষ্ট প্রতীত হয়। কোন্ ভাগ্যবানেরা তাঁহার শরীর মনাশ্রয়ে অবস্থিত সাক্ষাৎ মার নিকট হইতে ঐ নবীনোদয়ভাব গ্রহণ করিয়া নিজ নিজ জীবন গঠনে ধন্য হইবে, কাহারা মার নিকট হইতে শক্তিগ্রহণ করিয়া তাঁহার বর্ত্তমান যুগের অভিনব লীলার সহায়ক হইয়া অপরকে ঐ ভাব গ্রহণ করাইয়া কৃতার্থ করিবে, তাহাদিগকে মা ঐ মহৎ কার্য্যানুষ্ঠানের জন্য চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছেন— ঐ সকল কথা বুঝিবার, জানিবার ইচ্ছায় তাঁহার মন এসময় ব্যাকুল হইয়া উঠে। মথুরের সহিত ঠাকুরের প্রেম সম্বন্ধে বিচারকালে ঠাকুরের নিজ ভক্তগণকে দর্শনের কথা পূর্ব্বে আমরা বলিয়াছি। জগদম্বার অচিন্ত্য লীলায় পৃথিবীর সকল বিষয়ে এতকাল সম্পূর্ণ অনাসক্তভাবে অবস্থিত

ঠাকুরের মনে তাহাদের পূর্ব্বদৃষ্ট মুখগুলি এখন উজ্জ্বল জীবন্তভাব ধারণ করিল। তাহারা কতগুলি হইবে, কবে কতদিনে মা তাহাদের এখানে আনয়ন করিবেন, তাহাদের কাহার দ্বারা মা কোন কাজ করাইয়া লইবেন, মা তাহাদিগকে তাঁহার ন্যায় ত্যাগী করিবেন অথবা গৃহধর্ম্মে রাখিবেন, সংসারে এ পর্য্যন্ত দুই চারিজনই তাঁহাকে লইয়া মার এই অপূর্ব্ব লীলার কথা অল্প স্বল্প মাত্র বুঝিয়াছে—আগত ব্যক্তিদিগের কেহও কি জগদম্বার ঐ লীলার কথা যথাযথ সম্যক্ বুঝিতে পারিবে অথবা আংশিক বুঝিয়াই চলিয়া যাইবে, এইরূপ নানা কথার তোলাপাড়া করিয়াই যে এ অদ্ভুত সন্ন্যাসী-মনের এখন দিন কাটিতে লাগিল, একথা তিনি পরে অনেক সময় আমাদিগকে বলিয়াছেন! বলিতেন—"তোদের সব দেখ্‌বার জন্য প্রাণের ভিতরটা তখন এমন ক'রে উঠ্‌ত, এমনভাবে মোচড় দিত যে, যন্ত্রণায় অস্থির হ'য়ে পড়্‌তুম! ডাক ছেড়ে কাঁদ্‌তে ইচ্ছা হ'ত! লোকের সাম্‌নে, কি মনে কর্‌বে ভেবে কাঁদ্‌তে পার্‌তুম না; কোনও রকমে সাম্‌লে সুম্‌লে থাক্‌তুম! আর যখন দিন গিয়ে রাত আস্‌ত, মার ঘরে বিষ্ণুঘরে আরতির বাজনা বেজে উঠ্‌ত, তখন আরও একটা দিন গেল—তোরা এখনও এলিনি ভেবে আর সাম্‌লাতে পার্‌তুম না; কুঠির উপরের ছাদে উঠে 'তোরা সব কে কোথায় আছিস্ আয়রে' ব'লে চেঁচিয়ে ডাক্‌তুম ও ডাকছেড়ে কাঁদ্‌তুম! মনে হ'ত পাগল হ'য়ে যাব! তার পর কিছু দিন বাদে তোরা সব একে একে আস্‌তে আরম্ভ করলি—তখন ঠাণ্ডা হই! আর আগে দেখেছিলাম ব'লে, তোরা যেমন যেমন আস্‌তে লাগ্‌লি, অম্‌নি চিন্‌তে পার্‌লুম! তার পর পূর্ণ যখন এল, তখন মা বল্লে, 'ঐ পূর্ণতে তুই যারা সব আস্‌বে ব'লে দেখেছিলি, তাদের আসা পূর্ণ হ'ল। ঐ থাকের (শ্রেণীর) লোকের কেউ আস্‌তে আর বাকি রহিল না!' মা দেখিয়ে ব'লে দিলে—'এরাই সব তোর অন্তরঙ্গ'।" অদ্ভুত দর্শন— অদ্ভুত তাহার সফলতা! আমরা ঠাকুরের ঐ সকল কথার অর্থ কতদূর কি বুঝিতে পারি? ঠাকুরের এখনকার অবস্থা সম্বন্ধে আমাদের পূর্ব্বোক্ত কথা সকল যে স্বকপোলকল্পিত নহে, পাঠককে উহা বুঝাইবার জন্যই ঠাকুরের ঐ কথাগুলির এখানে উল্লেখ করিলাম।

এইরূপে নিজ উদারমতের অনুভব করিবার এবং গ্রহণের অধিকারী কাহারা, একথা নির্ণয় করিতে যাইয়া ঠাকুরের আর একটি কথারও ধারণা উপস্থিত হইয়াছিল। ঠাকুর উহা আমাদিগকে স্বয়ং অনেক সময় বলিতেন।

বলিতেন—'যার শেষ জন্ম সেই এখানে আসবে'—'যে ঈশ্বরকে একবারও ঠিক ঠিক ডেকেছে, তাকে এখানে আসতে হবেই হবে।' কথাগুলি শুনিয়া কত লোকে কত কি যে ভাবিয়াছে, তাহা বলিয়া উঠা দায়। কেহ উহা একেবারে অযুক্তিকর সিদ্ধান্ত করিয়াছে,কেহ ভাবিয়াছে,উহা ঠাকুরের ভক্তি-বিশ্বাস-প্রসূত অসম্বদ্ধ প্রলাপ মাত্র, কেহ বা ঐ সকলে ঠাকুরের মস্তিষ্কবিকৃতি অথবা অহঙ্কারের পরিচয় পাইয়াছে, কেহ বা আমরা বুঝিতে না পারিলেও ঠাকুর যখন বলিয়াছেন, তখন উহা বাস্তবিকই সত্য বুঝিয়া তৎসম্বন্ধে যুক্তি তর্কের অবতারণটা বিশ্বাসের হানিকর ভাবিয়া চক্ষুকর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করিয়াছে, আবার কেহ বা ঠাকুর যদি উহা কখন বুঝান তো বুঝিব, ভাবিয়া উহাতে বিশ্বাস বা অবিশ্বাস কিছুই একটা পাকা না করিয়া উহার স্বপক্ষে বা বিপক্ষে যে যাহা বলিতেছে, তাহা অবিচলিত চিত্তে শুনিয়া যাইতেছে। কিন্তু অহঙ্কার-সম্পর্কমাত্রশূন্য স্বাভাবিক সহজ ভাবেই জগদম্বা ঠাকুরকে নিজ উদার মতের অনুভব ও যথার্থ আচার্য্যপদবীতে আরূঢ় করাইয়াছিলেন, একথা যদি আমরা পাঠককে বুঝাইতে পারিয়া থাকি, তাহা হইলে, তাঁহার ঐ কথা-গুলির অর্থ বুঝিতে বিলম্ব হইবে না। শুধু তাহাই নহে, একটু তলাইয়া দেখিলেই পাঠক বুঝিবেন যে, ঐ কথাগুলিই ঠাকুরের সহজ স্বাভাবিকভাবে বর্ত্তমান উচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থা লাভের বিশিষ্ট প্রমাণস্বরূপ!

জগদম্বার বালক ঠাকুর নিজ শরীর মনের অন্তরে দৃষ্টিপাত করিয়া বর্ত্ত-মানে যে অপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক শক্তি-সঞ্চয় ও শক্তি-সংক্রমণ-ক্ষমতার পরিচয় পাইয়াছিলেন, তাহা যে তাঁহার নিজ চেষ্টার ফলে, একথা তিলেকের জন্যও তাঁহার জননীগত-প্রাণ মনে উদয় হয় নাই। উহাতে তিনি অচিন্ত্যলীলাময়ী জগজ্জননীর খেলাই দেখিয়াছিলেন এবং দেখিয়া স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইয়া-ছিলেন। অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মা নিরক্ষর শরীর-মনটাকে আশ্রয় করিয়া এ কি বিপুল খেলার আয়োজন করিয়াছেন! মূককে বাগ্মী করা, পঙ্গুর দ্বারা সুমেরু উল্লঙ্ঘন করান প্রভৃতি মার যে সকল লীলা দেখিয়া লোকে মোহিত হইয়া তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করে, বর্ত্তমান লীলা যে ঐ সকলকে শতগুণে সহস্রগুণে অতিক্রম করিতেছে! মার এ লীলায় বেদ বাইবেল পুরাণ কোরাণাদি যাবতীয় ধর্ম্মশাস্ত্র প্রমাণিত, ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত এবং জগতের যে অভাব কোনও পূর্ব্বযুগে কেহই দূর করিতে সমর্থ হয় নাই, তাহাও চির-কালের মত বাস্তবিক অন্তর্হিত! ধন্য মা—ধন্য লীলাময়ী ব্রহ্মশক্তি! –

এইরূপ ভাবনার উদয়ই ঠাকুরের ঐ দর্শনে উপস্থিত হইয়াছিল এবং মার কথায়, মার অনন্ত করুণায় ও অচিন্ত্য শক্তিতে একান্ত বিশ্বাসেই ঠাকুর ঐ দর্শনকে ধ্রুব সত্য বলিয়া ধরিয়া ঐ লীলার প্রসার কতদূর, কাহারা উহার সহায়ক এবং ঐ শক্তিবীজ কিরূপ হৃদয়েই বা রোপিত হইবে—এই সকল প্রশ্ন ঠাকুরের মনে পর পর উদয় হইয়া তাঁহার নিজ অন্তরঙ্গ ব্যক্তিদিগকে দেখা এবং যাহার শেষ জন্ম, যে ঈশ্বরকে পাইবার জন্য একবারও মনে প্রাণে ডাকিয়াছে, সেই ব্যক্তিই মার এই অপূর্ব্ব উদার নূতন ভাব গ্রহণের অধিকারী, এই সিদ্ধান্ত আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। অতএব দেখা যাইতেছে, উহা জগজ্জননীর উপর ঠাকুরের ঐকান্তিক বিশ্বাসের ফলেই আসিয়াছিল। মার উপর নির্ভরশীল বালকের ঐরূপ সিদ্ধান্ত করা ভিন্ন অন্যরূপ করিবার আর উপায়ই ছিল না এবং ঐরূপ করাতে ঠাকুরের অহঙ্কারের লেশমাত্রও মনে উদয় হয় নাই।

অতএব, 'যার শেষ জন্ম সেই এখানে আসবে, ঈশ্বরকে যে একবারও ঠিক ঠিক ডেকেছে, তাকে এখানে আসতে হবেই হবে'—ঠাকুরের এই কথাগুলির ভিতর 'এখানে' কথাটির অর্থ যদি আমরা 'মার অভিনব উদার ভাবে' এইরূপ করি, তাহা হইলে বোধ হয় অযুক্তিকর হইবে না এবং কাহারও আপত্তি হইবে না। কিন্তু ঐ অর্থ স্বীকার করিলেই আবার অন্য প্রশ্ন উঠিবে—তাহারা জগদম্বার 'যত মত তত পথ'-রূপ উদারভাবে আপনা হইতে উপস্থিত হইবে অথবা জগদম্বা যাঁহাকে যন্ত্র-স্বরূপ করিয়া জগতে ঐ ভাব প্রথম প্রচার করিলেন, তাঁহার সহায়ে হইবে। এ প্রশ্নের উত্তর আমাদের বোধে প্রশ্নকর্ত্তার নিজের বা অপর কাহারও প্রাণে ঐ ভাবের ঠিক ঠিক অনুভূতি দেখিয়াই করা উচিত এবং যতদিন না ঐ দর্শন আসিয়া উপস্থিত হয়, ততদিন চুপ করিয়া থাকাই ভাল। তবে পাঠক যদি আমাদের ধারণার কথা জিজ্ঞাসা করেন তো বলিতে হয়, ঠিক ঠিক ঐ ভাবানুভূতির সঙ্গে সঙ্গে জগদম্বা যাঁহাকে ঐ ভাবময় করিয়া কৃপায় নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাঁহার দর্শনও তোমার প্রাণে যুগপৎ উদয় হইবে, তাঁহার 'নির্ম্মাণমোহ' মূর্ত্তিতে প্রাণের ভক্তি শ্রদ্ধা তুমি আপনা হইতেই ঢালিয়া দিবে। ঠাকুর উহা প্রার্থনা করিবেন না—অপরেও কেহ তোমায় ঐরূপ করিতে বলিবে না, তুমি জগদম্বার প্রতি প্রেমে আপনিই উহা করিয়া ফেলিবে। এ বিষয়ে আর অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন।

জগদম্বার ইচ্ছায় গুরুভাব কাহারও ভিতর কিঞ্চিন্মাত্র সহজ বা ঘনীভূত হইলে ঐ পুরুষের কার্য্যকলাপ, বিহার, ব্যবহার এবং অপরের প্রতি অহেতুকী করুণাপ্রকাশ সকলই মানব-বুদ্ধির অগম্য এক অদ্ভুতাকার যে ধারণ করে, ভারতের তন্ত্রকার একথা বারম্বার বলিয়াছেন। ঐ ভাবের ঐরূপ বিকাশকে তন্ত্র দিব্যভাবাখ্যা প্রদান করেন এবং ঐ দিব্যভাবে ভাবিত পুরুষদিগের অপরকে শিক্ষাদীক্ষাদি দান শাস্ত্রবিধিবদ্ধ নিয়ম সকলের বহির্ভূত অসম্ভাবিত উপায়ে হইয়া থাকে, একথাও বলেন। কাহারও প্রতি করুণায় ইচ্ছা বা স্পর্শ মাত্রেই তাঁহারা ঐ ব্যক্তিতে ধর্ম্মশক্তি সম্যক্ জাগ্রত করিয়া তদ্দণ্ডেই সমাধিস্থ করিতে পারেন; অথবা আংশিক ভাবে তদ্দণ্ডে ঐ শক্তিকে তাহাদের ভিতর জাগ্রত করিয়া এ জন্মেই যাহাতে উহা সম্যক্ ভাবে জাগরিতা হয় ও সাধককে যথার্থ ধর্ম্মলাভে কৃতার্থ করে, তাহাও করিয়া দিতে পারেন। তন্ত্র বলেন, গুরুভাবের ঈষৎ ঘনীভূতাবস্থায় আচার্য্য শিষ্যকে 'শাক্তী' দীক্ষাদানে এবং বিশেষ ঘনীভূতাবস্থায় 'শাম্ভবী' দীক্ষাদানে সমর্থ হইয়া থাকেন। আর সাধারণ গুরুদেরই শিষ্যকে 'মান্ত্রী বা আনবী' দীক্ষা-দান তন্ত্রনির্দ্দিষ্ট। 'শাক্তী' ও 'শাম্ভবী' দীক্ষা সম্বন্ধে রুদ্রজামল, ষড়ম্বয় মহা-রত্ন, বায়বীয় সংহিতা, সারদা, বিশ্বসার প্রভৃতি সমস্ত তন্ত্র এক কথাই বলিয়াছেন। আমরা এখানে বায়বীয় সংহিতার শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করিলাম। যথা,—

শাম্ভবী চৈব শাক্তী চ মান্ত্রী চৈব শিবাগমে।
দীক্ষোপদিশ্যতে ত্রেধা শিবেন পরমাত্মনা॥
গুরোরালোকমাত্রেণ স্পর্শাৎ সম্ভাষণাদপি।
সদ্যঃ সংজ্ঞা ভবেজ্জন্তোর্দ্দীক্ষা সা শাম্ভবী মতা॥
শাক্তী জ্ঞানবতী দীক্ষা শিষ্যদেহং প্রবিশ্যতি।
গুরুণা জ্ঞানমার্গেন ক্রিয়তে জ্ঞানচক্ষুষা॥
মান্ত্রী ক্রিয়াবতী দীক্ষা কুম্ভমণ্ডলপূর্ব্বিকা।

* * * * *

অর্থাৎ—

আগমশাস্ত্রে 'পরমাত্মা শিব তিন প্রকার দীক্ষার উপদেশ করিয়াছেন। যথা—শাম্ভবী, শাক্তী, ও মান্ত্রী। শাম্ভবী দীক্ষায় শ্রীগুরুর দর্শন, স্পর্শন বা সম্ভাষণ (প্রণামাদি) মাত্রেই জীবের তদ্দণ্ডে জ্ঞানোদয় হয়। শাক্তী দীক্ষায়

জ্ঞানচক্ষু গুরু দিব্যজ্ঞান সহায়ে শিষ্যের ভিতর নিজ শক্তি প্রবিষ্ট করাইয়া তাহার প্রাণে ধর্ম্মভাব জাগ্রত করাইয়া দেন। মান্ত্রী দীক্ষায় মণ্ডল অঙ্কিত, ঘটস্থাপন এবং দেবতার পূজাদিপূর্ব্বক শিষ্যের কর্ণে মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া দিতে হয়।

রুদ্রজামল বলেন—শাক্তী ও শাম্ভবী দীক্ষা সদ্যোমুক্তি-বিধায়িনী।

যথা—

শাক্তী চ শাম্ভবী চান্যা সদ্যোমুক্তিবিধায়িনী।

* * * *

সিদ্ধৈঃ স্বশক্তিমালোক্য তয়া কেবলয়া শিশোঃ।
নিরুপায়ং কৃতা দীক্ষা শাক্তেয়ী পরিকীর্ত্তিতা॥
অভিসন্ধিং বিনাচার্য্য শিষ্যয়োরুভয়োরপি।
দেশিকানুগ্রহেণৈব শিবতা ব্যক্তিকারিণী॥

অর্থাৎ—

সিদ্ধ পুরুষেরা অপর কোনওরূপ বাহ্যিক উপায় অবলম্বন না করিয়া কেবলমাত্র নিজ আধ্যাত্মিক শক্তিসহায়ে শিষ্যের ভিতর যে দিব্যজ্ঞানের উদয় করেন, তাহাকেই শাক্তী দীক্ষা কহে। শাম্ভবী দীক্ষায় আচার্য্য ও শিষ্যের মনে দীক্ষা প্রদান ও গ্রহণ করিব, পূর্ব্ব হইতে এরূপ কোন সংকল্প থাকে না। পরস্পরের দর্শন মাত্রেই আচার্য্যের হৃদয়ে সহসা করুণার উদয় হইয়া শিষ্যকে কৃপা করিতে ইচ্ছা হয় এবং উহাতেই শিষ্যের ভিতর অদ্বৈতবস্তুর জ্ঞানোদয় হইয়া সে শিষ্যত্ব স্বীকার করে।

পুরশ্চরণোল্লাস তন্ত্র বলেন, ঐ প্রকার দীক্ষায় শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট কালাকালের বিচারেরও আবশ্যকতা নাই। যথা—

দীক্ষায়াং চঞ্চলাপাঙ্গি ন কালনিয়মঃ ক্বচিৎ।
সদ্‌গুরোর্দ্দর্শনাদেব সূর্য্যপর্ব্বে চ সর্ব্বদা॥
শিষ্যমাহূয় গুরুণা কৃপয়া যদি দীয়তে।
তত্র লগ্নাদিকং কিঞ্চিৎ ন বিচার্য্যং কদাচন॥

অর্থাৎ—

হে চঞ্চলনয়নী পার্ব্বতি, বীর ও দিব্যভাবাপন্ন গুরুর নিকট হইতে দীক্ষাগ্রহণে কালবিচারের কোনও আবশ্যকতা নাই। উত্তরায়ণ কালে সদ্‌গুরুর দর্শনলাভ হইলে এবং তিনি কৃপা করিয়া শিষ্যকে দীক্ষা দিতে আহ্বান করিলে, লগ্নাদিবিচার না করিয়াই উহা লইবে।

সাধারণ দিব্যভাবাপন্ন গুরুর সম্বন্ধেই শাস্ত্র যখন ঐরূপ ব্যবস্থা নির্ণয় করিয়াছেন, তখন এ অলৌকিক ঠাকুরের জগদম্বার হস্তে সর্ব্বথা যন্ত্রস্বরূপ থাকিয়া অহেতুকী করুণায় অপরকে শিক্ষাদান ও ধর্ম্মশক্তি সঞ্চারের প্রকার আমরা আর কি নির্ণয় করিতে পারিব! কারণ, জগন্মাতা কৃপা করিয়া ঠাকুরের শরীরমনাশ্রয়ে এখন যে কেবল তন্ত্রোক্ত দিব্যভাবের খেলাই শুদ্ধ দেখাইতে লাগিলেন, তাহা নহে, কিন্তু এ কাল পর্য্যন্ত দিব্যভাবাপন্ন যাবতীয় গুরুগণ, যত মত তত পথ রূপ যে উদার ভাবের সাধন ও উপলব্ধি কখনও করেন নাই, জগদ্ধিতায় সেই মহদুদার ভাবের প্রকাশও এখন হইতে তাঁহার ভিতরে থাকিয়া করিতে লাগিলেন! তাই বলিতেছি, অতঃপর ঠাকুরের জীবনে এক নূতনাধ্যায় এখন হইতে আরম্ভ হইল।

ভক্তিমান শ্রোতা হয়ত আমাদের ঐ কথায় কুটিল কটাক্ষ করিয়া বলিবেন—তোমাদের ও সকল কি প্রকার কথা? ঠাকুরকে যদি ঈশ্বরাবতার বলিয়াই নির্দ্দেশ কর, তবে তাঁহার ঐ ভাব বা শক্তিপ্রকাশ যে কখন ছিল না, একথা আর বলিতে পারনা। ঐ কথার উত্তরে আমরা বলি, ভ্রাতঃ, ঠাকুরের কথাপ্রমাণেই আমরা ঐরূপ বলিতেছি। নরদেহ ধারণ করিয়া ঈশ্বরাবতার-দিগেরও সকল প্রকার ঈশ্বরীয় ভাব ও শক্তি-প্রকাশ সর্ব্বদা থাকে না, যখন যেটির আবশ্যক হয়, তখনই সেটি আসিয়া উপস্থিত হয়। কাশীপুরের বাগানে বহুকাল ব্যাধির সহিত সংগ্রামে ঠাকুরের শরীর যখন অস্থিচর্ম্মসার হইয়া দাঁড়াইয়াছিল,তখন তাঁহার অন্তরের ভাব ও শক্তির প্রকাশ লক্ষ্য করিয়া ঠাকুর একদিন আমাদিগকে বলিয়াছিলেন—

"মা দেখিয়ে দিচ্চে কি যে, (নিজের শরীর দেখাইয়া) এর ভিতর এখন এমন একটা শক্তি এসেছে যে, এখন আর কাহাকেও ছুঁয়ে দিতেও হবে না; তোদের বোল্‌বো ছুঁয়ে দিতে, তোরা দিবি, তাইতেই অপরের চৈতন্য হ'য়ে যাবে! মা যদি এবার (শরীর দেখাইয়া) এটা আরাম করে দেন্ তো দরজায় লোকের ভিড় ঠেলে রাখ্‌তে পারবি না—এত সব লোক আস্‌বে! এত খাট্‌তে হবে যে, ঔষধ খেয়ে গায়ের ব্যথা সারতে হবে!"

ঠাকুরের ঐ কথাগুলিতেই বুঝা যায়, ঠাকুর স্বয়ং বলিতেছেন যে, যে শক্তিপ্রকাশ তাঁহাতে পূর্ব্বে কখন অনুভব করেন নাই তাহাই তখন ভিতরে অনুভব করিতে ছিলেন। এইরূপ আরও অনেক দৃষ্টান্ত ঐ বিষয়ে দেওয়া যাইতে পারে।

দিব্যভাবের আবেগে ঠাকুর এখন ভক্তদিগকে ব্যাকুলচিত্তে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ডাকিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন নাই। যেখানে সংবাদ পৌঁছিলে তাঁহার দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানের কথা প্রায় সকল ভক্তগণ জানিতে পারিবে জগদম্বা ঠাকুরকে সে কথা প্রাণে প্রাণে বলিয়া তাঁহাকে বেলঘরিয়ার উদ্যানে অনাহূত হইলেও লইয়া যাইয়া ভক্তপ্রবর শ্রীযুত কেশবচন্দ্র সেনের সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দিলেন। ঐ ঘটনার অল্পদিন পর হইতেই ঠাকুরের কৃপা-সম্পদের বিশেষ ভাবে অধিকারী ভাবাবস্থায় পূর্ব্বে দৃষ্ট স্বামী বিবেকানন্দ ও ব্রহ্মানন্দপ্রমুখ ভক্ত সকলের একে একে আগমন হইতে থাকে। তাঁহাদের সহিত ঠাকুরের দিব্যভাবে লীলার কথা ঠাকুর বলাইলে আমরা অন্য সময় বলিবার চেষ্টা করিব।

স্বামি-শিষ্য-সংবাদ।

[শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বি,এ।]

কলিকাতা জুবিলি আর্ট একাডেমির অধ্যাপক ও প্রতিষ্ঠাতা বাবু রণদা প্রসাদ গুপ্ত মহাশয়কে সঙ্গে করিয়া শিষ্য আজ বেলুড় মঠে আসিয়াছে। রণদা বাবু শিল্পকলানিপুণ, সুপণ্ডিত ও স্বামীজির গুণগ্রাহী। আলাপ পরিচয়ের পর স্বামীজি রণদা বাবুর সঙ্গে শিল্পবিজ্ঞান বিষয়ে নানারূপ প্রসঙ্গ করিতে লাগিলেন। রণদা বাবুকে বহুধা উৎসাহিত করিয়া জুবিলি আর্ট একাডেমিতে একদিন যাইতেও ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু নানা অসুবিধায় স্বামীজির তথায় একবারও যাওয়া ঘটিয়া উঠে নাই।

স্বামীজি রণদা বাবুকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন—"সব দেশ দেখে এলুম, কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবকালে এদেশে যেমন শিল্পকলার বিকাশ দেখা যায়, তেমনটী আর কোথাও দেখিলাম না। মোগল বাদ্‌সাদের সময়েও ঐ বিদ্যার বিশেষ বিকাশ হয়েছিল; সেই বিদ্যার কীর্ত্তিস্তম্ভরূপে আজিও তাজমহল, কুতবমিনার প্রভৃতি ভারতবর্ষের বুকে দাঁড়িয়ে রয়েছে।"

"মানুষ যে জিনীসটী তৈয়িরি করে, তাতে কোন একটা idea express (মনোভাব প্রকাশ) করার নামই art (শিল্প)। যাতে ideaর (ঐরূপ ভাবের) expression (প্রকাশ) নাই, তাতে রং বিরংএর পরিপাটী থাক্‌লেও তাকে প্রকৃত আর্ট (শিল্প) বলা যায় না। ঘটী বাটী পেয়ালা প্রভৃতি নিত্যব্যবহার্য্য জিনিষপত্রগুলিও কোন ভাবপ্রকাশক-কল্পে তৈয়িরি

হওয়া উচিত। প্যারিস্ প্রদর্শনীতে পাথরের খোদাই এক অদ্ভুত মূর্ত্তি দেখেছিলাম। মূর্ত্তিটির পরিচায়ক এই কয়টী কথা নিচে লেখা—Art unveiling nature. ভাব হচ্চে শিল্প কেমন ক'রে প্রকৃতির নিবিড়াবগুণ্ঠন স্বহস্তে মোচন ক'রে ভিতরের রূপসৌন্দর্য্য দেখে মূর্ত্তিটী এমন ভাবে তৈয়িরি করেছে, যেন প্রকৃতিদেবীর রূপচ্ছবি এখনো স্পষ্ট বেরোয়নি; যতটুকু বেরিয়েছে, ততটুকুর সৌন্দর্য্য দেখেই শিল্পি যেন মুগ্ধ হ'য়ে গিয়েছে। যে ভাস্কর এই ভাবটী প্রকাশ কত্তে চেষ্টা করেছেন তাঁর প্রশংসা না ক'রে থাকা যায় না। ঐ রকমের মৌলিক (original) কিছু কত্তে চেষ্টা কর্‌বেন।

রণদা বাবু—আমারও ইচ্ছা আছে, সময় মত original modelling (নূতন ভাবের মূর্ত্তি) সব গড়তে; কিন্তু এদেশে উৎসাহ পাই না। অর্থা-ভাব, তার উপর আমাদের দেশে গুণগ্রাহী লোকের অভাব।

স্বামীজি।—আপনি যদি প্রাণ দিয়ে যথার্থ একটী খাঁটী জিনীস কত্তে পারেন, যদি artএ (শিল্পে) একটী ভাবও যথাযথ express (প্রকাশ) কত্তে পারেন, কালে নিশ্চয় তার appreciation (আদর) হবে। খাঁটী জিনীসের কখনো জগতে অনাদর হয়নি। এরূপও শুনা যায়, এক এক জন artist (শিল্পী) মরবার হাজার বছর পর হয় তো তার appreciation (কার্য্যের আদর) হ'লো!

রণদা বাবু।—তা ঠিক। কিন্তু আমরা যেরূপ অপদার্থ হ'য়ে পড়েছি, তাতে 'ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে সাহসে কুলায় না। এই পাঁচ বৎসরের চেষ্টায় আমি যাহোক্ কিছু কৃতকার্য্য হয়েছি। আশীর্ব্বাদ করুন যেন উদ্যম বিফল না হয়।

স্বামীজি।—যদি ঠিক ঠিক কার্য্যে লেগে যান, তবে নিশ্চয় successful (সফলকাম) হবেন। যে, যে বিষয়ে মন প্রাণ ঢেলে খাটে, তাতে তার success (সফলতা) ত হয়ই—তার পর চাই কি ঐ কার্য্যের তন্ময়তা থেকে ব্রহ্মবিদ্যা পর্য্যন্ত লাভ হয়। যে কোনও বিষয়ে প্রাণ দিয়ে খাট্‌লে ভগবান্ তার সহায় হন।

রণদা বাবু।—ওদেশ এবং এদেশের শিল্পের ভিতর তফাৎ কি দেখলেন?

স্বামীজি।—প্রায় সবই সমান। originality (নূতনত্ব) প্রায়ই দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। ঐ সব দেশে ফটো যন্ত্রের সাহায্যে এখন নানা চিত্র

তুলে ছবি আঁক্‌ছে। কিন্তু যন্ত্রের সাহায্য নিলেই originality (নূতন নূতন ভাব প্রকাশের ক্ষমতার) লোপ হয়ে যায়; নিজের ideaর expression দিতে (মনোগত ভাব প্রকাশ কর্‌তে) পারা যায় না। আগেকার ভাস্করগণ আপনাদের মাথা থেকে নূতন নূতন ভাব বাহির কর্‌তে বা সেইগুলি ছবিতে বিকাশ কত্তে চেষ্টা কত্তেন। এখন ফটোর অনুরূপ ছবি হওয়ায় মাথা খেলাবার শক্তি ও চেষ্টার লোপ হ'য়ে যাচ্ছে। তবে এক একটা জাতের এক একটা characteristic (বিশেষত্ব) আছে। আচারে ব্যবহারে আহারে বিহারে চিত্রে ভাস্কর্য্যে সেই বিশেষ ভাবের বিকাশ দেখ্‌তে পাওয়া যায়। এই ধরুন—ওদেশের গান বাজনা নাচের expression (বাহ্যিক বিকাশ) গুলি সবই pointed (সূচ্যগ্রের ন্যায় তীব্র); নাচছে যেন হাত পা ছুড়্‌ছে; বাজনাগুলির আওয়াজে কাণে যেন সঙ্গীনের খোঁচা দিচ্ছে; গানেরও ঐরূপ। এদেশের নাচে আবার যেন হেলে দুলে তরঙ্গের ন্যায় গড়িয়ে পড়্‌ছে, গানের গমক্ মূর্চ্ছনাতেও ঐরূপ (rounded movement) চক্রনীতির অনুবর্ত্তন দেখা যায়। বাজ্‌নাতেও তাই। অতএব art (শিল্প) সম্বন্ধেও বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিভিন্নরূপ বিকাশ হয়! যে জাতটা বড় materialistic (জড়বাদী ও ইহকাল সর্ব্বস্ব) তারা nature (প্রকৃতিগত নামরূপ) টাকেই ideal (চরমোদ্দেশ্য) ধরে নিজেদের idea (মনোভাব) গুলির ঐরূপ ভাবের expression (বিকাশ) শিল্পে দিতে চায়। যে জাতটা আবার প্রকৃতির অতীত একটা ভাব-প্রাপ্তিকেই ideal (জীবনের চরমোদ্দেশ্য) ধরে, সেটা ঐ ভাবই natureর প্রকৃতিগত শক্তিসহায়ে শিল্পে express (প্রকাশ) কত্তে চেষ্টা করেছে ও কর্‌ছে। প্রথম শ্রেণীর জাতিদের natureই (প্রকৃতিগত সাংসারিক ভাব ও পদার্থনিচয় চিত্রণই) হচ্ছে primary basis of art (শিল্পের ভিত্তি); আর দ্বিতীয় শ্রেণীর জাতগুলোর ideality (প্রকৃতির অতীত কোনও একটা ভাব প্রকাশই) হচ্ছে শিল্পবিকাশের মূল কারণ। ঐরূপে দুই বিভিন্ন উদ্দেশ্য ধ'রে শিল্প চর্চ্চায় অগ্রসর হলেও ফল উভয় শ্রেণীর প্রায় একই দাঁড়িয়েছে, উভয়েই আপন আপন ভাবে শিল্পোন্নতি করেছে। ওসব দেশের এক একটা ছবি দেখে আপনার সত্যই প্রাকৃতিক দৃশ্য ব'লে ভ্রম হবে। এদেশের সম্বন্ধেও তেমনি—পুরাকালে স্থাপত্য বিদ্যার যখন খুব বিকাশ হয়েছিল তখনকার এক একটী মূর্ত্তি দেখলে আপনাকে এই জড় প্রাকৃতিক রাজ্য

ভুলিয়ে একটা নূতন ভাবরাজ্যে যেন নিয়ে ফেল্‌বে। ওদেশে এখন যেমন আগেকার মত ছবি হয় না, এদেশেও তেমনি নূতন নূতন ভাববিকাশকল্পে ভাস্করগণের আর চেষ্টা দেখা যায় না। এই দেখুন না আপনাদের আর্টস্কুলের ছবিগুলিতে যেন কোন expression নাই, ভাবের বিকাশ নাই। আপনারা এখন হিন্দুদের নিত্য ধ্যেয় মূর্ত্তিগুলিতে প্রাচীন ভাবের উদ্দীপক expression (বহিঃপ্রকাশ) দিয়ে আঁক্‌বার চেষ্টা কত্তে পাবেন।

রণদাবাবু।—আপনার কথায় হৃদয়ে মহোৎসাহ হয়। চেষ্টা করে দেখ বো—আপনার কথামত কার্য্য কর্‌তে চেষ্টা কর্‌বো।

স্বামীজি আপন মনে আবার বলিতে লাগিলেন—"এই মনে করুন মা কালীর ছবি। এতে যুগপৎ ক্ষেমঙ্করী ও ভয়ঙ্করী মূর্ত্তির সমাবেশ। ঐ ছবিতে কোন খানিতে কিন্তু ঐরূপ ভাবের expression (প্রকাশ) দেখা যায় না। তা দূরে যাক্—এর একটা ভাবেরও চিত্রে ঠিক্ ঠিক্ বিকাশ কত্তে কারুর চেষ্টা নাই! আমি মা কালীর ভীমামূর্ত্তির কিছু idea (ভাব) 'Kali the Mother' (জগন্মাতা কালী) নামক আমাব ইংরাজী কবিতাটায় লিপিবদ্ধ করতে চেষ্টা করেছি। আপনি ঐ ভাবটা একখানা ছবিতে express কর্ত্তে পারেন কি?

রণদাবাবু।—কি ভাব?

স্বামীজি শিষ্যের পানে তাকাইয়া তাঁহার ঐ কবিতাটি উপর হইতে আনিতে বলিলেন। শিষ্য লইয়া আসিলে স্বামীজি উহা ("The stars are blotted out" &c) রণদা বাবুকে পড়িয়া শুনাইতে লাগিলেন। স্বামীজির ঐ কবিতাটি পাঠের সময় শিষ্যের মনে হইতে লাগিল, যেন মহাপ্রলয়ের সংহারমূর্ত্তি তাহার কল্পনাসমক্ষে নৃত্য করিতেছে। রণদা বাবুও কবিতাটি শুনিয়া কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ বাদে রণদাবাবু যেন কল্পনানয়নে ঐ চিত্রটি দেখিতে পাইয়া "বাপ্" বলিয়া ভীত-চকিত নয়নে স্বামীজির মুখপানে তাকাইলেন।

স্বামীজি।—কেমন এই idea (ভাবটা) চিত্রে বিকাশ কত্তে পার্‌বেন ত?

রণদাবাবু।—আজ্ঞে চেষ্টা করবো। কিন্তু ঐ ভাবের কল্পনা কর্‌তেই যেন মাথা ঘুরে যাচ্ছে।

স্বামীজি।—এঁকে আমাকে দেখাবেন। তার পর আমি উহা সর্ব্বাঙ্গ-সম্পন্ন কর্‌তে আরও যা যা দরকার তা আপনাকে ব'লে দিব।

শিষ্য তখন রণদাবাবুর সঙ্গে একত্র থাকিত। তাহার জানা আছে, রণদাবাবু বাড়ী ফিরিয়া পরদিন হইতেই ঐ রণচণ্ডী মূর্ত্তি আঁকিতে আরম্ভ করেন। আজিও সেই অর্দ্ধঅঙ্কিত মূর্ত্তিখানি রণদাবাবুর আর্টস্কুলে রহিয়াছে। কিন্তু স্বামীজিকে তাহা আর দেখান হয় নাই।

অতঃপর স্বামীজি রামকৃষ্ণমিসনের শিলমোহরের জন্য কমলদল-বিকশিত হ্রদমধ্যে হংসরাজিত সর্প-পরিবেষ্টিত যে ক্ষুদ্র ছবিটি করিয়াছিলেন, তাহা আনাইয়া রণদাবাবুকে দেখাইয়া তৎসম্বন্ধে নিজ মতামত প্রকাশ করিতে বলিলেন। রণদাবাবু প্রথম উহার মর্ম্মপরিগ্রহণে অসমর্থ হইয়া স্বামীজিকেই উহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিলেন।

স্বামীজি বুঝাইয়া দিলেন, চিত্রস্থ তরঙ্গায়িত সলিলরাশি—কর্ম্মের, কমলগুলি—ভক্তির, এবং উদয়মান সূর্য্যটি জ্ঞানের প্রকাশক। চিত্রগত সর্প-পরিবেষ্টনটি—যোগ এবং জাগ্রত কুণ্ডলিনীশক্তির পরিচায়ক। আর চিত্র-মধ্যস্থ হংস-প্রতিকৃতিটির অর্থ পরমাত্মা। অতএব, কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞান, যোগের সহিত সম্মিলিত হইলেই পরমাত্মার সন্দর্শন লাভ হয়—চিত্রের ইহাই অর্থ।

রণদাবাবু চিত্রটির ঐরূপ অর্থ শুনিয়া নির্ব্বাক্ হইয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে বলিলেন, আপনার নিকটে কিছুকাল শিল্পকলা বিদ্যা শিখিতে পারিলে আমার ঐ বিষয়ে বাস্তবিক উন্নতি হইতে পারিত।

অত:পর স্বামীজি ভবিষ্যতে মঠমন্দির যে ভাবে নির্ম্মাণ করিতে তাঁহার ইচ্ছা, তাহারই একখানি চিত্র (drawing)—এই চিত্রখানি স্বামী বিজ্ঞানানন্দ স্বামীজির পরামর্শমত অঙ্কিত করিযাছিলেন—আনাইযা রণদাবাবুকে দেখাইতে দেখাইতে বলিতে লাগিলেন,—এই ভাবী মঠমন্দিরটির নির্ম্মাণে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় শিল্পকলাব একত্র সমাবেশ হবে। আমি পৃথিবী ঘুরে গৃহশিল্পসম্বন্ধে যত সব idea (ভাব) নিয়ে এসেছি, তাহার সকলগুলিই এই মন্দির নির্ম্মাণে বিকাশ করবার চেষ্টা করবো। বহুসংখ্যক জড়িত স্তম্ভের উপর একটি প্রকাণ্ড নাটমন্দির তৈরি হবে। উহার দেয়ালে শত সহস্র প্রফুল্ল কমল ফুটে থাকবে। হাজার লোক যাতে একত্র ব'সে ধ্যান জপ কত্তে পারে, এটি এমন বড ক'রে নির্ম্মাণ করতে হবে। আর মন্দিরটী এমন ভাবে গ'ড়ে তুলতে হবে যে, দূর থেকে দেখ্‌লে ঠিক ওঁকার ব'লে ধারণা হবে। মন্দিরমধ্যে একটী রাজহংসের উপর ঠাকুরের মূর্ত্তি থাকবে। দোরে দুদিকে দুটী ছবি এইভাবে থাকবে—একটী সিংহ ও একটী

মেষ বন্ধুভাবে উভয়ে উভয়ের গা চাট্‌ছে। অর্থাৎ মহাশক্তি ও মহানম্রতা যেন প্রেমে একত্র সম্মিলিত হইয়াছে! মনে এই সব idea (ভাব) রয়েছে; এখন জীবনে কুলায় তো কার্য্যে পরিণত ক'রে যাব। নতুবা ভাবী generation (বংশীয়েরা) ক্রমে ঐগুলি কার্য্যে পরিণত কত্তে চেষ্টা করবে। আমার মনে হয়, ঠাকুর এসেছিলেন দেশের সকল প্রকার বিদ্যা ও ভাবের ভিতরেই প্রাণসঞ্চার কত্তে। সেজন্য ধর্ম্ম কর্ম্ম বিদ্যা জ্ঞান ভক্তি সমস্তই যাতে এই মঠ-কেন্দ্র থেকে জগতে ছড়িয়ে পড়ে, এমন ভাবে ঠাকুরের এই মঠটি গ'ড়ে তুলতে হবে। এ বিষয়ে আপনারা আমার সহায় হোন।

রণদাবাবু ও উপস্থিত সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণ স্বামীজির কথাগুলি শুনিয়া অবাক্ হইয়া বসিয়া রহিলেন। যাঁহার মহদুদার মন, সকল বিষয়ের সকল প্রকার মহান্ ভাবরাশির ঐরূপ অদৃষ্টপূর্ব্ব ক্রীড়াভূমি, তাঁহার মহত্বের কথা ভাবিয়া সকলে একটা অব্যক্ত ভাবে পূর্ণিত হইয়া স্তব্ধীভূত হইয়া রহিলেন।

অল্পক্ষণ পরে স্বামীজি আবার বলিলেন—"আপনি শিল্পবিদ্যার যথার্থ আলোচনা করেন ব'লেই আজ ঐ সম্বন্ধে এত চর্চ্চা হচ্চে। আপনি শিল্পসম্বন্ধে এতকাল আলোচনা ক'রে ঐ বিষয়ের যাহা কিছু সার সর্ব্বোচ্চ ভাব পেয়েছেন, তাই এখন আমাকে বলুন।

রণদাবাবু। মহাশয়, আমি আপনাকে নূতন কথা কি শুনাব, আপনিই ঐ বিষয়ে আজ আমার চোক ফুটিযে দিলেন। শিল্পসম্বন্ধে এমন জ্ঞানগর্ভ কথা এ জীবনে আর কখনো শুনি নাই। আশীর্ব্বাদ করুন, আপনার নিকট যে সকল ভাব পাইলাম, তাহা যেন কার্য্যে পরিণত করিতে পারি।

অতঃপর স্বামীজি আসন হইতে উঠিয়া ইতস্ততঃ বেড়াইতে বেড়াইতে শিষ্যকে বলিলেন "ছেলেটী খুব তেজস্বী"।

শিষ্য।—মহাশয়, আপনার কথা শুনিয়া অবাক্ হইয়া গিয়াছে।

স্বামীজি শিষ্যের ঐ কথার কোনও উত্তর না করিয়া আপন মনে গুন্ গুন্ করিয়া ঠাকুরের একটী গান গাহিতে লাগিলেন—"পরম ধন পরশমণি" ইত্যাদি।

এইরূপে কিছুক্ষণ বেড়াইবার পর স্বামীজি মুখ ধুইয়া শিষ্য সমভিব্যাহারে উপরে নিজের ঘরে প্রবেশ করিলেন এবং Encyclopedia Britannica পুস্তকের শিল্প সম্বন্ধীয় অধ্যায়টী কিছুক্ষণ পাঠ করিলেন। পাঠ সাঙ্গ হইলে পূর্ব্ববঙ্গের কথা এবং উচ্চারণের ঢং লইয়া শিষ্যের সঙ্গে সাধারণ ভাবে ঠাট্টা তামাসা করিতে লাগিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দের সাধনফল।

[শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ]

(২৯শে জানুয়ারী, ১৯১০ খৃঃ
৺কাশীধামে "রামকৃষ্ণ অদ্বৈতাশ্রমে" স্বামী বিবেকানন্দের
জন্মোৎসব উপলক্ষে পঠিত।)

যদি কোন সংসারী ব্যক্তি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে জানাইতেন যে, পুত্র কলত্র লইয়া সংসারে বিজড়িত হইয়াছি, আমাদের উপায় কি ? শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন যে, যে পুত্রের মমতায় ঈশ্বরে মনোনিবেশ করিতে পারিতেছ না, সেই পুত্রকে রাম জ্ঞান করিয়া লালন পালন করিও, তোমার ঈশ্বরলাভ হইবে। আপত্তি উঠিত যে, রামজ্ঞানে সেবা করিলে পুত্র অবাধ্য হইবে, স্বেচ্ছাচার হইয়া যাহা ইচ্ছা করিবে, অশিক্ষিত থাকিবে, অতএব যে পুত্রের মমতায় তিনি সংসারে আবদ্ধ হইয়াছেন, পুত্রের ভাবী মঙ্গলকামনায় সেই মমতাই তাঁহাকে রামজ্ঞানে পূজা করিতে বিরত রাখিবে। তাহার উত্তর শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে দেখিতে পাওয়া যায়। উদ্বোধনে "রামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গে" বর্ণিত আছে যে, কোন এক সন্ন্যাসীর নিকট হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ রামলালা ঠাকুর পান। রামলালা অর্থে বালক রাম। সেই বালক রাম যেন তাঁহার পুত্র হইল, তাঁহাকে লালন পালন করেন, সঙ্গে লইয়া ফেরেন, বেয়াদব হইলে ধমক দেন, এমন কি তাঁহার শ্রীমুখে শুনিয়াছি যে "একদিন কথা না শুনিয়া রামলালা জলে সাঁতার দিতেছিল, আমি তাহাকে শাসিত করিবার জন্য জলে চুবাইয়া ধরিয়াছিলাম।" বলিতে বলিতে সহস্র ধারায় শ্রীরামকৃষ্ণের বুক ভাসিয়া গেল। অবশ্য সন্ন্যাসি-প্রদত্ত রামলালা একটী ক্ষুদ্র বিগ্রহ, যেটী অদ্যাবধি দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীকালীর মন্দিরে আছে। শ্রীরামকৃষ্ণের রামলালা ভাবের রামলালা, ভাবে তাহাকে প্রতিপালন করিতেন এবং ভাবে শাসিত করিতেন। যিনি এই ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া স্বীয় পুত্রকে রামলালার ন্যায় প্রতিপালন করিবেন, পুত্রকে রামজ্ঞানে প্রতিপালন করিলে পুত্র অবাধ্য হইয়া পরিণামে মন্দ হইয়া পড়িবে, এরূপ আশঙ্কা করিতে পারেন না। কেননা অপার প্রেমে পুত্রকে যশোদার ন্যায় শাসন-মানসে বন্ধনও করিতে পারেন ; এবং যশোদাও যেরূপ একমাত্র গোপালকে প্রতিপালন করিয়া পরম জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন, যে সংসারী রামজ্ঞানে

পুত্রকে প্রতিপালন করিবেন, তিনিও সেইরূপ পরমজ্ঞানের অধিকারী হইবেন। পুত্রকে রামজ্ঞানে প্রতিপালন করিলেই বুঝিবেন, রাম ক্ষুদ্র নয়; পুত্র রামে তাঁহার ধ্যানজ্ঞান হইলে দেখিতে পাইবেন যে, রাম অতি বৃহৎ; দেখিবেন সর্ব্বভূতে রাম, বিশ্বব্যাপী রাম জানিয়া রামে লয় হইবেন। সংসারীকে শ্রীরামকৃষ্ণ এইরূপ প্রকৃতি অনুসারে ঈশ্বরলাভের পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া দিতেন।

আবার যে ব্যক্তি তীব্র বৈরাগ্যে ঈশ্বরলাভ-আশায় তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতেন, তাঁহাকে তাঁহার প্রকৃতি অনুসারে নির্জ্জনে ধ্যানারূঢ় হইতে উপদেশ প্রদান করিতেন। তাঁহারও প্রথমে ইষ্টধ্যান একটী ক্ষুদ্র মূর্ত্তি, সেই মূর্ত্তি বৃহৎ হইতে বৃহত্তর হইয়া বিশ্বব্যাপী ভাবে সাধককে বিশ্বের সহিত মিলাইয়া লইত। এরূপ সাধনার বিরুদ্ধে কেহ কেহ আপত্তি তুলিয়া বলেন যে, জড়বৎ সংসারে কোনও কার্য্য না লইয়া থাকা কখনই ঈশ্বরের অভিপ্রেত নয়। সংসারে আসিয়া যদি সংসারের কার্য্য না করিলাম, সে তো একপ্রকার অকর্ম্মণ্য জীবনভার বহনমাত্র। এ আপত্তিরও প্রতিবাদ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন। দ্বাদশ বৎসর ধ্যানারূঢ় থাকিয়া সেই বিশ্ব-প্রেমিকের কার্য্য রামকৃষ্ণমিশনরূপ ধারণ করিয়া সুদূর আমেরিকা পর্য্যন্ত বিকাশ পাইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, পদ্ম প্রস্ফুটিত হইলে ভ্রমর আপনিই আসে, শ্রীরামকৃষ্ণ-নাম-প্রফুল্লসরোজে মধুলোভে দলে দলে সাধক-রূপ ভ্রমর আসিতেছে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পূর্ব্বোক্ত সাধনের দুইটী পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এবং প্রকৃতি অনুসারে তাঁহার শিষ্যেরা নিজ নিজ পন্থায় সিদ্ধিলাভ করিতেছেন। শ্রীশ্রীবিবেকানন্দ এই উভয় সাধনেই সিদ্ধ ছিলেন। ঈশ্বরলুব্ধচিত্ত বালক নরেন্দ্রনাথ ঈশ্বরলাভের উপায় জানিবার জন্য কলিকাতাস্থ সমস্ত ধর্ম্মসম্প্রদায়ে উপস্থিত হইয়া উপদেশ যাচ্ঞা করিয়াছিলেন—কিরূপে ঈশ্বরলাভ হইতে পারে। প্রত্যেক সম্প্রদায়ই সাম্প্রদায়িক মত তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, কিন্তু কোন সম্প্রদায়ের কোন ব্যক্তি তাঁহার একটী উদার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন নাই। প্রশ্ন—ঈশ্বর দেখিয়াছেন কি? এ প্রশ্নের উত্তরে কেহই 'হ্যাঁ' বলিতে সক্ষম হন নাই। এ প্রশ্নের উত্তর নরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে পান।

ভক্তচূড়ামণি ৺রামচন্দ্র দত্ত নরেন্দ্রনাথের সুবাদে দাদা ছিলেন। তাঁহারই

সহিত তিনি দক্ষিণেশ্বরে যান। যেরূপ অন্যান্যস্থলে জিজ্ঞাসা করিতেন, শ্রীরামকৃষ্ণকেও সেইরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি ঈশ্বর দর্শন করিয়াছেন?" শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তর করিলেন,—"হাঁ, যেরূপ তুমি আমায় সম্মুখে বসিয়া আছ, ঈশ্বর ইহা হইতেও অধিক প্রত্যক্ষের বস্তু। আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি, ইচ্ছা কর তুমিও প্রত্যক্ষ করিতে পারো।" ঈশ্বরলুব্ধচিত্ত একেবারে আকুল হইয়া পড়িল। কিরূপে ঈশ্বরলাভ করিবেন,এ নিমিত্ত তাঁহার যেরূপ ব্যাকুলতা, তাঁর গুরুরও সেইরূপ শিক্ষা প্রদান,—গুরুর উপদেশে বুঝিয়াছিলেন নির্ব্বিকল্প-সমাধিলাভ অতি উচ্চ অবস্থা। তাঁহার মনে বাসনা জন্মে যে, যতদিন দেহ থাকে, তিনি সেই নির্ব্বিকল্প অবস্থায় থাকিবেন এবং মধ্যে মধ্যে সমাধিভঙ্গ হইলে দেহ রক্ষার্থে কিঞ্চিৎ আহার করিয়া আবার সমাধিস্থ হইবেন। এই অবস্থা তিনি গুরুর নিকট প্রার্থনা করেন। তাহাতে তাঁহার গুরু বলেন,—"এরূপ স্বার্থপর হইও না, তুমি নির্ব্বিকল্প-সমাধিলাভ করিবে কিন্তু পরহিতসাধন তোমার জীবনের কার্য্য হোক। তোমায় ঈশ্বর বৃহৎ বটবৃক্ষের ন্যায় সৃজন করিয়াছেন, যাহার স্নিগ্ধ ছায়ায় বহুপ্রাণী শীতল হইবে। এই উপদেশের হৃদয়ে অটল ধারণা রাখিয়া নরেন্দ্রনাথ বিবেকানন্দ হইয়াছিলেন। যে বিবেকানন্দ জগৎ-প্রেমে জগৎকে জ্ঞান দানের নিমিত্ত কৌপিনধারী হইয়া দেশদেশান্তরে দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, সেই বিবেকানন্দ-সৃষ্টির ভিত্তি উপরোক্ত আদেশ।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সংসারী ও ত্যাগীকে দুই ভাবে উপদেশ দিতেন, দুইভাবের সাধনেই ঈশ্বরলাভ হয়। স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যেরাও সেই দুইভাবে উপদেশ পাইয়াছেন। স্বামীজির উপদেশে কেহ বা সকল মূর্ত্তি নারায়ণের মূর্ত্তি জ্ঞানে নারায়ণ সেবায় প্রবৃত্ত হইয়া সেবাশ্রমে সাধন করিতেছেন, আবার কেহ বা ধ্যানে জগৎব্যাপী শ্রীবিশ্বনাথের দর্শন-আশায় অদ্বৈতাশ্রমে অদ্বৈত-জ্ঞানলাভে প্রবৃত্ত। প্রবৃত্তি অনুসারে অদ্বৈত ও সেবাশ্রম চলিতেছে। দুই আশ্রমের উপদেষ্টা স্বামী বিবেকানন্দ। দুই আশ্রমই তাঁহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সাধন পথে অগ্রসর। কারণ, পূর্ব্বে বলিয়াছি, দুই সাধনেই তিনি সিদ্ধ ছিলেন।

কথা আছে, চন্দন ও বিষ্ঠায় সমজ্ঞান হইলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। কিন্তু সে অবস্থা যে কি, তাহা অনুভব করা অতি কঠিন। কিন্তু রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের সেবক স্বামি বিবেকানন্দের শিষ্যগণের নিকট সে অবস্থা উপলব্ধি করা

কঠিন নয়। যে সকল উৎকট রোগাক্রান্ত ব্যক্তির নিকটে সাধারণে ঘৃণায় যাইতে পারে না, স্বামি বিবেকানন্দের শিষ্যেরা অনায়াসে নারায়ণ জ্ঞানে তাহাদের মলমূত্র পরিষ্কার করিতেছেন,—পুত্রকে মাতা যেরূপ পরিষ্কার করেন—সেইরূপে। কারণ তাহাদের শিক্ষাদাতা স্বামি বিবেকানন্দ নিজ জীবনে অনুষ্ঠান করিয়া উহা শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। (একদা বিবেকানন্দ তাঁহার গুরু ভ্রাতা ৺নিরঞ্জনানন্দের সহিত ৺পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে অতিথি হন। একদিন ভ্রমণ করিতে গিয়া দেখেন, এক ব্যক্তি রক্তামাশয় পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া পথে পড়িয়া আছে, দারুন শীত,অঙ্গে সামান্য বস্ত্র মাত্র, মলদ্বার বহিয়া মল নিঃসৃত হইতেছে,—যন্ত্রণায় অধীর—আর্ত্তনাদ করিতেছে। মুমুর্ষু ব্যক্তিকে কিরূপে আশ্রয় দিবেন বিবেকানন্দের চিন্তা উপস্থিত হইল। পরের বাটীতে অতিথি হইয়াছেন, আমাশয় দুরন্ত রোগ, যে গৃহে সে রোগী থাকে, সে গৃহ বিষ্ঠাময় হইয়া যায়। রোগী লইয়া গেলে যদি পূর্ণবাবু বিরক্ত হন, যাহা হউক দুই ভ্রাতায় পরামর্শ করিয়া রোগীকে তুলিলেন, উভয়ে মিলিয়ে ধীরে ধীরে পূর্ণবাবুর বাসায় লইয়া আসিলেন, রোগীকে পরিষ্কার করিয়া দিয়া অগ্নিদ্বারা সেক দিতে লাগিলেন। উভয়ে যেরূপ সেবায় প্রবৃত্ত হইলেন, এরূপ সেবা যদি কেহ পিতার করেন, তাহাও প্রশংসনীয়। উচ্চ কার্য্যের এমনি আশ্চর্য্য মহিমা যে, পূর্ণ বাবু বিরক্ত হইবেন বলিয়া তাঁহারা আশঙ্কা করিয়াছিলেন সেই পূর্ণ বাবুই তখন সন্ন্যাসী-দ্বয়ের কার্য্য দর্শনে মুগ্ধ! পূর্ণ বাবু ভাবিলেন—কি আশ্চর্য্য সন্ন্যাসীদ্বয়! সন্ন্যাসীরা স্বতন্ত্র থাকে, অন্যের স্পর্শ অপবিত্র জ্ঞান করে—একি অপূর্ব্ব সন্ন্যাস বৃত্তি—এরূপ রোগী-সেবা যাহার অন্তর্গত! তদবধি পূর্ণ বাবু শ্রীরাম-কৃষ্ণদেবের সন্ন্যাসীগণকে অন্য প্রকার দৃষ্টিতে দেখিতেন। আমাদের কেহ যেরূপ সমালোচনা করেন, যে সংসার পরিত্যাগ করিয়া গেরুয়া ধারণ করাটা অলস ব্যক্তির কার্য্য, যাহারা পরিশ্রমে পরাঙ্মুখ, তাহারাই ঐরূপে গেরুয়াধারী হয় পূর্ণবাবুরও কতকটা সেরূপ সংস্কার ছিল, সে ধারণা তদবধি তাঁহার সমূলে উৎপাটিত হইল।)

(সর্ব্বভূতে নারায়ণ দৃষ্টি সম্বন্ধে স্বামি বিবেকানন্দের জীবনে আর এক দৃষ্টান্ত বলিব—ভ্রমণ করিতে করিতে একদিন তাঁহার তাম্রকূট সেবনে ইচ্ছা হয়,দেখিলেন এক বৃক্ষতলে কয়েকজন ব্যক্তি বসিয়া ধূমপান করিতেছে, তিনি তাহাদের নিকট কলিকা প্রার্থী হইলেন। সন্ন্যাসীর বেশ দেখিয়া তাহাদের

মধ্যে একজন উত্তর করিল,—"মহারাজ হাম লোগ ভঙ্গী হায়।" ভঙ্গী অর্থে ম্যাথর। বিবেকানন্দের শ্রীমুখে শুনিয়াছি, ইহা শুনিয়া তাঁহার মন একবার পশ্চাদ্গামী হইল, কিন্তু পরক্ষণেই তিনি আত্ম-তিরস্কার করিয়া ভাবিলেন যে, আমি কি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যের উপযুক্ত নই যে 'ভঙ্গী' নাম শুনিয়া আত্মাভিমানে পশ্চাৎপদ হইতেছি? যে শ্রীরামকৃষ্ণ অভিমান দূর করণার্থ স্বহস্তে আবর্জ্জনা-স্থান ধৌত করিয়া আপন লম্বিত কেশ দ্বারা উহা মুছিয়া দিতেন, সেই রামকৃষ্ণের পদাশ্রিত হইয়া আমার এতদূর অভিমান! বিদ্যুদ্বেগে এই সকল চিন্তা তাঁহার হৃদয়ের ভিতর দিয়া চলিয়া গেল এবং তিনি ছিলিম লইয়া ধূমপান করিলেন। আমরা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পাদস্পর্শ করায় স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের সহিত সমভাবে কথাবার্ত্তা কহিতেন। আমি তাঁহার নিকট হইতে পূর্ব্বোক্ত কথা শুনিয়া পরিহাস করিয়া বলিলাম,—"তুই গাঁজাখোর, তামাক খাবার ঝোঁকে ম্যাথরের কল্‌কে টেনেছিলি।" বিবেকানন্দ উত্তর করিলেন, "না হে,ইহাতে গুরুদেব আমাকে জীবনরক্ষাপ্রদ শিক্ষা দিয়াছিলেন, আমি আর কাহাকেও ঘৃণা করিতাম না।" দৃষ্টান্তস্বরূপ বলিলেন—"আমি এক স্থানে আছি, তথায় আমার নিকট উপদেশ লইবার জন্য দলে দলে লোক আসিতে লাগিল। তিন দিন অনবরত লোকসমাগম, আলাপ করিয়া সকলে উঠিয়া যায়, কিন্তু আমার আহার হইয়াছে কিনা, তাহা কেহ একবার জিজ্ঞাসাও করে না। তৃতীয় রাত্রে যখন সকলে চলিয়া গিয়াছে, এক দীন ব্যক্তি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল যে, 'মহারাজ, আপনি তিন দিন তো অনবরত কথাবার্ত্তা কহিতেছেন, কিন্তু জলপান পর্য্যন্ত করেন নাই, ইহাতে আমার ব্যথা লাগিয়াছে।' আমি ভাবিলাম নারায়ণ স্বয়ং দীনবেশে আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি কিছু আমাকে আহার করিতে দিবে? সে ব্যক্তি অতি কাতরভাবে বলিল, আমার প্রাণ চাহিতেছে, কিন্তু কিরূপে আমার প্রস্তুত করা রুটি দিব! যদি বলেন, আমি আটা ডাল আনি, রুটী ডাল প্রস্তুত করিয়া লউন।' সে সময় আমি সন্ন্যাসীর নিয়মানুসারে অগ্নি স্পর্শ করি না। তাহাকে বলিলাম, তোমার প্রস্তুত করা রুটী আমাকে দাও, আমি তাহাই আহার করিব। শুনিয়া সে ব্যক্তি ভয়ে অভিভূত! সে খেত্‌রির রাজার প্রজা, রাজা যদি শোনেন যে, চামার হইয়া সন্ন্যাসীকে তাহার প্রস্তুত করা রুটী দিয়াছে, তাহা হইলে রাজা তাহাকে গুরুতর শাস্তি প্রদান করিবেন এবং তাহাকে স্বদেশ হইতে দূর করিয়া

দিবেন। আমি তাহাকে বলিলাম, তোমার ভয় নাই, রাজা তোমাকে শাস্তি দিবেন না। এ কথায় তাহার সম্পূর্ণ প্রত্যয় জন্মিল না। কিন্তু বলবান দয়াপ্রভাবে ভাবী অনিষ্ট উপেক্ষা করিয়া ভোজ্য বস্তু আনিয়া দিল।” বিবেকানন্দ বলেন—‘সে সময়ে দেবরাজ ইন্দ্র স্বর্ণ-পাত্রে সুধা আনিয়া দিলে সেরূপ তৃপ্তিকর হইত কি না সন্দেহ।’ বিবেকানন্দের নয়নধারা নির্গত হইতে লাগিল। ঐ ব্যক্তির দয়া দেখিয়া স্বামীজি সেদিন মনে মনে ভাবিয়াছিলেন,—এইরূপ শত সহস্র উচ্চচেতা ব্যক্তি কুটীরে অবস্থান করে, আমরা তাহাদিগকে হীন বলিয়া ঘৃণা করি। স্বামী বিবেকানন্দের নীচ জাতির প্রতি অসীম সহানুভূতি উদ্দীপিত করিবার ঐ ঘটনা একটী বিশেষ কারণ। তিনি বলিতেন, তাঁহাকে নিরভিমান করিবার জন্য ঐ শিক্ষা উপস্থিত হইয়াছিল।

অভিমান যে কিরূপ দৃঢ়মূল, তাহা বুঝাইবার জন্য দৃষ্টান্তচ্ছলে তিনি আমাদের নিকট আর একটী ঘটনার উল্লেখ করেন। যখন তিনি খেত্‌রির রাজার অতিথি, তখন খেত্‌রির রাজা একদিন জনৈক প্রৌঢ়া স্ত্রীলোককে গান গাহিতে আনিলেন। বিবেকানন্দ ভাবিলেন, সঙ্গীত-ব্যবসায়ী স্ত্রীলোক কখনও সুচরিত্রা হইতে পারে না, বিশেষতঃ তিনি স্ত্রীলোকের গান শোনেন না। সে স্থান হইতে চলিয়া যাইবেন ভাবিয়া উঠিলেন,—খেত্‌রির রাজা তাঁহাকে বিশেষ অনুরোধ করিয়া গান শুনিবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিলেন। বিবেকানন্দ ভাবিলেন—অনুরোধ করিতেছেন, একটা গান শুনিযাই উঠিব। গায়িকা গান ধরিল ;—আমাদের সে গানের এক ছত্র মাত্র মনে আছে ;— “প্রভু মেরা অওগুণ চিত না ধরো, সমদরশি হ্যায় নাম তুযাবো।” গানের ভাব এই যে, প্রভু তুমি তো দোষগুণ বিচার করো না, গঙ্গায় অপবিত্র জল আসিলে সেও গঙ্গাজল হইয়া যায়। বিবেকানন্দ বলেন, আমি গান শুনিয়া ভাবিলাম যে, এই আমার সন্ন্যাস! আমি সন্ন্যাসী—এ সামান্যা বনিতা- এ জ্ঞান আজও আমার রহিয়াছে! বিশ্বব্যাপিনী জগদম্বার দর্শন আজও আমি পাইলাম না! তদবধি সেই গায়িকাকে মাতৃ-সম্বোধন করিতেন, এবং যখন খেত্‌রি রাজবাটীতে যাইতেন, তখনই তাহাকে ডাকাইয়া গান শুনিতেন, এবং সেই গায়িকা বিবেকানন্দের মাতৃ-সম্বোধনে, মাতৃভাবাপন্না হইয়া মাতৃচক্ষে বিবেকানন্দকে দেখিতেন। এই ঘটনা সাধন-অভিমানীর একটী অঙ্কুশস্বরূপ। ঈশ্বর কোন্ পথে কাহাকে লইয়া যান, তাহা মানববুদ্ধির

অতীত। যদি কোন সাধনাভিমানী এই গায়িকাকে যৌবনাবস্থায় দেখিয়া নারকী বলিয়া ঘৃণা করিতেন, এই ঘটনা দেখিলে নিশ্চয় বুঝিতেন যে, তাঁহার ধারণা ভ্রান্তিমূলক ছিল। ঈশ্বরকৃপাই মূল, সামান্যা গায়িকা অনায়াসে বাৎসল্য-প্রেমের অধিকারিণী হইযাছিল।

এস্থলে ধুনী কামারণী, যাহাকে আমরা দেবী জ্ঞানে প্রণাম করি, তাঁহার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহিত সম্বন্ধ মনে পড়িতেছে, রামকৃষ্ণদেব যখন যজ্ঞসূত্র ধারণ করেন, তখন তিনি একেবারে ধরিয়া বসিলেন যে, তিনি ভিক্ষা অপর কাহারও কাছে লইবেন না, ঐ ধুনী কামারণীর নিকট গ্রহণ করিবেন। তাঁহার মহাজ্ঞানী পিতা অদ্ভুত পুত্রের ইচ্ছায় বাধা প্রদান করিলেন না। কারণ, সকলেই অবগত আছেন যে, যে সময় শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম গয়াধামে গমন করেন, তিনি স্বপ্নে দেখিযাছিলেন যে, গদাধর তাঁহার পুত্র হইবেন—বলিতেছেন। ইহার বিস্তৃত বর্ণনা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন-চরিতে আছে। সেইজন্যই তিনি তাঁহার পুত্রের নাম গদাধর রাখিয়াছিলেন। গদাধর ধুনীর নিকট ভিক্ষা লইলেন ও ধুনীর 'গদাই' হইলেন। এস্থলে মাতাপুত্রের একটী আশ্চর্য্য প্রেমের ঘটনা উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। কামারপুকুর অঞ্চলে অর্থাৎ পরমহংসদেবের জন্মস্থানে চিংড়িমাছ প্রায় পাওয়া যায় না। একদিন কামারণী চিংড়িমাছ পাইয়াছিলেন যদিও কামারণী তাঁহার গদাইকে যেখানে যা উত্তম সামগ্রী পাইতেন খাওয়াইতেন, কিন্তু তাঁহার বড়ই ক্ষোভ ছিল, ব্রাহ্মণের পুত্রকে রন্ধন করা দ্রব্য দিতে পারিতেন না। চিংড়িমাছ পাইযাছেন, কিন্তু ক্ষুদিরাম প্রতিগ্রাহী ব্রাহ্মণ নন, ব্রাহ্মণেরও দান গ্রহণ করিতেন না। কামারণী চিংড়িমাছ দিলে তো গ্রহণ করিবেন না! চিংড়িমাছ রন্ধন করিয়া কলসী কক্ষে বারি আনিবার নিমিত্ত দোরে শিকল দিয়া যাইতেছেন, হঠাৎ পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখেন, গদাই শিকলি খুলিয়া চিংড়ি মাছ নিয়া পলাইতেছে। দেখিবামাত্র ধুনী চীৎকার করিতে লাগিলেন "ও গদাই খাস্ নে—খাস্ নে," গদাই তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া খাইতে খাইতে চলিল। ধুনী ভযে অভিভূত ;—ক্ষুদিরাম ব্রাহ্মণ,একথা শুনিলে আর গদাইকে তাহার নিকট আসিতে দিবে না। কিন্তু এ মাতাপুত্রের বিচ্ছেদ কে করিবে! ধুনী পুত্রের সেবা করিযা অন্তকালে পুত্রের সম্মুখে "হরি" বলিয়া দেহত্যাগ করিয়াছিলেন! শ্রীরামকৃষ্ণ-মাতা ধুনীর চরণে শত সহস্র প্রণাম!

আমরা উপরোক্ত খেত্রীর চামারের কথাটির শেষ কথা এখনও বলি নাই। চামার ভয় করিয়াছিল, বিবেকানন্দ স্বামীকে আহার প্রদান খেত্রীর রাজা শুনিলে তাহার সর্ব্বনাশ হইবে! স্বামী বিবেকানন্দ চামারের সে ভয়ের কথা জানিয়াও খেত্রির রাজার নিকট ঐ চামারের চরিত্র পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করিলেন। কাজেই কয়েকদিন পরেই খেত্রির রাজার নিকট চামারের ডাক পড়িল। চামার কাঁপিতে কাঁপিতে উপস্থিত। কিন্তু রাজপ্রসাদ-লাভে চামারকে আর চামারের বৃত্তি করিতে হইল না। এই ঘটনা প্রমাণ করে যে, দান বিফল হয় না। চামার নিষ্কাম ছিল, কিন্তু কামনা করিয়া ঈশ্বরোদ্দেশে দানে একগুণে যে শতগুণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার একটী উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত—এই চামার ও বিবেকানন্দ সংবাদ!

আমরা নারায়ণ জ্ঞানে নর-সেবার উল্লেখ করিতেছিলাম—যে সেবার আদর্শ স্বামী বিবেকানন্দের নিকট গ্রহণ করিয়া আশ্রমের যুবকবৃন্দ সেবা-কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। আমরা অত্যাশ্চর্য্য সেবা দেখিয়া যতই প্রশংসা করি, কিন্তু তাঁহারা যে দ্রুতপদে মুক্তির নিকট অগ্রসর হইতেছেন, এ কথা উপলব্ধি করা আমাদের কঠিন হয়। প্রশংসার সঙ্গে সঙ্গেই বলি, "হ্যাঁ, খুব উচ্চ কার্য্য করিতেছে বটে, কিন্তু যুবাবয়সে ঐরূপ একটা ঝোঁকে কার্য্য করিতেছে আর কি। পড়াশুনা ত্যাগ করিয়া বাপ মাকে ত্যাগ করিয়া যে অধঃপাতে যায় নাই ইহাই প্রশংসার বিষয়।" ঐরূপে যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছে, তাহা যে তাহারা অতি যত্ন সহকারে সমাধা করে, এ কথা শত্রুর মুখেও নিঃসৃত হয়। কিন্তু ভ্রমবশতঃ বুঝিতে বিলম্ব হয় যে, যে সকল শিক্ষিত ব্যক্তি সমাজের নেতাস্বরূপ হইয়া ভারতবর্ষে ভ্রাতৃভাব সংস্থাপনার্থ নানা প্রকার উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন, সেই মহৎকার্য্য এই সকল বালকের দ্বারাই সুসম্পন্ন হওয়া একমাত্র সম্ভব। মুসলমান, ক্রিশ্চিয়ান, পার্শি, বৌদ্ধ প্রভৃতি বিবিধ ধর্ম্মাবলম্বী বিবিধ জাতি ইহাদের অদ্ভুত সেবা দৃষ্টে পরস্পর জাতীয় বিদ্বেষ ত্যাগ করিতে নিশ্চয় বাধ্য হইবে। সেবাশ্রমভুক্ত সেবাগ্রাহি-গণ যে জাতিই হোক, সেবাশ্রমে আসিয়া বুঝিবেন যে, এই সকল বালকদের তাঁহাদের প্রতি বিদ্বেষভাব নাই। কারণ, সেব্য ও সেবকদিগের ভিতর বর্ণগত জাতিগত এবং ধর্ম্মগত প্রভেদ থাকিলেও ইহারা তাঁহাদিগকে সমভাবে সেবা করে। তাঁহারা নিশ্চয় অবাক্ হইয়া ভাবিবেন, ইহারা কারা? ইহারা কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী?—যে ধর্ম্মাবলম্বীই হোক, আর যাঁহারা সেবা গ্রহণ

করিতেছেন, তাঁহাদের মতে ইহাদের ধর্ম্ম ভ্রান্ত ধর্ম্মই হোক, কিন্তু এ বালকেরা যে তাঁহাদের ধর্ম্মের সার মর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে—একথা তাঁহাদের বুঝিতে হইবে নিশ্চয়। কেননা, তাঁহাদের মতেও তো নরসেবা প্রধান ধর্ম্ম। প্রেমের অদ্ভুত প্রভাবে প্রেম দৃষ্টে প্রেম লাভ হয়, এই অদ্ভুত সেবায় সেবকের প্রেম দৃষ্টে যিনি সেবা পাইতেছেন, তাঁহারও হৃদয়ে ঐরূপে প্রেমের উদ্দীপনা হইবে নিশ্চয়। তাঁহার জাতিগত ধর্ম্মগত বিদ্বেষ—উচ্চ দৃষ্টান্তে মলিন হইবে। সেবাগ্রহীতা সুস্থ শরীরে সেবাশ্রম হইতে ফিরিয়া এই উচ্চাশয় যুবকবৃন্দের পরিচয় নিজ সমাজমধ্যে প্রচার করিবেন এবং সেই সমাজে যিনি যিনি শুনিবেন, তাঁহাদেরও বিদ্বেষভাবে আঘাত লাগিবে। বিদ্বেষশূন্যতাই একতার মূল। এই সকল যুবক যদিচ বিদ্যালয়ের শিক্ষা পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছে, তথাচ বিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার ফলে যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া উচ্চচেতা ব্যক্তিগণ প্রাণপণ করিতেছেন, বক্তৃতা, সভা, প্রবন্ধ প্রভৃতিতে যাহা না হয়, যুবাগণের সেবায় তাহা হইতেছে। একতা স্থাপনের বিঘ্নবাধা সমূলে উচ্ছেদ প্রাপ্ত হইতেছে। বিদ্যালাভের ফল, বিদ্যালাভের কার্য্য—এই সেবাকার্য্যে যে দেদীপ্যমান—ইহা স্থূল দৃষ্টিতে লক্ষ্য হয়। যাঁহারা সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন, তাঁহারা আবার দেখিতে পাইবেন যে, এই যুবকেরা সর্ব্বভূতে সমজ্ঞান লাভ করিতেছেন, যে জ্ঞানলাভে আর ঈশ্বরলাভে প্রভেদ নাই। এই বিশ্বপ্রেম লাভে সক্ষম হইলে পর প্রতি ব্যক্তি তাহার দৃষ্টান্তে শত শত ব্যক্তিকে প্রেমিক করিবে। প্রেমজননী ভারতে প্রেমের বিকাশ হইবে, এবং সেই প্রেমে জগৎ মুগ্ধ হইয়া ভারতবর্ষকে তীর্থজ্ঞানে ভারতের ধূলি মস্তকে ধারণ করিবে। দূরে আমেরিকায় সেই তীর্থজ্ঞান অঙ্কুরিত হইয়াছে! ইংলণ্ডেও সেই তীর্থজ্ঞান উপ্ত, ভারতের সকল স্থানেই রামকৃষ্ণ মিশন সেই তীর্থজ্ঞান বপন করিবার জন্য নিযুক্ত আছে। যথায় যথায় রামকৃষ্ণ মিশন, সেই খানেই প্রকাশ যে, ভারত পুণ্যভূমি! পুণ্যভূমি কাশীধামের সেবাশ্রমের যুবকেরা ধীরে ধীরে শিক্ষাদান করিতেছে,—দেখিয়া যাও—ভারত পুণ্যভূমি!

উল্লেখ করিয়াছি, স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-নির্ণীত দুই পন্থারই চরম সীমায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহার সেবা-পন্থায় সিদ্ধিলাভের ফলস্বরূপ এই যুবকবৃন্দকে দেখাইবার চেষ্টা পাইলাম। আবার অপর দিকে অদ্বৈতাশ্রম দেখুন:—স্বামীজি শ্রীগুরুর নিকট নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভ

করিয়া কিরূপ ধ্যান-পন্থার পথিক সকল সৃজন করিয়াছেন, তাহা অদ্বৈতাশ্রমে লক্ষ্য হইবে। ঐ যে অদ্বৈতাশ্রমে বালক সন্ন্যাসিগণ দেখেন, উহাদের ক্রিয়াকলাপ আত্মত্যাগ সেবাশ্রমের বিবেকানন্দের শিষ্যগণ অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নয়। বিষয়-মমতা-বর্জ্জিত হইয়া প্রশংসা ও প্রতিষ্ঠার প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া কঠোর তিতিক্ষায় আত্মোন্নতি সাধনে নিযুক্ত। সন্ন্যাস-অভিমান নাই; পবিত্র বস্ত্র দেবসেবার উপযোগী—এই নিমিত্ত গৈরিকবস্ত্র ধারণ; সন্ন্যাসীর বেশে নীচ চিন্তা দমন হয়, এবং নীচ চিন্তায় আত্মগ্লানি জন্মে, এইজন্য মস্তক মুণ্ডন করিয়া কমণ্ডলু ধারণ। পরীক্ষা ব্যতীত রত্ন চেনা কঠিন, পরীক্ষা করিলে অদ্বৈতাশ্রমের বালকবৃন্দকে কতক চেনা যায়। এ বালকগণ সংসারত্যাগী, কিন্তু সংসার-কর্ত্তব্যত্যাগী নহে। অদ্বৈতাশ্রমে উপস্থিত হইলে, তাঁহারা কিরূপ অতিথিসৎকার করেন, বুঝিতে পারা যায়। গৃহীর যেরূপ অতিথির প্রতি কর্ত্তব্য, এই বালকেরাও সেইরূপ কর্ত্তব্যকার্য্য প্রদর্শন করেন। অতিথিকে স্থান দান, পরিচর্য্যা, আত্মবঞ্চনা করিয়া ভিখারীদিগের যতদূর সাধ্য, অতিথির তৃপ্তির জন্য সমস্ত কার্য্যই করিয়া থাকেন। সংসারে যেরূপ বয়োজ্যেষ্ঠের সম্মান, ইঁহারাও এখানে তাঁহাদিগকে আনত মস্তকে সেই সম্মান প্রদর্শন করেন। এদিকে কঠোর তপস্বী,—বিরামহীন তপস্যা, দেবসেবা একমাত্র কার্য্য! ধ্যান জ্ঞান সমস্তই দেবতায় অর্পিত! দৈহিক ক্লেশ, রোগ-তাড়না, এমন কি, নিজ নিজ দেহে পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ উপেক্ষা,—এবং অটল অচল থাকিয়া কোন অবস্থাতেই ইঁহারা কাতর নহেন। ইঁহাদের উপাসনা, উপাসনার নিমিত্ত—কোনও আর্থিক অবস্থার নিমিত্ত নয়। প্রতিষ্ঠালাভে ইঁহাদের তীব্র ঘৃণা? পরমলাভ—ঈশ্বরলাভই লক্ষ্য এবং সকল কার্য্যই সেই লক্ষ্যের অন্তর্গত। অনেকেই তাঁহাদের প্রতি উপহাস-দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। অনেকেই বলেন—ইদানীং সন্ন্যাসী হওয়া একটা ঢং! দূর হইতে বলিতে পারেন, কিন্তু অদ্বৈতাশ্রমে আসিয়া সমস্ত পরিদর্শন করিয়া এ কথা মুখে আনিতে তাঁহাদের জিহ্বা জড়িত হইবে। দেবকার্য্যে যে অষ্টপ্রহর নিযুক্ত থাকা যাইতে পারে, একথা আমাদের অনেকেই সম্ভবপর বিবেচনা করেন না এবং কঠোর তপস্যার কথা শাস্ত্রেই পড়িয়াছেন, অদ্বৈতাশ্রমে আসিয়া তাহা প্রত্যক্ষ করিতে পারিবেন। অদ্বৈতাশ্রমের বালকেরা কঠোর তপস্বী। যে কঠোর তপস্যায় স্বামী বিবেকানন্দ অদ্বৈতজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, সেই কঠোর তপস্যায় এই

বালকবৃন্দ নিযুক্ত। শরীর মন প্রাণ সমস্ত ঈশ্বরে অর্পিত। ইঁহাদিগের কার্য্য সমালোচকের দৃষ্টির বহির্ভূত। সেবাশ্রমের যুবাগণ প্রশংসাপ্রার্থী না হইয়াও প্রশংসা পান, কিন্তু এ বালকগণ কেবল উপহাসভাজন। তাহারা কাপড় পরে, তাহাতেও উপহাস; তাহারা শীতবস্ত্র গায়ে দেয়, তাহাতেও উপহাস; তাহারা শিক্ষা ত্যাগ করিয়াছে, এই জন্য নিন্দা; গৃহত্যাগ করিয়াছে—এই জন্য নিন্দা; পিতামাতা ত্যাগ করিয়াছে—এই জন্য ক্রোধ; তাহাদের আদর্শে অন্যান্য বালকগণ খারাপ হইবে এই জন্য ক্রোধ!—এ সমস্তই তাহারা সহ্য করে। কেহ বলিতে পারেন,—হইতে পারে, তুমি ইহাদের সম্বন্ধে যাহা বলিতেছ, তাহা সত্য, কিন্তু ইহাদের দ্বারা সংসারের কি উপকার হইল? কিন্তু ভাবুক বুঝিবেন, ভারতবর্ষের অবনতির কারণ—ধর্ম্মের অবনতি! কপট ব্যক্তির কপটাচারে ধর্ম্মের প্রতি অনাস্থা জন্মিয়াছে। পাশ্চাত্য আদর্শে আত্মসুখার্জ্জনই জীবনের উদ্দেশ্যরূপে গৃহীত হইয়াছে। যে কার্য্যফলে দৈহিক সুখস্বচ্ছন্দে থাকা যায়, সেই কার্য্যই প্রকৃত কার্য্য বলিয়া গণ্য হইতেছে। যে ব্যক্তি সহৃদয় বলিয়া আত্মপরিচয় দেন, তিনিও, যাহারা ঈশ্বরোদ্দেশে আত্মসমর্পণ করিয়াছে, তাহাদিগকে ভ্রান্ত বলেন। যখন দেখিবেন, এই যুবাবৃন্দ ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইয়া চরম অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছে, যখন দেখিবেন, আনন্দময়ের আশ্রয়ে পরমানন্দ লাভ করিয়াছে, যখন রোগ-শোক-তাড়নায় ও চতুর্দ্দিকে মারীভয়ে বিচলিত হইয়া আভাস পাইবেন যে, যাহার জন্য আজীবন বিব্রত ছিলাম, তাহাতে কেবল চিন্তা-জ্বরে জীর্ণ হইয়াছি, সম্মুখে মৃত্যুচ্ছায়া দেখিয়া যখন বিকল হইবেন, তখন বুঝিবেন—এ বালকেরা কি পন্থা অবলম্বন করিয়াছিল! তখন বুঝিবেন হৃদয়ে শান্তিলাভের একমাত্র উপায়ই ধর্ম্ম। রোগশোকমৃত্যু-সঙ্কুল ধরায় স্থির থাকিবার অপর উপায় নাই। এই বালকগণের দৃষ্টান্তে বুঝিবেন, ধর্ম্ম ভাণ নয়, ধর্ম্ম হৃদয়ের বস্তু—অর্জ্জন করা যায় এবং সেই অর্জ্জনই সার অর্জ্জন! তখন ভারতে ধীরে ধীরে ধর্ম্মের পূর্ব্ব মাহাত্ম্য ভারতবাসীর অনুভূত হইলে তাহারা সকলে বুঝিতে পারিবে—ধর্ম্মেই ভারতের উন্নতি, ধর্ম্মেই ভারতের প্রাধান্য—ধর্ম্মেই ভারতের জীবন!

সাধারণ ব্যক্তির মনে আপত্তি উঠিতে পারে যে, ভারতের ধর্ম্মজীবন হইয়াইতো ভারতের সর্ব্বনাশ হইয়াছে! ধর্ম্মজীবন হওয়ায় ভারতের বিজ্ঞান নাই, শিল্প নাই, ভারত হীনতেজা ও পরাধীন। এরূপ যাঁহারা বলেন, তাঁহারা ধর্ম্ম

কি, জানেন না। ভারতের যে সকল পূর্ব্ব-কীর্ত্তি শুনিয়া তাঁহারা মুগ্ধ হন, পাশ্চাত্যের যে সকল বৈজ্ঞানিক কার্য্য দেখিয়া তাঁহারা স্পর্দ্ধা করিয়া বলেন, "ভারতেও এ সকল ছিল,"—জানিবেন,সেই সকল কীর্ত্তি ভারতের ধর্ম্মবলে। যাহা জাতীয় জীবন, তদবলম্বন ব্যতীত জাতীয় উন্নতি সাধন হইতে পারে না। ইংলণ্ডের অর্থোপার্জ্জন, এবং ফরাসীর ব্যক্তিগত স্বাধীনতা যেরূপ জাতীয় উন্নতির ভিত্তি, ভারতের ধর্ম্মও সেইরূপ। ধর্ম্মাশ্রয় ব্যতীত ভারতের উন্নতির প্রত্যাশা বিফল, ধর্ম্মপ্রাণ ভারতে ধর্ম্মের উন্নতি ভিন্ন কদাচ উন্নতি হইবে না। আমরা যথার্থ ধর্ম্মপ্রাণ হইলে আজই দেখিতে পাইব—ভারতও পূর্ব্বের ন্যায় সর্ব্বদেশাপেক্ষা উন্নত হইয়াছে!

শ্রীশ্রীপরমহংসদেব-প্রতিশ্রুত দ্বিবিধ পন্থার উল্লেখ করিয়া দ্বিবিধ ফললাভ বর্ণনা করিবার চেষ্টা পাইয়াছি এবং সংক্ষেপে দেখাইয়াছি যে, স্বামী বিবেকানন্দ উভয় সাধনেই সিদ্ধ। কিন্তু উভয় সাধনার ফল যাহা বর্ণনা করিয়াছি, তাহা সকলের চক্ষে পড়ে নাই।

আমাদের জাতীয় উন্নতির নিমিত্ত বিদেশে যাইয়া কলকব্জা শিক্ষা করা উচিত—আমাদের নেতারা বলেন। কেহ বা বলেন, বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে উন্নত হও, বিজ্ঞানই জাতীয় উন্নতি সাধন করিবে। রাজনৈতিক আন্দোলনই কাহারও মতে উন্নতির নির্দ্দিষ্ট পথ। কিন্তু এই সকল নেতারা যদি একথাটি বিবেচনা করেন যে, কে ঐ সকল আমাদিগকে শিখাইবে আর কেনই বা শিখাইবে? বিনা স্বার্থে কেহ কোনও কাজ করিয়া থাকে কি? আমরা ঐ সকল শিখিয়া তাহাদের অপেক্ষা উন্নত হইব এই জন্যই কি তাহারা আমাদিগকে শিক্ষা প্রদান করিবে?—ইহা কদাচ হইতে পারে না। পাশ্চাত্যজাতিসকলের মধ্যে পরস্পরে নানা বিষয়ে আদান প্রদান চলে, এইজন্য পাশ্চাত্যজাতিরা পরস্পর পরস্পরের সহকারী। আমরা ঐ উন্নত জাতি সকলের সহিত কি আদান প্রদান করিব? আমাদের দিবার বস্তু কি আছে? সকলই ত গিয়াছে। এক বস্তু আছে—ধর্ম্ম,অবশ্য এ বেদমূলক ধর্ম্মের তুলনা নাই—কিন্তু সেই ধর্ম্মও তো এ সময় অতি ক্ষীণ অবস্থায় অবস্থিত। ধর্ম্মোন্নতির জন্য ভারতবাসীর অন্যের মুখাপেক্ষী হইতে হয় না সত্য, এবং ভারতবাসি-প্রদত্ত শিক্ষাই ভারতবাসীকে ধর্ম্মোন্নত করিতে পারে। ভারত নিজে ধর্ম্মোন্নতি করিয়া যদি অপর জাতিসকলের সহিত আবার আদানপ্রদানে প্রবৃত্ত হয়, তবেই আনতমস্তকে অপর উন্নত জাতিসকল ভারতকে সাংসারিক বিদ্যা গুরু-

দক্ষিণাস্বরূপ প্রদান করিয়া প্রকৃত-সত্যলাভাশায় ভারতকে আশ্রয় করিবে। 'সাম্য সাম্য' এই কথা সকলের মুখেই শুনি, বাস্তবিকই সমস্ত মানব এক-পরিবারস্বরূপ বাস করে এইরূপ উন্নত অবস্থা লাভই মনুষ্য-সমাজের চরম। কিন্তু সে চরম অবস্থা পাইবার সম্ভাবনা কি? কাহারও মস্তিষ্কে উদ্ভূত হইয়াছে, অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত থাকিলেই পৃথিবীতে যুদ্ধবিগ্রহ রহিত হইবে। অতএব নরঘাতী অস্ত্রসকল সৃজন করিয়া সংসারে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু দেখা যায়, পরস্পরের প্রতি ঈর্ষাবৃদ্ধিই অস্ত্রবৃদ্ধির এক মাত্র কারণ। কেহ আবার বলেন, দার্শনিক শিক্ষার দ্বারাই মানব একপরিবারস্থ হইবে। কিন্তু দর্শন ত নানাবিধ—কোন্ দর্শনবলে একপরিবারস্থ হইবে? যদি এরূপ কোনও দর্শন থাকে, যাহার শিক্ষায় বুঝিতে পারা যায় যে, তুমি আমি এক, তোমায় ক্লেশ দিলে আমি ক্লেশ পাইব—যদি ঐরূপ একত্ব স্থাপন কোনও দর্শনের দ্বারা সম্ভব হয়—তাহ'লেই জগতে সাম্য প্রতিষ্ঠা হইতে পারে, নচেৎ নয়। সে সাম্য-স্থাপক দর্শন—বেদান্ত-দর্শন। কিন্তু বেদান্ত দর্শন কেবল মাত্র পাঠে তাহা হয় না, বেদান্ত-দর্শন উপলব্ধি করিতে হয়। যেমন আমি আমাকে জানি, সেইরূপ তুমি আমি অভেদ ইহা জানিতে হয়। পড়া বা শোনা কথায় উহা উপলব্ধি হয় না। ঐ উপলব্ধি সাধন-সাপেক্ষ এবং ঐ সাধন সম্পন্ন করিবার জন্যই এই অদ্বৈত সেবাশ্রম। যথার্থ সাম্যের ভিত্তিস্বরূপ এই আশ্রমদ্বয়কে ঐজন্যই শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ স্থাপন করিয়াছেন। অতএব এস ভাই! সকলে মিলিত হইয়া বলি, 'জয় শ্রীরামকৃষ্ণের জয়! জয় বিবেকানন্দের জয়।'

শ্রীরামানুজ-দর্শন।

[শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ।]

(৫)

এইবার আমাদের আলোচ্য বিষয়—"সর্ব্ববিধ জ্ঞানের যথার্থতা"। ইহার অর্থ—সকল জ্ঞানই যথার্থ, কোন জ্ঞানই মিথ্যা নহে—দেখিলাম একটী, আর বুঝিলাম আর একটী—এরূপ নহে। এই বিষয়টী অতীব প্রয়োজনীয় বিষয়, এবং রামানুজ-মতে ইহাও একটী মূলভিত্তি; রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈত মতের সুন্দর স্বচ্ছ সৌধ ইহারই উপর নির্ম্মিত হইয়া রহিয়াছে।

কোন একটী মত স্থাপন করিতে হইলে, বিরুদ্ধ মতের খণ্ডন এবং নিজ মতের অনুকূল যুক্তি প্রদর্শন করিতে হয়। এই দুইটী ব্যাপার না করিতে পারিলে মত-স্থাপন-কার্য্য সিদ্ধ হয় না। আমি একটী মত স্থাপন করিলাম, অথচ তাহার বিরুদ্ধ মতের ভ্রম যদি না প্রদর্শন করিতে পারিলাম, তাহা হইলে আমার মত অভ্রান্ত বা সত্য বলিয়া জনসমাজে কখনই আদরণীয় হইতে পারে না। দুইটী বিরুদ্ধ মত কখনই সত্য হইতে পারে না। এজন্য এ ব্যাপারটী বড়ই প্রয়োজনীয়। যিনি যখনই কোন মত স্থাপন করিতে বসেন, তখনই এ কার্য্যটী তাঁহাকে করিতে হয়। কেবল তাহাই নহে, এ কার্য্যটী যিনি যত সুচারু ভাবে করিতে পারেন, তাঁহার মত ততই সম্মানিত হয়, তাঁহার পাণ্ডিত্য ততই প্রশংসনীয় হইয়া থাকে।

আমাদের গ্রন্থকার শ্রীনিবাস দাস এ কার্য্যটী বড় সুন্দর ভাবে করিয়াছেন। তিনি সর্ব্ববিধ জ্ঞানের যথার্থতা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া মিথ্যা জ্ঞান সম্বন্ধে যাবতীয় প্রসিদ্ধ মতবাদের উল্লেখ পূর্ব্বক নিজ মত স্থাপন করিয়াছেন। টীকাকার আবার উক্ত মতগুলি সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া সুন্দর ভাবে তাহাদের খণ্ডন করিয়াছেন। স্বমতের অনুকূল যুক্তি-প্রদর্শন-ব্যাপারে গ্রন্থকার স্বয়ংই এমন সার কথার অবতারণা করিযাছেন যে, টীকাকারের বলিবার বড় কিছুই নাই।

এখন দেখা যাউক, মিথ্যা জ্ঞান সম্বন্ধে আমাদের দেশে কত প্রকার মত-ভেদ আছে। এদেশে সহস্র বৎসর পূর্ব্বে জ্ঞানের যথার্থতা সম্বন্ধে এতই বিচার হইয়া গিয়াছে যে, ইহা পণ্ডিতসমাজে অতি প্রসিদ্ধ বিষয় মধ্যে গণ্য হইয়া থাকে এবং সকলেই ইহাকে খ্যাতিবাদ বা খ্যাতিপঞ্চক নামে উল্লেখ করিয়া থাকেন। কালের কেমন কুটিল গতি যে, খ্যাতি শব্দটী শুনিবামাত্র এখন আমরা অন্য অর্থ বুঝিয়া থাকি, অভিপ্রেত অর্থের ধার দিয়াও যাই না। এমন একদিন ছিল, যখন খ্যাতি অর্থে লোকে প্রশংসা না বুঝিয়া ইহার অর্থ জ্ঞান, বোধ বা প্রতীতি বুঝিত। আজ কিন্তু আমরা জ্ঞানের প্রতি লক্ষ্যহীন হইয়া প্রশংসার প্রতি লক্ষ্য করিয়া থাকি। আমরা যখন পূর্ব্বকালের কথা লইয়া আলোচনা করিতেছি এবং পূর্ব্বতন মহাত্মাগণের প্রসাদলাভে প্রয়াসী হইয়াছি, তখন তাঁহাদের অর্থ লইয়া অতঃপর আমরা এ বিষয়টী আলোচনা করিব।

খ্যাতি শব্দের এই অর্থ অবলম্বন করিয়া বিজ্ঞানবাদী বা যোগাচারী বৌদ্ধ-

মতকে আত্মখ্যাতিবাদী, মাধ্যমিক বা শূন্যবাদী বৌদ্ধমতকে অসৎখ্যাতি-বাদী, প্রভাকর-মতানুযায়ী মীমাংসক মতকে অখ্যাতিবাদী, নৈয়ায়িকগণকে অন্যথাখ্যাতিবাদী এবং মায়াবাদী বৈদান্তিককে অনির্ব্বচনীয়খ্যাতিবাদী নামে অভিহিত করা হয়। মিথ্যা জ্ঞান সম্বন্ধে যতপ্রকার মত হইতে পারে, এই পাঁচ শ্রেণীর মধ্যে তাহার সকল কথাই শুনিতে পাওয়া যায়। এই মত কয়টী সম্যক্ আলোচনা করিতে পারিলে মিথ্যা জ্ঞানের সকল দিক্ই দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং এই পাঁচ প্রকার মত খণ্ডন করিতে পারিলে এই খ্যাতি অংশে রামানুজ-মতের বিরোধী সকল মতেরই খণ্ডন করা হইবে। রামানুজ-মতাবলম্বিগণকে সৎখ্যাতিবাদী বলা হয়। সুতরাং এ স্থলে রামা-নুজ-মত অন্য মতের খণ্ডন করিতেছেন বলিয়া সৎখ্যাতিবাদিগণ কর্ত্তৃক অপর পাঁচ প্রকার খ্যাতিবাদিগণের মত খণ্ডন হইতেছে বুঝিতে হইবে।

সকলেই জানেন, জ্ঞান মাত্রেই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় থাকে। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় ভিন্ন জ্ঞান হয় না। সুতরাং জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় জ্ঞানের একটী অবয়ব-বিশেষ। যখনই আমার কোন জ্ঞান হয়,তখনই সেই জ্ঞানের ভিতর জ্ঞাতা-রূপে আমি, ও জ্ঞেয়-রূপে একটী "বিষয়" থাকে। এই যে লেখনীটীর জ্ঞান হইতেছে এই জ্ঞানে যেমন "আমি" ও "লেখনী" এই দুইটী অবয়ব আছে, তদ্রূপ সর্ব্ববিধ জ্ঞানেই "আমি" অর্থাৎ জ্ঞাতা ও "বিষয়" অর্থাৎ জ্ঞেয় থাকে। জ্ঞান বলিলেই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় আপনি বুঝাইয়া যায়। আবার দেখা যায়, জ্ঞাতা বলিলে যাহাকে লক্ষ্য করা হয় এবং জ্ঞেয় বলিলে যাহাকে বুঝায়, তাহারা বর্ত্তমান থাকিলেই যে জ্ঞান হয়, তাহা নহে। উক্ত জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় পদার্থদ্বয়-লক্ষিত বস্তু দুইটীর কোন না কোনরূপ সংযোগ হওয়া দরকার। এই সংযোগ না ঘটিলে অভিপ্রেত জ্ঞান হইতে পারে না। এক ঘরে একজন লোক বসিয়া আছে এবং অন্য ঘরে একখানি পুস্তক রহিয়াছে; এস্থলে যদি দুইটীর কোন-রূপ সংযোগ না হয়, তাহা হইলে সে পুস্তক-বিষয়ক জ্ঞান হইতে পারে না। সুতরাং দেখা গেল, জ্ঞান হইতে গেলে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়-সংযোগও চাই। জ্ঞানোৎপত্তির পক্ষে ইহাও একটী কারণ। তাহার পর আবার দেখা যায়, জ্ঞাতা বলিলে কেবল একটী মাত্র বস্তু বুঝায় না। জ্ঞাতার মধ্যে অনেকগুলি জিনিষ আছে, জ্ঞাতা সেই সকলের সাহায্যে জ্ঞান লাভ করে। এগুলি জ্ঞাতার করণ বা ইন্দ্রিয়-সমূহ। আমি যদি জ্ঞাতা হই, তাহা হইলে "রূপজ্ঞান"-লাভকালে আমার চক্ষুরিন্দ্রিয় দরকার। চক্ষু-

ব্যতীত আমার রূপজ্ঞান লাভ অসম্ভব। ঐরূপ মনে মনে বা স্মৃতিতে যদি কোন জ্ঞানের উদ্রেক করা প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে চক্ষুর মত আর একটী অভ্যন্তরীণ জিনিষের দরকার হয়। পণ্ডিতগণ এই অভ্যন্তরীণ জিনিষকেও ইন্দ্রিয়-নামে অভিহিত করিয়াছেন, তবে পার্থক্য এই যে, চক্ষুরাদিকে বহিরিন্দ্রিয় আর মনটাকে অন্তরিন্দ্রিয় বলা হয়। যাহা হউক, জ্ঞানোৎপত্তিতে যেমন জ্ঞাতা ও জ্ঞানের সংযোগ প্রয়োজন,তদ্রূপ ইন্দ্রিয় বা করণেরও প্রয়োজন আছে। তাহার পর আর এক কথা,—এই যে ইন্দ্রিয়, ইহারা সকল ক্ষেত্রে, সকল লোকের একরূপ হয় না; অথবা একই লোকের সকল সময় একরূপ থাকে না। ইহাদের দোষগুণ, বা সামর্থ্যের তারতম্য নিয়তই ঘটিয়া থাকে এবং তাহারই ফলে জ্ঞান উৎপন্ন হইলেও সে জ্ঞানের ঐক্য থাকে না। অনেক সময় ইহাদের দোষ বা সামর্থ্যাভাবই মিথ্যা জ্ঞানের হেতু হয়। তোমার যদি যকৃতের পীড়া বশতঃ ন্যাবা রোগ ঘটে, তুমি তখন যাহাকে পূর্ব্বে সাদা দেখিয়াছিলে, আজ তাহাকে হলুদে দেখিবে। সুতরাং জ্ঞানোৎপত্তিতে ইন্দ্রিয়াদির যেমন প্রয়োজন, ইহাদের অবিকৃত অবস্থাও তদ্রূপ আর একটী প্রয়োজন। তাহার পর আর এক কথা, জ্ঞানোৎপত্তিতে কতকগুলি স্থলে আমাদের পূর্ব্বজ্ঞানেরও দরকার হয়। আমি একটী নূতন জিনিষ দেখিলাম কিন্তু যদি তাহাকে আমার অপর জ্ঞানের সহিত মিলাইয়া না লই,তাহা হইলে তাহাকে আমার ব্যবহারে আনা বড় মুস্কিল হয়, তাহার কথা আমি কখনই অপরকে বুঝাইয়া দিতে পারি না। যে জিনিষটাকে আমি কাহারও 'মতন' বা কাহারও 'মতন নয়' বলিয়া বুঝিতে পারি না, সেস্থলে আমি কি বিস্ময়-সাগরে নিমজ্জিত হইয়া বিমূঢ়ের ন্যায় অবস্থিতি করি না? বস্তুতঃ তাহার জ্ঞান কে সাধারণতঃ জ্ঞান নামেই অভিহিত করা হয় না। যাহা হউক মোটামুটি দেখা যায় জ্ঞানের প্রকৃতিতে এবং জ্ঞানোৎপত্তিতে উক্ত কয়টী বিষয় প্রায়ই বিদ্যমান থাকে। একথাগুলি অতি সাধারণ কথা, ইহা আমরা যদি এস্থলে একটু আয়ত্ত করিয়া লইতে পারি, তাহা হইলে পরবর্ত্তী বাদীপ্রতিবাদীর তর্কবিতর্কস্থলে একটু সুবিধা হইবে। বস্তুতঃই এরূপ তর্কবিতর্কস্থলে আমাদের যেমন সাবধানতা প্রয়োজন, তেমনই একটু অন্তর্দৃষ্টি ও চিন্তাশীলতা প্রয়োজন হইয়া থাকে। এটুকু পড়িয়া অভিনব পাঠকবর্গকে যদি একটু চিন্তান্বিত করিতে পারি, তাহা হইলে আমার এ শ্রম সফল। যাহা হউক, এক্ষণে খ্যাতিবিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক এবং টীকাকারের অনুসরণ

করিয়া আমরা আত্মখ্যাতিবাদী বা বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধমতের আলোচনা করি।

বৌদ্ধমত সম্বন্ধে বিচারে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে আমাদের বৌদ্ধমতের লক্ষ্য সম্বন্ধে একটু জ্ঞান থাকিলে ভাল হয়। কারণ ইহার ফলে পাঠক অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন, যাবতীয় বৌদ্ধমতের যুক্তি তর্ক কোন্ দিকে যাইতেছে এবং ইহাদের দুই একটী যুক্তি শুনিয়া ইহাদের অবশিষ্ট অভিপ্রায় সহজে অনুমান করিয়া লইতে পারা যাইবে।

এতদুদ্দেশ্যে যদি এক কথায় যাবতীয় বৌদ্ধমতের লক্ষ্য সম্বন্ধে পরিচয় দিতে হয়, তাহা হইলে বলা যায় যে, ইহাদের উদ্দেশ্য বন্ধন মোচন; কোন কিছু প্রাপ্তি ইহাদের লক্ষ্য নহে। এই বন্ধন মোচনের উপায় আবার অন্য কিছু নহে, ইহার উপায়—যাহা বন্ধন, তাহারই অপনোদন বা ছেদন মাত্র। ভগবৎসেবা, ব্রহ্ম-বিচার বা ধ্যান, জপ, তপ, যাগ, যজ্ঞ, ইহারা কেহই উপায় মধ্যে গণ্য হয় না, পরন্তু যাহা বন্ধনের কারণ বা রজ্জু স্থানীয় পদার্থ, কেবল তাহারই মোচন বা ছেদন প্রয়োজন। বন্ধনের এই রজ্জু আবার আর কিছু নহে, ইহা অবিদ্যা, কামনা, বাসনা প্রভৃতি কতিপয় দোষরাশি মাত্র, সুতরাং এই দোষরাশি নিবারণ করাই জীবের কর্ত্তব্য। জগৎ সত্য কি মিথ্যা, ইহার মূল কি, ইহার নিয়ন্তা কে, ইত্যাদি কথা আলোচনায় ফল নাই, ইহা কেহ জানে নাই এবং ভবিষ্যতেও কেহ জানিতে পারিবে না। আমাদের বুদ্ধিশক্তির যেরূপ প্রকৃতি তাহাতে এবিষয় নির্ণয় হইবার যোগ্য নহে, এ বিষয়ে যত্ন করা বৃথা, এ বিষয়ে কালক্ষেপ করা শক্তিক্ষয় ভিন্ন আর কিছু নহে। এক জনকে ভাল বাসিয়া দেখা যায়, তাহার অভাব হইলে আমার মনে দুঃখের উদ্রেক হয়; সুতরাং এ দুঃখের ঔষধ ভাল না বাসা, ইহার ঔষধ আর কিছু হইতে পারে না। এইরূপ একজনের উপর ক্রোধ বা হিংসা করায় সে তাহার প্রতিশোধে আমার অনিষ্ট করিল, এবং সেই অনিষ্ট হইতে আমার দুঃখ ঘটিল। এখন যদি এই দুঃখ নিবারণ করিতে হয়, তাহা হইলে ইহার যাহা মূল কারণ—আমার ক্রোধ বা হিংসা-প্রবৃত্তি, তাহারই উচ্ছেদ করা প্রয়োজন। আমি পরের অপকার করিব, আর সে আমার অপকার করিবে, আর আমি যদি তাহার নিবারণ-মানসে যাগ যজ্ঞ বা জপ তপের অনুষ্ঠান করি, তাহা হইলে পিপাসার্থীর মরুভূমি গমন করায় কোন দোষ হইতে পারে না। তুমি জুড়াইতে চাও জুড়াও, জুড়াইবার

যাহা যথার্থ কারণ তাহার অনুষ্ঠান কর, যাহা কারণ নহে, তদনুষ্ঠানে ধাবমান হইও না। বুদ্ধদেবের উপদেশের এই ভাবটী লক্ষ্য করিয়া পরবর্ত্তীকালে বৌদ্ধমতের দার্শনিক অংশে, বৌদ্ধাচার্য্যগণ কেবল ইহাই প্রমাণ করিয়াছেন যে, তত্ত্ব-বিচারে কোন ফল নাই। বিচার করিয়া দেখিলে আমি, তুমি, জগৎ, ঈশ্বর প্রভৃতি যাহা কিছু সবই জ্ঞানের যোগ্য নহে, সবই প্রহেলিকা, অথবা সবই আসলে কিছুই নাই। মূল কথা এই ভাবটীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া বিভিন্ন বৌদ্ধমতের মতাবলম্বিগণ কেহ এসবকে ক্ষণিক বিজ্ঞান মাত্র, কেহ বা শূন্য প্রভৃতি নানা মতবাদের সৃষ্টি করিয়াছেন। এক কথায়, ইহার কারণ এই যে, এসব যদি সত্য সত্যই থাকে, তাহা হইলে দুঃখের কারণ নিবারণের সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের যথার্থ জ্ঞানের প্রয়োজন হইতে বাধ্য। কিন্তু এ সব যদি মিথ্যা হয়, তাহা হইলে দুঃখ নিবারণের জন্য ইহাদের জ্ঞান নিষ্প্রয়োজন, কেবল দুঃখের হেতু নিবারণ করিলেই দুঃখ দূর হইবে।

যাহা হউক, এই কথাটী সম্মুখে রাখিয়া আত্মখ্যাতিবাদিগণ বলেন জ্ঞান মাত্রেই ক্ষণিক। নদীর জলকণা যেমন নিয়ত প্রবাহিত হইয়াও নদী নামে ব্যবহৃত হয়, তদ্রূপ বিজ্ঞানপ্রবাহই এই জগৎ। নদীর এক স্থলের এক মুহূর্ত্তের জলকণা যেমন আর ফিরিয়া আসে না, অথচ লোকে "সেই নদী" "সেই জল" বলিয়া ব্যবহার করিয়া থাকে, তদ্রূপ একক্ষণের বিজ্ঞান চলিয়া গেলেও সেই বিজ্ঞান নামে গৃহীত হইয়া থাকে ; কিন্তু বস্তুতঃ তাহারা পরস্পরে পৃথক্। যদি একটু লক্ষ্য করিয়া দেখ, একথার সত্যতা তোমরা সহজেই বুঝিতে পারিবে। ঐ যে তোমার বাল্যের কত ধারণা, কত জ্ঞান, আজ বিলুপ্ত বা ভ্রান্ত বলিয়া উপেক্ষিত হইতেছে, তাহা কি তোমায় বলিয়া দিতে হয়। ভাবিয়া দেখ দেখি, তোমার সে সময়ের জগৎ আর আজকের জগৎ কি এক? ছেলেবেলায় ভূতের ভয় ও যৌবনের সাহস, যৌবনের প্রেম-পাশ ও বার্দ্ধক্যের হতাশ-মাখা জগৎ কি তোমার এক? যদিও কতকগুলা বিষয় এখনও এক বা একরূপ বলিয়া বোধ হইতেছে সত্য, কিন্তু তাহাও কালে পরিবর্ত্তন হইয়া যাইতে বাধ্য। কৈ তুমি একটা জিনিষ ঠিক এক রূপে মনে করিয়া রাখ দেখি? দেখিবে কালে তাহা যেন স্মৃতি হইতে মুছিয়া যাইতেছে, এবং একদিন তাহা তোমার চিত্রপট হইতে চিরকালের জন্য অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। একটু প্রণিধান করিলেই তোমায় বলিতে হইবে যে তোমার জ্ঞান ক্ষণিক, নিত্য নহে। তাহার পর

আবার দেখ, তুমি যাহাকে জগৎ বল, তুমি যাহাকে তোমা ছাড়া "বিষয়" বল, তোমার নিকট যাহা তোমার "জ্ঞেয়"—তাহা স্বরূপতঃ জিনিষটা কি? বল দেখি, তাহার কি সত্য সত্যই কোন সত্তা আছে, না তাহা তোমার বুদ্ধির খেলা। তুমি "যাহাকেই আছে" বল, তাহা কি তোমার "বোধ" নহে, তাহা কি তোমার জ্ঞান নহে? কৈ, তুমি কোন একটা কিছুকে, কোনরূপে না জানিয়া বল দেখি "তাহা আছে" বা "নাই"? তুমি তাহাকে যদি নাইও বল, তাহাও কি তোমার তাহাকে একরূপে জানার পর বলা হয় না? যাহার সম্বন্ধেই তুমি যে কোন কথাই বল না, তাহা তাহার সম্বন্ধে তোমার জানার পর বলা হয়। তুমি তাহার জ্ঞান ব্যতীত তাহার অস্তিত্বের কথা স্বপ্নেও ভাবিতে পার না, তোমার "অস্তিত্বও" জ্ঞান। সুতরাং তোমার জগৎ কি তোমার জ্ঞান নহে? এই জন্যই আমরা বলি, জ্ঞেয় পদার্থ বা যাহার বিষয় "জ্ঞান" হয়—তাহা, জ্ঞান ভিন্ন অন্য কিছু নহে; আর সেই জ্ঞান ক্ষণিক, বা অনিত্য; নদীর জলপ্রবাহের ন্যায় তাহাকে কেবল নিত্য বলিয়া আমরা ব্যবহার করিয়া থাকি এইমাত্র।

তাহার পর "জ্ঞেয়" পদার্থ যেমন জ্ঞান ভিন্ন আর কিছু নহে, দেখা গেল, এইরূপ জ্ঞাতা পদার্থও, দেখিবে, জ্ঞান ভিন্ন আর কিছু নহে। কারণ "আমি ঘটকে জানি," এ কথা বলিলে যেমন ঐ জ্ঞানের বিষয় "ঘট" হয় তদ্রূপ "আমি" পদার্থও সেই জ্ঞানেরই অন্যবিধ বিষয়। "কিসের জ্ঞান" বলিলে যেমন উত্তরে "ঘটের" জ্ঞান বলা যায়, তদ্রূপ "আমার" জ্ঞানও বলা যায়। আর এই আমিই ত জ্ঞাতা পদার্থ। ঘটের সঙ্গে জ্ঞানের যেমন একটা "সম্বন্ধ" বশতঃ "ঘট জ্ঞান" হয়, তদ্রূপ জ্ঞানের সহিত "আমি"র একটা সম্বন্ধ বশতঃ "আমার জ্ঞান" এই কথা বলা হয়। সুতরাং "জ্ঞেয়" পদার্থের ন্যায় "জ্ঞাতা" পদার্থও সেই জ্ঞানেরই এক প্রকার বিষয়। আর তাহা হইলে যে যুক্তি বশতঃ জ্ঞেয় পদার্থকে জ্ঞান বলিয়া বুঝিলে, সেই যুক্তি স্মরণ করিয়া জ্ঞাতাকেও জ্ঞান বলিয়া বুঝ অর্থাৎ জ্ঞাতৃত্ব সম্বন্ধেও জ্ঞান না হইলে জ্ঞাতৃত্বও সিদ্ধ হয় না। সুতরাং দেখা যাইতেছে, যাহা কিছু সবই এক জ্ঞান; জ্ঞান ভিন্ন কোথাও কিছু নাই, থাকিতেও পারে না। আর এই জ্ঞান যখন একক্ষণে একরূপ এবং পরক্ষণে অন্যরূপ—কখনই একরূপ থাকে না, তখন ইহাকে ক্ষণিক বলিতে হইবে, ইহার নিত্যতা নাই।

বুদ্ধদেবের উপদেশের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বৌদ্ধাচার্য্যগণ সত্য আবিষ্কারে

প্রবৃত্ত হইলে তাঁহাদের চক্ষে এইরূপ প্রতিভাত হইল, এবং ইহা সত্য হইলে যে সকল দিক্‌ই রক্ষা পায়, তাহাও তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন। জগতের যাহা কিছু সবই যদি অসত্য, অনিত্য হয়, তাহা হইলে আর তাহার তথ্যানুসন্ধানে লোকের প্রবৃত্তি হইতে পারে না; তখন যাহা দুঃখের হেতু, কেবল তাহারই নিবারণ করিলেই লোকের দুঃখ নিবারণ হইবার কথা। সুতরাং বুদ্ধদেবের উপদেশে যে কেবল দুঃখ নিবারণের প্রতি উৎসাহ ও জগদাদির তত্ত্বানুশীলনে অনুৎসাহ দেখা যায়, তাহারও সার্থকতা বুঝা যায়। তাঁহারা ভাবিলেন, বুদ্ধদেব যখন কঠোর তপস্যান্তে প্রবুদ্ধ হইয়াছেন, তখন তাঁহার সকল কথাই সত্য, সত্য সত্যই জগতাদি অসত্য, তাই তিনি জগদাদির তথ্যানুসন্ধানের নিমিত্ত উপদেশ দেন নাই, কেবল দুঃখ নিবারণেরই উপদেশ দিয়াছেন।

এইরূপে বৌদ্ধাচার্য্যগণ জগদাদির অনিত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহশূন্য হইয়া তাহাদের অসত্যতা প্রমাণে বদ্ধপরিকর হইলেন, এবং তাহার ফলে এই স্পষ্ট পরিদৃশ্যমান জগতের ব্যবহারাদি লইয়া তাঁহাদের বড়ই বিপত্তি ঘটিল। কিন্তু অধ্যবসায়ের আশ্চর্য্য ফল, তাঁহারা চিন্তা করিয়া ইহার উপায় করিলেন। তাঁহারা তাঁহাদের ক্ষণিক-বিজ্ঞানে চারি প্রকার কারণতা স্বীকার করিয়া জগত্তত্ত্বের রহস্য উদ্ঘাটন করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, জগতে যাহা কিছু দেখা শুনা যায়, তাহার একটী হেতু উক্ত বিজ্ঞানেরই "সহকারী ভাব।" যেমন কোন একটী জিনিষ দেখিতে হইলে আলোকের সাহায্য দরকার, নচেৎ তাহা দেখা যায় না, এবং তজ্জন্য দেখা ব্যাপারে যেমন আলোকের সহকারিতা অবশ্য স্বীকার্য্য, তদ্রূপ, এই জগতের জ্ঞান লাভ করিবার কালে যে সহকারিতা প্রয়োজন হইবে, তাহা ঐ এক বিজ্ঞান বস্তুতেই স্বীকার করিলে আর কোন গোল হইতে পারে না। আলোকের ন্যায় পৃথক্ কোন পদার্থ স্বীকারের কোন প্রয়োজন নাই। যদি বল, জগতের জ্ঞানকালে আমাদের ইন্দ্রিয়াদির আবশ্যকতা থাকে, নচেৎ জগতের কিছুই উপলব্ধি করিতে পারা যায় না, তাহা হইলে আমরা বলিব, সেই ইন্দ্রিয়ের পরিবর্তে আমরা সেই বিজ্ঞানেরই আর একটী কারণতা স্বীকার করিব। বিজ্ঞানের ভিতরেই এমন একটী ব্যাপার হয় মানিব, যাহার দ্বারা ইন্দ্রিয়ের কার্য্য হইয়া যায়। ঐরূপ, যদি বল, কোন একটা কিছু না থাকিলেও ত আমাদের সে সম্বন্ধে জ্ঞান হয় না—যেমন এই লেখনীটি রহিয়াছে বলিয়াই ইহার জ্ঞান আমাদের হয়;

লেখনীটি সরাইয়া লইয়া যাও, দেখিবে, আর ইহার জ্ঞান হইবে না, সুতরাং লেখনী বলিয়া একটা কিছু, লেখনী-জ্ঞান হইতে পৃথক্ আছে বলাই উচিত; তাহা হইলে আমরা ব্যবহার নিষ্পত্তির জন্য সেই বিজ্ঞানেরই একটা আলম্বন-ভাব স্বীকার করিয়া তাহা সিদ্ধ করিতে চাহি। বিজ্ঞানই লেখনী হইয়া লেখনীজ্ঞান জন্মাইয়া দেয়, লেখনী বলিয়া কিছু নাই।

এইরূপে এতদূর পর্য্যন্ত বৌদ্ধগণ যাহা বলিলেন, তাহাতে জগদ্ব্যাপারকে ক্ষণিক বিজ্ঞান মাত্র বলিয়া বুঝা গেল, কিন্তু তথাপি এখন এমনও সমস্যা রহিয়া যাইতেছে যে, তাহার মীমাংসা না হইলে জগত্তত্ত্বের রহস্য সম্পূর্ণরূপে উদ্ঘাটিত করা হইল বলিতে পারা যায় না। এই যে লেখনীটী, ইহা যদি না থাকিল, তাহা হইলে যতবার ইহার দিকে চাহিব, ততবারই কেন লেখনী লেখনী বলিয়া একটা জ্ঞানধারা বহিতে থাকে? আবার যদি একবার লেখনীটীকে এবং পরবার মসীপাত্রটীকে যথাক্রমে চক্ষুর সম্মুখে ধরা যায়, তাহা হইলে ত আর কেবল লেখনী-জ্ঞানধারা বহিবে না, তখন একবার লেখনী, একবার মসীপাত্র এই প্রকার জ্ঞানধারাই বহিবে। সুতরাং লেখনীবস্তু ও মসীপাত্রবস্তুকে দুইটী পৃথক্ বস্তু বলিয়াই স্বীকার করা উচিত। বৌদ্ধাচার্য্যগণ এই প্রকার সমস্যা মীমাংসার জন্য সেই বিজ্ঞান মধ্যেই আর একটী কারণতা মানিয়া লয়েন। তাঁহারা বলেন, ইহা বিজ্ঞানধারার একটা পূর্ব্বাপরভাব বশতঃই ঘটিয়া থাকে। পূর্ব্ববর্ত্তী বিজ্ঞানটী যখন পরবর্ত্তী বিজ্ঞানে নিজের বিষয়টী চালাইয়া দেয়, তখনই এরূপ হয়। কারণ, অত্যন্ত নৈকট্য বশতঃ একের গুণ অপরে সংক্রামিত হইতে সকলেই দেখিয়া থাকেন। উত্তপ্ত লৌহখণ্ডের নিকটে ধাতুদ্রব্য আনিলে উহাও উত্তপ্ত হইতে দেখা যায়। অবশ্য যখন লেখনী-জ্ঞান হইতে মসীপাত্র জ্ঞান হয়, তখন এ ব্যাপার ঘটে না, কারণ, তখন নৈকট্য সম্বন্ধের ব্যাঘাত ঘটে। যদি বল, লেখনী ও মসীপাত্র যদি খুব কাছাকাছি রাখা যায়, তাহা হইলে উক্ত নৈকট্য সম্বন্ধের ব্যাঘাত ঘটিবে না, তাহা হইলে আমরা বলিব যে, না, তাহা হয় না। লেখনীতে চক্ষু আবদ্ধ রাখিয়া লেখনী-জ্ঞানধারা প্রবাহিত করিতে যে সময় লাগে, লেখনী হইতে মসীপাত্রে চক্ষুকে আবদ্ধ করিতে তাহা অপেক্ষা অধিক সময় লাগিতে বাধ্য। সুতরাং বিজ্ঞানের এই পূর্ব্বাপরীভাব স্বীকার করিলেই এ সমস্যার মীমাংসা হইতে পারিবে।

বৌদ্ধাচার্য্যগণ এই প্রকারে বিজ্ঞানেই চারি প্রকার কারণতা স্বীকার করিয়া

জগত্তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। এই চারি প্রকার কারণতা স্বীকার করিলে যে কেবল জীব ও জগতের মধ্যে ব্যবহার নির্ব্বাহ হয়, তাহা নহে; জগতের মধ্যে জড় বস্তুসমূহের পরস্পরের মধ্যেও যে প্রকার ব্যাপারসমূহ পরিলক্ষিত হয় তাহাও নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। ঐ যে কুম্ভকার ঘটশরাবাদি নির্ম্মাণ করিতেছে উহার মধ্যে যে কারণগুলি আবশ্যক আমাদের উক্ত চারিপ্রকার কারণতা স্বীকার করিলে সে কার্য্য সিদ্ধ হইবে। তোমার কুম্ভকার নিমিত্ত কারণ, সলিল সূত্র দণ্ড চক্রাদি সহকারী কারণ, মৃত্তিকা উপাদান কারণ, আমাদেরও তদ্রূপ নিমিত্ত কারণের পরিবর্ত্তে অধিপতি প্রত্যয়, সহকারী কারণের পরিবর্ত্তে সহকারী প্রত্যয় এবং উপাদান কারণের পরিবর্ত্তে আলম্বন ও সমনন্তর প্রত্যয় স্বীকৃত হয়। ঐ যে বীজ হইতে আপনা আপনি বৃক্ষ উৎপন্ন হইতেছে জলস্রোত হইতে নদী হইতেছে, মেঘ হইতে বৃষ্টি হইতেছে, পৃথিবী সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে, চাপ ও তাপে মৃত্তিকা প্রস্তর হইতেছে, তাহাও বিজ্ঞানে ঐ চারিপ্রকার কারণতা স্বীকার করিলে সিদ্ধ হইবে। বৌদ্ধাচার্য্যগণ এই চারি প্রকার কারণের যে নামকরণ করিয়াছেন, তাহাও এস্থলে বলা ভাল। পরে এই মত খণ্ডনকালে এই নামগুলির ব্যবহার করিলে সংক্ষেপে অনেক কথা বলিতে পারা যাইবে। আমরা প্রথমে যাহাকে সহকারী কারণ বলিয়াছি, তাহা ইহাদের ভাষায় সহকারী প্রত্যয়, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়জন্য যে প্রকার কারণের কথা বলিয়াছি তাহা ইহাদের মতে অধিপতিপ্রত্যয়, বিজ্ঞানের যে আলম্বন-ভাবের পরিচয় দিয়াছি, তাহা এস্থলে আলম্বনপ্রত্যয়, এবং পরিশেষে যে পূর্ব্বাপরীভাবের উল্লেখ করিয়াছি, তাহা ইঁহাদের ভাষায় সমনন্তর প্রত্যয় পদবাচ্য হইয়া থাকে। প্রত্যয় শব্দের অর্থ ইহাদের অভিধানে "কারণ"।

এইরূপে জগৎ-তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া বৌদ্ধাচার্য্যগণ প্রায় সকল সন্দেহেরই ছেদন করিয়াছেন,—সকল সমস্যারই মীমাংসা করিয়াছেন। কিন্তু তথাপি আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এখনও যথেষ্ট হয় নাই, এখনও একটী গুরুতর সন্দেহ অবশিষ্ট রহিয়াছে এবং তাঁহারা ইহারও একটী সুন্দর উত্তর প্রদান করিয়া থাকেন। সন্দেহটী এই—মনে করুন, যদি জগতের যাহা কিছু সবই ক্ষণিক বিজ্ঞান হইল, তাহা হইলে পূর্ব্বদৃষ্ট পদার্থকে আমরা চিনিতে পারি কি করিয়া? যে বিজ্ঞান পূর্ব্বদৃষ্ট পদার্থের জ্ঞান উৎপন্ন করিয়াছিল, বহুকাল পরে ত আর তাহার আগমন সম্ভব নহে, সুতরাং কোন একটা পদার্থকে

"এটা সেই" বলিয়া কি করিয়া চিনিতে পারা সম্ভব হয়। "এটা এই" এই প্রকার জ্ঞানধারা যত বহিতে পারে বহিয়া যাউক,এবং তাহার বিজ্ঞানও ক্ষণিক বিজ্ঞান হউক, কিন্তু"এটা সেই" এইরূপ জ্ঞানস্থলে বিষযের ত ঐক্য প্রমাণিত হয়? সুতরাং এতদ্দ্বারা ত ক্ষণিক বিজ্ঞানের হানি অবশ্যম্ভাবী। বস্তুতঃ কথাটী যেমন যুক্তিযুক্ত, বৌদ্ধাচার্য্যগণ, ইহার যাহা উত্তর দিয়াছেন, তাহাও তেমনি কৌশলপূর্ণ। তাঁহারা বলেন "এটা সেই" এ জ্ঞানটা যথার্থ জ্ঞান নহে,—যেমন দেখা শুনা যায়, জিনীসটা সেরূপ নহে। এস্থলে পূর্ব্ব বিজ্ঞানের বিষয় ও পর বিজ্ঞানের বিষযের ঐক্য নাই, ভুল করিয়া তাহাকে ঐক্যজ্ঞান করা হয়। অবশ্য বিষয় বলিতে যে উহা বিজ্ঞানেরই আলম্বন কারণ-সম্ভূত একটা ব্যাপার,তাহা যেন আমরা বিস্মৃত না হই। একথা আমরা পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। যাহা হউক ফলে দাঁড়াইল এই যে, "এটা সেই" ইত্যাকার জ্ঞান আমাদের যথার্থ জ্ঞান নহে, যেমন দেখা যায় ঠিক তাহার বোধ নহে; ইহা ভুল বা ভ্রম-জ্ঞান। আর যদি ইহা ভ্রম-জ্ঞান হয়, তাহা হইলে বিষয়ের নিত্যতা প্রমাণের কোন সম্ভাবনাই থাকিল না। মোট কথা দাঁড়াইল এই যে, ক্ষণিক বিজ্ঞানের যাহা বিষয়,তাহা বিজ্ঞান; কিন্তু তাহাতে বিষয়-বিষয়ীর ঐক্য থাকে, কিন্তু ক্ষণিক ভ্রমবিজ্ঞানের যাহা বিষয়, তাহাও বিজ্ঞান, কিন্তু তাহাতে বিষয়-বিষয়ীর ঐক্য থাকে না।

এই প্রকারে বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধজ্ঞানের যাহা বিষয়, তাহাকে জ্ঞানাতিরিক্ত না স্বীকার করিয়া জ্ঞান ভিন্ন পদার্থের মিথ্যাত্ব ঘোষণা করিয়া থাকেন এবং সেই জ্ঞানকে ক্ষণিক বলিয়া তাহার সম্বন্ধে কোন কর্ত্তব্যের বিধান করেন না, তাহাকে প্রকারান্তরে অসৎ পদার্থের মধ্যে পরিগণিত করিয়া থাকেন। এই পর্য্যন্ত মোটামুটী বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধের মত, এইবার রামানুজ-মত অবলম্বন করিয়া ইহার কি খণ্ডন হয় দেখা যাউক।

ক্রমশঃ।

মণ্ডন-পরাজয়।

[শ্রীমতী—]

রাজার পুনর্জ্জীবনে রাজভক্ত প্রজারা নগরে নানা মহোৎসব করিল। রাজমহিষীরা দেবমন্দিরে পূজা প্রদান করিলেন। মহারাজও দিন দিন সুস্থ হইতে লাগিলেন।

কয়েক দিন গত হইলে মন্ত্রী মহারাজের আচার ব্যবহারে কিছু বিস্মিত হইলেন। মহারাজ আর পূর্ব্বের ন্যায় নিজে রাজকার্য্য দেখেন না, মন্ত্রীকেই সে সমস্ত করিতে হয়। রাজ্য সম্বন্ধে মন্ত্রী যদি কখন কিছু জিজ্ঞাসা করেন, মহারাজ তাঁহাকে এমন সুপরামর্শ দেন যে, তিনি আশ্চর্য্য হইয়া থাকেন। পূর্ব্বে মহারাজের এরূপ বুদ্ধিপ্রাখর্য্য দেখা যাইত না। রাজসভার পণ্ডিত-দিগের সহিত রাজা কখন বাক্যালাপও করিতেন না, তাঁহারা রাজসভায় বসিয়া নস্য গ্রহণ করিয়াই স্ব স্ব প্রাপ্য আদায় করিতেন। আজকাল মহারাজ সর্ব্বদাই তাঁহাদিগের সহিত শাস্ত্রীয় নানা বিষয়ে যুক্তি তর্ক করিয়া থাকেন ও তাহাতেই তাঁহার বিশেষ উৎসাহ দেখা যায়। পূর্ব্বে কোন কোন প্রজার প্রতি তিনি সন্তুষ্ট, কাহারও প্রতি বা অসন্তুষ্ট ছিলেন, এখন সকলের প্রতিই তাঁহার সমানভাব। পূর্ব্বে তিনি রাজ্যে কয়েকটী নূতন নিয়ম স্থাপন করিবার জন্য বহুদিন হইতে মন্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিতেছিলেন, এখন আর সে কথার কোন উল্লেখ করেন না। যেন তাহা স্মরণমাত্র নাই। পূর্ব্বে কোষা-গারের ধনের পরিমাণ বুঝিয়া তবে দানের ব্যবস্থা করিতেন, এখন সে বিষয় কিছুই জানিতে চাহেন না, অকাতরে ধন দান করেন। কর্ম্মক্ষেত্রে পুরাতন কর্ম্মচারী পরিবর্ত্তিত হইয়া নূতন কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইলে তাহার যে অবস্থা হয়, মন্ত্রী দেখিলেন, মহারাজেরও যেন তাহাই হইয়াছে।

ইহা দেখিয়া মন্ত্রী ভাবিতেন 'মহারাজের অবস্থা এরূপ হইবার কারণ কি? পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়া কি তাঁহার মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটিয়াছে! না, তাহা হইলে এরূপ বিচার-বুদ্ধি অসম্ভব হইত। তবে কি কোন যোগীর আত্মা মৃত রাজদেহ আশ্রয় করেছেন? ইহাই নিশ্চিত, নচেৎ মৃত-ব্যক্তির পুনর্জ্জীবন-লাভ অসম্ভব ঘটনা"। যাহা হউক, বিজ্ঞ মন্ত্রী মনের কথা মনেই রাখিলেন, কাহাকেও কিছু প্রকাশ করিলেন না।

অন্তঃপুরেও মহারাজকে লইয়া রাণীমহলে বড় গোল বাধিয়াছে। সখীরা অন্তরালে দিন রাত রাজার কথা বলা কহা করিতেছে, কেবল রাণীদের ভয়ে কিছু প্রকাশ করিতে পারিতেছে না।

মহারাজ আর পূর্ব্বের ন্যায় রাণীদের লইয়া আমোদ প্রমোদ করেন না। সর্ব্বদাই নির্জ্জনে থাকিতে চাহেন। কখন বা দেখা যায়, তিনি নির্জ্জন কক্ষে বসিয়া একাগ্রচিত্তে কি লিখিতেছেন। রাণীদের শত আহ্বানেও তাঁহার উত্তর পাওয়া যায় না। তিনি আর মদগর্ব্বিত বিলাসী যুবক নহেন, তিনি

সর্ব্বদাই ধীর গম্ভীর, অথচ প্রসন্নবদন। রাণীদিগের সহিত তাঁহার উদাসীন-বৎ আচরণ। সুবেশা নর্ত্তকীরা নানা হাবভাবে নৃত্য গীত করিত, তিনি যেন তাহা দেখিয়াও দেখিতেন না। আবার কখন বা একটু হাসিয়া তাহাদের প্রতি চাহিতেন। সে অপূর্ব্ব হাসি দেখিয়া কেহই তাঁহার ভাব বুঝিতে পারিত না। রাণীদিগের মধ্যে কেহ যদি কখন বলিতেন "মহারাজ! আজ নর্ত্তকীদের নৃত্য কিরূপ হইয়াছে, বলুন দেখি", তদুত্তরে মহারাজ তাহার এরূপ ব্যাখ্যা করিতেন যে, তাঁহার রসজ্ঞান দেখিয়া তাঁহারা অবাক্ হইতেন।

একদিন গভীর রাত্রে মহারাজ নির্জ্জন কক্ষে বসিয়া লেখাপড়া করিতেছেন। প্রধানা রাণী তাহা জানিতে পারিয়া নিকটে আসিয়া কহিলেন—

"মহারাজ! রাত্রিজাগরণ করিয়া নিত্য কি লিখিয়া থাকেন দেখি।"

মহা। মহিষি! ও বিশেষ কিছু নয়। কি আর দেখিবে।

রাণী। (সহাস্যে) মহারাজ! বিশেষ না হউক, সবিশেষ ত বটে। আমি উহাই দেখিব।

মহা। তবে শোন। ইহা একখানি কাব্য, ইহার নাম 'অমরু শতক' ইহা কামশাস্ত্রীয় গ্রন্থ।

রাণী সাগ্রহে পুস্তকখানি লইয়া পাঠ করিতে লাগিলেন। পুস্তকের কিয়দংশ পাঠ করিয়া তিনি বিমোহিত হইলেন। যদিও তিনি জানিতেন, মহারাজ কামশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, তথাপি অপূর্ব্ব রচনা-মাধুর্য্য দেখিয়া তাঁহার বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না।

তাঁহার মনোভাব বুঝিয়া রাজা কহিলেন—

রাণি! গ্রন্থ কিরূপ হইয়াছে?

রাণী। মহারাজ! অতি সুন্দর। ইহা অপূর্ব্ব গ্রন্থ। তিনি মুখে এই কথা বলিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার অন্তরে নানা সন্দেহের উদয় হইল। তিনি ভাবিলেন মৃগয়া হইতে আসিয়া অবধি মহারাজের যেন বিচিত্রভাব, যেন আর একজন ব্যক্তি; এরূপ সুন্দর গ্রন্থ-রচনা-শক্তি মহারাজের কখনও ত ছিল না, এরূপ উদাসীন ভাবও ত কখন তাঁহাতে দেখা যায় নাই। সখীরা সকলেই মহারাজের বিষয়ে গোপনে নানা কথা কহিয়া থাকে, সপত্নীগণ-মধ্যেও রাজার ব্যবহার বিস্ময়ের কারণ হইয়াছে। নিশ্চয় ইহার মধ্যে কোন রহস্য আছে।

এই ভাবিয়া তিনি মন্ত্রীর সহিত এ বিষয়ের কথোপকথন করাই স্থির করিলেন।

রাজমহিষীব আদেশে মন্ত্রী গোপনে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। রাণী মন্ত্রীকে রাজার বিষযে অনেক প্রশ্ন করিলেন। বৃদ্ধ মন্ত্রী প্রথমে যেন কিছুই জানেন না এইরূপ ভাব দেখাইলেন; কিন্তু চতুরা মহিষীর চতুরতায তাঁহার কৌশল ব্যর্থ হইল। ফলে তাঁহাকে নিজ সন্দেহ-কথা প্রকাশ করিতে হইল।

বাণী দেখিলেন, তাঁহার অনুমান সত্য। তিনি তখন মন্ত্রীকে রাজার এই বিচিত্র ভাবের কারণ কি, জিজ্ঞাসা করিলেন।

মন্ত্রী। জননি! আমার বিশ্বাস কোন যোগীর আত্মা প্রযোজনবশে মৃত বাজদেহ আশ্রয় করিয়াছেন।

রাণী। (চমকিত হইযা) বলেন কি মন্ত্রী! এরূপ ঘঠনা কি সম্ভব? আপনি কি ইহা বিশ্বাস করেন?

মন্ত্রী। মা! ইহা অসম্ভব নহে। আমি ইহা বিশ্বাস করিযা থাকি।

রাণী। যদি তাহাই হয, এক্ষণে কি কবা উচিত?

মন্ত্রী। যোগী যাহাতে রাজাকে ছাড়িযা যাইতে না পারেন এখন সেই ব্যবস্থা করাই উচিত।

রাণী। আপনি কি সে আশঙ্কা করিতেছেন?

মন্ত্রী। মা! প্রযোজন সিদ্ধ হইলে যোগী কখন রাজদেহে বাস কবিবেন না, ইহা নিশ্চয়। সুতরাং তাঁহার দেহত্যাগে আমরাও মহারাজকে হারাইব।

রাণী। (সভয়ে শিহরিয়া) মন্ত্রিবব! তাহা হইলে যথাকর্ত্তব্য শীঘ্রই স্থির করুন। বিলম্বে বিপদ উপস্থিত হইবে।

মন্ত্রী। জননি! আপনি অনুমতি করুন, আমি এ বিষয় পণ্ডিতদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া যথাকর্ত্তব্য স্থির করি।

অনন্তর রাণীর আদেশ পাইয়া মন্ত্রী নিজ বাসভবনে গোপনে পণ্ডিতদিগকে অহ্বান করিয়া তাঁহাদের পরামর্শ গ্রহণ করিলেন, এবং যথাসময়ে তাহা রাণীকে জানাইলেন।

পরদিন প্রাতে রাজবাড়ী হইতে এক অভিনব আদেশ প্রচারিত হইল। আদেশ শুনিয়া নগরবাসী বিস্ময়াভিভূত হইল। ঘরে ঘরে সে কথার আলোচনা হইতে লাগিল। বৃদ্ধ ব্যক্তিরা বলিলেন "এতখানি বয়স হ'ল, এমন

সৃষ্টিছাড়া কথা কখনও শুনি নাই। কোন দিন জ্যান্ত মানুষ পোড়াবার হুকুম হবে দেখছি, এই বেলা প্রাণ নিয়ে পলায়ন করাই ভাল।"

সেইদিন সন্ধ্যাকালে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের গৃহপ্রাঙ্গণে বসিয়া কয়েকজন কৃষক এইরূপ কথোপকথন করিতেছে।

১ম কৃষক। আচ্ছা, দাদাঠাকুর! রাজবাড়ী থেকে আজ কি ঢ্যাড়া দিয়েছেন আপুনি শুনেচ ত?

২য় কৃষক। তোর যেমন কথা, মোরা শুন্‌তি পালাম,আর ঠাকুর মোশই শুন্‌তি পাবা না?

১ম কৃষক। তুই থাম্ না বাপু!

দাদাঠাকুর এতক্ষণ অদূরে বসিয়া নিবিষ্ট মনে তামাকু সেবন করিতেছিলেন। এক্ষণে হুঁকাটী রাখিয়া কলিকাটী কৃষকের হস্তে প্রদান করিয়া কহিলেন,—

ওরে, আমি তোদের অনেক আগে এসব কথা শুনেছি।

২য় কৃ। এইবার মুদ্দফরাস গুলোরই কপাল ফিরে যাবে দেখ্‌চি।

৩য় কৃ। চল্ ভাই, আমবাও দিনকতক মুদ্দফরাসগিরি করি আয়।

১ম কৃ। ওরে তার দবকার কি? খালি মড়ার তল্লাস কত্তি পাল্লেও যে কত ট্যাকা বস্‌কিস্ পাওয়া যায়।

২য় কৃ। তবে আর কি খুড়ো। আমরা দিনকতক লাঙল ছেড়ে বাঁশ ঘাড়ে ক'রে মড়া খুঁজে বেড়াই চল।

৩য় কৃ। তা আর শক্ত কাজই বা কি? লাঙল ঘাড়ে করি, তার বদলে না হয় বাঁশ ঘাড়ে কব্‌ব। এই ত কথা।

৪র্থ কৃ। তার চেয়ে আয় না কেন, এই বেলা সব দাঁত খিঁচিয়ে মরি; তাহ'লে আর ব্যাটাগুনোর ঘাটখরচ লাগ্‌ত নি?

সকলে। (উচ্চহাস্যে) যা বলেছিস্ ভাই। মুন্‌তিরী মোশাই সকল দিকেই সুবিধে করেচে; কিছুদিন গরীব দুক্ষী নোকের ঘাটখরচ বেঁচে যাবে।

দাদা। মন্ত্রী মশায়কে ত আর ভূতে ধরেনি যে,তোদের মড়া নিয়ে গিয়ে পোড়াবে। মন্ত্রী সাধু সন্নিসীর মড়া খুঁজচে।

২য় কৃ। না দাদাঠাকুর! তা নয়। মুনতিরী হুকুম দিয়েছে, মড়া দেখলেই পোড়াবো।

দাদা। ওরে, আমার চেয়ে কি তোরা বেশী খবর রাখিস্? আসল দর-

কার সাধু সন্ন্যেসী। তবে যদি না চিন্‌তে পারে, তাই ঢালা হুকুম দিয়ে দিঁয়েচে।

৩য় কৃ। আচ্ছা ঠাকুর মোশই! মুন্‌তিরী এসব মড়া নিয়ে কি কর্‌বা?

৪র্থ কৃ। তোর মুণ্ডু কর্‌বা। শুন্‌চে, মড়া পোড়াতি নেগেচে, আবার কি কর্‌বা।

২য় কৃ। হ্যাদে দাদাঠাকুর! মড়া পোড়ালে বস্‌কিস্ দেবা, আবার সাধু সন্নিসীর মড়া হলে বেশী ট্যাকা দেবা, এসব কথার অথ কি?

১ম কৃ। অথ আর কি বল্। রাজা রাজ্‌ড়ার খেয়াল কখন কি হয় তা কি বলা যায়?

দাদা। ওহে বাপু, এটা বড় খেয়াল নয়। এর ভিতর কিছু কথা আছে।

সকলে। (ব্যস্তভাবে) কি কথা দাদাঠাকুর,কি কথা?

দাদা। তবে শোন্ বলি। দেখিস্ যেন প্রকাশ করিস্ নি।

সকলে। (জিভ্ কাটিয়া) আরে রাম, ছি! ঠাকুর মোশাই, আপনি কি আমাদের তেমনি প্যালে?

দাদা। (চারিদিকে চাহিয়া মৃদুস্বরে) রাজার মৃগয়ার কথা মনে আছে ত?

সকলে। সে কি ভোল্‌বার কথা! রাজা আমাদের মরে বেঁচেছে!

দাদা। সেই ত হয়েছে যত গোল। মরে বেঁচে, রাজা কেমন কেমন হয়েছেন, শুনেছিস ত?

সকলে। তা আর শুনিনি?

২য় কৃ। সেই থেকে রাজা দান ধ্যান খুব কর্‌তি নেগেচে।

৩য় কৃ। বামুন পণ্ডিতদের খুব খাতির মান্যি কর্‌তেচে।

দাদা। এই সব দেখে শুনে মুন্‌তিরী মুশয়ের মনে সন্দ হয়েছে যে, এ বুঝি সে রাজা নয়।

সকলে। (সভয়ে) কি সর্ব্বনাশ! তবে এ কে?

দাদা। কোন সাধু নিজের শরীর ছেড়ে রাজার মৃতদেহ আশ্রয় করেছেন।

সকলে। (আশ্চর্য্যে) এও নাকি হয় দাদাঠাকুর?

দাদা। ওরে সাধু মহাত্মারা কি আর মানুষ? তাঁরা মনে কর্‌লে সব কর্‌তে পারেন।

৩য় কৃ। তা না ত কি? ওনারা হলেন সাক্ষাৎ স্থাব্‌তা (সভয়ে প্রণাম)।

দাদা। এখন সাধু রাজাকে ছাড়লেই ত রাজা মারা পড়বেন।

সকলে। তবে ত রাজ্যির বড় বিপদ! এখন উপায়?

দাদা। মন্‌তিরী মশায় সেই ভয়ে সাধুর আগেকার দেহটা খুঁজে পোড়াবার হুকুম দিয়েচে।

৩য় কৃ। তাহ'লে কি হবে?

দাদা। তাহ'লে সাধু আর রাজাকে ছাড়তে পারবে না। নিজের শরীরটা না পেলে যাবে কোথায়? তাই মড়া পোড়াবার এত ধুম।

৩য় কৃ। বাবা! মুন্‌ত্তিরী মোশয়ের খুব বুদ্ধি যা হোক্।

৪র্থ কৃ। ওরে চরে চ; আদার ব্যাপারির অ্যাত সব জাহাজের খবরে দরকার নেই, এখন সব ঘরে চ।

তখন সকলে লাঙল কাঁধে করিয়া যে যাহার গৃহে গমন করিল। দাদাঠাকুরের গোপনীয় কথাটী সেই রাত্রেই ঘরে প্রচার হইল।

নিবিড় অরণ্যে নিভৃত গুহা। তন্মধ্যে আচার্য্যের প্রিয়তম শিষ্য পদ্মপাদ প্রাণোপম গুরুদেবের পরিত্যক্তদেহ ক্রোড়ে লইয়া বিমর্ষচিত্তে দিনযাপন করিতেছেন। গুরুগতপ্রাণ-শিষ্যগণ গুরুবিহনে দিন্ দিন মলিন। মাসাধিক হইতে চলিল, তাঁহারা গুরুবাক্য শিরে ধরিয়া গভীর অরণ্যে অরণ্য-বাসী। তাঁহাদের ক্লান্তি নাই, বিরক্তি নাই, দিবানিশি গুরুদেহ রক্ষণে নিযুক্ত। গভীর নিশাতেও নিদ্রা পরিহার করিয়া সমভাবে জাগ্রত।

নিত্য প্রাতে একে একে নদীতে স্নান ও প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন, পরে ধ্যান ধারণা প্রভৃতি সন্ন্যাসীর নিত্যকর্ম্ম সমাধান। দ্বিপ্রহরে একবার সুদূর পল্লীতে ভিক্ষায় গমন। ভিক্ষান্তে পুনরায় গুরু-পাদপদ্মে বসিয়া বেদান্ত-চর্চ্চা। ইহাই তাঁহাদের নিত্য-অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম।

নিত্য এক স্থানে যাতায়াতে যদি কেহ আচার্য্য দেহের সন্ধান পায়, এই ভয়ে তাঁহারা নিত্য এক স্থানে গমন করিতেন না। ফল ভিন্ন অন্য কিছু ভিক্ষা তাঁহারা লইতেন না। দ্বিপ্রহরে যে কোন গৃহস্থের দ্বারদেশে নারায়ণ বলিয়া দাঁড়াইতেন। কেহ ভিক্ষা দান করিলে গ্রহণ করিতেন নচেৎ অন্য গৃহস্থের দ্বারে গমন করিতেন।

তাঁহাদের পবিত্র মুখশ্রী ও নির্ম্মল ভাব দেখিয়া পল্লীবাসীরা সকলেই তাঁহাদের ভাল বাসিত।

গৃহস্থ রমণীরা সন্ন্যাসী দেখিয়া কেহ বা সন্তান কামনায়, কেহ বা অর্থ-কামনায়, কেহ বা পুত্রকন্যার মঙ্গলার্থে কেহ বা রুগ্নস্বামীর আরোগ্যের জন্য ঔষধ প্রার্থনা করিত।

তাঁহারা মৃদুহাস্যে সস্নেহে বলিতেন, "মা, ভগবানের নামই সর্ব্বরোগের মহৌষধ। অন্য ঔষধ কোথায় পাইব? ভগবানের পাদপদ্ম আশ্রয় করুন, সর্ব্বকামনা সিদ্ধ হইবে।"

তাঁহারা যে দিন যে পল্লীতে গমন করিতেন, পল্লীবাসীরা সাদরে তাঁহাদের ভিক্ষা প্রদান করিত।

এইরূপে মাসান্ত হইতে চলিল; এপর্য্যন্ত কেহই আচার্য্যদেহের সন্ধান পায় নাই।

সহসা একদিন জনৈক শিষ্য গ্রাম হইতে মন্ত্রীর আদেশ-কথা শুনিয়া আসিলেন।

রজনী দ্বিপ্রহর। গুহামধ্যে পদ্মপাদাদি জাগরিত। সকলেরই চিন্তিত ভাব। সকলেই নির্ব্বাক্।

কতক্ষণ পরে পদ্মপাদ কহিলেন :—

ভাই, তুমি ঠিক শুনিয়াছ?

শিষ্য। পদ্মপাদ, সকলের মুখেই যখন একরূপ কথা, তখন ভ্রমের সম্ভাবনা কোথায়?

পদ্ম। কোথাকার রাজা, কি নাম, তাহা কিছু শুনিয়াছ?

শিষ্য। বিন্ধ্যাচলের অধীশ্বর অমরকরাজ।

পদ্ম। তবে অমরকরাজদেহে অবস্থান করিতেছেন, ইহাই নিশ্চিত।

শিষ্য। সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই; এক্ষণে উপায় কি পদ্মপাদ?

পদ্ম। আচার্য্যের সহিত সাক্ষাৎ ভিন্ন অন্য উপায় আর কি হইতে পারে?

শিষ্য। তাহা কি সম্ভব হইবে?

পদ্ম। ভাই! গুরুদেবের কৃপায় সকলই সম্ভব হইবে। চল ভাই, কল্য আমরা দুইজন রাজধানী গমন করি; (অপর শিষ্যদ্বয়ের প্রতি) এবং তোমরা দুইজনে অতি সাবধানতার সহিত আচার্য্যের দেহ রক্ষা কর।

পদ্মপাদের পরামর্শে সকলেই সম্মত হইলেন। প্রভাতে পদ্মপাদাদি রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

যথাসময়ে তাঁহারা রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া শুনিলেন, মন্ত্রীর বিনাজ্ঞ-

ব্যতিতে কেহই রাজসাক্ষাৎ পায় না। নর্ত্তকী-বেষ্টিত প্রমোদ-কাননেই মহারাজ সর্ব্বদা বাস করেন। রাজাকে বিমুগ্ধ রাখিবার জন্য মন্ত্রীর আদেশে গায়কগণ ইচ্ছামত রাজসমীপে গমন করিয়া থাকে।

একথা শুনিয়া পদ্মপাদ চিন্তিত হইলেন। তাঁহারা গীতবাদ্য জানেন না কিয়ৎক্ষণ চিন্তার পর তিনি ভাবিলেন, কেন, আমরা ত নিত্য বেদগান করিয়া থাকি; বৈদিক সুরে গীতরচনা করিলেই ত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে।

এই ভাবিয়া তিনি একটী গীত রচনা করিলেন। গীতটী এমন ভাবে রচিত হইল যে, এক অর্থে ভিক্ষুক রাজার ঐশ্বর্য্য বর্ণনা করিয়া ভিক্ষা প্রার্থনা করিতেছে, অন্য অর্থে রাজকর্ম্মচারী কর্ত্তৃক আচার্য্যের দেহ দগ্ধ হইবে এই আশঙ্কায় পদ্মপাদ অতি সত্বর তাঁহার স্বদেহে প্রত্যাগমনের প্রার্থনা করিতেছেন--বুঝায়। পরদিন অপরাহ্নে দুইজনে গায়ক-বেশে রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের দেখিয়া রাজবয়স্যেরা সমাদরের সহিত রাজ-সন্নিকটে লইয়া গেলেন।

তাঁহারা গুরুপাদপদ্ম স্মরণ করিয়া মহারাজাকে প্রণাম করিলেন এবং গীত গাহিয়া মহারাজের মনোরঞ্জন করিতে চাহিলেন।

রাজার অনুমতি পাইয়া তাঁহারা একটী সুমধুর গীত গাহিলেন। গান শুনিয়া সকলেই মুগ্ধ হইলেন ও গায়কদিগের প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

মহারাজ অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে বহুমূল্য ধনরত্নাদি প্রদান করিলেন, এবং স্বরচিত কাব্যগ্রন্থখানিও তাঁহাদের উপহার দিলেন। রাজদত্ত উপহার পাইয়া তাঁহারা সানন্দচিত্তে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

গায়কদ্বয় চলিয়া গেলে মহারাজ কিয়ৎক্ষণ তথায় বসিয়া রহিলেন, ক্রমে সন্ধ্যা আগত দেখিয়া তিনি সায়ংসন্ধ্যা সমাপনের জন্য অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া পূজায় বসিলেন। অনেকক্ষণ অতীত হইল, মহারাজ আর উঠেন না। এদিকে মন্ত্রী কোন কার্য্য উপলক্ষে মহারাজের নিকট আসিলেন, কিন্তু মহারাজের সাক্ষাৎ পাইলেন না। অবশেষে পূজাগৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, মহারাজ যোগাসনে উপবিষ্ট, ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়াছে।

ইতিমধ্যে রাজ-অনুচরেরা নিভৃত গুহা হইতে আচার্য্যের পরিত্যক্ত দেহ আবিষ্কার করিল।

সহসা একদিন তাহারা গুহাদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। শিষ্যদ্বয় তাহাদের দেখিয়া চমকিত হইলেন।

অনুচরেরা দিব্য সন্ন্যাসি-মূর্ত্তি দেখিয়া সভয়ে বিনীতভাবে রাজাদেশ নিবেদন করিল। তাঁহারাও নিজ গুরুর আদেশ-কথা তাহাদিগকে জানাইলেন।

তাহা শুনিয়া তাহারা রাজাজ্ঞা পালন করিতে ভীত হইল এবং শীঘ্র রাজ-কর্ম্মচারীদিগকে এ বিষয় জানাইল।

পরদিন তাঁহারা সদলবলে তথায় আসলেন। তাঁহারা প্রথমতঃ বিনীত ভাবে নিজ উদ্দেশ্য শিষ্যদিগকে জ্ঞাপন করিলেন।

প্রত্যুত্তরে শিষ্য দুইজনও সানুনয়ে তাঁহাদের নিবৃত্ত হইতে বলিলেন; কিন্তু তাঁহারা তাহাতে অসম্মত হইলেন।

কর্ম্মচারীরা রাজাদেশ পালনের জন্য ও শিষ্যেরা গুরুদেহ রক্ষার জন্য ব্যস্ত হইলেন।

পরিশেষে রাজপক্ষই জয়লাভ করিল। কর্ম্মচারীর আজ্ঞায় অনুচরেরা বল-প্রকাশ করিতে উদ্যত হইল। শিষ্যগণ তখন আর দুই চারিদিন অপেক্ষা করিতে বলিলেন, কিন্তু রৌদ্র অপেক্ষা বালুকার উত্তাপ অধিক হয়, সুতরাং তাঁহারা সে কথায় কর্ণপাতও করিলেন না।

অনুচরেরা সবলে গুহামধ্যে প্রবেশ করিয়া আচার্য্য-দেহ গ্রহণ করিল।

অবিলম্বে চিতা রচনা হইল। শিষ্যদ্বয় তাহা দেখিয়া উন্মত্তের ন্যায় ছুটিয়া চিতামধ্যে পতিত হইয়া কহিলেন, "আমাদের জীবন থাকিতে গুরুদেহ অর্পণ করিব না। অগ্রে আমাদের দগ্ধ কর, পশ্চাৎ যাহা ইচ্ছা করিও।"

কর্ম্মচারীরা তাহা শুনিয়া অনুচরদিগকে আদেশ করিলেন, "দুষ্ট সন্ন্যাসী-দের এখনই বন্ধন কর।"

অনুচরেরা তৎক্ষণাৎ শিষ্য দুইজনকে নিকটস্থ বৃক্ষে বন্ধন করিয়া রাখিল।

অনন্তর আচার্য্য-দেহ চিতামধ্যে শায়িত করিয়া তাহাতে অগ্নি প্রদান করা হইল।

নিরুপায় শিষ্য দুইজন এই দৃশ্য দেখিয়া মর্ম্মাহত। তাঁহারা কখন গুরু-দেবকে স্মরণ করিতেছেন, কখন বা সেই বিপদবারণ ভগবচ্চরণ অন্তরে ধ্যান করিতেছেন, কখন বা উন্মত্তের ন্যায় বলিতেছেন "রে মূর্খগণ! এই অন্যায় কার্য্যের প্রতিফল এখনই প্রাপ্ত হইবি, গুরুদেবের প্রভাব শীঘ্র দেখিতে পাইবি, তোরা ভাবিয়াছিস্ বল প্রকাশ করিয়া আচার্য্যের দেহ নষ্ট করিবি,

কখনই তাহা হইবে না, এখনই নিজ শক্তিতে আচার্য্য চিতা-শয্যা হইতে উত্থিত হইবেন।"

ভক্তবৎসল ভগবান্ কি কখন ভক্তের দুঃখ সহিতে পারেন? বৈকুণ্ঠে তাঁহার আসন টলিল। তিনি ভক্তের ব্যথায় ব্যথিত হইলেন।

এদিকে আচার্য্য রাজদেহ পরিত্যাগ করিয়া স্বদেহপ্রবিষ্ট হইলেন। দেখিলেন, তাঁহার দেহ চিতামধ্যে নিক্ষিপ্ত ও তাহাতে অগ্নিসংযুক্ত। বহুদিন সমাধিস্থ থাকিয়া যোগীরা যেমন সমাধি অন্তে সহসা সে নিশ্চল দেহ চালিত করিতে পারেন না, এক্ষেত্রেও তাহাই হইবার কথা। সুতরাং আচার্য্য শীঘ্র উত্থিত হইতে পারিলেন না।

তিনি তখন অগ্নি নিবারণের জন্য মনে মনে ভগবান্ নৃসিংহদেবের স্তব করিতে লাগিলেন।

ভগবানের অনন্ত করুণা। ক্ষণমধ্যে অগ্নি নির্ব্বাপিত হইল। আচার্য্যের দেহে অগ্নিসংযুক্ত দেখিয়া কর্ম্মচারীরা কিয়দ্দূরে বসিয়াছিলেন। এক্ষণে অগ্নি নির্ব্বাপিত দেখিয়া পুনরায় অগ্নিপ্রদানের আদেশ দিলেন।

অনুচরেরা পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়াও তাহাতে কৃতকার্য্য হইল না। ইহা দেখিয়া শিষ্য দুইজন আশান্বিত হইলেন ও তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চিতাপানে চাহিয়া রহিলেন।

১ম অনুচর। ওরে, এযে কিছুতেই জ্বলে না, করি কি?

২য় অনুচর। কি জানি দাদা! এই কাজ ত চিরকাল ক'রে আসি নি; এই নতুন হাতে খড়ি।

৩য় অনুচর। (চুপিচুপি) হ্যাঁরে, একি নড়্ছে না কি?

২য় অনুচর। তার আর আশ্চর্য্য কি বল্। এইবার টাকার লোভে প্রাণটা গেল দেখ্ছি।

৪র্থ অনুচর। বকিস্ নি তোরা, কতকালের বাসি মড়া তার ঠিক নেই, সে নাকি আবার নড়ে।

৩য় অনুচর। হয় কি নয়, একটু এগিয়ে এসে ত্যাখ্ না।

এই সময় অতি ধীরে একবার আচার্য্যের হস্ত-পদ সঞ্চালিত হইল। তাহা দেখিয়া শিষ্যদ্বয় আনন্দে চীৎকার করিয়া কহিলেন "ওরে দুরাচার পাষণ্ডগণ! এখনও তোদের চক্ষু উন্মীলিত হইল না, তোরা অর্থলোভে এতই অন্ধ হইয়াছিস্ যে, জীবিত ব্যক্তির অগ্নিসৎকার করিতেছিস্, চাহিয়া দেখ্, আমাদের

গুরুদেব জীবিত, এখনই তিনি উত্থিত হইবেন। তোরা এখনও ক্ষান্ত হ, শীঘ্র পলায়ন কর্, নচেৎ তোদের আর রক্ষা নাই।”

তাঁহাদের চীৎকার শুনিয়া সকলেই বিস্মিত হইল ও সভয়ে মৃতদেহপানে চাহিয়া দেখিল।

৪র্থ অনুচর। ওরে বাবারে, এ যে দানোয় পেয়েছেরে।

১ম অনুচর। চুপ্, চুপ্, করিস্ কি, চেঁচাস্ কেন? একটু কাছে গিয়ে ভাল ক'রে দেখি আয়। এতগুলো টাকার মায়া অমনি ছাড়ব?

তখন সকলে কয়েকপদ অগ্রসর হইয়া সভয়ে দেখিল,মৃতদেহ উঠিবার চেষ্টা করিতেছে। যেমন দেখা, অমনি সকলে সমস্বরে চীৎকার করিতে করিতে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিতে লাগিল।

সন্ন্যাসীদের তিরস্কার-বাণী ও অনুচরদিগের সভয় কণ্ঠধ্বনি শুনিয়া কর্ম্মচারীরা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তাঁহারা অনুচরদের সাহস দিয়া ফিরাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাহারা তখন “ওরে বাবারে, ধল্লেরে, মাল্লেরে” বলিতে বলিতে দ্বিগুণ চীৎকার করিয়া যে যেদিকে পারিল, ছুটিয়া পলাইল।

তাহারা পলায়ন করিলে কর্ম্মচারীরা সন্দিগ্ধভাবে চিতা-সন্নিকটে গমন করিলেন। আসিয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহাদের বীর হৃদয়ও কম্পিত হইল; অনুচরদিগের পলায়নের কারণ এতক্ষণে বুঝিতে পারিলেন।

সকলে তখন প্রাণ লইয়া পলায়নই শ্রেয়ঃ বোধ করিলেন। প্রাণটা বজায় থাকিলে মৃতদেহেরও অভাব হইবে না, পুরস্কার লাভও ঘটিবে; কিন্তু প্রাণটী যাইলে আর তাহা ফিরিয়া পাইবেন না। সুতরাং তাঁহারাও অবিলম্বে অনুচরদিগের পন্থা আশ্রয় করিলেন।

শিষ্যদ্বয় আচার্য্যকে উঠিতে দেখিয়া ঘন ঘন আনন্দধ্বনি করিতে লাগিলেন।

ক্রমে ধীরে ধীরে আচার্য্য চিতা হইতে উত্থিত হইয়া শিষ্যদিগের নিকটে আসিলেন। তাঁহারা গুরুদেবকে ফিরিয়া পাইয়া আনন্দে আত্মহারা হইলেন।

আচার্য্য শীঘ্র তাঁহাদের বন্ধন মোচন করিয়া দিলেন। তাঁহারাও গুরুপাদপদ্মে পতিত হইলেন। তাঁহাদের আনন্দাশ্রুতে গুরুচরণ আর্দ্রীকৃত হইল।

পদ্মপাদের অপেক্ষায় আচার্য্য সেদিন গুহামধ্যে অবস্থান করিলেন। নানা কথোপকথনে নিশা অতিবাহিত হইল।

পরদিন পদ্মপাদাদি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গুরুদেবকে অক্ষত-দেহে জীবিত দেখিয়া তাঁহাদের আনন্দের আর সীমা রহিল না। তিনি আচার্য্যকে প্রণিপাতপূর্ব্বক সেই গ্রন্থখানি তাঁহার হস্তে প্রদান করিলেন। আসিতে আসিতে পদ্মপাদের হৃদয়ে কত বিভীষিকা উদিত হইতেছিল। এক্ষণে করুণাময়ের করুণায় তাঁহাকে সুস্থ দেখিযা সকলের হৃদয়ে শান্তি বিরা-জিত হইল।

একে একে পদ্মপাদ একমাসকালের ঘটনা গুরুপাদপদ্মে নিবেদন করিলেন।

আচার্য্য শান্তভাবে দুইচারিটী কথা কহিলেন। গুরুকে দেখিয়া আনন্দে শিষ্যগণ য দণ্ড একটু চঞ্চল,আচার্য্যের কিন্তু সেই স্থির ধীর গম্ভীর ভাব,—কোন আগ্রহ নাই, উদ্বেগ নাই,আনন্দ নাই, দুঃখেম্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।

একটু সুস্থ হইয়া আচার্য্য সশিষ্যে মাহিষ্মতী অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। মাহিষ্মতীবাসী বড়ই নিরানন্দ। ব্রাহ্মণগণও মাথায় হাত দিয়া বসিয়াছেন। যাজ্ঞিক মণ্ডন আর যজ্ঞকর্ম্ম করেন না। একমাস হইতে চলিল, মণ্ডনের গৃহে ক্রিয়াকলাপ প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। কেবল ভারতীর দীন দরিদ্র ও অতিথি সেবাটী এখনও বজায় আছে। তাহাও হয়ত কোন দিন উঠিয়া যাইবে, লোকে এইরূপ বলাবলি করে।

বাস্তবিক মিশ্র মহাশয়ের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তাঁহার আর কর্ম্মকাণ্ডে উৎসাহ নাই, সে বিদ্যাভিমান নাই, তর্কে আনন্দ নাই ; তিনি সর্ব্বদা নির্জ্জনে বসিয়া কি চিন্তা করেন। কখন বা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন, কখন বা দিন গণনা করেন। কেহ আচার্য্যের নাম করিলে চমকিত হইয়া উঠেন। মধ্যে মধ্যে এত অন্যমনস্ক হয়েন যে, ভারতী ঠাকুরাণীর উচ্চ আহ্বানেও সমনস্ক হইতে পারেন না। যে মিশ্র মহাশয় ভারতী ঠাকুরাণীর চিত্রকলা দর্শনে ও সঙ্গীত শ্রবণে পরম প্রীতিলাভ করিতেন এবং ঐ বিষয়ের জন্য ভারতীর অনেক মান অভিমান সহ্য করিতেন, এখন তাহাতেও আর বিশেষ আগ্রহ নাই।

ঠাকুরাণীর কিন্তু বিচিত্র ভাব। তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা হাস্যকুশলা রসিকা। মানাভিমানশূন্যা সদাই প্রফুল্লা। স্বভাবতঃই তিনি অত্যন্ত পতিপরায়ণা;

পতিই তাঁহার ইষ্টদেবতা, নিত্য প্রাতে পতি-পূজা না করিয়া তিনি কখন জলগ্রহণ করিতেন না। পতিসেবাই তাঁহার একমাত্র অভীষ্ট ছিল; এক্ষণে তাঁহার সে ভাব আরও বৃদ্ধি হইয়াছে। যদি কখন কিছু ত্রুটি হইয়া থাকে, যেন এই ভাবিয়াই তিনি এখন তাহা পূরণ করিতেছেন। অতিথি অভ্যাগতে তাঁহার সমান প্রীতি, দরিদ্র-সেবায় সমধিক উৎসাহ।

মিশ্রদম্পতির এই অবস্থা। মাহিষ্মতীর পণ্ডিতেরাও নিশ্চিন্ত নহেন। কিরূপে সেই সন্ন্যাসীকে পুনরায় পরাজিত করা যাবে, এই চিন্তায় অনেকেরই রজনীতে সুনিদ্রা হইত না।

তাঁহারা প্রায়ই মণ্ডনের নিকট আসিয়া তাঁহাকে এ বিষয়ে উৎসাহিত করিতেন ও নানারূপ পরামর্শ দিতেন।

অপরাহ্ণে কয়েকজন পণ্ডিত মণ্ডনের গৃহে আসিয়াছেন। তাহার মধ্যে একজন মণ্ডনের গুরু কুমারিলের শিষ্য প্রভাকর-মতাবলম্বী। আচার্য্য ও মণ্ডনের বিচারকালে ইনি উপস্থিত ছিলেন না।

প্রভাকর-শিষ্য। মিশ্র মহাশয়! আমি সব শুনেছি। কি বলব, আমি তখন ছিলাম না, নহিলে একবার দেখতুম, সে কত বড় পণ্ডিত।

মণ্ডন। আজ্ঞে তা বই কি।

প্রভাকর-শিষ্য। মহাশয়, আপনাকে যেন কিছু চিন্তিত ব'লে বোধ হয়। কেন আপনার মনে কি কোন সন্দেহের উদয় হয়েছে না কি?

মণ্ডন। আজ্ঞে তা ঠিক নয়। তবে কি জানেন, আমার স্মরণ হয়, আমার গুরুদেবও এই সন্ন্যাসীর অদ্বৈতবাদ স্বীকার করিতেন। তাঁহার গ্রন্থমধ্যে একথা আছে।

প্রভা। না, আপনাকে দেখছি একটা ছোঁড়া এসে সত্যই যাদু ক'রে গেছে।

২য় পণ্ডিত। পণ্ডিত মশাই! শুধু যাদু করা নয়, মিশ্র ঠাকুরকে একেবারে ঝুলি কাঁথা সার করিয়েছিল; ভাগ্যে এমন গৃহিণী ছিলেন, তাই যাদুমন্ত্র খাট্‌ল না।

প্রভা। মিশ্র মহাশয়! আমার গুরু প্রভাকরও ত কুমারিলের শিষ্য ছিলেন; কুমারিল কিন্তু আমার গুরুকে [illegible] মান্‌তেন, এ সব ত জানেন, তিনি কিন্তু অদ্বৈতবাদ মান্‌তেন না।

প্রভাকর। (বিরক্তচিত্তে উত্থিত হইয়া) যান মশায়, আপনাদের ও সব কথা এখন ভাল লাগে না। এত দিনের পর কর্ম্মবীর মণ্ডনের নাম লোপ পাইবে দেখিতেছি; মণ্ডনের সহিত আমাদের মান-মর্য্যাদাও নষ্ট হইল।

এই বলিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন, ক্রমে অপর পণ্ডিতেরাও গমন করিলেন। কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া মণ্ডনও ধীরে ধীরে অন্তঃপুরে গেলেন।

দ্বিপ্রহরে মিশ্রদম্পতী অন্তঃপুরে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন। মিশ্র মহাশয় অর্দ্ধ শয়ানাবস্থায়; ঠাকুরাণী পতির পদতলে বসিয়া পদসেবায় নিরতা।

সহসা ঠাকুরাণী কহিলেন :—

মিশ্রঠাকুর! আপনার আচার্য্যঠাকুর কই?

মণ্ডন। কি জানি ভারতি! আর ত কোন সংবাদ পাইলাম না।

ভা। আপনি না জানেন, আমি জানি। তিনি আর আস্‌ছেন না। তিনি একেবারে স'রে প'ড়েছেন।

ম। ভারতি! সত্যই ত আমি পরাজিত হ'য়েছিলাম। বিরুদ্ধ প্রশ্ন করিয়া তাঁহাকে বিপদে ফেলা তোমার উচিত হয় নাই।

ভা। (সহাস্যে) তাইত মিশ্র ঠাকুরের সহসা যে ধর্ম্মজ্ঞান টন্‌টনে হ'য়ে উঠ্‌ল দেখ্‌ছি।

ম। না ভারতি! রহস্য নয়। সন্ন্যাসীর মত গ্রহণ করাই আমার পক্ষে ছিল ভাল। তাঁহার মতই ঠিক ব'লে বোধ হয়।

ভা। আহা, তা তখন বল্‌তে হয়, তা হলে আর পরের বাছাকে এত কষ্ট দিতাম না।

ম। তুমি যে এমন অদ্ভুত প্রশ্ন ক'রে ব'স্‌বে, তা কে জানে বল? আহা! আর কি তাঁর দেখা পাব!

ভা। ওহো! ঠাকুরের য সন্ন্যাসীর উপর বড় টান হয়েছে।

ম। ঠাকুরাণীরও ত বড় কম দেখি না। সন্ন্যাসী চলে গেলে কার চোখ ছল্‌ছল্‌ করেছিল, মনে পড়ে?

ভা। কে বল্লে? তা নয়, "আত্মবৎ মন্যতে জগৎ" আপনার চোখ ছল্‌ছল্‌ করেছিল কিনা, তাই আপনি সকলেরই চোখ ছল্‌ছল্‌ দেখেছিলেন।

ম। যা হোক ভারতি! এবার তিনি এলে আর আমায় বাধা দিও না।

ভা। (সাশ্চর্য্যে) আপনি বলেন কি? আমায় ফেলে আপনি সন্ন্যাসী হবেন, আর আমি তাই চুপ ক'রে ব'সে দেখ্‌ব?

ম। তবে কি আমায় পণ ভঙ্গ কর্‌তে বল?

ভা। সে তখন দেখা যাবে। আঃ—

ভারতীর কথা সমাপ্ত হইতে না হইতে শশব্যস্তে পরিচারিকা আসিয়া জানাইল,—ভৃত্য বলিতেছে, দ্বারে কে সন্ন্যাসী আসিয়াছে।

ম। এ্যঁা! সত্য নাকি? নিশ্চয় সেই সন্ন্যাসী—এই বলিতে বলিতে সবেগে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। ব্যস্ততা প্রযুক্ত তাঁহার উত্তরীয় স্কন্ধচ্যুত হইয়া ভূমিতে লুণ্ঠিত হইতে লাগিল,কটিবন্ধন শ্লথ হইল।

ভারতী তাঁহার ভাব দেখিয়া উচ্চহাস্যে কহিলেন:—

ঠাকুর করেন কি? উত্তরীয়টা তুলিয়া লউন। এত ব্যস্ত কেন? সেই সন্ন্যাসী কি না তাহাই আগে দেখুন, এর মধ্যে এত উন্মত্ত কেন?

ঠাকুর ততক্ষণে বহির্ব্বাটীতে গিয়া উপস্থিত। দেখিলেন, দ্বারদেশে সশিষ্য আচার্য্য শঙ্কর।

মণ্ডন শশব্যস্তে আচার্য্যকে প্রণিপাত করিলেন এবং মহাসমাদরে তাঁহাদিগকে গৃহমধ্যে আনয়ন করিয়া যত্নপূর্ব্বক পাদ্য অর্ঘ প্রদান করিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে ধীরে ধীরে ভারতী ঠাকুরাণী তথায় আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া আচার্য্য ধীরভাবে কহিলেন:—

জননি! মাসান্তকাল উপস্থিত। আপনার প্রশ্নের উত্তর লইয়া আসিয়াছি; গ্রহণ করিয়া আপনার স্বামীকে পণ হইতে মুক্তি দান করুন।

এই বলিয়া তিনি একখানি পুস্তক ভারতীর হস্তে প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন।

আচার্য্যের প্রশান্ত আনন ও হস্তে একখানি গ্রন্থ দেখিয়াই ভারতী নিজের পরাজয় বুঝিতে পারিলেন। তিনি আচার্য্যকে নিবারণ করিয়া স্নেহমিশ্রিত কোমল স্বরে কহিলেন:—

মহাত্মন্! গ্রন্থের আর আবশ্যক নাই, আমিই পরাজিতা। গ্রন্থ-বিষয় আমি অবগত হইয়াছি। আপনার অলৌকিক ক্ষমতা দেখিয়া জগৎ মুগ্ধ হইবে। সার্থক আপনার সাধনা, ধন্য আপনার একাগ্রতা। আপনার পাদস্পর্শে ধরিত্রী ধন্যা।

আ। (বিনীতভাবে) জননি! এক্ষণে অনুমতি করুন, আমরা আমাদের বিচারের সর্ত্ত পালন করি।

ভা। ভগবন্! আমি অনুমতি দিলাম। আপনি স্বচ্ছন্দে আমার পতিকে সন্ন্যাস প্রদান করুন।

ভারতীর বাক্য শুনিয়া মণ্ডন কি বলিতে উদ্যত হইলে, ভারতী তাঁহাকে বাধা দিয়া কহিলেন "আপনারা ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন"। এই বলিয়া তিনি অন্তঃপুরে গমন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ অতীত হইল, ভারতী আর আসেন না। তাঁহার বিলম্ব দেখিয়া মণ্ডন অন্তঃপুরে গমন করিলেন।

তথায় গিয়া দূর হইতে দেখিলেন, ভারতী একাকী পূজাগৃহে বসিয়া আছেন। তিনি ভারতীকে কহিলেন :—

কি ভারতি! আমাদের অপেক্ষা কর্‌তে ব'লে এখানে ব'সে কি কর্‌চ?

উত্তরে ভারতী কিছুই বলিলেন না, তেমনি স্থির ভাবেই বসিয়া রহিলেন। তাহা দেখিয়া মণ্ডন পুনরায় ডাকিলেন, তথাপি কোন উত্তর পাইলেন না। তখন তিনি গৃহমধ্যে আসিলেন। আসিয়া দেখিলেন, ভারতী আসনের উপর যোগাসন করিয়া উপবিষ্টা। তাঁহার হস্তদ্বয় ক্রোড়দেশে স্থাপিত, ধ্যানস্তিমিতনেত্র নাসাগ্রে স্থির, তিনি গললগ্নীকৃতবাসা, আলুলায়িত কেশ-রাশি পৃষ্ঠদেশ আচ্ছাদিত করিয়া ভূমিতে পড়িয়াছে। তাঁহার জ্যোতির্ম্ময় আননে অপূর্ব্ব মাধুরী ক্রীড়া করিতেছে।

মণ্ডন ভারতীর ভাব দেখিয়া কিছু বিস্মিত হইলেন। যদিও তিনি জানিতেন নিত্য প্রভাতে ভারতী এইরূপে ইষ্টদেবতার ধ্যান করেন, তথাপি অসময়ে তাঁহার এই ভাবের কারণ কি, তাহা তিনি ভাবিয়া পাইলেন না। তিনি একবার ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন, আবার কি ভাবিয়া পুনরায় ভারতীকে উচ্চকণ্ঠে আহ্বান করিলেন।

কিন্তু ভারতী তথাপি নিরুত্তর। পতিগতপ্রাণা ভারতী পতির আহ্বানে উদাসীন। এইবার মণ্ডনের হৃদয়ে সন্দেহের উদয় হইল। অন্যদিন ইষ্ট-দেবতার পূজায় বসিয়াও ত ভারতী মণ্ডনের আহ্বানে নিরুত্তর থাকেন না! আজ তাঁহার এ কি ভাব।

মণ্ডন তখন চঞ্চলচিত্তে ভারতীর গাত্রে হস্ত প্রদান করিলেন।

একি! ভারতীর দেহ অত্যন্ত শীতল। নবনীত-সদৃশ সুকুমার দেহ কঠিন নিশ্চল, নিস্পন্দ। মণ্ডন সভয়ে হস্ত সরাইয়া লইলেন।

দ্বৈতবাদ।

(১৩১৭ সালের ২২শে মাঘ, বিবেকানন্দ-উৎসব উপলক্ষে পঠিত।)

মানুষের সহজ ও সাধারণ জ্ঞানে ইহাই প্রতিভাত হয়—"আমি" জগৎ হইতে স্বতন্ত্র বস্তু। প্রপঞ্চ জগৎ আমা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পদার্থ। পঞ্চেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জগৎপ্রপঞ্চ "আমার" ভোগ্য। আর "আমি" ইহার ভোক্তা। এই ভোক্তৃ-ভোগ্য-প্রবিভাগ কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হয় না। সুতরাং এই জগৎ ও তদিতর আমার সত্তা কেবল ব্যবহারিক রূপে পৃথক্ নহে; পারমার্থিক রূপেও এই চিরন্তন পার্থক্য সর্ব্বথা ও সর্ব্বদা বিদ্যমান। এই সহজজ্ঞানসিদ্ধ পৃথক্ সত্তাদ্বয় ও তদিতর ঈশ্বর-সত্তাই দ্বৈতবাদের ভিত্তি-ভূমি। এই দ্বৈতভিত্তির উপর মধ্বমুনি ও শ্রীবল্লভাচার্য্য প্রভৃতি দ্বৈতবাদী আচার্য্যগণ ভক্তিতত্ত্বের অভ্রলেহী সৌধাবলী নির্ম্মাণ করিয়া সেব্য-সেবক-ভাবের বহুধা সমর্থন করিয়া গিয়াছেন।

শ্রুতি ও উপনিষদাদিতেও দ্বৈতবাদের সমর্থন দৃষ্ট হয়। নিখিল-জন-হিতৈষিণী শ্রুতিতে সর্ব্ব মতের সামঞ্জস্য সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। রুচি-বৈচিত্র্য ও অধিকারি-ভেদে শ্রুতি সিদ্ধান্তিত মতগুলি বিভিন্ন আচার্য্যগণ দ্বারা বিভিন্ন কালে অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদরূপে ভারতবর্ষে প্রচারিত হইয়াছিল। তবে একথা বলাও যুক্তিযুক্ত হইবে না যে, নিখিল বেদই অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত বা দ্বৈতমত-সমর্থনকারী। মন্ত্রার্থদ্রষ্টৃ ঋষিগণ কখনো বা সেব্য-সেবক-ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া প্রলয়কল্প ভজন-রস-সমুদ্রের প্রবলোচ্ছ্বাসে ভাসিয়া গিয়াছেন; কখনো বা কর্ম্মফলাবদ্ধ সঙ্কুচিত জীবাত্মার নির্ব্বিশেষ প্রকাশমানতায় জীবাত্মভাবের নিরাশ করিয়াও যেন নিরাশ করিতে প্রয়াসী হন নাই; কখনো বা নির্ব্বিশেষাদ্বৈতবাদের তুঙ্গ শিখরে অধিরোহণ করিয়া "অহং ব্রহ্মাস্মি" "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" বলিয়া বেদান্তবাদের প্রবল দুন্দুভিতে দিঙ্মুখ সকল মুখরিত করিয়াছেন। এই অপূর্ব্ব সমন্বয়ী শ্রুতি-

সমুদ্রের অনন্ত উচ্ছ্বাস, অনন্ত বিস্তার ও অনন্ত লম্ফঝম্ফাস্ফালনে মতামতের প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও এক অভূতপূর্ব্ব সামঞ্জস্য বর্ত্তমান রহিয়াছে। মাতৃ-ক্রোড়ে কেলিকলহমান্ শিশুগণের ন্যায় বিবদমান্ হইয়াও ভারতীয় ঋষি ও আচার্য্যগণ বিশ্বজননী শ্রুতির কোমল ক্রোড়ে নিদ্রিত হইয়া বিশ্রান্তিসুখ অনুভব করিতেছেন। স্নেহপরা শ্রুতি সকলকেই সমভাবে আশ্রয় প্রদান করিয়াছেন। সেইজন্য এই বিভিন্ন-মত-পূর্ণ ভারতে শ্রুতিই সকলের মাতৃ-স্থানীয়া বলিয়া বিভিন্নমতবাদিগণ সকলেই পূজা করিয়াছেন।

যাহা হোক্, দ্বৈতবাদপ্রসঙ্গে এই সামঞ্জস্য প্রদর্শন করা লেখকের উদ্দেশ্য নহে। অধুনা দ্বৈতমতের পর্য্যালোচনা উপলক্ষে দ্বৈতাচার্য্যগণের মতগুলি কথঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে।

পূর্ব্বেই বলা হইযাছে, মধ্বাচার্য্যাদি দ্বৈতমতাবলম্বী আচার্য্যগণ জীব ও জগতের সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করেন। তদিতর পরমেশ্বর এই জীব-জগতের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া অবস্থান করিতেছেন। দ্বৈতাচার্য্য-গণের মতে এই জীব, জগৎ ও ঈশ্বর ক্রমে চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হন। জীব ভোক্তা, জগৎ ভোগ্য ; আর ঈশ্বর এই ভোক্তৃ-ভোগ্যের নিয়ন্তা। ঈশ্বরই এই ত্র্যাত্মক জগতের কর্ত্তা ও উপাদান। নিত্যপরমাণু, মায়া বা জড়া প্রকৃতিকে ইহারা জগদুপাদান-কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন নাই। ভগবান্ হরি নিজেই নিজ সৃষ্টির উপাদান। এই জগৎকর্ত্তা হরিই নিজ শক্তিবলে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড রচনা করিয়া উদ্দেশ্যহীন বালকের ন্যায় লীলা-পরায়ণ হইযা অবস্থান করিতেছেন। এই হরি শুদ্ধসত্তময়, পরম-কারুণিক, নিখিল মঙ্গল-নিদান ও ভক্তবৎসল। যাঁহারা এই ভগবানের শাস্তাদি ভাবাবলম্বনে উপাসনা করেন,তাঁহাদিগকে ভগবান্ উপাসনানুরূপ ফল প্রদান করিয়া চরিতার্থ করেন। ভক্তবৎসল বলিয়া এই ভগবান্ কখনো বা নর-লীলার বশবর্ত্তী হইযা কামকাঞ্চনপাশবদ্ধ জীবকুলের উদ্ধার সাধন ও জগতে ধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়া থাকেন। সোপানারোহণের ন্যায় সর্ব্ব বিভূতি অতিক্রম করতঃ ভক্ত সাধকগণ অন্তে হরিপ্রাপ্তিরূপ পরম মোক্ষফলাধিকারে প্রতিষ্ঠিত হন।

দ্বৈতাচার্য্যগণের মতে ঈশ্বর অর্চ্চাদি ভেদে চতুর্ব্ব্যূহ রূপে অবস্থান করেন। অর্চ্চা অর্থাৎ প্রতিমা। প্রতিমা-বিশেষে এই ভগবান্ বিশেষ ভাবে প্রতি-ষ্ঠিত আছেন। বিভব অর্থাৎ অবতারমূর্ত্তি। মৎস্যকূর্ম্মাদি অবতার মূর্ত্তি-

তেই ভগবানের বিশেষ বিভব। ব্যূহ চারিভাগে বিভক্ত। দ্বৈতশাস্ত্রে ইঁহারা সঙ্কর্ষণ, বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ বলিয়া কথিত হন। সম্পূর্ণ ষড়্‌গুণ-সম্পন্ন বাসুদেবই এই মতে বেদান্ত-কথিত পরব্রহ্ম বলিয়া সিদ্ধান্তিত হন। ইনিই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অন্তর্যামী জীবপ্রেরক নারায়ণ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন।

মধ্বমুনির মতে জীব অণু হইতেও পরমাণু। এই জীবই ভগবানের দাস। দাসের যেমন স্বামিত্বে অধিকার নাই—জীবেরও সেরূপ ঈশ্বরত্ব-পদপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। সেব্য-সেবক-ভাবে উপাসনা দ্বারা ঈশ্বরের প্রসন্নতা লাভ করাই পরম মুক্তি—এ কথাই ইনি সমর্থন করিয়া থাকেন। ঈশ্বরের প্রসন্নতা-লাভকল্পে ঐ মতবাদিগণ পঞ্চাঙ্গ উপাসনার সমর্থন করিয়াছেন। অভিগমন ইহার প্রথম সোপান। অভিগমন অর্থে ভগবন্মন্দিরাদি মার্জ্জন ও লেপন। উপাসনার দ্বিতীয় অঙ্গ "উপাদান"। উপাদান অর্থে গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ নৈবেদ্য ঈশ্বরোদ্দেশে দান করা। তৃতীয়, ইজ্যা বা মন্ত্রাদি উচ্চারণে ভগবানের আবাহন-বিসর্জ্জনাদি-রূপ পূজা। চতুর্থ, স্বাধ্যায় বা বেদপাঠ, মন্ত্রজপ, নামকীর্ত্তন, স্তবপাঠ প্রভৃতি। পঞ্চম, যোগ বা ধ্যানযোগে বাসুদেবের মূর্ত্তি চিন্তা করা। এইরূপ ক্রমপরম্পরা উপাসনা দ্বারা অহংবুদ্ধির ক্রমোৎসেধ হইয়া ভক্ত যখন শুদ্ধসত্ত্বে অবস্থান করেন, তখনি ভগবান্ বাসুদেব তাঁহার চিদ্‌ঘন মূর্ত্তি—যাহা পরমানন্দ ও অপার সুখসৌন্দর্য্যের আধার—ভক্তের হৃদয়ে ও বাহিরে প্রকটিত করিয়া তাহাকে জনন-মরণ-সঙ্কুল সংসারের পরপার বৈকুণ্ঠলোকে চিরস্থিতি প্রদান করেন। এই বৈকুণ্ঠলোক-প্রাপ্তিই জীবের পরম পুরুষার্থ—পরম মুক্তি বলিয়া দ্বৈতশাস্ত্রে সমর্থিত হইয়াছে।

কোন কোন দ্বৈতাচার্য্যের মতে ভক্তি ইতর-বৈতৃষ্ণরূপিণী, অর্থাৎ বাসুদেব ভিন্ন ইতর পদার্থে যখন হেয়ত্ব অনুভব হয়, যখন ঈশ্বরেতর পদার্থে বিষয়-বৈতৃষ্ণ উপস্থিত হয়, তখনি ভগবদ্ভক্তির স্ফুরণ হইতে থাকে। বৈরাগ্য ও সত্ত্বশুদ্ধি ব্যতীত এই ভক্তির উন্মেষণ হয় না। এই সত্ত্বশুদ্ধিকল্পে দ্বৈতাচার্য্যগণ এইজন্য আহারশুদ্ধি বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন।

মহামনা মধ্বমুনির মতে বেদ চিরনিত্য ও অপৌরুষেয়। কিন্তু নারদ-পঞ্চরাত্রই সাধনকল্পে গ্রহণীয় শাস্ত্র। রামানুজ স্বামীর সহিত একমত হইয়াও মধ্বাচার্য্য সম্পূর্ণ দ্বৈতবাদী। ইঁহার মতে তত্ত্ব দ্বিবিধ। অশেষ-গুণনিদান, অনন্তরসের অপার সমুদ্র ভগবান্ নারায়ণ স্বতন্ত্র তত্ত্ব। তদিতর

জীবজগৎ অস্বতন্ত্র বা অস্বাধীন তত্ত্ব। এই স্বতন্ত্র তত্ত্ব ভগবানের ইচ্ছা-প্রণোদনে জীবজগৎ স্থাবর জঙ্গম নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। সেই স্বাধীন ইচ্ছা পরমেশ্বরের বিরুদ্ধে কেহই স্বেচ্ছায় গমন করিতে পারে না। সুতরাং ভগবদ্দাস্য-ভাব পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের সহিত যাহারা সমত্ব বা একত্ব ইচ্ছা করে, তাহারা অধঃপতিত হয়। জীবের এই সমত্বলাভেচ্ছাকে দ্বৈতাচার্য্যগণ উন্মত্তপ্রলাপকল্প উপহাসাস্পদ বিষয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

মধ্বমুনির মতে সেবা ত্রিবিধাঃ—প্রথম, ভজন—কায়িক, বাচনিক ও মানসিক ভেদে ত্রিবিধ। শাস্ত্রে ও গুরুবাক্যে শ্রদ্ধা, জীবে দয়া, আর ভগবান্ লাভে অনুরাগ এই তিনটী মানসিক ভজন। বেদপাঠ, হিতবাক্য, সত্যকথা ও প্রিয়বাক্য বাচনিক ভজন। পর-পরিত্রাণ, দান ও পূজা কায়িক ভজন। সেবার দ্বিতীয় অঙ্গ নামকরণ। পুত্রপৌত্রাদির "কেশব" "বাসুদেব" "নারায়ণ" প্রভৃতি নামকরণ করিয়া যাহাতে মুখে ঐ সকল নামের সর্ব্বদা আবৃত্তি ও স্মরণ হয়, তাহাই ভগবৎসেবার দ্বিতীয় সাধন। নারায়ণের শঙ্খচক্রাদি চিহ্ন অঙ্কন দ্বারা শরীর অঙ্কিত করা সেবার তৃতীয় সাধন। এই শেষোক্ত সাধন দ্বারা সর্ব্বদা ভগবানের রূপ স্মরণ-মনন হয়। এই সকল সেবার ফলে ভগবানের প্রসন্নতা লাভ হইলে তাঁহার গুণোৎকর্ষতা-জ্ঞান চিরস্থায়ী হয়। 'তত্ত্বমস্যাদি" শ্রুতিবাক্যের স্মরণ-মননে এই গুণোৎকর্ষতা-জ্ঞান হইতে পারে না বলিয়া দ্বৈতাচার্য্যগণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ইঁহাদের মতে নির্ব্বাণ মুক্তি আকাশকুসুমবৎ নিতান্ত অলীক। সারূপ্য সালোক্য মুক্তিই ইহাদের পরম পুরুষার্থ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।

শুদ্ধ-দ্বৈতবাদী বল্লভাচার্য্য এই মতের সমর্থন করিলেও তাঁহার মতের কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে। তিনি বৈকুণ্ঠপতি বিষ্ণু জীবের সেব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন না। তিনি বলেন অবতাররূপী শ্রীবৃন্দাবনবিপিনবিহারী শ্রীকৃষ্ণই মুমুক্ষু জীবের একমাত্র সেব্য। ইনি মধুরভাবে উপাসনার একান্ত পক্ষপাতী। শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন যাবতীয় জীবজগৎ তাঁহার প্রকৃতি। পুরুষ-অভিমানী জীব প্রকৃতপক্ষে ভগবানের প্রকৃতি বা স্ত্রী-স্থানীয়া। সুতরাং জীবের স্বভাবসিদ্ধ প্রকৃতিভাব পরিত্যাগ করিয়া ভাবান্তরাবলম্বনে ভগবানের সেবা করিতে যাওয়া ঈশ্বরের নিয়মবিরুদ্ধ মত। পরমানন্দবিগ্রহ শ্রীবৃন্দাবনবিহারী শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ লাভে গোপীভাব প্রাপ্ত হইয়া অখণ্ডানন্দ-রাস-রসোৎসবে

শ্রীকৃষ্ণকে পতিভাবে সেবা করাই জীবের পরম পুরুষার্থ। ভক্তিকে ইনি উৎকৃষ্ট পন্থা বলিয়া সিদ্ধান্তিত করেন নাই। রাগমার্গ ও প্রেমাভক্তিকেই ইনি সর্ব্বোচ্চ স্থানে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সেই প্রেম-বিগ্রহ শ্রীরাধাই প্রকৃতির শীর্ষস্থানীয়া পরমানন্দরূপিণী। সেই পরমপ্রেমরূপিণীর অঙ্গচ্ছটাই বেদান্ত-সিদ্ধান্তিত ব্রহ্মতত্ত্ব বলিয়া ইনি নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

এই দ্বৈত-সিদ্ধান্তিত ভক্তিতত্ত্বের প্রতিষ্ঠাকল্পে চতুঃসম্প্রদায়ে প্রবিভক্ত বৈষ্ণবধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইয়াছিল। রামানুজ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত শ্রী বা রামাইৎ সম্প্রদায়, নিম্বাদিত্যাচার্য্যের নিমাইৎ সম্প্রদায, মধ্বাচার্য্য ও বল্লভাচার্য্যের অপর দুই শাখা শঙ্করাচার্য্যের বহু পরে ভারতবর্ষে বিস্তৃতি লাভ করে। ইঁহাদের বিস্তৃত মত, দার্শনিক বিচারপ্রণালী ও ধর্ম্মানুষ্ঠান পদ্ধতির ক্রমবিকাশ এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে অলোচনা করা অসম্ভব। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, অদ্বৈতবাদের দার্শনিকতা হৃদযঙ্গম করিতে অপারগ হইয়া শ্রীশঙ্করাচার্য্যের তিরোধানে. ভারতবর্ষ দ্বৈতবাদের বিজয়দুন্দুভিতে কম্পিত হইয়া উঠিযাছিল এবং ভারতের যাবতীয তীর্থ ও ধর্ম্মকেন্দ্র গুলি দ্বৈতাচার্য্যগণের অধিকারে আসিয়াছিল ও অদ্যাবধি বর্ত্তমান রহিয়াছে।

এই দ্বৈতবাদমূলক বৈষ্ণবধর্ম্মের অভ্যুত্থানেই ভারতবর্ষে পুরাণাদির সংকলন হয়। পুরাণপ্রসঙ্গে অন্যান্য দার্শনিক মতের কথঞ্চিৎ সমর্থন থাকিলেও যাবতীয় পুরাণই সেব্য-সেবক-ভাবে অনুপ্রাণীত বলিয়া অনুমিত হয। শৈব-শাক্ত-গাণপত্যাদি পঞ্চোপাসকগণ সকলেই দ্বৈতমতের অনুবর্ত্তন করিয়া আসিতেছেন। ধর্ম্মাঙ্গ ক্রিয়াকাণ্ডগুলি সকলই এই দ্বৈতমতের অনুকূলে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। বেদান্তবিৎ মনস্বিগণও ব্রহ্মজিজ্ঞাসার প্রাগনুষ্ঠেয় ক্রিয়াঙ্গের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারেন নাই। বরং অদ্বৈতাচার্য্যগণ বেদান্তপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিজ্ঞানকল্পে দ্বৈতবাদসমর্থিত আচারাদির অনুষ্ঠান সর্ব্বথা সমর্থন করিয়া গিযাছেন।

বিরাট্ বৌদ্ধ সাম্রাজ্যের অধঃপতনকালে ভারতের যাবতীয় ধর্ম্মমত তদ্দারা লাভবান্ হইয়াছিল—যথাসাধ্য বৌদ্ধধর্ম্মসার রত্নগুলি স্ব স্ব অধিকারে অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছিল ; ইতিহাস, ধর্ম্মসংহিতা, স্মৃতি,পুরাণ ও দেশাচার-গুলি অদ্যাপি ইহার সাক্ষিস্থানীয় হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু বৈষ্ণবধর্ম্ম এই বৌদ্ধধনভাণ্ডারলুণ্ঠনে যেমন কৃতকার্য্য হইয়াছিল, ভারতের অন্য কোন ধর্ম্ম বা ধর্ম্মমণ্ডলী তেমন তৎপরতা দেখাইতে পারে নাই। তাই দেখিতে পাই,

পূর্ব্বতন বৌদ্ধকেন্দ্রগুলিতে অদ্যাপি বৈষ্ণবাধিকার বর্ত্তমান রহিয়াছে। অহিংসা, মঠপ্রতিষ্ঠা, সঙ্ঘ বা সম্প্রদায় প্রবর্ত্তন, দলবদ্ধ হইয়া কীর্ত্তনাদি করা, ভেক ধারণ প্রভৃতি বৈষ্ণবাচারগুলি মৃত বৌদ্ধধর্ম্মের লুণ্ঠিত রত্ন বলিয়া অনুমিত হয়। দ্বৈতবাদপ্রসঙ্গের পরিপোষকরূপেই এ স্থলে পুরাণ ও বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয়তিরোধান কথঞ্চিৎ আলোচিত হইল।

'সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা' বঙ্গদেশে এই দ্বৈতমত কিরূপে সমাদৃত হইয়াছিল, তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া প্রসঙ্গের উপসংহার করিতেছি। মধ্বমুনির মত কালক্রমে বঙ্গদেশে প্রসারিত হইয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের অভ্যুদয় করে। বল্লভাচার্য্যের প্রেমমার্গের সাধনাও অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর ন্যায় বঙ্গদেশে প্রবাহিত হয। এই দুই মতের সহযোগে বঙ্গদেশে যে ভক্তির উচ্ছ্বাস, যে প্রেমতরঙ্গ উঠিয়াছিল ও অদ্যাপি যাহার কল্লোল-কোলাহলের প্রতিধ্বনি সুদূর-সমুদ্রকল্লোলের ন্যায় শুনিতে পাওয়া যায়, ভারতবর্ষের অন্যত্র সেরূপ হইয়াছে কিনা,সন্দেহের বিষয়। প্রোক্ত আচার্য্য-দ্বয়ের প্রবর্ত্তিত ভক্তিশাস্ত্রের অনুশীলনে প্রকৃতির বিলাসভূমি বঙ্গদেশে এক নূতন জীবন আনয়ন করিয়াছিল। ভক্তিগঙ্গা ও প্রেমযমুনার পুণ্য-সঙ্গম শ্রীনবদ্বীপধামে শ্রীচৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করিয়া যে প্রেমভক্তির উচ্ছ্বাসে আবঙ্গ উড়িষ্যা প্লাবিত করেন, সে উচ্ছ্বাস—সে গোপীতপ্তশ্বাস—সে উদ্দাম মধুর লাস্য-বিলসন, সে মধুর নামকীর্ত্তন ভারতবর্ষ কখনো দর্শন বা শ্রবণ করিয়াছে কিনা, সন্দেহের বিষয়। বৈরাগ্যের চলৎপ্রতিমা, প্রেমের স্ফুরৎ বিগ্রহ, জ্ঞানের জ্বলৎ জ্যোতিঃ, দৈন্যের গলৎ উৎস শ্রীচৈতন্যদেব ভগবন্নাম কীর্ত্তনে যে প্রেমভক্তির মহিমা স্থাপন করিয়া গিয়াছেন,বঙ্গদেশ তাহা কদাপি বিস্মৃত হইতে পারিবে না। ঈশ্বরাবেশে,ভগবদ্বিরহে ও প্রেমোন্মত্ততায় চৈতন্য-ঘন শ্রীচৈতন্যদেবের অষ্টসাত্ত্বিকাদি বিকারের স্ফুরণ, উল্লম্ফন, নর্ত্তন, কীর্ত্তন, ধূল্যবলুণ্ঠন, আচণ্ডালালিঙ্গন, অজস্রাশ্রুবর্ষণ এবং গৃহে গৃহে হরিনাম বিতরণ দর্শন করিয়া ভক্তিপ্রধান বঙ্গদেশ ভাবিয়াছিল, কপালমোচন ভগবান্ বুঝি দেহ ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হইযাছেন। ভাবিয়াছিল, ন্যায়কন্দলীর কোন্দল-কোলাহলে তান্ত্রিকের ব্যভিচার-নিরাশ-ছলে, বুঝি বা স্বতন্ত্র ভগবান্ স্বেচ্ছায় লীলাশরীর ধারণ করিয়া আসিয়াছেন। ভাবিয়াছিল অনন্ত আচার-গ্রন্থি-বন্ধনে উৎপীড়িত শুষ্কতর্কপাটবপাণ্ডিত্যাভিমানীদিগের দ্বারা পরিচালিত সমাজে সহজলভ্য ভক্তিপ্রচারকল্পে বুঝি বা ভগবান্ নরশরীর ধারণ

করিয়া আসিয়াছেন। সে আজি চারিশত বৎসরের কথা। মুসলমান রাজত্বের ধ্বংসোন্মুখ সময়ে সেই ভক্তিস্রোত নিরুদ্ধ হইতে না হইতেই বঙ্গদেশে আবার সেই প্রেমভক্তির সমুদ্রোচ্ছ্বাসকল্প প্রলয় হুহুঙ্কার দূর চক্রবালে নিনাদিত হইতেছে। পাঠক, প্রাণ থাকে ত সে স্পন্দন অনুভব কর, কর্ণ থাকে ত তাহা শ্রবণ কর, চক্ষু থাকে ত তাহা দর্শন করিয়া ধন্য হও। জগদ্ব্যাপী এই মহা সমন্বয়ে তুমি অনাথশরণ মহৎ সমন্বয়াচার্য্যকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া ধন্য হও। তিনি তোমার সমক্ষে বর্ত্তমান রহিয়াছেন।

অদ্বৈতবাদ।

[শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ।]

এই অনন্ত আকারে প্রবিভক্ত অসীম প্রপঞ্চের উপাদান যে এক এবং তাহা একছাড়া দুই কিছুতেই হইতে পারে না—এই দার্শনিকতার চরম সিদ্ধান্ত উপনিষদের যুগে আর্য্য ঋষিগণের উর্ব্বর মস্তিষ্কে সর্ব্বপ্রথমেই আবিভূ্ত হইয়াছিল। সেই অদ্বিতীয় এক সৎ কি অসৎ এবং তাহার সহিত এই বিচিত্র প্রপঞ্চের সম্বন্ধ কি, তাহা নির্ণয় করিবার জন্য যেরূপ সুবিস্তৃত যুক্তি ও প্রমাণের অনুশীলন আবশ্যক, তাহা উপনিষদের মধ্যে অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। শূন্য হইতেই এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, এই প্রকার মত উপনিষদের মধ্যেই প্রথমে দেখিতে পাওয়া যায়, আবার সেই উপনিষদের মধ্যে ইহাও দেখিতে পাওয়া যায় যে, জগতের মূল কারণ কখনই শূন্য হইতে পারে না। সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মই জগতের একমাত্র উপাদান। ইহা দ্বারা বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মই জগতের মূলীভূত উপাদান, ইহা উপনিষদের যুগেই সিদ্ধান্তিত হইয়াছিল—ইহা সত্য, কিন্তু শূন্য যে কেন জগতের মূল কারণ হইতে পারে না, ইহা নিঃসন্দিগ্ধভাবে যেরূপ যুক্তি ও প্রমাণের সাহায্যে প্রতিপাদিত হওয়া উচিত, উপনিষদের মধ্যে সেইরূপ যুক্তি ও প্রমাণের একেবারেই অবতারণা করা

---

* গত ৫ই ফেব্রুয়ারী রবিবারে কলিকাতা বিবেকানন্দ-সমিতির বাৎসরিক অধিবেশনে স্বামীজির জন্মোৎসব উপলক্ষে বেলুড়মঠে পঠিত।

হয় নাই। উপনিষদের ঋষিগণ শূন্যবাদে বিশ্বাস করিতেন না, ইহা উপনিষদ দেখিলে বেশ বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু সেই বিশ্বাস কোন্ প্রমাণ ও যুক্তিরূপ ভিত্তির উপর অবস্থিত, তাহা উপনিষদের ঋষিগণ যেমন করিয়া দার্শনিক-গণের বলা উচিত সেভাবে বলেন নাই। ভগবান্ শাক্যসিংহ উপনিষদের এই দুর্ব্বলতাকে শূন্যবাদ স্থাপনের পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন, শ্রুতি-প্রামাণ্যে তাঁহার বিশ্বাস ছিল না, প্রবল যুক্তি ও প্রমাণের সাহায্যে তিনি শূন্যকেই জগতের মূল কারণরূপে ব্যবস্থাপিত করিয়া তাহাকেই তাঁহার বৈরাগ্য-প্রবণ মহাধর্ম্মের মূল ভিত্তি করিয়া তুলি-লেন। এইরূপ নামরূপ-বিবর্জ্জিত শূন্যের সহিত নামরূপ প্রপঞ্চের কি সম্বন্ধ, তাহার নিরূপণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া তিনি প্রপঞ্চের সত্তা ব্যবহারিক এবং শূন্যকেই পারমার্থিক বলিধা ব্যবস্থাপিত করিলেন। ফলে দাঁড়াইল এই যে, এই প্রপঞ্চ বাস্তব পক্ষে শূন্যেরই বিবর্ত্তমাত্র, ইহার বাস্তব সত্তা কিছুই নাই। জাগ্রত জীবের পক্ষে স্বপ্নপ্রপঞ্চ যেরূপ অলীক কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নহে, তত্ত্বজ্ঞানী অর্থাৎ নির্ব্বাণোন্মুখ শূন্যভাবজ্ঞ অর্হতের নিকট এই আমাদের জাগ্রৎপ্রপঞ্চও সেইরূপ অলীক ও কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নহে। যে পর্য্যন্ত আচার্য্য শঙ্করের অভ্যুদয় না হইয়াছিল, সেই পর্য্যন্ত এই বৌদ্ধ-দিগের শূন্যবাদ ও জগতের ব্যাবহারিকতাবাদই ভারতীয় দার্শনিকগণের মনোরাজ্য অধিকার করিয়াছিল।

আচার্য্য শঙ্কর বৌদ্ধ শূন্যবাদের অযৌক্তিকতা ও অকিঞ্চিৎকরতা প্রবলতর যুক্তি ও প্রমাণের দ্বারা প্রতিপাদন করিলেন। তিনি প্রমাণের বলে ইহা প্রতিপাদন করিলেন যে, এই প্রপঞ্চের সত্তা "ভেদজ্ঞানের" উপরই নির্ভর করিতেছে, কিন্তু বস্তুবিচার করিয়া দেখিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, এই বিশ্ববৈচিত্র্যের প্রয়োজক ভেদ জ্ঞান সত্য জ্ঞান নহে, ইহা আমাদের জন্মজন্মান্তরের সঞ্চিত ভেদ বাসনার পরিণতি ভিন্ন আর কিছুই নহে। তাহাই যদি হইল, তবে আর তোমাতে আমাতে বাস্তব ভেদ কোথায়? তোমাকে আমি অনাদি ভ্রমবাসনার বশে ভিন্ন বলিয়া বুঝি, এইমাত্র, কিন্তু বাস্তবপক্ষে তুমিও যে আমিও সে, তোমার তুমিত্ব যাহার উপর কল্পিত, আমার আমিত্বও তাহারই উপর কল্পিত। এই কল্পিত ভেদ-মূলক অনন্ত ভেদ সৃষ্টি করিয়া জীবগণ পদে পদে অনন্ত দুঃখের জাল কল্পনা করিয়া আপনাআপনিই তাহার মধ্যে জড়িত হইয়া পড়িতেছে। এই

ভ্রমাত্মক ভেদজ্ঞানই যদি যাবতীয় অনর্থের মূল হয়, তাহা হইলে এই ভেদ-জ্ঞানকে দুর্ব্বল করাই কি মানবীয় সভ্যতার চরম লক্ষ্য নহে?

শাক্ত বল, শৈব বল, বৈষ্ণব বল, সৌর বল, গাণপত্য বল, সকলই ত এই ভেদ-জ্ঞান-মূলক ব্যবহারভেদমাত্র, মূলে সকলেরই ত সেই এক অদ্বিতীয় চিন্ময় সত্তা, সেই অদ্বিতীয় চিন্ময় আত্মাই যদি সকলের আত্মা হয়, তাহা হইলে ব্যবহারকালে উপাধি দ্বারা তুমি তাহাকে ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া বুঝিয়াছ বলিয়া বাস্তব পক্ষে সে ত আর ভিন্ন হইতে পারে না—এই মহা-সিদ্ধান্তই অদ্বৈতবাদ। এই অদ্বৈতবাদ প্রচার করিয়া আচার্য্য শঙ্কর জগতের সকল মনুষ্যকে এক করিবার পন্থা আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। এই অদ্বৈত-বাদের অনুশীলনে একদিন জগতের সর্ব্বধর্ম্মের সমন্বয় হইবে, সর্ব্বভেদবুদ্ধি তিরোহিত হইবে, পরম শান্তির সাম্রাজ্য সংস্থাপিত হইয়া মানবীয় সভ্যতাকে পরিপূর্ণ করিবে।

সংক্ষেপে অদ্বৈতবাদের উৎপত্তি ও প্রসার বিষয়ে ঐতিহাসিক পরিচয় প্রদান করিলাম। এক্ষণে সেই অদ্বৈতবাদের প্রকৃত তত্ত্ব কি তাহারই পরিচয় দিবার জন্য অগ্রসর হইতেছি।

অধ্যারোপ ও অপবাদ।

অদ্বৈতবাদের গূঢ় রহস্য ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে অধ্যারোপ এবং অপবাদ এই দুইটী শব্দের অর্থ কি এবং অদ্বৈত তত্ত্ব প্রতিপাদন বিষয়ে এই অধ্যারোপ ও অপবাদ কিরূপ সাহায্য করিয়া থাকে, তাহা অগ্রে জ্ঞাতব্য।

যে বস্তু বাস্তবিক যে ধর্ম্মাক্রান্ত নহে তাহার উপর যদি সেই ধর্ম্ম আরোপ করা যায়, তাহা হইলে সেই আরোপকে অধ্যারোপ কহা যায়। এই ভাবে কোন একটী বস্তুর উপর কোন একটী বস্তুর আরোপ করিয়া যদি পরে বলা যায় যে, বাস্তবিক এই বস্তু এই বস্তুর ধর্ম্ম নহে, তাহা হইলে এই নিষেধকে অপবাদ বলা যায়।

এই প্রকার অধ্যারোপ এবং অপবাদ অনেকস্থলে আমাদের বস্তুতত্ত্ব নির্ণয়ের উপযোগী হইয়া থাকে। একটা দৃষ্টান্ত দেখিলেই ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে:—

মনে কর—সৈন্যসামন্তপরিবেষ্টিত হইয়া এক নরপতি আসিতেছেন, ঐ নরপতিকে আমি পূর্ব্ব হইতেই জানি, তুমি কিন্তু তাঁহাকে জান না। এবং তিনি যেভাবে জাঁকজমকের সহিত আসিতেছেন, সেভাবে কোন নরপতিকে

পথে আসিতেও তুমি ইতিপূর্ব্বে কখনও দেখ নাই। দূর হইতে দেখিয়া আমি তোমাকে বলিলাম ঐ দেখ ভাই, রাজা আসিতেছেন—তুমি আমার কথা শুনিয়াই বলিলে তাইত ভাই, রাজা আসিতেছেন বটে, কিন্তু 'কে রাজা' তাহা ত আমি বুঝিলাম না। আমি তোমাকে 'কে রাজা' বুঝাইবার জন্য যে উপায় অবলম্বন করি,তাহা অধ্যারোপ ও অপবাদ। রাজা যখন তোমার ও আমার সম্মুখ দিয়াই আসিতেছেন, তখন তিনি তোমার ও আমার চক্ষুরিন্দ্রিয়ের গোচর হইয়াছেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। চক্ষুরিন্দ্রিয়ের গোচর হইলেও তাঁহাকে তুমি অন্যলোক হইতে পৃথক্ করিয়া বুঝিতে পারিতেছ না কেন বল দেখি? তুমি বলিবে—সজাতীয় ও বিজাতীয় বহু লোকের সহিত একত্র হইয়া আসিতেছেন বলিয়া বাস্তবিক 'কে রাজা', তাহা আমি বিশেষভাবে বুঝিতে পারিতেছি না, এক্ষণে তুমি তাহা বিস্পষ্টভাবে বুঝিতে চাহ, ইহাতে আমার কর্ত্তব্য কি?—আমি তোমাকে দূর হইতে দেখাইব যে, ঐ যে লোকগণের মধ্যে বড় একটী হাতী যাইতেছে, ঐ হাতীর উপরে রাজা রহিয়াছেন, তুমি অন্যান্য সকল বস্তু হইতে দৃষ্টি সরাইয়া সেই হাতীটীর দিকে চাহিয়া বলিবে, কৈ,এখনও ত 'কে রাজা' তাহা বুঝিলাম না, কারণ হাতীটীর উপর তিনটী লোক বসিয়া আছে,একজন হস্তীর স্কন্ধের উপর, আব একজন হস্তিপৃষ্ঠস্থিত সিংহাসনের মধ্যভাগে, আর একজন তাহার পশ্চাতে, ইহাদের মধ্যে রাজা কে? আমি তখন বলিব, ঐ তিনটী লোকের মধ্যে যাহাকে হস্তীর স্কন্ধদেশে দেখিতেছ, ঐ ব্যক্তি রাজার কাছে বসিয়াছে বটে, কিন্তু রাজা নহে; ঐরূপ হস্তীর পৃষ্ঠস্থিত সিংহাসনের পশ্চাৎভাগে যে বসিয়া চামর ব্যজন করিতেছে, ঐ ব্যক্তিও রাজা নহে। এই প্রকার বলার পর তুমি অনায়াসে বুঝিতে পার যে, ঐ জনতার মধ্যে কোন্ ব্যক্তি রাজা। এক্ষণে দ্রষ্টব্য এই যে—এই অধ্যারোপ এবং অপবাদ স্বয়ং প্রমাণ না হইলেও প্রমাণেব দ্বারা কোন বস্তুর স্বরূপ নির্ণয় যেখানে দুষ্কর হইয়া উঠে, সেই স্থলে এই অধ্যারোপ এবং অপবাদ প্রমাণের সাহায্য করে। অদ্বৈতবাদিগণের মতে এই অধ্যারোপ এবং অপবাদের সাহায্যে শ্রুতি এবং শ্রুতির অনুকূল অনুমান ব্রহ্মের তত্ত্ব কি ভাবে প্রতিপাদন করাইয়া থাকে, তাহাই এক্ষণে দেখান যাইতেছে।

অধ্যারোপ।

১ম, জীব। "আমি" বলিলে সাধারণতঃ আমরা যাহা বুঝি, তাহাই জীব। জগত এবং জাগতিক সর্ব্বপ্রকার ব্যবহারই এই জীবের উপর অধ্যস্ত।

এজগতের সত্তা জীবের সত্তার উপরে নির্ভর করিতেছে, ইহা একটু প্রণিধান করিলেই অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। যাহা আমার জ্ঞানের বিষয় নহে আমার কাছে তাহা নাই বলিলে কোন ক্ষতিরই সম্ভাবনা নাই, এই নিয়মানুসারে জগতের যত কিছু জড় বস্তু আছে তাহা কোন না কোন জীবের জ্ঞেয় হইবেই হইবে, সুতরাং এই ভাবে জড়প্রপঞ্চের যাহা সত্তা, তাহা কোন না কোন জীবের জ্ঞানের সত্তার উপরই নির্ভর করিতেছে, ইহা অবশ্য অঙ্গীকার্য্য। অবস্থাভেদে এই জীব তিন ভাগে বিভক্ত। সেই অবস্থা তিনটী, যথা—জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি,—জাগ্রদবস্থাযুক্ত জীবের নাম বিশ্ব, স্বপ্নাবস্থাযুক্ত জীবের নাম তৈজস, সুষুপ্তি বা স্বপ্নহীন গভীর নিদ্রারূপ অবস্থাযুক্ত জীবের নাম প্রাজ্ঞ। বাহ্য বিষয়সমূহের সহিত ইন্দ্রিয়সমষ্টির সান্নিধ্য বশতঃ যে সময় আমরা বিষয়ভোগ করিয়া থাকি, সেই সময় আমাদের জাগ্রদবস্থা থাকে। বাহ্য বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের কোন প্রকার সম্বন্ধ না থাকিলেও যখন আমরা বিষয় ভোগ করিতে সমর্থ হই, সে সময় আমাদের স্বপ্নাবস্থা বিদ্যমান থাকে। এই স্বপ্নাবস্থায় আমাদের মনই সকল প্রকার ভোগের বিষয় সৃষ্টি করিয়া ঐসকল বিষয়কে আমাদের প্রত্যক্ষগোচর করাইয়া দেয় এবং তন্নিবন্ধন দুঃখ বা সুখানুভূতিরূপ ভোগ উৎপাদন করে।

যে সময় বহিরিন্দ্রিয় এবং মন একেবারে নির্ব্ব্যাপার হইয়া নিজ উপাদান-কারণ-স্বরূপ অজ্ঞানে বিলীন হইয়া থাকে এবং ঐ অজ্ঞানই, সূর্য্যকে যেমন মেঘ আবরণ করে, সেইরূপ আমাদের প্রকাশস্বভাব আত্মাকে আবৃত করে এবং সেই, আবৃত হইলেও প্রকাশশীল, আত্মার সম্পর্কে স্বয়ংও প্রকাশিত হয়, সেই সময়ই আমাদের সুষুপ্তি অবস্থা বিদ্যমান থাকে।

২য়, ঈশ্বর। এক একটী দেহের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন অহংভাবাবৃত প্রকাশকে জীব বলা যায়, ইহা পূর্ব্বে এক প্রকার দেখান হইয়াছে। এই এক একটী জীবে উপাধিরূপ এক একটী দেহ না ধরিয়া যদি জগতে যত জীব থাকিতে পারে সকলের উপাধি-স্বরূপ যত দেহ হইতে পারে সেই দেহ-সমষ্টিকে ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে আমরা ঈশ্বর চৈতন্যের স্বরূপ কথঞ্চিৎ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। এই বিশ্বের যাবতীয় দেহ উপাধিস্বরূপ, ব্যাপক ভাবে অবস্থিত, প্রকাশস্বভাব আত্মাকে যিনি পরিচ্ছন্ন করিয়া ব্যবহারের গোচর করিয়া তুলিয়াছেন, তিনিই সকল দেহের অধিষ্ঠান, সকল দেহের চালয়িতা ও প্রকাশশীল ঈশ্বর বলিয়া অদ্বৈতবাদে অভিহিত হইয়া থাকেন।

যেমন জীব এক হইয়াও অবস্থা-ভেদ-নিবন্ধন তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকেন, সেইরূপ ঈশ্বরও এক হইয়া তিনটী উপাধির বশে তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকেন। যথা বিরাট্, হিরণ্যগর্ভ এবং মায়ী বা পরমেশ্বর। জীবের জাগরণাবস্থাতে ভৌতিক স্থূলদেহের উপরই জীবের অভিমান বা আত্মীয়তা জ্ঞান থাকে, এইরূপ সমগ্র প্রপঞ্চের যাবতীয় স্থূল শরীরের উপর যাঁহার অভিমান বা আত্মীয়ত্ব জ্ঞান পরিস্ফুট থাকে, সেই সমষ্টি স্থূলশরীরাভিমানী আত্মাই বিরাট্। জীবের স্বপ্নাবস্থায় তাহার স্থূল দেহে আত্মাভিমান নিবৃত্ত হয় এবং সূক্ষ্ম ব্যষ্টি দেহে অভিমানের অভিব্যক্তি হয়। এইরূপ জগতের যাবৎ সূক্ষ্ম দেহের উপর যাঁহার আত্মীয়ত্বাভিমান অভিব্যক্ত রহিয়াছে, তাহারই নাম হিরণ্যগর্ভ। এক একটী দেহের মধ্যে এক একটী সুষুপ্তির প্রকাশক জীব যেমন প্রাজ্ঞ শব্দের দ্বারা প্রতিপাদিত হয়েন, সেই প্রকার সমষ্টি জীবদেহের সমষ্টি সুষুপ্তির সাক্ষিস্বরূপ যে প্রকাশমান্ আত্মা, তাহাকেই অদ্বৈতবাদিগণ মায়ী বা পরমেশ্বর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। এই জীবও ঈশ্বর-রূপ ব্যষ্টি ও সমষ্টি উপাধির দ্বারা জগতের মূলকারণস্বরূপ সেই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের স্বরূপকে পরিচ্ছিন্নভাবে বুঝার নামই বেদান্ত শাস্ত্রের অধ্যারোপ।

অপবাদ।

১ম। ব্যষ্টির অপবাদ; জাগরণাবস্থায় যে চিদাত্মা বাহ্যপ্রপঞ্চের ভোক্তা হইয়া আপনাকে বাহ্যপ্রপঞ্চ হইতে অপৃথগ্ভূত বলিয়া বোধ করিয়া থাকে, সেই বাহ্যাভিমানী অধ্যারোপিত বিশ্বরূপজীবকে স্বপ্নাবস্থায় তৈজসরূপে অভিব্যক্ত জীবের মধ্যে মিশাইয়া দিয়া স্বপ্নাবস্থা, আমাদিগকে বাহ্যাভিমানী বিশ্বের অপবাদ কিরূপে করিতে হইবে তাহার পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া থাকে। এইরূপে গাঢ় সুষুপ্তির সময় আমাদের বিশ্ব ও তৈজস আত্মা এক হইয়া সেই সুষুপ্তির সাক্ষী প্রাজ্ঞ আত্মাতে প্রবিলীন হইয়া অবিদ্যা কল্পিত বিশ্ব ও তৈজসভাব পরিহার করিয়া থাকে, সুতরাং প্রাজ্ঞভাবে আমাদের বিশ্ব ও তৈজসরূপ দুইটী অধ্যারোপের অপবাদ হইয়া থাকে। এই প্রাজ্ঞ আত্মা আবার সমস্ত উপাধি হইতে বিনির্ম্মুক্ত চিন্ময় পরব্রহ্ম হইতে বস্তুতঃ ভিন্ন নহে। আমাদের জাগরণ ও স্বাপ্ন প্রপঞ্চের উপদান কারণস্বরূপ সুষুপ্তি কালীন অজ্ঞানই এই প্রাজ্ঞ আত্মাকে ব্যবহার দশায় সেই পরমাত্মা হইতে ভিন্ন করিয়া তুলে। অদ্বৈতাত্মতত্ত্বজ্ঞান যখন প্রবল হইয়া এই সৌষুপ্ত অজ্ঞানরূপ উপাধিকে

একেবারে বিধ্বস্ত করিয়া দেয়, তখন এই প্রাজ্ঞ আত্মার আর পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে না। ইহা তখন সেই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মই হইয়া থাকে। এই ভাবে ব্যষ্টি জীবের অপবাদ দ্বারা জীবের দিক দিয়া পরব্রহ্মের স্বরূপ প্রতিপাদিত হইয়া থাকে।

২য়। সমষ্টির অপবাদ। ব্যষ্টিজীবের দিক দিয়া অপবাদ দ্বারা যেরূপ পরব্রহ্মতত্ত্ব প্রতিপাদিত হইতে পারে, সমষ্টি বা ঈশ্বরের দিক দিয়াও অপবাদের দ্বারা সেইরূপ পরব্রহ্মের তত্ত্ব প্রতিপাদিত হইতে পারে। জাগরিত জীব যেমন স্বাপ্ন জীবে বিলীন হয সেইরূপ সমষ্টি জাগরণোপাধিক বিরাট্, সমষ্টি স্বাপ্ন প্রপঞ্চোপাধিক হিরণ্যগর্ভে বিলীন হইয়া থাকেন। সেই হিরণ্যগর্ভ ও আবার এইরূপে মায়ী বা পরমেশ্বরে বিলীন হইয়া থাকেন এবং সেই সমষ্টি অজ্ঞানরূপ মহাসুষুপ্তির সাক্ষী পরমেশ্বর, সকলজীবের নির্ব্বাণ কালে সমস্ত অজ্ঞানরূপ উপাধি অর্থাৎ মায়া বিবর্জ্জিত হইয়া অদ্বিতীয় পরমাত্মস্বরূপে অবস্থান করেন। এই ভাবে ক্রমে বিরাট হিরণ্যগর্ভ ও পরমেশ্বরের অপবাদ দ্বারা সমষ্টির দিক্ দিযা অদ্বৈতাত্মতত্ত্ব প্রতিপাদিত হইয়া থাকে।

ব্রহ্ম।

অদ্বৈতবাদিগণ বলিয়া থাকেন, যাহা সৎ তাহাই ব্রহ্ম। একমাত্র জ্ঞানই আমাদের নিকট সৎ এবং স্বয়ং প্রকাশ, এই কারণে জ্ঞানই যথার্থ সৎ, সুতরাং জ্ঞানই ব্রহ্ম। এক জ্ঞানই এ জগতে অপরিবর্ত্তনশীল ও সর্ব্বদা একরূপ। ঘট জ্ঞান,পট জ্ঞান,মঠ জ্ঞান প্রভৃতি আমাদের যত কিছু জ্ঞান আছে, ইহারা বিষয় অর্থাৎ ঘট, পট ও মঠাদির বৈলক্ষণ্য নিবন্ধনই যেন ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া বোধ হয়, এই মাত্র। কিন্তু যদি ঘট পট প্রভৃতি বিষয হইতে এই জ্ঞানকে পৃথক্ করিয়া দেখ, ত কি দেখিবে? সেই জ্ঞানের স্বরূপগত কোন ভেদই আর উপলব্ধি হইবে না। এই ভাবে আমার যত জ্ঞান আছে, সকলই বিষয়-ভেদ-বশতঃ পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া আমার নিকট প্রতীত হইলেও বাস্তব পক্ষে আমার জ্ঞান নানা নহে। আমার আত্মস্বরূপ একটি জ্ঞানের দ্বারা আমার জ্ঞেয় যাবৎ বিষয়ই প্রকাশিত হয়। কেবল বিষয়গুলি এক নহে বলিয়া ঐ সকল বিষয়ের সহিত প্রকাশমান্ আমার জ্ঞান এক হইলেও নানা বলিয়া প্রতিত হয়। আমার অনন্ত-বিষয়-প্রকাশক জ্ঞান যদি এক হইতে পারে, তাহা হইলে তোমার ও আমার আমিত্বের প্রকাশক যে

জ্ঞান, তাহাও এক হইবে না কেন? তোমার তুমিত্ব ও আমার আমিত্ব এক না হইতে পারে, কিন্তু তোমার তুমিত্বের জ্ঞান এবং আমার আমিত্বের জ্ঞান পরস্পর এক হইতে ক্ষতি কি? তোমার তুমিত্ব আর আমার আমিত্বকে পৃথক্ রাখিয়া, তুমি ও আমি এই জ্ঞান দুইটীর মধ্যে যে কোনও পার্থক্য আছে, ইহা কেহ বুঝিতে বা বুঝাইতে পারে না। এই ভাবে যাবৎ জীবের জ্ঞানই এক হইতে পারে। সেই জ্ঞানের উপর তুমিত্ব আমিত্ব প্রভৃতি অসংখ্য জীবভাব, কাল্পনিক ছাড়া আর কিছুই নহে। এই জ্ঞান এক অদ্বিতীয় এবং অবিনাশী। এই জ্ঞানই আনন্দ।

কেন যে জ্ঞানকে আনন্দ বলিতেছি, তাহা বলি:—যাহাকে আমরা সর্ব্বদা চাহি, যাহার অভাব হইবে এই কথা ভাবিলেও আমরা বিহ্বল হইয়া পড়ি, তাহারই নাম আনন্দ। সেই আনন্দ এই চিন্ময় আত্মা ছাড়া আর কে হইতে পারে? কারণ, আমরা আত্মা ছাড়া আর কোন বস্তুকেই সর্ব্বদা চাহিতে পারি না। স্ত্রী বল, পুত্র বল, স্বজন বল, বন্ধু বল, শব্দ বল, স্পর্শ বল, রূপ বল, রস বল বা গন্ধ বল, কেহই বা কিছুই আমাদের সর্ব্বদা চাহিবার বস্তু নহে। কিন্তু আমার আত্মাকে আমি চাহি না এরূপাবস্থা ক্ষণেকের জন্য আমাদের কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নহে। এইরূপ সর্ব্বদা আকাঙ্ক্ষার নাম নিরুপাধিক প্রেম। নিরুপাধিক প্রেমের যাহা বিষয় তাহাই সুখ। আত্মাই নিরুপাধিক প্রেমের বিষয়, এইজন্য সেই আত্মাই পরম সুখ বা আনন্দস্বরূপ।

অবিদ্যা।

(আবরণ ও বিক্ষেপ।)

অবিদ্যা শব্দের অর্থ বিদ্যার বা জ্ঞানের অভাব নহে, কিন্তু যথার্থ জ্ঞানের বিরুদ্ধ যে জ্ঞান অর্থাৎ বিপরীত জ্ঞানই অবিদ্যা। অবিদ্যার স্বভাব এই যে, ইহা বস্তুর স্বরূপকে আবৃত করে। অর্থাৎ যে বস্তুর যাহা যথার্থ স্বরূপ, তাহা বুঝিতে দেয়না এবং সেই আবৃত বস্তুর যাহা প্রকৃত স্বরূপ নহে, সেই রূপকে প্রকাশ করে। সময়বিশেষে আমাদের নেত্রের দোষ বশতঃই হউক বা বিস্পষ্ট আলোকাভাব নিবন্ধনই হউক, আমরা আমাদের সম্মুখস্থিত একগাছি রজ্জুকে দেখিয়া উহা যে রজ্জু তাহা বুঝিতে পারি না এবং তাহার প্রকৃত স্বরূপ না বুঝা নিবন্ধন আমরা তাহা সর্প বলিয়া প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। এই স্থলে

আমরা যে সম্মুখস্থিত রজ্জুকে রজ্জুবোধ করিতে পারি না, ও এই খানে রজ্জু নাই বলি, ইহাই আমাদের রজ্জুগোচর অবিদ্যার আবরণশক্তির কার্য্য। তাহার পর আমরা যে সেই রজ্জুকে সর্প বলিয়া বুঝি ও ব্যবহার করি, ইহাই হইল সেই রজ্জুগোচর অবিদ্যার বিক্ষেপশক্তির কার্য্য। এই নিয়মানুসারে পরব্রহ্মগোচর যে অবিদ্যা তাহারও দুইটী শক্তির কার্য্য দেখিতে পাওযা যায়। প্রথম, আবরণ-শক্তিঃ—এই আবরণ-শক্তির প্রভাবে জীব বস্তুতঃ সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ হইলেও তাহার আনন্দ ও প্রকৃত সত্তা তাহার নিকটে প্রকাশ পায় না—এবং দ্বিতীয়, বিক্ষেপ-শক্তির প্রভাবে দুঃখ ও মরণ প্রভৃতি যাহা তাহার বাস্তব ধর্ম্ম নহে, তাহাই তাহার নিকট আত্মধর্ম্ম বলিযা প্রতীত হইয়া থাকে। কিন্তু তাহার চৈতন্যস্বরূপ কখনই অবিদ্যা দ্বারা আবৃত হইতে পারে না। কারণ, চৈতন্যের ইহাই স্বভাব যে, ইহা সর্ব্বাবভাসক বলিযা কখনই আবৃত হইতে পারে না। যে ইহাকে আবৃত করিতে উদ্যত হয়, সেও ইহারই দ্বারা প্রকাশ পায়। দৃষ্টান্ত এই যে, আমাদের সুষুপ্তিকালে আমাদের অবিদ্যা বিক্ষেপ-শক্তিকে উপসংহৃত করিয়া কেবল আমার স্বরূপকে আবৃত করিয়াই থাকে—তখনও কিন্তু আমার প্রকাশেরই সাহায্যে সেই সুষুপ্তিরূপ আবরণ আমার নিকটে প্রকাশ প্রাপ্ত হয। আমার নিদ্রাবস্থায কোন জ্ঞান ছিল না এই প্রকার জ্ঞানের মূল যে আমার আত্মপ্রকাশ, সে বিষযে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। এই অবিদ্যাই পরিচ্ছিন্নভাবে ব্রহ্মকে জীবভাবে ব্যবহারের গোচর করিয়া থাকে এবং সমষ্টিভাবে সেই ব্রহ্মকে ঈশ্বরভাবে ব্যবহারের গোচর করিযা থাকে। প্রকৃত পক্ষে কিন্তু জীবভাব এবং ঈশ্বরভাব এই দুইটীই সেই ব্রহ্মগোচর অনাদি অবিদ্যার বিক্ষেপ বা পরিণতি ছাড়া আর কিছুই নহে।

জগৎ অলীক নহে, কিন্তু ব্যবহারিক।

অদ্বৈতবাদী, বৌদ্ধ ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদীর ন্যায় এই পরিদৃশ্যমান প্রপঞ্চকে একেবারে অলীক বলিয়া উড়াইয়া দেয় না। প্রত্যুত যে পর্য্যন্ত জীবের পরমাত্মসাক্ষাৎকার না হয়, সেই পর্য্যন্ত দ্বৈতবাদীর ন্যায় ইহার ব্যবহারোপযোগী সত্তা অঙ্গীকার করিয়া থাকে।

আমার আমিত্ব যে পর্য্যন্ত আমার নিকটে একেবারে মিথ্যা বলিয়া প্রতীত না হইবে, সেই পর্য্যন্ত আমার সত্তা যেমন আমার নিকট সন্দেহের-

বিষয় নহে, সেই রূপ আমার জ্ঞেয় বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ বস্তুনিবহের সত্তাও সন্দেহের বিষয় হইতে পারে না। আমার জীবভাব যতদিন বিদ্যমান থাকিবে, আমার ভোগ্য জগৎও ততদিন সমানভাবেই বিদ্যমান থাকিবে। জীব ভোক্তা ভোগ্য যদি একেবারে গগন-কুসুমের ন্যায় অলীক হয়, তাহা হইলে ভোক্তা ব্যবহারিক হইবে কি রূপে ? ফলকথা এই যে, যতক্ষণ জীব ততক্ষণ জগৎ। জীবের জীবত্ব যখন ব্রহ্মে বিলীন হইবে, তখন জীবভোগ্য জগৎ আর থাকিবে না বা থাকিতে পারে না।

তত্ত্বজ্ঞান ও মুক্তি।

রজ্জুতে সর্পভ্রান্তি এবং সেই ভ্রান্তিকল্পিত সর্প দেখিয়া ভয়ে মৃতপ্রায় যে ব্যক্তি হইয়াছে, তাহার সেই ভয়নিবৃত্তি এবং ভয়ের নিদান ভ্রান্তিনিবৃত্তির কারণ যেমন এক রজ্জুর যথার্থ স্বরূপের প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে না, সেই প্রকার এই ব্রহ্মের উপর অবিদ্যা-কল্পিত জীবভাব এবং তন্মূল দুঃখবহুল সংসারকে নিবৃত্ত করিবার একমাত্র উপায় সেই ব্রহ্মের যথার্থ স্বরূপের সাক্ষাৎ অনুভূতি ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে না। সেই ব্রহ্মের যথার্থ স্বরূপ কি ? তাহার উত্তরে উপনিষদ্ বলিতেছে, "সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম" "আনন্দং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ" অর্থাৎ ব্রহ্ম সৎ। জ্ঞান এবং আনন্দ-স্বরূপ, "একমেবাদ্বিতীয়ং" ব্রহ্মই একমাত্র সৎ—এ জগতে কোন বস্তুই ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ নহে, ভেদ আমাদের মনের কল্পনা মাত্র। তুমি আমি রাম শ্যাম ক্ষিতি অপ্ তেজঃ মরুৎ ব্যোম রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ ভাব অভাব প্রভৃতি যাহা কিছু ব্যবহারিক নানালক্ষণাক্রান্ত বস্তু আমাদের জ্ঞেয় বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে, সকলই সেই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের অবিদ্যা-কল্পিত রূপ ও নাম মাত্র। এক সদ্‌ভূত ব্রহ্মই এই সকল অবিদ্যাকল্পিত আকারে নানাপ্রকার ব্যবহারের গোচর হইয়া রহিয়াছেন। এই প্রকার ব্রহ্মতত্ত্বের অনুশীলন করিতে করিতে যখন আমাদের জাগতিক বস্তুবিষয়ক জ্ঞানগুলির উপর প্রামাণ্যাভিমান মিটিয়া যাইবে, ঐন্দ্রজালিকের মায়াকল্পিত বস্তুগুলির ন্যায় এই প্রত্যক্ষ-পরিদৃষ্ট প্রপঞ্চের জ্ঞানকে মিথ্যা বলিয়া বিশ্বাস হইবে, সেই সময় আমাদের ভেদজ্ঞানজনিত জন্মজন্মান্তরসঞ্চিত বাসনারাশি বিলীন হইতে আরম্ভ করিবে। এইরূপ অবস্থার উদয় হইলে আমাদের হৃদয় সেই অতিগম্ভীর,

অদ্বৈতাত্মতত্ত্বের যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করিবার যোগ্যতা লাভ করিবে। এই অবস্থায় নিরন্তর ধ্যাননিরত হইয়া ব্রহ্মনিষ্ঠ হইলে যথাকালে আমাদের নির্ম্মল চিত্তবৃত্তি সেই এক অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের বিশ্ব-ব্যাপিনী সত্তার প্রতিবিম্ব গ্রহণে সমর্থ হইবে। এই প্রকার মনোবৃত্তিকেই অদ্বৈতবাদিগণ ব্রহ্মসাক্ষাৎকার বলিযা নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। এই ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ হইলেই মনুষ্য কৃতকৃত্যতা লাভ করিয়া থাকে, তাহার সর্ব্ব দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয়। তখন সকল বিশ্বের আত্মার সহিত তাহার আত্মার ঐক্যানুভূতি হওয়া নিবন্ধন তাহার সকল জীবেই আত্মভাবের উদয় হইয়া থাকে, তাহার শত্রুও থাকে না মিত্রও থাকে না। সকলই তাহার আত্মভূত হইয়া যায়, তাহার সকল দুঃখের নিদানস্বরূপ ভেদবুদ্ধি অনন্ত কালের জন্য বিধ্বস্ত হইয়া যায়।

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই তাহার আত্মভূত হইযা যায়। এ জগতে আত্ম-ব্যতিরেকে সে অন্য কোন বস্তুরই অস্তিত্ব দেখিতে পায না। ইহাই হইল অদ্বৈতবাদিগণের মতে জীবের জীবন্মুক্তি। এই জীবন্মুক্তিই মানবীয় সভ্যতার শেষসীমা। সংকীর্ণতা পরিহার ও সর্ব্বজীবে আত্মভাবাভিব্যক্তি যদি মনুষ্য-সভ্যতার শেষ লক্ষ্য না হয়, তাহা হইলে মনুষ্যের পক্ষে সভ্যতা বিড়ম্বনা মাত্র।

এই ভাবে প্রারব্ধ কর্ম্মের বলে যতদিন জীবন্মুক্তের দেহ বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন তাহার নির্ব্বাণ হইবে না। তাহার দেহপাত হইলে, নির্ব্বাণ লাভ হইবে। নির্ব্বাণ মুক্তি সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মেরই স্বরূপ। দেহপাত না হইলে এই নির্ব্বাণ লাভের সম্ভাবনা নাই।

তত্ত্বজ্ঞানের সাধন।

উল্লিখিত তত্ত্বজ্ঞান লাভের সাধন দুই প্রকার, যথা, বহিরঙ্গ সাধন এবং অন্তরঙ্গ সাধন।

প্রথমতঃ দেখিতে হইবে যে, চিত্তের নির্ম্মলতা ও একাগ্রতা ব্যতিরেকে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হওয়া একান্ত অসম্ভব। সেই চিত্তের নির্ম্মলতা এবং একাগ্রতা কি উপায়ে সাধিত হইতে পারে?—ইহার উত্তরস্বরূপে অদ্বৈতবাদিগণ বলিয়া থাকেন যে—চিত্তের নির্ম্মলতা এবং একাগ্রতা সাধন করিতে হইলে প্রথমেই আহারশুদ্ধি সম্পাদন করিতে হইবে। যথাকালে পরিমিত ও বিহিত আহার্য্য গ্রহণই আহারের নিয়ম; যে দ্রব্য আহার করিলে শরীরে কোন

প্রকার রোগ হইবার সম্ভাবনা আছে, সেইরূপ দ্রব্য কদাচ আহার করিবে না; যে দ্রব্য উদরস্থ হইলে কাম ক্রোধ ও লোভ প্রভৃতি চিত্তের মোহজনক বৃত্তি উপচয়প্রাপ্ত হয় এমন দ্রব্য কদাচ সেবা করিবে না। যে দ্রব্য সেবনে মত্ততা বা মস্তিষ্কবিকার উপস্থিত হয়, তাহা কখনও যেন সেবিত না হয়। এই প্রকার আহার-নিয়মের সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমন, কথোপকথন প্রভৃতি ব্যবহারগুলি-কেও নিয়মিত করিতে হইবে। যাহাতে ক্রোধের কারণ উপস্থিত হইলেও অন্তঃকরণে ক্রোধের উদয় না হয়, ভোগ্য বস্তু নিকটে উপস্থিত হইলেও যাহাতে হৃদয়ে ভোগের স্পৃহা উদিত না হয়, তাহার জন্য সর্ব্বদা মনোযোগী হইতে হইবে। তাহার পর দুঃখিতের দুঃখ বিমোচন, তাপিতের অশ্রু বিমোক্ষন, বিপন্নের পরিত্রাণ, ব্যাধিতের শুশ্রূষা প্রভৃতি চিত্ত-নৈর্ম্মল্য-সাধক পুণ্যকার্য্যগুলির যথাসাধ্য অনুষ্ঠান করিতে হইবে। বিষয়ে যাহাতে আসক্তি দূর হয় এই প্রকার আলাপ, চিন্তা ও কল্পনা সর্ব্বদা করিতে হইবে। অদ্বৈতশাস্ত্রোক্ত এই অত্যাবশ্যক সাধনগুলির নাম বহিরঙ্গ সাধন। এই প্রকার বহিরঙ্গ সাধনের অনুষ্ঠান করিতে করিতে চিত্ত যখন আর বিষয়সঙ্গে পূর্ব্বের ন্যায় চঞ্চলতা প্রাপ্ত হইবে না, তখন চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদনের জন্য উপাসনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। যাহা পবিত্র, যাহা শান্তিময়, যাহা উৎকৃষ্ট, এমন একটী বস্তুকে নিজ রুচি অনুসারে বাছিয়া লইয়া যাহাতে সেই বিষয়ে চিত্ত একাগ্র হয় তাহার জন্য যে সকল ব্যাপার শাস্ত্রাদিতে বিহিত হইয়াছে, সেই সকল ব্যাপারই উপাসনা। যাহার যেরূপ সংস্কার ও শিক্ষা, সে তদনুসারেই নিজের উপাস্য বিষয় বাছিয়া লইতে পারিবে। সকল সম্প্রদায়ের সর্ব্ববিধ উপাস্যদেবতার সহিত বেদান্তের এই উপাসনামার্গের বিরোধ হইবার সম্ভাবনা নাই—

তাই ভগবান্ গীতাতে বলিয়াছেন—

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহং॥
সতয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততো জ্ঞানং সঙ্গবিচ্যুতিকারকম্॥

এই প্রকার নিয়মাদি সহকারে উপাসনা করিতে করিতে যখন সেই উপাসনাজনিত সংস্কারবলে চিত্ত বিশুদ্ধ হইয়া একাগ্র হইবার সম্পূর্ণ যোগ্যতা লাভ করে, তখন অদ্বৈতাত্মতত্ত্বজ্ঞানের অন্তরঙ্গ সাধন অর্থাৎ

শ্রবণ মনন এবং নিদিধ্যাসনের উপযুক্ত অবসর উপস্থিত হইয়া থাকে। এই শ্রবণ মনন এবং নিদিধ্যাসনই আত্মতত্ত্বজ্ঞানের অন্তরঙ্গ সাধন। এই অন্তরঙ্গ সাধনের অনুষ্ঠানকালে সাধকের চারিটী সাধনসম্পন্ন থাকা আবশ্যক। এই সাধন কয়টীর নাম, যথা—নিত্যানিত্য-বস্তু-বিবেক, ভোগ্য বস্তু মাত্রেই বৈরাগ্য, শমদমাদি সম্পত্তি এবং মুমুক্ষুত্ব। এই চারিটী সাধন বশীকৃত না হইলে যথাযথ ভাবে শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন হইবার সম্ভাবনা নাই।

উপসংহার।

অদ্বৈতবাদের উৎপত্তি, প্রসার ও গতির সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক ইহার দার্শনিক মুখ্য তত্ত্ব বিষয়ে অত্যল্প পরিচয় দিয়া এই খানেই প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি। অদ্বৈত দর্শন এক কথায় বলিতে গেলে ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দর্শন, জীবের সর্ব্ববিধ দুঃখ নিবৃত্তির উপায় প্রদর্শনই অদ্বৈতবাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। ভারতের প্রাচীনতম ঋষিগণ উপনিষদের যুগে এই মহান্ উদ্দেশ্যে পরিচালিত হইয়া অসীম অধ্যবসায় ও অসাধারণ আত্মত্যাগের প্রভাবে সর্ব্বলোকহিতকর ও সর্ব্ব ব্যবহারের অবলম্বনস্বরূপ যে অদ্বৈতাত্মতত্ত্বরূপ মহাসত্যের আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহার গাম্ভীর্য্য ও মহিমা এখনও যে ভাবে হওয়া উচিত সেইভাবে সভ্য মানব-সমাজে প্রচারিত হয় নাই। আচার্য্য শঙ্কর জীবন-পাতী পরিশ্রম করিয়া সমগ্র ভারতে এই অদ্বৈতবাদ প্রচারের জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে চারিটী প্রধান মঠ স্থাপন করিয়াছিলেন। দেশের প্রচলিত বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের উন্নতির দ্বারা অধিকারিগণের চিত্তবিশুদ্ধি সম্পাদন দ্বারা যাহাতে সর্ব্বদুঃখনিবর্ত্তনক্ষম আত্মতত্ত্বজ্ঞানলাভের যোগ্যতালাভ হয়, তাহার জন্য তিনি ঐ সকল মঠে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের তত্ত্বোপদেশক্ষম বিরক্ত সন্ন্যাস-দীক্ষিত আচার্য্যগণকে ঐ সকল মঠের স্বামিপদে সংস্থাপিত করিয়া অদ্বৈত-বাদের অনুশীলনের পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়া গিয়াছিলেন। সকল প্রকার ব্যবহারের একমাত্র আলম্বন, অনন্ত পরিবর্ত্তনের মধ্যে থাকিয়া সর্ব্বদা অপরিবর্ত্তনশীল, অতি গম্ভীর, অত্যুদার, ভূমা ব্রহ্মতত্ত্বই যে সমগ্র জগতের অভিন্ন উপাদান, এই মহান্ সত্য নানাবিধ উপায়ে ভারতের তাৎকালিক সমাজনেতৃ মনস্বিবৃন্দের মধ্যে প্রচারিত করিয়া তিনি জগতে সর্ব্বধর্ম্ম-

সমন্বয়ের পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিতে পারিয়াছিল বলিয়া আজ ভারতে শাক্ত শৈব সৌর গাণপত্য ও বৈষ্ণব সকলেই সকলকে এক বিরাট্ হিন্দুধর্ম্মেরই অন্তর্গত বলিয়া বিবেচনা করিতেছে। দেশভেদে, কালভেদে, আচারভেদে ও সংস্কারভেদে বাধ্য হইয়া যে, যে কোন ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করুক না কেন, তাহাদের মধ্যে বৈষম্য বা বিরোধ ব্যবহারিকমাত্র,পরমার্থতঃ কাহারও সহিত কাহারও ধর্ম্মসাম্রাজ্যে বিরোধ নাই ও থাকিতে পারে না। এই সর্ব্ব-বিরোধ-সমন্বয় হেতু অদ্বৈতব্রহ্মবাদরূপ মহামন্ত্র প্রচাব করিয়া আচার্য্য শঙ্কর মানবজাতির যে উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা মানবের অধিক উপকার এ পর্য্যন্ত মনুষ্য-জন্ম লাভ করিযা কেহ যে করিতে পারিয়াছেন, তাহার প্রমাণ মানবের ইতিহাসে খুঁজিযা পাওযা যায় না। এই অদ্বৈতবাদ প্রচার করিয়া তিনি মানবীয় পূর্ণতালাভের যে অত্যুদার পন্থা আবিষ্কার করিযা গিয়াছেন, সে পথের দিকে সভ্যজগতেব দৃষ্টি যতই আকৃষ্ট হইবে,ততই সেই পথে পথিকের সংখ্যা যে উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইবে, সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। মানবজাতির শ্রেষ্ঠতার অভিমান যদি কোন দিন পূর্ণ হয়, তাহা হইলে সেই পূর্ণতাপ্রাপ্তির সর্ব্বপ্রধান উপায় যে অদ্বৈতবাদই হইবে, এই মহতী আশা হৃদযে ধারণ করিযা অদ্যকার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।*

---

* কলিকাতা বিবেকানন্দ-সমিতির অনুষ্ঠিত স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উপলক্ষে গত ইং ৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে বেলুড় মঠে পঠিত।

মাইকেলের ভাষা।

[শ্রীযুত জিতেন্দ্রলাল বসু, এম্, এ]

মাইকেল মধুসূদনের অথবা মেঘনাদ-বধের ভাষার বিষয়ই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। বিষয়টী নিতান্ত সহজ নহে, কারণ, প্রথমতঃ আমাদিগকে মীমাংসা করিতে হইবে, কাব্যের ভাষা কেমন হওয়া উচিত। মাইকেল এ বিষয়ে বিলাতী মতাবলম্বী। তাঁহার মতে কাব্যের ভাষা "Sonorous" অর্থাৎ সুরময়ী হওয়া উচিত। এইস্থলে মাইকেলের নিজের কথা উদ্ধৃত করিব।

"I am afraid you think my style hard, but believe me, I never study to be grandiloquent like the majority of the "barren rascals" that write books in these days of excitement The words come unsaught,floating in the stream of (I suppose I must call it) inspiration ! Good blank verse should be sonorous—and the best writer of blank-verse in English is the toughest of poets—I mean old John Milton ! And Virgil and Homer are anything but easy"

এই কয়টী পংক্তি হইতে মেঘনাদ-বধের ভাষা সম্বন্ধে অনেক রহস্য পরিষ্কৃত হইবে, এই আশায় আমি এখানে ঐগুলি উদ্ধৃত করিলাম। বলা বাহুল্য যে, মাইকেল ভাষা সম্বন্ধে ইয়ুরোপীয় কবিগণকেই আদর্শস্থানীয় করিয়াছিলেন, দেশের কবিগণকে অবহেলা করিয়াছিলেন। তাঁহার অভি-প্রায় ইহাই বুঝা যায় যে, যখন মিল্টনের রচনা অত্যন্ত কঠিন এবং হোমর এবং ভর্জ্জিলও নিতান্ত কম কঠিন ভাষা প্রয়োগ করেন নাই, তখন তাঁহারও তাহাই কর্ত্তব্য। এই অভিমতের যাথার্থ্যতা বিচার করা প্রয়োজন।

আমরা দেখিতে পাই যে, ভারতবর্ষীয় মহাকবিগণের মধ্যে প্রথমতঃ বাল্মীকি ও দ্বিতীয়তঃ বেদব্যাসের রচনা সর্ব্বাপেক্ষা সরল ও সহজে বোধগম্য। যাঁহারা অল্পমাত্র সংস্কৃত পড়িয়াছেন, তাঁহারাও এই দুই মহাকবির গ্রন্থদ্বয় বেশ বুঝিতে পারেন। অথচ এই দুই গ্রন্থই জগতে যাবতীয় কাব্যগ্রন্থ আছে তাহাদের শীর্ষস্থানীয়। মাইকেল তাহা ভাবিতেন কি না বলিতে পারি না, কিন্তু সংস্কৃতজ্ঞ অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিত এ কথা স্বীকার করিয়াছেন। অমিত্রাক্ষর হইলেও ইঁহাদের ভাষা জটিল নহে। কালিদাসও

অমিত্রাক্ষর লিখিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার ভাষাও জটিল নহে; এবং তাঁহাদের ভাষা জটিল নহে বলিয়া তাঁহাদের ভাবের যে খর্ব্বতা হইয়াছে, এ কথা কেহই ভাবেন না। কালিদাসেব কাব্য পাঠে যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ উপভোগ করা যায, কঠোর ভাষায় সেই কাব্যনিচয় গ্রথিত হইলে তাহা যে উপলব্ধি হইত না,এ কথা কে অস্বীকার করিতে প্রস্তুত হইবেন? এক দিকে রঘুবংশ,কুমার-সম্ভব ও অপর দিকে ভট্টিকাব্য রাখিয়া তুলনা করিলেই এ কথা বেশ পরিস্ফুট হইবে। ফলতঃ মিত্রাক্ষরই হউক কিম্বা অমিত্রাক্ষরই হউক, ভাষার কাঠিন্য কোনও ক্ষেত্রেই অবশ্য নিষ্পাদিতব্য নহে, ইহা সকলেই অবিসম্বাদে যে স্বীকার করিবেন, এরূপ বিবেচনা করা বোধ হয অসঙ্গত হইবে না।

সংস্কৃত কাব্যের কথা ছাড়িয়া আমাদের চির-পরিচিত বাঙ্গালা কাব্য-গুলির পরীক্ষা দ্বারাও আমরা এই কথাই বুঝিতে পারি। আমি জানি, বাঙ্গালীর মধ্যে শিক্ষিতাভিমানী এমন অজ্ঞ অনেক আছেন, যাঁহারা সেই কাব্যগুলির বিষয অবগত নহেন। আবার অনেক পণ্ডিতাভিমানীও আছেন, যাঁহারা মাইকেলের পূর্ব্ববর্ত্তী বঙ্গসাহিত্যকে সাহিত্য-নামে অভিহিত করিতেই প্রস্তুত নহেন। এই সকল ব্যক্তিগণের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু আমরা জানি যে, সেই মহাকবিগণ বঙ্গদেশের যত উপকার সাধিয়াছেন, তত আজকালকার কোন কবিই পারেন নাই। সেই মহাকবিগণের রচনা আজও বাঙ্গালীর হৃদয়ে বাঙ্গালিত্ব, হিন্দুত্ব ও রসগ্রাহিতা জাগরূক রাখিয়াছে। আজকালকার মহাত্মারা যাহাই বলুন, তাঁহারা যাঁহার সময় হইতে বঙ্গ-সাহিত্যের উৎপত্তি নির্দ্দেশ করিতে চাহেন, সেই মধুসূদনই বঙ্গের পূর্ব্ব কবিগণের পায়ে যে অর্ঘ্য দিযা গিয়াছেন, এবং আচার্য্য বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাদের স্মৃতি-মন্দিরে যে পুষ্পোপহার দিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহাদের কবিত্ব-কীর্ত্তি যথেষ্ট পরিমাণে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। অতএব তাঁহাদের কাব্য-প্রদর্শিত পন্থা নিতান্ত অবহেলার বস্তু নহে ইহাই আমার বলা।

এই কাব্যগুলির মধ্যে মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর চণ্ডীকাব্য, কৃত্তিবাসের রামায়ণ, রঘুনন্দনের রাম রসায়ণ, মাধবাচার্য্যের কৃষ্ণমঙ্গল, কাশীদাসের মহাভারত, পরাগলী * মহাভারত, ঘনরাম চক্রবর্ত্তীর ধর্ম্মমঙ্গল, শ্যামানন্দের মনসার ভাসান ও ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল এই কয়খানিই বিশেষ বিখ্যাত।

* মুসলমান সেনাপতি পরাগলী খাঁর নিয়োগে কবীন্দ্র পরমেশ্বর নামক জনৈক প্রাচীন-কবি কর্ত্তৃক অনুবাদিত মহাভারতের নাম।

উহাদের ভাষা কিরূপ, তাহা একবার আমাদিগকে বিচার করিতে হইবে। অবশ্য ঐ সকল গ্রন্থই মিত্রাক্ষরে লিখিত। কিন্তু ভাষার কাঠিন্য বা সারল্য বিষয়ে মিত্রাক্ষর ও অমিত্রাক্ষর এ দুয়ের মধ্যে কোনও প্রকার বিভিন্নতা হইবার প্রযোজন আমাদের মতে স্বতঃসিদ্ধ নহে। ঐ সকল গ্রন্থের ভাষা কাশীদাসী মহাভারতের স্থলবিশেষ ভিন্ন কোথাও এমন কঠোর নহে যে, তাহা বুঝা যায় না, এবং এইজন্যই ঐ সকল আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার আদরের বস্তু। ইহা হইতে কেহ যেন এমন মনে না করেন যে, এই কাব্যগুলিতে শুদ্ধ ভাষা আদৌ নাই। আমাদের বক্তব্য এই যে, অধিকাংশস্থলে তাঁহাদের ভাষা শুদ্ধ হইয়াও খুব সহজ। ইহা দ্বারা বেশ বুঝা যায়, ঐ সকল কাব্য শিক্ষিত অশিক্ষিত উভয় সম্প্রদায়ের জন্যই লিখিত হইয়াছিল। কাব্য পাঠে যত অধিক লোক অধিকারী হইতে পারে ততই ভাল, অতএব এ হিসাবে এই কাব্যগুলির উপকারিতা অনেক বেশী। বিষয় হিসাবে কবিকঙ্কণ-প্রমুখ কবিগণ ভাষার পরিবর্ত্তন করিয়াছেন ; কোথাও তাঁহাদের ভাষা বেশ গম্ভীর, কোথাও কিছু হাল্‌কা, কোথাও বা মিশ্রিত। ইঁহাদের ভাষা যে সর্ব্বথা নির্দ্দোষ, তাহা আমার প্রতিপাদ্য নহে। ভাষা সরল হওয়া আবশ্যক বলিয়া তাহা গ্রাম্যতা-দোষ-যুক্ত হওয়া উচিত নহে। ইঁহাদের কাব্যে সে দোষ অনেকস্থলে আছে। উদাহরণ-বাহুল্যে প্রবন্ধের কলেবর পুষ্ট করা আমার অভিপ্রায় নহে। তবে দুই একটা দৃষ্টান্ত না দিলে আমার কথা প্রতিপন্ন হয় না, তাই সে কার্য্যে ব্রতী হইব।

কবিকঙ্কণের কালীদহ বর্ণন।

শ্বেত রক্ত নীল পীত শতদলে বিকশিত
কহ্লার কুমুদ কোকনদ।
হেন হয় মোর জ্ঞান দেবতার এ উদ্যান
দেখি বহু কুসুম সম্পদ॥
হেন মোর লয় মতি বিধাতার নহে কৃতি
অপরূপ দেখি কালীদহে।
কমল কুমুদ ফুটে কান্তি তার নাহি টুটে,
চিত্র-গন্ধ লৈয়া বায়ু বহে॥

মধুকর সনে বধূ বিকচ কমলে মধু
পান করি গায় কল গীত।
গীতে সমাহিত মন দলে দলে মৃগীগণ
যেন রহে চিত্রের নির্ম্মিত॥

কালীদহে কমলে-কামিনীর রূপ বর্ণন।

কলাপি কলাপ কেশ ভুবনমোহন বেশ
পায়ে শোভে সোণার নূপুর।
প্রভাতে ভানুর ছটা কপালে সিন্দূর ফোঁটা
রবির কিরণ করে দূর॥

* । *

অধর বিম্বক বন্ধু বদন শারদ ইন্দু
কুরঙ্গ খঞ্জন বিলোচন।
অতসী কুসুম তনু ভ্রূযুগল কামধনু
সুগন্ধি চন্দন বিলেপন॥
শ্রবণ উপর দেশে হেমের কলিকা ভাসে
কিঞ্চিত কম্পিত কেশ পাশে।
আষাঢ়িয়া মেঘ মাঝে যেমন বিদ্যুত সাজে
পরিহরি চপলতা দোষে॥

রামার ঈষৎ হাসে গগনমণ্ডল ভাসে
দন্তপাঁতি বিজিত বিজুলি।
বদন কমল গন্ধে পরিহরি মকরন্দে
কত কত শত ধায় অলি॥

এই ভাষা অতি বিশুদ্ধ,কিন্তু ইহার বোধে কোনও কষ্ট হয় না। এ ভাষা অত্যন্ত সরল সুতরাং কাব্যে পরিত্যাজ্য এ কথা কেহই বলিবেন না। বিষয়ের হিসাবেও এ ভাষা অতি উপযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু দুর্ব্বলা দাসীর কোন্দল বাধাইবার চেষ্টার স্থলে এরূপ বিশুদ্ধ ভাষা উপযুক্ত হইত না। কবিকঙ্কণ সে কথা বুঝিয়াই সেখানে ভাষা রূপান্তরিত করিয়াছেন—

আর শুন্যাছ বড় মা সতার চরিত।
হেন বুঝি সাধু ঠাঁই বলে অনুচিত॥

যখন পাইল সদাগরের ভেরীর সাড়া।
মাণিক ভাণ্ডারে আনে আভরণ পেড়া॥

আবার খুল্লনার বিরহ-খেদ বর্ণনায় তিনি অন্যরূপ ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন ; এ ভাষা মিশ্রিত ভাষা—

ভ্রমরী ভ্রমর তোরে যুড়ি কর
না গেয়ো মধুর গীত।
তোর মৃদুরায় কামশরে তায়
চিত কৈল চমকিত॥
সঙ্গে তোর বধূ পান কর মধু
না জান দুখের ওর।
অনাথী দেখিযা তোর নাহি দযা
চিত্ত হৈল মোর চোব॥
সঙ্গেতে অলিনী নিবস নলিনী
না জান বিরহ ব্যথা।
চিত্ত চমকিত যদি গাও গীত
খাও ভ্রমরীর মাথা॥

মহাকবি কৃত্তিবাসের ভাষাও এমনি বৈচিত্র্যময়ী। এক মাত্র অঙ্গদ-রায়বার হইতেই তাহার দৃষ্টান্ত মিলিবে। একদিকে অঙ্গদের তীব্র তিরস্কারের দীপ্তিময়ী ভাষা, যথা—

তুই ছার দুরাচারী হরিলি পরের নারী
পরলোকে নাহি তোর ভয়।
দশরথ মহারাজা দেবলোকে করে পূজা
শ্রীরাম যে তাঁহার তনয়॥
যাঁহার দুর্জ্জয় বাণ ভয়ে বিশ্ব কম্পমান
সেই রাম লঙ্কার ভিতর।
দেবরাজ করে পূজা হেলে মারে বালিরাজা
তাঁর সনে তোর পাঠান্তর॥

—ইত্যাদি ; আবার অন্য দিকে অঙ্গদের রহস্যময় টিট্‌কারীর ভাষা তাহারই উপযুক্ত—যথা,

হিতোপদেশ কি বুঝিবি শুনরে বেটা গরু।
তুই বাঁচিলে মোর বাপের কীর্ত্তি কল্পতরু॥
নৈলে তোরে বেঁচে থাক্‌তে সাধ করে কি বলি।
লোকে বল্‌বে এই বেটারে বেঁধেছিল বালী॥
ঘুষিবে আমার বাপের কীর্ত্তি জগন্ময়।
তাই বলি দিনকতক বাঁচ্‌লে ভাল হয়॥

এমনি ভাষার বিভিন্নতা অন্যান্য মহাকাব্যগুলিতেও আছে। ঘনরামের ধর্ম্মস্তুতির ভাষাও এইরূপ ; যথা—

প্রভু পরাৎপর ব্রহ্ম অনাদি অনন্ত ধর্ম্ম
বিশ্ববীজ অখিল আধান।
সূক্ষ্ম শূন্য সনাতন নিরাকার নিরঞ্জন
নিত্যানন্দ নির্গুণ নিধান॥

আবার কোথাও ভাষা ভঙ্গিময় করিয়া তিনি লিখিয়াছেন—

আজ্ঞায় অপূর্ব্ব বেশ ধরে বারাঙ্গনা।
খঞ্জন গঞ্জন চারু চঞ্চললোচনা।
কটাক্ষ কামের বাণ কামধনু ভূরু।
মৃগরাজ জিনি মাঝ রামরম্ভা উরু।
মুনিমনমোহিনী মদন মনোরমা।
নূতন তরুণী তনু তুল্য তিলোত্তমা।

কাশীদাসেরও এই প্রণালী। তাঁহার ভাষাও কখনও গম্ভীর, কখনও হাস্যময়, কখনও স্বচ্ছ দর্পণবৎ, কখনও রহস্যপূর্ণ। কিন্তু বোধ হয় অতি অল্প স্থলেই জটিল।

যথা, সত্যভামার স্তুতি—

তুমি লক্ষ্মী সরস্বতী রতি সতী অরুন্ধতী
পার্ব্বতী সাবিত্রী বেদমাতা।
তুমি অধঃ ক্ষিতি স্বর্গ তুমি দাতা চতুর্ব্বর্গ
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় বিধাতা॥

তাঁহার রূপ-বর্ণনার ভাষা আবার অন্যরূপ ; যথা—

কণ্ঠ দেখি কম্বু প্রবেশিল অম্বু
অগাধ অম্বুধি মাঝে।

নিন্দিত মৃণাল ভুজ দেখি ব্যাল
প্রবেশিল বিলে লাজে॥
মাজা দেখি ক্ষীণ প্রবেশে বিপিন
করি অরি হরি লাজে।
করে কোকনদ পাইল বিপদ
নখরেতে দ্বিজরাজে॥

এইরূপ ভাষার বৈচিত্র্য-সম্পদে মাইকেলের পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণ তাঁহাদের কাব্য সমৃদ্ধ করিয়াছেন। ভারতচন্দ্র মাইকেলের ঠিক পূর্ব্ববর্ত্তী কবি, তাঁহার ভাষার কথা আর কি বলিব? অনেক সমালোচক তাঁহার কাব্যকে "ভাষার তাজমহল" বলিয়াছেন। আর এ কথাও সত্য যে, তাঁহার কাব্যে ভাষার বৈচিত্র্য যত পরিমাণে পাওয়া যায়, ভাববৈচিত্র্য তত পরিমাণে নহে। অতএব ভাষার বৈচিত্র্য সম্বন্ধে মাইকেল যে নূতন কিছু করিতে পারিয়াছেন, বোধ হয় না; এবং মহাকাব্যের ভাষা সর্ব্বদা Sonorous সুরময় এবং tough দুরূহ হওয়া উচিত,তাঁহার এই মতও অভ্রান্ত বলিয়া মনে করিতে পারি না। ভাষা পরিষ্কার হওয়া উচিত,তা মহাকাব্যেই হউক বা খণ্ডকাব্যেই হউক; ভাষা সহজ ও সরল হওয়া বিধেয়, ইহা Aristotleও বলিয়াছেন। তিনি "Perspicuity"প্রাঞ্জলতা কে মহাকাব্যের ভাষার প্রধান গুণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অতএব ইহা স্থির সিদ্ধান্ত যে, মহাকাব্যই হউক অথবা আর কোনও প্রকার কাব্যই হউক, তাহার ভাষা প্রধানতঃ এমন হওয়া উচিত যে, তাহা সকলে বুঝিতে পারে। তার পর তাহার উপর যত অলঙ্কার আরোপণ করিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা করা যাইতে পারে। কবির ভাব-সম্পদ ভাষার যদি জটিলত্ব-মেঘে আবৃত থাকে, তাহা হইলে বিশেষ যে কিছু লাভ হয়, বোধ হয় না। যিনি যাহাই বলুন, আমাদের মতে উহা কাব্যের দোষ, গুণ নহে। শুধু যে আমাদেরই এই মত নহে, তাহাও পরে দেখাইব।

কাব্যের ভাষা সম্বন্ধে সাধারণতঃ এই কয়েকটী কথা বলিয়া এখন আমরা মেঘনাদবধের ভাষার দোষগুণ বিচারে প্রবৃত্ত হই।

মেঘনাদবধের ভাষার প্রধান গুণ তাহার তেজোময়ত্ব। যেখানে কৃত্রিমতার আবরণে মাইকেলের ভাষা ঢাকা পড়ে নাই, সেখানে তাহাতে যে একটা উচ্চ সুর পাওয়া যায়, তাহা বঙ্গসাহিত্যে সাধারণতঃ খুঁজিয়া পাওয়া

দুষ্কর। এ বিষয়ে মতদ্বৈধ হইবার সম্ভাবনা নাই। এই তোজোগর্ভ প্রকৃতি হইতেই মেঘনাদবধের ভাষার সজীবত্ব উৎপন্ন হইয়াছে। মেঘনাদবধের ভাষা কোথাও সুপ্ত নহে। অবসাদ-দোষে ইহা কোথাও দুষ্ট নহে। মাইকেলের ভাষা পড়িতে পড়িতে আর যে কোনও ভাবই মনে আসুক না, আমাদিগকে অবসন্ন হইতে হয় না। তবে একটা কথা আমরা এই খানেই বলিয়া রাখি যে, মাইকেলের ভাষার যাহা সর্ব্বপ্রধান গুণ, তাহা হইতেই তাহার একটী বিষম দোষেরও উৎপত্তি হইয়াছে। কথাটা আপাততঃ হেঁয়ালির মত বিপরীতোক্তি বলিয়া মনে হইতে পারে; কিন্তু আমরা পরে দেখাইব যে, ইহা অসঙ্গত কথা নহে। মাইকেলের ভাষার ওজস্বিতার রাশি রাশি উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে; এখানে দুই একটী দিলেই যথেষ্ট হইবে—

চিনিলা সৌমিত্রি

ভূতনাথে। নিষ্কাশিয়া তেজস্কর অসি
কহিলা বীর-কেশরী;—দশরথ রথী
রঘুজ-অজ অঙ্গজ বিখ্যাত ভুবনে,
তাঁহার তনয় দাস নমে তব পদে
চন্দ্রচূড়! ছাড় পথ, পূজিব চণ্ডীরে
প্রবেশি কাননে; নহে দেহ রণ দাসে।
সতত অধর্ম্ম কর্ম্মে রত লঙ্কাপতি;
তবে যদি ইচ্ছ রণ তার পক্ষ হয়ে
বিরূপাক্ষ! দেহ রণ বিলম্ব না সহে।
ধর্ম্মে সাক্ষী মানি আমি আহ্বানি তোমারে
সত্য যদি ধর্ম্ম তবে অবশ্য জিনিব।
গর্জ্জিলা ভৈরবে রাজা বসাইয়া চাপে
অগ্নি শিখা সমশর, ভীমসিংহনাদে
উত্তরিলা ভীমনাদী সৌমিত্রি কেশরী;
ক্ষত্রকুলে জন্ম মম রক্ষঃ কুলপতি!
নাহি ডরি যমে আমি; কেন ডরাইব
তোমায়? আকুল তুমি পুত্রশোকে আজি

যথাসাধ্য কর রথি! আশু নিবারিব
শোক তব প্রেরি তোমা পুত্রবর যথা।
বাজিল তুমুল রণ, চাহিলা বিস্ময়ে
দেব নর দোঁহা পানে, কাটিলা সৌমিত্রি!
শরজাল মুহুর্মুহুঃ হুহুঙ্কার রবে!

ইত্যাদি।

মেঘনাদবধের ভাষার দ্বিতীয় গুণ যুক্তাক্ষরের সদ্ব্যবহার। বলা বাহুল্য, যুক্তাক্ষরের অসদ্ব্যবহারে কবিতা অত্যন্ত কর্ণকটু হইয়া পড়ে; যথা—

ঐষীঃ পুনর্জ্জন্মজয়ায় যত্বং
রূপাদিবোধান্ন্যবৃতচ্চ যস্তে।
তত্বান্ববোধিঃ প্রতনূর্নি যেন,
ধ্যানং নৃপস্তচ্ছিব মিত্যবাদীৎ॥
ত্রৈমাতুরঃ কৃৎস্নজিতাস্ত্রশস্ত্রঃ
স্রধ্রং ব্রতঃ শ্রেয়সি লক্ষণোভূৎ॥

অথবা—

কূর্ম্ম কমঠীকূট উর্ম্মিতে লটপট

কিম্বা—

যথা যবে প্রবেশয়ে গহন বিপিনে
বৈশ্বানর, তুঙ্গতর মহীরুহব্যূহ
পুড়ি ভস্মরাশি সবে ঘোর দাবানলে।

ইত্যাদি।

যুক্তাক্ষর ব্যবহার কবিতায় সৌন্দর্য্য বাড়াইবার একটী কৌশল। সুকবি-গণ এই উপায়ে অনেক সময় কবিতা শ্রুতিমধুর করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

যথা—

মঞ্জুল বঞ্জুল কুঞ্জগতং বিচকর্ষ করেণ দুকূলে।

অথবা—

রুণু রুণু নিক্কণ কোমলে মিলিয়া
ক্রমে গুরুগর্জ্জন সপ্তমে ছুটিয়া॥

অথবা—

জয় শিবেশ শঙ্কর বৃষধ্বজেশ্বর
মৃগাঙ্কশেখর দিগম্বর।
জয় শ্মশান-নাটক, বিষাণ-বাদক
হুতাশ-ভালক মহত্তর॥—ইত্যাদি।

বলা যাইতে পারে যে, মধুসূদন যুক্তাক্ষর ব্যবহারে ভারতচন্দ্রের মত কৃতী নহেন ; কিন্তু মেঘনাদবধে ঐ কৌশল যে যথেষ্ট পরিমাণে আছে, তাহাও স্বীকার করিতে হইবে।

(১)

উর্ব্বশী, রম্ভা, সুচারুহাসিনী—
চিত্রলেখা, সুকেশিনী, মিশ্রকেশী আসি
নাচিলা শিঞ্জিতে রঞ্জি দেবকুলমন।

(২)

রঞ্জিত রঞ্জন-রাগে কুসুম-অঞ্জলি
আবৃত।

(৩)

মন্দ্রিলা জীমূতবৃন্দ আবরি অম্বরে
ইরম্মদে ধাঁধি বিশ্ব গর্জ্জিল অশনি
চামুণ্ডার হাসিরাশি সদৃশ হাসিল
সৌদামিনী, যবে দেবী হাসি বিনাশিলা
দুর্ম্মদ দানবদলে মত্ত রণ-মদে।

(৪)

বাঁচিনু প্রভু তোমার প্রসাদে!
আর কি কহিব নাথ? পদাশ্রিতা দাসী!
ঠেঁই পাদপদ্মতলে এ বিপত্তিকালে।

(৫)

সরোষে তেজস্বী আজি মহারুদ্রতেজে
হুঙ্কারি হানিল অস্ত্র রক্ষঃকুলনিধি
অগ্নিসম, শরজালে কাতরিয়া রণে
শক্তিধরে।

(৬)

—আশু পোহাইবে
এ দুঃখ-শর্ব্বরী তব। ফলিবে কহিনু
স্বপ্ন। বিদ্যাধরী-দল মন্দারের দামে
ও বরাঙ্গ রঙ্গি আসি আশু সাজাইবে।

—ইত্যাদি।

এই সকল গুণালঙ্কৃত হইয়াও মেঘনাদবধের ভাষায় যে দোষ স্পর্শিয়াছে, তাহা অনেকটা কেবল তাঁহার মহাকাব্যের ভাষা সম্বন্ধে মূল মতের জন্য,তাহা আমরা ক্রমশঃ দেখিতে পাইব। যেখানে তিনি সেই মত ভুলিতে পারিয়াছেন, সেখানেই তিনি সুন্দর কবিতা লিখিযাছেন। মেঘনাদবধের মধ্যে ৪র্থ সর্গটী ভাষা সম্বন্ধে অপেক্ষাকৃত নির্দ্দোষ, এ কথা সকলেই জানেন। এই সর্গে আমরা পূর্ব্ব কবিগণের মত সহজ কথায় লেখা, স্বাভাবিক কবিতা দেখিতে পাই, এ সর্গের চিত্রগুলি আড়ম্বরশূন্য ও প্রাণস্পর্শী। ইহার কারণ কি? ইহার একমাত্র কারণ যে, এই সর্গ লিখনকালে মাইকেল ভাবিয়াছিলেন যে, এই সর্গ মেঘনাদবধের যথার্থ অঙ্গ নহে, বরং অনাহূত প্রবেশকারী। তাঁহার কথাই উদ্ধৃত করিতেছি—"I have constructed the poem in strictly rigid principles, and even a French critic would not find fault with me Perhaps the episode of Sita's abduction (Fourth Book) should not have been admitted since it is scarcely connected with the progress of the fable."

অতএব মাইকেল এই সর্গটী কঠিনত্ব ও কৃত্রিমতা-বিমুক্ত করিবার অবকাশ পাইয়াছিলেন। যথা—

ভুলিনু পূর্ব্বের কথা! রাজার নন্দিনী
রাজকুলবধূ আমি; কিন্তু এ কাননে
পাইনু সরমা সই পরম পীরিতি!
কুটীরের চারিদিকে কত যে ফুটিত
ফুলকুল নিত্য নিত্য কহিব কেমনে?
পঞ্চবটী-বনচর মধু নিরবধি!
জাগাত প্রভাতে মোরে কুহরি সুস্বরে
পিকরাজ! কোন্ রাণী, কহ শশিমুখি

হেন চিত্ত-বিনোদন বৈতালিক গীতে
খোলে আঁখি? শিখিসহ শিখিনী সুখিনী
নাচিত দুয়ারে মোর, নর্ত্তক নর্ত্তকী,
এ দোঁহার সম, রামা, আছে কি জগতে?

এমনি সুন্দর চিত্র এই সর্গে আরও আছে। কিন্তু এই সর্গও একেবারে নির্দ্দোষ নহে। এখানেও কৃত্রিমতা যথেষ্ট আছে। চিত্রের কৃত্রিমতার কথা এখন বলিতেছি না, কেবল ভাষার কৃত্রিমতার কথাই বলিতেছি; যথা—

উত্তরিলা প্রিয়ম্বদা (কাদম্বা যেমতি
মধুস্বরা)
ইরম্মদাকৃতি বাঘ ধরিল মৃগীরে!
বক্ষ নাথ বলি আমি পড়িনু চরণে।
শবানলে শূরশ্রেষ্ঠ ভস্মিলা শার্দ্দূলে
মুহূর্ত্তে।

এই কৃত্রিমতাই মাইকেলের ভাষার বিষম দোষ। জনৈক অজ্ঞাতনামা সমালোচক কহিয়াছেন—"আমাদের মাইকেল কবিত্বের সহিত বিচারশক্তির সংক্রম করিতে পারেন নাই, করিলে তিনি অসাধারণ কবি হইতে পারিতেন, সন্দেহ নাই। * * বিচারশক্তিহীনতা বশতঃ মাইকেলের কবিত্বশক্তি সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারে নাই। এমন কি উহা তাঁহার কবিত্বের অর্দ্ধেক হানি করিয়াছে।" এ মতটী কতদূর সমীচীন, তাহা তাঁহার কবিত্বশক্তি-বিচার-কালে আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিব। তাঁহার ভাষাতে যে সকল দোষ আছে, এখন কেবল তাহাই আমরা পাঠককে দেখাইব। আমরা মাইকেলের নিজের কথাতেই দেখাইয়াছি যে, মহাকাব্যের ভাষা খুব কঠিন হওয়া কর্ত্তব্য। তাঁহার এইরূপ ধারণা ছিল। এইজন্যই বোধ হয় তিনি চেষ্টা করিয়া তাঁহার কাব্যের ভাষা "জমকালো" করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও এ সম্বন্ধে একবার লিখিয়াছিলেন—"ভাষাকে কৃত্রিম ও দুরূহ করবার জন্য যত প্রকার পরিশ্রম করা মানুষের সাধ্যায়ত্ত তাহা তিনি (মাইকেল) করিয়াছেন।" মাইকেল, মেঘনাদবধে যে সকল দুরূহ ও অপ্রচলিত কথা ব্যবহার করিয়াছেন, তাহার সমগ্র তালিক দেওয়া এখানে নিষ্প্রয়োজন। অনেকেই সহসা ঐ সকল কথার অর্থ যে বলিতে পারিবেন না, তাহা নিশ্চয়; কারণ, ঐ সকল শব্দের প্রয়োগ এখন অতীব বিরল। বলিতে

পারিনা,স্বয়ং মাইকেলকেও ঐ সকল কথার জন্য কতবার অভিধানের সাহায্য লইতে হইয়াছিল! শ্রীযুক্ত রামগতি ন্যায়রত্ন বলিয়াছেন, "মাইকেলের আর একটা দোষ এই, তিনি বোধ হয় অভিধান দেখিয়া অপ্রচলিত কঠিন কঠিন শব্দ বাহির করিয়া প্রয়োগ করিয়াছেন, এইজন্য তাঁহার রচনা দুর্ব্বোধ হইয়াছে—যথা 'ত্রিশূল-সদৃশ জিহ্বা লুলি অবলেপে"। এস্থলে যেরূপ হইয়াছে, 'অবলেপে' কথাটির এখন আর বাঙ্গালায় গর্ব্বার্থে প্রয়োগ ব্যবহার নাই। ঐরূপ 'কলম্ব' ও 'বাজী'—'শর' অর্থে বাঙ্গালায় ব্যবহার নাই, কিন্তু মাইকেল মেঘনাদবধে তাহা ব্যবহার করিয়াছেন। এইরূপে তাঁহার আরও অনেক কথা যে অভিধান হইতে সংগৃহীত, তাহা বেশ বুঝা যায়,— যথা, মলম্বা, কাকোদর, আস্কন্দিতে, শুনাসীর, প্রতিঘ, চিত্রভানু, বীতিহোত্র, যাদঃপতি রোধঃ প্রভৃতি বলা যাইতে পারে, ঐ প্রকারে মাইকেল ভাষার সৌন্দর্য্য-বর্দ্ধনে প্রত্যাশী ছিলেন। তদুত্তরে বলি, যেখানে কথার অভাব, সেখানে অভিধান বা ব্যাকরণ-সাহায্যে কথার সৃষ্টি করা প্রয়োজন, সন্দেহ নাই। কিন্তু যখন বাঙ্গালা ভাষায় তত্তদর্থসূচক মিষ্টতর অনেক কথা বিদ্যমান তখন ঐরূপ করিবার কোনও প্রয়োজনযীতা উপলব্ধি হয় না; এবং ঐরূপ করিলেই ভাষায় কৃত্রিমতার আবির্ভাব হয়।

ভাষার দ্বিতীয় দোষ, কর্কশতা। উহা কৃত্রিমতা হইতে উপস্থিত হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, মাইকেলের ভাষার যাহাই প্রধান গুণ তাহা হইতেই তাহার একটী দোষের উৎপত্তি হইয়াছে। সেই কথার প্রমাণ এখন উপস্থিত করিতেছি। মাইকেলের ভাষা সজীব, কিন্তু কিছু বেশী সজীব। মাইকেলের প্রযুক্ত শব্দগুলি কখন যেন সে সজীবতা ভুলিয়া থাকিতে জানে না বা পারে না। এবং সেজন্যই তাহারা রাবণের চেড়ীগুলার মত আমাদের শ্রুতি-সীতাকে অল্পক্ষণও শান্তিতে থাকিতে দেয় না, কাণের কাছে যদি কেহ সমর-বাদ্য বাজায়, তাহা হইলে আমাদের অবসাদ দূর হয় সত্য; কিন্তু দিন রাত চব্বিশ ঘণ্টা ঐরূপ করিতে থাকিলে যে কাণ ঝালাপালা হইয়া প্রাণ পালাই পালাই করিতে থাকিবে, তাহা কে না বলিবেন? ভাষার কর্কশতারও স্থানবিশেষে প্রয়োজন। মনে করুন, কবিকে একটা সংগ্রাম বর্ণনা করিতে হইবে, তখন সেই কর্কশ-কার্য্যানুকারী কর্কশ শব্দ সকল ব্যবহার করিলে সময়োপযোগী ও বিষয়োপযোগী বলিয়া তাহা ভালই হইবে। কালীদাসের রঘু যখন ইন্দ্রকে যুদ্ধে আহ্বান করিতেছেন, তখন বলিয়াছিলেন—গৃহাণ শস্ত্রং যদি সর্গ এষতে ন

খর্ব্বনির্জ্জিত্য রঘুং কৃতা ভবান্।" ইহাতে কাহারও আপত্তি হইতে পারে না। মাইকেলেরও রাক্ষস-সৈন্যের বা যুদ্ধের বর্ণনাকালে ঐরূপ কর্কশ কথার প্রয়োগে কাহারও আপত্তি হইবে না। কিন্তু যেখানে সেখানে সেই কর্কশ শব্দ সকল ব্যবহার করিলে কতদূর হৃদয়গ্রাহী হইবে, তাহা বিবেচনাসাপেক্ষ। মাইকেলের কাব্যের ভিতর অনেকস্থলে ঐরূপ আছে বলিয়াই কোন কোন সমালোচক উহাকে তাঁহার বিচারশক্তিহীনতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

মাইকেল তাঁহার কাব্যের সর্ব্বত্রই প্রায় একরূপ ভাষা ব্যবহার করায় বীর-রসের চিত্রাঙ্কণে উহা যেমন সজীব, ওজস্বী এবং কৃত্রিমতা-প্রপীড়িত নহে বলিয়া বোধ হয়, করুণরস চিত্রণে আর উহা তদ্রূপ বোধ হয় না। কোমল স্বভাবা রমণীদ্বয়ের কথোপকথন কঠোর বীর-পুরুষদিগের ন্যায় হইতেছে, শুনিলে কি কখনও কাহারও ভাল লাগিতে পারে?

আবার পুরুষের বর্ণনায় রথীন্দ্রর্ষভ বা রথির্ষভ প্রভৃতি কর্কশ কথা বরং সহা যায়, কিন্তু স্ত্রীলোকের মুখে "যাদঃপতি রোধ!" "যথা চলোর্ম্মি আঘাতে" শুনিতে বড়ই শ্রুতিকটু হয়। একটি দৃষ্টান্ত এখানে মন্দ হইবে না। যথা—

হায় সখি! বীরশূন্য স্বর্ণলঙ্কাপুরী
মহারথি-কুল-ইন্দ্র আছিল যাহারা
দেব-দৈত্য-নর-ত্রাস ক্ষয় এ দুর্জ্জয়
রণে! শুভক্ষণে ধনুঃ ধরে রঘুমণি!
ওই যে দেখিছ রথী স্বর্ণচূড় রথে,
ভীমমূর্ত্তি, বিরূপাক্ষ রক্ষঃ-দলপতি
প্রক্ষ্বেড়ন-ধারী বীর দুর্ব্বার সমরে।
গজপৃষ্ঠে দেখ ওই কালনেমি, বলে
রিপু-কুল-কাল বলী ভিন্দিপাল-পাণি।
অশ্বারোহী দেখ ওই তালবৃক্ষাকৃতি
তালজঙ্ঘা, হাতে গদা গদাধর যথা
মুরারি! সমর-মদেমত্ত ওই দেখ
প্রমত্ত ভীষণ রক্ষঃ বক্ষঃ শিলাসম
কঠিন! অন্যান্য যত কত আর কব?
শত শত হেন যোধ হত এ সমরে,
যথা যবে প্রবেশয়ে গহন বিপিনে

বৈশ্বানর, তুঙ্গতর মহীরুহ-ব্যূহ
পুড়ি ভস্মরাশি সবে ঘোর দাবানলে।

ইহার উপর আবার যখন—মুরলা দূতী সুধিলা

কহ দেবীশ্বরি!
কি কারণে নাহি হেরি মেঘনাদ রথী
ইন্দ্রজিতে—রক্ষঃকুল-হর্য্যক্ষ-বিগ্রহে?

তখন কর্ণরুদ্ধ করিবার প্রবৃত্তিই স্বতঃ উদয় হইয়া পড়ে!

বিচারশক্তিহীনতা হইতে মাইকেলের ভাষার আর একটা দোষ জন্মিয়াছে। তাহা এই—ব্যাকরণদুষ্ট পদ প্রয়োগ। অনেকস্থলে এই অশুদ্ধতা যে তাঁহার সংস্কৃত-ব্যাকরণ-জ্ঞানের অভাবেই হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ হয় না। যথা 'বাহুবল' 'লাঘব-গরব' 'রথির্ষভ' 'দেব-লোভ' 'অসুর-মাৎসর্য্য' প্রভৃতি। আবার অনেকস্থলে ঐরূপ অশুদ্ধ পদ তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বকই যে প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহারও বেশ প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি তাঁহার এক খানি পত্রে লিখিয়াছেন—

"The name is বরুণানী, but I have turned out one syllable. To my ears this word is not half so musical as বারুণী and I don't know why I should bother myself about sanskrit rules."

'বারুণী' কথাটা 'বরুণাণী'র অপেক্ষা হয়তো মিষ্টতর, কিন্তু 'বরুণানী'র স্থলে 'বারুণী' বসাইলেই সম্পূর্ণ অর্থ-বিপর্য্যয় ঘটিয়া যায—মাতার স্থলে কন্যাকে আনিয়া বসান হয়! আশ্চর্য্য, এইটুকু ভাবিবার ইচ্ছা মাইকেলের হইল না! আবার বিস্ময়ের বিষয় এই যে, যাঁহার সঙ্গীতপ্রিয় কর্ণে 'বরুণানী' কথাটা এইমাত্র এমন কঠোর ঠেকিল যে, তৎস্থলে 'বারুণী' পদ প্রযোগ করিয়া ব্যাকরণের অবমাননা করিয়া বসিলেন, তিনিই আবার দুই ছত্র পরে 'বারুণীর' পরিবর্ত্তে 'বারীন্দ্রাণী' কথাটা বেশ সহজে লিখিয়া যাইলেন! 'বারীন্দ্রাণী' কথাটি যদি 'বারুণী' কথাটির সমানই শ্রুতিমধুর, তবে ব্যাকরণের অবমাননাটা সহসা না করিয়া ঐ কথাটিই পূর্ব্ব হইতে বরাবর প্রয়োগ করিয়া যাইলে আর কোনও গোলই হইত না। যাহা হউক এমনি করিয়া তো বাঙ্গালা ভাষায় 'বারুণী' আসিলেন, কিন্তু 'নায়কী' ও 'গায়কী' আসিলেন কেন? 'নায়িকা' ও 'গায়িকা' কি এতই অসহনীয়া যে, তাহাদের পরিহার

করা নিতান্ত প্রয়োজন হইল? আবার কোন্ প্রয়োজনেই বা মধুসূদন পুত্রহা বা পুত্রঘাতী শব্দের পরিবর্ত্তে পুত্রহানী কথার সৃষ্টি করিলেন? তাঁহাকে তো আর ছন্দের মিলের খাতিরে কথা গড়িতে হয় নাই, তবে এই সকল জঞ্জাল জোটাইবার কি আবশ্যক ছিল? অনেকে হয়ত বলিবেন,ওগুলি সব মহাকবি-প্রয়োগ। কিন্তু মহাকবিপ্রয়োগ কাহাকে বলা যায়? যদি কোনও মহাকবি ছন্দের প্রয়োজনে কোনও একটা অশুদ্ধ শব্দ প্রয়োগ করেন, তাহা হইলে বৈয়াকরণেরা তাহাকে অশুদ্ধ না বলিয়া মহাকবিপ্রয়োগ বলিয়া থাকেন। মহাকবি কালিদাস সমগ্র কুমারসম্ভবের ভিতর একটী কথা ব্যাকরণ-বিরুদ্ধ মতে সাধিয়াছেন; যথা—"ত্রিঅম্বকং," এই কথাটী ত্র্যম্বকং কথা অপেক্ষা অনেক মিষ্ট। এমত স্থলে মহাকবিপ্রয়োগ বলা যায়, কারণ, ত্র্যম্বকং লিখিলে ছন্দোভঙ্গ-দোষ জন্মে। কিন্তু তাই বলিয়া অনর্থক রাশি রাশি ভুল লিখিয়া মহাকবিপ্রয়োগের দোহাই দেওয়া চলে কি? এরূপ ধারাবাহিক অনাসৃষ্টির পক্ষপাতী হইতে কেহ পারে কি? এই প্রকার অশুদ্ধির প্রশ্রয় দিলে বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি হওয়া দূরে থাকুক, বরং অবনতি হইবে, তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না।

মধুসূদনের ভাষার আর একটা দোষ শব্দের প্রচলিত অর্থ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাহার একটা অদ্ভুত অর্থ কল্পনা করা; যথা—'মঞ্জু-বিনাশিনী' 'মৃগাক্ষি-গঞ্জিনী'। 'মঞ্জু'র অর্থ সুন্দর ইহা সকলেই জানেন। অতএব 'মঞ্জুবিনাশিনী' কথার কোনও অর্থই হয় না। কিন্তু পাঠকদিগের দুরদৃষ্ট বশতঃ মধুসূদন 'মঞ্জুবিনাশিনী' কথা ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে উহার যাহা হয় একটা অর্থ খুঁজিয়া বাহির করিতেই হইবে! অতএব ইহার অর্থ করিতে হইয়াছে 'সুন্দরী কুলের গর্ব্ব'। এই রকম বহু আয়াস স্বীকার করিয়া 'মৃগাক্ষিগঞ্জিনী' কথারও অর্থ দাঁড় করাইতে হইবে 'সুন্দরীকুলেরগর্ব্ব'! এই ভাবে জোর করিয়া অর্থ গ্রহণ মাইকেলের কোনও কোনও স্থলে করিতে হয়। যথা 'প্রগল্‌ভে' ইহার অর্থ করিতে হইবে, প্রাগল্‌ভ্যের সহিত; 'ললনে' এই কথার অর্থ করিতে হইবে ললনাকে। 'চামুণ্ডে' অর্থ চামুণ্ডাকে, করিতে হইবে। তদ্ব্যতিরিক্ত 'রাঘব-বাঞ্ছা' 'লঙ্কার পঙ্কজরবি' এমন অনেক কথা শুনিতে হইবে।

ইহার উপর তাঁহার ভয়ঙ্কর ক্রিয়াপদগুলি আবার বড়ই গোলযোগ বাধায়। ভয়ঙ্কর বলিবার কারণ এই যে,এই প্রথায় ক্রিয়াপদপ্রয়োগ যদি এক-

বার বাঙ্গালা ভাষায় চলিয়া যায়,তাহা হইলেই সর্বনাশ ! কতক কতক চলিবার উপক্রম হইতেছে দেখিয়াই আমরা ভীত হইয়াছি। গুণানুকরণ-ক্ষমতা বিরল, কিন্তু দোষানুকরণ অতি সহজেই করিতে পারা যায়। অনুকরণ করার সম্বন্ধে এ কথা চিরপ্রচলিত, সাহিত্যেও তাহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। যখন এদেশে অনেকের নয়ন মাইকেলের মেঘনাদবধের নূতনত্ব মোহে সমাচ্ছন্ন, সে সময়ও এই দোষ কবিবর হেমচন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। তিনি কহিয়াছিলেন "তৃতীয় দোষ প্রথা বহির্ভূত নিয়মে ক্রিয়াপদ নিষ্পাদন ও ব্যবহার করা ; যথা—স্তুতিলা, শাস্তিলা, ধ্বনিলা,মর্ম্মরিছে, সুবর্ণি ইত্যাদি।

ইহা ছাড়া দক্ষিব, দক্ষাইতে, মুক্তিল, বৃষ্টিল, সান্ত্বনিব,রণে, সমরিব,ত্রাসো, দমনিয়া, দীপে, প্রফুল্লিল, তাপি, প্রতিবিম্বিৎসিতে, নীরবিলা, সুধিলা, লুলি, আয়াসে, পরিষ্কারি, আর্দ্রিল, সংশয়িতে, ঝলিল, বিদাও, শান্তিয়া, নিশ্বাসি, দানিনু, পূর্ণিতে প্রভৃতি রাশি রাশি ঐ প্রথায় নিষ্পাদিত ক্রিয়াপদ ! এ সকল ক্রিয়াপদ যে কোন্ প্রণালী অবলম্বনে গঠিত, তাহা অবগত হইবার কোনও উপায় নাই ; কারণ, ইহারা কোনও প্রণালীরই অনুসরণ করে না। কোথাও কোথাও ইংরাজির সহিত মিলে ; আবার ইহাও দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে সকল চিরপ্রচলিত ক্রিয়াপদ পরিত্যাগ করিয়া মধুসূদন এই নূতন ক্রিয়াগুলির সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহারা এ গুলির অপেক্ষা অনেক পরিমাণে সুশ্রাব্য। মাইকেল মিত্রাক্ষর লিখিতেছিলেন না যে, তাঁহাকে ছন্দের প্রয়োজনে এই সকল ক্রিয়া গড়িতে হইয়াছিল। তবে এ সকলের অবতারণা কেন ? ইহার উত্তর এই যে Milton, Hell-doomed, miscreated প্রভৃতি গুটিকতক নূতন ক্রিয়াপদ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, অতএব মাইকেলকেও করিতে হইবে ! কিন্তু বারবুক Paradise Lostএর ভিতর তিনটী কি চারটী এমনি ক্রিয়াপদ আছে, এবং তাহাদের গঠনের একটী নিয়মও খুঁজিয়া পাওয়া যায়। মাইকেলের এই ক্রিয়াপদগুলি সাধনের কিন্তু কোনও প্রকার নিয়ম খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ভাষার এই প্রকার অসংযম দোষ মেঘনাদবধে দৃষ্ট হয়। বঙ্গসাহিত্যে এই প্রকার ভাষার অসংযম যাহাতে ক্রমশঃ প্রবেশ লাভ না করে, তদ্বিষয়ে আমাদের সর্ব্বদা সতর্ক থাকা উচিত। তাই বলিতেছিলাম যে, মাইকেলের ক্রিয়াপদগুলি ভয়ঙ্কর।

কেহ কেহ হয়ত বলিবেন যে, ক্রিয়াপদগুলি সংস্কৃত নামধাতুর অনুযায়ী। যাঁহারা সংস্কৃতের নামধাতুর সহিত পরিচিত, তাঁহারা এ কথা বলিবেন না

কিন্তু যাঁহারা তাহা না জানিয়া মাইকেলের একটী সাফাই দিতে চাহেন, তাঁহারাই ঐ কথা বলিবেন। বাঙ্গালা ভাষার নামধাতু আছে; যথা—কুহরিছে, ঝরিছে, মন্ত্রিছে, ইত্যাদি। স্বাভাবিক শব্দানুকারী ক্রিয়াপদগুলিকে নাম-ধাতু বলে, সকল বিশেষ্য বিশেষণকে ক্রিয়াপদে পরিণত করাকে বলে না। যদি ইহাদের কিছু মাত্র প্রয়োজনীয়তা বা সার্থকতা থাকিত তাহা হইলে কর্ণ কটু হইলেও ইহাদিগকে আদরে গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিতাম। কিন্তু তাহা না থাকায় ঐ প্রথা সর্ব্বথা পরিবর্জ্জনীয়। শ্রীযুক্ত রামগতি ন্যায়রত্ন যথার্থ বলিয়াছেন যে, এই ক্রিয়াপদগুলি 'চক্ষুশূলস্বরূপ।' মাইকেলের ভাষার আর একটা দোষ গ্রাম্যতা। গুরু গম্ভীর শব্দ বিন্যাস করিতে করিতে তিনি সহসা লঘু গ্রাম্য শব্দ প্রয়োগ করিয়া বসিয়াছেন; যথা—

(১)

কেহ গরজি উল্লাসে
নাশে ক্ষুধা-অগ্নি, কেহ শোষে রক্তস্রোতে
পড়েছে কুঞ্জরপুঞ্জ ভীষণ-আকৃতি,
ঝড়গতি ঘোড়া হায় গতিহীন এবে।

(২)

বীরপুত্রধাত্রী এ কনকপুরী
দেখ বীরশূন্য এবে, নিদাঘে যেমতি
ফলশূন্য বনস্থলী জলশূন্য নদী।
বরজে সজারু পশি বারুইর যথা
ছিন্ন ভিন্ন করে তারে ..

ইত্যাদি।

(৩)

দূতীর আকৃতি দেখি ডরিনু হৃদয়ে
রক্ষোবর! যুদ্ধ-সাধ ত্যজিনু তখনি,
মূঢ় যে ঘাটায় সখে হেন বাঘিনীরে।

(৪)

সচকিতে জগৎ জাগিলা
ভাবি রবি-দেব বুঝি উদয় অচলে
উদিলা, ডাকিল ফিঙ্গা আর পাখী যত
পূরিল নিকুঞ্জ-পুঞ্জ প্রভাতী সঙ্গীতে।

(৫)

বামদেব নামে নাথ সদা কাঁপি আমি
স্মরি পূর্ব্বকথা যত. দুরন্ত হিংসক
শূলপাণি, যেয়ো না গো আর তাঁর কাছে,
মোর কিরে প্রাণেশ্বর?

(৬)

যথা প্রভঞ্জন বলে উড়ে তুলা রাশি
চৌদিকে, রাক্ষসবৃন্দ পলাইল রড়ে
হেরি যমাকৃতি বীরে, রুষি লঙ্কাপতি
চোক চোক শরে শূর অস্থিরিলা শূরে।

এইরূপ আরও অনেক স্থলে আছে। মেঘনাদবধের ভাষার আর একটা দোষ যমকের অপব্যবহার। ইহাও বিদেশীয়-অনুকরণ-লালসা সম্ভূত। Milton এও এ দোষ আছে,ইংরাজীতে ইহাকে "jingle" (শ্রুতিমধুর করিবার চেষ্টা বা অনুপ্রাস) বলে। ইংরাজ সমালোচকগণ একবাক্যে এইটীকে মিল্টনের একটী দোষের মধ্যে গণ্য করিয়াছেন, কিন্তু মিল্টনের অন্ধ ভক্ত মাইকেল এই দোষটুকুর অনুকরণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। মিল্টনে আছে—

(1) And brought into the world a world of woe,
(2) Begirt the almighty one
Beseeching or beseiging
(3) This tempted our attempt.
ইত্যাদি।

তাই মাইকেলও লিখিয়াছেন।

(১) মৃগইন্দ্রে গজইন্দ্ররিপু
(২) বামাব্রজ কাঁদি পদব্রজে
(৩) নৃমুণ্ডমালিনী দূতী নৃমুণ্ডমালিনী আকৃতি
(৪) বর্ম্ম ঝলে ঝলঝলে
(৫) ঝরিছে ঝর্ঝরে নির্ঝর
(৬) বিভীষণ বিভীষণ রণে।
(৭) রঘুজ-অজ-অঙ্গজ-দশরথাত্মজে
(৮) টানিলা হুড়ুকা ধরি হুড় হুড়হুড়ে।—ইত্যাদি।

এইরূপ অনুপ্রাসের সুব্যবহার যেমন সুখকর, যথা—"যেরূপ মাধুরী

মোহে মদনমোহনে," তাহার অপব্যবহার তেমনি পীড়াদায়ক; যথা—"থর্ব্বিলা বলির গর্ব্ব খর্ব্বাকার ছলে বামন।" মাইকেলের কাব্যে অনুপ্রাস ভিন্ন বাক্যালঙ্কার নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অলঙ্কার যদি শোভা সম্পাদন না করিল, তাহা হইলে সে অলঙ্কার প্রয়োগের সার্থকতা থাকে না। যমক, অনুপ্রাস এ সকল অলঙ্কার প্রয়োগে একটু কৌশল আবশ্যক; কারণ, ইহারা অপব্যবহৃত হইলে বাক্যের শোভা সম্পাদনের পরিবর্ত্তে তাহাকে শ্রুতিদুষ্ট করিয়া ফেলে। উপরিলিখিত পদগুলি হইতেই তাহা সপ্রমাণ হইতেছে। শুধ্ কথার মারপ্যাঁচ মহাকাব্যে শোভা পায় না। তদ্দ্বারা যতই বাহাদুরী দেখান হউক না কেন, কাব্য তাহাতে কোন ক্রমেই লাভবান হয় না। সংস্কৃত কাব্যগুলির ভিতর মাঘ ও ভারবী এই দোষে দুষ্ট। তাই বলিতেছিলাম যে, বাক্যালঙ্কার খুব সাবধানে প্রয়োগ করিতে হয়।

মেঘনাদবধের ভাষার আর একটী দোষ—কতকগুলি কথার পুনঃ পুনঃ ব্যবহার। শ্রীযুক্ত রামগতি ন্যায়রত্ন সত্যই বলিয়াছেন—"দ্বিরদরদ নির্ম্মিত" 'মরি কি বা হায় রে যেমতি' ইত্যাদি কতকগুলি কথার এত শ্রাদ্ধ হইয়াছে যে, সেগুলি দেখিলে হাস্য সম্বরণ করা যায় না। এমনি "কাঞ্চন কঞ্চুক বিভা" রতনসম্ভবা বিভা, উর্ম্মিলা-বিলাসী-কর্ব্বুর-কুল-গর্ব্ব, লঙ্কার পঙ্কজ-রবি, প্রভৃতি কথাও উপর্য্যপরি ব্যবহৃত হইয়াছে, এবং তদ্দ্বারা কাব্য-সৌন্দর্য্য হানিগ্রস্ত হইয়াছে বলিয়াই বোধ হয়। অতএব ছন্দে যেমন মেঘনাদবধে বৈচিত্র্যের অভাব, তেমনি ভাষাতেও বৈচিত্র্যের অভাব। একই ভাব ভারতচন্দ্রের ভাষাবৈচিত্র্যে অনেক স্থলে অনেকরূপ ধারণ করিয়াছে; কিন্তু মাইকেল সে ক্ষমতার পরিচয় অল্পই দিয়াছেন। একই চিত্র তিন চারি স্থলে তিনি প্রায় একই কথায় আঁকিয়াছেন, তাহাতে পাঠকের বিরক্তি উৎপন্ন হয়। আমার ইহা বলা উদ্দেশ্য নহে যে, সে চিত্রগুলিতে কথার পরিবর্ত্তন একেবারে নাই, কিন্তু যাহা আছে, তাহাতে চিত্রগুলিকে নূতনত্ব দিতে পারে নাই।

মেঘনাদবধের ভাষার প্রধান দোষ দুরান্বয়। হেমবাবু এই দোষ লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—"বাক্যের জটিলতা-দোষই তাঁহার রচনার প্রধান দোষ; অর্থাৎ যে বাক্যের সহিত যাহার অন্বয়, বিশেষ্য বিশেষণ, সংজ্ঞা সর্ব্বনাম এবং কর্ত্তাক্রিয়া সম্বন্ধ, তৎপরস্পরের বিস্তর ব্যবধান; সুতরাং অনেক স্থলে অস্পষ্টার্থ দোষ জন্মিয়াছে—অনেক পরিশ্রম না করিলে ভাবার্থ উপলব্ধি হয় না।"

ইহার উদাহরণ মেঘনাদবধে রাশি রাশি মিলিবে। দুই একটী মাত্র এ স্থলে প্রদর্শিত হইতেছে।

দেব-দম্পতীরে তুমি সেব যথাবিধি
বিজয়ে! যাইব আমি যথা যোগাসনে "
(বিকট শিখর।) এবে বসেন ধূর্জ্জটি।

এখানে বন্ধনীর ভিতর বিকট শিখর লিখিযা পূর্ণচ্ছেদ দেওয়ার যে কি সাফল্য, তাহা বুঝিতে পারি না।

—ঘন রাশি রাশি
স্বর্ণবর্ণ সুবাসিত বাস শ্বাসি ঘন
বরষি প্রসূনাসার—কমল কুমুদী
মালতী সেঁউতী জাতি পারিজাত আদি
মন্দ-সমীরণ-প্রিয়া—ঘিরিল চৌদিকে
দেবদেব মহাদেবে মহাদেবী সহ।

এই ছত্রগুলির অন্বয় করা একরকম অসাধ্য।

ফুলকুল-সখী উষা যখন খুলিবে
পূর্ব্বাশার হৈমদ্বার পদ্মকর দিয়া
কালি, তব চিরত্রাস, বীরেন্দ্র-কেশরী
ইন্দ্রজিত ত্রাসহীন করিবে তোমারে।

এখানে "তব চির ত্রাস" কথাটার কাহার সহিত অন্বয় তাহা বুঝিয়া উঠিবার উপায় নাই।

এইরূপ—

ধক্‌ধকে, রত্নাবলী কুচযুগমাঝে
পীবর।
বিরহ-অনলে
(দুরূহ) ডরাই সদা।
শিহরি প্রমীলা সতী মৃদু কলস্বরে
বাসন্তী নিশীথে সখী বসন্ত-সৌরভা
তার গলা ধরি কাঁদি কহিতে লাগিলা।
ঝকঝকি উরুদেশে (হায় রে বর্ত্তুল
যথা রম্ভা-বন-আভা) হৈমময় কোষে
শোভে খরসান অসি।

* * *

সাজিলা দানব-বালা, হৈমবতী যথা
নাশিতে মহিষাসুরে ঘোরতর রণে,
কিম্বা শুম্ভ নিশুম্ভ উন্মদ বীর মদে।

* * *

না জানি এ বামাদলে কে আঁটে সমরে
ভীমারূপী, বীর্য্যবতী, চামুণ্ডা যেমতি
রক্ত-বীজ-কুল অরি?

এই ছত্রগুলিতে দুরান্বয় দোষ স্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে। আর উদাহরণ-বাহুল্যের প্রয়োজন নাই।

মেঘনাদবধের ভাষা এতগুলি দোষে কলঙ্কিত। অথচ এই ভাষা মাইকেলের মতে (soft and easy) সহজ ও কোমল! অবশ্য মেঘনাদবধের ভাষা তিলোত্তমা-সম্ভবের অপেক্ষা কিছু সহজ ইহা নিশ্চয়, কিন্তু তাই বলিয়া মহাকাব্যোপযোগী উচ্চাঙ্গের ভাষা কিরূপে বলিতে পারি? মহাকাব্যের ভাষা সম্বন্ধে মাইকেলের নিজের ধারণা এবং আমাদের মত ইতিপূর্ব্বেই আমরা লিপিবদ্ধ করিয়াছি। এখানে আমরা ঐ সম্বন্ধে বঙ্কিমবাবুর মত উদ্ধৃত করিব। তিনি লিখিয়াছেন—"অতএব যেখানে বাঙ্গালা শব্দ নাই, সেখানে অবশ্য সংস্কৃত হইতে অপ্রচলিত শব্দ গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু নিষ্প্রয়োজনে অর্থাৎ বাঙ্গালা শব্দ থাকিতে তদ্বাচক অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার যাঁহারা করেন, তাঁহাদের কিরূপ রুচি, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।

"স্থূল কথা সাহিত্য কি জন্য? গ্রন্থ কি জন্য? যে পড়িবে, তাহার বুঝিবার জন্য। না বুঝিয়া বহি বন্ধ করিয়া পাঠক ত্রাহি ত্রাহি করিয়া ডাকিবেন বোধ হয়, এ উদ্দেশ্যে কেহ গ্রন্থ লিখে না। যদি এ কথা সত্য হয়, তবে যে ভাষা সকলের বোধগম্য, অথবা যদি সকলের বোধগম্য কোনও ভাষা না থাকে, তবে যে ভাষা অধিকাংশ লোকের বোধগম্য, তাহতেই গ্রন্থ প্রণীত হওয়া উচিত। * * * যিনি যথার্থ গ্রন্থকার তিনি জানেন যে পরোপকার ভিন্ন গ্রন্থপ্রণয়নের উদ্দেশ্য নাই, জনসাধারণের জ্ঞানবৃদ্ধি বা চিত্তোন্নতি ভিন্ন রচনার আর অন্য উদ্দেশ্য নাই; অতএব যত অধিক ব্যক্তি গ্রন্থের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারে, ততই অধিক ব্যক্তি উপকৃত, ততই গ্রন্থের সফলতা। যদি সর্ব্বজনের প্রাপ্য ধনকে তুমি এমত দুরূহ ভাষায় নিবদ্ধ রাখ যে, কেবল যে কয়জন

পরিশ্রম করিয়া সেই ভাষা শিখিয়াছে, তাহারা ভিন্ন আর কেহ তাহা পাইতে পারিবে না, তাহা হইলে তুমি অধিকাংশ মনুষ্যকে তাহাদিগের স্বত্ব হইতে বঞ্চিত করিলে।"

সুলেখক অক্ষয়চন্দ্র সরকারও বলিয়াছেন—"যে কবিতা বুকের ভিতর দিয়া হৃদয়ে বসিয়া যায়, তাহা বাঙ্গালির পক্ষে বাঙ্গালাতেই হওয়া সম্ভব। সাধারণ বর্ণনায় সাধারণ কথায় যেমন ভাব পরিস্ফুট হয়, সংস্কৃতানুসারিণী হইলে তেমন হয় না। Johnson মিল্টন সম্বন্ধে যাহা কহিয়াছেন তাহা আমাদের মাইকেল সম্বন্ধেও খাটে। যথা—

"Through all his greater works there prevails an unifrom peculiarity of diction, a mode and cast of expression which bears little resemblance to that of any former writer · and which is so far removed from common use, that an unlearned reader when he first opens his book, finds himself surprised by a new language

This novelty has been by those who can find nothing wrong in Milton, imputed to his laborious endeavours after wards suitable to the grandeur of his ideas Our language, says Addison, sunk under him. But the truth is that both in prose and verse he had formed his style by a perverse and pedantic principle. He was desirous of using English words with a foreign idiom."

মেঘনাদ বধ যে এখনও অসিক্ষিত বা সামান্য শিক্ষিত মাত্র বাঙ্গালির নিজস্ব হয় নাই, কেবল মুষ্টিমেয় ইংরাজী বিদ্যাভিজ্ঞ বাঙ্গালির কাছেই আদৃত, তাহার একটি কারণ এই। তাঁহার রচনার যে সকল দোষ উপরে লিখিত হইল তৎসম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রজনী কান্ত গুপ্তও কহিয়াছেন "সমালোচক মহোদয়গণ মধুসূদনের রচনাগত অনেকগুলি দোষের উল্লেখ করিয়া থাকেন। এই সকল দোষের মধ্যে বাক্যের জটিলতা, প্রাঞ্জলতার অভাব, উৎকট শব্দের সন্নিবেশ, অনুপযোগী উপমা সমূহের সমাবেশ, প্রথাবহির্ভূত ক্রিয়াপদের ব্যবহার প্রভৃতি প্রধান। মধুসূদনের কবিতা কৃত্রিমতায় আচ্ছন্ন।"

আমরা এতক্ষণ মেঘনাদ বধের ছন্দ ও ভাষার যে দোষগুলির উল্লেখ

করিলাম তাহা যে শুধু পরীবাদ প্রিয়তার বশবর্ত্তী হইয়া করিয়াছি এরূপ যেন কেহ মনে না করেন। তবে মাইকেলের কাব্যের নিরবচ্ছিন্ন স্তুতি-বাদের জন্য আমরা এ প্রবন্ধ লিখিতে বসি নাই। সমালোচনার অর্থ নিরপেক্ষ ভাবে দোষগুণ বিচার, কেবল চাটুবাক্য প্রয়োগ নহে। তবে গুণাপেক্ষা দোষগুলি দেখাইতে অধিক যত্নশীল যে হইয়াছি তাহার একমাত্র কারণ এই যে ঐ দোষাংশের বাঙ্গালা সাহিত্যে স্থায়িত্ব লাভের সম্ভবনা হইতেছে।

মাইকেল মধুসূদনের অন্যান্য কাব্যাবলীর সম্বন্ধে যাহাই করা হউক না, কিন্তু মেঘনাদবধের সমালোচনা যে সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের সহায়ে করা যুক্তিযুক্ত নহে ইহাই আমাদের ধারণা। তাহার হেতু এই যে, মাইকেল স্পষ্টতঃ নিজেই স্বীকার করিয়াছেন, ইয়ুরোপীয় (Rhetoric) অলঙ্কারানুসরণে মেঘনাদ বধ গঠিত করিয়াছেন, সংস্কৃত অলঙ্কারোক্ত মহাকাব্য রচনা করিবার প্রযাস পান নাই। সে জন্য অলঙ্কার শাস্ত্রের মতে মহাকাব্যের যে সকল লক্ষণ থাকা উচিত তাহার অল্পই লক্ষণ মেঘনাদ বধে বর্ত্তমান। কাব্যের সমালোচনাকালে কবির জীবনী জানা থাকিলে অনেক সুবিধা হয়। কারণ, তাঁহারা যে সময়ে জীবিত ছিলেন সেই কালের প্রভাব কোনও কবিই অতিক্রম করিতে পারেন নাই। মাইকেলও তাহা পারেন নাই। সেজন্য বর্ত্তমান সমালোচনায় আমাদিগকে মাইকেলের জীবনীর সাহায্য অনেক স্থলে লইতে হইয়াছে। শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু লিখিয়াছেন—স্বদেশীয় সাহিত্যে অনাস্থা ও পাশ্চাত্য সাহিত্যে অন্ধ অনুরাগ, স্বদেশীয় আচার ব্যবহারে অপক্ষপাতিত্ব, এইগুলি তখনকার ছাত্রমণ্ডলীর লক্ষণ ছিল। মধুসূদনের চরিত্রে ইহার সকলগুলিই বর্ত্তমান ছিল। সমাজের অবস্থা সে সময় যেরূপ বিপ্লবময় হইয়াছিল, তাহা রাজনারায়ণ বসুর আত্মজীবনচরিত হইতে যোগীন্দ্র বাবু যে অংশটুকু স্বীয় গ্রন্থ মধ্যে উদ্ধৃত করিয়াছেন, সেইটুকু শুনাইলেই যথেষ্ট বুঝা যাইবে। "তখন হিন্দু কলেজের ছাত্রেরা মনে করিতেন, মদ্যপান সভ্যতার চিহ্ন, উহাতে দোষ নাই। আমি এবং আমার কতকগুলি সহচর, একত্র হইয়া গোলদীঘীতে বসিয়া মদ খাইতাম। এখন যেখানে সেনেট হাউস্ হইয়াছে, সেখানে কতকগুলি শীক কাবাবের দোকান ছিল। আমরা গোলদীঘীর রেল টপ্‌কাইয়া (ফটক দিয়া বাহির হইবার বিলম্ব সহিত না) ওই কাবাব কিনিয়া আনিয়া আহার করিতাম। আমি

ও আমার সহচরেরা এইরূপ মাংস ও জলস্পর্শশূন্য ব্রাণ্ডি খাওয়া সভ্যতা ও সমাজ-সংস্কারের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শক কার্য্য বলিয়া মনে করিতাম।" ইহার উপর বিলাতী সাহিত্যের নূতন আমদানীতে, তখনকার শিক্ষিত ব্যক্তিগণ দেশী সাহিত্য একেবারে স্পর্শ করিতেন না। তাঁহারা তাঁহাদের বিলাতী গুরুগণের কাছে শিখিয়াছিলেন, "A single shelf of a good European library worth the whole literature of India and Arabia" পাশ্চাত্যের অসভ্য ও দাম্ভিকতা-পরিপূর্ণ শিক্ষার মোহে ভুলিয়া তাঁহারা জাতীয়তা একেবারে বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। তাঁহারা দেশীয় সাহিত্যচর্চ্চা তো ভুলিয়াই গিয়াছিলেন, তাহার উপর দেশীয় পণ্ডিতগণকে নিতান্তবর্ব্বর ও কৃপাপাত্র বলিয়া ভাবিতে শিখিয়াছিলেন। মাইকেল রাজনারায়ণ বাবুকে লিখিয়াছিলেন "Nothing like it, we find, are the men to turn away those beggars whom they call 'Pundits' but whom I call barren rascals." মনের এই অশিষ্ট অবস্থায় মাইকেল মধুসূদন মেঘনাদবধ রচনা করিয়াছিলেন। অতএব ইহা বিস্ময়ের বিষয় নহে যে, মাইকেল মধুসূদন দত্তের কবিতায় জাতীয়তার সম্পূর্ণ অভাব বিদ্যমান্। বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতায় রাজনারায়ণ বাবু লিখিয়াছেন, "জাতীয় ভাব মাইকেল মধুসূদনেতে যত অল্প পরিলক্ষিত হয়, অন্য কোনও বাঙ্গালী কবিতে সেরূপ হয় না; তিনি তাঁহার কবিতাকে হিন্দু-পরিচ্ছদ দিয়াছেন বটে, কিন্তু সেই হিন্দু-পরিচ্ছদের নিম্ন হইতে কোট প্যান্টুলান" দেখা যায়। (যোগীন্দ্র বাবুর মাইকেলের জীবনী ২৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

অতএব ইহা আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র যে, মাইকেল মধুসূদন মম্মথ ভট্ট বা বিশ্বনাথের নিকট হইতে কাব্য-গঠন-প্রণালী শিক্ষা করিয়া কাব্য রচনা করিবেন। করিলে ভাল হইত কি না, সে বিচারের এখন প্রয়োজন নাই। এখন আমার বক্তব্য এই যে, এই কারণে আমি মাইকেলের কাব্য সমালোচনা সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রের মতে না করিয়া সাধারণ পথাবলম্বনেই করা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিয়াছি। ইহাতে সকলেরই সুবিধা হইবার সম্ভাবনা।

কাব্যের প্রাণ যে ছন্দের ও ভাষার উপর অনেক পরিমাণে প্রতিষ্ঠিত, তাহা কেহই অস্বীকার করিবেন না। এজন্য আমরা প্রথমে মেঘনাদবধের

ছন্দ ও ভাষার আলোচনাই করিলাম। মাইকেলের ভাষায় কয়েকটি বিশেষ গুণের কথার আমরা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। অতঃপর তৎ-সম্বন্ধে আরও কিছু বলিব।

বঙ্গভাষায় অমিত্রাক্ষর বৃত্তের প্রথম অবতারণাই মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রধান কীর্ত্তি—ইহা সকলেই অকুণ্ঠিত ভাবে স্বীকার করিবেন, সন্দেহ নাই। আমি নিজে এই ছন্দের নিতান্ত পক্ষপাতী। কতকগুলি রস অমিত্রাক্ষর-ছন্দে যেমন সুন্দররূপে চিত্রিত হইতে পারে, তেমন মিত্রাক্ষরে হয় না,—তাহা যাঁহারা বাঙ্গালার পুরাতন কাব্যগুলি দেখিয়াছেন, তাঁহারাই বেশ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। বীর, ভয়ানক, রৌদ্র প্রভৃতি রসগুলি মিত্রা-ক্ষর অপেক্ষা অমিত্রাক্ষরে যে চারুতর অভিব্যক্তি লাভ করে, তাহার উদা-হরণ স্বরূপ এখানে দুইটী চিত্র আমরা পাঠককে উপহার দিব।

প্রথম চিত্রটী ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল হইতে গৃহীত—সুন্দর চিত্র, মহা-দেবের ক্রোধের চিত্র :—

ঊর্দ্ধে ছুটে জটা ঘন ঘটা জর জর।
উছলিয়া গঙ্গাজল ঝরে ঝর ঝর॥
গর গর গর্জ্জে ফণী ফিহি লক্ লক্।
অর্দ্ধশশী কোটী সূর্য্য অগ্নি ধক্ ধক্॥

অবিকল এই চিত্র মাইকেলও মেঘনাদবধে সন্নিবেশিত করিয়াছেন, কিন্তু সে চিত্র ছন্দের গাম্ভীর্য্যে গম্ভীরতর হইয়াছে—

অধীর হইলা শূলী কৈলাস আলয়ে
নড়িল মস্তকে জটা, ভীষণ গর্জ্জনে
গর্জ্জিল ভুজগবৃন্দ, ধক্ ধক্ ধকে
জ্বলিল অনল ভালে, ভৈরব কল্লোলে
কল্লোলিলা ত্রিপথগা, বরিষায় যথা
বেগবতী স্রোতস্বতী পর্ব্বত-কন্দরে।

এই গাম্ভীর্য্য অমিত্রাক্ষরের স্বভাবসিদ্ধ গুণ, কারণ, ইহাতে মিলের চপলতা নাই। অমিত্রাক্ষরের আর একটী স্বাভাবিক গুণ ওজস্বিতা। স্বাধীন বস্তুতে এইগুণ সহজেই আসে, অমিত্রাক্ষর মিত্রাক্ষর অপেক্ষা অনেক পরি-মাণে স্বাধীন, ইহাতে মিলের খাতিরে ভাবসঙ্কোচের প্রয়োজন হয় না, এই কারণ বশতঃ বিনা চেষ্টাতেও অমিত্রাক্ষরে একটু তেজ স্বতঃ বিদ্যমান থাকে;

আর এই জন্যই বীররস প্রকটনে অমিত্রাক্ষর যত উপযোগী, মিত্রাক্ষর ততটা নহে। বীররস কৃত্তিবাসাদি মহাকবিগণও চিত্রিত করিয়াছেন, কিন্তু সেগুলি যেন তেমন উত্তেজক নহে; তাহার প্রধান কারণ যে, সেগুলি মিত্রাক্ষরে বিরচিত। ফলতঃ বাঙ্গালায় প্রচলিত পয়ার, ত্রিপদী প্রভৃতি ছন্দে গাম্ভীর্য্য ও উত্তেজনার অনেক স্থলে অভাব লক্ষিত হয়, কিন্তু ইহাও বলিতে হইবে যে, যে সকল বাঙ্গালা ছন্দ সংস্কৃতের অনুকৃতি, সেগুলিতে গাম্ভীর্য্যের অভাব নাই এবং সংস্কৃত ছন্দ সকল অমিত্রাক্ষর হইয়াও লঘু-গুরু-ভেদে মিষ্টতাহীন নহে, এই জন্য সংস্কৃত বৃত্তের স্বভাবসিদ্ধ গুণ গাম্ভীর্য্যযুক্ত শ্রুতিসুখকরতা। উদাহরণ-স্বরূপ ভারতচন্দ্রের আর একটী চিত্র উদ্ধৃত করিতেছি। ইহা সর্ব্বজনবিদিত হইলেও, কেবল ভাষা-চাতুর্য্যে একটী বিরাট্ চিত্র উন্মেষিত করিবার কৌশলের বঙ্গসাহিত্যে অদ্বিতীয় উদাহরণ বলিয়া ঐটী উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

মহারুদ্ররূপে মহাদেব সাজে।
ভভম্ভম্ ভভম্ভম্ শিঙ্গা ঘোর বাজে॥
লটাপট্ জটাজুট সঙ্ঘট্ট গঙ্গা।
ছলচ্ছল টলট্টল কলক্কল তরঙ্গা॥
ফণাফণ ফণাফণ ফণী ফন্নগাজে।
দিনেশপ্রতাপে নিশানাথ সাজে॥
ধক্ ধ্বক ধক্ ধ্বক জ্বলে বহ্নি ভালে।
ববম্বম্ ববম্বম্ মহাশব্দ গালে।
অদূরে মহারুদ্র ডাকে গভীরে।
অরেরে অরে দক্ষ দেরে সতীরে॥

যে চিত্র পূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়াছি, ইহাও সেই চিত্র, কিন্তু কি অপূর্ব্ব রূপান্তর। মাইকেলও আর এক স্থলে মহাদেবের ক্রুদ্ধমূর্ত্তি বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু তাহা পূর্ব্ব চিত্রের অনুবৃত্তি মাত্র, তাহাতে এমন সুকৌশল-সম্পাদিত বিচিত্রতা নাই। তাই বলিতেছিলাম যে, সংস্কৃত বৃত্তনিচয়ের অনুকরণে, সংস্কৃতের হ্রস্বদীর্ঘ-ভেদের উপর ভিত্তি করিয়া বাঙ্গালা ছন্দ নির্ম্মাণ করিলে, মিত্রাক্ষর হইলেও বোধ হয় গাম্ভীর্য্যের হানি হয় না। ইহাও বলা আবশ্যক যে, মিত্রাক্ষরে একেবারে বীররস যে প্রকটন হয় না, এমন নহে। কৃত্তিবাস-প্রণীত রামায়ণে অঙ্গদ কর্ত্তৃক রাবণের প্রতি যে তিরস্কার লিপিবদ্ধ আছে,

তাহা মিত্রাক্ষর এবং সহজ ও সরল হইলেও অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী। অনেকের বিশ্বাস আছে যে, যুদ্ধবর্ণনাই একমাত্র বীররসের আধার, সেইটী সম্পূর্ণ ভুল। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবলী-মধ্যে কয়েকটী বীররসান্বিতা কবিতা স্থান পাইয়াছে, সে সকল মিত্রাক্ষরে রচিত হইলেও হৃদয়ে অপূর্ব্ব উত্তেজনার সৃষ্টি করে। অতএব নিপুণ শিল্পীর হস্তে মিত্রাক্ষরও বিশেষ পুষ্টি ও বল লাভ করিতে পারে। তবে ইহা নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতে পারে যে, ছন্দের গাম্ভীর্য্যে ও ওজস্বিতায় মেঘনাদবধ বাঙ্গালা কাব্যের শীর্ষস্থানীয়।

কিন্তু যেমন একদিকে গাম্ভীর্য্য ও ওজস্বিতা অমিত্রাক্ষরের স্বভাবসিদ্ধ গুণ, তেমনি প্রসাদগুণের অভাবও ইহার স্বভাবসিদ্ধ দোষ। ছন্দ ভাবের বাহন মাত্র। যেখানে যে ভাব, সেইখানে সেইরূপ ছন্দ না হইলে পরিতৃপ্তি জন্মে না। সর্ব্ব সময় তুরী ভেরী ভাল লাগে না, মাঝে মাঝে মৃদুল বীণাধ্বনির প্রতি মানুষের মন আকৃষ্ট হয়। অমিত্রাক্ষর ছন্দে এই বীণারবের অভাব অনেক স্থলেই দৃষ্ট হয়। যতই কোমল করিবার প্রয়াস করা যাউক, মিত্রাক্ষরের কোমলতা ইহাতে যেন আসে না; অন্ততঃ কোন কবি উহা আনিতে পারিয়াছেন কি না,জানি না। নমুনা স্বরূপ দুইটী চিত্র পাশাপাশি ধরিতেছি।

মাইকেল মেঘনাদবধে লক্ষ্মীর অধিষ্ঠান বর্ণনা করিয়াছেন—

ক্ষণকাল দাঁড়ায়ে দুয়ারে
জুড়াইলা আঁখি সখী, দেখিয়া সম্মুখে
যে রূপমাধুরী মোহে মদনমোহনে।
বহিছে বসন্তানিল চিব অনুচর
দেবীর কমল-পদ-পরিমল-আশে,
সুস্বনে। কুসুমরাশি শোভিছে চৌদিকে,
ধনীদের রত্নাগারে রত্নরাজি যথা।

এখন ভারতচন্দ্রের ঐ বিষয়ক বর্ণনা কি সুন্দর, তাহা দেখুন—

কল কোকিল অলিকুল বকুল ফুলে
বসিলা অন্নপূর্ণা মণি-দেউলে।
কমল-পরিমল, লয়ে শীতল জল
পবনে ঢল ঢল উছলে কূলে॥
বসন্ত রাজা আনি ছয় রাগিনী রাণী
করিল রাজধানী অশোক-মূলে॥

বিদ্যার রূপবর্ণনা হইতে ভাব গ্রহণ করিয়া মাইকেল মোহিনীর রূপ বর্ণনা করিয়াছেন কি না, বলিতে পারি না, কিন্তু একই ভাবান্বিত হইলেও ছন্দের তারতম্যে তাহাদিগের ভিতর পার্থক্য অনেক। বাহুল্য ভয়ে উদ্ধৃত করিলাম না।

যে অমিত্রাক্ষর মাইকেল বঙ্গভাষায় প্রথম সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা চতুর্দ্দশাক্ষরযুক্ত পয়ারানুকারী। ইহাতে হিল্লোলের ও চাঞ্চল্যের অসদ্ভাব, এজন্য ইহার দ্বারা উদ্দাম আনন্দের চিত্র ভাল ফুটান যায় না। আনন্দ বর্ণনায় ছন্দ যদি তালে তালে না নাচে, তাহা হইলে সে দৃশ্য আমাদের মনোমধ্যে যেন মুদ্রিত হইয়া যায় না। অনেক স্থলে মাইকেল আনন্দের দৃশ্য বর্ণনা করিয়াছেন -

বাজে কাঞ্চি মধুর শিঞ্জিতে
বিশাল নিতম্ব-বিম্বে, নূপুর চরণে,
বাজে বীণ সপ্তস্বরা মুরজ মুরলী ;
সঙ্গীত-তরঙ্গ, মিশি সে রবের সহ
উথলিছে চারি দিকে চিত্ত বিনোদিয়া।

ইহা যেন অনেকটা কথা সাজান, এ আনন্দের তরঙ্গ আমাদের হৃদয়ে আসিয়া যেন সজোরে আঘাত করে না। কিন্তু—

নূপুর ঘুজ্ঘু র মধুর বোল
ঝনন ঝনন নটন বোল
হাসি হাসি কেহ কর ঃ কোল
ভালি ভালি বোলনী।
জ্ঞানদাস পড়ত তাল
গাযত মধুর অতি রসাল
গুণত উমত জগত ভুলত
হৃদয় পুতলী দোলনী॥

অথবা— বাজত দ্রিগি দ্রিগি ধোদ্রিম দ্রিমিয়া।
নটতি কলাবতী, শ্যাম সঙ্গে মাতি
করে করতাল প্রবন্ধক ধ্বনিয়া॥
ডগ মগ ডম্ফ দ্রিমিকি দ্রিমি মাদল
রুণু ঝুণু মঞ্জীর বোল।

কিঙ্কিনী রণরণি বলয় কলয় মণি
নিধুবনে রাস তুমুল উতরোল।
বীণ রবাব মুরজস্বরমণ্ডল
সা রি গ ম প ধ নি সা বহুবিধ ভাব।
ঘেটিতা ঘেটিতা ঘেনি মৃদঙ্গ গরজনি
চঞ্চল স্বরমণ্ডল করু রাব॥

এই সকল ছন্দে আনন্দের একটী সজীব ছবি আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করে।

এমনি আরও অনেক উদাহরণ সঙ্কলিত করা যাইতে পারে, কিন্তু সময় সংক্ষেপ ও বহুবিস্তৃতির ভয়ে আর একটী মাত্র উদাহরণ প্রদর্শন করিব। মাইকেল ইন্দ্রজিতের বিহার-কাননের বর্ণনা করিয়াছেন—

বৈজয়ন্তধাম-সম পুরী,
অলিন্দে সুন্দর হৈমময় স্তম্ভাবলি
হীরাচূড়; চারিদিকে রম্য বনরাজি
নন্দন কানন যথা। কুহরিছে ডালে
কোকিল; ভ্রমরদল ভ্রমিছে গুঞ্জরি।
বিকশিছে ফুলকুল, মর্ম্মরিছে পাতা,
বহিছে বসন্তানিল, ঝরিছে ঝর্ঝরে
নির্ঝর।

বলরাম দাস এমনি একটী ছবি দিয়াছেন, তাহা কত বেশী সুন্দর, তাহ শুনিলেই বুঝা যাইবে।

একে সে মোহন যমুনার কূল
আর সে কেলি কদম্ব-মূল
আরে সে বিবিধ ফুটল ফুল
আরে সে শারদ যামিনী।
ভ্রমরা ভ্রমরী করত রাব
পিক কুহু কুহু করত গাব,
সঙ্গিনী রঙ্গিণী মধুর বোলনি
বিবিধ রাগ গায়নী॥

তাই বলিতেছিলাম যে, বীর-রৌদ্রাদি রস চিত্রণে অমিত্রাক্ষর বৃত্ত যেমন

উপযোগী, করুণ, শান্ত অথবা অন্যান্য কোমল রস চিত্রণে তেমন নহে। শ্রীযুত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন যে, ভারতচন্দ্রের ছন্দে 'মেঘনাদবধ বিরচিত হইলে জঘন্য হইত। আমিও বলি যে, মেঘনাদবধের ছন্দে ভারতচন্দ্রের কাব্য বিরচিত হইলে তাহাও বড় ভাল হইত না। এ বিষয়ে এখন আর অধিক সময় নষ্ট করা প্রয়োজন মনে করিতেছি না। কেবল এইটুকু বলিয়া রাখিতে ইচ্ছা করি যে,আমরা অমিত্রাক্ষরের যতই পক্ষপাতী হই,আমাদিগের ইহা ভুলিলে চলিবে না যে, জগতের অনেক কবিই মিত্রাক্ষরের সহযোগে সকল প্রকার ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। এ কথাটি সত্য জানিয়াও আমরা বলিতে প্রস্তুত আছি যে, কতকগুলি রসের জন্য অমিত্রাক্ষর, ভাষার সর্ব্বোত্তম বৃত্ত; এবং দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, অমিত্রাক্ষর বৃত্তের যতটা বহুল প্রচার আবশ্যক, সাহিত্যে ততটা এখনও হইতেছে না। অমিত্রাক্ষর ছন্দের সাধারণ লক্ষণ সম্বন্ধে এই কথা বলিয়া এখন ইহার গঠন-প্রণালীর পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাক।

ছন্দ মিত্রাক্ষরই হউক বা অমিত্রাক্ষরই হউক, তাহার একটা গঠন-প্রণালী থাকা আবশ্যক। তাহা না থাকিলে রচনা গদ্য কি পদ্য, তাহা নির্ণয় করা কঠিন হইয়া উঠে। ইহা বোধ হয় কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না যে, ছন্দের প্রাণ, যতি ও বিরামে। আবৃত্তিকালে শ্বাস ফেলিবার প্রণালীতেই যতি ও বিরামের অবস্থান। মধুসূদন দত্তের অমিত্রাক্ষর কোন্ প্রণালীতে গঠিত, তাহার পরিচয় পাইতে অনেকের কৌতূহল থাকিতে পারে। সেই কৌতূহল নিবারণার্থ হেমবাবু ও মাইকেল নিজে এই ছন্দ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা এখানে উদ্ধৃত করিলে মন্দ হইবে না। হেমবাবু বলিয়াছেন—"বাঙ্গালা ভাষার নিয়ম স্বতন্ত্র, অর্থাৎ মাত্রা গণনা করিয়া তৃতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ, অষ্টম, একাদশ, দ্বাদশ ও চতুর্দ্দশ অক্ষরের পর বিরামযতি থাকে; আবৃত্তির সময় সেই সেই স্থানে ছন্দ অনুসারে শ্বাস পাতন করিতে হয়; এবং যে সকল স্থানে শব্দের মিল থাকে, আপাততঃ সেখানে বোধ হয় যেন শব্দের মিলনই এ প্রণালীর প্রধান অঙ্গ; কিন্তু কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিলেই বুঝা যায় যে, শব্দের মিল ইহার আনুসঙ্গিক, শ্বাস-নিক্ষেপের নিয়মই প্রধান কৌশল। অমিত্রচ্ছন্দ রচনারও এই প্রণালী—বিরামযতি অনুসারে পদবিন্যাস করা তাহারও নিয়ম।" মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর আবৃত্তিকালে এই কথার সত্যতা যথেষ্ট পরিমাণে উপলব্ধ হইবে।

মধুসূদন নিজে তাঁহার ছন্দ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"You want me to explain my system of versification for the conversion of your sceptical friends Let your friends guide their voices by the pause (as in English blank-verse) and they will soon swear that this is the noblest measure in the language." আর এক স্থলে তিনি বলিয়াছেন —"So many fellows have of late been at me to explain to them the structure of the new verse, that I have been obliged to think on the subject and the result is that I find that the যতি instead of being confined to the 8th syllable, naturally comes in after the 2nd, 3rd, 4th, 6th, 7th, 8th, 10th 11th, 12th" মাইকেলের এই অভিমত যে ভুল নহে তাহা পরে দেখিতে পাইব। কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে যে, বিরামযতির উপরই মাইকেলের অমিত্রাক্ষর বৃত্তের স্থিতি। যে ছন্দ কেবল বিরামযতির উপর নির্ভর করিয়া রচিত হয়, তাহার প্রবাহ সর্ব্বতোভাবে বিঘ্নমুক্ত ও অপ্রতিহত হওয়া প্রয়োজন ; কারণ, তাহাতে যতিভঙ্গের দোষ, মিলে ঢাকা পড়িবার উপায় নাই মাইকেলের পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণ যতিভঙ্গ-দোষে দোষী নহেন, এমন নহে, কিন্তু অনেক স্থলে তাঁহাদের সে দোষ মিলের মাধুর্য্যে ঢাকা পড়ে ; যথা—

বসন্তরাজা আনি ছয় রাগিনী রাণী
করিল রাজধানী অশোক-তলে।

অমিত্রচ্ছন্দে এই সুবিধা না থাকায় যতিভঙ্গ হইলেই শ্রুতিকটু হইয়া পড়ে। এই যতিভঙ্গ-দোষই মাইকেলের অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রধান দোষ। এই দোষেও তাঁহার ছন্দ মাঝে মাঝে ক্রমতা দোষদুষ্ট হইয়াছে। লক্ষ্য করিয়া গেলে বেশ বুঝিতে পারা যাইবে, এই দোষ মেঘনাদবধের প্রথম কয় সর্গে অধিক ও পরের সর্গগুলিতে অপেক্ষাকৃত কম আছে।

হেমবাবু ঐ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"বিরামযতি সংস্থাপনের দোষে স্থানে স্থানে শ্রুতিদুষ্ট হইয়াছে, যথা—

"কাঁদেন রাঘব বাঞ্ছা আঁধার কুটীরে
নীরবে!

ইত্যাদি। তিনি অনেকগুলি উদাহরণ সংগ্রহ করিয়াছেন, কিন্তু উহাদিগের

অপেক্ষা ঐ বিষয়ে গুরুতর-দোষান্বিত উদাহরণও আছে। স্বয়ং মাইকেলের কর্ণেও এই শ্রুতি-কঠোরতা-দোষ ব্যথা দিয়াছিল, তাই তিনি নিজেও স্বীকার করিয়াছেন যে, ঐ দোষ মেঘনাদবধে যথেষ্ট আছে—

"I find there are many metrical blemishes in the earlier books of the Megnad. They might be removed in a future edition, if the work should live to run through one and I to do the needful." আমরা এইবার ঐ দোষের কতকগুলি উদাহরণ দেখাইতে প্রবৃত্ত হইব।

"বন্দি চরণারবিন্দে অতি মন্দমতি
আমি, ডাকি আবার তোমায় শ্বেতভুজে
ভারতি !

এই টুকুর মধ্যে দুই স্থলে যতি ভঙ্গ হইয়াছে। নবম ও তৃতীয় অক্ষরের পর বিরামযতি স্থাপন করায় পড়িবার সময় স্রোতোভঙ্গ বশতঃ বাধিয়া যায়।

"শুনেছি রাক্ষসপতি মেঘের গর্জ্জনে,
সিংহনাদে, জলধির কল্লোলে, দেখেছি
দ্রুত ইরম্মদে।

এই পংক্তিগুলি আবৃত্তি করিতে যে কষ্ট হয়, তাহা জলধির "র" উঠাইয়া দিয়া "দেখেছি" র পরে "হে" বসাইলে দূরীভূত হয়, যথা—

শুনেছি রাক্ষসপতি মেঘের গর্জ্জনে,
সিংহনাদে, জলধি-কল্লোলে, দেখেছি হে
দ্রুত ইরম্মদে।

"তবে মন্ত্রী সারণ সচিবশ্রেষ্ঠ বুধঃ।"

অতিশয় শ্রুতিকঠোর, তাহার কারণ, ইহাতে সপ্তম অক্ষরের পরে যতি পড়িয়াছে। এইরূপ "ডোবে শোক-সাগরে মৃণাল যথা জলে" সেই দোষদুষ্ট।

"সঞ্জয়ের মুখে...
শুনি ভীমবাহু ভীমসেনের প্রহারে
হত যত প্রিয় পুত্র কুরুক্ষেত্র-রণে।
এবং "ধূমপুঞ্জসম চর্ম্মাবলীর মাঝারে অযুত।

এইগুলিতে কোথাও যতিভঙ্গ, কোথাও স্রোতোভঙ্গ ইত্যাদি দোষ লক্ষিত হইবে।

(১) হে সুরথি! সমস্মুখী এদেশে কি তোমা
সকলে ?

(২) কিম্বা পদ্ম নিশা অবসানে
প্রফুল্ল।

(৩) ধর্ম্মকর্ম্মে রত জনে কভু না প্রহারে
ধার্ম্মিক!

(৪) কে বুঝে দেবের মায়া এ মায়া-সংসারে
রাজেন্দ্র? গন্ধমাদন শৈলকুলপতি
দেবাত্মা, আপনি আসি গত নিশাকালে
মহৌষধ দানে বাঁচাইলা পুনঃ
লক্ষ্মণে;

এই সকলগুলিতেই স্রোতোভঙ্গ দোষ আছে, এবং এই সকলগুলিই মেঘনাদ-বধের শেষাংশ হইতে উদ্ধৃত। আর অধিক উদ্ধারের প্রয়োজন নাই। ইহা হইতেই বেশ বুঝা যাইবে যে, মেঘনাদবধে ঐ দোষ যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান আছে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মাইকেলের অমিত্রাক্ষর ছন্দের এক দোষ বৈচিত্র্যহীনতা। একইরূপ ছন্দ ক্রমাগত পড়িতে পড়িতে শ্রুতি নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়ে এইজন্য হেম বাবুর বৃত্রসংহার মেঘনাদবধের ঠিক পরবর্ত্তী হইলেও তাহাতে তিনি ছন্দবৈচিত্র্যের কল্পনা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—"নিরবচ্ছিন্ন একই প্রকার ছন্দ পাঠ করিলে লোকের বিতৃষ্ণা জন্মিবার সম্ভাবনা আশঙ্কা করিয়া পয়ারাদি ভিন্ন ভিন্ন ছন্দের প্রস্তাব করিয়াছি। এই গ্রন্থে মিত্রাক্ষর ও অমিত্রাক্ষর উভয়বিধ ছন্দই সন্নিবেশিত হইয়াছে।"

ইহাতেই কেহ যেন না মনে করেন যে, আমার বলিবার উদ্দেশ্য যে, মাইকেলের মেঘনাদবধ-মধ্যে মিত্রাক্ষর বৃত্ত-সংযোজনা অবশ্য কর্ত্তব্য ছিল; তাহা নহে; কিন্তু আমি বলিতেছি যে, তাঁহার কোনওরূপ বৈচিত্র্য সম্পাদন করা বিধেয় ছিল। এই বৈচিত্র্য তাঁহার ছন্দোমধ্যে কুত্রাপি নাই। সেই একঘেয়ে ছন্দ আগাগোড়া পড়িতে লোকের প্রবৃত্তি হয় না। মাইকেলের মত ক্ষমতাবান্ কবি যদি অমিত্র সংস্কৃত বৃত্তনিচয়ের অনুকরণে নিজ অমিত্রাক্ষর রচনা করিবার প্রয়াস করিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমরা বহুবিধ

অমিত্রাক্ষর ছন্দ পাইতাম। বলা বাহুল্য যে, ভাবের পরিবর্তনের সঙ্গে ছন্দের পরিবর্তনও নিতান্ত আবশ্যক। যে ছন্দ বীররসে প্রযোক্তব্য, ঠিক সেই ছন্দ আদি বা করুণরসে খাটে না, ইহা বোধ হয় বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। ভারতবর্ষের মহাকবিগণ এই পন্থার অনুসরণ করিয়াছেন ও তদ্দ্বারা নিজ নিজ কাব্যের সমৃদ্ধি কতদূর বৃদ্ধি করিয়াছেন, তাহা বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই। এই কথার প্রমাণ জন্য কুমারসম্ভব হইতে দুইটী উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হইবে। কালিদাস মহাদেবের রূপ বর্ণনা করিয়াছেন - তাহার মধ্যে সর্ব্বজন-পরিচিত একটী শ্লোক এই—

অবৃষ্টিসংরম্ভইবাম্বুবাহম্
অপামিবাধারমনুত্তরঙ্গম্।
অন্তশ্চরাণাং মরুতাং নিরোধাৎ
নিবাতনিষ্কম্পমিব প্রদীপম্॥

যাঁহাদের তারতম্য-বিচারক্ষম কর্ণ আছে তাঁহারাই বুঝিবেন যে এই গম্ভীর ছন্দ রতিবিলাপের করুণদৃশ্যে সমীচীন হইবে না। কালিদাসও তাই রতিবিলাপে ছন্দের পরিবর্তন করিয়া করুণ তানে গাহিয়াছেন—

ক নু মাং ত্বদধীনজীবিতাং
বিনিকীর্য্য ক্ষণভিন্নসৌহৃদঃ।
নলিনীং ক্ষতসেতুবন্ধনো
জলসংঘাত ইবাসি বিদ্রুতঃ॥

তাই বলিতেছিলাম যে, মাইকেল মিত্রাক্ষর নিগড় ছিন্ন করিয়াও ছন্দের বিচিত্রতার সৃষ্টি করিতে পারিতেন। যদি তিনি সংস্কৃত ছন্দের আশ্রয় গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে কখনই তাঁহার অমিত্রাক্ষর একঘেয়ে হইত না। শুধু তাহাই নহে, আমার বিবেচনায় যদি সংস্কৃত ছন্দের অনুকরণ না করিয়াও তিনি অলঙ্কার-শাস্ত্রোক্ত শব্দ চাতুর্য্যের উপায়াবলম্বন করিতেন, তাহা হইলেও অনেক পরিমাণে তাঁহার ছন্দের আকৃতি-ভেদ সাধিত হইত। কিন্তু দুঃখের বিষয় মেঘনাদবধ-রচনাকালে তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য হইল, গ্রীকেরা যেমন লিখে, তেমন লেখা, ভারতবর্ষীয়েরা যমন লিখে তাহার কাছ দিয়াও না যাওয়া। তাই তিনি কালিদাস প্রভৃতি দেশীয় মহাকবিগণের পন্থা পরিত্যাগ করিয়া মিল্টনের অনুকরণ করিতে বসিলেন।

কিন্তু অনুকৃতি কখনও অনুকৃতের সমান হয় না, তাই Milton যে কয়ে-

কটী সুকৌশলে তাঁহার ছন্দের মধ্যে কিছু বৈচিত্র্য সম্পাদন করিয়াছেন (বলা বাহুল্য, alliteration তাহাদের মধ্যে একটী) তাহা আমরা মাইকেলের অমিত্রাক্ষরে দেখিতে পাই না। ফল এই হইয়াছে যে, অনবরত পয়ার পড়িতে যেমন ভাল লাগে না, তেমনি মাইকেলের অমিত্রাক্ষরও অনবরত পড়িতে ভাল লাগে না। জানি না, ইহা আমার কাণের দোষ কি তাঁহার ছন্দের দোষ, তবে এইটুকু আমি বলিতে ইচ্ছা করি যে, মাইকেলের অমিত্রাক্ষরের বিশেষ পক্ষপাতী হইয়াও আমাকে এই মত প্রকাশ করিতে হইতেছে।

যাহা হউক, এ সকল দোষ সত্ত্বেও যে বঙ্গভাষা মাইকেলের কাছে এই অমিত্রাক্ষর ছন্দের জন্য সবিশেষ ঋণী, তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিব। এই ছন্দই বাঙ্গালা কাব্যের গতি ফিরাইয়াছে, অথবা ইহাও বলা অন্যায় হইবে না যে, বাঙ্গালা সাহিত্যের গতি পরিবর্ত্তিত হওয়া প্রয়োজন হইয়াছিল; তাই এই অমিত্রাক্ষরের সৃষ্টি হইল। পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ যথার্থই কহিয়াছেন—"অতএব প্রগাঢ় রচনার্থ ভিন্নবিধ পদ্যসৃষ্টি নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। তিলোত্তমা-সম্ভব-কাব্য-রচয়িতা তাহা নবাবতার করিলেন। এখন যদি অন্যান্য লোকে তাঁহার প্রদর্শিত পথের পথিক হন, অবিলম্বে অমিত্রাক্ষর পদ্যের শ্রীবৃদ্ধি হইয়া উঠিবে, এবং ঐ পদ্যে নানাবিধ ছন্দ আবির্ভূত হইবে। এখন প্রগাঢ় রচনার সময় উপস্থিত হইয়াছে। এখন আর লোকের মন সুখময় আদিরস-সাগরে মগ্ন হইতে তাদৃশ উৎসুক নহে। এখন দিন দিন লোকের মন যেমন উন্নত হইতেছে, তেমনই উন্নত পদ্য-সৃষ্টিও আবশ্যক হইয়াছে। অতএব মাইকেল মধুসূদন দত্তের চেষ্টা যথোচিত সময়েই হইয়াছে, সন্দেহ নাই।"

বাস্তবিক মাইকেলের আবির্ভাবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বঙ্গসাহিত্য ভারতচন্দ্রের মন্ত্র-মোহে আচ্ছন্ন ছিল। তাঁহার কোমল-কান্ত পদাবলী সকলের কাণ জুড়িয়া রাখিয়াছিল, সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গসাহিত্য আদিরসের তরঙ্গে প্লাবিত হইয়াছিল। এই তরঙ্গ যাঁহারা ফিরাইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে দুই জনের নাম উল্লেখযোগ্য প্রথম ঈশ্বরগুপ্ত, দ্বিতীয় মাইকেল মধুসূদন। মাইকেলের গম্ভীর অমিত্রাক্ষর ছন্দ ভারতচন্দ্রের অলস সুপ্ত কোমল কবিতার জাল ভেদ করিয়া নূতন উত্তেজনা, নূতন আকাঙ্ক্ষার অবতারণা করিল। ইহাই মাইকেল-বিরচিত অমিত্রাক্ষরের প্রধান কীর্ত্তি।

প্রেমের দণ্ড।

এতদিন মায়ার গুহায়,
অভাগারে রেখেছিলে ফেলি ;
তাই দেব, চিনি নাই তোমা
চোখে পরি, অবিদ্যার ঠুলি।
কিন্তু আজ বিশ্ব পুরাতন
চক্ষে মোর সকলি নতুন।
হাসিতেছে, দৃষ্টি চক্রবালে
কোটি কোটি সুন্দর অরুণ।
হে কপটি মায়াময় দেব,
অবিদ্যার ফাঁদ পাত ছলে।
আজি তার প্রতিশোধ ল'ব,
বাঁধি, তোমা প্রেম-ডোরবলে।
ছিনু বন্দী দু'দিনের তরে,—
তুচ্ছ দণ্ড তারে আমি গণি।
কিন্তু তব দণ্ড গুরুতর ;—
চিরদিন বন্দী রবে তুমি।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ মৈত্র।

বন্দনা।

জয়, রামকৃষ্ণ জগত-ইষ্ট
দীন-হীন-জন-বন্ধু
জয়, পতিতোদ্ধারী ভকত-ভক্ত
অশেষ-করুণা-সিন্ধু।
জয়, নির্ম্মল প্রভু নিখিলেশ্বর,
বিশাল-বক্ষ—ক্ষমা সুন্দর,
শ্রীমুখপদ্ম—সুধা-নির্ঝর,
ভারত-গগন-ইন্দু,

জয়, রামকৃষ্ণ জগত-ইষ্ট
দীন-হীন-জন-বন্ধু।
ভীত চকিত কলুষাম্বরা,
বেদনা-বিদ্ধ ক্ষুব্ধ অধীরা,
শ্রান্ত ধরণী চরণ-পদ্মে,
জানাইলা দুঃখ দৈন্য;
নারিলা রহিতে তুমি শ্রীকান্ত,
নাশিতে বিশ্ব-প্লাবিত ধ্বান্ত
গ্রহিলা জন্ম বিপ্রকুটীরে,
জগত হইল ধন্য।
পূত-পরশা-জাহ্নবী-কূলে,
ভক্ত সাজিয়া নিজেরে পূজিলে,
চিন্ময়-সুখ দীপ্ত নিখিলে,
ছড়ালে নবীন বুদ্ধ!
নাহি ভেদাভেদ বিপ্র শূদ্র
কিবা ধনী দীন মহৎ ক্ষুদ্র,
দিলে তুমি কোল, বক্ষ ভরিয়া—
মহতী ভকতি শুদ্ধ।
রচিয়া ললিত কোমল ছন্দ,
রসে ভরপুর অমৃত গন্ধ,
দিলে উপহার—বচনামৃত—
ক্ষুধিত চকোরী-ইন্দু,
নমো নির্ম্মল দীন রঞ্জন
কলি কল্মষ তাপ হরণ
দাও এ আর্ত্তে তব করুণার,
একটি অমর বিন্দু,
জয়, রামকৃষ্ণ, জগত ইষ্ট,
দীন হীন জন বন্ধু।

শ্রীফণীন্দ্রনাথ ঘোষ।

মরিতে হইবে।

'মরিতে হইবে' বলিয়া ফুলটী
শাখা হ'তে ঐ ঝরিল ;
'মরিতে হইবে' বলিয়া ফলটী
তরুতলে ঐ পড়িল।
'মরিতে হইবে' পশিযা শ্রবণে
চঞ্চল করিল প্রাণ,
মরণের পথে দিন দিন তবে
হ'তেছি কি আগুয়ান্!
'মরিতে হইবে' 'মরিতে হইবে'
সকলে বলিছে মোরে!
মরণের ভয়ে পরাণ কাঁপিছে—
তারা মা ডাকি গো তোরে!
মরণের ভয়ে পরাণ শিহরে
কি হবে তারা বল না।
তুমি মা থাকিতে তনয় কাঁদিছে—
দয়া কি তোর হবে না!
কাল-ভয় নাশ জননি! কালিকে!
ডাকি তোরে অনিবার!
মরণ সময়ে দেখা কি দেবে না
দয়াময়ী মা আমার!

শ্রীতারাপ্রসাদ ঘোষ।

ষট্ চক্র।

(শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এ।)

নাড়ীত্রয়।

জীব মেরুদণ্ড বামে চন্দ্রনাড়ী ইড়ানাম্।
দক্ষিণে পিঙ্গলা বহে ভানুকরে দীপ্তিমান্॥
মেরুমজ্জা মধ্যপথে সুষুম্না স্থিরদামিনী।
আমস্তিষ্ক—মূলাধার—ব্যাপিনী সর্ব্বভাসিনী॥ ১॥

প্রফুল্ল ধুস্তুর সম মূলাধার বৃন্ত তার।
সহস্রারে উঠিয়াছে—অনন্ত জ্যোতিঃ আধার॥
প্রফুল্ল পঙ্কজ ষট্ গ্রন্থিযুত সেই নাড়ী।
যেখানে আঁধার টুটে লভয়ে নির্ব্বাণপুরী॥ ২॥

মূলাধার।

সুষুম্নার মূলদেশে শোভে পদ্ম মূলাধার।
বাদিসান্ত স্বর্ণ বর্ণ চতুর্দ্দলে চমৎকার॥
বালব্রহ্ম অঙ্কগতা পৃথ্বীবীজে অধিষ্ঠানা।
অযুতভাস্করদ্যুতি ডাকিনী তাহে শোভনা॥ ৩॥

ত্রিপুরা ত্রিকোণ যন্ত্র—সে পদ্ম কর্ণিকা মাঝে।
প্রবল কন্দর্প বায়ু বিশ্বজয়ী যথা রাজে॥
অধোমুখে বিগলিত স্বর্ণকান্তি দীপ্তিমান্।
স্বয়ম্ভূ অনাদিলিঙ্গ যাহাতে বিলাসবান্॥ ৪॥

সার্দ্ধ ত্রিবলয়াকারা দেবীকুল কুণ্ডলিনী।
লিঙ্গমণি গ্রাসি যথা সুপ্তাভুজগরূপিণী॥
বহ্নিবায়ু যোগে যাঁর নিদ্রাগমে উর্দ্ধগতি।
সুষুম্না উজ্জলপথে পদ্মে পদ্মে যাঁর রতি॥ ৫॥

অধোমুখ সে কমলে ধ্যানে করি উর্দ্ধমুখ।
সাধক সংযতচিত্ত লভয়ে নির্ব্বাণসুখ॥
বিভবে বিদ্যায় জিনে ইন্দ্রচন্দ্র বৃহস্পতি।
এই পদ্মে সম্পুটিত জীবের করমগতি॥ ৬॥

স্বাধিষ্ঠান। লিঙ্গমূল সমদেশে সুষুম্না মধ্য মণ্ডলে।
স্বাধিষ্ঠান প্রবালাভ বাদিলান্ত ছয়দলে॥
বরুণ বীজের ক্রোড়ে রাজিছে সাবিত্রীপতি।
ভীষণা রাকিনী হেথা উগরে অরুণ জ্যোতিঃ॥
এ চক্র ধেয়ানে জীব করে সর্ব্বরিপুজয়।
চকিতে মোহান্ধ ঘোচে—কবিত্ব অরুণোদয়॥ ৭॥

মণিপুর। সুষুম্না উজ্জ্বল পথে নাভিমূল সমস্থলে।
ডাদিফান্ত দশদলে মণিপুর পদ্ম জ্বলে॥
নীলবর্ণ শতদল বহ্নিবীজে শোভমান্।
লক্ষ্মীসহ শ্রীপতির যে কমলে অধিষ্ঠান॥
চতুর্ভুজা শ্যামাঙ্গিনী লাকিনীর লীলাস্থল।
ধেয়ানে জনন স্থিতি লয় শক্তি করতল॥ ৮॥

অনাহত। বালরবি সম হৃদে সুষুম্না পথ বিবরে।
ফুটপদ্ম কাদিঠান্ত দ্বাদশদল বিস্তারে॥
বায়ুবীজে স্থিত, যথা ঈশান গৌরীর খেলা।
পীতবর্ণা শক্তি যথা কাকিনী কঙ্কালমালা॥ ৯॥

অনাহত শতদল কর্ণিকার অন্তরালে।
ত্রিকোণ যন্ত্র বিবরে বাণাখ্য ভৈরব জ্বলে॥
সুবর্ণ কুম্‌কুম্ জিনি সমুজ্জ্বল কলেবর।
বালচন্দ্র জ্বলে ভালে—রূপে স্তিমিতভাস্কর॥ ১০॥

মাঝে তার অষ্টদল শতদল শোভমান্।
কল্পতরু—মণিপীঠে যে ইষ্ট করয়ে ধ্যান॥
হংসরূপী আত্মা তার ইষ্টপদে লয় পায়।
জিতেন্দ্রিয়—পারে সদা প্রবেশিতে পরকায়॥ ১১॥

বিশুদ্ধ। কণ্ঠদেশে ধূম্রবর্ণ সরসিজ মনোহর।
ষোড়শ দলেতে শোভে ভাস্বর ষোড়শস্বর॥
মহাশূন্য সুবিস্তার কোটি জ্যোতিষ্ক শোভিত।
আকাশ বীজের ক্রোড়ে সদাশিব সুখস্থিত॥ ১২॥

সুধাপান মত্তচিতা শাকিনী তাঁহার ক্রোড়ে।
কেলিপরা চতুষ্করা সাধকের চিত্ত হরে॥
প্রাণ শক্তি সহ জীব এখানেই করে বাস।
হেরিয়া সংযত যতী কাটয়ে সংসার ফাঁস॥ ১৩॥

দ্বিদল। হক্ষদল সমন্বিত দ্বিদল আজ্ঞা বিবরে।
অর্দ্ধ নারীশ্বর শিব দেয় মুক্তি সাধকেরে।
হাকিনী শক্তির নাম জিনিয়া তড়িতে জ্বলে।
সর্ব্বজ্ঞতা পায় স্ফূর্ত্তি এ চক্র ধ্যান করিলে॥ ১৪॥

সহস্রার। তদূর্দ্ধেতে গুরুস্থান, চন্দ্র, নাদবিন্দু আর।
তাহার(ও) উপরে হের অবিমুক্তপুরী দ্বার॥
বিসর্গযুগলযুত সহস্রপদ্মের স্থান।
অধোমুখে বিকসিত কোটিসূর্য্য দীপ্তিমান্‌॥
পঞ্চাশৎ বর্ণ যার দলে দলে শোভা পায়।
কত বর্ণ কত দীপ্তি কে বলিতে পারে তায়॥
কর্ণিকার অন্তরালে মহাদেব শক্তিযুত।
বিপরীত রতি বশে বরষে সদা অমৃত॥
সে অমৃত পানে জীব মর্ত্তে অমরতা পায়।
ভুক্তি মুক্তি করতলে অন্তে মহেশে মিলায়॥ ১৫॥

শান্তি। মূলাধারে স্বয়ম্ভুব বাণলিঙ্গ হৃদিমূলে।
ভ্রূমধ্যেতে অর্দ্ধনারী যেবা হেরে যোগবলে॥
কুণ্ডলিনী শিবলীনা যে নেহারে সহস্রারে।
জনন মরণ ভ্রান্তি শান্ত তার চিরতরে॥ ১৬॥

রামকৃষ্ণ-সঙ্গীত।

১

তার ত খবর তোরা কেহই নিলিনে।
সে যে, তোদের তরে কেঁদে কেঁদে, চলে গেল দেখ্‌লিনে॥

২

চুপে চুপে সে যে এল, চুপে চুপে চ'লে গেল,
তোদের, চুপে চুপে দেখে গেল, বুঝেও বুঝ্‌লিনে।

৩

যেজন, চুপে চুপে তার কাছে, প্রাণের দুঃখ জানায়েছে,
তার, দুঃখ নাশি ঢেলে দেছে শান্তি পরাণে।

৪

বড় দয়া দীনে তার, নিজে নিল দীনের ভার,
কেন, দীন বেশে দিন গেল তার, ভেবে দেখ্‌লিনে।

৫

দেখেছ গো কে কোথায়, আপন স্ত্রীকে মা বলে হায়,
দিলে, মা মা বলি, পুষ্পাঞ্জলি, পত্নীর চরণে।

৬

সে যে, মা বলিতে আত্মহারা, হরি বল্‌তে মাতোয়ারা,
দেখিয়েও নয়নে ধারা, চিনেও চিন্‌লিনে।

৭

মা বল আর হরি বল, রাম বল, রহিম বল,
সব নামেরই একি ফল, ব'লে গেল শুন্‌লিনে।

৮

ভারত ! তুই ভাগ্যহীন, চিরদিন র'লি দীন,
বিদায় দিয়ে অনাদরে ঘরের সে ধনে।

শ্রী ভোলানাথ মজুমদার।

মদন-মোহন।

"রাধা সঙ্গে যদা ভাতি, তদা মদন মোহনঃ।
অন্যথা বিশ্বমোহোঽপি, স্বয়ং মদনমোহিতঃ॥"

(গোবিন্দ-লীলামৃত)

১

সুরহীন যেমন সঙ্গীত,
ভাবহীন কবিতা যেমন,
তেমনি ত মহাভাব-রূপা,
রাধাহীন ব্রজেন্দ্র-নন্দন।

২

মধুশূন্য মধু-চক্র যথা,
সুধাহীন সুধাংশু যেমন,
বিনে রাই সুধা-তরঙ্গিণী,
তেম্নি হরি সুধার ভবন।

৩

যথা ভাঁড় কর্পূর বিহীন,
বাসহীন কুসুম যেমন,
তেম্নি রাই রঙ্গিনী বিহনে,
আমার সে শ্রীমধুসূদন।

৪

জ্যোতিহীন হীরক যেমন,
প্রভাশূন্য যথা প্রভাকর,
তেমনিত রাধিকা বিহনে,
রাধা নাথ নবনটবর।

৫

প্রাণহীন যেমন গো দেহ,
জলহীন যেমন তটিনী,
একমাত্র কিশোরী বিহনে,
তেমনিত নীলকান্ত মণি।

৬

অহো! লক্ষ্মী-নারায়ণ শূন্য,
যেমন গো শ্রীগোলক পুরী,
যথা ব্রজ রাধাকৃষ্ণ হীন,
প্যারীহীন তেমনি সে হরি।

৭

শস্যহীন শস্যক্ষেত্র যথা,
পত্রশূন্য পাদপ নিকর,
তেমনি সে রাধালতাহীন,
নীলতনু নবতরুবর।

৮

তারাহীন যেমন গগন,
ফুলহীন কুসুম-কানন,
তেমনি সে শ্রীমতী বিহীন,
অপ্রাকৃত নবীন মদন।

৯

কভু যদি সে শ্যামসুন্দর,
হয় ওগো! রাধাবিরহিত,
হইয়াও বিশ্ব-বিমোহন,
হয় কৃষ্ণ মদন মোহিত।

১০

যতক্ষণ রাধা পরিবৃত,
ব্রজের সে নবঘনশ্যাম,
ততক্ষণ মদন-মোহন,
রূপে তার বিমোহিত কাম।

শ্রী ভোলানাথ মজুমদার।

স্বামি-শিষ্য-সংবাদ।

[শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এ।]

আজ বেলা প্রায় দুটার সময় শিষ্য পদব্রজে মঠে আসিয়াছে। নীলাম্বর বাবুর বাগান বাটীতে তখন মঠ উঠাইয়া আনা হইয়াছে। বর্ত্তমান মঠের জমি অল্পদিন হ'ল খরিদ করা হইয়াছে। স্বামীজি শিষ্যকে সঙ্গে লইয়া বেলা ৪টা আন্দাজ মঠের নূতন জমিতে বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন। মঠের জমি তখন জঙ্গলপূর্ণ। জমিটীর উত্তরাংশে তখন একখানি একতলা কোঠা-বাড়ী ছিল; উহারই সংস্করণে বর্ত্তমান মঠবাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছে। মঠের জমিটী যিনি খরিদ করাইয়া দেন তিনিও স্বামীজির সঙ্গে কিছুদূর আসিয়া বিদায় লইলেন। স্বামীজি শিষ্যসঙ্গে মঠের জমিতে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন ও কথা প্রসঙ্গে ভাবী মঠের কার্য্যকারিতা ও বিধিবিধান পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন।

ক্রমে একতলা ঘরের বারাণ্ডায় পৌঁছিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে স্বামীজি বলিলেন "এইখানে সাধুদের থাক্‌বার স্থান হবে। সাধন ভজন জ্ঞান চর্চ্চায় এই মঠ প্রধান কেন্দ্রস্থান হবে। এখান থেকে যে শক্তির অভ্যুদয় হবে তাতে জগৎ ছেয়ে ফেল্‌বে; মানুষের জীবনগতি ফিরিয়ে দিবে। জ্ঞান, ভক্তি, যোগ, কর্ম্মের একত্র সমন্বয়ে এই থান থেকে ideals (মানব হিতকর উচ্চাদর্শ সকল) বেরোবে। এই মঠভুক্ত পুরুষদিগের ইঙ্গিতে কালে দিগ্‌দিগন্তরে প্রাণের সঞ্চার হবে। যথার্থ ধর্ম্মানুরাগিগণ সব এখানে কালে এসে জুটবে।

"আর মঠের ঐ যে দক্ষিণ ভাগের জমি দেখ্‌ছিস্ ওখানে বিদ্যার কেন্দ্রস্থল হবে। ব্যাকরণ, দর্শন, বিজ্ঞান, কাব্য, অলঙ্কার, স্মৃতি, ভক্তিশাস্ত্র আর রাজকীয় ভাষা ঐ স্থানে শিক্ষা দেওয়া হবে। প্রাচীন টোলের ধরণে ঐ বিদ্যামন্দির স্থাপিত হবে। বালব্রহ্মচারীরা ঐখানে থেকে শাস্ত্রপাঠ করবে। তাদের অশন বসন সব মঠ থেকে দেওয়া হবে। এই সব ব্রহ্মচারীরা পাঁচ বৎসর trainingএর (শিক্ষালাভের) পর ইচ্ছা হ'লে গৃহে ফিরে গিয়ে সংসারী হতে পার্‌বে। মঠের মহাপুরুষগণের অভিমতে সন্ন্যাসও ইচ্ছা হলে নিতে পার্‌বে। এই ব্রহ্মচারিগণের মধ্যে যাদের উচ্ছৃঙ্খল বা অসচ্চরিত্র দেখা যাবে তাদের মঠস্বামিগণ তখনি বহিষ্কৃত করে দিতে পার্‌বেন। এখানে জাতি বর্ণ নির্ব্বিশেষে অধ্যয়ন করান হবে। এতে যাদের objection (আপত্তি) থাকবে তাদের নেওয়া হবে না। তবে নিজের জাতিবর্ণাশ্রমাচার মেনে যারা চল্‌তে চাইবে তাদের—তাদের আহারাদির বন্দোবস্ত নিজেদের করে নিতে হবে। মাত্র অধ্যয়ন সকলের সহিত একত্র করবে। তাদেরও চরিত্র বিষয়ে মঠস্বামিগণ সর্ব্বদা তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখ্‌বেন। এখানে trained (শিক্ষিত) না হ'লে কেহ সন্ন্যাসের অধিকারী হ'তে পার্‌বে না বুঝ্‌লি?

শিষ্য।—হাঁ। তা হ'লে আপনি কি আগেকার মত গুরুগৃহে গিয়ে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের পুনরনুষ্ঠান কত্তে চান?

স্বামীজি—নয় ত কি তোর এই modern system of education এ (বর্ত্তমানে দেশে যেভাবে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে তাহাতে) ব্রহ্মবিদ্যা বিকাশের সুযোগ আছে রে? পূর্ব্বের মত ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম প্রতিষ্ঠিত কত্তে হবে; তবে এখন broad basis এর (উদারভাব সমূহের) উপর তার foundation (ভিত্তি স্থাপন) কত্তে হবে। কালোপযোগী অনেক পরিবর্ত্তন তাতে ঢোকাতে হবে।

সে সব পরে বল্‌বো। স্বামীজি আবার বলিতে লাগিলেন—"আর মঠের দক্ষিণে ঐ যে জমিটা আছে ঐটেও কালে কিনে নিতে হবে। ঐখানে মঠের অন্ন সত্র হবে। ঐখানে যথার্থ দীন দুঃখীগণকে নারায়ণজ্ঞানে সেবা করবার বন্দোবস্ত থাক্‌বে। ঐ অন্নসত্র ঠাকুরের নামে প্রতিষ্ঠিত হবে। যেমন funds (টাকা) জুট্‌বে সেই অনুসারে অন্নসত্র প্রথমে খুল্‌তে হবে। চাই কি প্রথমে দুতিনটী লোক নিয়ে start (কার্য্যারম্ভ) কত্তে হবে। উৎসাহী ব্রহ্মচারিগণকে এই অন্নসত্র চালাতে train কর্‌তে (শিখাইতে) হবে। তাদের যোগাড সোগাড করে—চাই কি ভিক্ষা করে—এই অন্নসত্র চালাতে হবে। মঠ এ বিষয়ে কোনরূপ অর্থ সাহায্য কত্তে পার্‌বে না। ব্রহ্মচারিগণকেই উহার জন্য অর্থ সংগ্রহ করে নিয়ে আন্‌তে হবে। এখানে ঐভাবে পাঁচ বৎসর training (শিক্ষালাভ) সম্পূর্ণ হলে তবে তারা বিদ্যামন্দির শাখায় প্রবেশাধিকার লাভ কত্তে পার্‌বে। অন্নসত্রে ৫ বৎসর আর বিদ্যাশ্রমে ৫ বৎসর একুনে দশ বৎসর trainingএর (শিক্ষার) পর মঠের স্বামিগণের দ্বারা দীক্ষিত হয়ে সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশ কত্তে পারবে। অবশ্য যদি তাদের সন্ন্যাসী হতে ইচ্ছা হয় ও মঠের অধ্যক্ষগণের তাহার ঐরূপ করা অভিমত হয়। তবে মঠাধ্যক্ষ কোন কোন বিশেষ সদ্‌গুণসম্পন্ন ব্রহ্মচারী সম্বন্ধে ঐ নিয়ম ব্যতিক্রম করিয়া তাহাকে যখন ইচ্ছা সন্ন্যাস দীক্ষা দিতে পারিবেন। সাধারণ ব্রহ্মচারিগণকে কিন্তু পূর্ব্বে যেমন বলিলাম সেইভাবে ক্রমে ক্রমে সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশ কত্তে হবে। আমার মাথায় এই সব idea (ভাব) রয়েছে।

শিষ্য—মহাশয়, মঠে এইরূপ তিনটী শাখা স্থাপনের উদ্দেশ্য কি হবে?

স্বামীজি—বুঝ্‌লিনি? প্রথমে অন্নদান; তারপর বিদ্যাদান। সর্ব্বপরে জ্ঞানদান। এই তিন ভাবের সমন্বয় এই মঠ থেকে কর্‌তে হবে।

"ঐইরূপে অন্নদান কর্‌তে কর্‌তে ব্রহ্মচারীদের মনে পরার্থ কর্ম্মতৎপরতা ও ভগবদ্ জ্ঞানে জীব সেবার ভাব দৃঢ় হবে। উহা হ'তে তাদের চিত্ত ক্রমে নির্ম্মল হয়ে তাতে সত্ত্বভাবের স্ফুরণ হবে। আর তা হলেই ব্রহ্মচারিগণ কালে ব্রহ্মবিদ্যা লাভের যোগ্যতা ও সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশাধিকার লাভ কর্‌বে।"

শিষ্য—মহাশয়, জ্ঞান দানই যদি শ্রেষ্ঠ হয় তবে আর অন্নদান ও বিদ্যাদানশাখা স্থাপনের প্রয়োজন কি?

স্বামীজি—তুই এত ক্ষণেও ঐ কথাটা বুঝ্‌তে পার্‌লিনি! শোন্—এই অন্নের হাহাকারের দিনে তুই যদি পরার্থে, সেবাকল্পে দীনদুঃখীকে ভিক্ষাশিক্ষা ক'রে

যেরূপে হোক্—দুমুটো অন্ন দিতে পারিস্ তা হলে জীব জগৎ ও তোর মঙ্গল ত হবেই—সঙ্গে সঙ্গে তুই, এই সৎকার্য্যের জন্য সকলের sympathy (সহানুভূতি) পাবি। কামকাঞ্চনে বদ্ধ হলেও সৎকার্য্যের জন্য তোকে বিশ্বাস কোরে সংসারী জীব তোর সাহায্য কত্তে অগ্রসর হবে। তুই বিদ্যাদানে বা জ্ঞানদানে যত লোক আকর্ষণ কত্তে পারবি তার সহস্রগুণ লোক তোর এই অযাচিত অন্নদানে আকর্ষিত হবে। এই কার্য্যে তুই public sympathy (সাধারণের সহানুভূতি) যত পাবি তত আর কোন কার্য্যেই পাবিনি। যথার্থ সৎকার্য্যে মানুষ কেন ভগবান্‌ও সহায় হয়। এইরূপে লোক আকৃষ্ট হলে তখন তাদের মধ্যে বিদ্যা ও জ্ঞানার্জ্জনের স্পৃহা উদ্দীপিত কত্তে পারবি। তাই অগ্রে অন্নদান "অন্নদানং কলৌ যুগে"।

শিষ্য—মশায়, এই অন্নসত্র করিতে প্রথম স্থান চাই; তারপর ঐজন্য ঘর দ্বার নির্ম্মাণ করা চাই। তার পর কাজ চালাবার টাকা চাই। এত টাকা কোথা হইতে আসিবে ?

স্বামীজি—এই মঠের দক্ষিণ দিকটা আমি এখনি ছেড়ে দিচ্চি ও ঐ বেলতলায় একখানা চালা তুলে দিচ্চি। তুই একটী কি দুটী অন্ধ আতুর সন্ধান কোরে নিয়ে এসে কাল্ থেকেই তাদের সেবায় লেগে যা দেখি। নিজে ভিক্ষা ক'রে তাদের জন্য নিয়ে আয়। নিজে রেঁধে তাদের খাওয়া। এইরূপে কিছু দিন করলেই দেখ্‌বি তোর এই কার্য্যে কত লোক সাহায্য কত্তে অগ্রসর হবে, কত টাকা কড়ি দেবে। "নহি কল্যাণ কৃৎকশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি"॥

শিষ্য—হাঁ তা বটে। কিন্তু ঐ রূপে নিরন্তর কর্ম্ম করিতে করিতে কালে কর্ম্মবন্ধন ত ঘটিতে পারে।

স্বামীজি—কর্ম্মের উদ্দেশ্য তোর যদি নিষ্ফল হয়, আর সকল প্রকার কামনা বাসনার পারে যাবার যদি তোর একান্ত অনুরাগ থাকে তা হ'লে ঐ সব সৎকার্য্য তোর কর্ম্মবন্ধন মোচনেই সহায়তা করবে। কর্ম্মবন্ধন আসবে ওকথা তুই কি বলছিস্? এই পরার্থ কর্ম্মই কর্ম্মবন্ধনের মূলোৎপাটনের একমাত্র উপায়। "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।"

শিষ্য—আপনার কথায় অন্নসত্রের সম্বন্ধে আপনার মনোভাব বিশেষ করিয়া শুনিতে প্রাণে উৎসাহ হইতেছে।

স্বামীজি—গরীব দুঃখীদের জন্য well ventilated (আলোক ও

বায়ু প্রবেশের পথযুক্ত) ছোট ছোট ঘর তৈয়ারি কর্‌তে হবে। এক এক ঘরে তাদের দুই জন কি তিনজন মাত্র থাক্‌বে। তাদের উত্তম বিছানা, পরিষ্কার কাপড় চোপড় সব দিতে হবে। তাদের জন্য একজন ডাক্তার থাক্‌বে। হপ্তায় একবার কি দুবার সুবিধা মত তিনি তাদের দেখে যাবেন। অন্নসত্রের ভিতর একটা ward (বিভাগ) থাক্‌বে যাতে রোগীদের শুশ্রূষা করা হবে। ক্রমে যখন funds (টাকা) এসে পড়্‌বে তখন একটা মস্ত kitchen (রন্ধন শালা) কর্‌তে হবে। অন্নসত্রে কেবল "দীয়তাং নীয়তাং ভুজ্যতাম্‌" এই রব উঠ্‌বে। ভাতের ফেন গঙ্গায় গড়িয়ে পড়ে গঙ্গার জল সাদা হয়ে যাবে। এই রকম অন্নসত্র হয়েছে দেখ্‌লে তবে আমার প্রাণটা ঠাণ্ডা হয়।

শিষ্য—আপনার যখন ঐরূপ ইচ্ছা হইতেছে তখন বোধ হয় কালে ঐ বিষয়টী বাস্তবিকই হইবে।

শিষ্যের কথা শুনিয়া স্বামীজি গঙ্গাপানে চাহিয়া কিছুক্ষণ স্থির হইয়া রহিলেন। পরে প্রসন্নমুখে সস্নেহে শিষ্যকে বলিলেন—তা তোদের ভিতরই কার সিংহ কবে জেগে উঠ্‌বে তা কে জানে। একটার মধ্যে মা যদি শক্তি জাগিয়ে দেন তো দুনিয়া ময় অমন অন্নসত্র খুলে ফেল্‌বে। কি জানিস্‌, জ্ঞান শক্তি ভক্তি সকলই সর্ব্বজীবে পূর্ণ ভাবে আছে। উহাদের বিকাশের তারতম্যটাই কেবল আমরা দেখি ও ইহাকে বড় উহাকে ছোট ব'লে মনে করি। আর কিছুই নয়। একটা পর্‌দা যেন পূর্ণ বিকাশের মাঝখানে প'ড়ে রয়েছে। সেটা স'রে গেলেই বস্‌, সব হয়ে গেল। যা চাইবি যা ইচ্ছে কর্‌বি তাই হবে।

স্বামীজির কথা শুনিয়া শিষ্য ভাবিতে লাগিল স্বামীজির সে পর্‌দা বোধ হয় খুলিয়া গিয়াছে। সেজন্য তিনি যাহা করিতে ইচ্ছা করেন তাহা প্রায়ই কার্য্যতঃ সফল করিতে পারেন।

স্বামীজি আবার বলিতে লাগিলেন—এই মঠ মহা সমন্বয় ক্ষেত্র ক'রে তুল্‌তে হবে। ঠাকুর আমাদের সর্ব্বভাবের সাক্ষাৎ সমন্বয় মূর্ত্তি। ঐ সমন্বয়ের ভাবটী এখানে জাগিয়ে রাখ্‌লে ঠাকুর জগতে প্রতিষ্ঠিত থাক্‌বেন। সর্ব্বমত সর্ব্বপথ আচণ্ডাল ব্রাহ্মণ এখানে এসে আপন আপন মতের ও পথের ideal (আদর্শ) পাবে। সে দিন যখন মঠের জমিতে ঠাকুরকে স্থাপন করলুম্‌ তখন দেখলুম্‌ যেন এখান হ'তে তাঁর ভাবের

বিকাশ হয়ে চরাচর বিশ্ব ছেয়ে ফেল্‌চে! তোর কি মনে হয় বল দেখি?

শিষ্য—মশায়, আমি আর কি বল্‌বো। আপনার আশীর্ব্বাদ আমার একমাত্র কামনা। আমি আর কিছুই চাই না।

স্বামীজি—কেন এই সব ভাব লোকদের বুঝিয়ে দিবি। কেবল বেদান্ত পড়ে কি হবে? এই শুদ্ধাদ্বৈতবাদের practical lifeএ (দৈনন্দিন কর্ম্মময় জীবনে) সত্যতা প্রমানিত কর্‌তে হবে। শঙ্কর এই অদ্বৈতবাদ স্বর্গে তুলে দিয়ে গেছেন; আমি এবার সেটাকে মর্ত্তে নাবাতে এসেছি। ঘরে ঘরে মাঠে ঘাটে পর্ব্বতে প্রান্তরে এই অদ্বৈতবাদের দুন্দুভি তুল্‌তে হবে। তোরা আমার সহায় হয়ে লেগে যা।

শিষ্য— মশায, ধ্যান সহাযে ঐ ভাব অনুভূতি করিতেই যেন আমার ভাল লাগে। লাফাতে ঝাঁপাতে ইচ্ছা হয় না।

স্বামীজি—ওরে, নেশা ক'রে অচেতন হ'য়ে থেকে কি হবে? কখন বা তাণ্ডব নৃত্য করবি কখনো বা বুঁদ হযে থাকবি। ভাল জিনীস পেলে কি একা খেয়ে সুখ হয? দশ জনকে দিতে হয় ও খেতে হয়। আত্মানুভূতি লাভ ক'রে নয তুই মুক্ত হযে গেলি। তাতে জগতের এলো গেলো কি? ত্রিজগৎ মুক্ত করে নিয়ে যেতে হবে। মহামায়ায় রাজ্যে আগুন ধরিয়ে দিতে হবে।

শিষ্য—সব আগুনে পুড়ে গেলে আর থাক্‌বে কি? এই লীলা খেলায় আনন্দই বা কোথায় পাব?

স্বামীজি—তখন নিত্য সত্যে প্রতিষ্ঠিত হবি। সে আনন্দের কি তুলনা আছে রে! "নিববধি গগণাভং" আকাশকল্প ভূমানন্দে প্রতিষ্ঠিত হবি। জীবজগতের সর্ব্বত্র তোর নিজ সত্তা দেখে অবাক্ হযে পড়্‌বি! স্থাবর জঙ্গম সমস্ত তোর আপনার সত্তা ব'লে বোধ হবে। তখন সকলকে আপনার মত যত্ন না করে থাক্‌তে পার্‌বিনি। এইরূপ অবস্থাই practical (কর্ম্মের ভিতর) বেদান্তের অনুভূতি বুঝ্‌লি? স্বামীজি আবার বলিতে লাগিলেন—তিনি (ব্রহ্ম) এক হয়েও ব্যবহারিক ভাবে বহুরূপে সাম্‌নে রয়েছেন। নাম ও রূপ এই ব্যবহারের মূলে রয়েছে। যেমন ঘটের নাম রূপটা বাদ দিয়ে কি দেখ্‌তে পাস্? এক মাটিই এর প্রকৃত সত্তা। সেইরূপ ভ্রমে ঘট পট মঠ সব ভাবছিস্ ও দেখছিস্। জ্ঞানপ্রতিবন্ধক এই যে অজ্ঞান, যাহার বাস্তব কোন

সত্তা নাই, তাই নিয়ে ব্যবহার চল্‌ছে। মাগ ছেলে দেহ মন যা কিছু সবই নামরূপ সহায়ে অজ্ঞানের সৃষ্টি। সে অজ্ঞানটা যেই সরে দাঁড়াল তখনি ব্রহ্ম-সত্তা অনুভূতি হয়ে গেল।

শিষ্য—এই অজ্ঞান কোথা হইতে আসিল?

স্বামীজি—কোথ্‌থেকে এল তা পরে বল্‌বো। তুই যখন দড়াকে সাপ ভেবে ভয়ে দৌড়ুতে লাগ্‌লি তখন কি দড়াটা সাপ হয়ে গিয়েছিল? না তোর অজ্ঞতাই তোকে অমন করে ছুটিয়ে ছিল?

শিষ্য—অজ্ঞতা হইতেই ঐরূপ করিয়াছিলাম।

স্বামীজি—তা হলে ভেবে দ্যাখ্‌—তুই যখন আবার দড়াকে দড়া ব'লে জান্‌তে পার্‌বি তখন নিজের অজ্ঞতা ভেবে হাসি পাবে কি না? তখন নামরূপ মিথ্যা ব'লে বোধ হবে কি না?

শিষ্য—তা হবে।

স্বামীজি—তা যদি হয়, তবে নামরূপ মিথ্যা হয়ে দাঁড়ালো। এইরূপে ব্রহ্মসত্তাই একমাত্র সত্য হয়ে দাঁড়ালো। এই অনন্ত সৃষ্টি বৈচিত্র্যেও তাঁর স্বরূপের কিছুমাত্র পরিবর্তন হ'লে তুই এই অজ্ঞানের মন্দান্ধকারে এটা মাগ, এটা ছেলে, এটা আপন, এটা পর ভেবে সেই সর্ব্ববিভাসক আত্মার সত্তা বুঝ্‌তে পার্‌ছিস্‌নে। যখন গুরুর উপদেশ ও নিজের বিশ্বাস দ্বারা এই নামরূপাত্মক জগৎটা না দেখে এর মূল সত্বটাই কেবল অনুভব কর্‌বি তখনি আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যস্ত তোর আত্মানুভূতি হবে। তখনি "ভিদ্যতে হৃদয় গ্রন্থি শ্ছিদ্যন্তে সর্ব্ব সংশয়াঃ" হবে। বুঝ্‌লি?

শিষ্য—বুঝেছি। কিন্তু এই অজ্ঞানের আদি অন্তের কথা জানিতে ইচ্ছা হয়।

স্বামীজি—যে জিনীসটা পরে থাকে না—সে জিনীসটা যে মিথ্যা তাত বুঝ্‌তে পেরেছিস্? যে যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞ হয়েছে সে বল্‌বে অজ্ঞান আবার কোথায়? সে দড়াকে দড়াই দেখে। সাপ বলে দেখ্‌তে পায় না। যারা দড়াকে সাপ বলে দেখে, তাদের ভয় ভীতি দেখে তার হাসি পায়। সে জন্য অজ্ঞানের বাস্তব স্বরূপ নাই। অজ্ঞানকে সৎও বলা যায় না—অসৎও বলা যায় না। "সন্নাপ্যসন্না উভয়াত্মিকান"। যে জিনীসটা এইরূপে মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন হচ্ছে, তার বিষয়ে প্রশ্নই বা কি, আর উত্তরই বা কি? ঐ বিষয়ে প্রশ্ন করাটা

যুক্তিযুক্তও হ'তে পারে না। কেন তা শোন্। এই প্রশ্নোত্তরটাও ত সেই নামরূপ বা দেশকাল ধ'রে করা হচ্চে। যে নামরূপ দেশ কালের অতীত তাকে প্রশ্নোত্তর দিয়ে কি বুঝানো যায়? এই জন্য এই শাস্ত্র মন্ত্রও ব্যবহারিক ভাবে সত্য—পারমার্থিক রূপে সত্য নয়। অজ্ঞানের স্বরূপই তা আর কি বুঝ্‌বি? যখন ব্রহ্মের প্রকাশ হবে তখন আর প্রশ্ন করবার অবসরই থাক্‌বে না। ঠাকুরের সেই "মুচী মুটের" গল্প শুনেছিস্ না? ঠিক তাই। অজ্ঞানকে যেই চেনা, অমনি সে পালিয়ে যায়।

শিষ্য—কিন্তু মহাশয় অজ্ঞানটা আসিল কোথা হইতে?

স্বামীজি—যে জিনীসটাই নাই, তা আবার আসবে কি করে? থাক্‌লে তো আস্‌বে।

শিষ্য—তবে এই জীব জগতের কি করিয়া উৎপত্তি হইল?

স্বামীজি—এক ব্রহ্মসত্তাই ত রয়েছেন। তুই মিথ্যা নামরূপ দিয়ে তাকে রূপান্তরে নামান্তরে দেখ্‌ছিস্।

শিষ্য—এই মিথ্যা নাম রূপই বা কেন? কোথা হইতে আসিল?

স্বামীজি—শাস্ত্রে এই নাম রূপাত্মক সংস্কার বা অজ্ঞতাকে প্রবাহরূপে নিত্যপ্রায় বলেছে। কিন্তু উহা সান্ত। ব্রহ্মসত্তা কিন্তু সর্ব্বদা দড়ার মত স্বস্বরূপেই রয়েছেন। এইজন্য বেদান্ত শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মে অধ্যস্ত—ইন্দ্রজালবৎ ভাসমান্। তাতে ব্রহ্মের কিছুমাত্র স্বরূপ বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই। বুঝ্‌লি?

শিষ্য—হাঁ। কিন্তু একটা কথা এখনো বুঝিতে পারিতেছি না।

স্বামীজি—কি, বল্‌না?

শিষ্য—এই যে আপনি বলিলেন এই সৃষ্টি স্থিতি লয়াদি ব্রহ্মে অধ্যস্ত তাহাদের কোন স্বরূপ সত্তা নাই। তা কি করিয়া হইতে পারে? যে যাহা পূর্ব্বে দেখে নাই সেই জিনীসের ভ্রম তাহার হইতেই পারে না। যে কখনো সাপ দেখে নাই তার দড়াতে যেমন সর্প ভ্রম হয় না, সেইরূপ যে এই সৃষ্টি দেখে নাই তার ব্রহ্মে সৃষ্টি ভ্রম হইবে কেন? সুতরাং সৃষ্টি ছিল বা আছে তাই সৃষ্টিভ্রম হইয়াছে। ইহাতেই দ্বৈতাপত্তি উঠিতেছে।

স্বামীজি—ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ তোর প্রশ্ন এইরূপে প্রথমেই প্রত্যাখ্যান করবে—যে তার দৃষ্টিতে সৃষ্টি প্রভৃতি একেবারেই প্রতিভাত হচ্ছে না। সে একমাত্র ব্রহ্মসত্তাই দেখ্‌ছে। রজ্জুই দেখ্‌ছে। সাপ দেখ্‌ছে না। তুই যদি বলিস্

দেখ, আমি তো এই সৃষ্টি বা সাপ দেখ্‌ছি—তবে তোর দৃষ্টিদোষ দূর কর্‌ত্তে তিনি তোকে রজ্জুর স্বরূপ বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করবেন। যখন এই উপদেশ ও বিচার বলে তুই রজ্জুসত্তা বা ব্রহ্মসত্তা বুঝ্‌তে পারবি তখন এই ভ্রমাত্মক সর্পজ্ঞান বা সৃষ্টিজ্ঞান নাশ হয়ে যাবে। তখন এই সৃষ্টিস্থিতিলয়রূপ ভ্রম-জ্ঞান ব্রহ্মে আরোপিত ভিন্ন আর কি বল্‌তে পারিস্? অনাদি প্রবাহরূপে এই সৃষ্ট ভাণাদি চলে এসে থাকেতো থাকুক্ তার নির্ণয়ে লাভালাভ কিছুই নাই। ব্রহ্মতত্ত্ব করামলকবৎ প্রত্যক্ষ না হলে এ প্রশ্নের পর্য্যাপ্ত মীমাংসা হতে পারে না। তখন আর প্রশ্নও উঠেনা, উত্তরেরও প্রয়োজন হয় না। এই ব্রহ্মতত্ত্বাস্বাদ তখন "মূকাস্বাদনবৎ" হয়।

শিষ্য—তবে আর এত বিচার করিয়া কি হইবে?

স্বামীজি—ঐ বিষয়টী বুঝ্‌বার জন্যই বিচার। সত্য বস্তু কিন্তু বিচারের পারে। "নৈষা তর্কেন মতি রাপণীয়া"।

ঐরূপ কথা হইতে হইতে শিষ্য স্বামীজির সঙ্গে মঠে আসিয়া উপস্থিত হইল। মঠে আসিয়া স্বামীজি মঠের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণকে অদ্যকার ব্রহ্মবিচারের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম বুঝাইয়া দিলেন। উপরে উঠিতে উঠিতে শিষ্যকে বলিতে লাগিলেন "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ" ইত্যাদি।

ইউরোপীয় দর্শনের ইতিহাস।

[শ্রীকানাইলাল পাল, এম, এ, বি, এল।]

মুখবন্ধ।

বাঙ্গালা ভাষায় ইউরোপীয় দর্শনের কোন ইতিহাস নাই। সেই অভাব পূরণ করিবার সঙ্কল্পে বন্ধুবর উপেন্দ্র নাথ উদ্বোধনে ধারাবাহিক প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু কেন জানি না যে মহৎ কার্য্যে তিনি ব্রতী হইয়াছিলেন সে কার্য্য অসম্পূর্ণ রাখিয়া আমাদিগকে শোকসাগরে ভাসাইয়া তিনি অসময়ে কোন্ অমরধামে চলিয়া গেলেন। এক বৎসর অতীত হইতে চলিয়াছে কিন্তু কাহাকেও ত এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে দেখি না, তাই নিজের শত ত্রুটি সত্ত্বেও নিজের একান্ত অযোগ্যতা স্মরণ

করিয়াও সেই উদ্দেশ্য সাধনে সাধ্যমত প্রয়াস পাইতেছি—কারণ কোন মহৎ উদ্দেশ্য নিষ্ফল হয় ইহা বড়ই আক্ষেপের বিষয়। গ্রীক দর্শনের প্রথম যুগের ইতিহাস শেষ করিয়া বন্ধুবর মধ্য যুগের ইতিহাস বলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন মাত্র। আমরা উহার পর হইতে বর্ত্তমান প্রবন্ধ আরম্ভ ক'রব।

গ্রীস দেশে কতকটা শান্তি স্থাপিত হইলে সেখানে যখন দার্শনিক চিন্তার সুবিধা জন্মে তখন এ্যানক্সোগোরাসের অভ্যুদয়। ইনিই মধ্যযুগের প্রথম দার্শনিক বলিয়া ইতিহাসে খ্যাত। ইনিই প্রথমে জড় ও চেতনের পার্থক্য কতকটা হৃদয়ঙ্গম করিয়া জড়ের উপর চৈতন্যের আধিপত্য প্রচার করেন।

এখানে পাঠককে বলা প্রয়োজন যে, পূর্ব্ববর্ত্তী দার্শনিকদিগের মতসমূহের উপর নির্ভর করিয়াই পরবর্ত্তী নূতন নূতন মতের বিকাশ হয়। সে কারণ, এ্যানাক্সোগোরাসের দার্শনিক মত জানিতে হইলে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী দার্শনিকদিগের মতামত মোটামুটী জানা আবশ্যক; সেজন্য আমরা অতি সংক্ষেপে এখানে প্রথম যুগের দার্শনিকগণের মতামত বিবৃত করিলাম। ঐ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ যাঁহারা জানিতে ইচ্ছুক তাঁহারা যেন উদ্বোধনের ১১শ বর্ষের প্রথম সংখ্যা হইতে ১২শ বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যার মধ্যগত ঐ বিষয়ক প্রবন্ধগুলি পাঠ করেন। এই বিচিত্র জগতের আদিকারণের মীমাংসা লইয়া গ্রীক দর্শনের সূচনা। জল ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করিতে সক্ষম দেখিয়া থেল্‌স্ জলকেই জগতের আদিকারণ রূপে স্থির করিলেন। কিন্তু কোন একটী পদার্থ হইতে তদ্বিপরীত গুণবিশিষ্ট ফলবিশেষের উৎপত্তি অসম্ভব; যথা, শৈত্য হইতে উষ্ণত্বের উৎপত্তি অসম্ভব—এই আপত্তি তুলিয়া এ্যানাক্সিমিনিস বলিলেন এক নির্ব্বিশেষ পদার্থই এই জগতের আদি কারণ। কিন্তু আবার নির্ব্বিশেষ পদার্থ কেমন করিয়া সবিশেষ হয় ইহা ভাল বুঝা যায় না; তাই এ্যানাক্সিম্যাণ্ডার বায়ুকে আদিকারণ বলিয়া প্রচার করিলেন। থেল্‌স্ প্রভৃতি আয়োনিক দার্শনিকগণ কারণ বলিতে কেবলমাত্র উপাদান কারণকেই বুঝিতেন। কিন্তু উপাদানই ত একমাত্র আবশ্যকীয় পদার্থ নয়; সেই উপাদান বস্তুর কোন বিশেষ ভাবে সমাবেশ ও সংস্থানাদি কি কারণে হইল তাহাও জানা দরকার। ঐ সমাবেশ সংখ্যাদ্বারা নিরূপিত হইবে—এইরূপ চিন্তা করিয়া পিথাগুরু বলিলেন "সংখ্যাই জগতের মূল"। আপাত দৃষ্টিতে জগতের বৈচিত্র্য প্রতীয়মান হয় বটে। কিন্তু বাস্তবিকই কি তাই?—ইলিয়াটিক গণের মনে এই সন্দেহ প্রথমে উদয় হয়। তাঁহারা চিন্তা করিয়া

স্থির করিলেন যে, পরিবর্ত্তন অসৎ, এবং এক অদ্বিতীয়, জন্মমরণরহিত, অসীম শক্তিশালী, অসদ্‌গুণ বর্জ্জিত, অতুলনীয় সত্তা পদার্থই যথার্থ বর্ত্তমান। হেরাক্লাইটাস কিন্তু ঠিক তদ্বিপরীত মত ব্যক্ত করিলেন। যথা—নদীর জল প্রবাহরূপে অবিরত বহিয়া চলিয়াছে—এক বিন্দু জলও স্থির নয়, অথচ নদীকে একটী পদার্থ বলিয়া মনে হয়; সেইরূপ, এ জগতে পরিবর্ত্তনই একমাত্র বর্ত্তমান; এবং অপরিবর্ত্তনীয় সত্তা বলিয়া কোন পদার্থই নাই। এম্পিডোক্লিস এই দুই বিরুদ্ধ মতের সামঞ্জস্য করিতে চেষ্টা করেন। সৎ বস্তু এক হইলে, ও সৎ বস্তুর পরিবর্ত্তন অসম্ভব হইলে জগতের বৈচিত্র্য অসম্ভব হইয়া উঠে; অথচ বৈচিত্র্যও জগতে বর্ত্তমান; সুতরাং, সৎ পদার্থ একমাত্র হইলে চলে না—এইরূপ ভাবিয়া তিনি চারিটী সৎ পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া তাহাদের সংযোগ ও বিয়োগের দ্বারা জগতের বৈচিত্র্য ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিলেন। উহাদের ঐরূপ সংযোগ বিয়োগ তাঁহার মতে "প্রীতি" ও "অপ্রীতি" নামক শক্তিবলে সাধিত হয়। তিনি জড় পদার্থ হইতে শক্তির পৃথক্ অস্তিত্ব প্রচার করিয়াছিলেন, কিন্তু "শক্তি" যে কি বা কাহাকে বলে তাহা তিনি পরিষ্কার করিয়া বলেন নাই। মনে হয় তাঁহার শক্তি যেন একটা রূপক মাত্র। পরমাণুবাদিগণ আবার তাঁহার ঐ মতে আপত্তি উত্থাপিত করিলেন যে, এই অসীম বৈচিত্র্য ৪টী মাত্র পদার্থের দ্বারা কেমন করিয়া সম্ভব হইবে? সেজন্য তাঁহারা বলিলেন—মূল পদার্থ অসংখ্য হওয়া প্রয়োজন; পরমাণু সমূহ অবকাশের দ্বারা বিযুত রহিয়াছে; পরমাণুর গুরুত্ব ও লঘুত্ব হইতে গতি জন্মে; ঐ গতির ফলে সংযোগ বিয়োগ উৎপন্ন হয় এবং তাহা হইতেই এই বৈচিত্র্য সমুদ্ভূত হয়। গ্রীসের প্রথম যুগের দার্শনিকদিগের মত সংক্ষেপে বলা হইল। এইবার আমরা মূল প্রবন্ধের অবতারণা করিব।

এনাক্সাগোরাস।

জীবনী।

এসিয়া মাইনরের অন্তর্গত ক্লেজোমিনি নগরে (Clazomenæ) নগরে প্রায় ৫০০ খ্রীঃ পূর্ব্বাব্দে, এ্যানাক্সা গোরাসের (Anaxagoros) জন্ম হয়। তিনি এম্পিডোক্লিস (Empedocles) ও লুসিপ্পাসের (Leuceppus) সমসাময়িক বলিয়া ইতিহাসে উল্লিখিত হন। তাহার যথেষ্ট ধন সম্পত্তি ছিল

এবং রাষ্ট্রব্যাপারে কিঞ্চিৎ প্রভাবও পরিলক্ষিত হইত, কিন্তু জ্ঞান উপার্জ্জনের নিমিত্ত তিনি সে সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া এথেন্স নগরে গমন করেন। এথেন্স নগরে যাইবার কারণ,—তখন সেই নগরী সমধিক সমৃদ্ধিশালী ছিল এবং তথায় জ্ঞানচর্চ্চার বিশেষ সুবিধা ছিল। এখানে তিনি প্রায় ৩০ বৎসর যাবৎ বাস করেন, এখানেই তাঁহার (Perecles) পেরিক্লিস ও (Eurepidis) ইউরিপিডিসের সহিত বিশেষ বন্ধুত্ব হয়। এখানে অনেক কাল বাসের পর তিনি এক সময়ে জনসাধারণের কুসংস্কারপূর্ণ ভ্রান্তমতের প্রতিবাদ করায় দেবদ্বেষী ও নিরীশ্বরবাদী বলিয়া অভিযুক্ত হন। পেরিক্লিস নিজ অদ্ভুত বাগ্মীতাপ্রভাবে জনসাধারণকে মুগ্ধ করিয়া তাঁহাকে তখন রক্ষা করিতে যথেষ্ট চেষ্টা করিলেও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ফলে তিনি এথেন্স নগর পরিত্যাগ করিয়া ল্যাম্পসেকাস (Lampsacus) নগরে পলাইয়া যাইতে বাধ্য হন। এথেন্স নগরের গুণী লোক সকল কিন্তু তাঁহাকে বিশেষ সমাদর করিত। অঙ্কশাস্ত্রে ও জ্যোতিষ বিদ্যায় তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি থাকাই ঐ সমাদর লাভের অন্যতম কারণ। কথিত আছে তিনি কঠোর ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করিতেন সে কারণেও লোকে তাঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিত। ল্যাম্পসেকাস নগরে তিনি অল্পদিন মাত্রই জীবিত ছিলেন। প্রায় খ্রীঃ পূঃ ৪২৮ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

দর্শন।—

পূর্ব্ববর্ত্তী দার্শনিকগণ জগতের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত ছিলেন। তাঁহারা জড় পদার্থ বা জড় শক্তি বিশেষের দ্বারা এই জগদ্ব্যাপারের মীমাংসা করিতে চেষ্ট করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সুব্যবস্থিত সুশৃঙ্খলাপূর্ণ সুনিয়মিত জগত কি কেবলমাত্র জড় বস্তু বা জড় শক্তির পরিণতি?—ইহা অসম্ভব। এইরূপ ভাবনায় পরিচালিত হইয়া তিনি প্রথমে প্রচার করিলেন জগদ্ব্যাপার এক চেতন শক্তির দ্বারা নিয়মিত। এনাক্সাগোরাস ইলিয়াটিক দার্শনিকদিগের মতানুসারে সৎ পদার্থের পরিবর্ত্তন অসম্ভব, এই তত্ত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। অথচ বৈচিত্র্যও তিনি মানিতেন। ফল কথা এম্পিডোক্লিসের দার্শনিক মতের উপরেই তিনি নিজ মত প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কিন্তু এম্পিডোক্লিসের মতের বিরুদ্ধে পরমাণুবাদিগণ যে আপত্তি তুলিয়াছিলেন তিনি সেই আপত্তি উত্থাপিত করিয়া বলিলেন যে সৎ পদার্থ কেবলমাত্র চারিটী নয়—অসংখ্য। সেই অসংখ্য পদার্থের সংযোগ ও বিয়োগে এই

বৈচিত্র্যের সৃষ্টি। সৃষ্টি বা বিনাশ, এই সংযোগ ও বিযোগ ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই সৎপদার্থকে তিনি "বীজপদার্থ" (seeds of things) আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে এই বীজপদার্থসমূহ আদিম অবস্থায় পুঞ্জীভূত হইয়া একাকারিতরূপে বর্ত্তমান ছিল। তখন কোন নিয়ম বা কোনরূপ শৃঙ্খলা ছিল না। একপ্রকার অব্যবস্থিত অবস্থায় বীজপদার্থসমূহ তখন অরাজকের রাজত্বে বাস করিত। এই বীজপদার্থ শক্তিহীন জড়পদার্থ মাত্র। সুতরাং তাহা হইতে স্বতঃ সুব্যবহিত জগতের উৎপত্তি অসম্ভব। অতএব এক চেতনশক্তি না থাকিলে কে এই সুন্দর জগৎ সৃষ্টি করিবে? এই "বীজপদার্থ" ও "চেতনশক্তি" বলিতে তিনি কি বুঝিতেন তাহাই এখন আমরা বিবৃত করিতে চেষ্টা করিব।

বীজ পদার্থ।—

এনাক্সাগোরাসের মতে যে পদার্থ নিজ অস্তিত্ব পৃথক্‌ভাবে বজায় রাখিতে সক্ষম তাহাই বীজপদার্থ। এই বীজপদার্থের প্রতি অংশে—যতই সূক্ষ্মতম অংশ হউক না কেন—সমজাতীয় বা একই প্রকার গুণ পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং তাঁহার মতে অস্থি স্বর্ণ কাষ্ঠ এক একটী বীজপদার্থ। এই অসংখ্য প্রকারের বীজপদার্থ অনাদিকাল হইতেই বর্ত্তমান। তাহাদের উৎপত্তি নাই, বিনাশ নাই, পরিণাম নাই (কারণ তাহারা সৎ পদার্থ)। উহারা প্রত্যেকে অনন্ত পরিমাণে বিভাজ্য এবং বর্ণগত, আকৃতিগত ও স্বাদগত ভেদে পরস্পর পরস্পর হইতে বিভিন্ন। এক প্রকারের বীজ অন্য প্রকারের বীজ হইতে একেবারে সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন। আদিম অবস্থায় এই বীজপদার্থসমূহ অতি সূক্ষ্মাকারে বর্ত্তমান ছিল। সেই বিশৃঙ্খলার রাজত্বে তাহাদের পৃথক্ অস্তিত্ব জ্ঞানগোচর ছিল না। চেতন-শক্তির প্রভাবে যখন সমজাতীয় বীজপদার্থসমূহ বিষম জাতীয় বীজপদার্থ হইতে কতকটা বিযুক্ত হইয়া পড়িল তখনই তাহাদের পৃথক্ অস্তিত্ব জ্ঞানগোচর হইল। কিন্তু সেই আদিম অবস্থায় তাহাদের পৃথক্ অস্তিত্ব মানবজ্ঞানের অগোচর থাকিলেও তাহাদের নিজত্ব বা পার্থক্য লোপ পায় নাই—তাহারা তাহাদের পৃথক্ গুণ সর্ব্বথা বজায় রাখিয়াছিল; কারণ তাঁহার মতে সৎপদার্থের গুণগত পরিণাম হওয়া একেবারে অসম্ভব—সুতরাং বিশৃঙ্খলার রাজ্যে তাহাদের চিনিয়া লওয়াই শুধু দুঃসাধ্য ছিল। তাহার পর সেই সূক্ষ্মাকারে বর্ত্তমান বীজপদার্থসমূহ চেতন-শক্তির বলে সমজাতীয় বীজপদার্থের সংযোগে বিষম

জাতীয় বীজপদার্থ হইতে পৃথক্ হইয়া যাইলেও সম্পূর্ণরূপে বিযুক্ত হইতে পারে নাই; সেই হেতু প্রতি পদার্থেই সমস্ত পদার্থের বীজ ন্যূনাধিক পরিমাণে বর্ত্তমান। তবে যে পদার্থে যে বীজের আধিক্য থাকে সেই বীজ অনুসারে সেই পদার্থের নামকরণ হয় এইমাত্র। ইলিয়াটিক দার্শনিকগণের মতানুসারে এনাক্সাগোরাস অবকাশের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন না। কোন একটী বীজপদার্থ যখন অপর একটী বীজপদার্থের সহিত সংযুক্ত হয় তখন সেই বীজপদার্থের পরিত্যক্ত স্থল অপর একটী বীজ আসিয়া অধিকার করে। পরমাণুবাদিগণের মতে—পরমাণু অবিভাজ্য; উহাদের গুণগত কোন ভেদ নাই এবং অবকাশের দ্বারা পরস্পর পরস্পরে বিযুক্ত। সুতরাং পরমাণুবাদিগণের "পরমাণু" হইতে এনাক্সাগোরাসের "বীজপদার্থের" পার্থক্য বেশ বুঝা গেল। এইবার চেতন-শক্তি বলিতে তিনি কি বুঝিতেন দেখা যাউক।

জগতের মধ্যে শিল্পচাতুর্য্য দেখিয়া তিনি এক চেতন শক্তিমান পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। কিন্তু সেই চেতন-শক্তি, স্বাধীন না হইলে জগতের উপর আধিপত্য করিয়া নিয়মের রাজত্ব স্থাপন করিতে পারে না; অদ্বিতীয় না হইলে, বীজপদার্থসকলের মধ্যে শৃঙ্খলা আনয়ন করা উহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠে; অবিমিশ্র না হইলে, জড় পদার্থে তাহাকেই আবদ্ধ হইয়া পড়িতে হয়, অথবা জড়ের উপর উহার আর আধিপত্য করা চলে না, আবার অসীম শক্তিশালী না হইলে, অসংখ্য প্রকারের বীজপদার্থকে নিয়মিত করিতে পারে না, এবং অনন্তজ্ঞানসম্পন্ন না হইলে, সুন্দর নিয়ম প্রতিষ্ঠা করা উহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়ে। বীজপদার্থে গুণগত অবয়বগত ভেদ আছে; কিন্তু চেতন-শক্তি নিরবয়ব ও নির্গুণ না হইলে বীজপদার্থসকলেরই অন্তর্গত অন্যতম হইয়া পড়ে। এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই তিনি প্রচার করিলেন যে, চেতন-শক্তি নির্গুণ, নিরবয়ব, অদ্বিতীয়, অনন্তজ্ঞানসম্পন্ন অসীম-শক্তিশালী ও স্বাধীন বিশুদ্ধ পদার্থবিশেষ। বীজপদার্থের ন্যায় এই চেতন-জাতিও অনাদিকাল হইতে অতি সূক্ষ্মাকারে বর্ত্তমান। জগদ্ব্যাপার ব্যাখ্যা করিবার জন্য এনাক্সাগোরাসের এই চেতনশক্তি স্বীকার করা প্রয়োজন হইয়াছিল; কিন্তু চেতন বলিতে কি বুঝায়, তিনি পরিষ্কাররূপে বুঝিয়াছিলেন কি না বলা যায় না। কারণ, কখনও তিনি বলেন, এই চেতন-শক্তি আপন সত্তায় আপনি বর্ত্তমান এবং আপনার

জ্ঞানে আপনি দীপ্তিমান্; আবার কখনও বলেন, এই চেতনশক্তি কোন কোন পদার্থে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় বিদ্যমান, আর সেই পরিমাণের তারতম্য-হেতু উচ্চ নীচ জীবের মধ্যে ভেদ লক্ষ্য হয়।

আবার কখন কখন তিনি এই শক্তির ক্রিয়াকে ভৌতিক ক্রিয়ার অনুরূপ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন! কারণ, তাঁহার মতে এই শক্তি হইতেই প্রথমে বীজপদার্থে গতিশক্তি উৎপন্ন হয়। চেতনশক্তির মধ্যে এইরূপ বিরুদ্ধ গুণ ও ধর্ম্মের আরোপ দেখিয়া মনে হয়, তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী দার্শনিকগণের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট থাকিতে না পারিয়াই ঐ চেতনশক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু স্বীকার করিয়াও পূর্ব্ব দার্শনিকগণের মতের প্রভাব এড়াইতে সক্ষম হন নাই। ফলে তাঁহার মতে ঐরূপ বিরোধের উৎপত্তি। সেজন্যই আবার দেখিতে পাওয়া যায় যে,যেখানে বৈজ্ঞানিক উপায়ে মীমাংসা সম্ভব সেখানে তিনি আর চেতনশক্তির কোন অপেক্ষা রাখেন নাই। এনাক্সাগোরাস ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতেন কি না, নিশ্চয় বলা যায় না। কোন কোন ঐতিহাসিক তাঁহার মতালোচনা করিতে যাইয়া স্থির সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন যে, তাঁহার এই চেতনশক্তিই ঈশ্বর। কিন্তু এই শক্তির সহিত বীজপদার্থের কিরূপ সম্বন্ধ, সে বিষয়ে তিনি নিরুত্তর। তাঁহার মতালোচনা করিলে মনে হয়, তাঁহার চেতনশক্তি যেন একটী বাহ্য যন্ত্রবিশেষ—দূর হইতে জগৎকে নিয়মের পথে চালিত করিতেছে মাত্র! যেন উহার পৃথক্ অস্তিত্বের অন্য কিছু বিশেষ প্রয়োজন নাই—তবে, ঐরূপ কিছু একটার অবতারণা না করিলে আমাদের সিদ্ধান্তটা খাড়া হয় না, কাজেই উহা স্বীকার করিতে হয়—পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা যাহাকে Deus ex machina বলিয়া থাকেন, সেইরূপ একটা পদার্থ!

সৃষ্টিতত্ত্ব।—এই "বীজপদার্থ" ও "চেতনশক্তি" হইতে কিরূপে জগতের উৎপত্তি হইল, তাহাই এইবার আলোচ্য।

পূর্ব্বকথিত চেতনশক্তি প্রথমতঃ ঐ একাকারিত বীজপদার্থপুঞ্জের মধ্যে একটী বিন্দুবিশেষকে আশ্রয় করিয়া ঘূর্ণায়মান গতি উৎপন্ন করে। সেই গতি ক্রমশঃ বর্দ্ধিত ও বিস্তৃত হইয়া ঐ পদার্থপুঞ্জের এক পরিধি হইতে অপর পরিধি পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইতে থাকে। ঐ গতির ফলে স্থূল সূক্ষ্ম, শীত উষ্ণ, আলোক অন্ধকারাদি দ্বন্দ্ব বা যুগ্ম ভাবসমূহ উৎপন্ন হয়। উহাদের পরস্পরের সংযোগ-বিয়োগে Ether ইথর ও Air বায়ু উৎপন্ন হয়। ইথর

লঘু সূক্ষ্ম ও উষ্ণ পদার্থ। Air বা বায়ু গুরু স্থূল ও শীতল পদার্থ। পরে ক্রমশঃ বাষ্প, জল, ক্ষিতি প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। আবার সেই গতির বলেই কালে পৃথিবী হইতে বিযুক্ত হইযা প্রস্তরপিণ্ডসকল সূর্য্য, চন্দ্র,গ্রহ, তারা রূপে ক্রমশঃ বিরাজ করিতে থাকে। বর্ত্তুলাকার চোঙের ন্যায় এই পৃথিবী বিশ্বজগতের মধ্যে বর্ত্তমান। পৃথিবীর বহির্দ্দেশে চন্দ্র অবস্থান করিতেছে; এবং এতদুভয়ের মধ্যস্থলে অন্য বীজপদার্থসমূহ রহিয়াছে। ঐ পদার্থ সকল চন্দ্র ও পৃথিবীর মধ্যে আসিলে চন্দ্রগ্রহণ হয়। সূর্য্য ও পৃথিবীর মধ্যে চন্দ্র অবস্থান করিতেছে। চন্দ্র তাহাদের মধ্যস্থলে আসিয়া পড়িলে সূর্য্যগ্রহণ হয। প্রত্যক্ষগোচর সূর্য্য হইতে বাস্তবসূর্য্য অনেক বড়—কত বড়, তাহা তিনি বলেন নাই। চন্দ্রে পর্ব্বত ও নদীসমূহ বর্ত্তমান এবং সেখানেও জীব বাস করে। চন্দ্রে জীবাদি বর্ত্তমান থাকায তাহার দীপ্তি হ্রাস হইয়াছে। সূর্য্যের দীপ্তি প্রতিবিম্বিত করিয়াই চন্দ্রের দীপ্তি। সূর্য্য এক বৎসরে ও চন্দ্র এক মাসে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে। দূরত্বের জন্য গ্রহ তারকার উষ্ণতা অনুভব হয না। তাহাদের দীপ্তিও সূর্য্যের দীপ্তি হইতে উৎপন্ন। সূর্য্য চন্দ্র পৃথিবীকে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে প্রদক্ষিণ করে। এই পৃথিবী, সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, তারা প্রভৃতি সমস্ত পদার্থ এক বিশ্বজগতের অন্তর্গত। এই পৃথিবীর বহির্দ্দেশে অসংখ্য বীজপদার্থ একাকার অবস্থায় এখনও বর্ত্তমান। চেতনশক্তির প্রভাবে তাহারা ক্রমশঃ সুব্যবস্থিত হইতেছে। এই বিশ্বজগতের বাহিরে কিছুই নাই।

জীব।—চেতনশক্তি সাধারণতঃ বীজপদার্থ হইতে একেবারে অবিমিশ্র হইলেও কোন কোন পদার্থে বর্ত্তমান। কিরূপ ভাবে বর্ত্তমান, এনাক্সাগোরাস কিছু স্পষ্ট করিযা প্রকাশ করেন নাই। এই চেতনশক্তির তারতম্য অনুসারে জীবসমূহের তারতম্য। উদ্ভিদ পদার্থে এই চেতনশক্তি অতি অল্প পরিমাণে বর্ত্তমান। জীবনীবীজ আকাশে ভাসমান থাকে। পরে বৃষ্টির সহিত পৃথিবীকে আশ্রয করে। এইরূপে মৃত্তিকা হইতে জীব ও উদ্ভিদের সৃষ্টি হয়।

বীজপদার্থসমূহের পরস্পর ভেদ হইতেই জ্ঞান জন্মে; যথা, অন্ধকারের প্রতিযোগিতায় আমরা আলোক অনুভব করি। আপাতদৃষ্টিতে যাহা দেখি, তাহা অনেক সময়ে ভ্রান্ত জ্ঞান হয়। কারণ ইন্দ্রিয়সমূহ, কোনও বিশেষ বস্তু কি প্রকারের পদার্থবীজের সংযোগে

উৎপন্ন হইয়াছে তাহা ধরিতে যাইয় অনেক সময় ভুল করিয়া বসে। আমাদের ভিতরে অবস্থিত ঐ চেতনশক্তির বলেই আমরা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগত (phenomenon) ইন্দ্রিয় দ্বারা জানিতে পারি। পারমার্থিক সত্য কিন্তু ঐরূপে জানা যায় না। উহা তাঁহার মতে বিশুদ্ধ জ্ঞানের বিষয়। আপাত-দৃষ্টিতেই বোধ হয়—পদার্থের উৎপত্তি ও বিনাশ আছে; কিন্তু বিশুদ্ধ বা পারমার্থিক জ্ঞানবলে জানিতে পারা যায় যে, পরিবর্ত্তন পরিণামাদি ভাবসমূহ মিথ্যা। তিনি ইন্দ্রিয়লভ্য জ্ঞানকে হেয় মনে করিতেন; এবং বিশুদ্ধ জ্ঞানলাভ মানবের কেবলমাত্র সাধনা দ্বারা সম্ভব বলিতেন। শুনিতে পাওয়া যায়, তিনি বরফকে কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া প্রচার করিতেন! কারণ, বরফ জল হইতে উৎপন্ন, এবং জল কৃষ্ণবর্ণ! সমুদ্রজল নীলবর্ণ দেখায় বলিয়াই বোধ হয় তিনি জল কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া ধারণা করিয়াছিলেন! সে যাহাই হউক, ঐ পারমার্থিক বা বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভের জন্য তিনি যে, ধনমানাদি সমস্ত পার্থিব সুখ ত্যাগ করিয়াছিলেন, একথা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। আমরা ঐ সম্বন্ধে ইতিহাসে লিপিবদ্ধ তাঁহার নিজ উক্তিই প্রমাণস্বরূপে উদ্ধৃত করিয়া এ প্রবন্ধ শেষ করি—"To Philosophy I owe my worldly ruin and my soul's prosperity.

মধ্যার্জ্জুনে শঙ্কর।

[শ্রীমতী—]

কেরল দেশ হইতে রামেশ্বরের পথে প্রাচীন চোল রাজ্য। এই রাজ্যের রাজধানী হইতে কিয়দ্দূরে মধ্যার্জ্জুন নামে একটী শৈবতীর্থ আছে। দেবাদিদেব মহাদেবের নামানুসারে তীর্থসংলগ্ন নগরটীও মধ্যার্জ্জুন নামে অভিহিত। এস্থানে অনেক সদ্ব্রাহ্মণের বাস। ব্রাহ্মণেরা নিষ্ঠাবান্ গৃহস্থ এবং অনেকেই পণ্ডিত। তাঁহাদের সদাচার এবং বিদ্যানুরাগ দেখিয়া মনে হয়, তাঁহারা রাজধানীর বিলাস-সুখ ও কোলাহল ছাড়িয়া স্বধর্ম্মনিষ্ঠার জন্যই যেন এস্থানে নির্জ্জন বাস করিতেছেন।

ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতির মধ্যে এখানে বণিক জাতিই প্রধান। তাঁহারাও ধর্ম্মাচরণ ও সৎসঙ্গাভিলাষেই যেন তীর্থবাসী।

নগরে প্রবেশ করিতেই রাস্তার দুই পার্শ্বে সারি সারি তাল নারিকেল ও

সুপারীগাছ। গাছগুলির আশে পাশে নগরবাসীর গৃহ দেখা যায়। নগরের প্রধান পথসকল, পথিককে নগরমধ্যস্থলে অবস্থিত শিবমন্দিরের দিকে লইয়া যায়।

প্রাচীর-বেষ্টিত ও বৃহৎ প্রাঙ্গণমধ্যস্থ সুন্দর নাটমন্দিরসংযুক্ত সুবৃহৎ শিবমন্দির পথিকমাত্রেরই চিত্তাকর্ষক। মন্দিরপ্রাঙ্গণটী প্রস্তরগঠিত। উহার এক প্রান্তে সুশীতল সলিল-পূর্ণ স্বচ্ছ সরোবর। সরোবরের চারিদিকে শান-বাধান সোপানশ্রেণী।

মন্দির-মধ্যে মধ্যার্জ্জুন শিবলিঙ্গ বিরাজমান, পাদদেশে কালী তারা প্রভৃতি বিগ্রমূর্ত্তি শিবপূজা করিতেছেন। মন্দিরের সৌন্দর্য্য ও গাম্ভীর্য্য দর্শকগণের মনোমুগ্ধকর।

মাতৃসৎকার অন্তে আচার্য্য শঙ্কর দিগ্বিজয়ার্থ বহির্গত হইয়া একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে মধ্যার্জ্জুনে উপস্থিত হইলেন। সঙ্গে তাঁহার শতাধিক সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী, এবং অনুচর-বেষ্টিত কর্ণাট উজ্জয়িনীর বিরক্ত-চিত্ত নরপতি সুধন্বারাজ।

সন্ন্যাসীদিগের পরিধান গেরুয়া বস্ত্র, মস্তক মুণ্ডিত এবং হস্তে দণ্ড কমণ্ডলু। ব্রহ্মচারিগণের পরিধান শুভ্রবস্ত্র, মস্তকে রুক্ষকেশ, কাহারও বা জটাভার। সকলেরই কক্ষদেশে মৃগ বা ব্যাঘ্রচর্ম্ম অথবা কুশাসন; এবং শাস্ত্রগ্রন্থ ও পুঁথিসকল উত্তরীয়ে বাধা, পৃষ্ঠদেশে ঝুলিতেছে। তাঁহাদের ধূলি-ধূসরিত নগ্নপদ দেখিলে বোধ হয়, তাঁহারা বহু দূর হইতে আসিতেছেন।

সুধন্বারাজের রাজবেশ নাই। তিনি বানপ্রস্থবেশে সর্ব্ববিধ ভোগবাসনা ত্যাগ করিয়া আচার্য্যের দেহরক্ষার নিমিত্ত তাঁহার অনুগমন করিতেছেন। রাজভক্ত অনুচরেরা প্রভুর বৈরাগ্যভাব দেখিয়া বিমর্ষচিত্তে যেন নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালন করিতেছে মাত্র।

আচার্য্যদেব মন্দির-সম্মুখে আসিয়া উদ্দেশে ভগবান্‌কে প্রণিপাত করিলেন এবং স্নানার্থ সরোবরতীরে উপস্থিত হইলেন।

সন্ধ্যা-সমাগমের বড় বিলম্ব নাই। মধ্যার্জ্জুন শিবমন্দিরে দুই একটী করিয়া নগরবাসীর আগমন হইতে লাগিল। ক্রমে সরোবরতীরে বেশ জনতা হইল। নিত্য সন্ধ্যাকালে এই স্থানে অধিকাংশ নগরবাসী শিবারতি দর্শনের জন্য সমবেত হয়েন।

সরোবরে ব্রাহ্মণেরা কেহ কেহ স্নান করিতেছেন, কেহ বা সন্ধ্যাহ্নিকের

উদ্যোগ করিতেছেন। কেহ কেহ সোপানে বসিয়া শাস্ত্রালাপে রত, কেহ বা চিন্তামগ্নভাবে বসিয়া আছেন। অদূরে বসিয়া যুবকের দল পরস্পরে হাস্যপরিহাসে নিমগ্ন, কখনও বা বাক্‌বিতণ্ডায় ব্যস্ত। দুষ্ট বালকেরা সরোবরে নামিয়া স্বচ্ছ সলিলরাশি পঙ্কিল করিয়া উচ্চহাস্যে সরোবর প্রতিধ্বনিত করিতেছে। মধ্যে মধ্যে গৃহস্থ-রমণীরা কলসীকক্ষে জল লইতে আসিতেছেন। তাঁহাদের অঞ্চল ধরিয়া ২।৪টী বালক বালিকা পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে। এইরূপে সেই নির্জ্জন মন্দির-প্রাঙ্গণ ক্ষণকালের জন্য গৃহস্থের আবাসভূমিতে পরিণত হইল।

এমন সময় তথায় শতাধিক সন্ন্যাসী দেখিয়া সকলেই চমকিত হইলেন। ব্রাহ্মণগণ ও যুবকেরা সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বালকেরা ত্রস্তভাবে জল হইতে উঠিল। গৃহস্থরমণী সলজ্জভাবে তাঁহাদের প্রতি একবার দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন। সন্ন্যাসীরা কিন্তু আনতদৃষ্টিতেই সরোবরে নামিয়া স্নানাদি করিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসীর পশ্চাতে সশস্ত্রপ্রহরীবেষ্টিত সুধন্বারাজকে দেখিয়া নগরবাসী বিস্ময়ে মগ্ন হইল। কেহ কেহ বা ভীত হইল। সুধন্বারাজ সরোবরতীরে বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। অনুচরেরা ইতস্ততঃ ভ্রমণে রত হইল।

আচার্য্য স্নানান্তে সশিষ্যে ধীরে ধীরে মন্দিরাভিমুখে চলিলেন। সুধন্বারাজও আচার্য্যের সহগামী হইলেন। তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বহুলোক মন্দিরে চলিল। ক্ষণপরে দেবাদিদেবের আরতি আরম্ভ হইল। নগরের অধিকাংশ স্ত্রী পুরুষ বালক বালিকা আরতি দেখিতে আসিল। চারিদিকে প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত হইল।

আচার্য্যদেব, মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সে সময় মন্দিরগৃহ ধূপ ধূনার পবিত্র গন্ধে ও সদ্যপ্রস্ফুটিত পুষ্পের সৌরভে আমোদিত হইতেছে। তন্মধ্যে শ্বেতচন্দনচর্চ্চিত, পুষ্পমাল্যবিভূষিত, বিল্বপত্রশোভিত, কর্পূরালোকে আলোকিত ভগবন্মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে দিব্যভাবের উদয় হইল। তিনি একস্থানে বসিয়া মনে মনে জ্ঞানোপচারে শিবের পূজা করিতে করিতে সমাধিস্থ হইলেন।

কতক্ষণ পরে আরতি সম্পূর্ণ হইল। আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই ভক্তিভাবে ভগবানের উদ্দেশে প্রণিপাত করিয়া গৃহে ফিরিলেন। কতকগুলি ব্যক্তি সন্ন্যাসী দেখিবার জন্য কৌতূহল চিত্তে দাঁড়াইয়া রহিল। আরতি-

শেষে আচার্য্যের সমাধিভঙ্গ হইল। তিনি শিষ্যগণকে লইয়া নাট মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

পুরোহিতেরা আরতি শেষ করিয়া বাহিরে আসিয়া যাহা দেখিলেন তাহা অপূর্ব্ব। দেখিলেন, এক তেজপূর্ণ সন্ন্যাসীকে বেষ্টন করিয়া শতাধিক সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী উপবিষ্ট। তাঁহাদের চারিদিকে একদল সশস্ত্র রাজপ্রহরী মশাল হস্তে দণ্ডায়মান। মন্দিরে সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীর আগমন সর্ব্বদাই ঘটিয়া থাকে। তথাপি প্রহরীবেষ্টিত শতাধিক সন্ন্যাসীর সমাগম অপূর্ব্ব বটে।

গৈরিক-পরিহিত, সুদীর্ঘ, সবল, সুকুমার, স্বর্ণবর্ণ দেহ, প্রশস্ত ললাটে ত্রিপুণ্ড্র রেখা,আয়ত নয়নে দিব্য জ্যোতিঃ,প্রসন্ন গম্ভীর আননে মহান্ ভাব—কে এই সন্ন্যাসিবর? তাঁহারা বিস্ময়বিস্ফারিতনয়নে সন্ন্যাসীর প্রতি চাহিয়া রহিলেন। সন্ন্যাসীর পরিচয় জিজ্ঞাসা প্রথা নয়। সুতরাং সকলে সুধন্বারাজের অনুচরদিগের নিকট চুপি চুপি আচার্য্যের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন; এবং পরিচয় শুনিয়া সকলে ভয়-ভক্তি-বিস্ময়ে পুনঃ পুনঃ তাঁহার দিকে চাহিতে লাগিলেন।

মন্দিরের প্রধান পুরোহিত সকলকে যথেষ্ট আদর অভ্যর্থনা করিলেন। তাঁহাদের আহারের নিমিত্ত নগরবাসীরা কেহ কেহ দুগ্ধ ফলমূল মিষ্টান্ন প্রভৃতি লইয়া আসিলেন। পুরোহিতগণের চেষ্টায় যথেষ্ট আহার্য্য দ্রব্য সংগ্রহ হইল। আচার্য্য সামান্য দুগ্ধমাত্র পান করিলেন। ফলমূল মিষ্টান্নাদি অন্যান্য সকলে ইচ্ছামত গ্রহণ করিলেন। সুধন্বারাজও অনুচর সহ সে রাত্রে তথায় রহিলেন। তাঁহারও যত্নের কোন ত্রুটি হইল না। পরদিন প্রাতে সুধন্বারাজের অনুচরেরা নগরমধ্যে শিবির সংস্থাপন করিল। মহারাজ অনুচরসহ তথায় কয়েকদিন থাকিবেন, স্থির হইল।

অবিলম্বে আচার্য্যের আগমনসংবাদ নগরময় রাষ্ট্র হইল।

সে সময় আচার্য্যের কীর্ত্তিকলাপ ভারতব্যাপী। সুতরাং তাঁহার নাম শুনিয়া ক্ষুদ্রনগরে বড় কোলাহল পড়িয়া গেল। পণ্ডিতেরা মন্দিরে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে লাগিলেন। কেহ বলিলেন "ভগবন্, আমাদের বড় সৌভাগ্য যে আপনি এস্থানে পদার্পণ করিয়াছেন।" কেহ বা "মহাত্মন্, যদি আসিয়াছেন কৃপা করিয়া কিছুদিন এস্থানে বাস করুন; আমরা আপনার উপদেশাদি শ্রবণ করিব" এইরূপ বলিয়া সৌজন্য প্রকাশ

করিলেন। উত্তরে আচার্য্য কহিলেন "মহাত্মন, ভগবৎআদেশে আমি এস্থানে আসিয়াছি। তাঁহার প্রসাদেই আপনাদের বাসনা পূর্ণ হইবে।

স্ত্রীলোকেরা মধ্যার্জ্জুনদর্শনে আসিয়া ভক্তিভাবে আচার্য্যদেবকে দর্শন করিয়া গেল। কেহ বলিল "আহা কি রূপ! যেন সাক্ষাৎ শিব." কেহ বা 'আচার্য্যি ঠাকুরের' অল্প বয়স দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেল কোন রমণী ব্রহ্মচারীদের জটা ও সন্ন্যাসীর মুণ্ডিত মস্তকের পার্থক্য কি,বুঝিতে না পারিয়া কোন প্রবীণা রমণীকে এ বিষয় জিজ্ঞাসা করিল। তিনি কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন "ব্রহ্মচারীরা নিশ্চয় 'ঠাকুরের' কাছে চুল দিতে আসিয়াছে, কিছু মানত আছে বোধ হয়।" তখন সকলেই স্থির করিলেন তাহাই সম্ভব, নচেৎ একেবারে এত সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীর দল এস্থানে কেন আসিবে।

বালকেরাও নিশ্চিন্ত নহে। আজ আর তাহারা মন্দির-প্রাঙ্গণ ত্যাগ করিতেছে না, সকলেই হাঁ করিয়া সন্ন্যাসীদের দেখিতেছে। যদি সন্ন্যাসী ঝুলির ভিতর পুরিয়া লয় এই ভয়ে তাহারা দূরে দাঁড়াইয়া আছে। সন্ন্যাসী দেখিয়া দেখিয়া যখন তাহা পুরাতন হইয়া গেল, তখন তাহারা একছুটে সুধন্বারাজের শিবির-সম্মুখে উপস্থিত হইল।

সাধু সন্ন্যাসী দেখিলেই লোকে নানা উদ্দেশ্যে তাহার নিকট যাওয়াআসা করিয়া থাকে। এ ক্ষেত্রেও তাহার অন্যথা হইল না। প্রত্যহ সকাল হইতে গভীর রাত্রিপর্য্যন্ত মন্দিরে লোক-সমাগম হইতে লাগিল।

প্রাতে আচার্য্য অপরাপর ব্যক্তির সহিত বড় কথা কহিতেন না, স্নান নিত্যকর্ম্ম ও অধ্যাপনাতেই ব্যাপৃত থাকিতেন। মধ্যাহ্নে ভিক্ষা গ্রহণ করিতেন এবং প্রায়ই একাকী অবস্থান করিতেন।

অপরাহ্নে তিনি মন্দির-প্রাঙ্গণে মন্দিরের ছায়াতলে বসিয়া থাকিতেন, এবং সকলের সহিত বাক্যালাপ করিতেন।

প্রাচীন পণ্ডিতেরা তাঁহার নিকট বসিয়া নানাবিধ প্রশ্ন করিতেন। তিনিও সহজ ভাবে তাঁহাদের সুন্দর উপদেশ প্রদান করিতেন।

এইরূপে দুই একদিনের ভিতর ক্রমেই বহুলোক তথায় সমবেত হইতে লাগিল। আচার্য্য-সঙ্গ এমনই মধুর যে, যে ব্যক্তি একবার তাঁহার নিকট আসে, সে পরদিন আর পাঁচজনকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসে। ক্রমে নিত্য অপরাহ্নে মন্দির-প্রাঙ্গণে একটী বৃহৎ সভা হইতে লাগিল।

এই সভায় পণ্ডিত, মূর্খ, ধনী, দরিদ্র, ব্রাহ্মণ, বণিক প্রভৃতি সকল প্রকার

লোকই উপস্থিত হইত। মধ্যে মধ্যে ২।১ টী বৃদ্ধা স্ত্রীলোক ও বালক বালিকা কৌতূহলচিত্তে দূর হইতে সভা দর্শন করিত।

আচার্য্যের উপদেশ শুনিয়া দুই চারিদিনের মধ্যেই মধ্যার্জ্জুনবাসী পণ্ডিতগণের মধ্যে মহা কোলাহল উপস্থিত হইল। তাঁহার অদ্বৈতমতের উপদেশ শুনিয়া অনেকেই বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। আচার্য্য-মতের সহিত তাঁহাদের কোনরূপেই ঐক্য হইল না।

তাঁহাদের বিশ্বাস এক শিব ও শক্তিই জগতের স্রষ্টা পাতা ও লয়কর্ত্তা। অন্য দেবদেবীর আরাধনা নিরর্থক। জীব, শিব ও শক্তির আরাধনা করিয়া অন্তে তাঁহাদের সান্নিধ্য-সুখ ভোগ করিতে পাইলেই কৃতার্থ হয়; ইহা ভিন্ন জীবের আর কামনা করিবার কিছুই নাই। বৈরাগ্য বা সন্ন্যাস-ধর্ম্ম কলির জীবের পক্ষে উচিত নহে।

আচার্য্যের উপদেশ কিন্তু অন্যরূপ। তাঁহার মতে ত্যাগ ও বৈরাগ্য প্রয়োজন। বাসনাই বন্ধনের কারণ, বাসনা ত্যাগ না করিলে মুক্তি নাই। শিব, শক্তি, বিষ্ণু, গণপতি প্রভৃতি তেত্রিশ কোটী দেবতা এক সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মেরই অনন্ত ভাবের এক একটা ভাবমাত্র। জীব যতক্ষণ না বুঝিবে যে, তাহার অন্তরাত্মাই সেই ব্রহ্ম, ততক্ষণ তাহার চরম চরিতার্থতা লাভ হইতে পারে না।

আচার্য্যের একপ মত গ্রহণ করিতে প্রায় সকলেই নারাজ। তবে কোন কোন পণ্ডিত মনে মনে এই মতের কিছু পক্ষপাতী হইলেন। কিন্তু বাহিরে সে ভাব প্রকাশ করিলেন না। অপর সকলের সহিত যোগদান করিয়া কিরূপে আচার্য্যকে পরাস্ত করিবেন, তদ্বিষয়েই পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

অবিলম্বে স্থির হইল, পরদিন সভাস্থলে এক অতি বৃদ্ধ পণ্ডিত আচার্য্যকে বিচারে পরাস্ত করিবেন।

পরদিন সভাস্থলে বহুলোক-সমাগম হইল। বৃদ্ধ পণ্ডিত কিরূপে আচার্য্যকে পরাজয় করিবেন, ইহা জানিবার জন্য সেদিন মন্দিরে লোক আর ধরে না। সকলেই মহাকৌতূহলী হইয়া সভায় আসিলেন।

যথাসময়ে আচার্য্যদেব নাটমন্দিরে আসিয়া বসিলেন। পদ্মপাদ, হস্তামলক, চিদ্বিলাস, সমিৎপাণি, জ্ঞানকন্দ, আনন্দগিরি প্রভৃতি প্রধান শিষ্যেরা তাঁহার চারিদিকে বসিলেন।

অনন্তর পণ্ডিতেরা তাঁহাকে অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। আচার্য্যও তাহার উত্তর প্রদান করিলেন।

পরিশেষে এক বৃদ্ধ পণ্ডিত উঠিয়া আচার্য্যকে প্রণিপাত করিয়া কহিলেন—

"মহাত্মন্! আপনার সুযুক্তিপূর্ণ জ্ঞানগর্ভ উপদেশ শুনিয়া আমাদের জীবন ধন্য হইয়াছে। আপনার উপদেশ অমূল্য এবং আপনার অদ্বৈতমত অতি সুন্দর, তাহাও বুঝিতেছি। সর্ব্বোপরি আপনার অদ্ভুত প্রতিভা দেখিয়া আমরা বিমুগ্ধ। আমাদের মধ্যে অনেকেই আপনার মত গ্রহণে ইচ্ছুক। কিন্তু আমাদের মনে হয়, আমাদের চতুর্দ্দশপুরুষ আচরিত ধর্ম্মমত ত্যাগ করা উচিত নহে। মানবমাত্রেরই ভ্রমপ্রমাদ থাকে, এবং তর্কে জয়লাভ করিলেই সত্য নির্ণয় হয় না। কারণ, বুদ্ধি যাহার যত প্রখর, সেই ব্যক্তি তর্কস্থলে ততই জয়লাভ করে। আর এক্ষেত্রে যে আমরা আপনাকে তর্কে পরাজিত করিতে পারিব, তাহাও আমাদের বোধ হয় না। অথচ অদ্বৈত-মত যে একেবারেই ভ্রমশূন্য এবং আমাদের মত যে একেবারে ভ্রান্ত, একথাও বিশ্বাস করিতে পারি না। আপনার অদ্বৈতমত যেরূপই হউক না কেন আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের অনুষ্ঠিত ধর্ম্মমত যে ভ্রান্ত তাহাও আমরা কোন মতে বলিতে পারিতেছি না। অতএব এস্থলে আমাদের পক্ষে কোন্ পথ শ্রেয় তাহা আমরা বুঝিতে সক্ষম হইতেছি না।"

এই কথা বলিয়া বৃদ্ধ ক্ষণকাল নীরব রহিলেন, কিন্তু আসন গ্রহণ করিলেন না ইচ্ছা যেন আরও কি বলিবেন।

তাঁহার ভাব দেখিয়া আচার্য্য শান্ত ভাবে কহিলেন "মহাত্মন্, আপনি বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ, আচ্ছা বলুন, কি হইলে আমাদের কথায় আপনাদের বিশ্বাস হইবে?

বৃদ্ধ। ভগবন্! দেখুন আমাদের মধ্যার্জ্জুন-শিব বড় জাগ্রত দেবতা, তিনি সর্ব্বসমক্ষে আবির্ভূত হইয়া যে মত সত্য বলিবেন তাহাই আমাদের শিরোধার্য্য, আমরা তাহাই গ্রহণ করিব।

সভাস্থ সকলে বৃদ্ধের প্রত্যুৎপন্নমতি ও অপূর্ব্ব কৌশল দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। পণ্ডিতগণ তাঁহার প্রস্তাবে সকলেই সম্মত হইলেন।

বৃদ্ধের বাক্য শুনিয়া পদ্মপাদ প্রভৃতি যেন চিন্তিত অথচ চমকিত ভাবে আচার্য্যের মুখপানে চাহিলেন। তিনি কিন্তু নীরব, নিরুত্তর! যেন কি এক চিন্তায় তাঁহার প্রসন্ন আনন সহসা গম্ভীর ভাব ধারণ করিল।

মুহূর্ত্ত পরেই তিনি ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে পদ্ম-পাদ প্রভৃতিও উত্থিত হইলেন।

তাহা দেখিয়া সভাস্থ কয়েক ব্যক্তি আচার্য্যের পরাজয় ভাবিয়া কোলাহল করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু সেই বৃদ্ধ পণ্ডিত তাঁহাদিগকে নিবারণ করিলেন।

আচার্য্য পদ্মপাদের হস্তে কমণ্ডলু প্রদান করিয়া বাম কক্ষে দণ্ডধারণ করতঃ মধ্যার্জ্জুন, শিবসম্মুখে অগ্রসর হইলেন। পথে যাহারা বসিয়াছিল তাহারা সসম্মানে পথ প্রদান করিল।

আচার্য্য শিবসম্মুখে আসিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন এবং দণ্ডায়মান হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে-ভগবানের দর্শন প্রার্থনা করিয়া একটী স্তোত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। এসময় তাঁহার অভিনব ভাব!—ভক্তিপরিপূরিত, আকুলিত আনন একাগ্রতায় আরক্তিম হইয়া উঠিয়াছে; অর্দ্ধনিমীলিত নয়নকোণে প্রেমাশ্রু ঢল ঢল করিতেছে, অমিয় কণ্ঠে গদগদ ভাব, বাক্য অস্পষ্ট ও জড়িত হইয়া যাইতেছে!

ধীরে ধীরে শিবস্তোত্র সম্পূর্ণ হইল, আচার্য্য দণ্ডবৎ দণ্ডায়মান রহিলেন। তাঁহার কণ্ঠনিঃসৃত মধুর ধ্বনি যেন কিয়ৎক্ষণ মন্দিরগৃহে নৃত্য করিতে করিতে শূন্যে মিলাইয়া গেল।

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া আচার্য্য যুক্তকরে শিবলিঙ্গপ্রতি চাহিয়া কহিলেন "হে দেবাদিদেব মহেশ্বর! হে করুণানিধান ভক্তবৎসল ভগবন্! আপনার আদেশেই আজ এ দাস অদ্বৈতমত প্রচার করিতেছে, আপনার ইচ্ছাতেই আজ এ অধম বৈদিক ধর্ম্ম পুনঃ প্রবর্ত্তন করিতে উদ্যত হইয়াছে; কিন্তু দেব তাহাতে এক্ষণে বিঘ্ন উপস্থিত। এই মধ্যার্জ্জুনের পণ্ডিতমণ্ডলী আমার বাক্যে আজ সন্দিহান; তাঁহারা আজ আপনার শ্রীমুখের অভয়-বাণী না শুনিলে আমার কথা গ্রহণ করিবেন না; তাঁহারা আজ আপনার বাক্য শুনিতে চাহেন; হে সর্ব্বান্তর্যামিন্! তাঁহাদের বাসনা আজ আপনি পূর্ণ করুন; আপনার শ্রীপাদপদ্মদর্শনে তাঁহারা আজ ধন্য হউন!"

সহসা মন্দিরগৃহ অপূর্ব্ব আলোকে আলোকিত হইল! গৃহমধ্যে যেন শত বিজলী চমকিয়া উঠিল! দর্শকগণ চমকিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা দেখিলেন মন্দিরাভ্যন্তরে কি এক অদৃষ্টপূর্ব্ব দিব্য জ্যোতিঃ। সে জ্যোতিঃ যেন 'সূর্য্যকোটী প্রতীকাশং চন্দ্রকোটী সুশীতলম্'। তাহাতে যেন কি এক

অপূর্ব্ব মাধুর্য্য, কি এক মধুর আকর্ষণ! একবার দৃষ্টিপাত করিলে নয়ন ফিরাইয়া লওয়া যায় না!

ক্রমে সকলে দেখিলেন সেই জ্যোতির মধ্যে 'কষিত রজত জিনিতরূপ' কটিদেশে সর্পবেষ্টিত বাঘাম্বরপরিহিত, বাহুতে ও হস্তে রুদ্রাক্ষবলয়, কণ্ঠে রুদ্রাক্ষমালা, কর্ণে বিকশিত ধুস্তুর কুসুম, শিরে জটাপুট, ভালে চন্দ্রমা-বিরাজিত চন্দ্রশেখর যেন লিঙ্গোপরি দণ্ডায়মান। তাঁহার দক্ষিণ হস্তে ত্রিশূল, বাম হস্তে ডম্বরু, ঢল ঢল স্তিমিতনেত্রে যেন করুণা উথলিত হইতেছে। স্নিগ্ধ জ্যোতিরভ্যন্তরে সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব অপরূপ শান্ত শিবমূর্ত্তিদর্শনে দর্শকগণ এখন আত্মহারা! তাহাদের দৃষ্টিশক্তি বিলুপ্ত, কর্ণ বধির ও স্পর্শশক্তি যেন অন্তর্হিত হইয়াছে! তাহারা আছে কি নাই তাহা তাহারা বুঝিতে অক্ষম! ঐভাব বিলীন হইতে না হইতে সহসা মন্দির কম্পিত করিয়া এক ধ্বনি শ্রুত হইল। সকলে শুনিল—"অদ্বৈত সত্য, অদ্বৈত সত্য, অদ্বৈত সত্য!"

সভাস্থ সকলে এতক্ষণ রূপ দেখিয়াই মুগ্ধ হইয়াছিলেন, এক্ষণে আবার সেই দিব্যবাণী শুনিয়া তাঁহারা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। সে মধুর ধ্বনি যেন তাঁহাদের 'কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল'ও তাঁহাদিগকে আকুল করিয়া তুলিল! তাঁহারা তখন আকুল প্রাণে ভক্তিবিহ্বল-চিত্তে ভগবচ্চরণোদ্দেশে সভাক্ষেত্রে লুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। সকলেই একেবারে বাহ্যজ্ঞানশূন্য, অসীম আনন্দে আত্মহারা! আচার্য্যকৃপায় এইরূপে অনেকের আজ আজীবনতপস্যা সার্থক ও হৃদয়ের অজ্ঞান মোহ দূরীভূত হইল! মধ্যার্জ্জুনের আপামর সাধারণ এইরূপে 'ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থি শ্ছিদ্যন্তে সর্ব্ব সংশয়া' হইয়া ধন্য হইল।

ভগবান্ ভবানীপতিকে যথারীতি বিসর্জ্জন দিয়া আচার্য্য পুনরায় ধীরে ধীরে নাটমন্দিরে আসিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। সমবেত সভ্যমণ্ডলী এখন তাঁহাকেই কেবল নয়ন ভরিয়া দেখিতে লাগিলেন। তাঁহারা তাঁহার রূপ দেখিবেন কি ভাব দেখিবেন তাহা এখন স্থির করিতে অক্ষম। আচার্য্যের আননে এখন আনন্দ নাই, গর্ব্ব নাই, উল্লাস নাই, চঞ্চলতা নাই, গাম্ভীর্য্যও নাই! তাঁহার সেই অপূর্ব্ব ভাব, ভাবগ্রাহী ভগবান্ ভিন্ন আর কে বুঝিবে? সভাস্থ সকলে কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া তাঁহাতে কি যে দেখিল তাহা তাহারাই বুঝিল না।

ক্রমে পণ্ডিতেরা নিজ নিজ বিহ্বল ভাব সম্বরণ করিয়া মুক্তকণ্ঠে আচার্য্যের জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন। জনসাধারণ পণ্ডিতদিগের অনুসরণ করিয়া জয়ধ্বনিদ্বারা দিঙ্‌মণ্ডল পরিপূরিত করিয়া তুলিল। তখন সমুদয় লোক উন্মত্তের ন্যায় আচার্য্যের পাদপদ্ম স্পর্শের জন্য ব্যাকুল হইল। সকলেরই ইচ্ছা আচার্য্যের পাদপদ্ম স্পর্শ করিয়া নিজ নিজ বাসনা তাঁহার চরণে নিবেদন করিবে। এইরূপে সভামধ্যে এক মহা কোলাহল উপস্থিত হইল।

সকলের এ প্রকার ভাব দেখিয়া পদ্মপাদ, হস্তামলক প্রভৃতি আচার্য্য-শিষ্যসমূহ তাঁহাদিগকে সুমিষ্ট বচনে শান্ত করিলেন, এবং সন্ধ্যাসমাগম দেখিয়া সেদিন তাঁহাদিগকে গৃহে যাইয়া সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকর্ম্ম করিতে বলিলেন। পদ্মপাদের কথা শেষ হইলে আচার্য্য গাত্রোত্থান করিলেন। পণ্ডিতেরা অনেকে মহানন্দে ও মহা বিস্ময়ে গৃহে ফিরিলেন। কেহ কেহ আবার সেই রাত্রি আচার্য্যের সঙ্গী হইবেন বলিয়া আর গৃহে ফিরিলেন না।

পরদিন প্রাতে অপূর্ব্ব দৃশ্য। মধ্যার্জ্জুনবাসী সকলে দলে দলে আসিয়া আচার্য্যচরণে আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিলেন। আচার্য্য তাঁহাদিগকে দীক্ষিত করিবার জন্য নিজ শিষ্যবর্গকে ইঙ্গিত করিলেন। তিনি কিন্তু প্রায়ই নির্জ্জনবাস করিতে লাগিলেন। এইরূপে কয়েকদিনের ভিতরই প্রায় সমগ্র মধ্যার্জ্জুনবাসী আচার্য্যের মত গ্রহণ করিল এবং পঞ্চযজ্ঞ ও পঞ্চদেবতার পূজাপরায়ণ হইয়া দিনযাপন করিতে লাগিলেন।

শ্রীরামানুজ-দর্শন।

[শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ।]

বিজ্ঞান ও শূন্যবাদ খণ্ডন।

ইতিপূর্ব্বে আমরা বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধমতটী মোটামুটী এক প্রকার বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি, এক্ষণে আচার্য্য রামানুজমতে তাহার কিরূপ খণ্ডন করা হয় তাহা একবার দেখা যাউক। অবশ্য রামানুজ মতে খণ্ডন বলিতে যে ইহাতে রামানুজাচার্য্যের উদ্ভাবিত কোন নূতন খণ্ডন মনে করিতে হইবে তাহা নহে, তবে রামানুজাচার্য্যের পূর্ব্বের আচার্য্যগণ যে ভাবে বৌদ্ধমত খণ্ডন করিয়াছিলেন, তাহাই যতটা রামানুজাচার্য্য অনুমোদন করিয়াছেন ততটাই

বুঝিতে হইবে। এই খণ্ডনের কৃতিত্ব অধিকাংশ ভট্ট কুমারিল ও আচার্য্য শঙ্করেরই বলিতে হইবে। যদিও আচার্য্য রামানুজ শঙ্করাচার্য্যের মতের ঘোর বিরোধী তথাপি অবৈদিক মতের বিরুদ্ধে উভয়েই অনেক স্থলে এক-মতাবলম্বী। আমাদের অবলম্বিত গ্রন্থের টীকাকার যে সমুদায় খণ্ডনের যুক্তি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা, অনুসন্ধান করিয়া দেখিলাম, আচার্য্য শঙ্করের সূত্রভাষ্য ও বৃহদারণ্যকভাষ্যের ছায়ামাত্র।

পাঠকবর্গের সুবিধার জন্য এই খণ্ডনের প্রকৃতিসম্বন্ধে পূর্ব্ব হইতে একটু বলিয়া রাখিলে ভাল হইবে মনে হয়। আমরা দেখিতে পাইব ইহাতে ছয়প্রকার পন্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। প্রথম বিজ্ঞানবাদের স্বীকৃত যুক্তির অসঙ্গতি, দ্বিতীয় প্রবাহাকারে প্রবাহিত ক্ষণিক বিজ্ঞানের কোন সাক্ষী থাকা প্রয়োজন, এতৎসম্বন্ধীয় যুক্তি ; তৃতীয়—"দেশ" সম্বন্ধীয় যুক্তি ; চতুর্থ "কাল" সম্বন্ধীয় যুক্তি ; পঞ্চম বিষয়তা যুক্তি এবং ষষ্ঠ বিজ্ঞানের জ্ঞেয়ত্ব সম্বন্ধীয় যুক্তি। টীকাকারের বক্ষ্যমান যুক্তি হইতে পাঠক এই ছয়প্রকার যুক্তি দেখিতে পাইবেন। তবে দুঃখের বিষয় তাহারা ঠিক পরের পর সাজান নাই। যাহা হউক এখন টীকাকারের কথা অবলম্বন করিয়া আমরা ইহাদের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। এবং যথাস্থানে উক্ত যুক্তিসম্বন্ধে ইঙ্গিত করিবার চেষ্টা করিব।

ইহার পূর্ব্বপ্রবন্ধে পাঠক দেখিয়া থাকিবেন যে বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ চারিপ্রকার কারণ স্বীকার করিয়া জগৎ-তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন,—যথা,সহকারী প্রত্যয়,অধিপতি প্রত্যয়, সমনন্তর প্রত্যয়,এবং আলম্বন প্রত্যয়। এখন এই চারি প্রকার কারণতার খণ্ডন উপলক্ষে বলা হয় যে, যদি সকল প্রকার জ্ঞানোৎপত্তিতেই এই চারি প্রকার কারণ থাকা আবশ্যক হয়, তাহা হইলে, যে স্থলে শুক্তিতে রজত জ্ঞান হয়, সেস্থলে সহকারী প্রত্যয় দ্বারা এ প্রকার ভ্রমজ্ঞান উৎপন্ন হওয়া উচিত নহে। ঘটজ্ঞানে আলোকস্থানীয় পদার্থকে সহকারী প্রত্যয় বলা হয়, সুতরাং শুক্তিতে রজতজ্ঞানস্থলে সেই আলোক জাতীয় পদার্থকে ত কারণ বলা চলে না। কারণ আলোক ত কেবল শুক্তিকে শুক্তির মত প্রকাশ করিতে বাধ্য, অন্য প্রকারে অর্থাৎ রজতাকারে কেন তাহাকে প্রকাশ করিবে? আলোকের ধর্ম্ম স্ফুটতা সাধন, অন্য প্রকারে, প্রতিভাত করা তাহার ত ধর্ম্ম নহে। সুতরাং সহকারী প্রত্যয়, ভ্রমজ্ঞান স্থলে নিরর্থক। আবার দেখা যায় বৌদ্ধগণ চক্ষুরাদিকে অধিপতি প্রত্যয়

বলেন। এখন জগদ্ব্যাপার ব্যাখ্যা করিতে যদি ইহার কোন সার্থকতা থাকে, তাহা হইলে উক্ত ভ্রম স্থলে আবার গোল বাধে। চক্ষুরাদি করে কি? উহারা যেরূপ বিষয়ের সহিত মিলিত হয় সেইরূপই জানাইয়া দেয়, এবং ইহাই ইহাদের কার্য্য। এখন একথা যদি মানা যায়, তাহা হইলে শুক্তিতে রজতজ্ঞানস্থলে চক্ষুরাদিকে বাদ দেওয়া উচিত; কারণ, চক্ষুর কার্য্য শুক্তি দর্শনে শুক্তি-জ্ঞান উৎপাদনে সহায়তা করা; কিন্তু এস্থলে তাহা না করিয়া শুক্তিতে কেন রজতাকার জ্ঞান উৎপাদনে সহায়তা করিল? সুতরাং অধিপতিপ্রত্যয় দ্বারা ভ্রমজ্ঞান ব্যাখ্যা করা হইল না। আর বস্তুতঃ ভ্রম-জ্ঞানও জগদ্ব্যাপারের একটা অঙ্গবিশেষ। ঐরূপ, জগদ্ব্যাপারের ব্যাখ্যা-কালে সমনন্তরপ্রত্যয়ও কোন কার্য্যে আসিতে পারে না। কারণ, সমনন্তর-প্রত্যয় অর্থে "অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী পূর্ব্বজ্ঞান।" এতদ্দ্বারা একটা জিনীসকে অনেকক্ষণ "সেই একটা জিনীস" বলিয়াই বোধ উৎপন্ন হয়, জলধারার যেমন প্রতি-কণা পৃথক্ তদ্রূপ বিজ্ঞানের ধারা পৃথক্ বলিয়া একটা জিনীসকে পৃথক পৃথক্ বোধ হয় না। এখন একথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে এক প্রকার জ্ঞানের ধারা বহিতে বহিতে অন্য প্রকার জ্ঞানের ধারা কি প্রকারে প্রবাহিত হইতে পারে? অন্য কথায়, নিতান্ত নিকটবর্ত্তী পূর্ব্বজ্ঞান যদি পরবর্ত্তী জ্ঞানের কারণ হয়, তাহা হইলে যাহার যে জ্ঞানধারা বহিতেছে, তাহার তাহাই বহিতে থাকুক; অন্যথা ঘটিবার কোন কারণ নাই। কিন্তু ঘট-পট-রজত এই প্রকার ক্রম-সম্পন্ন জ্ঞানে তাহা ঘটে না। সুতরাং জগদ্ব্যাপারে সমনন্তর-প্রত্যয় নিষ্প্রয়োজন; শুক্তিতে রজতজ্ঞান-রূপ মিথ্যাজ্ঞান-স্থলে ইহার নিষ্প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ত কথাই উঠিতে পারে না। ঐরূপ বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধের আলম্বন-প্রত্যয়টীও স্বীকার করিয়া কোন লাভ নাই। কারণ, এই আলম্বন প্রত্যয় অর্থে 'কোন বাহ্যিক কারণ।' এখন ইহা স্বীকার করিয়া যদি জগতের বিভিন্ন পদার্থের জ্ঞানোৎপত্তির হেতু প্রদর্শন করা হয়, তাহা হইলে প্রকারান্তরে বৌদ্ধগণের নিজ মতেরই ব্যাঘাত ঘটিবে। কারণ, বাহ্য অর্থ কি? বাহ্য বলিলেই কি একটা বিজ্ঞানকণা যথায় নাই, সেই স্থানটা অথবা বিজ্ঞানকণা ভিন্ন "একটা কিছু" কি বুঝায় না? আর যদি তাহাই বুঝায়, তাহা হইলে সেই স্থানটা বা সেই ভিন্ন পদার্থটা কি উক্ত বিজ্ঞান ভিন্ন পদার্থ বলিয়া স্বীকার করা হইল না? আর যদি বল, না, উহাও বিজ্ঞান, তাহা হইলে বল দেখি, তোমার বিজ্ঞানকণা

ও তাহার বাহ্যে পার্থক্য কি? পার্থক্য থাকিলে তাহা বিজ্ঞান পদার্থ হইতে ভিন্ন পদার্থ এবং না থাকিলে তাহা বাহ্য নামের যোগ্য হইতে পারে না। সুতরাং তোমাদিগের মতে আলম্বন প্রত্যয় স্বীকার করিয়া জগদ্ব্যাপার ব্যাখ্যা করা অসম্ভব হইয়া পড়িতেছে। (এই খণ্ডনটীকে প্রথম প্রকারের খণ্ডন বলা যায়।)

তাহার পর বল দেখি, রজত না থাকিলে বিজ্ঞানের রজতাকার ধারণ কি করিয়া সম্ভব? যদি বল, বিজ্ঞানে রজতাকার ধারণ করিবার একটা শক্তি বা সংস্কার আছে, তাহারই বলে বিজ্ঞান রজতাকার ধারণ করে—রজত আছে বলিয়া বিজ্ঞান রজতাকার ধারণ করে না, ইত্যাদি। কিন্তু তাহাও বলিতে পার না। তাহার কারণ কি এই দেখ। আচ্ছা বল দেখি, তোমার ঐ সংস্কার স্থায়ী কি ক্ষণিক? যদি বল স্থায়ী, তাহা হইলে তোমারই সিদ্ধান্তের ব্যাঘাত ঘটিল। তোমার বিজ্ঞানই যখন ক্ষণিক পদার্থ, তখন তাহার সংস্কারকে স্থায়ী বলা চলে না। আর যদি বল, না, সে সংস্কার ক্ষণিক, তাহা হইলে বল দেখি, ঐ সংস্কার যখন দ্বিতীয় ক্ষণে থাকিবে না, তখন সে সংস্কার কি করিয়া তাহার আশ্রয়স্থানীয় বিজ্ঞান বস্তুতে রজতাকার উৎপাদন করিতে পারে? যে ক্ষণে বিজ্ঞানটী উৎপন্ন হইবে তাহার পরক্ষণেই ত তাহার নাশ হইবে, সুতরাং বিজ্ঞানকে রজতাকার প্রদান করিবার সময় কোথায়? আর তা ছাড়া যে পক্ষই কেন স্বীকার কর না সংস্কারকে ত তোমায় জ্ঞেয় বলিযা মানিতে হইবে, যেহেতু রজত পদার্থ জ্ঞেয়; আর তাহা হইলেই তোমার বিজ্ঞানবাদের বিশেষ ক্ষতি হইল। তোমরা জ্ঞেয় মাত্রকেই বিজ্ঞান বলিয়া থাক, আর এখন সংস্কারকেও আবার জ্ঞেয় বলিলে,সুতরাং যে সংস্কার স্বীকার করিয়া বিজ্ঞানের রজতাকাব ধারণ সম্ভব প্রমাণ করিতেছিলে এক্ষণে তাহাও বিজ্ঞান হইল। এক কথায় তোমার বিজ্ঞান রজতাকার কেন ধারণ করে তাহা তুমি বলিতে পারিলে না।

তাহার পর আর এক কথা। তুমি বল তোমার বিজ্ঞান বিশুদ্ধ, তাহার সহিত কোন কিছুই মিশ্রিত থাকে না। আচ্ছা, তাহা হইলে বল দেখি, সেই বিশুদ্ধ বিজ্ঞান কি করিয়া রজতজ্ঞানের জনক হইতে পারে? তুমি ত জ্ঞানের এই বিশুদ্ধিভাবকেই মোক্ষস্বরূপ বলিয়া থাক? আর সেই মোক্ষস্বরূপে এই "জ্ঞান" ছাড়া আরত কিছুই স্বীকার কর না? সুতরাং তোমার মতে বিজ্ঞানের রজতাকার ধারণ অসম্ভব নহে কি? (এ পর্য্যন্ত

পঞ্চম প্রকারের খণ্ডন বলা যায়।) আচ্ছা বেশ অন্য কথাই ধরি। যদি বল কোন দুষ্ট কারণ হইতে বিজ্ঞান উক্ত রজতাকার ধারণ করে। তাহা হইলে বল দেখি যে বিজ্ঞানটী উক্ত দুষ্ট কারণ বশতঃ রজতাকার ধারণ করে সেই বিজ্ঞানটীই কি রজতের গ্রাহক অথবা অন্য কোন বিজ্ঞান সেই রজতাকারের গ্রাহক ? সেই বিজ্ঞানটী গ্রাহক একথা বলিতে পার না; কারণ ক্ষণিক পদার্থের কার্য্যকারণভাব এককালে থাকা অসম্ভব, যে ক্ষণে তোমার ক্ষণিক বিজ্ঞানটী কারণ নামের যোগ্য হইল পরক্ষণে তাহা থাকিবে না বলিয়া তাহা আর কার্য্য নামের যোগ্য হইতে পারিল না। আর তাহা হইলে রজতের প্রত্যক্ষ জ্ঞানও সম্ভব হয় না। কারণ প্রত্যক্ষ জ্ঞানস্থলে বিষয় থাকা একান্ত আবশ্যক, বিষয় না থাকিলে যে জ্ঞান হয় তাহা স্মৃতি-পদবাচ্য হইতে পারে মাত্র। কিন্তু দেখ, প্রত্যক্ষ জ্ঞান জগতে সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ বিষয়; আর যদি তুমি তাহাই না স্বীকার করিলে, তাহা হইলে তুমি সর্ব্বজনপরিচিত জগত্তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিলে না। আর যদি বল, যে বিজ্ঞানটী রজতাকার ধারণ করে, সে বিজ্ঞানটী রজতের গ্রাহক নহে, অন্য একটী বিজ্ঞান রজতের গ্রাহক, তাহা হইলে ত তোমায় প্রকারান্তরে রজত-রূপ বাহ্য বিষয় স্বীকার করিতে হইল; কারণ, একটা জ্ঞান রজতাকার ধারণ করিল অন্য জ্ঞান তাহার গ্রাহক হইল, এবং তাহা হইলে দ্বিতীয় জ্ঞানের পক্ষে তাহার বিষয় তাহা হইতে পৃথক্ বলিয়া মানিতে হইল। রজত যদি না থাকিত, তাহা হইলে রজত তাহার বিষয় হইত না। কে না জানে যাহা জ্ঞানের আকার প্রদান করে তাহাই জ্ঞানের বিষয়, বিষয় শব্দের অর্থই এই। (এই যুক্তিগুলির মধ্যে দ্বিতীয় ও পঞ্চম প্রকার খণ্ডনের যুক্তি মিশ্রিতভাবে দেখা যায়।) আবার দেখ, বুদ্ধি ও বুদ্ধির বিষয়কে যাঁহারা অভিন্ন বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহারা বিরুদ্ধ ধর্ম্ম বশতঃ কোন ভেদ স্বীকার করেন কি না ? যদি কোন ভেদ স্বীকার না করা হয়, তাহা হইলে ক্ষণভেদ বা কালের ভেদ বলিয়া একটা কিছু থাকিতে পারে না। ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান বলিয়া কোন কিছু জগতে থাকা তাহা হইলে তাঁহাদের মতে অন্যায়। কিন্তু বাস্তবিক এ বিষয়টীকে উঠাইয়া দেওয়া সম্ভব নহে। (এটী চতুর্থ প্রকারের খণ্ডন বলা যায়।) আর যদি উক্ত ভেদ আছে বলিয়া স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে একই জ্ঞানে কি করিয়া শ্বেতপীতাদি অনেকাকার পরস্পর বিরুদ্ধ ভাব থাকিতে পারে ? মনে কর, তুমি একটা

জিনীস দেখিলে, তাহাতে শ্বেতপীতাদি বিবিধ বর্ণ আছে; এখন উক্ত ভেদ স্বীকার করিলে এক বস্তুতে উক্ত বিবিধ বর্ণ আছে এরূপ জ্ঞান হইতে পারে না, সুতরাং বুদ্ধি ও বুদ্ধির বিষয় এক হইতে পারে না। (এটী তৃতীয় প্রকারের খণ্ডন বলা যায়।) এইরূপে যত দিক্ দিয়াই দেখা যাইবে, ততই প্রমাণিত হইবে যে ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদ যুক্তিসহ নহে। এই পর্য্যন্ত বিজ্ঞানবাদ ও রামানুজ-মতে তাহার খণ্ডন আলোচনা করা গেল; কিন্তু যদি আরও একটু অগ্রসর হওয়া যায়, তাহা হইলে জানা যায়, অসৎ-খ্যাতি-বাদী শূন্যবাদী বৌদ্ধগণও উক্ত বিজ্ঞানবাদের খণ্ডন করিয়া থাকেন। আর এইটীকেই পূর্ব্বোক্ত ষষ্ঠ প্রকারের খণ্ডন বলা চলে। অবশ্য তাই বলিয়া যে শূন্যবাদই রামানুজের অভিমত তাহাও নহে, একথা আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছি। তবে শূন্যবাদী কর্তৃক বিজ্ঞানবাদের খণ্ডনটী জানিতে পারিলে এই টুকু জানিতে পারা যাইবে যে বিজ্ঞানবাদ হইতে কি করিয়া শূন্যবাদের উৎপত্তি ঘটিল এবং বিজ্ঞানবাদেই বা কোন স্থলে দুর্ব্বলতা আছে। ফলে সত্যানুসন্ধিৎসুর পক্ষে একথাটী অতীব প্রয়োজনীয় তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদীর বিরুদ্ধে শূন্যবাদীর একথাটী আর কিছুই নহে, ইহা সেই জ্ঞেয়ত্ব ধর্ম্ম লইয়া। বিজ্ঞানবাদী, "জ্ঞাতা" ও "জ্ঞেয়" এই উভয় পদার্থকে জ্ঞানাতিরিক্ত স্বীকার করে না, তাঁহারা বলেন "জ্ঞাতা" বা "জ্ঞেয়" বলিয়া যাহা কিছু তাহা আসলে জ্ঞান বা বিজ্ঞানই—অন্য কিছু নহে। শূন্যবাদী বলিলেন—"আচ্ছা, যদি জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় পদার্থে জ্ঞেয়ত্ব ধর্ম্ম থাকায় উহারা জ্ঞান ভিন্ন কিছুই না হয় তাহা হইলে জ্ঞানেও ত জ্ঞেয়ত্ব ধর্ম্ম আছে। সুতরাং জ্ঞানও কিছুই নহে বলিয়া কেন গণ্য হইবে না? জ্ঞানে জ্ঞেয়ত্ব ধর্ম্ম নাই বলিতে পার না, কারণ জ্ঞানে যদি জ্ঞেয়ত্ব ধর্ম্ম না থাকিত তাহা হইলে জ্ঞান বলিয়া তুমি নির্দ্দেশ কর কি করিয়া? "আমার জ্ঞান" বা "ঘট জ্ঞান" এই দুই স্থলে "আমার" ও "ঘট" অংশ ছাড়িয়া দিলেও যে জ্ঞান পদার্থ থাকে তাহা ত আমরা বুঝিতে পারি, জ্ঞানকে জ্ঞানের বিষয় করিতে পারি—তৎসম্বন্ধে ত আমরা পরস্পরে কথাবার্ত্তাও কহিয়া থাকি, সুতরাং জ্ঞানে জ্ঞেয়ত্ব ধর্ম্ম নাই একথা বল কোথা হইতে? আর জ্ঞানেও যদি জ্ঞেয়ত্ব ধর্ম্ম প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে "বিষয়" বস্তুতে জ্ঞেয়ত্ব থাকায় যেমন বিষয় বস্তু "বিষয়" নহে—বিজ্ঞান মাত্র, তদ্রূপ জ্ঞানেরও জ্ঞেয়ত্ব বশতঃ জ্ঞানত্ব বিলুপ্ত হইতে বাধ্য।

আর এইরূপে যদি জ্ঞানের জ্ঞানত্বই বিলুপ্ত হইল, তাহা হইলে তাহাকে "কিছুই নহে" বলিবেনা কেন? অন্য কথায় তাহাকে শূন্য বলিয়া ক্ষান্ত হও।

ফলে দাঁড়াইল এই যে শূন্যবাদীর উক্ত যুক্তিবলে বিজ্ঞানবাদের অবস্থা একটু সঙ্কটাপন্ন হইল এবং তদবসরে শূন্যবাদী নিজ জয় ঘোষণা করিলেন। যাহা হউক এইবার আমরা রামানুজ মতে শূন্যবাদের খণ্ডন সম্বন্ধে আলোচনা করিব এবং তাহা হইলে পাঁচপ্রকার খ্যাতির মধ্যে দুইপ্রকার খ্যাতির বিচার কার্য্য শেষ হইবে।

উপরে যে যুক্তি প্রদর্শন করা হইয়াছে তাহা হইতে দেখা যাইবে যে আসলে সকল জিনীসই "শূন্য" বা "কিছুই নহে"। কিন্তু এখন দেখা দরকার এই শূন্য পদার্থটী কি? কারণ এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে এই শূন্য পদার্থ কি অস্তিত্ব-শূন্য বা অভাব পদার্থ অথবা কেবল অস্তিত্ব মাত্র। যদি বল অভাব বা ভাব পদার্থ বা কিছুই নহে তাহা হইলে তাহাতে আবার জ্ঞেয়ত্বধর্ম্ম আসিতে পারে এবং তাহার ফলে পূর্ব্বোক্ত যুক্তিবলে আবার তাহাকে "কিছু নয়" বা শূন্যপদার্থে পরিণত করিয়া বুঝিতে হইবে। বস্তুতঃ এই "শূন্য" পদার্থ 'কিছু' বা কিছু নহে ইহার কোনটীই বলা চলে না; কারণ ইহার সম্বন্ধে যাহাই বলা যাইবে তাহাতেই ইহার জ্ঞেয়ত্বধর্ম্ম আসিয়া উপস্থিত হইবে। অগত্যা ইহাকে অনির্ব্বচনীয় ভিন্ন আর কিছু বলা চলে না। কালে এই শূন্য পদার্থের আসল অর্থ যে অনির্ব্বচনীয়ত্ব তাহা যখন লোকে ভুলিয়া গেল এবং সাধনাভাবে বিপক্ষের আক্রমণে যখন তাহাকে একেবারে অসৎ বা অভাব পদার্থ মধ্যে পরিগণিত করিতে বাধ্য হইল তখনই বৈদিক ধর্ম্মাবলম্বীগণের পক্ষ হইতে ইহার তুমুল প্রতিবাদ হইতে লাগিল এবং সে প্রতিবাদ কার্য্য আচার্য্য শঙ্করেই একপ্রকার পূর্ণতা প্রাপ্ত হইল। যাহা হউক শূন্যবাদের অর্থ অসৎ কারণবাদ বলিয়া বুঝিবা ইহার যে খণ্ডন দৃষ্ট হয় তাহা এইবার আলোচনা করা যাউক।

কিন্তু এই শূন্যবাদ খণ্ডনে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে আমাদের শূন্যবাদ সম্বন্ধে আর একটু জ্ঞান লাভ করা প্রয়োজন। সব না হউক ইহার দুই একটি প্রধান যুক্তিও জানা আবশ্যক। যাহা খণ্ডন করা হইবে, তাহা যদি আদৌ না জানা হয়, তাহা হইলে সে খণ্ডনের মূল্য বুঝিতে পারা যায় না।

আমাদের অবলম্বিত গ্রন্থের টীকাকার অবশ্য শূন্যবাদের সাপক্ষে যাবতীয় উত্তম যুক্তি বিন্যাস করেন নাই; তবে উপরে বিজ্ঞানবাদ হইতে কি করিয়া

শূন্যবাদের উৎপত্তি হইযাছে —ইহা প্রদর্শন-প্রসঙ্গে আমরা যে যুক্তির অবতারণা করিযাছি, তাহাব সহিত তৎপ্রদত্ত নিম্নলিখিত যুক্তিটী একত্র করিলে এস্থলে শূন্যবাদের সাপক্ষে অতি উত্তম দুইটী যুক্তি পাওয়া যাইবে। অবশ্য নিম্নলিখিত যুক্তিটী যে শূন্যবাদের একটী অমোঘ যুক্তি, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইহার বিস্তারিত বিবরণ আর্য্য নাগার্জ্জুনের মাধ্যমিক কারিকা নামক গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। সুখের বিষয়, এই মাধ্যমিক কারিকা নাগার্জ্জুনের শিষ্য আর্য্যদেবের ভাষ্য-সহ নবপ্রকাশিত হেরল্ড নামক পত্রিকায় অদ্ভুত-প্রতিভা-সম্পন্ন বহুভাষা-বিশারদ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিনাথ দে মহাশয় কর্ত্তৃক ইংরাজি ভাষায় অনুবাদিত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে। অভিজ্ঞ পাঠকের ইহাতে যে চিত্ত-বিনোদ হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

শূন্যবাদী বলেন, দেখ, পদার্থ মাত্রেই হয় প্রমাণ, না হয়—প্রমেয়। যাবতীয় পদার্থকে প্রমাণ ও প্রমেয়—এই দুই ভাগে বিভক্ত করিতে আমরা বাধ্য। দেখ, যখনই তুমি যাহা বল বা যাহা বুঝ, তাহাই তখন প্রমেয় এবং যাহার দ্বারা তুমি বুঝ বা বল তাহা তখন প্রমাণ। প্রমাণ ব্যতিরেকে কখনই আমরা কোন কিছুর জ্ঞানলাভ করিতে পারি না—কোন কিছু সম্বন্ধে "হ্যা" বা "না"—কিছুই বলিতে পারি না, লোককেও কোন কথা বলিতে সক্ষম হই না। দেখ, চক্ষু দিয়া কিছু দেখিলে, দেখিযা তাহার একটা জ্ঞান হইল, এস্থলে চক্ষু তোমার প্রমাণ এবং সেই জিনীসটা তোমার প্রমেয়। নদীতে জল বাড়িয়াছে দেখিয়া বৃষ্টি হইয়াছে বলিলে, এস্থলে বৃষ্টি প্রমেয় এবং তোমার অনুমান তাহার প্রমাণ। মানুষ মরিয়া পুনরায় জন্মায়—একথা তুমি কোন বিজ্ঞের মুখে শুনিয়া বিশ্বাস করিলে; ইহার প্রমাণ সেই বিজ্ঞের বাক্য বা শাস্ত্র। এইরূপ যাহা আমরা জানি বা বুঝি সকলই প্রমাণের সাহায্যে জানি বা বুঝিয়া থাকি। প্রমাণ না পাইলে আমরা কোন কথাই মানি না, জানি না বা বুঝি না। সুতরাং দেখা যাইতেছে, এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যাবতীয় পদার্থ প্রমাণ ও প্রমেয় ভেদে দ্বিবিধ হইতে বাধ্য।

এখন দেখ, সর্ব্ববিধ জ্ঞান লাভ করিতে হইলে যদি প্রমাণের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে প্রমাণেরও কোন প্রমাণ আছে কি না—একথাটা কি একবার ভাবিয়া দেখা উচিত নহে? প্রমাণ পদার্থ যে "প্রমাণ", তাহা তোমায় কে বলিল? তুমি কেন গড্ডলিকাপ্রবাহের ন্যায় "প্রমাণ", এই শব্দটী মাত্র শুনিয়াই সন্তুষ্ট হইয়া চুপ করিয়া তাহা মানিয়া লও? দর্শনজন্য যে জ্ঞান

হয়, তাহার প্রমাণ চক্ষু ; আচ্ছা চক্ষু যে "চক্ষু", তাহা তোমায় কে বলিল? এটা কি শোনা কথামাত্র নহে? ইহার ভিত্তি কি গড্ডলিকাপ্রবাহের ন্যায় নহে? সুতরাং প্রমাণ যে "প্রমাণ", তাহার প্রমাণ পাওয়া প্রয়োজন। প্রমাণের প্রমাণত্ব সিদ্ধ না হইলে তুমি যাহার সম্বন্ধে যাহা বলিবে বা প্রমাণ প্রয়োগ করিবে, তাহাও অসিদ্ধ হইতে বাধ্য। আগে প্রমাণের প্রমাণত্ব স্থির কর, তাহার পর, তুমি যাহা বলিতে চাহ, তাহা বলিতে আসিও। আমরা (শূন্যবাদী) বলি, এই "প্রমাণের" প্রমাণত্ব সিদ্ধ হয় না বলিয়া এ জগদাদি যাহা কিছু, সকলই "কিছু নহে" বা সকলই "শূন্য"। যদি বল "প্রমাণের প্রমাণত্ব সিদ্ধ হয় না, সুতরাং কথা বলি কেন," তাহা হইলে শুন ;—দেখ যখন তুমি প্রমাণ বলিয়া একটা কথা স্বীকার করিতেছ, তখন তুমি প্রমাণ বলিতে কি বুঝায় তাহা বুঝ। আচ্ছা, যদি প্রমাণ বলিতে তুমি কিছু বুঝ,তাহা হইলে, যে হেতু তুমি ইহা বুঝ সেই হেতু ইহা প্রমেয় পদার্থও বটে? আচ্ছা, তাহা হইলে তুমি এই প্রমাণ-রূপ প্রমেয়ের এখন প্রমাণ দিতে বাধ্য। তুমি যখন সকল প্রমেয়েরই প্রমাণ দিয়া থাক, তখন তুমি প্রমাণরূপ প্রমেয় পদার্থেরই বা প্রমাণ দিবে না কেন? তাহার পর দেখ, এই প্রমাণের প্রমাণ এমন কত প্রকার হইতে পারে? হিসাব করিলে ইহা মোট দুইটী প্রকার হইতে বাধ্য। অর্থাৎ প্রমাণ নিজেই নিজের প্রমাণ এবং প্রমাণের যাহা প্রমাণ তাহা প্রমাণ হইতে ভিন্ন। আচ্ছা, এখন যদি প্রথম পক্ষ স্বীকার কর, অর্থাৎ প্রমাণ নিজেই নিজের প্রমাণ এই কথা বল,তাহা হইলে আত্মাশ্রয়-দোষ ঘটে। আত্মাশ্রয়-দোষটা তুমিও স্বীকার করিতে চাহ না তাহা নিশ্চিত। মোট কথা একথা বলিলে প্রমাণের প্রমাণত্বই সিদ্ধ হইল না, তুমি পাগলের মত একটা কথা মানিয়া চলিতেছ মাত্র। আর যদি অন্য কিছুকে প্রমাণের প্রমাণ বল, তাহা হইলে আবার জিজ্ঞাসা করিব, সে প্রমাণের প্রমাণ কি? এইরূপ তুমি যত অন্য প্রমাণ স্বীকার করিবে, আমি ততই তাহার প্রমাণ জিজ্ঞাসা করিব। সুতরাং এইরূপেও অনবস্থা নামক আর এক প্রকার দোষ আসিয়া উপস্থিত হইবে। অগত্যা দেখিতেছ, প্রমাণের প্রমাণত্ব সিদ্ধ হয় না। আর প্রমাণের প্রমাণত্বই যদি সিদ্ধ হইল না, তখন আমার কথাই স্বীকার কর যে, যাহা কিছু আমরা দেখি, শুনি, বুঝি, জানি, সবই প্রমাণাভাবে অসিদ্ধ, সুতরাং আসলে দাঁড়াইল সবই 'কিছু নয়' বা সবই 'শূন্য'।

বাস্তবিক শূন্যবাদীর এ যুক্তিটী বড়ই সুন্দর। প্রমাণেও প্রমেয়ত্ব থাকায়

প্রমাণেরও প্রমাণ জানিবার প্রবৃত্তি হওয়া স্বাভাবিক, ইহাতে ভাবিবার বলিবার এবং বুদ্ধিমোহ জন্মিবার অনেকগুলি স্থল আছে। যাহা হউক, এক্ষণে টীকাকার ইহার যে উত্তর প্রদান করিয়াছেন,তাহা আমরা আলোচনা করিব। তিনি প্রথমতঃ বলিযাছেন—যে বস্তুর সত্তা নাই, তাহার ভাণ হয় কিরূপে? সত্যই হউক আর মিথ্যাই হউক, যখন এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ভাণ হইতেছে, তখন ইহাকে শূন্য বা "কিছু না" বলিলে ইহার ভাণ হওযা অসম্ভব। দেখ, খরগোসের সিং নাই,সেজন্য কেহ খরগোসের সিং দেখে না,গরুর সিং আছে, তাই ত লোকে গরুর সিং দেখে; সুতরাং যাহা একেবারে নাই, তাহার কোন রূপ প্রতীতি হওয়া উচিত নহে। আর যদি বল, তোমার সেই শূন্যই সেই বস্তু যাহার ভাণ হয়, তাহা হইলে তুমি স্বীকার করিলে শূন্য আছে এবং শূন্য আছে স্বীকার করায তাহাকে কিছু না বল কি করিয়া? তাহাকে একটা "কিছু" বলিতে হইবে। সুতরাং তোমার শূন্যবাদ অসিদ্ধ হইল।

তাহার পর আবার দেখ, তুমি যে প্রমাণেরও প্রমাণ জানিতে চাহিতেছ এবং প্রমাণের প্রমাণ নাই বলিযা প্রমেয অসিদ্ধ, সুতরাং সকলই "শূন্য" বা "কিছু নহে" বলিতেছ, আচ্ছা বল দেখি, তোমার এই কথাটা প্রমাণসিদ্ধ কিনা? যদি তোমার কথা প্রমাণসিদ্ধ না হয, তাহা হইলে তুমিই বা কেন সকলই শূন্য বলিয়া লোককে বুঝাইতে বসিয়াছ? তোমার কথার মূল্য কোথায়? তুমি চুপ করিয়া আপন মনে ঘরের কোণে বসিয়া থাক, লোকসমাজে আসিযাছ কেন? যদি বল, না, তোমার কথা প্রমাণসিদ্ধ, তাহা হইলে ত তুমিই প্রমাণ মানিলে; আর যদি বল, প্রমাণের প্রমাণ নাই, তাহা হইলে তোমার একথার প্রমাণ কি তাহা তুমি জান এবং তাহা হইলে আবার প্রকারান্তরে তুমিই প্রমাণ স্বীকার করিলে। সুতরাং সর্ব্বত্রই প্রমাণ স্বীকার প্রয়োজন, প্রমাণের প্রমাণ অন্বেষণ-প্রবৃত্তি বুদ্ধিমানের প্রকৃতিবিরুদ্ধ। আসল কথা এই যে প্রমাণের প্রমাণ অন্বেষণ করিতে বসিলে আর কোন কথাই বলা চলে না; অধিক কি, সকলই শূন্য এ কথাও বলা চলে না। আর লোকে যখন যাহা বুঝে বা স্বীকার করে, তখন তাহা তাহাদের আত্মা, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিযাদির দ্বারাই বুঝে বা স্বীকার করে এবং এই স্বীকারের সময় তাহাদের আত্মা বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদির সহিত অভিন্ন সম্বন্ধ ঘটিয়া থাকে। সুতরাং যখনই যাহা কিছু বুঝা বা স্বীকার করা যায়, তখনই সেই মূল আত্মা পদার্থই প্রমাণ হইয়া দাঁড়ায়। আমি

যাহা জানি, তাহার জন্য আমি অপরকে জিজ্ঞাসা করিতে যাই না ; আমি জানি কি জানি না, তাহার প্রমাণ আমিই। আমি না থাকিলে কোন কিছু আমার স্বীকার করা চলে না, সুতরাং আমির বা আত্মার প্রমাণান্বেষণ অস্বাভাবিক প্রবৃত্তি। আত্মা স্বতঃ প্রমাণ—আত্মাই আত্মার প্রমাণ—আত্মাই অনাত্মার প্রমাণ। সুতরাং অসৎখ্যাতিবাদী বা শূন্যবাদী যে সকলই "শূন্য" বা "কিছু নহে" বলেন, তাহা ঠিক নহে।

এতদূরে আমরা ভ্রমজ্ঞান সম্বন্ধে রামানুজের অনভিমত পাঁচ প্রকার মতের মধ্যে দুইটী মত টীকাকারকে অনুসরণ করিয়া খণ্ডন করিলাম. আগামী বারে প্রভাকরের অখ্যাতিবাদ এবং নৈয়ায়িকের অন্যথা-খ্যাতিবাদ খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিব।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ।

[স্বামী সারদানন্দ।]

ঠাকুর ও পণ্ডিত পদ্মলোচন।

যথার্থ সাধু, সাধক বা ভগবদ্ভক্ত, যে কোনও সম্প্রদায়ের হউন না কেন, কোনও স্থানে বাস করিতেছেন শুনিলে অনেক সময় ঠাকুরের তাঁহাকে দর্শন করিতে ইচ্ছা হইত ; এবং ঐরূপ ইচ্ছার উদয় হইলে অযাচিত হইয়াও তাঁহার সহিত ভগবৎপ্রসঙ্গে কিছুকাল কাটাইয়া আসিতেন। লোকে ভাল বা মন্দ বলিবে, অপরিচিত সাধক তাঁহার যাওয়ায় সন্তুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হইবেন, আপনি তথায় যথাযথ সম্মানিত হইবেন কি না, এ সকল চিন্তার একটিও তখন আর তাঁহার মনে উদয় হইত না। কোনরূপে তথায় উপস্থিত হইয়া উক্ত সাধক কি ভাবের লোক ও নিজ গন্তব্য পথে কতদূরই বা অগ্রসর হইয়াছেন ইত্যাদি সকল কথা জানিয়া, বুঝিয়া, একটা স্থির মীমাংসায় উপনীত হইয়া তবে ক্ষান্ত হইতেন। সাধু সাধকদিগের ন্যায় শাস্ত্রজ্ঞ সাধক পণ্ডিতদিগের কথা শুনিলেও ঠাকুর অনেক সময় ঐরূপ ব্যবহার করিতেন। পণ্ডিত পদ্মলোচন, স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী প্রভৃতি অনেককে ঠাকুর ঐভাবে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের কথা আমাদিগকে অনেক সময় গল্পচ্ছলে বলিতেন। সেই কথাই আমরা এখন পাঠককে বলিতে চেষ্টা করিব।

ঠাকুরের আবির্ভাবের পূর্ব্বে বাঙ্গালায় বেদান্তশাস্ত্রের চর্চ্চা অতীব বিরল ছিল। আচার্য্য শঙ্কর বহু শতাব্দী পূর্ব্বে, বঙ্গের তান্ত্রিকদিগকে তর্কযুদ্ধে পরাজিত করিলেও সাধারণে নিজমত বড একটা প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন নাই। ফলে, এদেশের তন্ত্র অদ্বৈতভাবরূপ বেদান্তের মূল তত্ত্বটি সত্য বলিয়া স্বীকার করিযা নিজ উপাসনা-প্রণালীব ভিতর উহাব কিছু কিছু প্রবিষ্ট করাইয়া জনসাধারণে পূর্ব্ববৎ পূজাদির প্রচার করিতেই থাকে এবং বাঙ্গালাব পণ্ডিতগণ ন্যাযদর্শনেব আলোচনাতেই নিজ উর্ব্বব মস্তিষ্কের সমস্ত শক্তি ব্যয় করিতে থাকিযা কালে নব্য ন্যাযের সৃজন করতঃ উক্ত দর্শনের রাজ্যে অদ্ভুত যুগবিপর্য্যয় আনযন করেন। আচার্য্য শঙ্করের নিকট তর্কে পরাজিত ও অপদস্থ হইয়াই কি বাঙ্গালী জাতির ভিতর তর্কশাস্ত্রেব আলোচনা এত অধিক বাড়িযা যায়?—কে বলিবে। তবে, জাতিবিশেষের নিকট কোন বিষয়ে পরাজিত হইয়া অভিমানে, অপমানে পরাজিত জাতিব ভিতর ঐ বিষযে সকলকে অতিক্রম করিবাব ইচ্ছা ও চেষ্টার উদয জগৎ অনেকবার দেখিযাছে।

তন্ত্র ও ন্যাযের রঙ্গভূমি বঙ্গে ঠাকুরের আবির্ভাবের পূর্ব্বে বেদান্ত-চর্চ্চা ঐরূপে বিরল থাকিলেও, কেহ কেহ যে উহার উদার মীমাংসাসকলের অনুশীলনে আকৃষ্ট হইতেন না, তাহা নহে। পণ্ডিত পদ্মলোচন ঐ সকল ব্যক্তিগণের মধ্যে অন্যতম। ন্যাযে ব্যুৎপত্তি লাভ করিবার পর পণ্ডিতজির বেদান্তদর্শন পাঠে ইচ্ছা হয় এবং তজ্জন্য ৺ কাশীধামে গমন করিযা গুরুগৃহে বাস করতঃ তিনি দীর্ঘকাল ঐ দর্শনের চর্চ্চায় কালাতিপাত করেন। ফলে, কযেক বৎসর পরেই তিনি বৈদান্তিক বলিযা প্রসিদ্ধি লাভ করেন এবং দেশে আগমন করিবার পর বর্দ্ধমানাধিপের দ্বারা আহূত হইযা তদীয সভাপণ্ডিতের পদ গ্রহণ করেন। পণ্ডিতজির অদ্ভুত প্রতিভার পরিচয পাইয়া বর্দ্ধমানরাজ তাঁহাকে ক্রমে প্রধান সভাপণ্ডিতের পদে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং তাঁহার সুযশ বঙ্গের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়।

পণ্ডিতজির অদ্ভুত প্রতিভা সম্বন্ধে একটি কথা এখানে বলিলে মন্দ হইবে না। আধ্যাত্মিক কোন বিষযে একদেশীভাব বুদ্ধিহীনতা হইতেই উপস্থিত হয়—এই প্রসঙ্গে ঠাকুর পণ্ডিতজির ঐ কথা কখন কখন আমাদের নিকট উল্লেখ করিতেন। কারণ, আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অসাধারণ সত্যনিষ্ঠ ঠাকুর কাহার নিকট হইতে কখন কোন মনোমত উদারভাব-প্রকাশক কথা

শুনিলে উহা স্মরণ করিয়া রাখিতেন এবং কথাপ্রসঙ্গে উহার উল্লেখকালে যাহার নিকটে তিনি উহা প্রথম শুনিয়াছিলেন, তাহার নামটিও বলিতেন।

ঠাকুর বলিতেন, বর্দ্ধমান-রাজসভায় পণ্ডিতদিগের ভিতর 'শিব বড় কি বিষ্ণু বড়'—এই কথা লইয়া এক সময়ে মহা আন্দোলন উপস্থিত হয়। পণ্ডিত পদ্মলোচন তখন তথায় উপস্থিত ছিলেন না। উপস্থিত পণ্ডিত সকল নিজ নিজ শাস্ত্রজ্ঞান ও বোধ হয় অভিরুচির সহায়ে কেহ এক দেবতাকে, আবার কেহ বা অন্য দেবতাকে বড় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া বিষম কোলাহল উপস্থিত করিলেন। এইরূপে শৈব ও বৈষ্ণব উভয়পক্ষে দ্বন্দ্বই চলিতে লাগিল, কিন্তু কথাটার একটা সুমীমাংসা আর পাওয়া গেল না। কাজেই প্রধান সভা-পণ্ডিতকে তখন উহার মীমাংসা করিবার জন্য ডাক পড়িল। পণ্ডিত পদ্ম-লোচন সভাতে উপস্থিত হইয়া প্রশ্ন শুনিয়াই বলিলেন—'আমার চৌদ্দপুরুষে কেহ শিবকেও কখন দেখেনি, বিষ্ণুকেও কখন দেখেনি; অতএব কে বড় কে ছোট, তা কেমন ক'রে বোল্‌বো? তবে শাস্ত্রের কথা শুন্‌তে চাও তো এই বল্‌তে হয় যে, শৈবশাস্ত্রে শিবকে বড় করেছে ও বৈষ্ণবশাস্ত্রে বিষ্ণুকে বাড়িয়েছে, অতএব যার যে ইষ্ট, তার কাছে সেই দেবতাই অন্য সকল দেবতা অপেক্ষা বড়।' এই বলিয়া পণ্ডিতজি শিব ও বিষ্ণু উভয়েরই সর্ব্ব-দেবতাপেক্ষা প্রাধান্যসূচক শ্লোকগুলি প্রমাণস্বরূপে উদ্ধৃত করিয়া উভয়কেই সমান বড় বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন। পণ্ডিতজির ঐরূপ সিদ্ধান্তে তখন বিবাদ মিটিয়া গেল এবং সকলে তাঁহাকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। পণ্ডিতজির ঐরূপ আড়ম্বরশূন্য সরল শাস্ত্রজ্ঞান ও স্পষ্টবাদিত্বেই তাঁহার প্রতিভার পরিচয় আমরা বিলক্ষণ পাইয়া থাকি এবং তাঁহার এত সুনাম ও প্রসিদ্ধি যে কেন হইয়াছিল, তাহার কারণও বেশ বুঝিতে পারি।

শব্দজালরূপ মহারণ্যে বহুদূর পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন বলিয়াই যে, পণ্ডিতজির এত সুখ্যাতি লাভ হইয়াছিল তাহা নহে। লোকে দৈনন্দিন জীবনেও তাঁহাতে সদাচার, ইষ্টনিষ্ঠা, তপস্যা, উদারতা, নির্লিপ্ততা প্রভৃতি সদ্‌গুণরাশির পুনঃপুনঃ পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে একজন বিশিষ্ট সাধক বা ঈশ্বরপ্রেমিক বলিয়া স্থির করিয়াছিল। যথার্থ পাণ্ডিত্য ও গভীর ঈশ্বর-ভক্তির একত্র সমাবেশ সংসারে দুর্লভ; অতএব তদুভয় কোথাও একত্র পাইলে লোকে ঐ পাত্রের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হয়। অতএব লোক-পর-ম্পরায় ঐ সকল কথা শুনিয়া ঠাকুরের ঐ সুপুরুষকে যে দেখিতে ইচ্ছা হইবে,

ইহাতে বিচিত্র কিছুই নাই। ঠাকুরের মনে যখন ঐরূপ ইচ্ছার উদয় হয়, তখন পণ্ডিতজি প্রৌঢ়াবস্থা প্রায় অতিক্রম করিতে চলিয়াছেন এবং বর্দ্ধমান-রাজসরকারে অনেককাল সসম্মানে নিযুক্ত আছেন।

ঠাকুরের মনে যখনি যে কার্য্য করিবার ইচ্ছা হইত, তখনি তাহা সম্পন্ন করিবার জন্য তিনি বালকের ন্যায় ব্যস্ত হইয়া উঠিতেন। 'জীবন ক্ষণস্থায়ী, যাহা করিবার, শীঘ্র করিয়া লও'—বাল্যাবধি মনকে ঐ কথা বুঝাইয়া তীব্র অনুরাগে সকল কার্য্য করিবার ফলেই বোধ হয় ঠাকুরের মনের ঐরূপ স্বভাব হইয়া গিয়াছিল। আবার একনিষ্ঠা ও একাগ্রতা অভ্যাসের ফলেও যে মন ঐরূপ স্বভাবাপন্ন হয়, এ কথা অল্প চিন্তাতেই বুঝিতে পারা যায়। সে যাহা হউক, ঠাকুরের ব্যস্ততা দেখিয়া মথুরানাথ তাঁহাকে বর্দ্ধমানে পাঠাইবার সংকল্প করিতেছিলেন, এমন সময় সংবাদ পাওয়া গেল, পণ্ডিত পদ্মলোচনের শরীর দীর্ঘকাল অসুস্থ হওয়ায় তাঁহাকে আরিয়াদহের নিকট গঙ্গাতীরবর্ত্তী একটি বাগানে বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য আনিয়া রাখা হইয়াছে এবং গঙ্গার নির্ম্মল বায়ু সেবনে তাঁহার শরীরও পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু ভাল আছে। সংবাদ যথার্থ কি না, জানিবার জন্য হৃদয় প্রেরিত হইল।

হৃদয় ফিরিয়া সংবাদ দিল সংবাদ যথার্থ, পণ্ডিতজি ঠাকুরের কথা শুনিয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন এবং হৃদয়কে তাঁহার আত্মীয় জানিয়া বিশেষ সমাদর করিয়াছেন। তখন দিন স্থির হইল। ঠাকুর পণ্ডিতজিকে দেখিতে চলিলেন। হৃদয় তাঁহার সঙ্গে চলিল।

হৃদয় বলেন, প্রথম মিলন হইতেই ঠাকুর ও পণ্ডিতজি পরস্পরের দর্শনে বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে অমায়িক, উদার-স্বভাব, সুপণ্ডিত ও সাধক বলিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন; এবং পণ্ডিতজিও ঠাকুরকে অদ্ভুত আধ্যাত্মিক অবস্থায় উপনীত মহাপুরুষ বলিয়া ধারণা করিয়াছিলেন। ঠাকুরের মধুর কণ্ঠে মার নামগান শুনিয়া পণ্ডিতজি অশ্রু সংবরণ করিতে পারেন নাই এবং সমাধিতে মুহুর্মুহুঃ বাহ্য চৈতন্যের লোপ হইতে দেখিয়া ও ঐ অবস্থায় ঠাকুরের কিরূপ উপলব্ধিসমূহ হয়, সে সকল কথা শুনিয়া পণ্ডিতজি নির্ব্বাক্ হইয়াছিলেন। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ আধ্যাত্মিক অবস্থা সকলের সহিত ঠাকুরের অবস্থা মিলাইয়া লইতে যে চেষ্টা করিয়াছিলেন, ইহা আমরা বেশ বুঝিতে পারি। কিন্তু ঐরূপ করিতে যাইয়া তিনি যে ফাঁপরে পড়িয়াছিলেন এবং সেদিন কোন একটা বিশেষ সিদ্ধান্তে

উপনীত হইতে পারেন নাই ইহাও সুনিশ্চিত। কারণ, ঠাকুরের চরম উপলব্ধি সকল শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ দেখিতে না পাইয়া তিনি শাস্ত্রের কথা সত্য অথবা ঠাকুরের উপলব্ধিই সত্য, ইহা স্থির করিতে পারেন নাই। অতএব শাস্ত্রজ্ঞান ও নিজ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সহায়ে আধ্যাত্মিক সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বদা স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত পণ্ডিতজির বিচারশীল মন, ঠাকুরের সহিত পরিচয়ে আলোকের ভিতর একটা অন্ধকারের ছায়ার মত অপূর্ব্ব আনন্দের ভিতরে একটা অশান্তির ভাব উপলব্ধি করিয়াছিল।

প্রথম পরিচয়ের এই প্রীতি ও আকর্ষণে ঠাকুর ও পণ্ডিতজি আরও কয়েকবার একত্র মিলিত হইয়াছিলেন, এবং উহার ফলে পণ্ডিতজির ঠাকুরের আধ্যাত্মিক অবস্থা বিষয়ক ধারণা অপূর্ব্ব গভীর ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল। পণ্ডিতজির ঐরূপ দৃঢ় ধারণা হইবার একটি বিশেষ কারণও আমরা ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছি।—

পণ্ডিত পদ্মলোচন বেদান্তোক্ত জ্ঞানবিচারের সহিত তন্ত্রোক্ত সাধনপ্রণালীরও বহুকাল অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছিলেন; এবং ঐরূপ অনুষ্ঠানের ফলও কিছু কিছু জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। ঠাকুর বলিতেন, জগদম্বা তাঁহাকে পণ্ডিতজির সাধনলব্ধ-শক্তিসম্বন্ধে একটি গোপনীয় কথা ঐ সময়ে জানাইয়া দেন। তিনি জানিতে পারেন, সাধনায় প্রসন্না হইয়া পণ্ডিতজির ইষ্টদেবী তাঁহাকে বর প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি এতকাল ধরিয়া অগণ্য পণ্ডিত সভায় অপর সকলের অজেয় হইয়া আপন প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছেন! পণ্ডিতজির নিকটে সর্ব্বদা একটি জলপূর্ণ গাড়ু ও একখানি গামছা থাকিত, এবং কোনও প্রশ্নের মীমাংসায় অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে উহাদ্বারা মুখ প্রক্ষালন ও মোক্ষণ করিয়া তৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া আবহমান কাল হইতে তাঁহার রীতি ছিল। তাঁহার ঐ রীতি বা অভ্যাসের কারণানুসন্ধানে কাহারও কখন কৌতূহল হয় নাই এবং উহার যে কোন নিগূঢ় কারণ আছে, তাহাও কেহ কখন কল্পনা করে নাই। তাঁহার ইষ্টদেবীর নিয়োগানুসারেই যে তিনি ঐরূপ করিতেন এবং ঐরূপ করিলেই যে তাঁহাতে শাস্ত্রজ্ঞান, বুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্নমতি দৈববলে সম্যক্ জাগরিত হইয়া উঠিয়া তাঁহাকে অন্যের অজেয় করিয়া তুলিত, পণ্ডিতজি একথা কাহারও নিকটে—এমন কি, নিজ সহধর্ম্মিণীর নিকটেও কখন প্রকাশ করেন নাই। পণ্ডিতজির ইষ্টদেবী তাঁহাকে ঐরূপ করিতে নিভৃতে,

প্রাণে প্রাণে বলিয়া দিয়াছিলেন এবং তিনিও তদবধি এতকাল ধরিয়া উহা অক্ষুণ্ণভাবে পালন করিয়া অন্যের অজ্ঞাতসারে উহার ফল প্রত্যক্ষ করিতেছিলেন!

ঠাকুর বলিতেন—জগদম্বার কৃপায় ঐ বিষয় জানিতে পারিয়া তিনি অবসর বুঝিয়া একদিন পণ্ডিতজির গাড়ু গামছা তাঁহার অজ্ঞাতসারে লুকাইয়া রাখেন এবং পণ্ডিতজিও তদভাবে উপস্থিত প্রশ্নের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইতে না পারিয়া উহার অন্বেষণেই ব্যস্ত হন। পরে যখন জানিতে পারিলেন ঠাকুর ঐরূপ করিয়াছেন তখন আর পণ্ডিতজির আশ্চর্য্যের সীমা থাকে নাই! আবার যখন বুঝিলেন ঠাকুর সকল কথা জানিয়া শুনিয়াই ঐরূপ করিয়াছেন, তখন পণ্ডিতজি আর থাকিতে না পারিয়া তাঁহাকে সাক্ষাৎ নিজ ইষ্ট জ্ঞানে সজল নয়নে স্তব স্তুতি করিয়াছিলেন! তদবধি পণ্ডিতজি ঠাকুরকে সাক্ষাৎ ঈশ্বরাবতার বলিয়া জ্ঞান ও তদ্রূপ ভক্তি করিতেন! ঠাকুর বলিতেন—"পদ্মলোচন অত বড় পণ্ডিত হ'যেও এখানে (আমাতে) এতটা বিশ্বাস ভক্তি কোর্‌তো! বলেছিল—'আমি সেরে উঠে সব পণ্ডিতদের ডাকিয়ে, সভা ক'রে সকলকে বোল্‌বো, তুমি ঈশ্বরাবতার; আমার কথা কে কাট্‌তে পারে দেখ্‌বো।' মথুর (এক সময়ে অন্য কারণে) যত পণ্ডিতদের ডাকিয়ে দক্ষিণেশ্বরে এক সভার যোগাড় কর্‌ছিল। পদ্মলোচন নির্লোভী অশূদ্রপ্রতিগ্রাহী নিষ্ঠাচারী ব্রাহ্মণ; সভায় আস্‌বে না ভেবে আস্‌বার জন্য অনুরোধ কর্‌তে বলেছিল। মথুরের কথায় তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—'হ্যাঁগা, তুমি দক্ষিণেশ্বরে যাবে না?' তাইতে বলেছিল—'তোমার সঙ্গে হাড়ির বাড়ীতে গিয়ে খেয়ে আস্‌তে পারি!—কৈবর্ত্তের বাড়ীতে সভায় যাব, এ আর কি বড় কথা!"

মথুর বাবুর আহূত সভায় কিন্তু পণ্ডিতজিকে যাইতে হয় নাই। সভা আহূত হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার শারীরিক অসুস্থতা বিশেষ বৃদ্ধি পায় এবং তিনি সজল নয়নে ঠাকুরের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া কাশীধামে গমন করেন। শুনা যায়, সেখানে অল্পকাল পরেই তাঁহার শরীর ত্যাগ হয়।

ইহার বহুকাল পরে, ঠাকুরের কলিকাতার ভক্তেরা যখন তাঁহার শ্রীচরণপ্রান্তে আশ্রয় লইয়াছে এবং ভক্তির উত্তেজনায় তাহাদের ভিতর কেহ কেহ ঠাকুরকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া প্রকাশ্যে নির্দ্দেশ করিতেছে—তখন ঐ সকল

ভক্তের ঐরূপ ব্যবহার জানিতে পারিয়া ঠাকুর একদিন আমাদিগকে বলিয়াছিলেন—'কেউ ডাক্তারি করে, কেউ থিয়েটারের ম্যানেজারি করে, এখানে এসে অবতার বল্লেন! ওরা সব অবতার কাকে বলে, তার বোঝে কি? তোদের আস্‌বার আগে পদ্মলোচনের মত লোক—কেউ ছয়টা দর্শনে পণ্ডিত, কেউ তিনটা দর্শনে পণ্ডিত কত সব এখানে এসে অবতার ব'লে গেছে! অবতার বলায় তুচ্ছজ্ঞান হ'যে গেছে! ওরা অবতার ব'লে এখানকার (আমার) আর কি বাড়াবে বল্?'

পদ্মলোচন ভিন্ন আরও অনেক খ্যাতনামা পণ্ডিতদিগের সহিত ঠাকুরের সময়ে সময়ে সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাঁহাদের প্রত্যেকের ভিতরে ঠাকুর যে সকল বিশেষ গুণের পরিচয় পাইয়াছিলেন, সে সকলও কথাপ্রসঙ্গে তিনি কখন কখন আমাদিগকে বলিতেন। ঐরূপ কয়েকটির কথা সংক্ষেপে এখানে বলিয়া আমরা বর্ত্তমান প্রসঙ্গের উপসংহার করিব।

আর্য্যমত-প্রবর্ত্তক স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী একসময়ে বঙ্গদেশে বেড়াইতে আসিয়া কলিকাতার উত্তরে বরানগরের সিঁতি নামক পল্লীতে জনৈক ভদ্রলোকের উদ্যানে কিছুকাল বাস করেন। সুপণ্ডিত বলিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিলেও, তখনও তিনি নিজের মত প্রচার করিয়া দলগঠন করেন নাই। তাঁহার কথা শুনিযা ঠাকুর একদিন ঐ স্থানে তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। দয়ানন্দের কথাপ্রসঙ্গে ঠাকুর একদিন আমাদিগকে বলিয়াছিলেন—"সিঁতির বাগানে দেখ্‌তে গিয়েছিলাম, দেখ্‌লাম, একটু শক্তি হয়েছে, বুকটা সর্ব্বদা লাল হযে রয়েচে; বৈখরী অবস্থা—দিন রাত চব্বিশ ঘণ্টাই কথা (শাস্ত্রকথা) কচ্চে; ব্যাকরণ লাগিয়ে অনেক কথার (শাস্ত্র বাক্যের) মানে সব উল্‌টো পাল্‌টা কর্‌তে লাগ্‌লো; নিজে একটা কিছু কোব্‌বো, একটা মত চালাবো, এ অহঙ্কার ভিতরে রয়েচে!"

জয়নারায়ণ পণ্ডিতের কথায় ঠাকুর বলিতেন—'অত বড় পণ্ডিত, কিন্তু অহঙ্কার ছিল না; নিজের মৃত্যুর কথা জান্‌তে পেরে বলেছিল, কাশী যাবে ও সেখানে দেহ রাখ্‌বে—তাই হয়েছিল!'

আরিয়াদহ-নিবাসী কৃষ্ণকিশোর ভট্টাচার্য্যের শ্রীরামচন্দ্রে পরম ভক্তির কথা ঠাকুর অনেক সময় উল্লেখ করিতেন। কৃষ্ণকিশোরের বাটীতে ঠাকুরের গমনাগমন ছিল এবং তাঁহার পরমভক্তিমতী সহধর্ম্মিণীও ঠাকুরকে বিশেষ ভক্তি করিতেন। রামনামে ভক্তির তো কথাই নাই, ঠাকুর বলিতেন, কৃষ্ণ-

কিশোর, 'মরা' 'মরা' শব্দটিকেও ঋষিপ্রদত্ত মহামন্ত্র জ্ঞানে বিশেষ ভক্তি করিতেন। কারণ, পুরাণে লিখিত আছে, ঐ শব্দই মন্ত্ররূপে নারদ ঋষি দস্যু বাল্মীকিকে দিয়াছিলেন এবং উহার বারম্বার ভক্তিপূর্ব্বক উচ্চারণের ফলেই বাল্মীকির মনে শ্রীরামচন্দ্রের অপূর্ব্ব লীলায় স্ফূর্ত্তি হইয়া তাঁহাকে রামায়ণ-প্রণেতা কবি করিয়াছিল। কৃষ্ণকিশোর সংসারে শোকতাপও অনেক পাইয়াছিলেন। তাঁহার দুই উপযুক্ত পুত্রের মৃত্যু হয়। ঠাকুর বলিতেন, পুত্রশোকের এমনি প্রভাব, অত বড় বিশ্বাসী ভক্ত কৃষ্ণকিশোরও তাহাতে প্রথম প্রথম সামলাইতে না পারিয়া আত্মহারা হইয়াছিলেন।

পূর্ব্বোক্ত সাধকগণ ভিন্ন ঠাকুর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতিকেও দেখিতে গিয়াছিলেন, এবং মহর্ষির উদার ভক্তি ও ঈশ্বরচন্দ্রের কর্ম্মযোগপরায়ণতার কথা আমাদের নিকট সময়ে সময়ে উল্লেখ করিতেন। অন্যান্য পুস্তকে সে সকল কথার বিস্তার উল্লেখ থাকায় আমরা তাহার আর পুনরাবৃত্তি করিলাম না।

ত্রিবাঙ্কুরে স্বামী নির্ম্মলানন্দ।

রামকৃষ্ণমিশন সংবাদ।

(হরিপাদস্থ রামকৃষ্ণধর্ম্মসভার সম্পাদক প্রেরিত বিবরণীর অনুবাদ।)

বিগত ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যভাগে, ত্রিবাঙ্কুরস্থ হরিপাদ নামক স্থানের রামকৃষ্ণধর্ম্মসভা কর্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া রামকৃষ্ণমিশনের অন্যতম সভ্য ও বাঙ্গালোর রামকৃষ্ণমঠের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী নির্ম্মলানন্দ ধর্ম্মপ্রচারার্থ ত্রিবাঙ্কুরে গমন করিয়াছিলেন। ১৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে তিনি অরুণাকুলম্ ষ্টেশনে পৌঁছেন। এবং তথায় উক্ত ধর্ম্মসভার সম্পাদক শ্রীযুত অনন্তকৃষ্ণ ও শ্রীযুত সুব্বারাও আয়ার কর্তৃক অভ্যর্থিত হইয়া শ্রীযুত পল্লিয়াল গোপাল মেননের বাংলোতে সেই দিবস অতিবাহিত করেন। শ্রীযুত মেননের যত্ন ও আতিথ্যে স্বামীজি বিশেষ সন্তোষলাভ করেন, এবং পর দিবস প্রাতে ভেম্বানাদ হ্রদোপরি ষ্টীম-পোতযোগে আলেপ্পে অভিমুখে যাত্রা করেন এবং প্রায় পঞ্চাশ মাইল অতিক্রম করিয়া অপরাহ্ন সাড়ে পাঁচ

ঘটিকার সময় আলেপ্পে সহরে পদার্পণ করেন। এই স্থানে স্থানীয় উকিলবৃন্দ ও সনাতনধর্ম্ম-বিদ্যাশালার শিক্ষক ও ছাত্রগণ মহাসমাদরে স্বামীজির অভ্যর্থনা করেন। অতঃপর সকলে উক্ত বিদ্যালয়ে সমবেত হইলে, নগরবাসীদিগের অনুরোধে ভক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করিয়া স্বামীজি সমাগত শ্রোতৃবৃন্দকে উৎসাহিত ও পরিতুষ্ট করেন। রাত্রে শ্রীযুক্ত ধরমরাজ আয়ারের বাটীতে স্বামীজি ভিক্ষা গ্রহণ করেন, এবং প্রত্যূষেই একখানি নৌকাযোগে হরিপাদাভিমুখে রওনা হন। নৌকাঘাটে সহরের রাজকর্ম্মচারিগণ, ভদ্রমণ্ডলী ও রামকৃষ্ণ-ধর্ম্মসভার সভ্যগণ স্বামী নির্ম্মলানন্দের অভ্যর্থনা করেন এবং সকলে মিছিল করিয়া ভ্যালিয়া ফোটারম্ নামক স্বামীজির জন্য পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট আবাসাভিমুখে গমন করেন। পথে স্থানীয় এক দেবমন্দিরে স্বামীজি কিয়ৎকাল ঠাকুর-দর্শনাদি উপলক্ষে অপেক্ষা করেন। ১৮ই ফেব্রুয়ারী বেলা ৫টার সময় ধর্ম্মসভাকর্ত্তৃক সংস্কৃত ও ইংরাজীতে দুইটী অভিনন্দন পাঠ করা হয়। তদুত্তরে স্বামীজি একটী গভীর ভাবব্যঞ্জক বক্তৃতা দেন, এবং শ্রীগুরুদেবপ্রসঙ্গে সকলের হৃদয় ভক্তি ও উন্মাদনায় আপ্লুত করিয়াছিলেন। পরদিবস ধর্ম্মসভা কর্ত্তৃক শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব সম্পন্ন হয়। প্রাতে স্থানীয় দেবমন্দিরে সার্দ্ধদ্বিঘণ্টাব্যাপী ভজনগীতাদিতে অনেক ভদ্রলোকের সমাগম হয়; স্বামী নির্ম্মলানন্দ ভজনে যোগদান করিয়া সকলকে উৎসাহিত করেন। পরে প্রায় ২৩০০ শত দরিদ্র লোককে তৃপ্তিসহকারে খাওয়ান হইয়াছিল। বেলা চারিটার সময় স্থানীয় স্কুলপ্রাঙ্গণে সুসজ্জিত মণ্ডপের নিম্নে এক মহতী সভার অধিবেশন হয়। সভায় শ্রীযুত কৃষ্ণ ওয়ারিয়ার বি, এ, স্থাণু আসারী নামক সাধু ও মুন্সেফ শ্রীযুত নারায়ণ পিলে মহোদয়গণ শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবার পর স্বামী নির্ম্মলানন্দ "হিন্দুধর্ম্মের স্বভাবসিদ্ধ অবিনাশিত্ব" সম্বন্ধে এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। ওজস্বিনী ভাষায় জগতের সমগ্র ধর্ম্মবিধানের ভিত্তি পরীক্ষা করিয়া বক্তা গভীর গবেষণার সহিত প্রমাণ করেন যে হিন্দুধর্ম্মের ভিত্তি সর্ব্ববিধ ক্ষয়-পরিণামের অতীত। তাঁহার বক্তৃতাদ্বারা সকলেই বিশেষভাবে উপকৃত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার ভাব ও বর্ণনা-কৌশল এতদূর হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল যে, যাঁহারা ইংরাজি বুঝেন না, তাঁহারাও বিনা চাঞ্চল্যে ও সসম্ভ্রমে শেষ পর্য্যন্ত স্থিরভাবে শুনিয়াছিলেন। বক্তৃতা শেষ হইলে শ্রীযুত সুব্রহ্মণ্য আয়ার বক্তৃতার মর্ম্ম দেশীয় ভাষায় অনুবাদ করিয়া দেন এবং শ্রোতৃবৃন্দকে

তাঁহাদের উৎসাহ ও অবধানশীলতার জন্য এবং ধর্ম্মসভার প্রতি সহায়তার জন্য ধন্যবাদ দেন। কাণ্ডিয়ুর সহরের শ্রীযুত মহাদেব আয়ার তৎপরে জনসাধারণের পক্ষ হইতে ধর্ম্মসভার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং জ্ঞান বৈরাগ্য ও করুণার উজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্বরূপ সন্ন্যাসি-পুঙ্গবের সহিত তৎপ্রদেশবাসীদের যোগাযোগ সংঘটনের জন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দেন। চন্দন গোলাপজল প্রভৃতি বিতরণ করা হইলে শ্রীরামকৃষ্ণের নামে জয়ধ্বনি করিতে করিতে সভাভঙ্গ হয়। অল্পক্ষণ পরেই স্থানীয় সুসজ্জিত স্কুলগৃহে ভজনাদি আরম্ভ হয় এবং রাত্রি ৮ টা পর্য্যন্ত মহোৎসাহে নামকীর্ত্তন হয়। অতঃপর স্বামীজি স্বীয় আবাসে প্রত্যাগমন করিলে, তিরুভেলা হইতে আগত অনেক ভদ্রমহোদয়ের সহিত নানা সৎপ্রসঙ্গে তাঁহার বাক্যালাপ হয়। এইরূপ মহাসমারোহে হরিপাদ সহরে এবার শ্রীরামকৃষ্ণোৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

পরদিবস স্বামীজি রামকৃষ্ণ-ধর্ম্মসভায় গীতাসম্বন্ধে আলোচনাদি করেন এবং ধ্যান সম্বন্ধে শিক্ষা প্রদান করেন। বৈকালে বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে এক সভায় তিনি অনেক সদুপদেশ দেন এবং নানা স্থান হইতে উৎসবোপলক্ষে সমাগত ভক্তবৃন্দকে সৎপ্রসঙ্গ ও উপদেশাদিদ্বারা আপ্যায়িত করেন।

হরিপাদ হইতে রওনা হইয়া স্বামী নির্ম্মলানন্দ ২১শে তারিখে কুইলনে গমন করেন। স্থানীয় কর্ম্মচারিগণ ও ভদ্রমহোদয়গণ তাঁহাকে সাদরে অভিবাদন করেন এবং সন্ধ্যার সময় সকলে সমবেত হইয়া তাঁহার সহিত বিবিধবিষয়ক প্রশ্নোত্তরালাপে প্রবৃত্ত হন। স্বামীজির সদুত্তর প্রদানে সকলেই মুগ্ধ ও পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন। রাত্রি প্রায় ১০ টার সময় সভা ভাঙ্গিয়া যায়। ত্রিবাঙ্কুর হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পূর্ব্বে হরিপাদের রামকৃষ্ণ-ধর্ম্মসভার সভ্যগণ সভার কার্য্যপ্রণালী ও তৎপরিচালনা সম্বন্ধে স্বামী নির্ম্মলানন্দের নিকট অনেক সৎপরামর্শ লাভ করিয়াছেন।

মহর্ষি ফ্র্যানসিস্।

শ্রীহরিদাস দত্ত বি, এ।

—:০:—

দ্বিতীয় অধ্যায়।

মানসিক পরিবর্ত্তন—১২০৪—১২০৬ খৃঃ অঃ।

এ্যাসিসিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ফ্র্যান্‌সিস্‌ পূর্ব্বাভ্যাস অনুযায়ী দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। সকলের বোধ হইল, তাঁহার উচ্ছৃঙ্খলতা যেন পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ফলে, তিনি শীঘ্রই সাংঘাতিক রোগে পীড়িত হইয়া পড়িলেন। ঐ কালে এমন অনেক দিন গিয়াছে, যখন তাঁহার জীবনের কোন আশাই ছিল না। কিন্তু এই প্রাণসংশয়কালেই তাঁহার মানসিক জীবনে মহাপরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। আরোগ্যলাভ করিবার পর যখন তাঁহার দেহে ধীরে ধীরে বল-সঞ্চার হইতেছিল, তখন তিনি প্রথম প্রথম বাটীর মধ্যেই বেড়াইয়া বেড়াইতেন। ক্রমে, প্রকৃতির শান্ত, স্নিগ্ধ দৃশ্যমধ্যে স্থিরভাবে বসিয়া চিন্তা করিতে পাইলেই তিনি জীবনীশক্তি পুনর্লাভ করিবেন ভাবিয়া তাঁহার বাটীর বাহিরে একদিন বেড়াইবার অভিলাষ জন্মে। ঈদৃশ ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া একগাছি যষ্টির উপর ভর করিয়া তিনি নগরদ্বার-অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহার পিত্রালয়ের নিকটবর্ত্তী নগর-তোরণটী দিয়া বহির্গত হইলেই সুন্দর নৈসর্গিক দৃশ্য নয়নপথে পতিত হইত এবং উন্মুক্ত পল্লীগ্রামে আসিয়া উপস্থিত হওয়া যাইত। ঐ তোরণ দিয়া বহির্গত হইয়া পূর্ব্বোক্ত 'সুবাসিও' শৈলের এমন একাংশে উপস্থিত হওয়া যাইত যে, সেখান হইতে নগরটী দৃষ্টিপথের সম্পূর্ণ বহির্ভূত হইয়া পড়িত এবং নগরের কোনরূপ শব্দও আর শুনিতে পাওয়া যাইত না। তোরণের বহির্ভাগে পথটী বক্রভাবে ঘুরিয়া ফিরিয়া প্রসারিত ছিল। উহার বাম পার্শ্বে উন্নত সুবাসিও শৈল—দেখিলেই মন এক অনির্দ্দেশ্য গাম্ভীর্য্যে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িত এবং দক্ষিণ পার্শ্বে আম্ব্রিয়ার সুবিস্তীর্ণ ক্ষেত্রমধ্যে ছোট ছোট গ্রাম, মেঘমালার ন্যায় অস্পষ্ট শৈলশ্রেণী, এবং কৃষিকার্য্যোপযোগী ভূমিভাগ শোভা পাইতেছে, দেখা যাইত। শৈলগাত্রস্থিত দেবদারু,

সিডার (এক প্রকার পার্ব্বত্য বৃক্ষ) ওক্, জলপাই ও দ্রাক্ষা প্রভৃতি নানাবিধ বৃক্ষ ও লতারাজি অতুলনীয় সৌন্দর্য্যে চারিধার বিমণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছিল এবং উহাদের প্রভাবে সমগ্র দৃশ্য যেন জীবন্ত বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছিল। তথাকার সমুদয় ভূভাগের সুষমাময় সৌন্দর্য্যে যে পূত ও প্রশান্ত ভাবের পরিচয় পাওয়া যাইত, তাহাতে মানব আপন হৃদয়তন্ত্রীতে এক অপূর্ব্ব মূর্চ্ছনার অনুভব করিত। ফ্র্যান্সিস্ উহার সাহায্যে যৌবনের মধুর আমোদ-প্রিয়তাই পুনর্লাভের আশা করিয়াছিলেন। স্বাস্থ্যলাভোন্মুখ রোগীর অনুভব-শক্তি সর্ব্বথা তীক্ষ্ণ হইয়া থাকে। তিনি তৎসহায়ে ঐ বসন্তকালীন সৌরভ প্রাণ ভরিয়া উপভোগ করিতে লাগিলেন সত্য, কিন্তু যেরূপ আশা করিয়া-ছিলেন, তাহা ঘটিয়া উঠিল না! হৃদয়মধ্যে প্রসন্নতা লাভ না করিয়া বরং হাস্যময়ী প্রকৃতির এই অনিন্দ্য সৌন্দর্য্যে নিজের হৃদয়মধ্যে একটা বিষাদের কালিমাই অনুভব করিতে লাগিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, সহরের বাহিরে উন্মুক্ত স্থানে কিছুকাল মৃদুমন্দবায়ুসেবনে তিনি শারীরিক দুর্ব্বলতা হইতে মুক্তিলাভ করিবেন। ঐ বিষয়ে অনেকটা সফল-মনোরথ হইলেও, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মনে একটা নূতন উপসর্গ আসিয়া উপস্থিত হইল। শারীরিক অসুস্থতার কষ্ট অপেক্ষা সহস্রগুণে অধিকতর ক্লেশকর নৈরাশ্য ও হতাশভাবে তিনি হৃদয়মধ্যে এমন অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিলেন যে, সহসা তাঁহার হৃদয় শূন্য ও দুর্ব্বহ-ভারবিশিষ্ট বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। এই শূন্যতার জন্য তিনি হৃদয়ে একটা আতঙ্ক অনুভব করিতে লাগিলেন! হৃদয়-সিংহাসন শূন্য হইলে সমুন্নত চরিত্রমাত্রেই এই ভাবের একটা অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করিয়া থাকে। তখন অতীত স্মৃতি ফ্র্যান্সিসের পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল এবং নিজের প্রতি তাঁহার কেমন একটা ঘৃণার উদ্রেক হইতে লাগিল। অতীত জীবনে তিনি যে সমুদয় অভিলাষ অতি যত্নের সহিত হৃদয়ে পোষণ করিয়াছিলেন, সে সকলকে এখন অকিঞ্চিৎকর ও হাস্যোদ্দীপক বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন। বাটীর বাহিরে বা ভিতরে কোন স্থানেই এ যন্ত্রণার উপশম হইত না। এইরূপ স্থলে লোকে ভালবাসা অথবা ধর্ম্ম-বিশ্বাসের সাহায্যে মনোবেদনার হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভের উপায় অন্বেষণ করে; কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহার পরিবার অথবা বন্ধুবর্গের মধ্যে কেহই তাঁহার বর্ত্তমান মানসিক অবস্থা বুঝিতে সমর্থ হইল না। সে সময়ের অধি-কাংশ লোকের ন্যায় তাঁহারও প্রচলিত ধর্ম্মকে ভাবহীন, অর্থশূন্য কতকগুলি

বাক্যমাত্র অথবা দুর্ব্বোধ্য শব্দের সাহায্যে কুসংস্কারমূলক পূজা-পদ্ধতি প্রচারের উপায় ভিন্ন অপর কিছুই নহে বলিয়া ধারণা ছিল। ধর্ম্ম বলিলে তখনকার লোকে পুরোহিতদিগের দেয় বিষয়ে অবৈধ আচরণ না করা, নগরের স্থানে স্থানে ভগবানের মূর্ত্তি অথবা চিত্রাদি প্রতিষ্ঠা করা অথবা ধর্ম্মযাজকদিগকে যথাসময়ে নিয়মিত ভাবে কর প্রদান করিতে পারা এবং তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা—এ কথাই বুঝিতেন। ধর্ম্মার্থদানে কৃপণতা ও ধর্ম্মযাজকদিগের প্রাপ্তি সম্বন্ধে প্রতারণাদি অপরাধের জন্য কঠিন দণ্ডের বিধান থাকিলেও ধর্ম্মযাজকগণ উপযুক্ত পুরস্কার পাইলেই ঐ সকলের হস্ত হইতে মানবকে সম্পূর্ণরূপে অব্যাহতি দানে সক্ষম—ইহাই তখন ধর্ম্মবিশ্বাসের প্রধান অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইত।

প্রচলিত ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় ধারণার মধ্যেই ফ্র্যান্‌সিসের জীবন এতদিন অতিবাহিত হইয়াছিল। তাঁহার বর্ত্তমান মানসিক অশান্তি দূর করিতে একমাত্র আধ্যাত্মিক উপায়ই যে অবলম্বনীয়, তাহা তিনি স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন নাই। জীবন্ত বিশ্বাসে অধিকারী হইবার জন্য তাঁহাকে যে কঠোর তপস্যার অনুষ্ঠান করিতে হইবে, একথা তিনি জানিতেন না। তাঁহার জীবনের যে সময়ের কথা আমরা বলিতেছি, সে সময় তিনি উহার আভাসমাত্রও পান নাই এবং সেজন্য ঐরূপ উপায়ের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও তাঁহার কোনরূপ ধারণা ছিল না। এখন তিনি কেবলমাত্র ইহাই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, পার্থিব আমোদ-প্রমোদে কিছুই নাই—উহা শূন্যগর্ভ ও অন্তঃসারশূন্য এবং উহারা পরিণামে বিতৃষ্ণা, অবসাদ ও আত্মগ্লানি আসিয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু ঐ কথা বুঝিয়াও তিনি পুনরায় পূর্ব্ববৎ ভোগসুখময় জীবনযাপনের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন! মানবের দেহ মন এতদূর দুর্ব্বল যে, মুহূর্ত্তকালের জন্যও যদি তাহার হৃদয় হইতে সদিচ্ছা অবসর গ্রহণ করে, তবে অমনি উহারা পূর্ব্বপরিচিত ভোগসুখের পথে গমন করিতেই উদ্যত হয়। ফ্র্যান্‌সিস্‌ও পূর্ব্বের ন্যায় ভোগের তরঙ্গে জীবনতরী ভাসাইয়া দিলেন! কিন্তু এবার তিনি বুঝিয়া সুঝিয়া স্বেচ্ছায় ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন—কোনরূপ ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া ঐরূপ করেন নাই। তবে কি তিনি পূর্ব্বোক্ত অসহ্য ক্লেশকর পরিদেবনার হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইবার আশায় ঐরূপ করিয়াছিলেন? যেরূপ আগ্রহের সহিত এবার তিনি ভোগসুখের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন, তাহাতে ঐরূপ অনুমান করাই সমীচীন বলিয়া বোধ হয়।

এই সময় তাঁহার যশোলাভের এক অবসর উপস্থিত হয়। ইটালির দক্ষিণ-ভাগে পোপ্ তৃতীয় ইনোসেন্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চলিতেছিল। সে সময়ের এক প্রসিদ্ধ বীর পোপের পক্ষ অবলম্বন করেন। তাঁহার অধীনে কার্য্য করিবার অভিপ্রায়ে এ্যাসিসির একজন যোদ্ধ্পুরুষ যুদ্ধাভিযানের জন্য আয়োজন করিতেছিলেন। কারাবাসসময়ে ফ্র্যান্‌সিসের সহিত বোধ হয় ইঁহার পরিচয় হইয়া থাকিবে। সে যাহা হউক, পূর্ব্বোক্ত সংবাদে ফ্র্যান্‌সিসের হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। ঐ বীরবরের অধীনে যুদ্ধে যাইয়া তিনি শীঘ্রই যশোমাল্যে ভূষিত হইযা উঠিবেন, তাঁহার মনে এই ধারণার উদয় হইতে লাগিল। তাঁহার যুদ্ধাভিযান স্থির হইলেও তিনি প্রমোদ-তরঙ্গে অঙ্গ ঢালিযা রহিলেন, এবং মহাসমারোহে অভিযানের আয়োজন করিতে লাগিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রেও যাহাতে কোনপ্রকার বিলাসিতার দ্রব্যের অভাব না হয়, এই ভাবে দ্রব্যসম্ভার সংগৃহীত হইতে লাগিল এবং ঐ আয়োজন শীঘ্রই সাধারণের আলোচনার বিষয় হইয়া উঠিল। এই যুদ্ধাভিযানের অধিনেতা নিজ অবস্থা-বিপর্য্যয়ে পরিমিত ব্যযে, অতি সংক্ষেপে ঐ আয়োজনের নিমিত্ত দ্রব্যসম্ভার সংগ্রহ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সে জন্য ফ্র্যান্‌সিসের ঐ বিষয়ক বিপুল আয়োজনই বিশেষভাবে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। কিন্তু এ সময়েও আড়ম্বর প্রকাশ করিবার ইচ্ছা অপেক্ষা দয়া যে তাঁহার হৃদয়ে অধিকতর বলবতী ছিল—এ বিষয়ের পরিচয পাওয়া যায়। কারণ, এই কালে তিনি তাঁহার মহামূল্য পরিচ্ছদ একজন হীনাবস্থ যোদ্ধ্পুরুষকে দান করেন।

এই যুদ্ধাভিযানের দ্রব্য-সংগ্রহে ফ্র্যান্‌সিস্ যেরূপ অপরিমিত ব্যয় করিতে লাগিলেন, তাহাতে তাঁহাকে একজন মহা ধনবান্ ও সম্ভ্রান্তবংশীয় বলিয়া লোকের ধারণা হইতে লাগিল। তাঁহার ঈদৃশ আচরণ তাঁহার সহ-যাত্রিগণের অসন্তোষের কারণ হইয়াছিল এবং ইহার প্রতিশোধ লইবার জন্য তাঁহাদের মনে প্রবল ইচ্ছাও জন্মিতে লাগিল। কিন্তু সঙ্গিগণের মনে ঐরূপ ঈর্ষার উদ্রেক সম্বন্ধে ফ্র্যান্‌সিস্ সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ থাকিয়া তাঁহার ভবিষ্যৎ যশো-লাভের চিন্তাতেই দিবানিশি তন্ময় হইয়া থাকিলেন। কল্পনা-চক্ষে তিনি দেখিতেন, যেন তাঁহার পিত্রালয় সম্পূর্ণভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে; বস্ত্রের বস্তার স্থানে, তথায় যেন নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র শোভিত রহিয়াছে এবং অর্দ্ধাঙ্গিনী-স্বরূপিণী কোন অভিজাত বংশীয়া সুন্দরী যুবতীর পার্শ্বে তিনি স্বয়ং

দণ্ডায়মান হইয়া রহিয়াছেন। আবার এই সমুদয় কল্পনাপ্রসূত দৃশ্য তাঁহার তখন ধ্রুব সত্য হইবে বলিয়া মনে ধারণা হইত। পূর্ব্বে কেহই তাঁহাকে ঐরূপ এককালে প্রফুল্ল অথচ চিন্তাপূর্ণ দেখে নাই। এ সময়ে ঐ প্রফুল্লতার কারণ কেহ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি দৃঢ় নিশ্চয়তার সহিত বলিতেন "আমার বিশ্বাস, আমি একজন প্রসিদ্ধ রাজপুত্রের পদবীতে শীঘ্রই অধিরূঢ় হইব।" ক্রমে যাত্রার দিন উপস্থিত হইল। তিনি ঢালহস্তে অশ্বপৃষ্ঠে বসিয়া সহাস্য-বদনে জন্মস্থান হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন এবং কতিপয় সৈন্যসমভি-ব্যাহারে সুবাসিও শৈলের পার্শ্ববর্ত্তী আঁকাবাকা পথে এ্যাসিসির দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত স্পোলেটো নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

স্পোলেটোয পঁহুছিয়া ফ্র্যান্‌সিসের জ্বর হয়, এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহার পূর্ব্বোক্ত কল্পনাপ্রসূন শুষ্ক হইয়া যায়। তিনি পরদিবস এ্যাসিসি নগরে ফিরিয়া আসেন। কেহ কেহ বলেন যে, যে দিবস তিনি যুদ্ধযাত্রায় বহির্গত হ'ন, সেই দিবস সন্ধ্যাকালে তিনি কি এক দৃশ্য দর্শন করেন এবং উহারই প্রেরণায এ্যাসিসি নগরে ফিরিয়া আসিতে সংকল্প করেন। তাঁহার অপ্রত্যাশিত ভাবে আকস্মিক প্রত্যাবর্ত্তনে সহরমধ্যে এক মহা আন্দোলন উপস্থিত হয় এবং তাঁহার পিতামাতাও অতিশয় ক্ষুণ্ণ হ'ন। তিনি কিন্তু পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ উৎসাহে দরিদ্রগণকে দান করিতে এবং পূর্ব্বের ন্যায নির্জ্জন স্থানে একাকী বাস করিতেই থাকেন। তাঁহার পূর্ব্ব-বন্ধুবান্ধবগণ তিনি পূর্ব্ববৎ তাঁহাদের সহিত বিলাসিতায় যোগদান করি-বেন ভাবিয়া তাঁহার নিকট দল বাঁধিয়া পূর্ব্বের ন্যায়ই উপস্থিত হইতে লাগিলেন। তিনিও তাঁহাদের ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু এই সময় হইতে তাঁহার মনোমধ্যে এক মহা পরিবর্ত্তনের সূচনা হইল। কোনরূপ আমোদপ্রমোদেই তিনি আর এখন অধিকক্ষণ মনোনিবেশ করিতে পারিতেন না এবং দিবসের কিয়দংশ সহরের বাহিরে ভ্রমণ করিয়াই অতি-বাহিত করিতেন। এই সময়ে একজন বন্ধু তাঁহার সঙ্গে সর্ব্বদাই থাকিতেন। ইঁহার প্রকৃতি তাঁহার পূর্ব্বপরিচিত বন্ধুবর্গের প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিল। এবারও শারীরিক স্বাস্থ্যলাভের সহিত ফ্র্যান্‌সিস্‌ সর্ব্বদা চিন্তান্বিত হইয়া থাকিতেন, কিন্তু এবার তাঁহার মানসিক ক্লেশ পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক পরি-মাণে অল্প ছিল। পার্থিব আমোদপ্রমোদে অথবা যশের আকাঙ্ক্ষায় আর বৃথা সময়াতিপাত করা তাঁহার কর্ত্তব্য নহে, কোন গুরুতর আদর্শ অবলম্বন

করিয়া তাহার জন্য জীবন উৎসর্গ করাই বিধেয়—একথাই এখন তিনি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার পূর্ব্বোক্ত বন্ধুটীও তাঁহার আচরণ দেখিয়া তাঁহাকে ঐ কথা বলিতে লাগিলেন। এখন হইতেই তাঁহার হৃদয়ে ধর্ম্মভাব প্রথম অঙ্কুরিত হইল। যে মুহূর্ত্ত হইতে জীবন-সমস্যাপূরণের এই নূতন পথ তিনি দেখিতে পাইলেন, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই তাঁহার হৃদয়ে ঐ পথ অবলম্বন করিবার প্রবল আগ্রহও জন্মিতে থাকিল। ফ্র্যান্সিস্ যখন যে কার্য্য করিতেন, তাহাতেই তাঁহার প্রবল আগ্রহের পরিচয় পাওয়া যাইত —তাঁহার স্বভাবই ঐরূপ ছিল। এখন হইতে তিনি সদাসর্ব্বদা ঐ বন্ধুটীর সহিতই নিভৃতে কালাতিপাত করিতেন। প্রবল আন্তরিক সংগ্রাম লিখিয়া প্রকাশ করিবার বিষয় নহে। যাঁহারা ঈদৃশ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হ ন, তাঁহারাই উহার তীব্রতা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া থাকেন। এই ভীষণ সংগ্রামের বেগে স্থিরভাবে অবস্থান করিবার শক্তিও ফ্র্যান্সিসে বিলক্ষণ ছিল। তাঁহার পূর্ব্বোক্ত বন্ধুটিও তাঁহার ঐরূপ অবস্থায় তাঁহার প্রতি নিজ কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বেশ ধারণা করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি কদাচ উপদেশচ্ছলে এক আধটী কথা বলিতেন; অধিকাংশ সময় নিঃশব্দে তাঁহার অনুগমনমাত্র করিতেন; এবং ফ্র্যান্সিস্ স্বেচ্ছায় তাঁহাকে যাহা বলিতেন, তদতিরিক্ত কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া তাঁহার প্রতি নিজ সহানুভূতির পরিচয়মাত্র প্রদান করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন। সময়ে সময়ে ফ্র্যান্সিস্, এ্যাসিসির নিকটবর্ত্তী একটী গুহাভিমুখে গমন করিয়া উহার মধ্যে একাকী অবস্থান করিতেন। পাষাণময় গুহাটী কতকগুলি জলপাইবৃক্ষের অন্তরালে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত ছিল। তথায় যাইয়া তিনি গভীর আর্ত্তনাদে হৃদয়ের দুর্ব্বহ ভার দূর করিতে প্রয়াস পাইতেন; আবার কখন কখন যৌবনের বিশৃঙ্খলতার কথা স্মরণ করিয়া অতিশয় ভীত ও অনুতপ্ত হইয়া জগদীশ্বরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেন! কিন্তু অধিকাংশ সময়ই তাঁহার দৃষ্টি ভবিষ্যজ্জীবনের প্রতি সন্নদ্ধ থাকিত। তিনি প্রবল আগ্রহের সহিত মহান্ সত্যের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং উহাতেই তাঁহার অবশিষ্ট জীবন উৎসর্গ করিতে সংকল্প করিয়াছিলেন। শাস্ত্রে * এই অমিয়, অভয় বাণী দেখিতে পাওয়া যায় "Whosoever seeks finds ; he who asks receives , and to him who knocks, it shall be opened."—"যিনি আন্তরিক আগ্রহের সহিত

* The Holy Bible.

অধ্যাত্ম বিষয়ের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হ'ন, তিনি নিশ্চয়ই উহার প্রকৃত তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন।" দীর্ঘকাল নির্জ্জনবাসের পর গুহা হইতে যখন তিনি বাহিরে আসিতেন তখন তাঁহার বিষণ্ণ বদন দর্শন করিয়া তাঁহার ব্যাকুলভাবে প্রার্থনা ও অন্তঃসংগ্রামের বিষয় অতি পরিস্ফুটভাবে বুঝিতে পারা যাইত। কিন্তু ভগবদ্ভাবে তন্ময়ত্বে যে শান্তির উদয় হয়, তাহা এখনও তাঁহার হৃদয়ে বিকশিত হয় নাই। অতীতের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিবার প্রয়াসেই তাঁহার মন এখনও ব্যাপৃত ছিল। সে সময়ও আসিতে বিলম্ব হয় নাই! তিনি যাহাতে পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় আমোদপ্রমোদে দিনাতিপাত করেন, তদ্বিষয়ে তাঁহার পূর্ব্ব-বন্ধুবান্ধবগণ ক্রমাগত চেষ্টা করিতেছিলেন। একদিন তিনি বহু অর্থব্যয়ে উৎসবের আয়োজন করিয়া তাঁহাদের সকলকে নিমন্ত্রণ করিলেন। তাঁহাদের চেষ্টা এতদিনে সফল হইয়াছে, একথাই এই ঘটনায় বন্ধুদিগের মনে হইয়াছিল এবং ঐ দিবসের উচ্ছৃঙ্খল উৎসবে তাঁহারা পূর্ব্বের ন্যায় ফ্র্যান্সিস্‌কেই তাঁহাদের নেতার পদবাতে অভিষিক্ত করিলেন। অনেক রাত্রি অবধি প্রমোদ-তরঙ্গ চলিতে থাকিল। অবশেষে উৎসবঅবসানে সকলে বাটীর বাহিরে রাজপথে উপস্থিত হইলেন এবং সঙ্গীত ও উচ্চ ধ্বনিতে চারিদিক্ মুখরিত করিয়া তুলিলেন। কিন্তু হঠাৎ তাঁহাদের জ্ঞান হইল, ফ্র্যান্সিস্ তাঁহাদের মধ্যে নাই! অনেক অনুসন্ধানের পর দেখা গেল, তিনি তাঁহাদের বহু পশ্চাতে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। প্রমোদ-মিছিলের অধিনায়কের পদে বরণ করিয়া তাঁহারা তাঁহার হস্তে যে দণ্ডটি প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার হস্তে রহিয়াছে; কিন্তু তিনি এরূপ গভীর চিন্তামগ্ন যে, তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহাদের স্থাণুবৎ মনে হইতে লাগিল এবং তাঁহাদের বর্ত্তমান কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে তাঁহার কিছুমাত্র সংজ্ঞাই যে নাই—একথা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতে লাগিল। তাঁহারা সকলে তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন— "ফ্র্যান্সিস্! তোমার কি হইয়াছে?" ইহাতে একজন বলিয়া উঠিলেন "হ'বে আর কি?—দেখ্‌চ না, বিবাহের কথা ভাবিতেছে!" তাঁহাদের ঐরূপ কথাবার্ত্তায় ফ্র্যান্সিসের চৈতন্য হইল এবং তিনি ঈষৎহাস্য করিয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন—"হ্যাঁ, ঐ ব্যক্তি সত্য কথাই বলিয়াছেন। আমি এমন একটী পাত্রীরত্নের পাণিগ্রহণ সম্বন্ধে চিন্তা করিতেছি, যাঁহার রূপ, গুণ, ঐশ্বর্য্য ও পবিত্রতার উৎকর্ষ তোমরা ধারণার ভিতরেই আনিতে পারিবে

না।” কিন্তু তাঁহার ঐ পরিহাস-বাক্যের মধ্যে যে গভীর অর্থ নিহিত ছিল, তাহা ইঁহারা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না। ফ্র্যান্‌সিসের অধ্যাত্ম-জীবনে ইহা একটী বিশেষ ঘটনা। ইহার পর হইতে পার্থিব আমোদ প্রমোদের সহিত তাঁহার সম্পর্ক চিরদিনের জন্য শেষ হয়। ব্যাপার যে কি তাহা তাঁহার বন্ধুগণ সম্ভবতঃ প্রথমে কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। কিন্তু তিনি বেশ বুঝিতে পারিতেছিলেন যে তাঁহার ও উঁহাদের মধ্যে একটা ব্যবধান যেন ক্রমশঃ পরিস্ফুট ও পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। শীঘ্রই তাঁহার মানসিক অবস্থা বুঝিতে পারিয়া তাঁহারা তাঁহার সঙ্গ ত্যাগ করিলেন; এবং শীঘ্রই তিনিও তাঁহাদের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া প্রাণ ভরিয়া নির্জ্জনবাসজনিত সুখ উপভোগ করিতে লাগিলেন। কারণ অতীত জীবনের উচ্ছৃঙ্খলতার কথা স্মরণ করিয়া তিনি অনুতাপানলে এখন দগ্ধ হইতেন সত্য এবং তাদৃশ কলুষময় জীবনে ক্লেশ অনুভব না করিয়া তিনি ইতিপূর্ব্বে কিরূপে সুখবোধ করিতেন এ কথা ভাবিয়া তিনি বিস্মিতও হইতেন সত্য, কিন্তু তাহা বলিয়া তিনি অনুতাপে একেবারে অভিভূত হইয়া কখনও পড়েন নাই।

দরিদ্রগণ ফ্র্যান্‌সিসের প্রতি কৃতজ্ঞ ও অনুরক্ত ছিল। তিনি নিজেকে তাহাদের অতিরিক্ত প্রশংসাবাদের অনুপযোগী বিবেচনা করিলেও তাহাদের স্তুতিবাদ তাঁহার অতিশয় মধুর বলিয়া মনে হইত। ইহারা তাঁহাকে অন্তরের সহিত ভালবাসিলেও অনেক সময় সে কথা মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিত না; কিন্তু তাঁহার উহা বুঝিতে বাকি থাকিত না। ইহাদের ঐরূপ ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতায় ভবিষ্যজীবনে তাঁহার কল্যাণ হইবে, ফ্র্যান্‌সিসের হৃদয়ে এই আশা বলবতী হইত; এবং আজ যদিও তিনি ইহাদের ঐরূপ বিশেষ শ্রদ্ধা গ্রহণের উপযুক্ত পাত্র নহেন তত্রাচ সাধ্যমত যত্ন করিয়া দুই দিন পরে যাহাতে ঐরূপ হইতে পারেন তদ্বিষয়ে তাঁহার মনে দৃঢ় সংকল্পের উদয় হইত।

এ্যাসিসি নগরের দরিদ্র অধিবাসিগণ ফ্র্যান্‌সিসের প্রতি যে এতদূর শ্রদ্ধাবান্‌ ও অনুরক্ত ছিল তাহার কারণ ছিল। ইহাদের মধ্যে যাহাদের সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল তাহাদের অধিকাংশেরই, যুদ্ধ-বিগ্রহ, শাসনের স্বল্পতা ও শারীরিক অসুস্থতা প্রভৃতি কারণে অবস্থা অসচ্ছল ছিল বটে কিন্তু তাঁহার অর্থসাহায্যের জন্যই ইহারা যে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট ছিল তাহা নহে; তাঁহার স্নেহ ও ভালবাসাই ইহাদিগকে তাঁহার প্রতি চিরদিনের জন্য

আকৃষ্ট করিয়া রাখিয়াছিল। মানবহৃদয় চিরদিন আন্তরিক সহানুভূতিরই প্রার্থী। ফ্র্যান্‌সিস ঐ ঐশ্বর্য্যের প্রভূত পরিমাণে অধিকারী ছিলেন এবং উহা অকাতরে দান করিবার প্রবৃত্তিও তাঁহার যথেষ্ট ছিল। ঐ দানের পরিবর্ত্তে তিনি উপযুক্ত প্রতিদানও পাইতেন। দুঃখক্লিষ্ট লোকদিগের মধ্যে স্বভাবতঃই পরস্পরের প্রতি একটা সহানুভূতি জন্মিয়া থাকে। দুঃখের বিভিন্নতা তদ্বিষয়ে প্রতিবন্ধকস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায় না। দরিদ্রগণ বুঝিতে পারিয়াছিল তাহাদের পরম হিতকারী ফ্র্যান্‌সিস্ কোন কারণে এখন কষ্ট পাইতেছেন। কিন্তু উহার প্রকৃত কারণ না জানিলেও তাহারা তাঁহার দুঃখের কথা মনে করিয়া অনেক সময় নিজেদের দুঃখ ভুলিয়া যাইত। দুঃখ ও ক্লেশের মধ্যেই যে বিশুদ্ধ প্রণয়ের পরিচয় পাওয়া যায় এবং একত্র অশ্রু-বিসর্জ্জনই যে মানবদিগকে প্রকৃত প্রণয়সূত্রে আবদ্ধ করিবার শ্রেষ্ঠ উপাদান, এ কথা বাস্তবিক সত্য।

সে যাহা হউক ধর্ম্মবিশ্বাস এইরূপে অজ্ঞাতসারে ফ্র্যান্‌সিসের হৃদয়ে প্রবেশ লাভ করিল। এ পর্য্যন্ত তাঁহার ভিতরে যাহা কিছু আধ্যাত্মিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল সে সমুদয়ই তাঁহার সংস্কারজ প্রতিভার ফলে। কিন্তু মানসিক ভাব পরিবর্ত্তনের তরঙ্গে পড়িয়া ঐরূপ ক্লেশকর অবস্থায় অধিক কাল তাঁহাকে পড়িয়া থাকিতে হয় নাই। শীঘ্রই তাঁহার চিন্তাশক্তি বিকশিত হইয়া উঠিল এবং বাহ্য ঘটনাবলীর প্রভাব উহাতে অঙ্কিত হইয়া ধর্ম্মোপদেশ সহায়ে তাঁহার অপরিস্ফুট ধারণাগুলিকে বিকশিত করিয়া তুলিল। কিন্তু প্রচলিত ধর্ম্মভাবের মধ্যে তিনি মৌলিকতা ও মানবকে উন্নত করিবার শক্তির অভাব অনুভব করিতে লাগিলেন এবং প্রাচীন ধর্ম্মভাবসমূহ কিরূপে বিশেষ সজীব ও শক্তিমান্ হইয়া উঠিবে তদ্বিষয়ও অনেক সময় তাঁহার চিন্তার বিষয় হইতে লাগিল। ধীরে ধীরে তাঁহার প্রকৃতি শান্তভাব ধারণ করিতেছিল। প্রাকৃতিক শোভা দর্শনে পূর্ব্বে তিনি সামান্য পরিমাণে আনন্দলাভই করিতেন, উহার প্রকৃত আস্বাদ এখন প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া একটা অনির্দ্দেশ্য শান্তি ভিন্ন তিনি যেন আরও অধিক কিছু পাইতে লাগিলেন। তাঁহার হৃদয়মধ্যে নূতন নূতন ভাবের উদয় হইতে লাগিল; এবং কর্ম্ম করিবার, পরার্থে আত্মোৎসর্গ করিবার প্রবৃত্তি ধীরে ধীরে মনোমধ্যে উদিত হইয়া শৈলশীর্ষস্থিত সমীপবর্ত্তী নগর গুলির অধিবাসিগণের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনের ইচ্ছা তাঁহার ভিতর জাগরিত হইয়া উঠিল।

এখনও পর্য্যন্ত নিজ ভবিষ্যজীবন সম্বন্ধে কোনরূপ ধারণা তাঁহার মনে স্থিরভাব ধারণ করে নাই। কিন্তু তাঁহার মানসিক শক্তিসমূহের বিকাশ-সাধনে জীবনের এই অংশ তাঁহার বিশেষ সহায়ক হইয়াছিল। এই সময়েই স্বাধীন ও মৌলিকভাবে তাঁহার হৃদয় অনুপ্রাণিত হইয়া উঠে এবং উহার বলেই এখন তিনি সংসারে বা ধর্ম্মরাজ্যে সাধারণ মানবের ন্যায় প্রচলিত ভাবে জীবনযাপন করার হস্ত হইতে স্বকীয় স্বাতন্ত্র্যসংরক্ষণে সমর্থ হইয়াছিলেন। তীর্থযাত্রা উপলক্ষ্য করিয়া তিনি এই সময়ে রোমনগরে গমন করেন। তত্রত্য বন্ধুবান্ধবগণের সহিত পরামর্শ করিবার অভিপ্রায়ে অথবা ধর্ম্মোপদেশকের উপদেশ অনুসারে প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য অথবা সাময়িক উত্তেজনার বশবর্ত্তী হইয়া কি উদ্দেশ্যে যে তিনি এখন রোমে গমন করেন তাহা জানিতে পারা যায় না। সাধু মহাত্মাদিগের প্রস্তরনির্ম্মিত প্রতিরূপ হইতে ঐস্থানে হৃদয়মধ্যে উত্থিত প্রশ্নাবলীর স্বতঃ উত্তর প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই প্রচলিত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই বোধ হয় তিনি ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকিবেন। যাহা হউক তিনি রোমনগরে গমন করিলেন। কিন্তু তথায় গমন ও দর্শনাদি করিয়া তাঁহার হৃদয়ে ধর্ম্মভাবের বিশেষ উদয় হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। বরং মহাত্মা পিটারের সমাধিমন্দিরে যাত্রীগণের দানের পরিমাণ অতি সামান্য প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার হৃদয়ে বিস্ময় ও ক্লেশের যুগপৎ উদয় হইল এবং নিকটে যাহা কিছু ছিল সমস্তই তিনি পিটারের সমাধি স্তম্ভের উপর অর্পণ করিলেন। এই ভ্রমণসময়ে তাঁহার জীবনে একটী মহৎ ঘটনা ঘটিয়াছিল। দরিদ্র লোকদিগকে সাহায্যকালে অনেক সময় তিনি ভাবিতেন—"আমি কি ইহাদের ন্যায় দারিদ্র্য ক্লেশ সহ্য করিতে পারি? অন্ততঃ মুহূর্ত্তকালের জন্যও ভুক্তভোগী না হইলে কোন বিষয়ের প্রকৃত গুরুত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ সম্ভব নহে।" নিষ্কিঞ্চন অবস্থা কিরূপ এবং ভিক্ষাবৃত্তি-দ্বারা জীবনধারণ করাই বা কি প্রকার তাহা তাঁহার এ সময়ে জানিতে ইচ্ছা হইল। তথাকার প্রসিদ্ধ ধর্ম্মশালায় বহুসংখ্যক ভিখারী একত্রিত হইত। তাহাদের একজনের সহিত তিনি নিজ পরিচ্ছদ বিনিময় করিলেন এবং সমস্ত দিবস প্রসারিত হস্তে দাঁড়াইয়া থাকিয়া উপবাস করিয়া থাকিলেন। হৃদয়ের স্বভাবজাত অহঙ্কার তাঁহার ঐ কার্য্যে বিদূরিত হইয়া দরিদ্রগণের প্রতি অনুকম্পা যে প্রবল হইয়া দাঁড়ায়াছিল ইহা বেশ অনুমিত হইল। যাহাদিগকে সোদর আখ্যায় অভিহিত করিবার তাঁহার প্রকৃত অধিকার ছিল এ্যাসিসিতে

প্রত্যাগমন করিয়া সেই সকল দরিদ্রগণের প্রতি তাঁহার দয়া দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইল। ঈদৃশ মানসিক অবস্থায় তিনি দীর্ঘকাল ধর্ম্মমন্দিরের প্রভাব হইতে মুক্ত থাকিতে পারেন নাই। এখনকার ন্যায় পুরাকালেও নগরের চারিধারে পথিপার্শ্বে বহুসংখ্যক ছোট ছোট উপাসনা মন্দির ছিল। তথায় তিনি একাকী প্রার্থনাদি শ্রবণ করিতেন। সরল প্রাণে শ্রবণের ফল সহজে উপস্থিত হয়—কথাটী সত্য; এবং উহা হইতেই আমরা বেশ বুঝিতে পারি, ঐ সকল মন্দিরের পুরোহিতেরা যখন তাঁহার দিকে চাহিয়া ধর্ম্মপুস্তক হইতে দৈনিক প্রার্থনা ও উপদেশাবলীর আবৃত্তি করিতেন তখন তাঁহার হৃদয় কিরূপ আন্দোলিত ও ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিত। ধর্ম্মের আদর্শ তখন তাঁহার নিকট জীবন্ত হইয়া উঠিত এবং অধ্যাত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে কোনরূপ সন্দেহই আর তখন তাঁহার মনে উঠিত না। আবার পরক্ষণে যখন তিনি নিভৃত বনমধ্যে প্রবেশ করিতেন তখন তাঁহার সমগ্র মন নাজারথের দরিদ্র সূত্রধরের প্রতি ধাবিত হইত এবং মনে হইত মেরিনন্দন তাঁহার সম্মুখীন হইয়া যেন বলিতেছেন—"ফ্র্যান্‌সিস! তুমি আমার অনুসরণ কর!"

ক্রমশঃ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

উদ্বোধনের গত সংখ্যায় 'মণ্ডন-পরাজয়' নামক প্রবন্ধের কিয়দংশ মুদ্রিত করিতে ভুল হইয়াছে। যে অংশটুকু ছাপা হয় নাই তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল। ঐ প্রবন্ধ পাঠ করিবার কালে পাঠক এই অংশটুকু ২৫৬ পৃষ্ঠার শেষে পড়িয়া পরে ২৫৭ পৃষ্ঠা পড়িতে অগ্রসর হইবেন, ইহাই অনুরোধ।

মণ্ডন। আজ্ঞে, তাহা আর জানি না? আমার গুরুর অন্তর্দ্ধানের পর সেই প্রভাকরই আবার নিজের পাঁজি পুঁথি ফেলে দিয়ে আমার গুরুর মতই গ্রহণ করেছিলেন, একথাও কোন্ আপনি না জানেন?

প্রভাকর। (কিছু অপ্রতিভ হইয়া) সে যাই হোক্ গে, এখন আপনার মতটা কি?

মণ্ডন। মত আর কি? তবে এই সন্ন্যাসীর বিষয় যতই চিন্তা করি, মনে যেন এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হয়।

প্রভা। (ক্রোধে) আরে মশায়, ও সব কথা রেখে দিন্। বালকটা একবার এলে হয়, তার বিদ্যের দৌড়টা একবার দেখে নি।

২য় প। দৌড়টা বড় কম নয় মশায়! মিশ্রঠাকুরকেও দৌড় করিয়েছিল;—কেবল ঠাকুরাণী বড় ক'সে রাশ টেনেছিলেন, তাই বেশীদূর যেতে পাল্লেন না!

৩য় প। যা হোক ভায়া, পত্নীভাগ্যটা করেছিলে বটে! আমাদের কপালে যদি অমন হ'ত তা হ'লে কি আর আমরা ন্যায়ের তর্ক নিয়ে এত বকাবকি করিতাম?

২য় প। মিশ্র মহাশয়ের গৃহিণী কি সামান্যা নারী! আমরা তাঁকে সরস্বতী ব'লে জ্ঞান করি।

৩য় প। সত্য; তাঁহার বুদ্ধি-চাতুর্য্যে মাহিষ্মতী-বাসী অবাক্ হইয়াছে! আমাদের ঘরে ঘরে যেন এইরূপ সরস্বতীর আবির্ভাব হয়।

সমালোচনা।

বলি-রহস্য—কবিরাজ শ্রীশ্যামাচরণ সেনগুপ্ত কবিরত্ন কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। মূল্য ।০ আনা। সমাজশরীর হইতে মহিষ-বলিরূপ ব্যাধি প্রতিকারের উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থ প্রচারিত হইযাছে। কবিরাজ মহাশয় যে সুচিকিৎসক, এ গ্রন্থে তাহার প্রচুর পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার তর্ক যুক্তি প্রমাণ প্রশংসনীয়; তাহার উপর বহুল খ্যাতনামা পণ্ডিতগণের ব্যবস্থাপত্রও গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। যাঁহারা মহিষবলিপ্রথা সমর্থন করেন, তাঁহাদিগকে একবার এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি পড়িতে অনুরোধ করি।

বিচার-প্রকাশ। কুমার-পরিব্রাজক-পুস্তকাবলীর তৃতীয় সংখ্যক পুস্তক। প্রাপ্তিস্থান— কাশী যোগাশ্রম। প্রকাশক—শ্রীসেবানন্দ স্বামী।

পুস্তকখানি তিন অংশে বিভক্ত। প্রথমাংশ—বাবা দয়ালদাসজির জীবনী, দ্বিতীয়াংশ—তৎপ্রণীত বৈদান্তিক অদ্বৈততত্ত্বের ব্যাখ্যা, তৃতীয়াংশ সন্ন্যাসমীমাংসা। দয়ালদাসজির জীবনী পাঠকমাত্রেরই উপাদেয় হইবে। অল্পের মধ্যে অদ্বৈততত্ত্বের ব্যাখ্যা নিশ্চয়ই প্রশংসাযোগ্য হইয়াছে; তবে মূল হিন্দি পুস্তকখানির ভাষা বোধ করি এতটা জটিল নহে, অনুবাদে

জটিলতা আসিয়া পড়িয়াছে। সন্ন্যাসমীমাংসা যুক্তিযুক্ত হইয়াছে। দয়ালদাস বাবাজি তত্ত্বসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার রচিত বেদান্তব্যাখ্যা যে উৎকৃষ্টই হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? ব্যাখ্যায় যোগবাশিষ্ঠের ভাবই প্রবল,—সৃষ্টি সৃষ্টিক্রম প্রভৃতির মায়ামূলকতা প্রতিপাদিত। অদ্বৈততত্ত্বের পরিপাক না হইলে, এমনভাবে অল্পের মধ্যে গুছাইয়া বলা সম্ভবপর নহে।

উজ্জ্বলরস চিন্তামণি। শ্রীযুগলকিশোর দাস বিরচিত। মূল্য ২৲টাকা। বৈষ্ণব-ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব সাধারণকে বুঝাইবার জন্য এই পুস্তকের অবতারণা। ইহার ভাষা সকল স্থানে সরল না হইলেও,সাধারণতঃ প্রাঞ্জল এবং গ্রন্থে রচয়িতার শ্রম, যত্ন, ভাবুকতার নিদর্শন যথেষ্ট বিদ্যমান। শাক্ত তন্ত্রের ন্যায়, বৈষ্ণব তন্ত্রে যে সকল কুলাচার অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে, তাহারই ব্যাখ্যা করা এ গ্রন্থের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু এ গুহ্য সাধনতত্ত্ব সাধারণ-পাঠ্য পুস্তকে আলোচনা করা ঠিক কি না, আমরা স্থির করিতে পারিতেছি না। গ্রন্থকার স্বয়ংই লিখিতেছেন:—"এই গ্রন্থে মধুর ভক্তিরস ও তৎপ্রাপ্তির উপায় বিশদভাবে বর্ণিত হইযাছে; মধুররসাশ্রিত ভক্ত ব্যতিরেকে অন্য কোন ব্যক্তির ইহার আলোচনায় অধিকার নাই। সুতরাং অনধিকারী ব্যক্তিদিগের দৃষ্টিপথ হইতে ইহা সতত অন্তরিত করা অধিকারী ভক্তমাত্রেরই কর্ত্তব্য।" অথচ নগদ মূল্য ২৲ টাকায় তাহা অনায়াস-লভ্য!

শান্তিকণা।—ঢাকা হইতে প্রকাশিত ধর্ম্ম,সাহিত্য, সমাজ এবং নীতি বিষয়ক সচিত্র মাসিক পত্রিকা। ২য় বর্ষের ৫ম সংখ্যা বিগত ভাদ্রে প্রকাশিত, কিন্তু এতদিন পরে সমালোচনার জন্য আমাদের করাগত। ঐরূপ কেন হইল? আমাদেরই ভাগ্যদোষে, অথবা সম্পাদকের ভাগ্যদোষে ভাদ্রের পত্রিকা এতদিনে বাহির হইল—তাহা অপ্রকাশ। কাগজ তত ভাল নহে, তবে ছাপা অনেকটা নির্ভুল। প্রবন্ধের সকল গুলিই সুলিখিত ও সুপাঠ্য। কৃষকে, পেঁপের চাষটি বেশ সরলভাবে বুঝান হইয়াছে; বালকেও উহা পড়িয়া অনায়াসে কার্য্য করিতে পারে। বৈষ্ণবধর্ম্ম ও সপ্তমন্দির বেশ প্রবন্ধ। আমরা পত্রিকাখানির উন্নতি এবং দীর্ঘায়ু কামনা করি।

পত্রিকার মলাটের উপরের ব্লকের ছবিখানি ছাড়া এ সংখ্যায় অন্য কোন চিত্র দেখিলাম না। মলাটের ব্লকের মধ্যস্থলে আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়ের বিজ্ঞাপনটি দেওয়া সুরুচির পরিচায়ক নহে; উহা অন্যত্র দেওয়া উচিত।

সংবাদ ও মন্তব্য।

আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইলাম যে, বরাহনগর-নিবাসী শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 'বরাহনগর ইন্‌ষ্টিটিউট' নামক কার্য্য, যাহা ১৮৭৬খৃষ্টাব্দে জনসাধারণের ভিতর শিক্ষাবিস্তারের জন্য তাঁহার উদ্যমে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল—অদ্যাপি অক্ষুণ্ণভাবে আপন কার্য্য করিয়া যাইতেছে। শশিপদ বাবু উহার স্থায়িত্বকল্পে উপযুক্ত ট্রষ্টিগণ মনোনীত করিয়া তাঁহাদের হস্তে ঐ কার্য্যের পরিচালনা অর্পণ করিয়াছেন এবং নিজ লাইব্রেরী বা পুস্তক-সংগ্রহও উহাতে দান করিয়াছেন। শ্রদ্ধাস্পদ শশিপদ বাবুর ঐ নিঃস্বার্থ উদ্যম ও দান সকলেরই অনুকরণীয়, সন্দেহ নাই।

আমাদের সহযোগী 'কুশদহ' আমাদিগকে ইউরোপী 'পোপ' তুল্য মনে করেন বোধ হয়! নতুবা তাঁহার আশ্বিনের সংখ্যায় আমাদিগকে 'বসুমতী' সংবাদপত্রের কোন এক সংখ্যায় প্রকাশিত 'দায়ে প'ড়ে বিয়ে' নামক কোনও এক প্রবন্ধের জন্য সোরগোল করিতে বলেন কেন? সোর-গোল করিলেই যদি সকলে সকল কথা লইত, তাহা হইলে না হয় তাঁহার অনুরোধে একবার ঐরূপ করিয়া দেখা যাইত। তাহা যখন লয় না, তখন আমাদের বিবেচনায় সত্যই জগতে জয়যুক্ত হয়—মিথ্যা নহে, "সত্যমেব জয়তে নানৃতং" এই কথাটি দৃঢ় ধারণা করিয়া ঐরূপ স্থলে মহাজন-প্রদর্শিত পথ—উপেক্ষাই অবলম্বনীয় বলিয়া বোধ হয়। আমাদের এ পরামর্শ সহযোগীর ভাল লাগিবে কি না, জানি না। কিন্তু আমরা চিরকালই ঐ ভাবাবলম্বন করিয়া আছি এবং এখনও ঐভাবেই থাকা ভিন্ন উপায়ান্তর দেখি না। 'যে যা বলে বলুক—আমি আমার কাজ করিয়া যাই'—এ ভাব মনে ঠিক রাখিতে না পারিলে সংসারে বাঁচা সুকঠিন।

প্রকৃতি-পুরুষ-পঞ্চক।

১।

ভীমা ভয়ঙ্করী নিশি ঘোর ঘনে ব্যোম ভরা।
ভৈরব-ভৈরবী-দল লক্ষ্যশূন্য, পথহারা॥
বীভৎস তাণ্ডবে মত্ত, সন্ত্রাসিত বিশ্ববাসী।
মহাবেগে ছুটে শূন্যে জ্বালামুখী উল্কারাশি॥
কক্ষচ্যুত গ্রহতারা, মহাবিশ্ব হ'ল লয়।
সোম-সূর্য্যে পাশাপাশি ছুটাছুটি অভিনয়॥
গন্ধর্ব্ব কিন্নর নর যক্ষ রক্ষ ব্যোমচর।
জলচর সবে পড়ে, সংজ্ঞাশূন্য-কলেবর॥
ব্রহ্মাচ্যুত দেবগণ যোড়-করে কাঁপে কায়।
হ'ল বুঝি অচৈতন্য, বাক্য নাহি সরে হায়॥
কেন্দ্রে শুয়ে মহারুদ্র সহস্র-ভাস্করোজ্জ্বল।
বক্ষে নাচে মহাকালী, চূর্ণ কাল-দর্প-বল॥

২।

হিমাবাসে হেমচূড়া শোভে স্নিগ্ধজ্যোতির্ম্ময়।
সুধাংশুর করে ঝরে ছানিত কিরণ-পয়॥
ফুটেছে অযুত ফুল, ছুটেছে ভ্রমর-দল।
প্রেম-পয়োন্মত্ত বিশ্ব করিতেছে ঢল ঢল॥
আনন্দে ভ্রমিছে নন্দি শিবানীর সিংহ সনে।
হিংসাদ্বেষ পলায়েছে দেবাসুর-সম্মিলনে॥
দেবতা-দানব-নরে সবে করে স্তব-গান।
ধ্বনিত হ'তেছে বিশ্বে সে অপূর্ব্ব মহাতান॥
হর-গৌরী সদানন্দে সদাই বিরাজমান।
নিত্যানন্দ-উৎস হেথা মহানন্দ অধিষ্ঠান॥
মহাশিব স্থলে শিব জগত-মঙ্গল তরে।
সুধাংশু-শেখরা বামে দ'য়ে বরাভয় করে॥

৩।
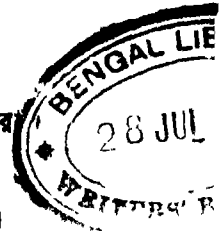
কম্পিত-সাগরাঞ্চলা ধরা বুঝি দীর্ণ হয়।
মহারোলে মহাবায়ু ছোটে উন্মাদের প্রায়॥
ব্যোমপথে শ্রুত মাত্র সহস্র-কুলিশ-ধ্বনি।
দামিনী-দলকে ওঠে শত শত ঝন্ ঝনি॥
অসংখ্য আগ্নেয় স্রোত ধরা করে উদ্গিরণ।
আঁধারে আঁধার মিশি পুনঃ করে মহারণ॥
নাগ-নাগিনীর দল গরজি গরল-কণ্ঠে।
করিতেছে কিলিবিলি ঘেরি সেই নীলকণ্ঠে॥
মহামারী বিভীষণ রক্ত মাংস অস্থি ছোটে।
ডাকিনী-যোগিনী-চিত্র শুধু নেত্রে ফুটে উঠে॥
আনন্দ-কানন হ'ল মহাশ্মশানের প্রায়।
সে করাল মহাদৃশ্যে মহাকালী নেচে ধায়॥

৪।

প্রেমের শান্তির স্থান ঝরে প্রেম অবিরত।
প্রেমের সে হিম-বিন্দু দোলে মণিমুক্তা মত॥
ধবল তুষার-গিরি, গায়ে প্রেম-স্রোত বয়।
গলাইয়া ঢালে অঙ্গ, পাছে ধরা শুষ্ক হয়॥
বহে প্রেম-মন্দাকিনী পবিত্রিয়া ধরাধাম।
সুরাসুর নর স্পর্শি পূর্ণ করে মনস্কাম॥
শুধু প্রেম, শুধু শান্তি, ঐশ্বর্য্যের নাহি লেশ।
স্বর্গরাজ্যে অনুপম কৈলাসের শান্ত বেশ॥
দেব-দৈত্য-নরগণ আপন কল্যাণ তরে।
বিশ্বনাথ বিশ্বেশ্বরী পুলকে বন্দনা করে॥
সকল(ই) মঙ্গলময় পবিত্র এ শিবাবাসে।
সদানন্দময় সনে সদানন্দময়ী হাসে॥

৫।

স্মরারি, ভৈরব, রুদ্র, বিশ্বধ্বংসকারী কাল।
ব্যাল-উপবীত-ধারী, পরিধৃত-বাঘছাল॥
ভোলানাথ, আশুতোষ, শিব সদানন্দময়।
নাহি চাহে স্তব-স্তুতি, নাম মাত্র নিলে হয়॥

মহাচণ্ডী, মহাকালী, মুণ্ডমালা-বিভূষণা।
দিগম্বরী, রুদ্রপত্নী, করালিনী, শবাসনা॥
অভয়া, সর্ব্বমঙ্গলা, নামে কাল-ভয় হরে।
অন্নপূর্ণা, ক্ষেমঙ্করী, বরাভয় ল'য়ে করে॥
বিপরীত সম্মিলনে গৌরী সনে স্থিত হর।
নত বুধজনে ভাবে বিশ্বেশ্বরী বিশ্বেশ্বর॥
মহাভীমা, মহাক্ষেমা, মহারুদ্র, তাপহর।
কিরণে চরণে শেষে রেখো উমা-মহেশ্বর॥

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত।

প্রার্থনা।

হে দীনশরণ!

অবোধ অধম পাপী, চিরক্লান্ত, চিরতাপী,
ডাকে যদি, হে করুণ, দিবে না কি দেখা?
দিবে না মুছিয়ে তার, হৃদয়ের ক্ষত ধার,
মরমে দিবে না আঁকি তব প্রেম-রেখা? ১।

চির দিন রহিলে আকুল,
দিবে না কি চরণ রাতুল?
উথলি' বিমল ভক্তি, জাগাবে না প্রেমশক্তি?
পাবে না তোমার প্রভো! এক বিন্দু দয়া?
এমনি উদ্ভ্রান্ত স্মৃতি, একবেগে বহি' নিতি,
হতাশায় হবে হত অকূলে পড়িয়া? ২।

না প্রভো! স'বে না তাহা; দেহ দয়া করি,
জ্যোতির্ম্ময় রূপে মোর দগ্ধ হৃদি ভরি'।
মোহের বন্ধন খুলি, স্নেহ-অঙ্কে লহ তুলি',
সুখ দুঃখ হাসি কান্না দাও গো মুছিয়া;

যা' মলিন, যা' অমল, যা' অমৃত, যা' গরল,—
তোমারেই চাহি নাথ,— সকলি স'পিয়া ॥ ৩।

শ্রীমতী মনোরমা দেবী।

স্বামি-শিষ্য-সংবাদ।

[শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এ।]

স্বামীজি আজ কাল মঠেই অবস্থান করিতেছেন। শরীর তত সুস্থ নহে। সকাল সন্ধ্যায় বেড়াইতে বাহির হন। শিষ্য আজ শনিবার মঠে আসিয়াছে। স্বামীজির পাদপদ্মে প্রণত হইয়া তাঁহার শারীরিক কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতেছে।

স্বামীজি—এ শরীরের ত এই অবস্থা। তোরা ত কেহই আমার কার্য্যে সহায়তা কর্ত্তে অগ্রসর হচ্ছিস্ না। আমি একা কি কর্‌বো বল্? বাঙ্গলা দেশের মাটিতে এবার এই শরীরটা হয়েছে, এ শরীর দিয়ে কি আর বেশী কাজ কর্ম্ম চল্‌তে পারে? তোরা সব এখানে আসিস্—শুদ্ধাধার। তোরা যদি আমার এই সব কার্য্যে সহায় না হোস্ ত আমি একা কি কর্‌বো বল্?

শিষ্য—মহাশয়, এই সকল ব্রহ্মচারী ত্যাগী পুরুষেরা আপনার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন—আমার মনে হয়, আপনার কার্য্যে ইঁহারা প্রত্যেকে জীবন দিতে পারেন—তত্রাচ আপনি ঐ কথা বলিতেছেন কেন?

স্বামীজি—কি জানিস্? আমি চাই A band of young Bengal (একদল জোয়ান বাঙ্গালীর ছেলে), এরাই দেশের আশা-ভরসা-স্থল। চরিত্রবান্, বুদ্ধিমান্, পরার্থে সর্ব্বত্যাগী এবং আজ্ঞানুবর্ত্তী যুবকগণের উপরেই আমার ভবিষ্যৎ ভরসা। আমার idea (ভাব) সকল যারা work out (জীবনে পরিণত) ক'রে আপনাদের ও দেশের কল্যাণ সাধন কর্ত্তে জীবন-পাত কর্ত্তে পার্‌বে। নতুবা দলে দলে কত ছেলে আস্‌ছে ও আস্‌বে। তাদের মুখের ভাব তমোপূর্ণ—হৃদয় উদ্যমশূন্য—শরীর অপটু—হৃদয় সাহসশূন্য।

এদের দিয়ে কি কাজ হয়? নচিকেতার মত শ্রদ্ধাবান্ দশ বারটী ছেলে পেলে আমি দেশের চিন্তা ও চেষ্টা নূতন পথে চালনা ক'রে দিতে পারি।

শিষ্য—মহাশয়, এত যুবক আপনার নিকট আসিতেছে, ইহাদের ভিতর ঐরূপ স্বভাববিশিষ্ট কাহাকেও কি দেখিতে পাইতেছেন না?

স্বামীজি—যাদের ভাল আধার ব'লে মনে হয়, তাদের মধ্যে কেউ বা বে ক'রে ফেলেছে; কেউ বা সংসারের মান যশ ধন উপার্জ্জনের চেষ্টাতে বিকিয়ে গিয়েছে; কারো বা শরীর অপটু! তারপর বাকী অধিকাংশই উচ্চ ভাব নিতে অক্ষম। তোরা আমার ভাব নিতে সক্ষম বটে, কিন্তু তোরাও তো কার্য্যক্ষেত্রে তা এখনও বিকাশ কত্তে পাচ্ছিস্ না। এই সব কারণে মনে সময় সময় বড়ই আক্ষেপ হয়; মনে হয়, দৈব-বিড়ম্বনে শরীর ধারণ ক'রে কোন কাজই ক'রে যেতে পাল্লুম্ না। অবশ্য এখনো একেবারে হতাশ হই নি; কারণ, ঠাকুরের ইচ্ছা হ'লে এই সব ছেলেদের ভিতর থেকেই কালে মহা মহা ধর্ম্মবীর, কর্ম্মবীর বেরুতে পারে—যারা ভবিষ্যতে আমার idea (ভাব) নিয়ে কাজ কর্‌বে।

শিষ্য—আমার মনে হয়, আপনার উদার ভাবসকল, সকলকেই একদিন না একদিন নিতে হবে। ঐটী আমার দৃঢ় ধারণা। কারণ, স্পষ্ট দেখিতে তো পাইতেছি—সকল দিকে সকল বিষয়কে আশ্রয় করিয়াই আপনার চিন্তাপ্রবাহ ছুটিয়াছে!—কি জীবসেবা, কি দেশকল্যাণব্রত, কি ব্রহ্মবিদ্যা চর্চ্চা, কি ব্রহ্মচর্য্য—সর্ব্বত্রই আপনার ভাব প্রবেশ করিয়া উহাদের ভিতর একটা অভিনবত্ব আনিয়া দিয়াছে! আর, দেশের লোকে, কেহ বা আপনার নাম প্রকাশ্যে করিয়া, আবার কেহ বা আপনার নামটী গোপন করিয়া নিজেদের নামে আপনার ঐ ভাব ও মতই সকল বিষয়ে গ্রহণ ও সাধারণে উপদেশ করিতেছে।

স্বামীজি—আমার নাম না কর্‌লে তাতে কি আসে যায়? আমার idea (ভাব) নিলেই হ'লো। কামকাঞ্চনত্যাগী হ'য়েও শতকরা নিরেনব্বই জন সাধু নাম-যশে বদ্ধ হ'য়ে পড়ে। Fame—the last infirmity of noble mind—(যশাকাঙ্ক্ষাই উচ্চান্তঃকরণের শেষ দুর্ব্বলতা) পড়েছিস্ না? একেবারে ফলকামনাশূন্য হ'য়ে কাজ ক'রে যেতে হবে। ভাল, মন্দ—লোকে দুইতো বল্‌বেই। কিন্তু ideal (উচ্চাদর্শ) সাম্‌নে রেখে আমাদের

সিঙ্গির মত কাজ ক'রে যেতে হবে; তাতে, "নিন্দন্তু নীতিনিপুণা যদি বা স্তুবন্তু"—(চতুর ব্যক্তিরা নিন্দা বা স্তুতি যাহাই করুক।)

শিষ্য—আমাদের পক্ষে এখন কিরূপ আদর্শ গ্রহণ করা উচিত?

স্বামীজি—মহাবীরের চরিত্রকেই তোদের এখন আদর্শ কত্তে হবে। দেখ্ না রামের আজ্ঞায় সাগর ডিঙ্গিয়ে চলে গেল!—জীবন-মরণে দৃক্‌পাত নাই—মহাজিতেন্দ্রিয়, বুদ্ধিমান্। দাস্যভাবের ঐ মহা আদর্শে তোদের জীবন গঠিত কত্তে হবে। ঐরূপ হ'লেই অন্যান্য ভাবের স্ফুরণ, কালে আপনা আপনি হ'য়ে যাবে। দ্বিধাশূন্য হ'যে গুরুর আজ্ঞা পালন, আর ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা—এই হচ্ছে secret of success (কৃতী হবার একমাত্র গূঢোপায;) নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় (অবলম্বন কর্‌বার আর দ্বিতীয় পথ নাই)। হনুমানের একদিকে যেমন সেবা-ভাব—অন্যদিকে তেমনি ত্রিলোকসংত্রাসী সিংহবিক্রম। রামের হিতার্থে জীবনপাত কত্তে কিছুমাত্র দ্বিধা রাখে না! রামসেবা ভিন্ন অন্য সকল বিষয়ে উপেক্ষা—ব্রহ্মত্ব শিবত্ব লাভে পর্য্যন্ত উপেক্ষা! শুধু রঘুনাথের আদেশপালনই জীবনের একমাত্র ব্রত! ঐরূপ একাগ্র নিষ্ঠা হওয়া চাই। খোল করতাল বাজিয়ে লম্ফ ঝম্ফ ক'রে দেশটা উচ্ছন্ন হ'য়ে গেল। একে ত এই dyspeptic রোগীর দল—তাতে অত লাফালে ঝাঁপালে সইবে কেন? কামগন্ধহীন উচ্চ সাধনার অনুকরণ কর্‌তে গিয়ে দেশটা ঘোর তমসাচ্ছন্ন হ'য়ে পড়েছে। দেশে দেশে গাঁয়ে গাঁয়ে যেখানে যাবি, দেখ্‌বি, খোল্ করতালই বাজছে! বলি, ঢাক ঢোল কি দেশে তৈয়িরি হয় না—তুরী ভেরী কি ভারতে মিলে না? ঐসব গুরুগম্ভীর আওয়াজ ছেলেদের শোনা না? ছেলেবেলা থেকে মেয়েমানুষি বাজনা শুনে শুনে, কীর্ত্তন শুনে শুনে, দেশটা যে মেয়েদের দেশ হ'য়ে গেল। হায় হায! এর চেয়ে আর কি দেশ অধঃপাতে যেতে পারে? কবিকল্পনাও এ ছবি আঁক্‌তে হার মেনে যায়! ডমরু শিঙ্গা বাজাতে হবে, ঢাকে ব্রহ্মরুদ্রতালের দুন্দুভি তুল্‌তে হবে, 'মহাবীর মহাবীর' ধ্বনিতে এবং হর হর ব্যোম ব্যোম শব্দে দিগ্‌দেশ কম্পিত কত্তে হবে। যে সব musicএ (গীতবাদ্যে) মানুষের soft feelings (হৃদয়ের কোমল ভাবসমূহ) উদ্দীপিত করে, সে সকল কিছুদিনের জন্য এখন বন্ধ রাখ্‌তে হবে।—বীণা, খোল, বেয়ালা, বাঁশী ভেঙ্গে ফেল্‌তে হবে।—খেয়াল টপ্পা বন্ধ ক'রে, ধ্রুপদ গান শুনতে লোককে অভ্যাস করাতে হবে। বৈদিক ছন্দের মেঘমন্দ্রে দেশটার প্রাণসঞ্চার কত্তে হবে। সকল

বিষয়ে বীরত্বের কঠোর মহাপ্রাণতা আন্‌তে হবে। এইরূপ ideal follow (আদর্শের অনুসরণ) কর্‌লে তবে এখন জীবের কল্যাণ—জগতের কল্যাণ। বুঝ্‌লি ?

শিষ্য—আজ্ঞে হাঁ, আপনি আশীর্ব্বাদ করুন, যাহাতে ঐ আদর্শে ও ভাবে জীবন গঠন করিতে পারি।

স্বামীজি—তুই যদি একা ঐভাবে চরিত্র গঠন কত্তে পারিস্ তা হ'লে তোর দেখাদেখি হাজার লোক ঐরূপ কত্তে শিখ্‌বে। কিন্তু দেখিস্, ideal (ঐ আদর্শ) থেকে কখন যেন এক পা হটিস্ নি। কখন হীনসাহস হবি নি। খেতে শুতে পর্‌তে, গাইতে বাজাতে, ভোগে রোগে, কেবলই সৎসাহসের পরিচয় দিবি। তবে ত মহাশক্তির কৃপা হবে।

শিষ্য—এক এক সময় কেমন হীনসাহস হ'য়ে পড়ি।

স্বামীজি—তখন এইরূপ ভাব্‌বি "আমি কার সন্তান ?—তাঁর কাছে গিয়ে আমার এমন হীন বুদ্ধি—হীন সাহস !" হীন বুদ্ধি হীন সাহসের মাথায় লাথি মেরে "আমি বীর্য্যবান্—আমি মেধাবান্—আমি ব্রহ্মবিৎ—আমি প্রজ্ঞাবান্" বল্‌তে বল্‌তে দাঁড়িয়ে উঠ্‌বি। "আমি অমুকের চেলা—কাম-কাঞ্চনজিৎ ঠাকুরের সঙ্গীর সঙ্গী" এই অভিমান খুব রাখ্‌বি। এতে কল্যাণ হবে। ঐ অভিমান যার নাই, তার ভিতর ব্রহ্ম জাগেন না। রামপ্রসাদের গান শুনিস্ নি ? তিনি বল্‌তেন—"এ সংসারে ডরি কারে রাজা যার মা মহেশ্বরী।" এই অভিমান সর্ব্বদা মনে জাগিয়ে রাখ্‌তে হবে। তা হ'লে আর হীন বুদ্ধি—হীন সাহস নিকটে আস্‌বে না।

শিষ্য—মহাশয়, এই কথাগুলি যেন আমার মনে গাঁথা থাকে, এই আশীর্ব্বাদ করুন।

স্বামীজি—তা থাক্‌বে বই কি ! কখনো মনে দুর্ব্বলতা আস্‌তে দিবিনি। মহাবীরকে স্মরণ কর্‌বি—মহামায়াকে স্মরণ কর্‌বি। দেখ্‌বি, সব দুর্ব্বলতা—সব কাপুরুষতা তখনি চ'লে যাবে।

ঐরূপ বলিতে বলিতে স্বামীজি নীচে আসিলেন। মঠের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে যে আঁব গাছ আছে, তাহারই তলায় একখানা ক্যাম্পখাটে তিনি অনেক সময় বসিতেন ; অদ্যও সেখানেই আসিয়া পশ্চিমাস্তে উপবেশন করিলেন। তাঁহার নয়নে মহাবীরের ভাব যেন তখনও ফুটিয়া বাহির হইতেছে ! উপবিষ্ট হইয়াই তিনি শিষ্যকে উপস্থিত সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণকে দেখাইয়া বলিতে লাগিলেন—

"এই যে প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম! একে উপেক্ষা ক'রে, যারা অন্য বিষয়ে মন দেয়—ধিক্ তাদের। করামলকবৎ এই যে ব্রহ্ম! দেখ্‌তে পাচ্ছিস্ নে?—এই—এই!"

এমন হৃদয়স্পর্শী ভাবে স্বামীজি কথাগুলি বলিলেন যে, শুনিয়াই উপস্থিত সকলে "চিত্রার্পিতারম্ভ ইবাবতস্থে"!—সহসা গভীর ধ্যানে মগ্ন!—কাহারো মুখে কথাটী নাই! স্বামী প্রেমানন্দ তখন গঙ্গা হইতে কমণ্ডলু করিয়া জল লইয়া ঠাকুরঘরে উঠিতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াও স্বামীজি "এই প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম—এই প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম" বলিতে লাগিলেন। ঐ কথা শুনিয়া তাঁহারও তখন হাতের কমণ্ডলু হাতে বদ্ধ হইয়া রহিল; একটা মহা নেশার ঘোরে আচ্ছন্ন হইয়া তখনি তিনি ধ্যানস্থ হইয়া পড়িলেন! এইরূপে প্রায় ১৫ মিনিট গত হইলে স্বামীজি প্রেমানন্দকে আহ্বান করিয়া বলিলেন "যা, এখন ঠাকুর-পূজায় যা।" স্বামী প্রেমানন্দের তবে চেতনা হয়! ক্রমে সকলের মনই আবার "আমি আমার" রাজ্যে নামিয়া আসিল এবং সকলেই তখন যে যাহার কার্য্যে গমন করিলেন।

সেদিনের সেই দৃশ্য শিষ্য ইহজীবনে কখনও ভুলিতে পারিবে না। স্বামী-জির কৃপা ও শক্তিবলে তাহার চঞ্চল মনও সেদিন অনুভূতির রাজ্যের অতি সন্নিকটে গমন করিয়াছিল! এই ঘটনার সাক্ষিরূপে বেলুড়মঠের সন্ন্যাসি-গণ এখনো বর্ত্তমান রহিয়াছেন। স্বামীজির সেদিনকার সেই অদ্ভুত ক্ষমতা দর্শন করিয়া উপস্থিত সকলেই বিস্মিত হইয়াছিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে তিনি সকলের মনগুলি যেন সমাধির অতল জলে ডুবাইয়া দিয়াছিলেন।

সেই শুভদিনের অনুধ্যান করিয়া শিষ্য এখনো আবিষ্ট হইয়া পড়ে এবং তাহার মনে হয়—পূজ্যপাদ আচার্য্য-কৃপায় ব্রহ্মভাব প্রত্যক্ষ করা তাহার ভাগ্যেও একদিন ঘটিয়াছে।

কিছুক্ষণ পরে শিষ্য-সমভিব্যাহারে স্বামীজি বেড়াইতে গমন করিলেন। যাইতে যাইতে শিষ্যকে বলিলেন "দেখ্‌লি, আজ কেমন হ'লো? সবাইকে ধ্যানস্থ হ'তে হ'লো। এরা সব ঠাকুরের সন্তান কিনা, বল্‌বামাত্র এদের তখনি তখনি অনুভূতি হ'য়ে গেল!"

শিষ্য—মহাশয়, আমাদের মত লোকের মনও যখন নির্ব্বিষয় হইয়া গিয়াছিল, তখন ওঁদের কা কথা। আনন্দে আমার হৃদয় যেন ফাটিয়া যাইতে-ছিল! এখন কিন্তু ঐ ভাবের আর কিছুই মনে নাই। যেন স্বপ্নবৎ।

স্বামীজি—ও সব কালে হ'য়ে যাবে। এখন কাজ কর্। এই মহামোহগ্রস্ত জীবের কল্যাণের জন্ত কোন কাজে লেগে যা। দেখ্‌বি, ওসব আপ্‌নি আপ্‌নি হ'য়ে যাবে।

শিষ্য—মহাশয়, অত কর্ম্মের মধ্যে যাইতে ভয় হয়—সে সামর্থ্যও নাই। শাস্ত্রেও বলে "গহণা কর্ম্মণো গতিঃ"।

স্বামীজি—তোর কি ভাল লাগে?

শিষ্য—আপনার মত সর্ব্বশাস্ত্রার্থদর্শীর সঙ্গে বাস ও তত্ত্ব-বিচার কর্‌বো; আর, শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন দ্বারা এ শরীরেই ব্রহ্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষ কর্‌বো। এ ছাড়া কোন বিষয়েই আমার উৎসাহ হয় না। বোধ হয়, যেন অন্ত কিছু করবার সামর্থ্য আমাতে নাই।

স্বামীজি—ভাল লাগে ত তাই ক'রে যা। আর, তোর সব শাস্ত্রসিদ্ধান্ত লোকদেরও জানিয়ে দে, তা হ'লেই অনেকের উপকার হবে। শরীর যতদিন আছে, ততদিন কাজ না ক'রে ত কেউ থাক্‌তে পারে না? তবে যে কার্য্যে পরের উপকার হয়, তাই করা উচিত। তোর নিজের অনুভূতি এবং শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তবাক্যে অনেক বিবিদিষুর উপকার হ'তে পারে। ঐ সব লিপিবদ্ধ ক'রে যা। এতে অনেকের উপকার হ'তে পারে।

শিষ্য—অগ্রে আমারই অনুভূতি হউক, তখন লিখিব। ঠাকুর বলিতেন যে—চাপ্‌রাস্ না পাইলে কেহ কাহারও কথা লয় না।

স্বামীজি—তুই যেসব সাধনা ও বিচারের stage (অবস্থা) দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিস্, জগতে এমন লোক অনেক থাক্‌তে পারে, যারা ঐ stageএ (অবস্থায়) প'ড়ে আছে; ঐ অবস্থা পার হ'য়ে অগ্রসর হ'তে পাচ্ছে না। তোর experience (অনুভূতি) ও বিচারপ্রণালী লিপিবদ্ধ হ'লে তাদের ত উপকার হবে। মঠে সাধুদের সঙ্গে যে সব "চর্চ্চা" করিস্, সেই বিষয়গুলি সহজ ভাষায় লিপিবদ্ধ ক'রে রাখ্‌লে অনেকের উপকার হ'তে পারে। বুঝ্‌লি?

শিষ্য—আপনি যখন আজ্ঞা করিতেছেন, তখন ঐ বিষয়ে চেষ্টা করিব।

স্বামীজি—যে সাধন ভজন বা অনুভূতি দ্বারা পরের উপকার হয় না—মহামোহগ্রস্ত জীবকুলের কল্যাণ সাধিত হয় না—কামকাঞ্চনের গণ্ডী থেকে মানুষকে বাহির হ'তে সহায়তা করে না, এমন সাধন-ভজনে ফল কি? তুই বুঝি মনে করিস্, একটী জীবের বন্ধন থাক্‌তে তোর মুক্তি আছে? যত কালে—যত জন্মে তার উদ্ধার না হচ্ছে, তত কাল তোকেও জন্ম নিতে

হবে—তাকে সাহায্য কত্তে, তাকে ব্রহ্মানুভূতি করাতে। প্রতি জীব যে তোরই অঙ্গ। এই জন্যই পরার্থে কর্ম্ম। তোর স্ত্রী-পুত্রকে আপনার জেনে তুই যেমন তাদের সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গল-কামনা করিস্, প্রতি জীবে যখন তোর ঐরূপ টান্ হবে, তখন বুঝ্‌বো—তোর ভিতর ব্রহ্ম জাগরিত হচ্ছেন—not a moment before (ঐরূপ হবার পূর্ব্বে নহে)। জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে এই সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গলকামনা জাগরিত হ'লে তবে বুঝ্‌ব—তুই idealর (আদর্শের) দিকে অগ্রসর হচ্ছিস্।

শিষ্য—এটী তো মহাশয় ভয়ানক কথা—সকলের মুক্তি না হইলে ব্যক্তিগত মুক্তি হইবে না! কোথাও ত এমন অদ্ভুত সিদ্ধান্ত শুনি নাই!

স্বামীজি—হ্যাঁরে, এও এক class (শ্রেণীর) বেদান্তবাদীদের মত আছে। তাঁরা বলেন, ব্যষ্টিগত মুক্তি মুক্তির যথার্থ স্বরূপ নহে। সমষ্টিগত মুক্তিই মুক্তি। ও মতের দোষগুণও যথেষ্ট আছে।

শিষ্য—বেদান্ত-মতে জীবত্ব বা ব্যষ্টিভাবই ত বন্ধনের কারণ। সেই উপাধিগত চিৎসত্তাই কাম্যকর্ম্মাদিবশে বদ্ধ বলিয়া প্রতীত হন। বিচার-বলে উপাধিশূন্য হইলে—নির্ব্বিষয় হইলে—প্রত্যক্ষ চিন্ময় আত্মার বন্ধন থাকিবে কিরূপে? যাহার জীবজগতাদি বোধ থাকে, তাহার মনে হইতে পারে—সকলের মুক্তি না হইলে তাহার মুক্তি নাই। কিন্তু শ্রবণাদি-বলে মন নিরুপাধিক হইয়া যখন প্রত্যগ্‌ব্রহ্মময় হয়, তখন তাহাব নিকট জীবই কোথায়, আর জগৎই বা কোথায়?-কিছুই থাকে না। তাহার মুক্তিত্বের অবরোধক কিছুই হইতে পারে না।

স্বামীজি—হাঁ, তুই যা বল্‌ছিস্ তাহাই অধিকাংশ বেদান্তবাদীর সিদ্ধান্ত। উহা নির্দ্দোষও বটে। উহাতে ব্যক্তিগত মুক্তি অবরুদ্ধ হয় না। কিন্তু যে মনে করে, আমি আব্রহ্ম জগৎটাকে আমার সঙ্গে নিয়ে এক সঙ্গে মুক্ত হব তার মহাপ্রাণতাটা একবার ভেবে দেখ্ দেখি।

শিষ্য। হাঁ, তাহা সত্য। কিন্তু উহা উদারভাবের পরিচায়ক হইলেও জ্ঞানীর কথা নহে বলিয়া মনে হয়।

স্বামীজি শিষ্যের কথাগুলি যেন শুনিয়াও শুনিতেছেন না, অন্য মনে কি ভাবিতেছেন। কিছুক্ষণ পরে বলিয়া উঠিলেন—"ওরে, আমাদের কি কথা হচ্ছিল?" যেন পূর্ব্বের সকল কথা ভুলিয়া গিয়াছেন! শিষ্য ঐ বিষয়ের অনুস্মরণ করাইয়া দেওয়ায় স্বামীজি বলিলেন "দিন রাত

ব্রহ্মবিষয়ের অনুধ্যান কর্‌বি। একান্ত মনে ধ্যান কর্‌বি। আর ব্যুত্থানকালে হয় কোন লোকহিতকর বিষয়ের অনুষ্ঠান কর্‌বি—না হয় মনঃসংকল্প দ্বারা এই ভাব্‌বি, "জীবের জগতের উপকার হোক্‌" "সকলের দৃষ্টি ব্রহ্মাবগাহী হোক্‌"। ধারাবাহিক ঐরূপ চিন্তা-তরঙ্গের দ্বারাই জগতের উপকার হবে। জগতের কোন সদনুষ্ঠানই নিরর্থক হয় না, তা উহা কার্য্যই হোক্‌—আর চিন্তাই হোক্‌। তোর চিন্তা-তরঙ্গের প্রভাবে হয় তো এমেরিকার কোন লোকের চৈতন্য হবে।

শিষ্য—মহাশয়, আমি আপনার ঐ কথা বুঝিতে পারিতেছি না। আমার মন যথার্থ নির্ব্বিষয় হউক; আপনি আমাকে ইহা আশীর্ব্বাদ করুন—এই জন্মেই যেন তাহা হয়।

স্বামীজি—তা হবে বই কি? ঐকান্তিকতা থাক্‌লে নিশ্চয়ই হবে।

শিষ্য—আপনি মনকে ঐকান্তিক করিয়া দিতে পারেন; আপনার সে শক্তি আছে, আমি জানি। আমাকে ঐরূপ করিয়া দিন, ইহাই প্রার্থনা।

ঐরূপ কথাবার্ত্তা হইতে হইতে শিষ্যসহ স্বামীজি মঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দশমীর চন্দ্রে মঠের উদ্যান যেন দ্রুত রজতধারায় প্লাবিত হইতেছিল। শিষ্য উল্লসিত-প্রাণে স্বামীজির পশ্চাতে পশ্চাতে মঠ-মন্দিরে উপস্থিত হইয়া আনন্দে বিচরণ করিতে লাগিল। স্বামীজি উপরে বিশ্রাম করিতে গেলেন।

লণ্ডনে ভারতীয় যোগী।

(ওয়েষ্টমিনিষ্টার গেজেট, ২৩শে অক্টোবর, ১৮৯৫)

কয়েক বর্ষ যাবৎ ভারতীয় দর্শন এখানকার (ইংলণ্ডের) অনেক ব্যক্তির হৃদয়ে গভীর ও ক্রমবর্দ্ধমান প্রভাব বিস্তার করিতেছে; কিন্তু এ পর্য্যন্ত যাঁহারা এদেশে উহার ব্যাখ্যা-ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের চিন্তাপ্রণালী ও শিক্ষাদীক্ষা সম্পূর্ণ পাশ্চাত্যভাবাপন্ন হওয়ায় বেদান্তজ্ঞানের গভীরতর রহস্য-সমূহ সম্বন্ধে প্রকৃতপক্ষে লোকে অতি অল্পই জানিয়াছে—তাহাও আবার নির্দ্দিষ্ট স্বল্প কয়েকজন মাত্র। প্রাচ্য ভাবে শিক্ষিত দীক্ষিত, প্রাচ্য

ভাবে গঠিত, উপযুক্ত আচার্য্যগণ বেদান্তশাস্ত্র হইতে যে গভীর তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন, শব্দশাস্ত্রবিদ্‌গণের সাহায্যের জন্যই প্রধানতঃ প্রকাশিত দুর্ব্বোধ্য অনুবাদগ্রন্থ হইতে সেই জ্ঞান সঞ্চয় করিবার সাহস ও অন্তর্দৃষ্টি আবার অনেকেরই নাই।

জনৈক সংবাদদাতা আমাদিগকে লিখিতেছেন—'পূর্ব্বোক্ত কারণে কতকটা যথার্থ আগ্রহের সহিত আর কতকটা কৌতূহল-পরবশ হইয়াও বটে, আমি পাশ্চাত্য জাতির নিকটে একপ্রকার সম্পূর্ণ নূতন বলিয়া প্রতীত বেদান্তধর্ম্মের প্রচারক স্বামী বিবেকানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। ইনি সত্যসত্যই একজন ভারতীয় যোগী—যুগযুগান্তর ধরিয়া সন্ন্যাসী ও যোগিগণ শিষ্যপরম্পরাক্রমে যে শিক্ষা দিয়া আসিতেছেন, তাহাই ব্যাখ্যা করিবার জন্য তিনি অকুতোভয়ে পাশ্চাত্য দেশে আগমন করিয়াছেন। গত রজনীতে প্রিন্সেস হলে তিনি ঐ বিষয়ে এক বক্তৃতা দিয়াছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দের মাথায় কাল কাপড়ের পিরালি পাগড়ী, মুখের ভাব শান্ত ও প্রসন্ন—তাঁহাকে দেখিলেই তাঁহার মধ্যে কিছু বিশেষত্ব আছে বলিয়া বোধ হয়।

আমি জিজ্ঞাসিলাম,—

"স্বামীজি, আপনার নামের কোন অর্থ আছে কি?—যদি থাকে, তাহা কি আমি জানিতে পারি?"

স্বামীজি। "আমি এক্ষণে যে নামে (স্বামী বিবেকানন্দ) পরিচিত, তাহার প্রথম শব্দটীর অর্থ সন্ন্যাসী অর্থাৎ যিনি বিধিপূর্ব্বক সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়াছেন, আর দ্বিতীয়টী একটী উপাধি—সংসার-ত্যাগের পর ইহা আমি গ্রহণ করিয়াছি। সকল সন্ন্যাসীই এইরূপ করিয়া থাকেন। ইহার অর্থ—"বিবেক অর্থাৎ সদসদ্বিচারের আনন্দ।"

আমি জিজ্ঞাসিলাম,—

"আচ্ছা স্বামীজি, সংসারের সকল লোকে যে পথে চলিয়া থাকে, আপনি তাহা ত্যাগ করিলেন কেন?"

তিনি উত্তর দিলেন,—

"বাল্যকাল হইতেই ধর্ম্ম ও দর্শন-চর্চ্চায় আমার বিশেষ আগ্রহ ছিল। আর আমাদের শাস্ত্রের উপদেশ—মানবের পক্ষে ত্যাগই শ্রেষ্ঠতম আদর্শ। পরে

রামকৃষ্ণ পরমহংস নামক একজন উন্নত ধর্ম্মাচার্য্যের সহিত আমার মিলন হইল—আমি দেখিলাম, আমার যাহা শ্রেষ্ঠতম আদর্শ, তাহা তিনি জীবনে পরিণত করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবার পর, তিনি স্বয়ং যে পথের পথিক, আমারও সেই পথ অবলম্বন করিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগরিত হইল—আমার সন্ন্যাসগ্রহণের সংকল্প স্থির হইল।"

"তবে কি তিনি একটী সম্প্রদায় স্থাপন করিয়া গিয়াছেন—আপনি এক্ষণে তাহারই প্রতিনিধিস্বরূপ ?"

স্বামীজি অমনি উত্তর দিলেন,—

"না না, সাম্প্রদায়িকতা ও গোঁড়ামি দ্বারা আধ্যাত্মিক জগতে সর্ব্বত্র যে এক গভীর ব্যবধানের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা দূর করিবার জন্যই তাঁহার সমগ্র জীবন ব্যয়িত হইয়াছিল। তিনি কোন সম্প্রদায় স্থাপন করেন নাই। বরং উহার সম্পূর্ণ বিপরীতই করিয়া গিয়াছেন। সাধারণে যাহাতে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীনচিন্তাপরায়ণ হয়, তদ্বিষয়েরই তিনি সম্পূর্ণ পোষকতা করিতেন এবং উহার জন্যই তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। তিনি একজন খুব বড় যোগী ছিলেন।"

"তাহা হইলে এই দেশের কোন সমাজ বা সম্প্রদায়ের সহিতই আপনার কোন সম্বন্ধ নাই ? যথা—থিওজফিক্যাল সোসাইটি, খ্রীষ্টিয়ান সায়েণ্টিষ্ট * বা অপর কোন সম্প্রদায়ের সহিত ?"

স্বামীজি স্পষ্ট হৃদয়স্পর্শী স্বরে বলিলেন, "না, কিছুমাত্র না।" (স্বামীজি যখন কথা কহেন, তখন তাঁহার মুখ বালকের মুখের মত উজ্জ্বল হইয়া উঠে—মুখখানি এতই সরল, অকপট ও সদ্‌ভাবপূর্ণ)। "আমি যাহা শিক্ষা দিই, তাহাতে আমার গুরুর উপদেশের অনুযায়ী হইয়া আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রসমূহের ব্যাখ্যাই করিয়া থাকি। অলৌকিক উপায়ে লব্ধ কোন প্রকার অলৌকিক বিষয় শিক্ষা দিবার আমি দাবী করি না। আমার উপদেশের

* Christian Scientists —মার্কিনদেশীয় একটী ধর্ম্মসম্প্রদায়ের নাম। মিসেস এডি নাম্নী মার্কিন মহিলা এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাত্রী। ইঁহাদের মতে, রোগ, দুঃখ, পাপ প্রভৃতি মনের ভ্রমমাত্র। আমাদের কোন রোগ নাই একথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করিলে আমরা সর্ব্বপ্রকার রোগমুক্ত হইব। ইঁহারা বলেন, আমরাই খ্রীষ্টের মত প্রকৃতভাবে অনুসরণ করিতেছি। তিনি যেরূপ অলৌকিক উপায়ে রোগীকে রোগমুক্ত করিতেন, আমরাও পূর্ব্বোক্ত বিশ্বাস সহায়ে তাহা করিতে সমর্থ।

মধ্যে যতটুকু তীক্ষ্ণ বিচার-বুদ্ধিতে উপাদেয় এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের গ্রাহ্য বলিয়া বোধ হইবে, ততটুকু লোকে গ্রহণ করিলেই আমার যথেষ্ট পুরস্কার হইবে।"

তিনি বলিতে লাগিলেন,—

"সকল ধর্ম্মেরই লক্ষ্য—কোন বিশেষ মানবজীবনকে আদর্শস্বরূপ করিয়া স্থূলভাবে ভক্তি, জ্ঞান বা যোগ শিক্ষা দেওয়া। উক্ত আদর্শগুলিকে অবলম্বন করিয়া ভক্তি জ্ঞান ও যোগ-বিষয়ক যে সাধারণ ভাব ও সাধনপ্রণালী রহিয়াছে, বেদান্ত তাহারই বিজ্ঞানস্বরূপ। আমি ঐ বিজ্ঞানই প্রচার করিয়া থাকি এবং ঐ বিজ্ঞান সহায়ে, নিজ নিজ সাধনোপায় ভাবে অবলম্বিত বিশেষ বিশেষ স্থূলাদর্শ সকল প্রত্যেকে আপনিই বুঝিয়া লউক—এই কথাই বলি। আমি প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার নিজ নিজ অভিজ্ঞতাকেই প্রমাণস্বরূপে গ্রহণ করিতে বলিয়া থাকি, আর যেখানে কোন গ্রন্থের কথা প্রমাণস্বরূপে উপস্থিত করি, সেখানে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখি—সেই গ্রন্থ সকলের অনায়াসলভ্য কি না—অথবা সকলেই ইচ্ছা করিলে নিজে নিজে উহা পড়িয়া লইতে পারে কি না। সর্ব্বোপরি, আমি মানব প্রতিনিধিগণ দ্বারা নিজা-দেশ প্রচারকারী, সাধারণ চক্ষুর অন্তরালে সর্ব্বথা অবস্থিত—পুরুষ সকলের উপর বিশ্বাস বা তাহাদের উপদেশ বলিয়া কোনও কিছু প্রমাণ স্বরূপে উপ-স্থাপিত করি না অথবা গোপনীয় গ্রন্থ বা হস্তলিপি হইতে আমি কিছু শিখি-য়াছি বলিয়া দাবী করি না। আমি কোন গুপ্ত সমিতির মুখপাত্র নহি, অথবা ঐরূপ সমিতিসমূহের দ্বারা কোনরূপ কল্যাণ হইতে পারে বলিয়াও আমার বিশ্বাস নাই। সত্য আপনিই আপনার প্রমাণ, উহার অন্ধকারে লুকাইয়া থাকিবার কোন প্রয়োজন নাই, উহা অনায়াসে দিবালোক সহ্য করিতে পারে।"

আমি জিজ্ঞাসিলাম,—

"তবে, স্বামীজি, আপনার কোন সমাজ বা সমিতি প্রতিষ্ঠা করিবার সংকল্প নাই?"

"না, আমার কোন প্রকার সমিতি বা সমাজ প্রতিষ্ঠিত করিবার ইচ্ছা নাই। আমি প্রত্যেক ব্যক্তির হৃদয়ে গূঢ়ভাবে অবস্থিত, সর্ব্বসাধারণের সম্পত্তিস্বরূপ আত্মার তত্ত্ব উপদেশ দিয়া থাকি। জনকতক দৃঢ়চিত্ত ব্যক্তি আত্মজ্ঞানলাভ করিলে ও ঐ জ্ঞান অবলম্বনে দৈনন্দিন জীবনের কার্য্যাবলী

করিয়া যাইলে পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের স্থায় আজকালকার দিনেও জগৎটাকে সম্পূর্ণ ওলটপালট করিয়া দিতে পারে। পূর্ব্বে পূর্ব্বে এক এক জন দৃঢ়চিত্ত মহাপুরুষ ঐরূপেই তাঁহাদের নিজ নিজ সময়ে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিলেন।"

আমি জিজ্ঞাসিলাম,

"স্বামীজি, আপনি কি এই সবে ভারত হইতে আসিতেছেন?" কারণ, তাঁহার চেহারা দেখিলে প্রাচ্যদেশীয় প্রবল সূর্য্যকিরণের কথা মনে পড়ে।

স্বামীজি বলিলেন,—

"না। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে চিকাগোয় যে ধর্ম্ম-মহাসভা হইয়াছিল, আমি তাহাতে হিন্দুধর্ম্মের প্রতিনিধির কার্য্য করিয়াছিলাম। সেই অবধি আমি আমেরিকার যুক্তরাজ্যে ভ্রমণ ও বক্তৃতা করিতেছি। মার্কিন জাতি পরম আগ্রহ সহকারে আমার বক্তৃতা শুনিতেছে এবং আমার পরমবন্ধুবৎ আচরণ করিতেছে। তথায় আমার কার্য্য এরূপ দৃঢ়মূল হইয়াছে যে, আমাকে তথায় শীঘ্র ফিরিয়া যাইতে হইবে।"

"পাশ্চাত্য ধর্ম্মসমূহের প্রতি আপনার কিরূপ ভাব, স্বামীজি?"

"আমি এমন একটী দর্শন প্রচার করিয়া থাকি, যাহা—জগতে যতপ্রকার ধর্ম্ম থাকা সম্ভব, তৎসমুদয়েরই ভিত্তিস্বরূপ হইতে পারে, আর আমার ঐ সমুদয়গুলিরই উপর সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে—আমার উপদেশ কোন ধর্ম্মেরই বিরোধী নহে। আমি ব্যক্তিগত জীবনের উন্নতিসাধনেই বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখি, উহাই তেজস্বী করিবার চেষ্টা করি—প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বয়ং ঈশ্বরাংশ বা ব্রহ্ম—এ কথাই শিক্ষা দিই, আর, সর্ব্বসাধারণকে তাহাদের অভ্যন্তরীণ এই ব্রহ্মভাব সম্বন্ধে সচেতন হইতেই আহ্বান করিয়া থাকি। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে—ইহাই প্রকৃত পক্ষে সকল ধর্ম্মের আদর্শ।"

"এদেশে আপনার কার্য্য কি আকারে হইবে?"

"আমার আশা এই যে, আমি কযেকজন লোককে পূর্ব্বোক্ত ভাবে শিক্ষা দিব—আর তাহাদের নিজ নিজ ভাবে অপরের নিকট উহা ব্যক্ত করিতে উৎসাহিত করিব। আমার উপদেশ তাহারা যত ইচ্ছা রূপান্তরিত করুক, ক্ষতি নাই। আমি অবশ্যবিশ্বাস্য মতবাদস্বরূপে কিছু শিক্ষা দিব না, কারণ, পরিণামে সত্যের জয় নিশ্চয়ই হইয়া থাকে।

"আমি প্রত্যক্ষ যে ভাবে কার্য্য করি, তাহার ভার আমার দু একটী বন্ধুর হাতে আছে। তাঁহারা ২২শে অক্টোবর সন্ধ্যা ৮॥০ টার সময় পিকাডেলি প্রিন্সেস হলে ইংরাজ শ্রোতৃবৃন্দের সম্মুখে আমার এক বক্তৃতা দিবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। চারিদিকে এই বিষয়ের বিজ্ঞাপন দেওয়া হইতেছে; বিষয়—মৎপ্রচারিত দর্শনের মূলতত্ত্ব—'আত্মজ্ঞান'। তাহার পর আমার উদ্দেশ্য সফল করিবার যে রাস্তা দেখিতে পাইব, তাহারই অনুসরণ করিতে আমি প্রস্তুত আছি—লোকের বৈঠকখানায় বা অন্য স্থলে সভায় যোগ দেওয়া, পত্রের উত্তর দেওয়া বা সাক্ষাৎভাবে বিচার করা—সমুদয়ই করিতে প্রস্তুত আছি। এই অর্থলালসা-প্রধান যুগে আমি এ কথাটী কিন্তু সকলকে বলিতে চাই যে, অর্থলাভের জন্য আমার কোন কার্য্যই অনুষ্ঠিত হয় না।"

আমি এইবার তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইলাম—আমার সহিত যত ব্যক্তির সাক্ষাৎকার হইয়াছে, ইনি তন্মধ্যে একজন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মৌলিকভাবপূর্ণ, তদ্বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

মহর্ষি ফ্র্যান্‌সিস।

[শ্রীহরিদাস দত্ত বি, এ]

দ্বিতীয় অধ্যায়।

আধ্যাত্মিক পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত হইতে ফ্র্যান্‌সিসের জীবনে এখন দুই বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে। সন্ন্যাস গ্রহণই তাঁহার জীবনের চরম লক্ষ্য—একথা তিনি এখন বুঝিতে পারিয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বুঝিয়াছেন যে, তাদৃশ জীবন গ্রহণ করিতে হইলে যে শিক্ষার প্রয়োজন, সে শিক্ষা এখনও তাঁহার সম্পূর্ণ হয় নাই। এই সময়ের একটী ঘটনায় তাঁহার ঐ বিষয়ক ধারণা দৃঢ়ীভূত হয়। সাধন-ভজনে জীবনাতিপাত করিবার ইচ্ছা যখন তাঁহার ভিতর অত্যন্ত বলবতী, তখন একদিন ঘোড়ায় চড়িয়া পথে বেড়াইতে বেড়াইতে মোড় ফিরিবার সময় তিনি সম্মুখে একজন কুষ্ঠ রোগীকে দেখিতে পাইলেন। পূর্ব্বে এই ভীষণ ব্যাধি তাঁহার মনে অতিশয় ঘৃণার উদ্রেক করিত। সংস্কারবশতঃ এখনও তাঁহার মনে তদ্রূপ ভাবের

উদয় হইল। তিনি ঐ দৃশ্য সহ্য করিতে না পারিয়া ঘোড়া ফিরাইয়া অন্য দিকে চলিয়া যাইবার উপক্রম করিলেন। কিন্তু ঐরূপ করিবার পরক্ষণেই তাঁহার মনে তীব্র ধিক্কার জন্মিল। তিনি ভাবিলেন—"সুন্দর ও সমুচ্চ কল্পনা সৃজনের সময় দেখিতেছি আমি বেশ মজবুত—কিন্তু কাযের সময় একেবারে কিছুই নয়! কি ঘৃণার কথা! তবে কি আমি ধর্ম্মনির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য পালনে এই ভাবে চিরদিন পরাঙ্মুখ থাকিব?" এই কথা ভাবিয়া তিনি পুনরায় অশ্বকে ফিরাইলেন এবং উহার পৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া তাঁহার নিকটে যাহা কিছু অর্থ ছিল, তৎসমুদয় ঐ কুষ্ঠরোগীটীকে দান করিলেন। তাহার পর সাধারণে যে ভাবে ধর্ম্মযাজকের হস্ত চুম্বন করিয়া সম্মান প্রদর্শন করে, সেইভাবে তিনি তাহার হস্ত চুম্বন করিলেন। তাঁহার ঐরূপ ব্যবহারে কুষ্ঠরোগীটী অবাক্ হইয়া রহিল। ফ্রান্সিসের ধর্ম্মজীবনে ইহা অপর একটী প্রসিদ্ধ ঘটনা। ইহার কিছুদিন পরে তিনি হাসপাতাল পরিদর্শনে গমন করেন। তাঁহার ন্যায় উদ্ধত ধনী পুরুষকে সেখানে দেখিয়া হতভাগ্য রোগিগণ স্তম্ভিত হইয়া রহিল। অসহায় রোগীদের অবস্থা যাঁহারা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন, একটী স্নেহপূর্ণ বাক্য অথবা সামান্য সহানুভূতি-পরিচায়ক দৃষ্টি দ্বারা ইহাদের হৃদয়ে কত আনন্দ উৎপাদন করিতে পারা যায়। হাসপাতাল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ফ্র্যান্সিস্ ব্যথিত ও আনন্দিত হইলেন এবং তাঁহার সর্ব্ব অবয়ব সহানুভূতিপূর্ণ এক অভূতপূর্ব্ব উত্তেজনায় স্পন্দিত হইয়া উঠিল। তাঁহার সানুকম্প আচরণে রোগীদের মধ্যে কৃতজ্ঞতাসূচক একটা অব্যক্ত ধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল। আমরা উহাকে এখানে অব্যক্ত বলিলাম, কারণ, ভাষায় উহা প্রকাশ করিতে পারা যায় না। ফ্র্যান্সিস্ উহা জীবনে এই প্রথম শুনিলেন। উপকারককে কেবলমাত্র প্রশংসা করিতেছে না কিন্তু সাক্ষাৎ দেবতা জ্ঞান করিতেছে, রোগীদিগের ঐ ধ্বনি শুনিয়া তাঁহার মনে এইরূপ একটা ধারণারই উদয় হইয়াছিল।

তৃতীয় অধ্যায়।

তৎকালীন ধর্ম্মভাব—১২০৫-১২০৬।

মনুষ্যের যতদূর হওয়া সম্ভব, আমাদের মনে হয়, মহাত্মা ফ্র্যান্সিস্ ঐশী-ভাবে ততদূর অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। আমরা দেখিয়াছি, ঈশার জীবন

অনুসরণে তাঁহার প্রবল ইচ্ছা ছিল এবং ঈশানুসরণেই তাঁহার জীবন গঠিত হইয়াছে, এ কথা তিনি সর্ব্বদা বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু তজ্জন্য ফ্র্যান্সিসের জীবনের নূতনত্বের কিছুমাত্র হ্রাস হয় না, কারণ, ঈশার জীবনী সম্বন্ধে আমাদের অল্পই জানা আছে। ঐ বিশ্বাসের জন্য আবার অহঙ্কার তাঁহাকে আজীবন কখনও স্পর্শ করিতে পারে নাই। আমরা দেখিতে পাইব ভবিষ্য জীবনে অসীম উৎসাহে তিনি ধর্ম্মপ্রচারকার্য্যে ব্রতী হইলেও অহংভাব তাঁহার অন্তরে কখনও স্থান পায় নাই। এখন তৎকালিক ধর্ম্মভাব তাঁহার উপর কি ভাবে কতদূর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল, সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা এই প্রসঙ্গে আবশ্যক।

সে সময়ে ধর্ম্মযাজকদিগের চরিত্রহীনতা চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না এবং দেশীয় জনসাধারণের ধর্ম্মজীবন যতদূর শোচনীয় হইবার, হইয়া উঠিয়াছিল। ধর্ম্মযাজক হইবার জন্য প্রকাশ্যে অসঙ্কোচে উৎকোচ প্রদত্ত ও গৃহীত হইত। এবং যিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অর্থ প্রদান করিতে পারিতেন, তাঁহাকেই ঐ পদে অভিষিক্ত করা হইত। সাধারণ ধর্ম্মযাজকগণ পৌরোহিত্য-পদ প্রাপ্তির নিমিত্ত সাধ্যমত চেষ্টা করিত এবং মুমূর্ষু পুরোহিতগণের উত্তরাধিকার লাভের জন্য অতীব ঘৃণ্য ও নিন্দনীয় কার্য্য করিতেও পশ্চাৎপদ হইত না। ন্যায়বিচারের দিকে বিচারপতিগণের আদৌ দৃষ্টি ছিল না এবং তাঁহাদের হৃদয়ে লেশমাত্র ক্ষমাগুণের পরিচয় পাওয়া যাইত না। সাধারণতঃ তাঁহারা অতিশয় কোপন-স্বভাব, অতিরিক্ত প্রতারণা-পরায়ণ, অহঙ্কারী ও অর্থলোলুপ ছিলেন। প্রধান প্রধান ধর্ম্মযাজকগণ দুর্দ্দান্ত ও কলহপ্রিয় ছিলেন এবং পুরোহিতগণের নিকট হইতে নানাবিধ উপায়ে অর্থশোষণ করিতেন। সন্ন্যাসীদিগের অবস্থা ইহা অপেক্ষা কোন অংশে প্রশংসনীয় ছিল না। তাঁহাদের যশ একবার প্রচারিত হইলে ভক্তিমান্ লোকেরা অজস্র পরিমাণে তাঁহাদিগকে অর্থাদি সাহায্য প্রেরণ করিতেন। ইহার ফলে তাঁহাদের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইত এবং কোনরূপ কুকর্ম্ম অনুষ্ঠানেই তখন আর ইঁহারা পশ্চাৎপদ হইতেন না। মঠের ও আশ্রমের মধ্যে ইঁহারা মাদক দ্রব্যের দোকান বসাইতেন এবং উহাতে ক্রেতা আকর্ষণের জন্য রং তামাসা এবং বারবনিতারও সাহায্য গ্রহণ করা হইত। নরহত্যা, যোষিৎসঙ্গ, অগম্যাগমন, ব্যভিচার প্রভৃতি কোনরূপ গর্হিত কর্ম্মই তাঁহাদের অনুষ্ঠানের বহির্ভূত ছিল না। পোপ তৃতীয় ইনোসেণ্ট স্পষ্ট

স্বীকার করিয়াছিলেন,অগ্নি ও তরবারির সাহায্য-গ্রহণই ধর্ম্মযাজক ও সন্ন্যাসিগণের জীবনে এই ভীষণ ব্যাধির একমাত্র প্রতিকার। ধর্ম্মজীবনের ঈদৃশ বীভৎস ও শোচনীয় অবস্থা দর্শনে তিনি নিরাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং উহার প্রতিকার বিধান করা যে তাঁহার ক্ষমতার বহির্ভূত, এ কথা তিনি সম্যক্ বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

পূর্ব্বোক্ত কারণে কেহই আর ধর্ম্মযাজক বা পুরোহিতগণকে সম্মান করিত না এবং তাহাদের বিরুদ্ধে স্থানে স্থানে বিদ্রোহ-বহ্নিও সাধারণের ভিতর প্রজ্বলিত হইয়া উঠিতেছিল। বিপন্ন অবস্থায় পড়িলে তাহারা পোপের শরণাপন্ন হইত এবং তাহারা আশ্রয় দানের পাত্র নহে এ কথা বুঝিতে পারিলেও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় পোপ তাহাদিগকে সাহায্য করিতে পরাঙ্মুখ হইতেন না,—আবার এরূপভাবে অধিক দিন কার্য্য চলিতে পারে না এবং ব্যাধিরও প্রতিকার বিধান সম্ভব নহে, ভাবিয়া তিনি বিষণ্ণ হইতেন। জনসাধারণের পূজোপাসনা প্রাণহীন উৎসবাদিতে পরিণত হইয়া উঠিয়াছিল এবং সেজন্য উহা জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান্ লোকদিগের চিত্ত আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইত না। এইরূপ নানাবিধ কুসংস্কারে দেশ সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছিল এবং কেবল যে অশিক্ষিত চাষা-ভুসোদের মধ্যে উহার প্রভাব দৃষ্ট হইত, তাহাও নহে, কিন্তু শিক্ষিত সন্ন্যাসীদের মধ্যেও ঐ প্রভাব স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইত। প্রধান প্রধান ধর্ম্মযাজকগণের মধ্যে অনেকেই অনুপযুক্ত ও ধর্ম্মভাবশূন্য ছিলেন এবং মঠাধিবাসী সন্ন্যাসীগণের মধ্যে অনেকেই আলস্য ও ব্যভিচার-দোষে দূষিত ছিলেন।

ধর্ম্মজীবনের ঈদৃশ অধঃপতন ও শোচনীয় পরিণামের মধ্যে আদর্শ চরিত্র ও ধর্ম্মজীবন অতিশয় বিরল হইলেও একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। ইহাদের সংখ্যা অতি অল্প হইলেও তাঁহাদের চরিত্রশক্তিবলেই নাস্তিকদিগের হস্ত হইতে ধর্ম্ম কথঞ্চিৎ সংরক্ষিত হইতেছিল। কারণ, এই বিশৃঙ্খলতার দিনেও অধ্যাত্মশক্তির প্রভাব পূর্ব্ববৎ না থাকিলেও উহার শক্তি একেবারে তিরোহিত হয় নাই। তখনও প্রবল পরাক্রান্ত নৃপতিগণ ধর্ম্মনেতা পোপের আদেশ লঙ্ঘন করিতে সাহসী হইতেন না এবং অতি সামান্য পদবীস্থ পুরোহিতগণের প্রতি বিনীতভাবে প্রভূত সম্মান প্রদর্শন করিতেন। কারণ, প্রচলিত ধারণা ইহাই ছিল যে, ধর্ম্মযাজকেরা মহাত্মা পিটারের সাক্ষাৎ প্রতিনিধি-স্বরূপ। ধর্ম্মের কি মহীয়সী শক্তি! ধর্ম্মজীবনের এইরূপ শোচনীয় পরি-

ণামের সময় প্রচলিত ধর্ম্মের বিরোধী মত প্রচারের চেষ্টাও কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নহে এবং ঐ ভাবের দুইটী দলেরও সৃষ্টি হইযাছিল। একদলের উদ্দেশ্য ছিল, প্রচলিত ধর্ম্ম অপেক্ষা অধিকতর মহান্ ও পবিত্র ধর্ম্মভাবের প্রবর্ত্তন ও প্রচলন, এবং অপর দল প্রচলিত ধর্ম্মের অধঃপতন দর্শনে উহার পুনরুদ্ধারের অভিপ্রায়ে সাধ্যমত চেষ্টা করিতেছিল। দেশের ঐরূপ অবস্থায় কঠোর পবিত্রতার আদর্শ অবলম্বন করিয়া যিনিই আধ্যাত্মিক জগতে উঠিযা দাঁড়াইতেন, তিনিই সাধারণের সহানুভূতি লাভ করিতেন এবং ঐরূপে ধর্ম্মসংস্কারের যথার্থ চেষ্টাও চারিধারে কিছু কিছু চলিতেছিল। ঈশ্বর-বিশ্বাসী নিজ ভরণপোষণের জন্য সঞ্চয পরিহারপূর্ব্বক নির্ভরশীল হইয়া দীনভাবে জীবন যাপন করিবে, খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের এই কথা তখন সকলেরই মনে সর্ব্বক্ষণ উদিত হইতেছিল এবং তজ্জন্য মহাত্মা ফ্র্যান্‌সিসের উহা প্রচারেব অতি অল্প কালমধ্যেই ঐ ভাব জগতের সর্ব্বত্র বিস্তৃতি লাভ করিযাছিল।

আধ্যাত্মিক রাজ্যের পুর্ব্বোক্ত বিশৃঙ্খলতা হইতে এ্যাসিসি নগরও অব্যাহতি লাভ করিতে পারে নাই এবং সেজন্য নিজ গৃহে বসিয়াই ফ্র্যান্‌সিস দেশব্যাপী ধর্ম্মান্দোলনের আভাস পাইতেছিলেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইটালীর অবস্থা যে কিরূপ শোচনীয হইযা উঠিয়াছিল, উপরি লিখিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে তৎসম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা লাভ দুরূহ হইবে না। ধর্ম্মযাজকদিগের ভিতর ধর্ম্মভাবের ঐরূপ অবনতির জন্য অনেকেই তখন আবার অন্য ধর্ম্মের প্রতি অনুরক্ত হইয়া উঠিতেছিল। মহাত্মা ফ্র্যান্‌সিসের পবিত্র জীবন এইরূপ সময়েই দেশমধ্যে উদিত হইয়া নিজ চরিত্র-প্রভাবে ধর্ম্মহীনতারূপ সমূহ বিপদ হইতে জনসাধারণকে মুক্তি প্রদান করিয়াছিল। পরবর্ত্তী কালের মানব-জীবনের পবিত্রতা ও ধর্ম্মোন্নতির জন্য সমগ্র দেশবাসী এই মহাপুরুষের নিকটেই বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ। ঐ মহৎ কার্য্য সম্পাদনের জন্য ফ্র্যান্‌সিস্ পাণ্ডিত্য ও তর্কযুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া অগ্রসর হন নাই, কিন্তু সাধনের দ্বারা স্বয়ং পবিত্র ও সমুন্নত জীবন লাভ করিয়া দেশবাসীর সম্মুখে ঐ জীবন আদর্শভাবে স্থাপন করিয়াছিলেন এবং ঐ আদর্শ-চরিত্র-প্রভাবেই পূর্ব্বোক্ত দেশব্যাপী বিশৃঙ্খলতা অতি সহজে তিরোহিত করিতে সমর্থ হইযাছিলেন। তর্ক-বিচার পরিহার পূর্ব্বক সাধন-সহায়ে ধর্ম্ম জীবন লাভে অগ্রসর হওয়াতেই তাঁহাতে ঐ শক্তি উদ্ভূত হইয়াছিল। পাণ্ডিত্য ও তর্ক-বিচার অনেক সময়ে ধর্ম্মবিষয়ক অভিমানেরই সৃষ্টি করে

এবং বিবাদ ভঞ্জন ও নিষ্পত্তি করা দূরে থাক, উহার বিপরীত ফলই উৎপাদন করিয়া থাকে। তর্কযুক্তির সহায়ে সত্যকে সত্য বলিয়া প্রমাণিত করিবার প্রয়োজন নাই—সত্য নিজেই নিজের প্রমাণস্বরূপ। আপন পবিত্রতা ও প্রেমের সাহায্যেই তিনি অসৎ লোকদিগকে সৎপথে আনয়ন এবং তাঁহাকে ভাল বাসিতে বাধ্য করিয়াছিলেন এবং ঐরূপে সাধারণের মনে তিনি যে উন্নতিলাভের উত্তেজনার সৃজন করিয়াছিলেন, তাহারই পরোক্ষ ফলস্বরূপে ধর্ম্মবিরোধিগণ স্বতঃই দেশ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিল। এইরূপে আম্‌ব্রিয়া-নিবাসী এই ধর্ম্মসংস্কারকের আদর্শে তাঁহার দেশবাসিগণ মোহ পরিহার পূর্ব্বক জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিল এবং যথার্থ আধ্যাত্মিক ভাবে জীবন গঠিত করিয়া সুন্দর-প্রকৃতি-বিশিষ্ট হইতে সমর্থ হইয়াছিল।

সমসাময়িক ধর্ম্মপ্রচারক এবং সংস্কারকগণের ভাব মহাত্মা ফ্র্যান্‌সিস্ অজ্ঞাতসারে প্রচুর পরিমাণে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইটালির অন্তঃপাতি ক্যালেব্রিয়া নামক দক্ষিণ প্রদেশের খ্যাতনামা সাধুর ভবিষ্যদ্বাণী তাঁহার উপর কতদূর প্রভাব যে বিস্তার করিয়াছিল, তাহার নির্ণয় কঠিন হইলেও উহা নিতান্ত অল্প ছিলনা বলিয়া বোধ হয়। ঐ সাধুর নাম জিবাচিনো ডিফিওরি (Gioacchino di Fiore)। কথিত আছে, ইনি প্রথম জীবন বিশৃঙ্খলভাবে অতিবাহিত করেন। পরে কোন কারণে তাঁহার পরিবর্ত্তন হয় এবং সাধুভাবে নানাদেশ পরিভ্রমণের পর নিজ দেশে পুনরায় প্রত্যাগমন পূর্ব্বক ধর্ম্মপ্রচারকার্য্যে ব্রতী হ'ন। পরে, নিজের বিশেষ ইচ্ছা না থাকিলেও ইনি একটী মঠাধ্যক্ষের পদবীতে কিছুকাল নিযুক্ত হ'ন এবং ঐ কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণের পর মঠ হইতে মঠান্তরে ভ্রমণ করিয়া কালাতিপাত করেন। দেশভ্রমণ সাঙ্গ করিয়া দক্ষিণ ইটালিতে পুনরায় প্রত্যাগমন করিলে, বাইবেলের দুরূহ অংশের ব্যাখ্যা-শ্রবণ-মানসে কতকগুলি লোক তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়। নিজের ইচ্ছা না থাকিলেও তাহাদের সনির্ব্বন্ধ আগ্রহে তিনি ইহাদিগকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইহাদিগকে সঙ্গে লইয়া তিনি ইটালির অন্তর্গত কৃষ্ণ কানন (Black Forest) নামক অরণ্যে কিছুকাল বাস করেন এবং তথায় শাস্ত্র বিষয়ে নিজ মতামত সম্বলিত রচনাবলী সমাপ্ত করেন। তাঁহার তিরোধানের পঞ্চাশ বৎসর পর পর্য্যন্ত তাঁহার ঐ রচনাবলীর কেহই বিশেষ সংবাদ রাখে নাই। কিন্তু ঐ কালের পরে তাঁহার ঐ সকল রচনাকে ভিত্তি করিয়া প্রচলিত-ধর্ম্মবিরোধিগণ নিজেদের

উদ্দেশ্য সাধনে প্রবৃত্ত হয়। প্রচলিত ধর্ম্মের পুনরুদ্ধারের জন্য যাঁহারা এ সময়ে অভিলাষী ছিলেন, তাঁহারাও ইঁহার ঐ রচনাবলী হইতে বিশেষ সহায়তা লাভ করিয়াছিলেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে কেহই একথা বুঝিতে পারে নাই যে, যে অধ্যাত্মস্রোতের প্রবল প্রসার ইটালি তৎকালে অনুভব করিতেছিল, উহার উৎপত্তিস্থান ক্যালেব্রিয়ার অন্তর্গত হিমানী-মণ্ডিত শৈল-শিখর। ডিফিওরির উপদেশাবলী শিষ্যগণ কর্তৃক সাধারণে প্রচারিত হইলে উহা অনেকেরই হৃদয়-কন্দরে সমস্বরে প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল ও তাহাদের মনোমধ্যে আশা-শক্তির সঞ্চার করিয়াছিল। ফ্র্যান্সিস্ তাঁহার ধর্ম্মবিষয়ক মতামত সম্বন্ধে ক্যালেব্রিয়া-নিবাসী এই সাধু মহাত্মার নিকট বিশেষ ভাবে ঋণী ছিলেন এবং তৎপ্রবর্ত্তিত সম্প্রদায় মধ্যে উক্ত মহাপুরুষের উপদেশাবলী প্রধান অবলম্বনস্বরূপ হইয়াছিল। অনেক স্থলে মহাত্মা ফ্র্যান্সিস্ কেবল তাঁহারই কথার পুনরুক্তি করিয়াছেন মাত্র। যে মহাপুরুষ নিজ অসাধারণ চরিত্রগুণে এত লোকের হৃদয় আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, এবং ঊর্দ্ধমুখে ঈশার সহিত সখ্যভাবে কথোপকথন করিতেন, যিনি মানব-হৃদয়ে শান্তিবারি সেচন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং মুমূর্ষু ব্যক্তিকে নিজ বক্ষে আকর্ষণ করিয়া প্রেমালিঙ্গন দানে চরিতার্থ করিতেন, ১২০৫ খৃঃ অব্দে ফ্র্যান্-সিস্ যে তাঁহার বিষয় অবগত ছিলেন, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। ইহার পরবর্ত্তী কতিপয় বৎসর কিন্তু সমগ্র খৃষ্টীয় জগৎ বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে এ্যাসিসি নগরের মহাপুরুষসিংহের অলৌকিক কার্য্যাবলীর প্রতিই দৃষ্টি করিয়াছিল।

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসে মধুর রস।

[শ্রীজিতেন্দ্র লাল বসু, এম, এ।]

উদ্বোধনের কয়েক সংখ্যায় বৈষ্ণব কবির পদাবলী হইতে এই লেখক সাধারণ ভাবে মধুর রস বুঝাইবার প্রয়াস করিয়াছে। এতৎপ্রবন্ধে ব্যক্তিগত ব্যাখ্যান অবলম্বন করিয়া তাহারই একরূপ পুনরুল্লেখ করিতে অগ্রসর

হইবাছি, ইহার কারণ এই যে, পূর্ব্বলিখিত প্রবন্ধে সকল কথা খুলিয়া বলিবার অবকাশ হব নাই। যাহা তখন স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারি নাই, তাহাই এখন বলিবার সংকল্প আছে; কতদূর কৃতকার্য্য হইব, তাহা সকল-কার্য্য-প্রবর্ত্তক শ্রীমধুসূদনই জানেন। মধুররস বিষয় অতি বিস্তৃত, একটী ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তৎসম্বন্ধে সব কথা বলিয়া শেষ করা যাইতে পারে না তাহাও বটে, আর এক কথা এই যে, মধুররস-সংক্রান্ত পদাবলী এত মধুর যে, তাহা-দের দ্বিরুক্তি বা বহূক্তিও অনেকের অপ্রিয় না হইতে পারে। বিশেষতঃ বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস বৈষ্ণব-কাব্যগগনেব দুইটী উজ্জ্বল নক্ষত্র, বঙ্গদেশে মধুর রসের প্রবর্ত্তক বলিলেও চলে। সেই মহাত্মাদের কথা বার বার বলিলেও তৃপ্তি হয় না; কাব্যরসের যতই আস্বাদ লওয়া যায়, ততই উত্তরোত্তর পিপাসা বৃদ্ধি হয়। এই প্রবন্ধ গ্রথিত করিবার ইহাই এক রকম মোটামুটি কারণ বলিতে পারা যায়।

কিন্তু এতদতিরিক্ত আর একটা কারণও আছে, তাহারই কথা এখন বলিব। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস দুই জনেই মহাকবি, তাহা একবাক্যে স্বীকৃত বটে, কিন্তু সাধারণতঃ তাঁহাদের কাব্যের যে ভাবে সমালোচনা করা হয়, তাহাতে তাঁহাদেব যে বিশেষত্ব, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখা হয় না। সাধারণ সমালোচক ভুলিয়া যান যে, তাঁহারা শুধু কবি নহেন, তাঁহারা বৈষ্ণব কবি। দুজনেই প্রেমের কথা কহিয়াছেন, প্রেমের গান গাহিয়াছেন সত্য, কিন্তু শুধু তাঁহাদিগকে প্রেমিক কবি বলিলে বা প্রেমিক কবিরূপে দেখিলে অনেক সময় তাঁহাদিগকে বুঝা যাইবে না, অথবা তাঁহাদিগকে ভুল বুঝা হইবে। এইজন্য আমি তাঁহাদিগকে প্রথমতঃ বৈষ্ণবকবি ও দ্বিতীয়তঃ প্রেমের কবি এইরূপ ভাবিয়া তাঁহাদের কাব্য বিশ্লেষণ করিতে সচেষ্ট হইব। প্রথমে দেখিতে হইবে যে, তাঁহাদের অমর পদাবলী দ্বারা বৈষ্ণব দার্শনিককে বুঝিবার কত দূর সুবিধা হইয়াছে; বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিশেষতঃ বৈষ্ণবধর্ম্মোক্ত মধুর-রস তত্ত্বের কত দূর সুগমত্ব সাধিত হইযাছে, এবং তাঁহাদের কাব্য-কলা-রসে ও কবিত্বের প্রগাঢ়ত্ব-বলে বৈষ্ণব ধর্ম্মের সকল কথা কত সহজে বুঝিতে পারা যাইতেছে। বলা বাহুল্য যে, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস পার্থিব নায়কনায়িকার প্রণয় চিত্রাঙ্কন কার্য্যে জীবন ব্যয়িত করেন নাই। তাঁহাদের নায়ক নায়িকা শ্রীকৃষ্ণ—যিনি আর্য্যধর্ম্মাবলম্বীর চক্ষে ভগবান্ স্বয়ং এবং শ্রীরাধিকা যিনি ভগবানের হ্লাদিনী-শক্তি। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু এই দুই মহাকবির গান, বড়

ভাল বাসিতেন। "চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক গীতি" "কর্ণামৃত শ্রীগীত গোবিন্দ"—তাঁহার প্রেমের পোষক-স্বরূপ হইয়াছিল। এই কথাটুকু মনে রাখিলেই আমরা বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের যথার্থ স্বরূপ বুঝিতে পারিব। তাহা না বুঝিলে যে, অন্ততঃ ইহাদের মধ্যে একজনের প্রতি অবিচার করা হইবে, তাহা যাঁহারা ইহাদের পদাবলীর সাধারণ সমালোচনা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিবেন।

ঐরূপ সমালোচনার একটু নমুনা এখানে দিলেই আমাদের পূর্ব্বোক্ত কথা বুঝিতে পারা যাইবে। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসকে শুধু পার্থিব প্রণয়ের কবি বলিয়া ধরিয়া লইয়া যে সকল সমালোচনা রচিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে একটী অতিশয় কবিত্বপূর্ণ সমালোচনা আছে; তাহাই বোধ হয় এই হিসাবের সমালোচনাগুলির মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তাহাও একদেশদর্শী, সন্দেহ নাই; কিন্তু যে দেশটা উহা দর্শন করিয়াছে, তাহাকে সম্পূর্ণরূপ না হউক বড় সরস—বড় উপাদেয় ভাবে দেখিয়াছে। এই সমালোচনাটী বিদ্যাপতির আধুনিক প্রধান কবি-শিষ্য শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত।(১) ইহা হইতে কোনও কোনও অংশ আমাদিগকে পরে উদ্ধৃত করিতে হইতে পারে। শ্রীরাধার প্রণয় সামান্য নায়িকার প্রণয় বলিয়া স্বীকার করিলে, সে প্রণয়ের এমন সুন্দর ছবি আর কোথাও দেখি নাই। কিন্তু বিদ্যাপতির ও চণ্ডীদাসের তুলনায় সমালোচনা করিতে গিয়া তিনি যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার ভ্রম বিশেষরূপে লক্ষিত হইবে। ঐরূপ তুলনায় সমালোচনা আমরা এখানে আর একটী উদ্ধৃত করিতেছি।

"আর একটা কথা কেহ কেহ বলেন, বিদ্যাপতির যশে চণ্ডীদাসের যশ কিছু ঢাকা পড়িয়াছে। তাহা হওয়া বিচিত্র নহে, কালীদাসের যশে ভবভূতি ঢাকা পড়িয়াছেন, ভারতচন্দ্রের যশে কবিকঙ্কণ ঢাকা পড়িয়াছেন, কতক দিনের জন্য পোপের যশে সেক্ষপীয়র ঢাকা পড়িয়াছিলেন; চারু চিত্রপটখানা দেখিয়া সকলেই বিমুগ্ধ হয়, কিন্তু মানস সৌন্দর্য্য ও গরিমা সেরূপ সহজে আয়ত্ত হইবার বিষয় নহে।" (২)

বৈষ্ণব কবির সম্বন্ধে এইরূপ সমালোচনা কতদূর ভ্রান্ত ও অনিষ্টকর, আমরা এখন তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিব। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের

(১) বিদ্যাপতির রাধিকা—সাধনা—১ম বর্ষ ৪০৭ পৃঃ।

(২) দীনেশবাবুর বঙ্গভাষা ও সাহিত্য- ১৯০ পৃঃ।

বিষয় বিশেষ ভাবে বলিবার পূর্ব্বে আমাদের বক্তব্য—এই সমালোচনায় যে ভাবে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের বিচার ও তুলনা করা হইয়াছে, তাহাতে বিদ্যাপতির প্রতিও যথেষ্ট অবিচার করা হইয়াছে। বিদ্যাপতিকে পোপ ও চণ্ডীদাসকে সেক্ষপীয়রের সহিত তুলনা করা কতদূর ন্যায়সঙ্গত, তাহা বলিতে পারি না।

চণ্ডীদাস মহাকবি। বাঙ্গালা গীতিকাব্যে তাঁহার সমকক্ষ আর কেহ নাই, একথা অকুণ্ঠিত ভাবে বলা যায় সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া মৈথিলকবি বিদ্যাপতিতে যে মনের অংশ কিছুই নাই, কেবল চিত্রমাত্রের সমষ্টি লইয়াই তাঁহার কাব্য পরিপুষ্ট, একথা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয়। অন্যদিকে আচার্য্য বঙ্কিমচন্দ্র যিনি বলিয়াছেন যে, বিদ্যাপতি প্রভৃতি কবিদিগের কাব্যে মনের অংশই প্রবল—তিনিও আবার বিদ্যাপতিকে বৈষ্ণব কবি হিসাবে দেখেন নাই।

অনেকে আবার কাব্যের মধ্যে দেহ জিনিষটা আদৌ দেখিতে চাহেন না এবং দেহের বর্ণনার মধ্যে উপমা দেখিলে মনে করেন যে, কবির ক্ষমতার অভাব পড়িয়াছে। দীনেশবাবু এই দলের লোক বলিয়া বোধ হইতেছে। উপমা দ্বারা রূপ বর্ণনা তাঁহার একেবারে পছন্দ হয় না, তাই তিনি লিখিয়াছেন:—"চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির ন্যায় উপমা প্রয়োগ করেন নাই—সুন্দরের স্বভাব-ভঙ্গীই অলঙ্কার হইতে বেশী আকর্ষক, উপমা কবির একটী শ্রেষ্ঠ গুণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু যিনি ভাবটি নিজের তুলিতে আঁকিতে পারেন না, তিনি উপমার অঙ্গুলী সঙ্কেতে গৌণবস্তুর দ্বারা মুখ্য বস্তুর আভাস দিতে চেষ্টা করেন। তাই উপমার রূপ বর্ণনা অপেক্ষা জীবন আঁকিয়া রূপ বর্ণনা উৎকৃষ্ট। এই অংশে কালিদাস হইতে সেক্ষপীয়র শ্রেষ্ঠ, বিদ্যাপতি হইতে চণ্ডীদাস শ্রেষ্ঠ।"

দীনেশবাবু এখানে 'ধান ভানিতে শিবের গীত' কেন যে গাহিলেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। তিনি বলিতেছিলেন, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কথা, কালিদাস ও সেক্ষপীয়রের সহিত তাঁহাদের তুলনা করিবার কি প্রয়োজন তাঁহার উপস্থিত হইয়াছিল, বুঝিতে পারি না। সে কথা যাউক, এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, তিনি বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহাই কি সত্য? উপমার সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহাও কি সর্ব্ববাদিসম্মত এবং সমীচীন? জীবন আঁকিয়া রূপ বর্ণনা কেমন করিয়া করিতে হয়, তাহা

যদি আচার্য্য বঙ্কিমচন্দ্রের জানা থাকিত, তাহা হইলে তাঁহার পুস্তকগুলির অত পৃষ্ঠা রূপ বর্ণনায় নষ্ট হইত না। কিন্তু কোন্ কবি নায়ক-নায়িকার রূপ বর্ণনার কালে উপমার সাহায্য ল'ন নাই তাহা জানিবার আমাদের ঔৎসুক্য রহিল। রূপ তো সৌন্দর্য্য বৈ আর কিছুই নহে? সৌন্দর্য্যের বর্ণনা আর একটী সুন্দর বস্তুর তুলনা দ্বারা যেমন হইতে পারে, শুধু বিশেষণ দ্বারা তেমন হয় না। তাই সকল মহাকবিই রূপ বর্ণনার কালে উপমার সাহায্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। সেক্ষপীয়র মিল্টন কালিদাস ভবভূতি সকলেই তাহা করিয়াছেন। চণ্ডীদাসও করিয়াছেন; যথা—

বরণ দেখিনু শ্যাম, জিনিয়াত কোটী কাম
বদন জিতিল কোটী শশী।
ভাঙু ধনু ভঙ্গীঠাম, নয়ন কোণে পূরে বাণ
হাসিতে খসয়ে সুধারাশি॥

* * * *

নাভির উপরে লোম লতাবলী
সাপিনী আকার শোভা।
ভুরুর বলানী কামধনু জিনি
ইন্দ্রধনুকের আভা॥
চরণ নখরে বিধু বিরাজিত
মণির মঞ্জীর তায়।
চণ্ডীদাস হিয়া সে রূপ দেখিয়া
চঞ্চল হইয়া ধায়॥

আবার—

সুধা ছানিয়া কেবা ও সুধা ঢেলেছে গো
তেমতি শ্যামের চিকণ দেহা।
অঞ্জন গঞ্জিয়া কেবা খঞ্জন আনিল রে
চাঁদ নিঙ্গাড়ি কৈল থেহা॥
সে থেহা নিঙ্গাড়ি কেবা মুখ বনাইল রে
জবা ছানিয়া কৈল গণ্ড।
বিম্বফল জিনি কেবা ওষ্ঠ গড়ল রে
ভুজ জিনিয়া করিশুণ্ড।

কম্বু জিনিয়া কেবা   কণ্ঠ বনাইল রে
কোকিল জিনিয়া সুস্বর।
আরদ্র মাখিয়া কেবা   সারদ্র বসাইল রে
ঐছন দেখি পীতাম্বর॥
বিস্তারি পাষাণে কেবা   রতন বসাইল রে
এমতি লাগয়ে বুকের শোভা।
দামকুসুমে কেবা   সুষমা করেছে রে
এমতি তনুর দেখি আভা॥
আদলি উপরে কেবা   কদলী রোপল রে
ঐছন দেখি উরুযুগ।
অঙ্গুলি উপরে কেবা   দর্পণ বসাইল রে
চণ্ডীদাস দেখে যুগ যুগ॥

সাক্ষাৎ দর্শনে শ্রীরাধার মুখে শ্রীকৃষ্ণের রূপবর্ণনায় এবং শ্রীকৃষ্ণের মুখে শ্রীরাধার রূপবর্ণনায় চণ্ডীদাস সর্ব্বত্রই উপমার আশ্রয় লইয়াছেন।

আঁখি তারা দুটী   বিরলে বসিয়া
সৃজন করেছে বিধি।
নীল ' দ্ম ভাবি   লুবধ ভ্রমরা
ছুটিতেছে নিরবধি॥
কিবা দন্ত ভাঁতি   মুকুতার পাঁতি
জিনিয়া কুন্দক কুড়ি।
সীঁথার সিন্দুর   জিনিয়া অরুণ
কাণে কর্ণবালা ঢেড়ি॥
শ্রীফলযুগল   জিনে কুচযুগ
পাতলা কাঁচলি তাহে।
তাহার উপর   মণিময় হার
উপমা কহিব কাহে॥
কেশরী জিনি   কৃশ মাঝ খানি
মুঠে করি যায় ধরা।
গজকুম্ভ জিনি   নিতম্ব বলনি
উরু করি কর পারা॥

চরণ যুগল জিনিয়া কমল
আলতা রঞ্জিত তায়।
মঝু মন তাহে কাহে না ভুলব
মদন মুরছা পায় ॥

এই তো চণ্ডীদাসের রূপ বর্ণনা। ইহা সত্ত্বেও দীনেশ বাবু কেমন করিয়া লিখিলেন যে, এ সম্বন্ধে বিদ্যাপতি হইতে চণ্ডীদাস শ্রেষ্ঠ, তাহা আমরা ভাল বুঝিতে পারিলাম না। ইহা কি একজনের প্রতি পক্ষপাত ও আর এক জনের প্রতি অবিচার নহে ?

যে মূল মতের উপর ভিত্তি করিয়া দীনেশ বাবু এই সমালোচনা করিয়াছেন, তাহা যে ভ্রান্তিশূন্য, এ কথা তিনি প্রতিপন্ন করিয়া লন নাই এবং করিতে পারেন কি না সন্দেহ। উপমা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাব্যালঙ্কার ; এই অলঙ্কারের সদ্ব্যবহারে কাব্যাঙ্গ উজ্জ্বলতর হয়। সুন্দরীর ভূষণের আবশ্যক হয় না, এ কথা সত্য হইলেও, সঙ্গে সঙ্গে ইহাও সত্য যে, ভূষণের সমীচীন ব্যবহারে সুন্দরীর সৌন্দর্য্য আরও লোভনীয় হয়। উপমা অনেক স্থলে স্বাভাবিক, যেমন একটী সুন্দর বালক বা সুন্দরী বালিকাকে দেখিলেই লোকে বলিয়া উঠে 'যেন টুকটুকে গোলাপ ফুলের মত'। অকস্মাৎ বিপৎপাত হইলে লোকে তখনি বলে 'বিনা মেঘে বজ্রাঘাত।' অতএব উপমাদ্বারা রূপ বর্ণনা করিলেই যে, সে বর্ণনা হেয় বা শক্তির অল্পতার পরিচায়ক, একথা আমরা স্বীকার করিতে পারি না। বরঞ্চ প্রেমিক প্রেমিকার স্বভাবই এই যে, তাহারা প্রণয়পাত্রের শরীরে সকল প্রকার সৌন্দর্য্য একত্র সমাবেশিত দেখে। কাজে কাজেই তাহাদের মুখে প্রণয়পাত্রের বর্ণনা কেবল মাত্র দুটী বিশেষণ বা দুটী আহা মরি দ্বারা হইতে পারে না। সে স্থলে যাহা স্বাভাবিক, তাহা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি (১)। তাই উপমায় রূপ বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া কোন কবিকেই আমরা দোষার্হ বলিয়া মনে করিতে পারি না।

এই গেল এক রকমের সমালোচনা। আর এক রকমের সমালোচনা এইরূপ—"কিন্তু সমুদ্রের অন্তর্দ্দেশে যে গভীরতা, নিস্তব্ধতা, যে বিশ্ববিস্মৃত ধ্যানলীনতা আছে, তাহা বিদ্যাপতির গীতি-তরঙ্গের মধ্যে পাওয়া যায় না।"

"চণ্ডীদাস গভীর ও ব্যাকুল, বিদ্যাপতি নবীন ও মধুর।"

(১) মধুর রস—উদ্বোধন ফাল্গুন, ১৩১৬, ১২৫—১২৭।

বিদ্যাপতিকে কেবল পার্থিব প্রণয়ের কবি-রূপে লইলেও এই মত সম্পূর্ণ-রূপে সত্য বলিয়া বোধ হয় না; কতক পরিমাণে সত্য, ইহা স্বীকার করা যায় বটে। মিলনে বিদ্যাপতি নবীন ও মধুর, চণ্ডীদাস গভীর ও ব্যাকুল, কিন্তু বিরহে বিদ্যাপতি গভীর হইতেও গভীরতম, চণ্ডীদাস কতক পরিমাণে হাল্‌কা। *মিলনে বিদ্যাপতি সুখ হইলেও, বিরহে বিদ্যাপতি যে অপূর্ব্ব* বেদনার মূর্ত্তি, তাহার পরিচয় আমরা চণ্ডীদাসেও পাই না। চণ্ডীদাসে চির-বিরহ—মিলনের পূর্ব্বে বিরহ, মিলনেও বিরহ, তাই তাঁহাতে বিরহের প্রখরতা নাই, বেদনার তীব্রতা অনুভূত হয় না।

বিদ্যাপতি মিলনে আনন্দময় আবেশময় উপভোগক্ষম ও চঞ্চল; এইখানে রবি বাবুর বিদ্যাপতি সম্বন্ধে সাধারণ মত ঠিক খাটে—"এমন প্রেমে বেদনা অপেক্ষা বিলাস বেশী। ইহাতে গভীরতার অটল স্থৈর্য্য নাই, কেবল নবানুরাগের লীলা-চাঞ্চল্য। বিদ্যাপতির এই পদগুলি পড়িতে পড়িতে একটী সমীর-চঞ্চল সমুদ্রের উপরিভাগ চক্ষে পড়ে। ঢেউ খেলিতেছে, ফেন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে, মেঘের ছায়া পড়িতেছে, সূর্য্যের আলোক শত শত অংশে প্রতিস্ফুরিত হইয়া চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইতেছে, তরঙ্গে তরঙ্গে স্পর্শ এবং পলায়ন, কলরব, কলহাস্য করতালি—কেবল নৃত্য ও গীত, আভাস এবং আন্দোলন—আলোক এবং বর্ণবৈচিত্র্য। এই নবীন চঞ্চল প্রেমহিল্লোলের উপর সৌন্দর্য্য যে কত ছন্দে কত ভঙ্গীতে বিচ্ছুরিত হইয়া উঠে বিদ্যাপতির গানে তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে।"

কিন্তু এ সমালোচনা বিদ্যাপতির বিরহচিত্রের কাছে আসিয়া স্তব্ধ হইয়া যায় আর কূল দেখিতে পায় না। বিলাস বিভ্রমময়ী, সরলা যৌবন-চঞ্চলা, লালসায় উদ্দাম প্রকৃতি অথচ লীলাময়ী, মিলন-লুব্ধা অথচ লজ্জা-সঙ্কুচিতা বিদ্যাপতির নায়িকা, বিরহে প্রাণময়ী, অগাধ প্রেমময়ী, চিন্তা-সর্ব্বস্বা, আত্মবিস্মৃতা, সাধিকা। বিদ্যাপতির বিরহ চিত্র অতুল। বেদনার মর্ম্মান্তিক যাতনার এমন উজ্জ্বল প্রস্ফুটিত ছবি আর কোনও কবি তুলিয়াছেন কি না জানি না।

এই অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তনের হেতু কি? রবিবাবু এই অবস্থার বিষয় কিছুই বলেন নাই। দীনেশ বাবু ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন এবং ব্যক্তও করিয়াছেন কিন্তু তিনি যে কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর। চণ্ডী-দাসের সহিত পরিচয়ের পর বিদ্যাপতিতে ঐ পরিবর্ত্তন যে, সাধিত হইয়া-

ছিল এ কথার কোনও যৌক্তিকতা তো নাই ই প্রমাণও নাই। আমাদের মনে হয় যে বিদ্যাপতির পদাবলীকে প্রণয়সঙ্গীতমাত্র ভাবিলে এই পরিবর্ত্তনের কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। কিন্তু বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলীর যথার্থ স্বরূপ অবগত হইয়া তাহাদের বিচারে প্রবৃত্ত হইলেই উহা বিশদভাবে বুঝা যাইবে। একথা পরে প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিব।

বৈষ্ণবকবি বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসকে অন্তরালে রাখিয়া প্রণয়ের কবি বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের বিষয়ে --আরও যে কয়েকটী কথা লক্ষ্য করিবার আছে তাহা এইখানে বলিয়া রাখিলে তাঁহাদের বিশেষত্ব অনুভব ও বোধ করিবার সুবিধা হইবে। যে সকল বিশেষত্ব তাঁহাদের কাব্যের প্রধান উপকরণ তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সে জন্য তদ্বিষয়ে অপর যাহা কিছু বলিবার আছে তাহা পরে বলিবার ইচ্ছা রহিল।

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলীর চর্চ্চা করিলেই প্রথমে লক্ষ্য হইবে যে, বিদ্যাপতি কবি ও শিল্পী, চণ্ডীদাস শুধু কবি। বিদ্যাপতি তাঁহার কবিতা সজ্জিত করিতে ভালবাসেন—চণ্ডীদাস তাঁহার কবিতার উপর কোনও সাজসজ্জা অর্পণ করেন না। প্রথম পরিচয়েই আমরা বেশ বুঝিতে পারিব যে, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস যেন একই সুন্দর বস্তুর দুই দিক্, একই ভাবের দুই অবস্থা, একই বৃত্তির দুই রকম বিকাশ। আরও লক্ষ্য করিতে পারা যায় যে, বিদ্যাপতির কাব্যে স্তর আছে, কিন্তু চণ্ডীদাসের কাব্যের সমস্তটাই এক সুরে বাঁধা। সে সুর এক অনির্ব্বচনীয় উচ্চ ভাবের সমন্বয়ে সৃষ্ট। সে সুর যখনই কাণের ভিতর ঝঙ্কৃত হয়, তখনই যেন "মরমে পশে"। বিদ্যাপতির কাব্য সেই অনির্ব্বচনীয় সুর বর্জ্জিত নহে, কিন্তু তাঁহার বীণায় প্রথমে "রুণু রুণু নিক্কণ কোমলে মিলিয়া"। ক্রমে গুরুগর্জ্জন সপ্তমে ছুটিয়া।" বিদ্যাপতিতে বয়ঃসন্ধি, যৌবন ও যৌবনের চাঞ্চল্য পর পর পাওয়া যায়, চণ্ডীদাসে কেবলই উন্মত্ততা। বিদ্যাপতিতে প্রথমে প্রেমের হিল্লোল মাত্র দেখা যায়, চণ্ডীদাসে প্রথম হইতেই প্রেমের তীব্রতা ও উন্মত্ততা। বিদ্যাপতি প্রথমে সলজ্জ বিলাসময় তার পর আত্মহারা, চণ্ডীদাস প্রথম হইতেই আত্মহারা। বিদ্যাপতি সুন্দর ও সৌন্দর্য্য-মুগ্ধ ; চণ্ডীদাস আত্মা ও আত্মলীন। বিদ্যাপতি ধাপে ধাপে আত্মলীনতায় উপস্থিত হইয়াছেন, চণ্ডীদাস প্রথমাবধি তদবস্থ।

ইহা হইতেই বুঝা যাইবে যে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস একই বিষয়ের দুই দিক্ হইলেও তাঁহাদের প্রকৃতি স্বতন্ত্র, এইজন্য তাঁহাদের কাব্যের প্রকৃতিও

স্বতন্ত্র। এই স্বাতন্ত্র্য অনেক সময় তাঁহাদিগকে বুঝিবার অন্তরায়-স্বরূপ হইয়াছে; অনেকে সেই স্বাতন্ত্র্যের যথার্থ কারণ অনুসন্ধান করিতে প্রস্তুত নহেন। যখন তাঁহাদিগকে বৈষ্ণবকবি ভাবিয়া সমালোচনা করিব, তখন এই স্বাতন্ত্র্যের হেতু সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাবে ব্যাখ্যা করিবার সুবিধা হইবে।

বিদ্যাপতির কাব্য প্রথমতঃ দেহ-প্রধান। তিনি প্রথমেই শ্রীরাধার বয়ঃ-সন্ধি বর্ণনা করিয়াছেন। নানা ছন্দে, নানা প্রকারে, নানা ভাবে শ্রীরাধার এই মধুর বয়সের দৈহিক-মাধুর্য্য বর্ণনা করিয়াছেন। এক একটী চিত্র নিজে সম্পূর্ণ, অপরের অপেক্ষা রাখে না। বিদ্যাপতি নিপুণ চিত্রকর। তাঁহার তূলিকার স্পর্শে আমাদের নয়নের সমক্ষে একটী উজ্জ্বল প্রতিমা ফুটিয়া উঠে। তিনি সকল পরিবর্ত্তনগুলিই লক্ষ্য করিয়াছেন ও বলিয়াছেন—দেহের পরি-বর্ত্তন, মনের পরিবর্ত্তন, ভাবের পরিবর্ত্তন সব লক্ষ্য করিয়াছেন ও বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার ঐ বিষয়ে চিত্র অনেকগুলি; সকলগুলিই কিন্তু মনোহর। সুন্দরীর শরীরে তিনি নিম্নোদ্ধৃত কবিতায় এক অপূর্ব্ব রূপান্তর বর্ণনা করিয়াছেন—

ক্ষণ ভরি নহি রহ গুরুজন মাঝে।
বেকত অঙ্গ ন ঝাপয়ে লাজে॥
বালা জন সঙ্গে যব রহই।
তরুণি পাই পরিহাস তঁহি করই॥
মাধব তুয়া লাগি ভেটল রমণী।
কে কহ বালা কে কহ তরুণী॥
কেলিক রভস যব শুনে আনে।
অনত এ হেরি তবহি দএ কানে॥
ইথে যদি কেও করএ পরচারী।
কাঁদন মাখি হসি দএ গারী॥
সুকবি বিদ্যাপতি ভণে।
বালা চরিত রসিক জন জানে॥

এই হাসি কান্নার মাখামাখি যে অবস্থা সে অবস্থার সার্থকতা প্রণয়কাব্যে বিলক্ষণ অনুভূত। ইহার অপর প্রয়োজন পরে প্রকাশ পাইবে। যাঁহারা সেই প্রয়োজন অনুসন্ধান করেন, তাঁহাদের বিদ্যাপতির ভণিতা-গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে অনুরোধ করি। এই ভণিতাগুলিতে অতি আবশ্যক সঙ্কেত-

সমূহ নিহিত আছে। যাঁহারা তাহা না করিতে চাহেন, তাঁহারা শুধু চিত্রগুলির সৌন্দর্য্য উপভোগ করিয়াই যথেষ্ট সন্তুষ্টি লাভ করিতে পারিবেন। বিদ্যাপতির কবিত্ব-শিল্প এখানে সবিশেষ বিকশিত। চণ্ডীদাস বয়ঃসন্ধির কল্পনা করেন নাই। চণ্ডীদাস যেখানে আরম্ভ করিয়াছেন, বিদ্যাপতি অনেক দূরে গিয়া তবে সেইখানে পঁহুছিয়াছেন। এই অবস্থার বর্ণনা কবি রবীন্দ্রনাথের ভাষায় আমরা এখানে করিব—"যৌবন সেও সবে আরম্ভ হইতেছে, তখন সকলি রহস্য-পরিপূর্ণ। সদ্য-বিকচ হৃদয় সহসা আপনার সৌরভ আপনি অনুভব করিতেছে, আপনার সম্বন্ধে আপনি সবে মাত্র সচেতন হইয়া উঠিতেছে; তাই লজ্জায় ভয়ে আনন্দে সংশয়ে আপনাকে গোপন করিবে কি প্রকাশ করিবে, ভাবিয়া পাইতেছে না। হৃদয়ের নবীন বাসনা সকল পাখা মেলিয়া উড়িতে চায়, কিন্তু এখনো পথ জানে নাই। কৌতূহল এবং অনভিজ্ঞতায় সে একবার ঈষৎ অগ্রসর হয়, আবার জড় সড় অঞ্চলটীর অন্তরালে, আপনার নিভৃত কোমল কুলায়ের মধ্যে ফিরিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে।"

এই অবস্থা প্রণয়-বীজ বপনের, আকাঙ্ক্ষার উন্মেষের, বাসনার সৃষ্টির উপযুক্ত অবস্থা। তাই কবি ঠিক এই সময়ে রাধার সমক্ষে শ্রীকৃষ্ণকে উপস্থিত করিয়াছেন। বিদ্যাপতি অতঃপর নায়ক ও নায়িকার পূর্ব্বরাগ বর্ণনা করিয়াছেন। সঙ্গমের পূর্ব্বে যে প্রণয়, তাহাকে বৈষ্ণবশাস্ত্রে পূর্ব্বরাগ বলে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, উভয়বিধ কাব্যেই অর্থাৎ প্রণয়-কাব্যে ও বৈষ্ণব-কাব্যে ইহার সার্থকতা আছে। এ চিত্রগুলিও অত্যন্ত মনোরম। ইহাদের মধ্যে মন ও দেহ উভয় বস্তুই বিদ্যমান আছে—কারণ, বিদ্যাপতির কাব্যে প্রণয় রূপজ; নায়ক নায়িকা উভয়ের চিত্তেই রূপজ মোহ হইতে প্রণয়ের উৎপত্তি—পরে গুণের আকর্ষণ—বাঁশীর আকর্ষণ।

অবনত আনন কএ হমে রহলিহু
বারল লোচন চোর।
পিয়া মুখ রুচি পিবএ ধাওল
জনি সে চাঁদ চকোর॥

লজ্জায় চক্ষু নামিয়া আসে, তবু না দেখিয়া থাকিতে পারে না।

সে অব ইতে হম রমনি সমাজ।
দিঠি ভরি ন পেখল দারুণ লাজ॥

শুনি চিত উমত দেখি আঁখি ভোর।
চাঁদ উদয় বন্দি রহল চকোর॥
মিলল পুরুষবর ন পূরল কাম।
কিএ বিধি দাহিন কিএ বিধি বাম॥

ইহার ভিতর ইন্দ্রিয়ের আকাঙ্ক্ষা স্পষ্ট, আবার এই আধ দেখাদেখিতেই প্রাণ পরের হাতে তুলিয়া দেওয়া।

কানু হেরব ছল মনে বড সাধ।
কানু হেরইতে ভেল পরমাদ॥
তবধরি অবোধি মুগধ হম নারি।
কি কহি কি শুনি কিছু বুঝই ন পারি॥
সাওন ঘন সম ঝরু দু নয়ান।
অবিরত ধস ধস করয় পরাণ॥
কাঁ লাগি সজনি দরশন ভেল।
রভসে অপন জিউ পরহাথে দেল॥
ন জানিয়ে কি এ করু মোহন চোর।
হেরইতে প্রাণ হরি লই গেল মোর॥
এত সব আদর গেল দরশাই।
যত বিসরিয় তত বিসর না যাই॥
বিদ্যাপতি কহ শুন বর নারি।
ধৈরজ ধর চিতে মিলব মুরারি॥

প্রাণে এত আকাঙ্ক্ষা—এত লালসা, তবু সে যাতনা প্রকাশ করিতে চাহে না।

জই নব চন্দ পুরন্দর অম্বর
চন্দন তাসু সমানে।
দশমি দশা পথ অঁগিরঞো
ন করঞো ভেসর কানে॥

তাই দূতীর প্রয়োজন। যেমন রাধা শ্রীকৃষ্ণের রূপে পাগল, শ্রীকৃষ্ণও তেমনি রাধার রূপে পাগল। তাঁহার মনেও ঐ এক প্রকারের ব্যথা:—

সজনি! ভাল করি পেখন না ভেল,
মেঘমালা সঞে তড়িত লতা জনু হৃদয়ে শেল দেই গেল॥

তাই দূতী বলিতেছে—

ধনি ধনি রমণী জনম ধনি তোর
সবজন কানু কানু করি ঝুরায়,
সে তুয়া ভাবে বিভোর।
চাতক চাহি তিয়াসল অম্বুদ
চকোর চাহি রহু চন্দা।
তরু লতা অবলম্বন করিএ
মঝু মনে লাগল ধন্দা॥

দুই জনেরই হৃদয়ে যখন এত ভালবাসা, এত আকাঙ্ক্ষা, তখন তাঁহাদের মিলন অবশ্যম্ভাবী।

বিদ্যাপতি অতঃপর মিলন-চিত্র আঁকিয়াছেন। প্রথম সঙ্গমে শ্রীরাধা ব্রীড়াসঙ্কুচিতা, ভয়শীলা, হৃদয়ের পূর্ণ আবেগ সত্ত্বেও যেন কাছে যাইতে ইচ্ছা করে না। অনেক বাধা, অনেক বিঘ্ন, অনেক জিনিষের ভয়, লোক-লজ্জা প্রভৃতি সকলি তাঁহাকে যেন পশ্চাৎপদ করিতেছে।

আহ সখি আহ সখি লই জনু জাহে।
হম অতি বালিকা আকুলনাহে॥
গোট গোট সখী সভ গেলি বহরায়।
বজর কবাড় পহু দেল হি লগায়॥
তেহি অবসর পহ জাগল কন্তে।
চীর সম্ভারলি জীর্ণ ভেল অন্তে॥
নহি নহি করে নয়ন ঢর লোরে।
কাঁচক মলা ভমরা ঝিক ঝোরে॥
জইসে ডগমগ নলিনিক নীরে।
তইসে ডগমগ ধনিক শরীরে॥
ভনই বিদ্যাপতি শুনু কবিরাজে।
আগি জারি পুনু আগিক কাজে॥

এখন "আঁখিক লাজ" শ্রীরাধাকে পরাভব করিয়াছে, তিনি প্রিয়ের পাশে আসিয়া যেন "নিজ তনু মিলি রহলি বর নারী।" এই প্রথম সমাগমে লজ্জিতা নায়িকার নায়কসম্ভোগ সংকীর্ণ। ইহাতে সুখের সঙ্গে অনেক আতত্তায়ী ভাব মিশ্রিত;

তারপর ক্রমশঃ বিশ্রব্ধতা লাভ ও সম্পূর্ণ সম্ভোগ। এ স্থলে কবি নানা প্রকারে নায়ক নায়িকার সুখ চিত্রিত করিয়াছেন। এখানে তাঁহার মিলন-চিত্র সম্পূর্ণ আনন্দময়, হিল্লোলময়, চঞ্চলসৌন্দর্য্যময়। কত লালসায়, কত আগ্রহে যে প্রণয়ের উৎপত্তি, তাহার এইখানে ফললাভ। মান অভিমান, হাব-ভাব-লীলা-সমৃদ্ধ ভালবাসা—এ সকল সম্ভোগ-চিত্রে ক্রমশঃ পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। দেহের সহিত প্রাণের মিলন সাধিত হইয়া এই খানে আমাদিগকে বিদ্যাপতির একটী স্তরের শেষ ভাগে উপনীত করিয়াছে। বিদ্যাপতির কাব্য-কুঞ্জের এই স্থলে যেন চির বসন্ত বিরাজমান—আনন্দ-মুখর-বসন্ত-কোলাহলে আমাদের হৃদয়ের সঙ্গে কবির হৃদয়ও যেন মত্ত ও মোহিত। এখানে তাঁহার নায়ক নায়িকার,

প্রেম পয়োনিধি উছলি উছলি পড়ু
চেতন অচেতন ভেলা।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলাভূমি নব-বিকশিত-নবতরুগণ-সমাকুল-বসন্ত-শোভা-সমন্বিত নববৃন্দাবনের বর্ণনায় কবির অসীম উৎসাহ ও অনুরাগ। এখানে বিদ্যাপতি যথার্থই নবীন ও মধুর।

মধু ঋতু মধুকর পাঁতি।
মধুর কুসুম মধু মাতি॥
মধুর বৃন্দাবন মাঝ।
মধুর মধুর রসরাজ॥
মধুর যুবতীগণ সঙ্গ।
মধুর মধুর রসভঙ্গ।
মধুর মাদল রসাল।
মধুর মধুর করতাল॥
মধুর নটন গতি ভঙ্গ।
মধুর নটনী নট রঙ্গ॥
মধুর মধুর রস গান।
মধুর বিদ্যাপতি ভাণ॥

বিদ্যাপতির রাধিকা আর লজ্জালুলিতা নববধূ নাই, এখন তিনি যুবতী। এখন তাঁহার সাহস আসিযাছে, প্রেম পরিপক্ক হইযাছে—শ্যাম-সঙ্গমে তাঁহার আনন্দ উছলিয়া পড়িতেছে, কবির হৃদয়ও সঙ্গে সঙ্গে নাচিয়া

উঠিয়াছে। সেই উচ্ছ্বসিত আনন্দ-তরঙ্গের সহিত তাল দিয়া যেন কবির ছন্দোবন্ধ নৃত্যশীল, হিল্লোলময়, আবেগময়—

বাজত দ্রিগি দ্রিগি ধোদ্রিম দ্রিমিয়া।
নটতি কলাবতী শ্যাম সঙ্গে মাতি,
করে করু তাল প্রবন্ধক ধ্বনিয়া॥
ডগমগ ডম্ফ ডিমিকি ডিমি মাদল।
রুনুঝুনু মঞ্জীর বোল।
কিঙ্কিনী রণরণি বলয়া কণকণি
নিধুবনে রাস তুমুল উতরোল॥
বীণা রবাব মুরজ স্বর মণ্ডল
সা রি গ ম প ধ নি সা বহুবিধ ভাব।
ঘেটিতা ঘেটিতা ঘেনি মৃদঙ্গ গরজনি
চঞ্চল স্বর মণ্ডল করু রাব॥
শ্রমভরে গলিত লোলিত কবরিযুত
মালতি মাল বিথারল মোতি।
সময় বসন্ত রাস রস বর্ণনে
বিদ্যাপতি মতি ক্ষোভিত হোতি॥

এমনি আনন্দ-তরঙ্গের মাঝখানে বিদ্যাপতির প্রথম স্তর শেষ ও দ্বিতীয় স্তরের আরম্ভ হইযাছে।

চণ্ডীদাসে আমরা এ আনন্দ, এই সুখের উত্তাপ, এই চঞ্চলতা— কিছুই অনুভব করিতে পারি না। এই যাওযা আসা, আধ চাহনি, আধ দেখা, আধ না দেখা, প্রেমের ছলনা, ভয়ের বিড়ম্বনা, লজ্জার মধুর লীলা—এ সকল তাঁহাতে নাই। চণ্ডীদাসে সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি, সুরের ঝঙ্কার বা আনন্দের উল্লাস এ সকল কিছুই নাই। বিদ্যাপতি কবি, চণ্ডীদাস প্রেমিক। বিদ্যাপতি দেখিয়াছেন প্রেমের আনন্দ, চণ্ডীদাস দেখিয়াছেন প্রেমের আধ্যাত্মিকতা; তাই বিদ্যাপতির কবিতা বহু বৈচিত্র্যময, বহু ছন্দোবন্ধে বিকশিত, বহু কাব্য কলায় শোভিত; চণ্ডীদাসের কবিতায় বাহ্যতঃ কোনও বৈচিত্র্য বা শোভা দেখা যায় না। রবি বাবু যে উপমার সাহায্যে বিদ্যাপতির কাব্য ও চণ্ডীদাসের কাব্যের প্রভেদ বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা আব একবার স্মরণ করিতে হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, বিদ্যাপতির কাব্য সমুদ্রের

উপরিভাগ—ঢেউ খেলিতেছে, বাতাস উঠিতেছে, ফেন দেখা যাইতেছে ইত্যাদি। চণ্ডীদাসের কাব্য—সমুদ্রের অতলস্পর্শ নিম্নভাগ। কথা সত্য। কিন্তু সমুদ্রের এই উপরিভাগ দেখিবার জন্যই সংসারে সকলে ব্যস্ত ও দেখিয়া মুগ্ধ; সমুদ্রের নিম্নভাগ দেখিবার ভাগ্য বিরল কাহার কাহারই হইয়া থাকে, তাহার অনুভবের বা তত্রস্থ রত্ন আনিবার জন্য বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন। একটী প্রস্ফুটিত গোলাপ ফুল দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ হয়, মনে আনন্দ অনুভব করে; তাহার প্রাণের কথা জানিবার জন্য যে দৃষ্টি আবশ্যক, তাহা সকলের থাকে না। বিদ্যাপতি সুন্দর ও মধুর, চণ্ডীদাস গভীর। এইজন্য দুই কবির বাহ্য প্রকৃতিতে বিস্তর প্রভেদ। বিদ্যাপতির প্রথম স্তরের পদাবলীতে যে উদ্দাম চাঞ্চল্য বিরাজমান, চণ্ডীদাসে তাহার অস্তিত্বমাত্র নাই।

এই স্তরে বিদ্যাপতির নায়িকা অর্দ্ধযৌবনা, অর্দ্ধবালিকা, সরলা, অনভিজ্ঞা, ভাবময়ী, সুখময়ী, আবেশময়ী, ছলনাময়ী। বিদ্যাপতির শ্রীরাধার প্রেমোৎপত্তি ও প্রেমের ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করা যায়, তাঁহার হৃদয়ের প্রত্যেক পরিবর্ত্তন কবি লক্ষ্য করাইয়াছেন। তাঁহার হৃদয়ে এমন আনন্দের উচ্ছ্বাস সুখের বন্যা। তাঁহার দুঃখেও সুখ, বাধা, বিঘ্নে প্রতিহত প্রেমেও একটা সুখের উল্লাস; প্রিয়োপভোগের জন্য অসীম লালসা। তাঁহার রূপের, দেহের ও মনের যে সৌন্দর্য্য তাঁহার পক্ষে এ সকলেরই সার্থকতা ও প্রয়োজন আছে। বিদ্যাপতির নায়কও আনন্দময়, সুখলোলুপ, লালসাময়। তাই এই অভিনব ভাবের প্রভাবে এই দুই প্রেমিক-প্রেমিকাকে অবলম্বন করিয়া কবির লেখনী প্রেমের শত চঞ্চল অস্থির লোভনীয় মূর্ত্তি লিপিবদ্ধ করিয়াছে; চিত্রকরের তুলিকা নিরবচ্ছিন্ন সৌন্দর্য্যের রাশি রাশি ছবি তুলিয়াছে, গায়কের বীণা কত কোমল কান্ত মধুর রাগিণী গাহিয়াছে। বিদ্যাপতি কবি, চিত্রকর ও সুগায়ক।

চণ্ডীদাস চিত্রকর বা সুগায়ক নহেন। চিত্র আঁকিবার বা সঙ্গীতশিল্প প্রদর্শনের তাঁহার অবসর হয় নাই। এতৎসত্ত্বেও তিনি কবি মহাকবি। তিনি প্রেমের যে উন্মাদ মূর্ত্তি আঁকিয়াছেন, তাহা জগতের কাব্যরাশিমধ্যে বিরল। বিদ্যাপতির কাব্য বিশ্লেষণ সাপেক্ষ, কিন্তু চণ্ডীদাসের কাব্য বুঝাইবার আবশ্যক করে না। যাহার প্রাণে বুঝিবার ক্ষমতা আছে সেই তাঁহার কাব্য-সুধা পানে অমর হইবে। তাহাতে বাহ্য সৌন্দর্য্য নাই, যাহা আছে মনের সৌন্দর্য্য, তাই প্রথমতঃ তাহাতে হয়তো

আকর্ষণের কিছু অভাব অনুভূত হইবে কিন্তু যখন চণ্ডীদাসের কাব্যের অন্তঃস্থলে উপস্থিত হইবে তখনই দেখা যাইবে যে সেই গম্ভীরতম স্থানে কত মণি মাণিক্য মুক্তা লুকাইয়া রহিয়াছে।

বিদ্যাপতিকে বিশ্লেষণ সাপেক্ষ বলিয়াছি। তাঁহার বাহ্য সৌন্দর্য্য এত উজ্জ্বল যে তাহাতেই লোকের চক্ষু ঝলসাইয়া যায়, তাহার মনটুকু কোথায় তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়। চণ্ডীদাসে এই বাহ্যচাকৃচিক্যের বাহুল্য একেবারেই নাই, তাই তাঁহার প্রাণটুকু সহজেই ধরা পড়ে। বিদ্যাপতির প্রেম মধুস্বরূপ; তাহার উচ্ছ্বাস কাটিয়া গেলে তবে তাহার মিষ্টত্ব আস্বাদিত হইতে পারে। চণ্ডীদাসের প্রেম সুধা, তাহার উচ্ছ্বাস নাই, "গাদ" কাটে না, তাহা যেন দুর্লভ স্বর্গীয় বস্তু, যে একবার আস্বাদ করিতে পারে সেই অমর হয়। বিদ্যাপতিতে দেহের সৌন্দর্য্য এত বেশী, দেহের ভাগ এত চোখের সাম্‌নে পড়ে, যে তাঁহার মনটা লুকাইয়া থাকে, যেন ধরা দিতে চাহে না, চেষ্টা করিয়া ধরিতে হয়। যখন ধরা পড়ে তখন দেখিতে পাইবে তাঁহার মন ও প্রাণ তাঁহার দেহ ও ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে মিশিয়া তাঁহার প্রেমযজ্ঞের আহুতি হইয়া বসিয়া আছে। চণ্ডীদাসের মন স্বতঃ প্রকাশিত, তাঁহার দেহ আছে কি নাই, তাহাই বুঝা যায় না। বিদ্যাপতির মনের মত তাঁহার দেহখানি লুক্কায়িত, অপনাকে প্রকাশ করিতে চাহে না, খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়। চণ্ডীদাস ইন্দ্রিয়গুলিকে তাঁহার কাব্য-কাননে প্রবেশাধিকার দেন নাই। তাই তাঁহার কাব্যে আগ্রহ আছে কিন্তু হিল্লোল নাই, চাঞ্চল্য নাই; সৃজনশক্তি আছে কিন্তু শিল্পচাতুর্য্য নাই, মিষ্টতা আছে কিন্তু বৈচিত্র্য নাই।

এইজন্যই বিদ্যাপতির নায়িকা ও চণ্ডীদাসের নায়িকার মধ্যে বাহ্য ব্যবধান যেন বড় বেশী মনে হয়। বিদ্যাপতি তাঁহার নায়িকার দেহ ভাল করিয়া ফুটাইয়াছেন, চণ্ডীদাস তাঁহার নায়িকার দেহ উপেক্ষা করিয়াছেন। বিদ্যা-পতির রাধিকার ইন্দ্রিয়গণ স্বতন্ত্র, তাহাদিগের নিজের নিজের কার্য্য করিবার ক্ষমতা আছে, তাহাদের সুখবুদ্ধি আছে, ইহাদের সঙ্গে মনও যোগ দিয়া কার্য্য করিতেছে। কিন্তু চণ্ডীদাসের রাধিকার ইন্দ্রিয়গুলি যেন তাঁহার মনের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে; তাঁহার প্রণয় নাম শুনিয়া। প্রথম দর্শনাবধি চণ্ডীদাসের "রাধিকা যেন যোগীনীর পারা।" প্রথম দর্শনাবধি চণ্ডীদাসের রাধিকার জগন্ময় কৃষ্ণমূর্ত্তি। সেইক্ষণ হইতেই শ্রীরাধার আর অন্য

কোনও চিন্তা নাই, অন্য কিছুতে সুখ নাই, অন্য কোনও বস্তুর আকর্ষণ নাই।

রাধার কি হ'লো অন্তরে ব্যথা।
বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে
না শুনে কাহার কথা॥
সদাই ধ্যানে চাহে মেঘপানে
না চলে নয়নের তারা।
বিরতি আহারে রাঙা বাস পরে
যেমন যোগিনী পারা॥
এলাইয়া বেণী ফুলের গাঁথনি
দেখয়ে খসায়ে চুলি।
হসিত বয়ানে চাহে মেঘপানে
কি কহে দু হাত তুলি॥
একদিন করি ময়ূর ময়ূরী
কণ্ঠ করে নিরীক্ষণে।
চণ্ডীদাস কয় নব পরিচয়
কালিয়া বঁধুর সনে॥

চণ্ডীদাসের রাধা যোগিনী——ক্রন্দনময়ী –

কালিয় বরণ হিরণ পিধন
যখন পড়য়ে মনে।
মুরছি পড়িয়া কাঁদয়ে ধরিয়া
সব সখী জনে জনে॥

শুধু যোগিনী নহেন, তিনি পাগলিনী—

তরুণ মুরলী করিল পাগলী
রহিতে নারিনু ঘরে।
সবারে বলিয়া বিদায় লইনু
কি করিবে দোসর পরে॥

এই পাগলিনীকে অবলম্বন করিয়া কবির তুলিকা কত ভঙ্গী প্রকাশ করিবে, কত ছবি আঁকিবে? কবি যাহা আঁকিয়াছেন তাহা একটী প্রাণের ছবি। এ অমূল্য প্রাণের ছবি আমাদের প্রাণে বসিয়া গিয়াছে—

যমুনা যাইয়া শ্যামেরে দেখিয়া
ঘরে আইল বিনোদিনী।
বিরলে বসিয়া কান্দিয়া কান্দিয়া
ধেয়ায় শ্যামরূপ খানি॥
নিজ করোপরে রাখিয়া কপোলে
মহা যোগিনীর পারা।
ও দুটী নয়নে বহিছে সঘনে
শ্রাবণ মেঘেরি ধারা॥

চণ্ডীদাসের রাধিকার পূর্ব্বরাগে সুখ নাই—প্রেমে সুখ নাই, মিলনে সুখ নাই। মিলনেও তিনি আশঙ্কাময়ী, যাতনাময়ী—

দুঁহু কোরে দুঁহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।

মিলনেও তাঁহার দেহবোধ নাই—প্রিয় সম্ভোগ রসাস্বাদ নাই—

এ কাল মন্দিরে আছিলা সুন্দরী
কোরহি শ্যামর চন্দ।
তবহু তাহার পরশ না ভেল
এ বড়ি মরম ধন্দ॥

এ প্রেমে কেবলি আকুলতা—কেবলি মর্ম্ম জ্বালা—

এ কে কুলবতী ধনী তাহে সে অবলা।
ঠেকিল বিষম প্রেমে কত সবে জ্বালা॥
অকথন বেয়াধি এ কহা নাহি যায়।
যে করে কানুর নাম ধরে তার পায়॥
পায়ে ধরি কাঁদে চিকুর গড়ি যায়।
সোণার পুতলি যেন ধূলাতে লোটায়॥

আগ্নেয় গিরি যেমন দ্রবময়ী জ্বালা প্রসব করে—চণ্ডীদাসের শ্রীরাধার হৃদয়ও তেমনি পূর্ব্বরাগে, মিলনে, সম্ভোগে, রসোদ্গারে সর্ব্বকালেই এক অনির্ব্বচনীয়—অবিচ্ছিন্ন সর্ব্ববিনাশিনী সর্ব্বগ্রাসিনী জ্বালা উদ্গিরণ করিযাছে। তাঁহার সুখে যন্ত্রণা, যন্ত্রণায় সুখ, প্রেমে যন্ত্রণা, যন্ত্রণায় প্রেম; কবি বলিতেছেন যে

সুখের লাগিয়া যে করে পিরীতি
দুখ যায় তারি ঠাঁই।

তাই তাঁহার রাধিকার দুঃখের পিরীতি; তাই যেন তাঁহার অবিরত—

হিয়া দগ দগি পরাণ পোড়নি।

ভগীরথের সাধনায় জ্বালামুখীসঙ্কুল হিমালয় হইতে পবিত্র মন্দাকিনীর সলিল প্রবাহিত হইয়া জগজ্জনকে যেমন পবিত্র ও শীতল করিয়াছে, তেমনি চণ্ডীদাসের সাধনায়—তাঁহার শ্রীরাধার প্রীতি-জ্বালামুখী হইতে শত শত ভাব-প্রবাহ ছুটিয়া আমাদিগকে পবিত্র ও কৃতার্থ করিয়াছে। চণ্ডীদাসের কাব্যকে শুধু প্রণয়ের কবিতা বলিয়া ধরিয়া লইলেও এই প্রশংসা যে তাঁহার ন্যায্য প্রাপ্য এ বিষয়ে কেহই বোধ হয় মত-বিরোধ উপস্থিত করিবেন না।

চণ্ডীদাসে মান আছে কিন্তু তাঁহার মান করিবার যেন ক্ষমতা নাই, তাঁহার ইন্দ্রিয় আছে, কিন্তু ইন্দ্রিয়গণ তাঁহার যেন বশ নয়। মান করিয়া তিনি নিজেই কাঁদিয়া আকুল—

আপন শির হাম আপন হাতে কাটনু
কাহে করিনু হেন মান?
শ্যাম সুনাগর নটবর শেখর
কাঁহা সখি করল পয়ান?
তপ বরত কত করি দিন যামিনী
যো কানুকো নাহি পায়।
হেন অমূল ধন মঝু পাদ গড়ায়ল
কোপে মুঞি ঠেলিনু পায়॥
আরে সই কি হবে উপায়।
কহিতে বিদরে হিয়া ছাড়িনু সে হেন পিয়া
অতি ছার মানের দায়॥
জনম অবধি মোর এ শেল রহিল বুকে
এ পরাণ কি কাজ রাখিয়া।
কহে বড়ু চণ্ডী দাসে কি ফল হইবে বল
গোড়া কেটে আগে জল দিয়া॥

এ অবস্থায় যাহা হইবার তাহাই হইয়াছে। চণ্ডীদাসের নায়িকার হৃদয়ে ছল কৌশল কোথাও নাই—প্রাণ লইয়া হেলা খেলা তাঁহার আদৌ নাই।

মান করিয়া যাহা বিদ্যাপতির নায়িকাতে আমরা দেখিতে পাই—সাধাইবার ইচ্ছা, কাঁদাইবার ইচ্ছা—এটা তাঁহাতে বড় একটা দেখিতে পাই না। আছে স্পষ্ট-বাদিত্ব, শ্লেষোক্তি ও ক্রন্দন।

এইতো গেল তাঁহার নায়িকার কথা, তাঁহার নায়কও প্রায় তদবস্থ, তিনিও শুধু ভাবে বিভোর নহেন, জ্ঞানশূন্য, উন্মাদ।

সোণার বরণ হইল শ্যাম।
সোঙরি সোঙরি তোহারি নাম॥
না চিনে মানুষ নিমিখ নাই।
কাঠের পুতলি রয়েছে চাই॥
তুলা খানি দিলে নাসিকা মাঝে।
তবে সে বুঝিনু শোয়াস আছে।

পাগল না হইলে কি এত কৌশল করিয়া কেহ স্বয়ং দৌত্যে প্রবৃত্ত হয়? কিন্তু চণ্ডীদাসের নায়কের কাহারও উপর বিশ্বাস করিয়া বসিয়া থাকিবার ক্ষমতা নাই। চণ্ডীদাস এই সকল কৌশল উদ্‌ভাবন কালে সৃষ্টি ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন; কল্পনাশক্তি প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু বলিতে পারিলাম না যে ইহাতে তাহার কবিত্বশক্তি বিশেষরূপে বিকশিত। তিনি মনের আনন্দে গ্রাম্য গীতি গাহিয়াছেন, কখনও বা প্রেমের আনন্দে ভাবের প্রগাঢ়তায় ডুবিয়া প্রাণের গীতি, মর্ম্মের উচ্ছ্বাস গাহিয়াছেন। তাঁহার সমগ্র পদাবলী একটা গভীর আত্মহীনতার, একটা অবিনশ্বর প্রেম-পবাহত হৃদয়ের কাহিনী প্রকাশ করিয়াছে, এতদতিরিক্ত আর কিছু চণ্ডীদাসে নাই।

পূর্ব্বরাগ হইতে মিলন পর্য্যন্ত বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসে যে প্রভেদ তাহা নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা করিলাম। বলা বাহুল্য এ প্রভেদ তাঁহাদের বাহ্যা-বয়ব সম্বন্ধে। অর্থাৎ তাঁহাদিগকে কেবল প্রেমের কবি হিসাবে বিচার করিলে যে ফল পাওয়া যায় তাহাই এবার দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি ও করিব। মিলনের পর যে সকল পদাবলী তাহাতেও বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসে প্রভেদ লক্ষিত হইবে। সেই বিভিন্নতা এখন দেখাইবার প্রয়োজন হই-তেছে।

প্রভেদ আছে সত্য কিন্তু তৎসম্বন্ধে আগের মত বিস্তৃত ব্যাখ্যার প্রয়োজন হইবে না। যাহা মূলগত স্বাতন্ত্র্য তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। আমরা বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের আধুনিক সমালোচনা-বিচার-কালেই বলিয়া

রাখিযাছি যে বিদ্যাপতির বিরহ-চিত্র অতুল, চণ্ডীদাসের বিরহ-চিত্র তত মর্ম্মভেদী নহে। সেই কথা এখন সংক্ষেপে বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

এতক্ষণ চণ্ডীদাসের বিষয় যাহা কিছু বলা হইয়াছে তাহা হইতেই বেশ বুঝাইবে যে চণ্ডীদাসের রাধিকার বিরহ এক রকম অসম্ভব। কবিও অনেকটা সেই কথার আভাস দিয়াছেন। তাঁহার রাধিকা ভাবী বিরহ বলিযাছেন ঃ—

আমারে ছাড়িয়া শ্যাম, মধুপুরে যাইবেন
একথা তো কভু শুনি নাই ॥
হিয়ার মাঝারে মোর এ ঘর মন্দির গো
রতন পালঙ্ক বিছা আছে।
অনুরাগের তুলিকায় বিছানা হয়েছে তায়
শ্যামচাঁদ ঘুমাযে রযেছে ॥
তোমরা যে বল শ্যাম, মধুপুরে যাইবেন
কোনপথে বন্ধু পালাইবে।
এ বুক চিরিয়া যবে বাহির করিয়া দিব
তবে তো শ্যাম মধুপুরে যাবে ॥

কবি বলিযাছেন তাঁহার মানের ভয় ঘুচিয়া গেল। কিন্তু তিনি তথাপি বিরহের চিত্র আঁকিয়াছেন; আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে যেখানে বিদ্যাপতির রাধিকার দেহ অন্তর্হিত হইতে আরম্ভ হইযাছে, ঠিক সেই খানেই চণ্ডীদাসের রাধিকার দেহ-বোধ আরম্ভ হইযাছে। আবও বিচিত্র এই যে বিরহে যেন চণ্ডীদাসের একটু কবিত্ব চেষ্টা ফুটিযাছে, একটু ছন্দোবন্ধের দিকে দৃষ্টি পড়িযাছে। ঐ বিষযে দুইটী উদাহরণ দিতেছি।

কালি বলি কালা গেল মধুপুরে
সেকালের কত বাকি।
যৌবন সাযরে সরিগেছে ভাঁটা
তাহারে কেমনে রাখি ॥
জোযারের পানি নারীর যৌবন
গেলে না ফিরিবে আর।
জীবন থাকিলে বঁধুরে পাইব
যৌবন মিলন ভার ॥

যৌবনের গাছে না ফুটিতে ফুল
ভ্রমরা উড়িয়া গেল।
এ ভরা যৌবন বিফলে গোঙাইনু
বধু ফিরে নাহি এল॥

শ্রীরাধার তখন মনে আসিয়াছে যে তাঁহার শরীরের সৌন্দর্য্য তাঁহার ভরা যৌবন যদি প্রিয়সম্ভুক্ত না হইল তাহা হইলে তাহা বিফল। সকল প্রেমিকারই এই কথা মনে হয় "প্রিয়েষু সৌভাগ্য ফলা হি চারুতা"। মিলনে যাহা ঢাকা পড়িয়াছিল তাহা এখন প্রকাশিত হইতেছে। এখন তাঁহার মনে হইতেছে যে শুধু মন দিয়া নহে দেহ দ্বারাও প্রিয় রসাস্বাদ না করিলে জীবন বিফল—

সখি কহবি কানুর পায়—
সে সুখ সাগর দৈবে সুখায়ল তিয়াষে পরাণ যায়।
সখি ধরবি কানুর কর
আপন বলিয়া বোল না তেজবি, মাগিয়া লইবি বর॥
সখি যতেক মনের সাধ,
শয়নে স্বপনে করিনু ভাবনে বিহি সে করাল বাদ।
সখি হাম সে অবলা তায়
বিরহ আগুন হৃদয়ে দ্বিগুণ সহন নাহিক যায়॥
সখি বুঝিয়া কানুর মন
যে মন করিলে আইসে করিবে
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণ।

এই চিত্রে ছন্দভঙ্গী লক্ষ্য করিবার বিষয়। চণ্ডীদাসে এতাবৎ আমরা এইরূপ ছন্দো পরিপাট্য দেখিতে পাই নাই। ইহার দুইটী কারণ আছে। প্রথম ইহাতে একটা অব্যক্ত ব্যথার উদ্রেক মাত্র, লালসার অতৃপ্তির উল্লেখ মাত্র আছে, ইহাতে বিরহের অতিশয় উত্তাপ নাই, যন্ত্রণার প্রাখর্য্য নাই। যেন একটা অবস্থা বুঝাইবার একখানা ছবি আঁকিবার একটু প্রয়াস আছে। দ্বিতীয় কারণ পরে প্রকাশ পাইবে।

দেখিয়া মনে হয় যে, চণ্ডীদাসের বিরহ-চিত্র আঁকিবার কালে যেন তাহার রচনার সহিত তাঁহার তেমন সহানুভূতি ছিল না। কিন্তু তিনি যে ভিত্তির উপর তাঁহার কাব্য গঠিত করিয়াছিলেন, তাহাতে বিরহ-প্রসঙ্গ ছিল তাই তাঁহাকে বিরহ-চিত্র আঁকিতে হইয়াছিল; এতদ্ভিন্ন তাঁহার ভাব-

সম্মিলনের পদগুলির সম্পূর্ণতা হইবার নহে, তাই তাঁহাকে বিরহ দেখাইতে হইয়াছে। আরও যেন মনে হয় যে কোনও কারণ বশতঃ তাঁহার চিত্তে দেহের কথাটা হঠাৎ উদয় হইয়াছিল, তাই তিনি দৈহিক আকাঙ্ক্ষার কথা এই খানে বলিয়া রাখিয়াছেন। যে কারণেই হউক ইহা বিলক্ষণ উপলব্ধি করিতে পারা যায় যে তাঁহার পূর্ব্বরাগাদিতে যে প্রগাঢ়ত্ব, যে তন্ময়তা বিদ্যমান তাঁহার বিরহের চিত্রে তাহার শতাংশের এক অংশও দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি নিজেই যেন প্রথমেই নিজের বিরহ-চিত্রাঙ্কণের পথ বন্ধ করিয়াছেন। যদি চণ্ডীদাসে স্তরকল্পনা সম্ভবপর হয় তো এই চিত্রগুলি তাঁহার দ্বিতীয় স্তরের অন্তর্গত বলা যাইতে পারে।

চণ্ডীদাসে না হউক কিন্তু বিদ্যাপতিতে স্তরকল্পনা খুব সঙ্গত, তাহা আমরা অগ্রেই বলিয়াছি। এখন আমরা বিদ্যাপতির দ্বিতীয় স্তরের বিষয় কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। ভাবী বিরহের চিত্র হইতে বিদ্যাপতির দ্বিতীয়-স্তর আরম্ভ হইয়াছে। এই খান হইতে তাঁহার রাধিকা অল্প অল্প করিয়া দেহ ভুলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এইখান হইতে তাঁহার মনের কার্য্য স্পষ্টতঃ আরম্ভ হইয়াছে। এখানেও কিন্তু বিদ্যাপতি কবি, চিত্রকর ও গায়ক। ভাবী বিরহাশঙ্কিতা শ্রীরাধার—মুগ্ধা বিশ্বাসবতী প্রেমময়ী শ্রীরাধার একটী উজ্জ্বল চিত্র প্রদর্শনের লোভ সংবরণ করা যায় না ঃ—

কানু মুখ হেরইতে ভাবিনী রমণী।
ফুকরই রোয়ত ঝর ঝর নয়নী॥
অনুমতি মাগিতে বর-বিধুবদনী।
হরি হরি শবদে মুরছি পড়ু ধরণী।
আকুল কত পরবোধই কান।
অব নাহি মাথুর করব পয়ান॥
ইহ সব শবদ পশিল যব শ্রবণে।
তব বিরহিনী ধনী পাওল চেতনে॥
নিজ করে ধরে দুহুঁ কানুক হাত।
যতনে ধরলি ধনি আপন মাথ॥
বুঝিয়া কহয়ে বর নাগর কান।
হাম নাহি মাথুর করব পয়ান॥

যব ধনী পাওল ইহ আশোয়াস।
বৈঠলি পুন তব ছোড়ি নিশোয়াস॥
রাই পরবোধিয়া চলল মুরারি।
বিদ্যাপতি ইহ কহই না পারি॥

প্রাণের আকুল ব্যথা ও প্রেমিকের প্রতি সরল বিশ্বাস—এই দুইটী ভাব এই চিত্রে কেমন সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছে। "জীবন আঁকিয়া রূপ বর্ণনা করা যায় কিনা জানিনা কিন্তু কার্য্য দ্বারা মনের চিত্র প্রকাশিত হইতে পারে তাহা এই চিত্র হইতে পরিষ্কার রূপে বুঝা যায়।

নিজ করে ধরে দুহুঁ কানুক হাত।
যতনে ধরলি ধনি আপন মাথ॥

কি অপূর্ব্ব সরলতার, কি মুগ্ধ বিশ্বাসের ছবি প্রকটিত করিতেছে! মহাকবি বিদ্যাপতি যে প্রাণের ছবিও তুলিতে পারেন এখন হইতে আমরা তাহা দেখিতে পাইব।

বিদ্যাপতির রাধার প্রেমে অশেষ সুখ, তাই তাঁহার বিরহের যন্ত্রণা এত বেশী; তাঁহার অশেষ লালসা, তাই সেই লালসার অতৃপ্তিতে অপার কাতরতা; তাঁহার প্রিয়সম্ভোগ-রসাস্বাদন সম্পূর্ণ, তাই তাঁহার বিরহ মর্ম্মান্তিক কষ্টের কারণ—শুধু ভাবুকের ভাব মাত্র নহে। বিদ্যাপতির রাধার বিরহ বেদনা আমরা যেন চোখের উপর দেখিতে পাই, তাঁহার কাতর ক্রন্দন যেন আমাদের মর্ম্মের ভিতর প্রবেশ করে। দীনেশ বাবুকেও বলিতে হইয়াছে—"কিন্তু বিরহে পঁহুছিয়া কবি ভক্তি ও প্রেমের গীতি গাহিয়াছেন, তথা হইতে কবি অলঙ্কার-শাস্ত্রের সহিত সম্বন্ধবিচ্যুত হইয়া পরম ভাগবত হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার প্রেমে বাঁধা বিলাসকলাময়ী নায়িকার চিত্র-পট খানা সহসা সজীব রাধিকা হইয়া দাঁড়াইল। তাঁহার উপমার ও কবিতার সৌন্দর্য্য চক্ষের জলে ভিজিয়া নব লাবণ্য ধারণ করিল। বিরহ ও বিরহান্তর মিলন বর্ণনায় বিদ্যাপতি বৈষ্ণব কবিগণের অগ্রগণ্য।"

বিদ্যাপতির বিরহ চিত্র উদ্ধৃত করিয়া বুঝাইবার উপায় নাই, সব গুলি হৃদয়ের সহিত উপভোগ করিবার বস্তু। এই চিত্রের আংশিক প্রদর্শন অসম্ভব। আমি ইহার অধিকাংশই পূর্ব্বে মধুর রস ও বৈষ্ণব কবি প্রবন্ধে বিরহ বর্ণনার কালে উদ্ধৃত করিয়াছি। যদি এখানে আরও তদতিরিক্ত দুই একটী উদ্ধৃত করি তাহা বোধ হয় মার্জ্জনীয় হইবে।

উর হার ন চীর চন্দন দেলা।
সে অবনদী গিরি আঁতর ভেলা॥
পিয়াক গরবে হম কাহু ন গণলা।
সে পিযা বিনা মোহে কো কি ন কহলা॥
বড় দুখ রহল মরমে।
পিয়া বিসরল জঞো কি আর জীবনে॥
পূরব জনমে বিহি লিখিল ভরমে।
পিয়াক দোখ নহি যে ছিল করমে॥
আন অনুরাগে পিয়া অনি সে গেলা।
পিযা বিনা পাঁজর ঝাঁঝর ভেলা॥
ভনয়ে বিদ্যাপতি শুন বর নারি।
ধৈরজ ধর চিতে মিলব মুরারি॥

কিন্তু কবির এই আশ্বাসবাক্য তাঁহার নিজের হৃদয়েই যেন স্থায়ী হইতেছে না তো রাধার অন্তরে কেমন করিয়া স্থায়ী হইবে?

পিয় বিরহিনি অতি মলিনি
বিলাসিনি কোনে পরি জীউতিরে।
অবধি ন উপগত মাধব
আবে বিষ পিউতিরে॥
আতপচর বিধু রবিকর
চরণ কি পরশহ ভীমারে।
দিন দিন অবসন দেহ
সিনেহক সীমারে॥
পহর পহর যুগ যামিনী—
যামিনী জগইতে রে।
মুরছি পড়ই মহী মাঝ
সাঁঝ শশি উগইতেরে॥

এখন শ্রীরাধা বুঝিয়াছেন যে, যে যতই বলুক শ্রীকৃষ্ণই তাঁহার সার। আর তাঁহার মান নাই গর্ব্ব নাই, সুখ নাই, দেহ বিফল, বুঝি প্রাণও বিফল।

কহও পিশুন শত অবগুণ সজনি
তনিসম মোহি নহি আন।
কতেক যতন সোঁ মেটিয় সজনি
মেটয় ন রেখ পষান।
যে দুরজন কটু ভাষয় সজনি
মোর মন ন হোয় বিরাম।
অনুভব রাহু পরাভব সজনি
হরিণ ন তেজ হিমধাম॥
যইও তরণি জল শোষয় সজনি
কমল না তেজয় পাঁক।
যে জন রতন যাহি সোঁ সজনি
কি করত বিহ ভএ বাঁক॥

এখন তাঁহার একমাত্র চিন্তা

যুগ যুগ জীবযু বসযু লখ কোল।
হমর অভাগ হুনক কোন দোষ॥

সে যেখানে থাকুক লাখ বর্ষ সুখে জীবিত থাকুক, আমার অভাগ্য, তাহার কি দোষ! অদোষ পরিত্যক্তা রাধার কি নিঃস্বার্থ ভালবাসা! ইহার পর শ্রীরাধার কোন্ কোন্ অবস্থা হইল, কেমন করিয়া তিনি আপনা ভুলিয়া দিব্যোন্মাদ লাভ করিয়াছিলেন, কেমন করিয়া তাঁহার বিশ্বময় কৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি ও কৃষ্ণানুভব আসিযাছিল, কেমন করিয়া তিনি আপনার অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে প্রিয়তমের অস্তিত্বে নিমজ্জিত করিযা কৃষ্ণতন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন কবি ক্রমে ক্রমে তাহা বর্ণনা করিযাছেন। এখানে আর বিদ্যাপতি নবীন ও মধুর নাই, তিনি গম্ভীর ও প্রবীণ। তাঁহার এক একটী চিত্র এত মনোহর যে তাহা ব্যাখ্যা দ্বারা বুঝাইবার নহে। ইহার অধিকাংশ চিত্রে যে অপূর্ব্ব ডমরু ধ্বনি শুনিতে পাওযা যায় তাহা বৈষ্ণব কবিতায়, বৈষ্ণব কবিতায় কেন বাঙ্গলা কোনও কবিতায় পাওযা যায় না। ইহার অধিক এখন আর বলিবার প্রয়োজন নাই।

বিরহান্ত মিলন বিদ্যাপতির তৃতীয় স্তর। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস উভয়েরই এইখানে একই ভাবসমুদ্রে আসিয়া মিলিত হইয়াছেন। সে ভাব নিবিড় আত্ম সমর্পণ। বিদ্যাপতি এখানে আবার গভীর আনন্দময

চণ্ডীদাস গভীর ভাবময়, দুইজনেই অশেষ প্রেমময়। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস যে ভাব-স্রোত প্রবাহিত করিয়াছেন, তাহাতে অবগাহন করিয়া কাব্য-রস-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রেই কৃতার্থ, পরিতৃপ্ত ও উল্লসিত হইয়াছে। কাব্য-কলা-হিসাবে তাঁহাদের পদাবলীর ইহাই সার্থকতা।

অতঃপর আমরা বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসকে তাঁহাদিগের বিশেষত্ব অর্থাৎ বৈষ্ণব-কবিত্ব সম্বন্ধে দৃষ্টি রাখিয়া অন্য সময়ে বিচার করিব।

শ্রীরামানুজ-দর্শন।

(৭)

(প্রভাকরের অখ্যাতিবাদ খণ্ডন।)

[শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ।]

পূর্ব্বপ্রবন্ধে "সমস্ত জ্ঞানই যথার্থ" এইকথা প্রমাণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া ইহার বিরোধী পাঁচটী মতবাদের মধ্যে বিজ্ঞানবাদ ও শূন্যবাদ রূপ বৌদ্ধ-মত দুইটী খণ্ডন করা হইয়াছে। এক্ষণে প্রভাকর-মতাবলম্বী কর্ম্ম-মীমাংসকগণের কথা আলোচ্য। কারণ, ইঁহারাও "সমস্ত জ্ঞান যথার্থ" একথা অস্বীকার না করিলেও, ইহার যে সকল "হেতু" প্রদর্শন করিয়া তাহা স্বীকার করেন, তাহা রামানুজ স্বামীর অভিমত নহে; এবং বিজ্ঞান ও শূন্যবাদী বৌদ্ধ-মতের পরই উক্ত কর্ম্মমীমাংসকগণেরই প্রাধান্য দেখা যায়। বৌদ্ধমত বিতাড়নে "ন্যায়" "সাংখ্য" প্রভৃতি বৈদিক মতের মধ্যে কর্ম্মমীমাংসা মতাবলম্বী প্রভাকর ও কুমারিলের "মত" দুইটী প্রথম প্রথম যতটা যশোলাভে সমর্থ হইয়াছিল, এতটা আর কাহারো ভাগ্যে ঘটে নাই। প্রভাকর ও কুমারিল উভয়েই কর্ম্মমীমাংসার পক্ষপাতী, এবং প্রচলিত প্রবাদ অনুসারে প্রভাকর এই কর্ম্ম-মীমাংসকদলের দলপতি কুমারিলের প্রিয় শিষ্য ও দক্ষিণ হস্ত ছিলেন; অথচ আশ্চর্য্যের বিষয়, প্রভাকর ও কুমারিল একমতাবলম্বী ছিলেন না। প্রভাকর এমনই দক্ষতার সহিত কুমারিলের মতের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন যে, কুমারিলের গ্রন্থে, প্রভাকর-"মত" খণ্ডিত হইতে দেখা যায়।

অনেকেই মনে করিতে পারেন, প্রিয় শিষ্যের "মত" কি করিয়া গুরুর মতের সহিত অনৈক্য হইতে পারে, কি করিয়া প্রভাকর গুরুর মতের প্রতিবাদ করিলেন? কথাটা একটু যে বিস্ময়কর তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

কিন্তু এ সম্বন্ধে যে প্রবাদ প্রচলিত আছে, তাহা শুনিলেই সে সন্দেহ দূর হইবার কথা। সংক্ষেপে গল্পটা এই ;—কুমারিল সর্ব্বদা বৌদ্ধ ও জৈনগণের সহিত অতিকূট তর্কে প্রবৃত্ত থাকিতেন। এজন্য তিনি নিজ শিষ্যমণ্ডলীর সহিত সর্ব্বদা বিচার করিতেন। প্রভাকর ঐ শিষ্যমণ্ডলীর ভিতর একজন অসাধারণ-বুদ্ধি-সম্পন্ন ছিলেন। তিনি গুরুর বুদ্ধিকে সুতীক্ষ্ণ রাখিবার জন্য ইচ্ছা করিয়াই সতত গুরুর মতের তুমুল প্রতিবাদ করিতেন এবং এই প্রতিবাদ তিনি এমনই সঙ্গতভাবে করিতেন যে, সাধারণ লোকে অনেকে প্রভাকরের দলে আসিয়া যোগদান করিত। পরন্তু গুরুর দেহান্ত ঘটিলে প্রভাকর আর গুরুর মতের প্রতিবাদ করেন নাই ; তিনি তখন নিজ মতের যাবতীয় গ্রন্থ বিনষ্ট করিয়া গুরুর মতই সত্য বলিযা সাধারণে অকপটে ঘোষণা করিলেন। প্রভাকর-মতের গ্রন্থাবলী এইজন্য কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রবাদ যাহাই হউক, প্রভাকর যে কুমারিলের পরবর্ত্তী নহেন, তাহা স্থির,এবং আচার্য্য শঙ্কর ও ন্যায়াচার্য্য উদয়নেব পূর্ব্বে বৌদ্ধ-মত-খণ্ডনে যখন কর্ম্মমীমাংসকগণের কৃতিত্বই অধিক, তখন এই প্রবন্ধে বিজ্ঞান ও শূন্যবাদ খণ্ডনের পর ইঁহাদিগের মতই আলোচনা করা উচিত। কুমারিলের "মত" এ অংশে আমাদের মতের বিরোধী নহে বলিযা, এস্থলে তাঁহার মতের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

যাহা হউক, এক্ষণে প্রস্তাবিত বিষযে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। রামানুজ বলেন "সমস্ত জ্ঞানই যথার্থ"—এমন কোন জ্ঞানই নাই, যাহার "বিষয়" সত্য নহে—সকল জ্ঞানেরই যাহা "বিষয়" তাহা সত্য। প্রভাকরও সেই কথা বলেন, কিন্তু যে "কারণ" দেখাইয়া তিনি ঐ কথা বলেন, সে "কারণ" রামানুজের অভিমত নহে।

এই বিষয়টী ভাল করিযা বুঝিতে হইলে একটী দৃষ্টান্ত লওযা আবশ্যক। ধরা যাউক "শুক্তিতে রজত-ভ্রম"। সাধারণতঃ শুক্তি দেখিয়া রজত মনে করাকে লোকে ভ্রম বলিয়া থাকে। এস্থলে শুক্তি রহিযাছে, রজত নাই, অথচ রজত বলিয়া জ্ঞান হইল ;—সুতরাং ইহা ভ্রম। রামানুজ বলেন, হাঁ, উহা ভ্রম বটে, কিন্তু তাই বলিয়া ঐ ভ্রমের অর্থ ইহা নয় যে, ঐ রজত-জ্ঞানের "বিষয়" তথায় নাই। এস্থলেও রজত-জ্ঞানের "বিষয়" আছে, কিন্তু শুক্তি-খণ্ডকে রজত বলিয়া ব্যবহার করা যায় না, এইজন্যই উহা ভ্রম। শুক্তিতে রজত-জ্ঞানের "বিষয়" নাই বলিয়া শুক্তিতে রজতজ্ঞান ভ্রম নহে, পরন্তু

শুক্তিকে রজত বলিয়া ব্যবহার করা যায় না বলিয়া উহা ভ্রমপদবাচ্য। দেখনা রূপার চাকচিক্য, ঝিনুকে আছে বলিয়াই লোকে ঝিনুককে রূপা মনে করে। সুতরাং ভ্রমজ্ঞানেরও বিষয় সত্য। কিন্তু প্রভাকর বলেন,না--তাহা নহে। ঝিনুকে রূপাজ্ঞান যখন হয় তখন ঝিনুককেই রূপা বলিয়া জ্ঞান হয় না, তখনও রূপাতেই রূপাজ্ঞান থাকে : কেবল ঝিনুকে "এই রূপা"বলিয়া একটা জ্ঞান জন্মে। মনে কর একটা লোক একখণ্ড ঝিনুক দেখিল,তখন যদি সে"এই রূপা"বলিয়া লইতে যায়,তাহা হইলে কি ঘটে?—ঘটে—এই যে, সে লোকটার তখন ঝিনুক খণ্ডে "এই" বলিয়া একটা জ্ঞান হয় এবং হাটে বাজারে বা ঘরে যে রূপা দেখিয়া তাহার রূপা জ্ঞান জন্মিয়াছে, সেই জ্ঞানটা তখন তাহার মনে উদয় হয় মাত্র। সে তখন মনে করে "এটা যে রূপা"। যে সব রূপা সে দেখিয়াছে সে তখন সেই সব রূপার কথাই মনে করে। অন্য কথায় তাহার ঝিনুকে রূপার প্রতীতি হয় না, রূপাতেই রূপার প্রতীতি হয়। এজন্য ইহাকে অপ্রতীতিবাদ বা অখ্যাতিবাদ বলা হয়। অখ্যাতি অর্থেই অপ্রতীতি। সুতরাং দেখা গেল, প্রভাকরের মতে ঝিনুকে রূপা জ্ঞানের স্থলে রূপা-জ্ঞানের বিষয় হাট বাজারের রূপা; সুতরাং তাহা মিথ্যা নহে, তাহা সত্য। রামানুজও রূপাজ্ঞানের বিষয়কে সত্য বলেন, মিথ্যা বলেন না। তবে দুইজনের ওরূপ বলিবার হেতু বিভিন্ন। প্রভাকরের মতে ঝিনুকে রূপার প্রতীতি হয় না বলিয়া এই জ্ঞান যথার্থ; রামানুজের মতে রূপার ধর্ম্ম ঝিনুকে দেখা যায় বলিয়া ঐ জ্ঞান যথার্থ। রূপাতে রূপা-জ্ঞান ত সকল মতেই যথার্থ, সুতরাং সকল জ্ঞানই যথার্থ।

যাহা হউক, এতক্ষণে আমরা উভয় মতের কোথায় ঐক্য এবং কোথায় অনৈক্য, তাহা বুঝিয়াছি। এইবার দেখা যাউক, রামানুজ কি করিয়া প্রভাকরের মত খণ্ডন করেন।

রামানুজ বলেন,প্রভাকরের ও কথা ঠিক নহে, কারণ লোকে যে ঝিনুকে রূপা দেখে তাহা ত তখন সে প্রত্যক্ষই করিয়া থাকে। সে যে হাট বাজারের রূপা দেখিয়া "এই সেই রূপা" বলিয়া কুড়াইয়া লইতে যায়—তাহা নহে; সে সেই ঝিনুকখণ্ডকেই "এও একখণ্ড রূপা" বলিয়া কুড়াইতে যায়। হাট বাজারের রূপা তাহার স্মৃতিপথে উদিত হইতে পারে, কিন্তু সে যে রূপা কুড়াইতে ধাবিত হয়—তাহা কি স্মৃতিতে উদিত রূপার জন্য বা প্রত্যক্ষদৃষ্ট রূপার জন্য? আরও দেখ, হাটে বাজারে যে রূপা লোকে দেখিয়া থাকে ঠিক

সেই আকৃতির, সেইরূপ গঠনের রূপা কিছু সে উক্ত ঝিনুকখণ্ডে দেখে না; ঝিনুকখণ্ডের সরলবক্র কোণ এবং উন্নত-অবনত-ক্ষেত্র-বিশিষ্ট-ভাব হাট বাজারের রূপাতে থাকা একরূপ অসম্ভব বলিলেও চলে। সুতরাং ঝিনুক-খণ্ডে যে রূপা দেখা যায় তাহা স্মৃতিতে উদিত রূপা নহে। স্মৃতিতে উদিত রূপার জন্য লোকে কখনও ধাবিত হয় না। যদি বল, পয়ঃ-প্রণালী উল্লঙ্ঘনের সময় লোকে শুষ্কস্থানে পদ বিক্ষেপ করিতে ইচ্ছা করিয়াও বায়ু প্রভৃতি কারণে যেমন কখন কখন কর্দ্দমে পতিত হয়, তদ্রূপ হঠাৎ সে ঝিনুককে রূপা বলিয়া লইতে যায়; এ সময় সে ঝিনুকে রূপা দর্শন করে না, ঝিনুকে ঝিনুকও দর্শন করে না; সে যাহা দর্শন করে তাহা "এই" পদবাচ্য ঝিনুক দেখিয়া তাহার "এই" বলিয়া একটা জ্ঞান হয় মাত্র; এবং ঠিক পরক্ষণেই তাহার স্মৃতিতে রূপা জ্ঞানের উদয় হয়। "এই" জ্ঞানের পরক্ষণেই "রূপা" জ্ঞানের কথা মনে পড়ে বলিয়া সে হঠাৎ তাহা গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হয় নচেৎ ঝিনুকে তাহার রূপা জ্ঞান হয় না, না—তাহাও বলিতে পার না। কারণ ঝিনুক দেখিয়া "এই রূপা" এই প্রকার জ্ঞান কালে, "এই" জ্ঞানের যাহা বিষয় তাহা যে কোন একটা উজ্জ্বল পদার্থ তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সে লোকটার "এই" জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে উহার উজ্জ্বলতারও জ্ঞান হইয়াছে, এবং সেই জন্যই সে তাহাকে রূপা মনে করিয়া লইবার জন্য ধাবিত হয়। যদি সে উহাকে উজ্জ্বল না মনে করিত তাহা হইলে কি সে উহা লইতে যাইত, কখনই নহে। সুতরাং লোক স্মৃতিস্থ পদার্থ জ্ঞানের জন্য ধাবিত হয় একথা বলা চলে না।

যদি বল রজত-ভিন্ন পদার্থেও লোকের রজত বলিয়া গ্রহণ করিবার প্রবৃত্তি হয়, যখন সে সেই পদার্থের সহিত রজতের কি ভেদ তাহা বুঝিতে অক্ষম হয়। ইহা "রজত-ভিন্ন পদার্থ" নহে, এই জ্ঞান তাহার না হইলে, সে তাহাকে রজত বলিয়া লইতে যাইবে না কেন? এস্থলে "এই রজত" এই জ্ঞানের ভিতর দেখ দুইটী জ্ঞান রহিয়াছে। একটী—"এই জ্ঞান" অপরটী "রজত" জ্ঞান। "এই" জ্ঞানটী প্রত্যক্ষ দৃষ্ট, এবং "রজত" জ্ঞানটী স্মৃতি-পথে সমুদিত। ইহারা যে পরস্পরে বিভিন্ন জ্ঞান, তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। এখন "এই" জ্ঞানের বিষয়ের সহিত "রজত" জ্ঞানের বিষয়ের যে ভেদ তাহা যখনই লোক না বুঝিতে পারে তখনই তাহার তাহা লইবার প্রবৃত্তি হয়। দুইটীর ভেদ না বুঝা আর দুইটীকে এক বলিয়া বুঝা কি একই কথা নহে।

সুতরাং "এই" পদবাচ্য ঝিনুকের সহিত রজতের ভেদ না বুঝিয়া লোকে ঝিনুককে কুড়াইয়া লইতে যায়, ঝিনুককে রজত বলিয়া কুড়াইয়া লইতে যায় না। না—তাহাও বলিতে পার না। কারণ, লোকের স্বভাবই এই যে, প্রয়োজন না থাকিলে কখন সে বাঁকা পথে চলিতে চাহে না; লোকে স্বভাবতঃ সোজা পথে চলিতে চাহে। মিছামিছি শক্তিক্ষয় করা লোকের প্রকৃতি নহে। দেখ "এটা রজত" এবং "এটা রজত হইতে ভিন্ন নহে" এই দুইটী জ্ঞান দেখিতে এক হইলেও ইহাদের মধ্যে বিশেষত্ব আছে। "এটা রজত" বলিলে লোকের মনে রজতের কথাই প্রথমে উদয় হয়, এবং "এটা রজত হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে" বলিলে লোকের মনে অগ্রে রজতজ্ঞান, পরে রজত ভিন্ন পদার্থের জ্ঞান উদয় হয় এবং তাহার পরক্ষণে উক্ত রজত ভিন্ন পদার্থের জ্ঞানকে মন হইতে বিতাড়িত করিয়া, পুনরায় রজতজ্ঞানকে হৃদয়ে আসন প্রদান করিতে হয়। "এটা রজত" যদি এই জ্ঞানের প্রথম ক্ষণেই "রজত" জ্ঞান হয়, তাহা হইলে "এটা রজত হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে" এই জ্ঞানে "রজত" এইরূপ জ্ঞানটী তৃতীয় ক্ষণে হইবার কথা। সুতরাং ইহাতে বিলম্ব ত ঘটেই, অধিকন্তু একটা জ্ঞানকে আনিয়া, তাহাকে তাড়াইয়া, আবার তাহাকে আনিতে যথেষ্ট শক্তিক্ষয়ও হইতে বাধ্য। মনুষ্য এরূপ কার্য্য স্বভাববশে করে না। অগত্যা "এই রজত" এই জ্ঞানের "এই" পদদ্বারা যে জ্ঞান বুঝায়, সেই জ্ঞানের সহিত "রজত" জ্ঞানের অভেদ জ্ঞানই প্রবৃত্তির হেতু; রজতভিন্ন পদার্থের সহিত তাহার ভেদ না বুঝা এখানে প্রবৃত্তির হেতু নহে।

যদি বল, কোন একটা কিছু নির্ণয় করিতে হইলে, সেটা কি বা কোন্ জাতীয় এবং সেটা কি নহে বা কোন্ জাতীয় নহে, এই দুইটী ব্যাপারই প্রয়োজন হয়, এবং এই দুইটী ব্যাপারের কোনটীর অগ্র পশ্চাৎ হইবার কোন নিয়ম নাই; সেইরূপ এস্থলেও রজত নির্ণয়ে রজতের সহিত ঐক্যসাধন এবং রজত ভিন্ন পদার্থের সহিত অনৈক্য সাধনের যে কোনটী দ্বারাই সমান ফল হইবার কথা; কারণ, অগ্রে ঐক্য সাধন, পরে অনৈক্য সাধন করিতেই হইবে এরূপ কোন নিয়ম নাই; যেহেতু মন তাহার জ্ঞানভাণ্ডার অস্ত্রের মত আমাদের সম্মুখে খুলিয়া দিয়া যেন আমাদিগকে বাছিয়া লইতে বলে এবং দুইটীরই ফল পরিশেষে যখন এক, সুতরাং ভেদের অভাব-জ্ঞানই কেন প্রবৃত্তির হেতু হউক না। তাহা হইলে বলিব, না, তোমার ওকথা ঠিক

নহে। কোন একটা কিছু নির্ণয়ে, সেটা কি বা কোন্ জাতীয়, এইটীই আমাদের লক্ষ্য হয়, এবং এই কার্য্যেই আমরা প্রথমে প্রবৃত্ত হই, এবং ইহারই ফলে, সেটা কি নহে বা কোন্ জাতীয় নহে, তাহা প্রকারান্তরে সাধিত হইয়া যায়।

স্পষ্ট কথা এই যে, ঝিনুকখণ্ডে "এই রজত" জ্ঞানই প্রবৃত্তির হেতু, বলিয়া "এই" জ্ঞানের সহিত "রজত" জ্ঞানের ভেদ না বুঝাই প্রবৃত্তির হেতু নহে! এই হইল রামানুজ কর্ত্তৃক প্রভাকরের অখ্যাতিবাদ খণ্ডন। যদিও দুই-জনেই ভ্রমস্থলে ভ্রমের "বিষয়" সত্য বলেন, তথাপি বলিবার হেতু বিভিন্ন বলিয়া এই প্রকার তর্ক উঠিয়া থাকে। আর প্রকৃত প্রস্তাবে এই খণ্ডনটী ঠিক রামানুজের নিজের খণ্ডন নহে, ইহা কুমারিল প্রভৃতি মনীষিগণ রামানুজের পূর্ব্বেই এই সকল যুক্তির দ্বারা খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন; রামানুজ তাহা গ্রহণ করিয়াছেন মাত্র।

বস্তুতঃ প্রভাকরের মতটী বড় সাধারণ মত নহে। ইহাতে সূক্ষ্মদর্শন ও বুদ্ধিমত্তার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায। এ মতের গ্রন্থাদি লোপ পাওয়ায় ইহার সবিশেষ পরিচয় পাওয়া একপ্রকার অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যাহা হউক, যেটুকু পাওয়া যায় তাহাতেই দেখা যায়, আচার্য্য শঙ্কর অনেকস্থলে প্রভাকরেরই মত গ্রহণ করিয়াছেন। প্রভাকরের মতে অজ্ঞানই জগৎকারণ, আচার্য্য শঙ্করের মতেও তাহাই, তবে পার্থক্য এই যে, প্রভাকর ব্রহ্ম স্বীকার করেন নাই, শঙ্কর তাহা স্বীকার করিযাছেন। প্রভা-করের অজ্ঞান জগৎকারণ বলিয়া, প্রভাকর, লোকের প্রবৃত্তিও অজ্ঞান-বশতঃ হইয়া থাকে বলেন, এবং এইজন্যই তিনি শুক্তিতে রজত ভ্রমস্থলে বলেন যে শুক্তিতে রজত জ্ঞান হয় না, উহা স্মৃতিতে থাকে। বস্তুতঃ জগৎ সত্য বলিবার উদ্দেশ্যে তিনি তাহা বলেন না। শঙ্করমতেও অজ্ঞানই প্রবৃত্তির হেতু, তবে তাহা অজ্ঞানের আবরণ ও বিক্ষেপ নামক শক্তিবশতঃ ঘটে। আবরণ বশতঃ শুক্তি লুক্কাইত হয় এবং বিক্ষেপ বশতঃ তাহাতে অজ্ঞপ্রসূত একটী রজতজ্ঞানের ভাণ হয় মাত্র। প্রভাকরের মতেও জ্ঞান স্বতঃপ্রকাশ, শঙ্করমতেও জ্ঞান স্বতঃপ্রকাশ, কিন্তু কুমারিল জ্ঞানকে স্বতঃ ও পরত প্রকাশ বলিয়াছেন। রামানুজ এই কুমারিলমতেরই পক্ষপাতী।

এই প্রবন্ধ প্রারম্ভে আমরা কুমারিল ও প্রভাকর সম্বন্ধে যে প্রবাদটীর

কথা উল্লেখ করিয়াছি তাহা প্রচলিত প্রবাদ হইলেও ইহাতে সন্দেহাবসর যথেষ্ট আছে। কারণ কিছুদিন পূর্ব্বে আমি কাশীধামে এই সকল বিষয় অনুসন্ধান কালে জানিতে পারি যে লোকে সাধারণতঃ প্রভাকরকে "গুরু" নামক কুমারিলের এক শিষ্যের সহিত গোল করিয়া ফেলে; এবং তাহারই ফলে পূর্ব্বোক্ত প্রবাদটী প্রভাকরের নামে আরোপিত হয়। প্রাচীন গ্রন্থে প্রভাকর-মত সম্বন্ধে যেরূপ উল্লেখ করা যায় তদ্রূপ গুরুমতেরও উল্লেখ দেখা যায়। অবশ্য গুরুমতের সহিত প্রভাকরের মতের যে কি পার্থক্য তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। কারণ উভয় মতের গ্রন্থগুলি আজ বিলুপ্ত। "গুরু" ও কুমারিল সম্বন্ধেও একটী গল্প শুনা যায়। সংক্ষেপতঃ ইহা এই—একদিন কুমারিল কোন একটী প্রাচীন পুস্তকের কোন একটীস্থল পরদিন শিষ্যবর্গকে পড়াইবেন বলিয়া রাত্রে গ্রন্থ দেখিতে এবং একটী দুর্ব্বোধ্য স্থলের অর্থ বুঝিতে না পারিয়া রাত্রিশেষ পর্য্যন্ত ঐ বিষয়ে এক মনে চিন্তা করিতে থাকেন। "গুরু," হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গ হওয়ায় দেখেন যে তাঁহার গুরুদেব, সম্মুখে পুথি খুলিয়া বড়ই উৎকণ্ঠিত ভাবে কি যেন ভাবিতেছেন। কিন্তু পাছে কুমারিলের চিন্তায় কোন বিঘ্ন হয় এজন্য তিনি শায়িত অবস্থাতেই নিদ্রিতের ন্যায় পড়িয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ এইরূপ অতিবাহিত হইবার পর কুমারিল একবার কি কারণে বহির্দ্দেশে গমন করেন, এবং তাঁহার বিলম্ব দেখিয়া "গুরু" কৌতূহল পরবশ হইয়া পুথির সেই স্থানটীতে কি আছে তাহা চুপি চুপি দেখিতে লাগিলেন। একটু পাঠ করিয়াই তিনি বুঝিলেন কোন্ স্থলে তাঁহার গুরুদেবের সন্দেহ জন্মিয়াছে এবং তৎক্ষণাৎ লেখনী লইয়া সেই স্থলের পংক্তিটীতে একটী ছেদের চিহ্ন দিয়া আবার আসিয়া শুইয়া পড়িলেন। কুমারিল আসিয়া আর মনোযোগ সহকারে সেই স্থানটী দেখিতে লাগিলেন, কিন্তু এবার হঠাৎ তাঁহার অর্থাবগতি হইল, এবং মহানন্দ মনে সেই স্থলটী পুনরায় দেখিতে লাগিলেন যে কেন তাঁহার এরূপ সন্দেহ হইতেছিল। পরে দেখিলেন যে, তথায় একটী ছেদের চিহ্নই তাঁহার এরূপ অর্থাবগতির কারণ। তিনি তখন উক্তছেদ চিহ্নটী কে দিল ভাবিতে ভাবিতে আনন্দ মনে শয়ন করিলেন। পরদিন কুমারিল শিষ্য-বর্গকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন এবং উহা গুরুরই কার্য্য জানিয়া, সেই অবধি গুরুকে গুরু বলিয়া সম্মান করিতেন। বস্তুতঃ ইতিপূর্ব্বে গুরুর নাম অন্য ছিল।

তদ্ব্যতীত কুমারিল নিজ গ্রন্থে প্রভাকরেরই মত খণ্ডন করায় মনে হয় যে প্রভাকর কুমারিলের পূর্ব্ববর্ত্তী বা প্রধান সমসাময়িক কিন্তু কখনই কুমারিলের শিষ্য নহেন।

যাহা হউক আগামী বারে নৈয়ায়িকের অন্যথাখ্যাতি ও মায়াবাদীর অনির্ব্বচনীয় খ্যাতিবাদের বিষয় আলোচ্য।

কর্ণাট-উজ্জয়িনীতে শঙ্কর।

[শ্রীমতী—]

বিদর্ভ রাজধানীতে অদ্বৈতমত স্থাপন করিয়া আচার্য্যদেব কর্ণাট-উজ্জয়িনী-গমনে মনস্থ করিলেন। ক্রমে এই সংবাদ বিদর্ভরাজ অবগত হইলেন। ইহা শুনিয়া তিনি অত্যন্ত চিন্তিত ভাবে আচার্য্য-সমীপে উপস্থিত হইলেন।

তাঁহাকে দেখিয়া আচার্য্যদেব বিস্মিতভাবে কহিলেন "মহারাজ, আজ অসময়ে কেন?"

বিদর্ভপতি আচার্য্য-চরণে প্রণিপাত করিয়া কহিলেন "ভগবন্, পাদপদ্মে কিছু নিবেদন করিতে চাহি।"

আচার্য্য কহিলেন "কি কথা বৎস, স্বচ্ছন্দে বল।"

বিদর্ভরাজ বিনীতভাবে কহিলেন "মহাত্মন্! রাত্রি প্রভাতে আপনি নাকি বিদর্ভ দেশ পরিত্যাগ করিবেন?"

আচার্য্য কহিলেন "হাঁ বৎস, এইবার কর্ণাট-উজ্জয়িনীতে গমন করিব স্থির করিয়াছি।"

বিদর্ভরাজ কহিলেন ভগবন্! কর্ণাট-উজ্জয়িনীতে বহুসংখ্যক পিশাচ-সদৃশ কাপালিককুলের বাস। তাহারা অতি নিষ্ঠুর এবং তাহাদের আচার ব্যবহার অত্যন্ত ঘৃণিত। আপনার প্রতি তাহাদের বড়ই ঈর্ষা। মহৎ লোক দেখিলেই তাহারা তাঁহার সহিত সর্ব্বদাই বিবাদ করিয়া থাকে। মহাত্মন্! এরূপ স্থলে আপনি গমন করিবেন ইহা কখনই উচিত নহে। আপনার জীবনাশঙ্কায় আমাদের চিত্ত চঞ্চল হইতেছে। আমাদের একান্ত অনুরোধ, আপনি—"

বিদর্ভরাজের বাক্য শেষ হইতে না হইতেই কর্ণাট-উজ্জয়িনীর অধিপতি সুধন্বারাজ শরাসন হস্তে উত্থিত হইলেন।

তিনি মহারাজকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন "মহারাজের কোন চিন্তা নাই। এ দাস জীবিত থাকিতে প্রভুর কোন অমঙ্গল হইবে না। তাহারা যদি কোনও রূপ বাধা প্রদান করে তাহা হইলে সমূলে বিনষ্ট হইবে। প্রভু যথায় যাইবেন এ দাস শরাসন হস্তে সসৈন্যে তথায়ই গমন করিবে।"

এই বলিয়া তিনি আচার্য্যকে কহিলেন "ভগবন্! অনুমতি করুন কি কার্য্য করিতে হইবে? আমি আপনার একান্ত আশ্রিত, আমি বিদ্যমান থাকিতে শত্রু পক্ষ হইতে কোন আশঙ্কা নাই।

কর্ণাটরাজের কথা শেষ হইলে আচার্য্য যেন একটু হাসিলেন, কাহাকেও কোন উত্তর দিলেন না।

পদ্মপাদ নিকটেই ছিলেন, তিনি গুরুদেবের গম্ভীর ভাব দেখিয়া নৃপতি-দ্বয়কে কহিলেন "মহারাজ, আমাদের আচার্য্য বিশ্বপতি বিশ্বেশ্বরের আদেশে দিগ্বিজয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাঁহাকে বাধা দিতে পারে এমন লোক কে আছে? তিনি যাহা করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তাহাতে কিছুতেই পশ্চাৎপদ হইবেন না।"

ঐ কথা বলিতে বলিতেই কিন্তু পদ্মপাদের মনে সহসা "শ্রীশৈলে উগ্র-ভৈরবের" ঘটনা মনে পড়িল এবং তিনি একটু বিচলিত ও চিন্তিত ভাবে কহিলেন "তবে আমাদের ভয় যদি কেহ ছলনা করিয়া গুরুদেবের কোন অনিষ্ট সাধন করে।"

সুধন্বারাজ তাহাতেও ভীত হইলেন না। তিনি সকলকে সাহস দিলেন। তখন স্থির হইল যে পদ্মপাদ এক মুহূর্ত্তও আচার্য্যকে চক্ষুর অন্তরাল করিবেন না।

বিদর্ভপতি এই ব্যবস্থা শুনিয়া অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেন। আচার্য্যদেব কিন্তু কাহারও কোন কথায় মনোযোগ দিলেন না। তিনি আপনার ভাবেই বসিয়া রহিলেন।

প্রভাত হইলে সন্ন্যাসিগণ সকলে নিজ নিজ প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া আচার্য্য-চরণে উপস্থিত হইয়াছেন দেখিয়া পদ্মপাদ তাঁহাকে কর্ণাট গমনের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

তিনি কহিলেন "হাঁ বৎস! চল আমরা এখনই যাত্রা করি। অধিক বেলা হইলে শিষ্যগণের কষ্ট হইবে।"

এই বলিয়া আচার্য্য শিষ্যদিগকে লইয়া যাত্রা করিলেন। পশ্চাতে সসৈন্যে কর্ণাটরাজ সুধন্বা; তাঁহার ইচ্ছা ছিল তিনি সৈন্য-পরিবৃত হইয়া অগ্রে অগ্রে যাইবেন; কিন্তু ঐরূপ করিতে আচার্য্যের কোন আদেশ না পাইয়া তাঁহার পশ্চাৎগামী হইলেন।

এক পক্ষ কাল পথে অতিবাহিত হইল। যথা সময়ে তাঁহারা কর্ণাট-উজ্জয়িনীতে উপস্থিত হইলেন।

রাজার আগমন জানিয়া নাগরিকগণ পূর্ব্ব হইতেই নগর ধ্বজ পতাকা দ্বারা শোভিত করিয়া রাখিয়াছিল, এক্ষণে তাহারা মহাসমারোহে আচার্য্য-দেব সহ নিজ নরপতিকে নগরে অভ্যর্থনা করিল।

আচার্য্যদেব নগরে প্রবেশ করিবামাত্র সুধন্বারাজ তাঁহার পার্শ্বে আসি-লেন এবং রাজপথে চলিতে চলিতে নগরের বিভিন্ন স্থানের পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন।

ক্রমে রাজা আচার্য্যকে লইয়া নগরমধ্যস্থ প্রধান শিব-মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং তথায় আচার্য্যদেবের অবস্থিতির সমুদায় ব্যবস্থা করিবার জন্য মন্ত্রীকে আদেশ করিলেন।

আচার্য্য তথায় উপবেশন করিলে সুধন্বারাজ তাঁহার অনুমতি লইয়া নিজ প্রাসাদে ফিরিয়া আসিলেন।

অচিরে আচার্য্যের আগমনসংবাদ রাজধানীতে প্রচারিত হইল। রাজা স্বয়ং তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছেন শুনিয়া আচার্য্যদেবকে দেখিবার জন্য নগরবাসীদিগের আগ্রহ যারপর নাই বৃদ্ধি হইয়া উঠিল। তাহারা সকলে সকল কাজ ফেলিয়া এক্ষণে দলে দলে আচার্য্য-সমীপে আসিতে লাগিল। এইরূপে কয়েকদিনের মধ্যে নগরের বহু লোক আচার্য্যের পদাশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিল। দেশময় একটা মহা হুলস্থুল পড়িয়া গেল।

নগরের অনতিদূরে একটী পর্ব্বত। এই পর্ব্বতে সহস্র সহস্র কাপালিকের আবাস। কাপালিক সম্প্রদায়ের গুরু ক্রকচ এই স্থানে বাস করিতেন। ইঁহারা সুধন্বারাজের রাজ্যে বাস করিয়াও প্রকৃত প্রস্তাবে যেন একটী স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিয়া বসতি করিতেছিলেন।

একদিন ক্রকচ ভৈরবের পূজার আয়োজনে ব্যস্ত। এমন সময় একজন কাপালিক ঊর্দ্ধশ্বাসে আসিয়া কহিল "গুরুদেব শুনুন, শঙ্করাচার্য্য নামে সেই ভণ্ড সন্ন্যাসী এস্থানে আসিয়াছে এবং অনেককে চেলা করিতেছে, এমন কি রাজা পর্য্যন্ত তাহার চেলা হইয়াছে।"

ক্রকচ শুনিয়া কহিলেন "বটে! সে আবার এখানে আসিয়াছে? তা বেশ হইয়াছে, এইবার তাহার মরণ নিশ্চিত।"

কাপালিক কহিল "কেবল তাহাই নয়, সে নাকি আপনাকেও পরাজয় করিতে চাহে।"

ক্রকচ পরাজয়ের কথা শুনিয়া ক্রোধে যেন গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিলেন—"কি! এত বড় স্পর্দ্ধা! সে কি জানে না আমি ভৈরবসিদ্ধ। শত সহস্র কাপালিক আমার ইঙ্গিতে প্রাণ দিতে প্রস্তুত। দাঁড়াও হতভাগ্যকে এখনই সমুচিত শাস্তি প্রদান করিতেছি।"

এই বলিতে বলিতে ক্রকচ তাড়াতাড়ি পূজা শেষ করিলেন এবং কয়েক-জন কাপালিককে সঙ্গে লইয়া আচার্য্যের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

শিবমন্দিরে আচার্য্যদেব শিষ্যসহ উপবিষ্ট আছেন। সুধন্বারাজও রক্ষিগণ সহ তথায় অবস্থান করিতেছেন। এমন সময় কাপালিকগণ তথায় উপস্থিত হইল।

তাহাদের ভয়ানক ও বীভৎস বেশভূষা দেখিয়া আচার্য্য শিষ্যগণ-মধ্যে কেহ কেহ চমকিত হইলেন। তাহাদের পরিধানে রক্তবর্ণের কৌপীন, অনাবৃত দেহ শ্মশানের চিতা ভস্মে লেপিত, কোমর মনুষ্য-কেশ-নির্ম্মিত মোটা মোটা দড়ীতে জড়ান ও তাহাতে ছোট ছোট ঘণ্টা বাঁধা, গলায় রুদ্রাক্ষমালা, মাথায় জটাভার, বাহুও ঐরূপ চুলের দড়ীতে জড়ান, এক হস্তে লোহার দীর্ঘ-চিমটা এবং অপর হস্তে ভীষণ শূল। তাহাদের দক্ষিণ কক্ষ-দেশে মড়ার মাথার খুলি এবং বাম কক্ষদেশে উগ্রমদিরাপূর্ণ মৃণ্ময়পাত্র ঝুলিতেছিল ও ললাটে সিন্দূরের সুদীর্ঘ ফোঁটা এবং রক্তচন্দনের ত্রিপুণ্ড্র-চিহ্ন অঙ্কিত ছিল।

আচার্য্যকে দেখিবামাত্র ক্রকচ সগর্ব্বে কহিলেন, "তুমিই শিবের অবতার? তোমারই নাম শঙ্করাচার্য্য? তুমি নাকি কাপালিক মতের নিন্দা করিয়া বেড়াইতেছ!"

আচার্য্য ক্রকচের কথায় একবার তাহার প্রতি চাহিয়া দেখিলেন।

তাঁহার ললাটে ত্রিপুণ্ড্র চিহ্ন দেখিয়া ক্রকচ পরিহাসভরে কহিলেন, "বাঃ, এই যে তোমরাও ভস্ম ধারণ কর। কিন্তু মড়ার মাথাটী ছাড়িলে কেন? তোমরা কাহার উপাসনা করিয়া বৃথা সময় নষ্ট কর? আমাদের দেবতা ভৈরবের উপাসনা কর। কেন দীন দুঃখীর মত এক মুষ্টি ভিক্ষার জন্য লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া মর। আইস ভৈরবকে আশ্রয় কর, অতুল ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইবে। আর যদি তাঁহার অসীম ক্ষমতা দেখিতে চাও ত আমাকে ভজনা কর। রক্তমাখা নরমুণ্ডরূপ পদ্ম এবং মদ্য দ্বারা ভৈরবের উপাসনা করিলে এখনই তোমাদের সর্ব্বকামনা সিদ্ধ হইবে।"

এইরূপে ক্রকচ তাঁহাদিগের সম্প্রদায়ে অনুষ্ঠিত জঘন্য আচারের পরিচয় দিতে লাগিলেন এবং তাঁহার শিষ্যবর্গ মধ্যে মধ্যে হুঙ্কার ছাড়িয়া তাঁহার বাক্যে সায় দিতে লাগিল।

আচার্য্য ক্রকচের কদর্য্য কথা শুনিয়া প্রশান্তভাবেই বসিয়া রহিলেন। তাঁহার উদার হৃদয়ে ক্রোধ বা ঘৃণার উদ্রেক হইল না! ব্রাহ্মণ কুক্কুর ও চণ্ডাল যাঁহার নিকট ব্রহ্মভাবে সমান বলিয়া সর্ব্বদা প্রতিভাত হইত তাঁহার হৃদয়কে বিক্ষোভিত করিতে ক্রকচ কিরূপে সক্ষম হইবে?

আচার্য্য ক্রকচের কথার কোন উত্তরই দিলেন না। পদ্মপাদ প্রভৃতির হৃদয়ে মধ্যে মধ্যে ক্রোধ ও ঘৃণার উদ্রেক হইলেও আচার্য্যের ভাব দেখিয়া তাঁহারা চিত্তসংযত করিলেন।

সুধম্বারাজ কিন্তু ক্রকচের গর্ব্বমিশ্রিত ঘৃণিত কথায় ক্রুদ্ধ হইলেন। তাঁহার সাক্ষাতে আচার্য্যের অপমান!—তিনি সহ্য করিতে পারিলেন না।

তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া স্বীয় শরীররক্ষীদের কহিলেন "এখনই এই পাপাত্মাদের গলা টিপিয়া এই স্থান হইতে দূর করিয়া দাও।"

রক্ষীগণ রাজ-আদেশ পালনে উদ্যত হইলে ক্রকচের শিষ্যবর্গও তাহাদের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে অগ্রসর হইল। আচার্য্য ইহা দেখিয়া রক্ষীদের ক্ষান্ত হইতে ইঙ্গিত করিলেন। ক্রকচও তখন ক্রোধে সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তিনি ত্রিশূল উত্তোলন করিয়া বজ্রনাদে বলিতে লাগিলেন, "স্থির হ নরাধম, ইহার প্রতিফল এই মুহূর্ত্তেই দিতেছি। যদি আমি তোদের মুণ্ডচ্ছেদ না করি তবে আমি ক্রকচই নয়।" এই বলিয়া কাপালিক-গুরু সেস্থান হইতে ক্রোধভরে চলিয়া গেলেন।

ক্রকচ স্বস্থানে ফিরিয়া সমুদায় কাপালিকদিগকে আহ্বান করিলেন এবং সশিষ্য আচার্য্যদেবকে নিধন করিতে আদেশ দিলেন।

ক্ষণমধ্যে সহস্র কাপালিক ভীষণ শূল হস্তে আচার্য্যের নিধনোদ্দেশ্যে ধাবিত হইল।

কাপালিকসৈন্য আসিবার পূর্ব্বেই সুধন্বারাজ ঐ সংবাদ পাইলেন। তিনিও সসৈন্যে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন।

কাপালিক সৈন্য প্রথমেই সশিষ্য আচার্য্যকে আক্রমণ করিতে ধাবমান হইল। ইহা দেখিয়া সুধন্বারাজ স্বয়ং সৈন্য পরিচালনাপূর্ব্বক তাহাদিগকে বাধা দিলেন।

রাজসৈন্যসমূহ প্রবল প্রতাপে কাপালিকগণকে পরাজিত করিয়া সশিষ্য আচার্য্যকে রক্ষা করিতে লাগিলেন।

ক্রকচ ইহা দেখিয়া অপর দিক দিয়া আর একদল কাপালিক সৈন্য প্রেরণ করিলেন। কিন্তু মহারাজের যুদ্ধকৌশলে অচিরে তাহারাও বিধ্বস্ত হইল। অবশেষে সমুদায় কাপালিক সৈন্য রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল।

ক্রকচ বলপ্রকাশে অকৃতকার্য্য হইয়া ক্রোধে ও ক্ষোভে অধীর হইলেন। তিনি তখন একাকী সুধন্বারাজের নিকট আসিয়া আচার্য্যের নিকটে যাইবার অনুমতি চাহিলেন।

যুদ্ধের পর ক্রকচকে ঐভাবে একাকী আসিতে দেখিয়া মহারাজ তাঁহাকে বাধা দিলেন না। তিনি ভাবিলেন বুঝি ক্রকচ আচার্য্যের শরণাপন্ন হইবে।

কিন্তু ফলে ঘটিল বিপরীত। ক্রকচ আচার্য্যসমীপে আসিয়া হস্তে নরকপাল লইয়া ধ্যান করিতে বসিলেন।

তখন সহসা সেই নৃকপাল সুরাপূর্ণ হইয়া উঠিল। ক্রকচ তাহা অর্দ্ধেক পান করিয়া অর্দ্ধেক রাখিয়া দিলেন, এবং মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ভৈরবকে স্মরণ করিতে লাগিলেন।

সহসা ভীষণ হুঙ্কারে দিক্ কম্পিত হইয়া উঠিল! সকলে চমকিত হইয়া দেখিলেন—মুণ্ডমালা গলে, অগ্নিশিখার ন্যায় জ্যোতির্ম্ময় জটাভার শিরে, সুদীর্ঘ ত্রিশূল হস্তে ভৈরব আবির্ভূত হইয়াছেন।

এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়া আচার্য্য ভিন্ন সমুদায় লোক একটা অনির্দ্দেশ্য অমঙ্গলাশঙ্কায় ভীত ও ত্রস্ত হইয়া উঠিল।

ক্রকচ তখন নতজানু হইয়া জোড়হস্তে বলিতে লাগিলেন—"হে দেব, এই ব্যক্তি আপনার আশ্রিত ভক্তবৃন্দের হিংসা করিতে উদ্যত হইয়াছে। আপনি কৃপা করিয়া সত্বর ইহাকে বিনষ্ট করুন, ইহাই এ দাসের একান্ত প্রার্থনা।" এই বলিয়া আচার্য্যকে দেখাইয়া দিলেন, এবং ভূমিষ্ঠ হইয়া পুনঃ পুনঃ ভৈরবকে প্রণাম করিতে লাগিলেন।

কিন্তু লীলাময়ের লীলা কে বুঝিতে পারে! ক্রকচের কথা শুনিয়া ক্রুদ্ধ ভৈরব তাহাকেই সম্বোধন করিয়া কহিলেন "রে দুরাত্মা! তুমি কাহার প্রাণনাশ করিতে চাহিতেছ? মূঢ, জাননা এই ব্যক্তি আমার আত্মা। পাপিষ্ঠ, মদগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া তুমি একেবারে অন্ধ হইয়াছ? তুমি শঙ্করের প্রতি অপরাধ করিয়া নিজ জীবনের আশা রাখ? এই দণ্ডেই তাহার ফলভোগ কর।"

এই বলিয়া ভৈরব ত্রিশূল দ্বারা ক্রকচের মস্তক বিদ্ধ করিলেন। ক্রকচও গতপ্রাণ হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন।

আচার্য্যদেব এতক্ষণ ভৈরবের স্তব করিতেছিলেন। ভৈরব তাঁহার স্তবে তুষ্ট হইয়া এখন অন্তর্দ্ধান হইলেন।

ক্রকচের এই পরিণাম মুহূর্ত্তমধ্যে সমগ্র নগরে প্রচার হইল। তখন ব্রাহ্মণগণ যে যেখানে ছিলেন আসিয়া আচার্য্যচরণে পতিত হইলেন। তিনিও তাঁহাদিগকে বৈদিক সিদ্ধান্ত উপদেশ করিয়া সুপথে আনয়ন করিলেন।

এইরূপে এখন হইতে ব্রাহ্মণেরা সকলে পুনরায় পঞ্চযজ্ঞ ও পঞ্চদেবতা পূজা পরায়ণ হইলেন; এবং আবার ধীরে ধীরে নগরবাসীরা যাগযজ্ঞের প্রতি প্রীতিসম্পন্ন হইয়া উঠিতে লাগিল। ক্রমে সমগ্র দেশের অবস্থা ফিরিয়া গেল; এবং কর্ণাট-উজ্জয়িনীতে শান্তি স্থাপিত হইল।

সুধন্বারাজ এই ঘটনার পর হইতে আচার্য্যের প্রতি এতই অনুরক্ত হইলেন যে তিনি মন্ত্রীর হস্তে রাজকার্য্য অর্পণ করিয়া সস্ত্রীক ব্রহ্মচারী-বেশে আচার্য্যের অনুগমন করিলেন।

———

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

খাদ্য। শ্রীচুণীলাল বসু এম, বি. এফ্, সি, এস্ প্রণীত।

(সাহিত্যসভার গ্রন্থ-প্রচার-বিভাগ হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১৲ টাকা, প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকান, ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

চুণী বাবু ইতিপূর্ব্বে সাধারণের ভিতর স্বাস্থ্য-সম্বন্ধীয় জ্ঞান প্রচারের জন্য জল, বায়ু প্রভৃতি সম্বন্ধে গ্রন্থ প্রকাশিত করিয়াছেন, সম্প্রতি খাদ্য গ্রন্থখানি লিখিয়া সাধারণের বিশেষ কল্যাণ সাধন ও লোকশিক্ষার সহায়তা করিয়াছেন। উপনিষদে বলে—'আহার শুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ' আহারের সহিত ধর্ম্মের বিশেষ সম্বন্ধ। আমাদের স্মৃতিকারেরা এ সম্বন্ধে যথেষ্ট বিধি দিয়াছেন এবং এ সম্বন্ধে নানাবিধ লোক সংস্কারও প্রচলিত আছে। আধুনিক বিজ্ঞান কিন্তু আমাদের খাদ্য সম্বন্ধে কি বলেন, তদ্বিষয়ে সাধারণ বাঙ্গালী পাঠক একেবারে অজ্ঞ। চুণী বাবু বাঙ্গালা ভাষায় তাঁহার অভিজ্ঞতালব্ধ খাদ্য-সম্বন্ধীয় জ্ঞানরাজি এই গ্রন্থে প্রচারিত করিয়া এই অভাব দূরীভূত করিয়াছেন। গ্রন্থকার যে সমুদয় সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহা আধুনিক বিজ্ঞান সাহায্যে লব্ধ হইলেও শাস্ত্রানুকূল। যদি আমরা 'শরীরমাদ্যং খলুধর্ম্মসাধনং' ইহা শাস্ত্রবাক্য বলিয়া বিশ্বাস করি, তবে এই গ্রন্থকে আমরা ধর্ম্ম-গ্রন্থের ন্যায় আদর করিতে পারিব এবং ইহার সিদ্ধান্ত গুলি শাস্ত্রবাক্যের ন্যায় মান্য করিতে চেষ্টা করিব। খাদ্য দ্রব্যে ভেজাল কিরূপে নিবারণ হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে গ্রন্থকার আলোচনা করিয়াছেন এবং তৎসংক্রান্ত আইনের কিছু কিছু সংশোধনের প্রস্তাবও করিয়াছেন। আইনের দ্বারা কতকটা কায হইতে পারে বটে, তবে ব্যবসায়িগণের ভেজাল দেওয়া মহা অধর্ম্ম—এ জ্ঞান দূরীভূত না হইলে ইহার মূলোৎপাটন হইবার কোন আশা নাই। যাহা হউক আমরা এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

রামকৃষ্ণ শান্তিশতক। শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত প্রণীত। মূল্য ৷৷০ আনা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়,২০১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,কলিকাতা।

রক্ষিত মহাশয় এই গ্রন্থে তৎপ্রণীত কতকগুলি আধ্যাত্মিক সঙ্গীত প্রকাশিত করিয়াছেন। গানগুলি পড়িয়া দেখিলাম—বেশ ভক্তিরসপূর্ণ ও ধর্ম্ম-ভাবোদ্দীপক। অনেকগুলি গান ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশাবলম্বনে রচিত হইয়াছে। একটী কথা কেবল না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না।

গ্রন্থ খুলিয়াই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ছবির পত্র ও ভক্তিরসপূর্ণ ভূমিকাটীর পূর্ব্বে সন্নিবেশিত বিশেষণাড়ম্বরপূর্ণ উৎসর্গ পত্রটী পড়িয়া পুস্তকখানি মুড়িয়া রাখিতে ইচ্ছা হইয়াছিল।

সান্ত্বনা। শ্রীকেশবচন্দ্র বসু প্রণীত। মূল্য ॥০ আনা। প্রাপ্তিস্থান গিরীশ লাইব্রেরী, ২১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এখানি একখানি কবিতা পুস্তক। ইহাতে গ্রন্থকার রচিত ২৩টী কবিতা আছে। কতকগুলি গ্রন্থকারের স্বর্গীয়া পত্নীর উদ্দেশ্যে রচিত শোকোচ্ছ্বাস—অবশিষ্টগুলি অন্যান্য বিষয়ক। কবিতাগুলি চলন সই গোছের।

মহাভারতীয় নীতি কথা (আদি হইতে উদ্যোগ পর্ব্ব) প্রথম খণ্ড। শ্রীরাজেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল, বি, এল প্রণীত মূল্য ৸০ আনা। প্রকাশক শ্রীগজেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, ৩৮নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আমরা আজকাল বিদেশ হইতে নীতিতত্ত্ব শিক্ষা করিতে যাই। কিন্তু আমাদের দেশীয় শাস্ত্রে যে উচ্চনীতির শত শত জীবন্ত উদাহরণ বিদ্যমান তৎপ্রতি আমাদের দৃষ্টি আদৌ আকৃষ্ট হয় না। রাজেন্দ্র বাবু ৺ মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ কৃত মহাভারতের অনুবাদ হইতে সার সঙ্কলন করিয়া বর্ত্তমান গ্রন্থ রচনা করিয়া দেশের অভাব কতকটা মোচন করিয়াছেন নিঃসন্দেহ। ইহাতে মহাভারতের উৎপত্তি ও মাহাত্ম্য এবং ভরত-বংশ-বিবরণ ভিন্ন ভীষ্মের পিতৃভক্তি, অর্জ্জুনের একাগ্রতা ইত্যাদ দ্বাবিংশতিটী উচ্চ নৈতিকাদর্শ সন্নিবেশিত আছে। যাঁহাদের সুবিপুলকায় মহাভারত পাঠের সময় নাই, তাঁহারা এই গ্রন্থপাঠে বিশেষ উপকৃত হইবেন আর অনেকেই মূল-গ্রন্থপাঠে আকৃষ্ট হইবেন, আশা করা যায়। ইহার ভাষা অতি প্রাঞ্জল, বালকগণেরও সুবোধ্য। আশা করি, এই পুস্তক বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক-রূপে পরিগণিত হইবে। এখানি প্রথম ভাগ, আমরা শীঘ্রই ইহার দ্বিতীয় ভাগ দেখিবার ইচ্ছা করি।

সংবাদ।

আমরা শোকসন্তপ্তহৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি যে, ইণ্ডিয়ান মিররের সুযোগ্য সম্পাদক, স্বনামধন্য ৺নরেন্দ্রনাথ সেন গত ২৩শে আষাঢ় শনিবার রক্তামাশয় রোগে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি উদার, স্বাধীনচেতা, ধর্ম্ম-পরায়ণ এবং স্বদেশহিতৈষী ছিলেন। সর্ব্বপ্রকার দেশহিতকর অনুষ্ঠানেই তাঁহার আন্তরিক সহানুভূতি ছিল। তাঁহার মৃত্যুতে দেশের যে ক্ষতি হইল তাহা শীঘ্র পূরণ হইবার নয়। ভগবান্ তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের শান্তিবিধান করুন।

স্বামি-শিষ্য-সম্বাদ

[শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এ।]

এখন স্বামীজি বেশ সুস্থ আছেন। শিষ্য আজ রবিবার প্রাতে মঠে আসিয়াছেন। স্বামীজির পাদ-পদ্ম-দর্শনান্তে শিষ্য নীচে আসিয়া স্বামী নির্ম্মলানন্দের সহিত বেদান্তশাস্ত্রের আলোচনা করিতেছে, এবং নির্ম্মলানন্দের অনুরোধে স্বরচিত "পাগলী পাগল সনে মিলেছে ভালো" গানটী গাহিতেছে। স্বামীজি ইতিমধ্যে যে নীচে নামিয়া আসিয়াছেন, শিষ্য তাহা জানিতে পারে নাই। স্বামীজিকে দেখিতে পাইয়াই শিষ্য গীত বন্ধ করিয়া লজ্জায় দৌড়িয়া পলায়ন করিল। স্বামীজি কিন্তু গানের সম্বন্ধে ভাল মন্দ কাহাকেও কিছু বলিলেন না। কিছুক্ষণ পরে শিষ্য আবার স্বামীজির কাছে উপস্থিত হইল। স্বামীজি শিষ্যকে দেখিয়া বলিলেন "কিরে, তুলসীর সঙ্গে তোর বিচার হচ্ছিলো ?"

শিষ্য—মহাশয়, তুলসী মহারাজ বলিতেছিলেন, তোর বেদান্তের ব্রহ্মবাদ কেবল তোর স্বামীজি, আর তুই বুঝিস্। আমরা কিন্তু জানি—

"কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।"

স্বামীজি—তুই কি বল্‌লি ?

শিষ্য—আমি বলিলাম, এক আত্মাই সত্য। কৃষ্ণ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ ছিলেন মাত্র। তুলসী মহারাজ ভিতরে বেদান্তবাদী। বাহিরে কিন্তু দ্বৈতবাদীর মত লইয়া তর্ক করেন। বোধ হয়, তাঁহার ঐরূপ তর্ক সত্যের উপস্থাপনের জন্য। ঈশ্বরকে ব্যক্তিবিশেষ বলিয়া কথা অবতারণা করিয়া ক্রমে বেদান্তবাদের ভিত্তি সুদৃঢ় প্রমাণিত করাই তাঁহার অভিপ্রায় বলিয়া মনে হয়। কিন্তু উনি আমায় "বৈষ্ণব ফৈষ্ণব" বলিলেই আমি ঐ কথা ভুলিয়া যাই এবং তাঁহার সহিত তর্কে লাগিয়া যাই।

স্বামীজি—তুলসী তোকে খুব ভাল বাসে কি না, তাই ঐরূপ ব'লে তোকে খ্যাপায়। তুই চট্‌বি কেন ? তুইও বল্‌বি "আপনি শূন্যবাদী নাস্তিক"।

শিষ্য—মহাশয়, উপনিষৎ দর্শনাদি পড়িয়া শুনিয়া বেদান্ত-সিদ্ধান্তিত ব্রহ্মবাদ ভিন্ন আমার আর কিছুই মনে ধরে না। ঈশ্বর যে কেবলমাত্র শক্তিমান্ ব্যক্তিবিশেষ, এ কথায় আমার আস্থা হয় না।

স্বামীজি—সর্ব্বেশ্বর কখনো ব্যক্তিবিশেষ হ'তে পারেন না। জীব হচ্চে ব্যষ্টি, আর সকল জীবের সমষ্টি হচ্ছেন ঈশ্বর। জীবে অবিদ্যা প্রবল, ঈশ্বর, ঐ অবিদ্যার সমষ্টি বা মায়াকে বশীভূত ক'রে স্বাধীন ভাবে এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎ নিজের ভিতর থেকে project (বাহিরে প্রকাশ) করেছেন। ব্রহ্ম কিন্তু ঐ ব্যষ্টি-সমষ্টির পারে বর্ত্তমান। ব্রহ্মের অংশাংশ ভাগ হয় না। বুঝাবার জন্য তাঁর ত্রিপাদ, চতুষ্পাদ ইত্যাদি কল্পনা করা হয়েছে মাত্র। যে পাদে সৃষ্টি-স্থিতি-লয়াধ্যাস হচ্ছে, সেই ভাগকে শাস্ত্র "ঈশ্বর" ব'লে নির্দ্দেশ কর্‌ছে। কূটস্থ অপর ত্রিপাদ যাতে কোনরূপ দ্বৈত কল্পনার ভান নাই, তাই ব্রহ্ম। তাই ব'লে এরূপ যেন মনে করিস্‌নি, ব্রহ্ম জীবজগৎ হ'তে একটা স্বতন্ত্র বস্তু। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীরা বলেন, ব্রহ্মই জীবজগৎরূপে পরিণত হয়েছেন। অদ্বৈতবাদীরা বলেন, তাহা নহে, ব্রহ্মে এই জীবজগৎ অধ্যস্ত হয়েছে মাত্র। কিন্তু উহাতে ব্রহ্মের বস্তুতঃ কোনরূপ পরিণাম হয় নাই। অদ্বৈতবাদী বলেন, নামরূপ নিয়েই জগৎ। যতক্ষণ নামরূপ আছে, ততক্ষণই জগৎ আছে। ধ্যান-ধারণা-বলে নাম-রূপের বিলয় হ'য়ে যায়; তখন এক ব্রহ্মই থাকেন। তখন তোর, আমার, বা জীবজগতের স্বতন্ত্র সত্তার আর অনুভব হয় না। তখন বোধ হয়, নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ আমিই প্রত্যক্-চৈতন্য বা ব্রহ্ম। জীবের স্বরূপই ব্রহ্ম। ধ্যান ধারণায় নামরূপের আবরণটা দূর হ'য়ে ঐ ভাবটা প্রত্যক্ষ হয় মাত্র। এই হচ্ছে শুদ্ধাদ্বৈতবাদের সার মর্ম্ম। বেদ বেদান্ত শাস্ত্র মাস্ত্র এই কথাই নানা রকমে বার বার বুঝিয়ে দিচ্ছে।

শিষ্য—তাহা হইলে ঈশ্বর যে সর্ব্বশক্তিমান্ ব্যক্তিবিশেষ—একথা আর সত্য হয় কিরূপে?

স্বামীজি—মন উপাধি নিয়েই মানুষ। মন দিয়েই তাকে সকল বিষয় ধর্‌তে বুঝ্‌তে হচ্ছে। কিন্তু মন যা ভাবে, তা limited (সীমাবদ্ধ) হবেই। এজন্য আপনার personality (ব্যক্তিত্ব) থেকে ঈশ্বরের personality (ব্যক্তিত্ব) কল্পনা করা জীবের স্বতঃসিদ্ধ স্বভাব। মানুষ তার ideal (আদর্শ) টাকে মানুষরূপেই ভাব্‌তে সক্ষম। এই জরামরণসঙ্কুল জগতে

মানুষ "হা-হতোস্মি" ক'রে ক'রে এমন এক ব্যক্তির আশ্রয় চায়, যার উপর নির্ভর ক'রে সে চিন্তাশূন্য হ'তে পারে। কিন্তু আশ্রয় কোথায়? নিরাধার সর্ব্বগ আত্মাই একমাত্র আশ্রয়স্থল। প্রথমে মানুষ তা টের পায় না। বিবেক বৈরাগ্য এলে, ধ্যান ধারণা কত্তে কত্তে সেটা ক্রমে টের পায়। কিন্তু যে, যে ভাবেই সাধন করুক না কেন, সকলেই অজ্ঞাতে আপনারই ভিতরে অবস্থিত ব্রহ্মভাবকে জাগিয়ে তুলছে। তবে আলম্বন ভিন্ন ভিন্ন হ'তে পারে। যার personal Godএ (ঈশ্বরের ব্যক্তিবিশেষত্বে) বিশ্বাস আছে, তাকে ঐ ভাব ধ'রেই সাধন ভজন কত্তে দে না। ঐকান্তিকতা এলে ঐ থেকেই কালে ব্রহ্মসিংহ তার ভিতরে জেগে উঠ্‌বেন। এই ব্রহ্মজ্ঞানই Goal (একমাত্র গম্য বা লভ্য)। তবে নানা পথ—নানা মত। জীবের পারমার্থিক স্বরূপ ব্রহ্ম হ'লেও মনরূপ উপাধি নিয়ে তার হরেক্ রকম বিচিত্র লীলা-রঙ্গ-ভঙ্গ। কিন্তু নিজের স্বস্বরূপ লাভে আব্রহ্ম-স্তম্ব পর্য্যন্ত সকলেই গতিশীল। যতক্ষণ না "অহং ব্রহ্ম" ইত্যাকার বোধ হবে, ততক্ষণ এই জন্মমৃত্যুগতির হাত থেকে কারোই নিস্তার নাই।

শিষ্য—মহাশয়, এমন সর্ব্ব-সমন্বয়ী উদার ব্রহ্মবাদ ত্যাগ করিয়া যাহারা অন্য মতামতের অনুসরণ করে তাহারা বড় নির্ব্বোধ।

স্বামীজি—মানুষজন্ম লাভ ক'রে, মুক্তির ইচ্ছা প্রবল হ'লে আর মহাপুরুষের কৃপা হ'লে তবে মানুষের আত্ম-জ্ঞান-স্পৃহা বলবতী হয়। নতুবা কাম-কাঞ্চন-জড়িত লোকের ওদিকে মনের গতিই হয় না। মাগ্, ছেলে, ধন, মান লাভ কোর্‌বে ব'লে মনে যার সংকল্প রয়েছে, তার কি ক'রে ব্রহ্ম-বিবিদিষা হবে? যে সব ত্যাগ কত্তে প্রস্তুত, যে সুখদুঃখ-ভালমন্দের চঞ্চল প্রবাহে ধীর স্থির শান্ত—সমনস্ক, সেই আত্ম-জ্ঞান লাভে যত্নপর হয়। সেই "নির্গচ্ছতি জগজ্জালাৎ পিঞ্জরাদিব কেশরী"—মহাবলে জগজ্জাল ছিন্ন ক'রে মায়ার গণ্ডী ভেঙ্গে সিংহের মত বেরিয়ে পড়ে।

শিষ্য—সন্ন্যাস-ধর্ম্ম না লইলে ব্রহ্মজ্ঞান হইতেই পারে না, ইহাই কি আপনার অভিপ্রায়?

স্বামীজি—তা একবার বল্‌তে? অন্তর্বহিঃ উভয় ভাবেই সন্ন্যাস করা চাই। আচার্য্য শঙ্করও বলেছেন "তপসা বাপ্যলিঙ্গাৎ" লিঙ্গহীন অর্থাৎ সন্ন্যাসের চিহ্ন গৈরিকবসন-দণ্ড-কমণ্ডলুহীন তপস্যায় এ দুরধিগম্য ব্রহ্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষ হয় না। বৈরাগ্য না এলে—ত্যাগ না এলে—ভোগস্পৃহা

ত্যাগ না হ'লে কি কিছু হবার যো আছে রে বাপ? "সে যে ছেলের হাতে মোয়া নয় যে ভোগা দিয়ে কেড়ে খাবি।"

শিষ্য—কিন্তু সাধন করিতে করিতে ক্রমে ত ত্যাগ আসিতে পারে?

স্বামীজি—যার ক্রমে আসে, তার আসুক্। তুই তা ব'লে সেইজন্য ব'সে থাকৃবি কেন? এখনি খাল কেটে জল আন্‌তে লেগে যা। ঠাকুর বল্‌তেন "হচ্ছে—হবে ওসব মেদাটে ভাব"। পিপাসা পেলে কি কেউ ব'সে থাকৃতে পারে?-না, জলের জন্য ছুটোছুটি ক'রে বেড়ায়? পিপাসা পায়নি—তাই ব'সে আছিস্। বিবিদিষা প্রবল হয়নি, তাই মাগ্ ছেলে নিয়ে সংসার কচ্ছিস্।

শিষ্য—বাস্তবিক কেন যে এখনও ঐরূপ সর্ব্বস্ব-ত্যাগের বুদ্ধি হয় না, তাহা বুঝিতে পারি না। আপনি ইহার একটা উপায় করিয়া দিন।

স্বামীজি—উদ্দেশ্য ও উপায় সবই তোর হাতে। আমি কেবল Stimulate (ঐ বিষয়ের বাসনা মনে প্রবল) ক'রে দিতে পারি। এই সব সৎশাস্ত্র পড়্‌ছিস্—এমন ব্রহ্মজ্ঞ সাধুদের সেবা ও সঙ্গ কচ্ছিস্—এতেও যদি না ত্যাগের ভাব আসে, তবে জীবনই বৃথা হ'লো। তবে একেবারে বৃথা হবে না—কালে এর ফল তেড়ে ফুঁড়ে বেরুবেই বেরুবে।

শিষ্য অধোমুখে বিষণ্ণভাবে নিজের পরিণাম কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া পুনরায় স্বামীজিকে বলিতে লাগিল—"মহাশয়, আপনিই আমার উদ্দেশ্য ও উপায়। আমায় মুক্তিলাভের পন্থা বলিয়া দিন—আমি যেন এ শরীরেই তত্ত্বজ্ঞ হইতে পারি।"

স্বামীজি শিষ্যের অবসন্নতা দর্শন করিয়া বলিতেছেন—"ভয় কি? সর্ব্বদা কেবল বিচার কর্‌বি—এই দেহ গেহ জীবজগৎ সকলি নিঃশেষ মিথ্যা—স্বপ্নের মত। সর্ব্বদা ভাব্‌বি, এই দেহটা একটা জড় যন্ত্র মাত্র। এতে যে আত্মারাম পুরুষ রয়েছেন, সেই তোর যথার্থ স্বরূপ। মনরূপ উপাধিটাই তাঁর প্রথম আবরণ। তার পর দেহটা তাঁর স্থূল আবরণ হ'য়ে রয়েছে। নিষ্কল, নির্ব্বিকার, স্বয়ং জ্যোতিঃ সেই পুরুষ এই সব মায়িক আবরণে আচ্ছাদিত থাকায়, তুই তোর স্বস্বরূপকে জান্‌তে পাচ্ছিস্ না। এই রূপরসে ধাবিত মনের গতি অন্তর্দ্দিকে ফিরিয়ে দিতে হবে। মন্‌টাকে মার্‌তে হবে। দেহটা ত স্থূল—এটা ম'রে পঞ্চভূতে মিশে যায়। কিন্তু সংস্কারের পুঁটুলী—মন শীগ্‌গির মরেন না। বীজের ন্যায় কিছুকাল থেকে আবার বৃক্ষে পরিণত

হন; আবার স্থূল শরীর ধারণ ক'রে জন্মমৃত্যুপথে গমনাগমন করেন। এইরূপ যতক্ষণ না আত্মজ্ঞান হয়। সেইজন্য বলি, ধ্যান ধারণা ও বিচার-বলে মনকে সচ্চিদানন্দ সাগরে ডুবিয়ে দে। এই মনটা ম'রে গেলেই সব গেলো—ব্রহ্মসংস্থ হ'লি। বুঝ্‌লি?

শিষ্য—মহাশয়, এই উদ্দাম উন্মত্ত মনকে ব্রহ্মাবগাহী করা মহা কঠিন।

স্বামীজি—বীরের কাছে আবার কঠিন ব'লে কোনও জিনীস আছে? কাপুরুষেরাই ওকথা বলে। "বীরাণামেব করতলগতা মুক্তিঃ ন পুনঃ কাপুরুষাণাং।" অভ্যাস ও বৈরাগ্য-বলে মনকে সংযত কর্। গীতা বল্‌-ছেন "অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে।" চিত্তবৃত্তি যেন একটী স্বচ্ছ হ্রদ। রূপরসাদির আঘাতে তাতে যে তরঙ্গ উঠ্‌ছে, তার নামই মন। এজন্যই মনের স্বরূপ সংকল্পবিকল্পাত্মক। ঐ সংকল্প-বিকল্প থেকেই বাসনা উঠে। তার পর ঐ মনই ক্রিয়াশক্তিরূপে পরিণত হ'য়ে স্থূলদেহ-রূপ যন্ত্র দিয়ে কার্য্য করায়। আবার কর্ম্মও যেমন অনন্ত, কর্ম্মের ফলও তেমনি অনন্ত। ঐ অনন্ত অযুত কর্ম্মফলরূপ তরঙ্গে মন তখন দুল্‌তে থাকে। এইজন্য মনকে বৃত্তিশূন্য করে দিতে হবে। স্বচ্ছ হ্রদে পরিণত কত্তে হবে—যাতে বৃত্তিরূপ তরঙ্গ একটীও আর না থাকে। তবে ত ব্রহ্ম প্রতিফলিত হবেন, তবে ত ব্রহ্ম প্রকাশ হবেন। ঐ অবস্থারই আভাস শাস্ত্রকার এই ভাবে দিচ্ছেন "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ" ইত্যাদি—বুঝ্‌লি?

শিষ্য—আজ্ঞে হাঁ; কিন্তু ধ্যান ত বিষয়াবলম্বী হওয়া চাই।

স্বামীজি—তুই নিজেই নিজের বিষয়। তুই সর্ব্বগ আত্মা—এইটীই মনন ও ধ্যান কর্‌বি। আমি দেহ নই—মন নই—বুদ্ধি নই—স্থূল নই—সূক্ষ্ম নই—এইরূপ "নেতি" "নেতি" ক'রে প্রত্যক্‌চৈতন্যরূপ স্বস্বরূপে মনকে ডুবিয়ে দিবি। এইরূপে মন শালাকে ডুবিয়ে ডুবিয়ে মেরে ফেল্‌বি। তবেই বোধস্বরূপের বোধ ও স্বস্বরূপে স্থিতি হবে। ধ্যাতা ধ্যেয় তখন এক হ'য়ে যাবে—জ্ঞাতা জ্ঞেয় এক হ'য়ে যাবে। নিখিল অধ্যাসের নিবৃত্তি হবে। একেই বলে শাস্ত্রে "ত্রিপুটিভেদ।"

শিষ্য—মহাশয়, কবে আমার ঐরূপ অবস্থা হইয়া 'নিবাত নিষ্কম্প' প্রদীপের ন্যায় অবস্থান করিতে পারিব? আমার ঐ অবস্থাটাই সর্ব্বাপেক্ষা বড় বলিয়া বোধ হয়।

স্বামীজি—ঐরূপ অবস্থায় জানাজানি থাকে না। আত্মাই যখন এক-

মাত্র বিজ্ঞাতা, তখন তাকে আবার জান্‌বি কি ক'রে? আত্মাই জ্ঞান—আত্মাই চৈতন্য—আত্মাই সচ্চিদানন্দ। সৎ বা অসৎ যাই কেন বলিস্ না, অনির্ব্বচনীয়া মায়াশক্তি সেই ব্রহ্মে এই জানাজানি ভাবটা এনে দিয়েছে। এটাকেই সাধারণ মানুষ Conscious state (চৈতন্য বা জ্ঞানের অবস্থা) বলে। আর যেখানে এই দ্বৈত-সংঘাত নিরাবিল ব্রহ্মতত্ত্বে এক হ'য়ে যায়, তাকেই শাস্ত্র Super-conscious state (সাধারণ জ্ঞানভূমি অপেক্ষা উচ্চাবস্থা) ব'লে এইরূপে বর্ণনা করেন—"স্তিমিতসলিলরাশিপ্রখ্যমাখ্যাবিহীনং!"

কথাগুলি, স্বামীজি যেন ব্রহ্মানুভবের অগাধ জলে ডুবিয়া যাইয়াই বলিতে লাগিলেন!

স্বামীজি—এই জানাজানি থেকেই দর্শন বিজ্ঞান সব বেরিয়েছে। কিন্তু কোনও ভাব বা ভাষা জানাজানির পারের বস্তুকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ কত্তে পাচ্ছে না! দর্শন-বিজ্ঞানাদি Partial truth (আংশিক ভাবে সত্য)। উহারা সেজন্য পরমার্থতত্ত্বের expression (প্রকাশক) কখনই হ'তে পারে না। এইজন্য পরমার্থের দিক্ দিয়া দেখিলে সবই মিথ্যা ব'লে বোধ হয়। ধর্ম্ম মিথ্যা—কর্ম্ম মিথ্যা—আমি মিথ্যা—তুই মিথ্যা—জগৎ মিথ্যা। তখন দেখে যে, আমিই সব; আমিই সর্ব্বগত আত্মা; আমার প্রমাণ আমিই। আমার অস্তিত্বের প্রমাণের জন্য আবার প্রমাণান্তরের অপেক্ষা কোথায়? আমি শাস্ত্রে যেমন বলে—"নিত্যমস্মৎ প্রসিদ্ধং"। আমি ঐ কথা সত্যসত্যই দেখেছি—অনুভূতি করেছি। তোরাও দ্যাখ্—অনুভূতি কর্ আর জীবকে এই ব্রহ্মতত্ত্ব শুনাগে। তবে ত সোয়াস্তি—তবে ত শান্তি।

ঐ কথা বলিতে বলিতে স্বামীজির মুখ গম্ভীর হইল এবং তাঁহার মন যেন কোন এক অজ্ঞাত রাজ্যে যাইয়া কিছুক্ষণের জন্য স্থির হইয়া গেল! কিছুক্ষণ পরে তিনি আবার বলিতে লাগিলেন—"এই সর্ব্বমতগ্রাসিনী, সর্ব্বমতসমঞ্জসা ব্রহ্মবিদ্যা নিজে অনুভব কর্—আর জগতে প্রচার কর্। উহাতে নিজের মঙ্গল হবে, জীবেরও কল্যাণ হবে। তোরে ভালবাসি তাই এই সব সার কথা বল্লুম। এর চাইতে বড় কথা আর কিছুই নাই।

শিষ্য—মহাশয়, আজ আপনি এই সব এমন জ্ঞানের কথা বলিতেছেন। আবার কখন বা ভক্তির, কখন কর্ম্মের ও কখন যোগের প্রাধান্যও কীর্ত্তন করেন। উহাতে আমাদের বুদ্ধি গুলাইয়া যায়।

স্বামীজি—কি জানিস্?—এই ব্রহ্মজ্ঞ হওয়াই চরম লক্ষ্য—পরম পুরুষার্থ।

তবে মানুষ ত আর সর্ব্বদা ব্রহ্মসংস্থ হ'য়ে থাক্‌তে পারে না? ব্যুত্থানকালে কিছু নিয়ে ত থাক্‌তে হবে? তখন এমন কর্ম্ম করা উচিত, যাতে লোকের শ্রেয়োলাভ হয়। এইজন্য এদের বলি, অভেদবুদ্ধিতে জীবসেবারূপ কর্ম্ম কর্। কিন্তু বাবা কর্ম্মের এমন মারপ্যাঁচ্ যে, মহা মহা সাধুরাও এতে বদ্ধ হ'য়ে পড়েন। সেইজন্য ফলাকাঙ্ক্ষাহীন হ'য়ে কর্ম্ম কত্তে হয়। গীতায় ঐ কথাই বলেছে। কিন্তু জান্‌বি, ব্রহ্মজ্ঞানে কর্ম্মের অনুপ্রবেশও নাই। পরম্পরা-পক্ষে সৎকর্ম্ম দ্বারা জোর চিত্তশুদ্ধি হয়। এইজন্যই ভাষ্যকার জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়ের প্রতি এত তীব্র কটাক্ষ—এত দোষারোপ করেছেন। নিষ্কাম কর্ম্ম থেকে কারো কারো ব্রহ্মজ্ঞান হ'তে পারে। এও একটা উপায় বটে; কিন্তু উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ। এ কথাটা বেশ ক'রে জেনে রাখ্—বিচারমার্গ ও অন্য সকল প্রকার সাধনার ফল হচ্ছে ব্রহ্মজ্ঞতা লাভ করা।

শিষ্য—ভক্তি ও রাজযোগের উপযোগিত্ব বলিয়া আমার জানিবার আকাঙ্ক্ষা দূর করুন।

স্বামীজি—ঐ সব পথে সাধন কত্তে কত্তেও কারো কারো ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হ'য়ে যায়। তবে ভক্তিমার্গ slow process—দেরিতে ফল হয়—কিন্তু সহজসাধ্য। যোগে নানা বিঘ্ন। হয়তো বিভূতি-পথে মন চ'লে গেলো; আর স্বরূপে পঁহুছিতে পার্‌লে না। একমাত্র জ্ঞানপথই আশুফলপ্রদ—সর্ব্বমতবাদী, সর্ব্বকালে—সর্ব্বদেশে সমানাদৃত। তবে বিচারপথে চল্‌তে চল্‌তেও মন দুস্তর তর্কজালে বদ্ধ হ'য়ে যেতে পারে। এইজন্য সঙ্গে সঙ্গে ধ্যান করা চাই। বিচার ও ধ্যান বলে উদ্দেশ্যে বা ব্রহ্মতত্ত্বে পঁহুছিতে হবে। এই ভাবে সাধন কর্‌লে goal এ (গম্যস্থানে) ঠিক পঁহুছান যায়। এ সহজ পন্থা আশুফলপ্রদ।

শিষ্য—এইবার আমায় অবতারবাদ বিষয়ে কিছু বলুন।

স্বামীজি—তুই যে এক দিনেই সব মেরে নিতে চাস্।

শিষ্য—মহাশয়, মনের ধাঁধা একদিনে মিটে যায় তো বার বার আর আপনাকে বিরক্ত হইতে হইবে না।

স্বামীজি - যে আত্মার এত মহিমা শাস্ত্রমুখে অবগত হওয়া যায়, সেই আত্মজ্ঞান যাঁদের লাভ হয়, তাঁরাই সচল তীর্থ—অবতার পুরুষ। ব্রহ্ম ও ব্রহ্মজ্ঞে কিছুমাত্র তফাৎ নাই। "ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি"। আত্মাকে ত আর জানা যায় না। কারণ, এই আত্মাই বিজ্ঞাতা ও মন্তা—একথা পূর্ব্বেই

বলেছি। মানুষের জানাজানি ঐ অবতার পর্য্যন্ত—যাঁরা আত্মসংস্থ। মানব-বুদ্ধি ঈশ্বরসম্বন্ধে Highest ideal (সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ ভাব) যাহা গ্রহণ করিতে পারে, তাহা ঐ পর্য্যন্ত। তার পর "বিদি" ক্রিয়া থাকে না—জানাজানি থাকে না। ঐরূপ ব্রহ্মজ্ঞ কদাচিৎ জগতে জন্মায়। তাঁদের অল্প লোকেই বুঝ্‌তে পারে। তাঁরাই শাস্ত্রোক্তির প্রমাণস্থল—সমুদ্রের আলোক-স্তম্ভস্বরূপ। এই অবতারগণের সঙ্গ ও কৃপাদৃষ্টিতে চাই কি মুহূর্ত্তমধ্যে হৃদয়ের অন্ধকার দূর হ'য়ে যায়—সহসা ব্রহ্মজ্ঞানের স্ফুরণ হয়! কেন বা কি processএ (উপায়ে) হয়, তার নির্ণয় করা যায় না। তবে হয়—হ'তে দেখেছি। শ্রীকৃষ্ণ আত্মসংস্থ হ'য়ে গীতা বলেছিলেন। গীতার যে যে স্থলে "অহং" শব্দের উল্লেখ রয়েছে, তা "আত্মপর" বলে জান্‌বি। "মামেকং শরণং ব্রজ" কিনা "আত্মসংস্থ হও"। এই আত্মজ্ঞানই গীতার চরম লক্ষ্য। যোগাদির উল্লেখ ঐ আত্মতত্ত্বলাভের আনুষঙ্গিক অবতারণা। বুঝ্‌লি?

শিষ্য—আজ্ঞে হাঁ। একথা আর ভুলিব না।

স্বামীজি—এই আত্মজ্ঞান যাদের হয় না, তারাই আত্মঘাতী। "বিনিহন্ত্যসদ্‌গ্রহাৎ"। রূপরসাদির উদ্বন্ধনে তাদের প্রাণ যায়। তোরাও ত মানুষ—দুদিনের ছাই-ভস্ম ভোগকে উপেক্ষা কত্তে আর পার্‌বি না? "জায়স্ব—ম্রিয়স্বের দলে যাবি কেন? শ্রেয়োকে গ্রহণ কর্‌—প্রেয়োকে পরিত্যাগ কর্‌।

এইরূপ বলিতে বলিতে স্বামীজি জল খাইতে চাহিলেন। শিষ্য জল আনিয়া দিলে তাহা কিঞ্চিৎ পান করিয়া আবার বলিতে লাগিলেন "এই আত্মতত্ত্ব আচণ্ডাল সব্বাইকে বল্‌বি। ঐরূপ বল্‌তে বল্‌তে নিজের বুদ্ধিও পরিষ্কার হ'য়ে যাবে। আর "তত্ত্বমসি" "সোহমস্মি" "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" প্রভৃতি মহামন্ত্র সর্ব্বদা উচ্চারণ কর্‌বি ও হৃদয়ে সিংহের মত বল রাখ্‌বি। ভয় কি? ভয়ই মৃত্যু—ভয়ই মহাপাতক। নররূপী অর্জ্জুনের ভয় হয়েছিল—তাই আত্মসংস্থ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাকে এত উপদেশ দিলেন। তবু কি ভয় যায়? পরে অর্জ্জুন যখন আত্মসংস্থ হলেন, তখন জ্ঞানাগ্নি-দগ্ধ-কর্ম্ম হ'য়ে যুদ্ধ কর্‌লেন।

শিষ্য—আত্মজ্ঞান লাভ হ'লেও কি কর্ম্ম থাকে?

স্বামীজি—জ্ঞানলাভের পর সাধারণে যাকে কর্ম্ম বলে, সেরূপ কর্ম্ম

থাকে না। তখন কর্ম্ম "জগদ্ধিতায়" হ'য়ে দাঁড়ায়। আত্মজ্ঞানীর চলন্ বলন্ সবই জীবের কল্যাণ সাধন করে। ঠাকুরকে দেখেছি—"দেহস্থোঽপি ন দেহস্থঃ" এই ভাব! ঐরূপ পুরুষদের কর্ম্মের উদ্দেশ্য-সম্বন্ধে কেবল এই কথা মাত্র বলা যায়—"লোকবত্তু লীলাকৈবল্যং"।

এইরূপ কথাবার্ত্তার পরে শিষ্য নীচে আসিয়া স্বামীজির শ্রীমুখকথিত ঐ সকল সিদ্ধান্তবাক্যগুলি শ্রীমান্ নির্ম্মলানন্দ স্বামী প্রমুখ সন্ন্যাসিগণের নিকটে বলিতে লাগিল। তাঁহারা শুনিয়া বলিলেন, "এ সব কথা লিখে রাখ্‌বি। লোকের উপকারে আস্‌বে।" তাঁহাদের ঐ আজ্ঞানুসরণেই স্বামী-কথিত ব্রহ্মবাদ আজ জনসমাজে আংশিক ভাবে প্রকাশ করিতে সক্ষম হইলাম।

ইউরোপীয় দর্শনের ইতিহাস।

[শ্রীকানাইলাল পাল এম, এ।]

সোফিষ্ট।

এনাক্সাগোরাস্ যখন প্রচার করেন যে, এই জগদ্ব্যাপার অনন্তসংখ্যক চৈতন্যশক্তি দ্বারা নিয়মিত, তখন তিনি যে কেবলমাত্র জীব-চৈতন্যকে লক্ষ্য করিয়া ঐ কথা বলেন নাই ও ঐ সিদ্ধান্তে উপনীত হন নাই, তাঁহার গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া একথা স্বীকার না করাটা অতি বড় নৈয়ায়িকের পক্ষেও শক্ত হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু তিনি সেই চৈতন্যশক্তিকে এক না বলিয়া বহু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া স্ববিরোধ ঘটাইলেন। কারণ, দুইটী পদার্থ কখনও অনন্ত হইতে পারে না। তাঁহার মতে ঐ চৈতন্যশক্তি বীজপদার্থ হইতে পৃথক্ বস্তু-বিশেষ; সুতরাং উহা বীজপদার্থ দ্বারা সীমাবদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিতেই হয়; অতএব তাহার অসীমত্ব আর স্বীকার করিতে পারা যায় না। আর এক কথা, এনাক্সাগোরাস্ বলিলেন, সেই চৈতন্যশক্তিই এই সুশৃঙ্খলাপূর্ণ সুন্দর সুনিয়মিত সুব্যবস্থিত জগৎ রচনা করিতেছে; কিন্তু উহার এই জগদ্রচনার প্রয়োজন কি? তাঁহার মতে সৃষ্টিব্যাপারে বীজপদার্থের কোন উদ্দেশ্য থাকিতেই পারে না; কারণ, তাহারা জড়বস্তু মাত্র। সুতরাং দাঁড়াইল এই যে, চৈতন্যশক্তি নিজ উদ্দেশ্য-বিশেষ সাধনের জন্যই এই জগদ্রচনায় ব্যস্ত। কিন্তু বহু বলিয়া নির্দ্দেশ করায় যদি সেই চৈতন্যশক্তির

অসীমত্বই অস্বীকার করিতে হয়. তবে অনন্তসংখ্যক জীব-চৈতন্যই জগতের নিয়ামক, কথাটা এইরূপ হইয়া দাঁড়ায় না কি? আবার ঐরূপ স্বীকার করিলে মানুষের নিজ প্রয়োজন-সাধনই কি সৃষ্টিব্যাপারের উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইল না? অতএব যুক্তি-কল্পনার সহায়ে তিনি যে বহু চৈতন্যশক্তির সত্তা স্বীকার করিয়া এই প্রত্যক্ষ জগদ্ব্যাপারের একটা কারণ গড়িয়া তুলিলেন, তাহার যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা না পাইয়া মানুষ কালে জীব-চৈতন্যকেই যে জগতের অধিনায়ক বলিয়া বুঝিয়া বসিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? সেজন্যই আমরা দেখি, তাঁহার ঐ প্রকার মতবাদ-প্রচারের পরেই সোফিষ্টগণের অভ্যুদয় ও ঘোষণা—মানবই জগতের নিয়ন্তা; মানব-প্রয়োজন-সাধনই জগতের একমাত্র উদ্দেশ্য; জীবের সত্যমিথ্যা, শুভাশুভ বিচার করিয়া চলা ততদূরই আবশ্যক যতদূর করিলে ঐ প্রয়োজন-সাধনে হানি না হয়।

সোফিষ্ট শব্দের অর্থ কি. প্রথমে তাহাই পরিষ্কার করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। সাধারণতঃ তাঁহাদিগকে কূটতার্কিক বলিয়াই নির্দ্দিষ্ট করা হয়। ইতিহাসে তাঁহাদের বিষয়ে যে বিবরণ পাওয়া যায়, তাহার অধিকাংশই শত্রুপক্ষীয়দের কথা; সুতরাং ঐ বিবরণ সতর্কতার সহিত গ্রহণ করিতে হইবে। সোফিষ্টেরা অত্যধিক বিত্ত গ্রহণ করিয়া অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষা দিতেন, দুর্নীতি প্রচার করিয়া এথেন্স্ সহরের যুবকদিগকে কলুষিত করিতেন এবং সত্যকে মিথ্যা ও মিথ্যাকে সত্য প্রতিপন্ন করিয়া আপনাদিগের বুদ্ধি ও যুক্তি-কৌশলের পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক গর্ব্ব করিতেন ইত্যাদি তাঁহাদিগের সম্বন্ধে বহুপ্রকার. অপরাধের কথা সেই বিবরণে শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু যখন ঐ ইতিহাসেই আবার এ কথাও দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাঁহারা বিদ্বান্ বুদ্ধিমান্ বলিয়া সর্ব্বত্র সম্মানিত হইতেন, অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়া সমাজের শীর্ষস্থান অধিকারে এবং এথেন্স্ নগরে সর্ব্ব বিষয়ে এক-প্রকার একাধিপত্য স্থাপনে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, তখন পূর্ব্বোক্ত অপবাদ-গুলির সত্যতা-সম্বন্ধে একটু সন্দেহ উপস্থিত হয়। মনে হয়, তখন এথেন্স্ নগরে জনসাধারণের মধ্যে যে ব্যবহার-নীতি প্রচলিত ছিল, তাহা উচ্চ অঙ্গের ছিল না। লোকে আইনব্যবসা তখন অত্যন্ত পছন্দ করিত। কারণ, একমাত্র ঐ উপায়েই সেকালে সাংসারিক উন্নতি-লাভের সম্ভাবনা ছিল। আইন-ব্যবসায়ী আপনার মোকদ্দমা অত্যন্ত খারাপ হইলেও যেমন তাহাকে সাজাইয়া গুজাইয়া সুন্দর বর্ণে রঞ্জিত করিয়া জয়লাভের

চেষ্টা করে, সেই হিসাবেই সোফিষ্টগণ মিথ্যাকে সত্য ও সত্যকে মিথ্যা বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেন। সোফিষ্টদিগের সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত অপবাদের ইহাই যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা বলিয়া আমাদের মনে হয়। ছাত্রদিগের নিকট হইতে তাঁহাদের অত্যধিক বিত্ত-গ্রহণ সম্বন্ধে প্রোটাগোরাসের উক্তিই ঐ বিষয়ে বিপরীত সাক্ষ্য প্রদান করে। তিনি তাঁহার শিষ্যদিগকে বলিতেন, "তোমরা প্রত্যেকে আমার নিকট যে শিক্ষা লাভ করিয়াছ, তাহার যাহা উচিত মূল্য বলিযা বুঝ, তাহাই আমায দিবে।" সোফিষ্টেরা যে ব্যবহার-নীতি শিক্ষা দিতেন, তাহা এরিষ্টটল্ বা প্লেটোর চক্ষে অত্যন্ত হেয় বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু তাৎকালিক সমাজ যে তজ্জন্য তাঁহাদিগকে কখনও হেয় জ্ঞান করিত না, এ কথা বেশ বুঝা যায়। কারণ, ঐরূপ হইলে সমাজে উচ্চ পদ লাভ করা তাঁহাদের পক্ষে কখন সম্ভবপর হইত না। তবে ঐরূপে বিত্ত-গ্রহণে অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষা দেওয়ায় কালে দুইটী বিষময় ফল ফলিযাছিল—(১) সমাজে উচ্চ পদ লাভ করিতে হইলে অর্থকরী বিদ্যা বিশেষতঃ আইন শিক্ষা ভিন্ন অন্য কোন উপায় নাই বলিযা লোকের ধারণা হইয়াছিল ; (২) জ্ঞানের মর্য্যাদা যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস হইয়া পড়িয়াছিল ও নিষ্কাম ভাবে বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চ্চা লুপ্তপ্রায় হইতে চলিযাছিল। আবার স্বার্থ-সাধনের জন্যই জ্ঞানচর্চ্চা, সমাজে এই ভাব সর্ব্বত্র প্রচলিত হওয়ায শিক্ষার্থীদিগের মনোভাব বুঝিযা সোফিষ্টেরা অনেক সময়ে ব্যক্তিবিশেষকে বিশেষ স্বার্থ-সাধনের উপযোগী শিক্ষাসকলও দান করিতেন। এইরূপে সাধারণভাবে সামাজিক বা সাংসারিক উন্নতি-সাধনকল্পে শিক্ষাপ্রদান করিযাই ক্ষান্ত না থাকিয়া বিশেষ বিশেষ লোকের জন্য বিশেষ বিশেষ স্বার্থ-সাধনোপযোগী শিক্ষা প্রদান করিতে অগ্রসর হওযাতেই কালে তাঁহাদের শিক্ষায় ভয়ানক ফল ফলিয়াছিল।

আমাদের উপরোক্ত কথা হইতে এটুকু বেশ বুঝা যাইবে যে, সোফিষ্টদিগের বিরুদ্ধে পরবর্ত্তী ঐতিহাসিকগণ যে সকল অপবাদ প্রচলিত করিয়াছেন, তাহা অতিরঞ্জিত। এখন অপবাদের কথা ছাড়িয়া দিয়া কাহাদিগকে সোফিষ্ট বলা হইত, তাহাই দেখা যাউক। ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়, গ্রীক্ দেশে তৎকালে বিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রকেই সাধারণতঃ সোফিষ্ট বলা হইত; শিল্পী, কবি, গায়ক, বক্তা, প্রভৃতি সকলকেই ঐ আখ্যা প্রদান করা হইত। অতএব বুঝা যায়, সোফিষ্টদিগের রীতি নীতি দর্শন বিজ্ঞান প্রভৃতি বিশেষ-

রূপে সময়োপযোগী ছিল বলিয়াই সমাজে তাঁহারা খ্যাতি অর্জনে সমর্থ হইয়াছিলেন। প্লেটো এরিষ্টটল প্রভৃতি সবিশেষ উচ্চভাবাপন্ন ব্যক্তি সকল তাৎকালিক সমাজকেই ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। সুতরাং যাঁহাদিগের দ্বারা ঐ সমাজ পুষ্টিলাভ করিয়া দণ্ডায়মান ছিল, সেই সোফিষ্টদিগকে তাঁহারা যে অত্যন্ত হেয় জ্ঞান করিবেন, তাহার আর আশ্চর্য্য কি ? বিশেষতঃ আবার যখন ইতিহাসে একথা লিপিবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায় যে, সোফিষ্ট সম্প্রদায়ের গুরুরা সাধারণে প্রচার করিতেন যে, পারমার্থিক তত্ত্বানুসন্ধান করিতে যাওয়াটা বৃথা পরিশ্রম, উহা মানবের চিরকাল অজ্ঞেয় থাকিবে, তখন প্লেটো ও এরিষ্টটলের তাঁহাদিগের প্রতি ঘৃণার কারণ বুঝিতে আর বাকি থাকে না।

সে যাহা হউক পাঠকের একথা বিশেষ ভাবে স্মরণ রাখা উচিত যে, সোফিষ্টদিগের দর্শন বলিয়া কোন একটী বিশেষ দার্শনিক মত কোন কালেই প্রচলিত ছিল না। উহার প্রমাণস্বরূপে আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, সোফিষ্ট বলিতে শুধু দার্শনিককে কোন কালেই বুঝাইত না। অতএব সোফিষ্ট দর্শন বলিতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব দার্শনিকদিগের মতের মধ্য হইতে সোফিষ্টেরা যতটুকু গ্রহণ ও প্রচার করিতেন তাহাই বুঝাইয়া থাকে। কিন্তু কোন্ কোন্ দার্শনিক সম্প্রদায়ের কতটুকু মত তাঁহারা গ্রহণ ও অনুমোদন করিতেন তাহার সম্যক্ নির্ণয় করা এখন আর সম্ভবপর নহে।

প্রোটাগোরাস্।

সোফিষ্ট দর্শনকারদিগের মধ্যে প্রথমেই প্রোটাগোরাসের (Protagoras) নাম ইতিহাসে উল্লিখিত আছে। তাঁহার আবির্ভাব কাল খ্রীঃ পূঃ ৪৮০ অব্দ। সাধারণকে শিক্ষাদান এবং বিনিময়ে বিত্তগ্রহণ করিয়া তিনি গ্রীসের ভিন্ন ভিন্ন স্থলে, বিশেষতঃ এথেন্স ও সিসিলিতে, প্রায় ৩০ বৎসর কাল ভ্রমণ করিয়া বেড়ান। জগতের সহিত মানবের আদান প্রদান সুন্দর ভাবে কেমন করিয়া সম্পন্ন হইতে পারে, মানবের উন্নতি কোন্ উপায়ে সুকর হয় এই বিষয়ে শিক্ষাদান করাই তাঁহার প্রধান কার্য্য ছিল। শুনিতে পাওয়া যায় তিনি উত্তম আইনজ্ঞও ছিলেন এবং থুরি (Thurii) উপনিবেশে আইনসম্বন্ধীয় ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তিনি প্রচার করিতেন প্রত্যেক মতই আপেক্ষিক সত্য ; সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন ভূমি বা অবস্থা হইতে বিচার করিয়া দেখিলে প্রত্যেক মতই যুক্তির দ্বারা অকাট্য বলিয়া প্রমাণিত করা যাইতে পারে, বিশুদ্ধ সত্য অথবা সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বদা সমভাবে সত্য থাকিবে

এরূপ কোনও তত্ত্ব-নির্ণয় করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। সুতরাং সে বিষয়ে অনুসন্ধান করা বৃথা; এবং যাহাতে আপনার সামাজিক ও সাংসারিক উন্নতি-সাধন হইতে পারে তৎবিষয়েই মানুষের মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য। আইনজ্ঞ না হইলে মানবের সাংসারিক উন্নতির পথ অবরুদ্ধ থাকে; সুতরাং আইনজ্ঞ হওয়া তাঁহার মতে একান্ত প্রয়োজনীয়। আবার শুধু আইনজ্ঞ হইলেই চলে না; বাগ্মীতা প্রভাবে নিজের মতামতের উপর অপরের বিশ্বাস জন্মাইয়া দিতে না পারিলে সংসারে প্রতিষ্ঠা-লাভ হয় না; তজ্জন্য কেমন করিয়া বক্তৃতা করিতে হয় তদ্বিষয় শিক্ষা করাও প্রয়োজন। তাঁহার দর্শন তিনি স্বয়ং লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। এখনও উহার কিছু কিছু সংরক্ষিত পাওয়া যায়। ধর্ম্ম বিষয়ে সাধারণের পূজ্য দেব দেবীতে তিনি বিশ্বাস করিতেন না এবং সাধারণের ভ্রান্ত ধর্ম্মমতের সময়ে সময়ে প্রতিবাদও করিতেন। তজ্জন্য অভিযুক্ত হইয়া তাঁহাকে অন্যান্য অনেকের ন্যায় নির্ব্বাসিতও হইতে হইয়াছিল। ঈশ্বর সম্বন্ধে নিজ মতামত প্রকাশ করিয়া তিনি যে গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, শুনা যায়, অশিক্ষিত জন সাধারণ উত্তেজিত হইয়া তাহা ভস্মীভূত করিয়া ফেলে। সিসিলিতে শেষ যাত্রা কালে তিনি জলমগ্ন হন। তাঁহার মৃত্যুকাল ঠিক জানা যায় না।

দর্শন—জ্ঞান মাত্রেই আপেক্ষিক, এই নূতন তত্ত্ব তিনিই প্রথমে প্রচার করিয়াছিলেন। জগতের সমস্ত পদার্থই পরিবর্ত্তনশীল। অপরিবর্ত্তনীয় কোন সত্তার অস্তিত্ব নাই। হেরাক্লাইটাসের পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত তিনি স্বীকার করিয়া লইযাছিলেন। আবার মানবের সমস্ত জ্ঞানই ইন্দ্রিয়লব্ধ এবং ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ, ডেমোক্রাইটাসের এই সিদ্ধান্তটুকুও তিনি মানিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু ডেমোক্রাইটাস্ যে বলিতেন, বিচারলব্ধ জ্ঞান ইন্দ্রিয়ানুভূতি হইতে বিভিন্ন এবং তাহা দ্বারা সত্যতত্ত্ব লাভ করা যায়, প্রোটাগোরাস, ডেমোক্রাইটাসের এই শেষ সিদ্ধান্তটুকু অযৌক্তিক মনে করিতেন। তিনি বলিতেন, বিচারলব্ধ জ্ঞান ইন্দ্রিয়ানুভূতির উপরেই যখন সতত নির্ভর করে, তখন প্রথমটী শেষটী হইতে একেবারে ভিন্ন হইবে কিরূপে? সুতরাং বিচারলব্ধ জ্ঞানের দ্বারাও যথার্থ সত্য কখনও নির্ণীত হয় না। মানুষ শুধু আপনার অনুভূতিই জানে; অতএব মানব তাহার নিজ অনুভূতির অতীত কোন বিষয় কখনও জানিতে পারে নাই এবং কোন কালে পারিবেও না। অতএব ডেমোক্রাইটাসের পরমাণু,

এনাক্সাগোরাসের বীজপদার্থ, এম্পিডোক্লিসের ভূতকণা প্রভৃতি কেবল কল্পনা মাত্র—তাহাদের বাস্তবিক সত্তা নাই। যাহা প্রত্যক্ষ, তাহাই এক-মাত্র সত্য। বস্তুসকলের পরস্পর সংযোগ-বিয়োগেই ঐ প্রত্যক্ষজ্ঞান জন্মে। অতএব কোন বস্তু সদা বর্ত্তমান আছে, এ কথা আর বলা চলে না। বস্তুসকল হইতেছে (Becoming) বা হইয়াছে, এইটুকু মাত্র বলিতে পার। উদাহরণস্বরূপ তিনি বলেন, দর্শনেন্দ্রিয়ের সহিত দৃশ্য বস্তুর সংযোগ হইতেই দর্শনজ্ঞান জন্মে। অতএব দ্রষ্টাকে ছাড়িয়া দিয়া দৃষ্ট বস্তুর স্বরূপ কি, তাহা জানা যায় না। মোট কথা, জ্ঞাতার উপরেই জ্ঞেয় বস্তুর সত্তা সর্ব্বদা নির্ভর করে; সেজন্য একই বস্তু ভিন্ন ভিন্ন লোকের নিকট ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হয়। সেজন্যই আবার একই বস্তু হইতে সমসময়ে কেহ সুখ অনুভব করে ও কেহ দুঃখ পাইয়া থাকে এবং একই বস্তু হইতে একই ব্যক্তি কখন সুখ ও কখন দুঃখ ভোগ করে। বস্তুর যথার্থ স্বরূপ যখন মানুষ নির্ণয় করিতে অক্ষম এবং সকল জ্ঞানই যখন আপেক্ষিক, তখন যাহা আমার নিকট সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয় তাহাই আমার পক্ষে সত্য ও যাহা তোমার নিকট শুভকর বলিয়া বোধ হয় তাহাই তোমার মঙ্গল-জনক। অতএব জগতের সমস্ত জ্ঞানই আমাকে তোমাকে বা অপর কাহাকেও অপেক্ষা করে এবং বিশুদ্ধ সত্য লাভের চেষ্টা নিস্ফল। আমার জ্ঞান আমার জন্য সত্য নির্ণয় করে; তোমার জ্ঞান তোমার জন্য সত্য নির্ণয় করে। আমার জ্ঞানের দ্বারা আমি আমার জগৎ নিয়মিত করি। তোমার জ্ঞানের দ্বারা তুমি তোমার জগৎ নিয়মিত কর। এনাক্সাগোরাস্ জগতে চৈতন্যের আধিপত্য ঘোষণা করিযাছিলেন সত্য, কিন্তু তাহার স্বরূপ কি, সৃষ্টিব্যাপারে তাহার উদ্দেশ্য কি এই সকল প্রশ্নের বিশদ উত্তর মানব না পাওয়ায় ক্রমে সেই চৈতন্যের স্থান সসীম চৈতন্য-বিশিষ্ট জীব এইরূপে অধিকার করিয়া বসিল। ফলে, সত্যকে মানবের অনুভূতি-সাপেক্ষ হইয়া মানব মনের অধীন হইয়া থাকিতে হইল এবং স্বার্থপর মানবের নিকট স্বার্থসাধনই সত্য ও সর্ব্বস্ব হইয়া দাঁড়াইল। আবার স্বার্থসাধন করিতে হইলে নিজের স্বার্থ কি তাহা বুঝিতে পারা চাই এবং সেই স্বার্থসাধনে যাহাতে অপর বস্তু ও ব্যক্তি সহায় হয় তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখা চাই। এখন ভিন্ন ভিন্ন লোকের নিকট সত্যের ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি যদি প্রকাশ পায়, অথবা ভিন্ন ভিন্ন লোকের মঙ্গল যদি ভিন্ন ভিন্ন

প্রকারের হয় তবে পরস্পরের স্বার্থের সংঘর্ষ উপস্থিত হইবেই হইবে। তবে আমার নিকট যাহা সত্য বলিয়া প্রতীয়মান, আমার নিকট যাহা শুভকর বোধ হয়, অপরের মনে যদি তাহাই সত্য ও শুভকর বলিয়া ধারণা কৌশলে বদ্ধমূল করিয়া আমি দিতে পারি তবে আমাদের মধ্যে স্বার্থবিরোধ ঘটে না; অথবা কৌশলপূর্ণ যুক্তি ও বাগ্মীতা প্রভাবে আমার বিশ্বাস ও মতামত অপরের নিকট সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারিলে তবেই আমার স্বার্থসাধন হওয়া সম্ভব। এই জন্যই জগতে বাগ্মীতার এত সম্মান। প্রোটাগোরাস্ বলিতেন, প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে স্ববিরোধ বর্ত্তমান, এবং ঐ বিষয়ের প্রমাণস্বরূপে নানারূপ কূট যুক্তিও প্রয়োগ করিতেন। তাঁহার ঐ যুক্তিগুলি কিন্তু অনেক সময় পরস্পর বিরোধী বলিয়া প্রতীত হয়। ঐ বিষয়ে কিন্তু তাঁহার যেন কোন লক্ষ্যই ছিল না। যে কোন উপায়ে বিপক্ষের মতখণ্ডন করাই যেন তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। ঐরূপ একটী উদাহরণের এখানে উল্লেখ করিয়া আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধ উপসংহার করি।—

মানুষ কিছুই জানিতে পারে না। কারণ, যাহা জানে, তাহার আবার জ্ঞানলাভ কি? আর, যাহা জানে না, তাহা কিরূপে জানিবে? আমরা প্রোটাগোরাসের মতামত ব্যক্ত করিলাম; কিন্তু কেবলমাত্র উহা হইতেই সোফিষ্টদিগের সম্বন্ধে সকল বিষয় জানিতে পারা যায় না। কারণ, জড় বিজ্ঞানের প্রতি অনাস্থা প্রদর্শন করিয়া মানব সত্য জ্ঞান কখন লাভ করিতে পারে না—তত্ত্ব-চিন্তা বৃথা পরিশ্রম,—সাংসারিক ও সামাজিক উন্নতিসাধনই মানব জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ইত্যাদি মত-সমূহের প্রচারে এবং অলঙ্কার-শাস্ত্রের সমধিক চর্চ্চা করিয়া বাগ্মীতা প্রভাবে সংসারে আপনার উন্নতি ও স্বার্থসিদ্ধি করা সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন সোফিষ্টদলের মধ্যে অনেকটা সৌসাদৃশ্য থাকিলেও তাহাদের পরস্পরের মধ্যে যে পার্থক্য ছিল তাহাও অগ্রাহের বিষয় নহে। সুতরাং আরও কয়েক জন সোফিষ্টের মতামত এখানে ব্যক্ত করিয়া আমরা এ প্রবন্ধ শেষ করিব।

জর্জিয়াস্।

জীবনী—প্রোটাগোরাসের (Protagoras) পর জর্জিয়াসের নাম (Georgeas) উল্লেখযোগ্য। ইনি সিসিলি দ্বীপে লিওনিটি (Leoniti) নগরে আন্দাজ ৪৮৩ খ্রীঃ পূঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

সুতরাং তিনি এক হিসাবে প্রোটাগোরাস (Protagoras) ও সক্রেটিসের (Socrates) সমসাময়িক লোক ছিলেন। ৪২৭ খ্রীঃ পূঃ অব্দে সিরাকিউজিয়ান্‌সদের (Syracusians) বিরুদ্ধে এথিনিয়ানদের সাহায্য প্রার্থনা করিতে তিনি স্বদেশ হইতে এথেন্সে দূতরূপে প্রেরিত হন। এথিনিয়ানদিগের সাহায্যলাভে কৃত-কার্য্য হইয়া তিনি সেবার স্বদেশে ফিরিয়া যান। কিন্তু বাগ্মীতা প্রভাবে এথিনিয়নগণকে তিনি এত মুগ্ধ করিয়াছিলেন যে তাহারা তাঁহাকে এথেন্সে আসিয়া বসবাস করিতে অনুরোধ করে। তিনিও কিছুকাল পরে দেশ হইতে প্রত্যাগত হইয়া এথেন্সে অবস্থিতি করেন। তথায় অবস্থানকালে তাঁহার বক্তৃতা-প্রভাবে ও শিক্ষা-প্রদানের গুণে দেশের প্রচলিত ভাষার সম্যক্ শ্রীবৃদ্ধি হয়। কারণ, অপরাপর সোফিষ্টদিগের ন্যায় তিনিও গ্রীস দেশের ভিন্ন ভিন্ন নগরে বক্তৃতা ও শিক্ষা প্রদান পূর্ব্বক এই সময় হইতে ভ্রমণ করিতেন এবং তদ্দ্বারা প্রভূত অর্থও সঞ্চয় করিয়াছিলেন। অলঙ্কার-শাস্ত্রে শিক্ষা দেওয়াই তাঁহার প্রধান কার্য্য ছিল। শুনা যায় তিনি এম্পিডোক্লিসের শিষ্য ছিলেন। কিন্তু কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন জিনোর (Zeno) দার্শনিক মতের প্রভাব তাঁহার শিক্ষায় বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হইত। শেষ জীবনে তিনি থেসালী (Thessally) প্রদেশে ল্যারিসাস্ (Larisus) নগরে বাস করিতেন এবং তথায় ৩৭৫ খ্রীঃ পূঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল।

দর্শন—জর্জিয়াসের (Georgeas) দার্শনিক মতের সহিত এম্পিডোক্লিসের (Empedocles) মতের কতকটা সাদৃশ্য আছে। সুতরাং তিনি যে এম্পিডোক্লিসের শিষ্য ছিলেন একথা একেবারে অসঙ্গত নয়। তাঁহার রচিত দার্শনিক গ্রন্থ হইতে আমরা এই তিনটী তত্ত্ব প্রাপ্ত হই—

(১) সৎ বলিয়া কিছুই নাই।

(২) যদি সৎ বলিয়া কিছু থাকে তো তাহা অজ্ঞেয়।

(৩) যদি অজ্ঞেয়ও না হয়, তবে তাহা অব্যক্ত—ভাষা দ্বারা তাহার স্বরূপ প্রকাশ করা যায় না।

দেখা যায়, ইলিয়াটিক দার্শনিকগণের যুক্তি অবলম্বন করিয়া তিনি প্রথম তত্ত্বটী প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন।—তাঁহার যুক্তি প্রণালী কতকটা এইরূপ—যদি কিছু থাকে, তাহা হয় (১) অসৎ, (২) না হয় সৎ, (৩) না হয় দুইই।

(১) যাহা আছে, তাহা হইতে পারে না; কারণ, কোন পদার্থ একই কালে বর্ত্তমান ও অবর্ত্তমান থাকিতে পারে না। যদি বল অসৎ পদার্থ আছে, তাহা হইলে তাহার অস্তিত্ব-স্বীকার প্রয়োজন হইয়া পড়ে। কিন্তু সৎ পদার্থ ও অসৎ পদার্থ পরস্পর বিরুদ্ধ। অতএব অসৎ পদার্থের অস্তিত্ব-স্বীকার করিতে হইলে সৎ পদার্থের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে হয়; কিন্তু তাহা একেবারেই অসম্ভব। সুতরাং যাহা আছে, তাহাকে অসৎ বলা যায় না।

(২) এখন দেখা যাউক, যাহা আছে, তাহাকে সৎ পদার্থ বলা যায় কি না? সৎ পদার্থ যদি থাকে, তাহা হইলে (ক) হয় তাহার উৎপত্তি আছে, না হয় তাহা উৎপত্তিহীন. (খ) হয় তাহা এক, না হয় বহু।

(ক) যদি বল সৎ পদার্থ উৎপত্তিশূন্য, তাহা হইলে তাহার আদি নাই, সুতরাং তাহা অনন্ত। এখন দেখা যাউক, অনন্ত পদার্থ কোথাও আছে কি না। অনন্ত পদার্থ অন্য কোন পদার্থে থাকিতে পারে না; কারণ তাহা হইলে তাহার অনন্তত্ব লোপ পায়। অনন্ত পদার্থ আপনার মধ্যেও থাকিতে পারে না; কারণ, যাহা যাহার অভ্যন্তরে থাকে, তাহার সহিত তাহার পার্থক্য অবশ্যম্ভাবী; সুতরাং এখানেও অনন্তত্বের হানি হইযা পড়ে। ফলে দাঁড়াইল অনন্ত পদার্থ কোথাও বিদ্যমান নাই। কিন্তু যাহা কোথাও বিদ্যমান নাই, তাহার অস্তিত্বই নাই। সুতরাং যদি সৎ পদার্থকে উৎপত্তিহীন বলিযা স্বীকার কর, তবে তাহার অস্তিত্বই সিদ্ধ হয় না।

এখন দেখা যাউক, সৎ পদার্থকে উৎপন্ন বলিযা স্বীকার করিলে তাহার অস্তিত্ব সুসিদ্ধ হয় কি না। যদি সৎ পদার্থকে "উৎপন্ন বা জন্য" বল—তাহা হইলে বল দেখি, তাহা কোন্ পদার্থ হইতে উৎপন্ন হইল? তদুত্তরে তোমাকে বলিতেই হইবে, উহা হয় অন্য কোন সৎ পদার্থ হইতে না হয় অসৎ পদার্থ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। সৎ পদার্থ অন্য সৎ পদার্থ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, বলিতে পার না; কারণ, সতের পরিণাম নাই। আর সৎ হইতে সতের উৎপত্তির কোন অর্থই নাই। অসৎ পদার্থ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এ কথাও বলিতে পার না, কারণ, অসৎ পদার্থের অস্তিত্ব-কল্পনাই আকাশকুসুমবৎ অলীক ও অসম্ভব। সুতরাং সেই অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি হওয়া তদধিক অসম্ভব।*

* ইলিয়াটিক দর্শন দ্রষ্টব্য।

(খ) এখন দেখা যাউক, জর্জিয়াস্ কিরূপে, সৎ পদার্থ এক নয় বহুও নয়, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তিনি বলেন, যাহা এক তাহার কোন পরিমাণ থাকিতে পারে না। আবার যাহার পরিমাণ নাই, তাহা শূন্য বা কিছুই নহে। সুতরাং সৎ পদার্থ এক হইতে পারে না। যদি বল বহু, তাহা হইলে বল দেখি, বহু কি? একের সমষ্টিই ত বহু! মূলে যেখানে একই বিদ্যমান নাই, সেখানে বহু আছে, এ কথা বল কেমন করিয়া?

এই সঙ্গে আরও একটী তত্ত্ব গ্রহণ করা যাইতে পারে। যথা, পদার্থের গতি নাই। কারণ, গতি বলিতেই পরিবর্ত্তন বুঝায়, এবং ইলিয়াটিক দর্শন অনুসারে পরিবর্ত্তন অসৎ। এই সিদ্ধান্তও জর্জিয়াস মানিয়া লইয়াছেন; সুতরাং তাঁহার মতে গতিও অসম্ভব।

(৩) এখন, যদি কিছু আছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়, এবং তাহা যদি সৎ না হয় এবং অসৎও না হয়,তাহা হইলে উহা তদুভয়াত্মক বা সদসৎ একথা কেমন করিয়া হইবে? সুতরাং সিদ্ধান্ত হইল, সৎ বলিয়া কিছুই নাই। এইবার অপর দুইটী সিদ্ধান্তের যুক্তি আলোচনা করা যাউক্—

(২) যদি কিছু থাকে, তাহা অজ্ঞেয়। কারণ, যাহা আছে, ঠিক তাহাই যে আমরা চিন্তা দ্বারা গ্রহণ করি, তাহা নহে; আবার যে সকল বিষয় চিন্তা করি, সে সকলেরই যে অস্তিত্ব আছে, একথাও বলা যায় না। কারণ, তাহা হইলে যে যাহা কল্পনা করে তাহারই বাস্তবিক সত্তা স্বীকার করা প্রয়োজন হইয়া পড়ে এবং মিথ্যা বা ভ্রমের অস্তিত্ব একেবারে অসম্ভব হইয়া যায়। চিন্তা দ্বারা যাহা গ্রহণ করি, তাহা যদি সৎ বস্তু না হয়, তাহা হইলে সৎ বস্তু চিন্তারও বিষয় নয়; সুতরাং জ্ঞানেরও বিষয় নয়। অতএব সৎ বস্তু অজ্ঞেয়।

(৩) সৎ বস্তু অজ্ঞেয় না হইলেও অব্যক্ত। ভাষায় যাহা প্রকাশ করি, তাহা চিন্তা হইতে ভিন্ন। ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভিন্নপ্রকার প্রতীতি জন্মে। যথা, চক্ষু দ্বারা বর্ণজ্ঞান ইত্যাদি। অপরের মুখোচ্চারিত বাক্য শ্রবণে গ্রহণ করিয়া কেমন করিয়া সেই বর্ণজ্ঞান লাভ হইবে? আবার বক্তা যে ভাব প্রকাশ করিতেছে, শ্রোতা যে ঠিক তাহাই গ্রহণ করিতেছে, এ কথা কে বলিল? কারণ, বক্তার সম্পূর্ণ মনোভাব শ্রোতা কি কেবলমাত্র শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রহণ করিতে সমর্থ? তারপর একই বস্তু একই কালে বক্তা ও শ্রোতা উভয়ের মনোমধ্যে কেমন করিয়া বর্ত্তমান থাকিবে?

যদি ধরা যায়, একই বস্তুর একই কালে ভিন্ন ভিন্ন স্থলে এবং ভিন্ন ভিন্ন লোকে থাকা সম্ভব হয়, তাহা হইলেও দেশভেদে পাত্রভেদে সেই বস্তু কি ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হইবে না? আমরা উপরে জর্জিয়াসের দার্শনিক মত ব্যক্ত করিলাম। দার্শনিক মতের জন্য যত না হউক, অলঙ্কারশাস্ত্রে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তির জন্যই তিনি ইতিহাসে বিখ্যাত। অলঙ্কারশাস্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করিয়া ভাষার যথোচিত ব্যবহারে লোকের মনে কোন বিষয়ে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মাইয়া দেওয়া যায়। দেখা যায়, ঐরূপ ভাষার উপরেই তাঁহার যত কিছু যুক্তি নির্ভর করিতেছে। জর্জিয়াস পূর্ব্ববর্ত্তী দার্শনিকদিগের মতসমূহের মধ্যে স্ববিরোধ-দোষ প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহাদের অসত্যতা প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইতেন। কিন্তু ঐজন্য তিনি যে সকল যুক্তির অবতারণা করিতেন, তাহাতে বাক্‌চাতুর্য্যই প্রধান অবলম্বন বলিয়া স্পষ্ট লক্ষিত হয়।

জর্জিয়াসের মতানুসারে সকল বস্তুই অসৎ। আমরা দেখিয়াছি প্রোটাগোরাস্ অন্যপক্ষে বলিতেন সকল বস্তুই সৎ। কিন্তু ঐ দুই মত হইতেই "যথার্থ জ্ঞান মানুষের পক্ষে অসম্ভব"—এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে হয়। উহা হইবারই কথা; কারণ, উভয়ের মূলেই নাস্তিকতা (Scepticism) বর্ত্তমান।

এইবার প্রোডিকাস্ ও হিপায়াস্ নামক দুই সোফিষ্টের মতামত সম্বন্ধে ২।৪টী জ্ঞাতব্য বিষয় অতি সংক্ষেপে ব্যক্ত করিয়া আমরা প্রবন্ধের উপসংহার করি।

প্রোডিকাস্ (Prodicus)

প্রোডিকাস্ শব্দপ্রয়োগ-নৈপুণ্যে অসাধারণ দক্ষ ছিলেন এবং শব্দশাস্ত্রেই তাঁহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল। কোন্ শব্দটী কোথায় প্রয়োগ করিলে অতি পরিষ্কার রূপে অর্থবোধ হইবে, এ বিষয়ে তাঁহার সর্ব্বদা লক্ষ্য ছিল। বাস্তবিকও কোন্ শব্দের কি অর্থ, তাহা বিশেষরূপে জানা একান্ত আবশ্যক; নচেৎ অনেক স্থলে শব্দের অপপ্রয়োগ হইয়া পড়ে। ভাষার দ্বারাই ভাব প্রকাশ হয়। অতএব একমাত্র ভাষার দ্বারাই অপরের উপর নিজ মতামতের প্রভাব বিস্তার করিতে পারা যায়। সুতরাং ভাষার যথার্থ প্রয়োগ শিক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন। শুনা যায়, ঐ বিষয় শিক্ষা করিতে সক্রেটিস তাঁহার কোন কোন শিষ্যকে তাঁহার নিকটে প্রেরণ করিতেন। প্রোডিকাসের মতে মৃত্যুই এই জগতের দুঃখনিবারণের একমাত্র উপায়। তিনি বলিতেন, প্রাকৃতিক শক্তিসমূহকেই পূর্ব্ববর্ত্তী দার্শনিকেরা দেবতা করিয়া খাড়া করিয়াছেন। তিনি ইহার অযৌক্তিকতা প্রমাণ করিতেন।

হিপায়াস্ (Hippias)

হিপায়াস্ (Hippias) বহুশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত বলিয়া ইতিহাসে উল্লিখিত আছে। তিনি প্রোডিকাসের (Prodicus) সমসাময়িক ছিলেন। তিনি ভাষাপ্রয়োগে ছন্দের প্রতিই বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন। কিরূপ শব্দ প্রয়োগ করিলে ভাষা শ্রুতিমধুর হয়, এই বিষয়েই তাঁহার অসাধারণ জ্ঞান ছিল। অন্যান্য সোফিষ্টদিগের ন্যায় তিনিও দেশভ্রমণে ব্যাপৃত থাকিতেন। তিনি প্রাকৃতিক ঘটনা, মনুষ্যের রীতি নীতি এবং অসভ্যদের আচার ব্যবহার পর্য্যন্তও লক্ষ্য করিতেন। ঐ সকল লক্ষ্য করার ফলে তিনি এক অপূর্ব্ব সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া তৎপ্রচারে প্রবৃত্ত হন; যথা—আইনশাস্ত্র স্বেচ্ছাচারী প্রবল রাজার দ্বারাই প্রবর্ত্তিত; উহা সার্ব্বজনীন বা সার্ব্বভৌমিক শাস্ত্র নহে; কারণ, তাহা হইলে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম প্রচলিত কেন? তিনি আরও বলিতেন যে, যাহারা প্রাকৃতিক নিয়মের দ্বারা সম্বদ্ধ, তাহারা আইনের দ্বারা অনেক সময় বিচ্ছিন্ন হইয়াও পড়ে। কিন্তু এইরূপ মতাবলম্বী হইলেও, তিনি গ্রীসদেশে প্রচলিত আইনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন নাই। তিনি অঙ্কশাস্ত্র এবং জ্যোতিষশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন; প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সম্বন্ধেও তাঁহার মোটামুটী বেশ জ্ঞান ছিল।

উপসংহার।

সোফিষ্ট পণ্ডিতগণের উল্লেখকালে উপরিকথিত সোফিষ্টগণ ব্যতীত Polus পোলাস্, thrasymachus থ্রাসাইমেকাস্, Euthydemus ইউথিডিমাস্, Dionysodrorus ডায়োনি সোড্রোরাস্, Cretias ক্রিটিয়াস্, Antimoreus এন্টিমিরাস্ এবং Antiphen এ্যান্টিফনের নামও উল্লেখযোগ্য। পূর্ব্ববর্ত্তী সোফিষ্ট দর্শনে সংশয়বাদের যে বীজ অঙ্কুরাবস্থায় ছিল, পরবর্ত্তী এই সকল সোফিষ্টদিগের দর্শনে তাহারই পূর্ণ পরিণতি আমরা দেখিতে পাইয়া থাকি। কারণ, সংশয়বাদের প্রাদুর্ভাবে তত্ত্বচিন্তা বৃথা-পরিশ্রম বলিয়া ঘোষিত হইলে, জ্ঞানের মাহাত্ম্য লোপ পাইবেই পাইবে এবং সাংসারিক ও সামাজিক উন্নতিই মানবের নিকট সর্ব্বস্ব হইয়া দাঁড়াইয়া, তাহাকে কেবলমাত্র স্বার্থসাধনেই নিযুক্ত রাখিবে। সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে সত্য বলিয়া কোনও পদার্থ নাই, প্রত্যেক লোকের নিকট যাহা সত্য বলিয়া প্রতীয়মান, তাহাই তাহার একমাত্র অনুসরণীয়, যাহা তাহার নিকট ন্যায় বলিয়া বোধ হয়, তাহাই ন্যায়,—যখন এইরূপ মত প্রচারিত হয়, তখনই মানব নিজে যাহা সত্য

বুঝে, সুন্দর ভাষা প্রয়োগে অপরকে তাহা কৌশলে বুঝাইয়া স্বার্থসাধনের প্রয়াস পায়। ফলে, অলঙ্কারশাস্ত্র ও বাহ্যিক আড়ম্বরপূর্ণ বাক্‌চাতুর্য্যই তখন যথার্থ দার্শনিক চিন্তা ও যুক্তির স্থান অধিকার করিয়া বসে এবং নৈতিক বিধি নিয়মের মূল ভিত্তি একেবারে লোপ পাইয়া ধর্ম্মের নামগন্ধও আর সমাজে থাকে না। সত্য বটে, পূর্ব্ববর্ত্তী সোফিষ্টগণ এতদূর অগ্রসর হন নাই, সত্য বটে, তাঁহারা প্রচলিত রীতি নীতি প্রভৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহঘোষণা করেন নাই, কিন্তু তাঁহারা যে বীজ বপন করিয়াছিলেন, তাহার ফল অবশ্যম্ভাবী। তাই দেখি, পরবর্ত্তী সোফিষ্টগণ একেবারে সংশয়বাদের শেষ সীমায় উপনীত হইয়াছেন, স্বেচ্ছাচারিতা পূর্ণ মাত্রায় দেশে আধিপত্য করিতেছে এবং স্বার্থসাধনই ঐ সময়ে মানব-জীবনের সর্ব্বস্ব হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

মূকাম্বিকায় শঙ্কর।

[শ্রীমতী—]

আচার্য্য শঙ্কর গোকর্ণ তীর্থ দর্শন করিয়া মূকাম্বিকা * নামক তীর্থস্থানে সশিষ্যে উপস্থিত হইলেন। এই স্থানে পর্ব্বতশৃঙ্গোপরি "অম্বিকা দেবীর" মন্দির বিরাজিত। এই দেবী-সম্বন্ধে এখানে একটী প্রবাদ শুনা যায় যে, যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন মৌনব্রত ধারণ করিয়া অম্বিকা দেবীর প্রসাদ ভক্ষণ করে, সে ব্যক্তি মূক হইলেও দেবীর কৃপায় পণ্ডিত হয়। এইজন্য দেবীর নাম মৌনাম্বিকা বা মূকাম্বিকা। ইহা দক্ষিণ দেশে একটী অতি প্রসিদ্ধ তীর্থ। দেবীর নামানুযায়ী সহরটীও মূকাম্বিকা নামে খ্যাত।

আচার্য্যদেব সহরে প্রবেশ করিয়া অম্বিকা দেবীর শ্রীচরণ-দর্শন-মানসে মন্দির উদ্দেশে চলিলেন। তাঁহার পার্শ্বে পদ্মপাদ এবং পশ্চাতে গৃহী সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারি-ভেদে বহুসংখ্যক শিষ্য সঙ্গে যাইতে লাগিলেন। পথিক ও নাগরিকেরা একসঙ্গে এতগুলি সাধু সন্ন্যাসী দেখিয়া কৌতূহলী হইয়া তাঁহাদের দেখিতে লাগিল। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা অবাক্ হইয়া তাঁহাদের প্রতি চাহিয়া রহিল ; কেহ কেহ আবার সভয়ে চুপিচুপি সন্ন্যাসী-

* মূকাম্বিকা তীর্থ বর্ত্তমান মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত মহীশূর রাজ্যের উত্তর প্রান্তে অবস্থিত।

দের পিছনে পিছনে যাইতে লাগিল। কতকগুলি নিষ্কর্ম্মা লোকও সাধুগণের সঙ্গ লইল।

এইরূপে কিছু দূর গমন করিয়া আচার্য্য সহসা চমকিত হইয়া দাঁড়াইলেন। দূরে রমণীর করুণ কণ্ঠধ্বনি!—তিনি কিছু ক্ষণ উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিলেন। সেই রোদনধ্বনি তাঁহার হৃদয়কে কাতর করিয়া তুলিল। আচার্য্যের পরদুঃখকাতর হৃদয় বিচলিত হইল।

আচার্য্যকে দাঁড়াইতে দেখিয়া শিষ্যবর্গও দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি এক্ষণে পদ্মপাদকে কহিলেন "বৎস পদ্মপাদ! দেখ ত কে কোথায় এরূপে কাঁদিতেছে।"

পদ্মপাদ তখনই রোদনের শব্দ লক্ষ্য করিয়া সেই দিকে যাইলেন। আচার্য্য দাঁড়াইয়া রহিলেন।

কিছু ক্ষণ গত হইল, তথাচ পদ্মপাদ ফিরিলেন না। তাঁহার বিলম্ব দেখিয়া আচার্য্যদেব নিজেই সেই দিকে চলিলেন। শিষ্যসমূহ তাহা দেখিযা ব্যস্ত হইয়া তাঁহার অনুসরণ কবিতে উদ্যত হইলে, তিনি ইঙ্গিতে তাঁহাদিগকে তথায় অপেক্ষা করিতে বলিলেন। সুতরাং গুরুদেবের আদেশে তাঁহারা নিকটস্থ এক বৃক্ষমূলে বসিয়া তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

এদিকে আচার্য্য কিছু দূর যাইতে না যাইতে পথিমধ্যে পদ্মপাদের সহিত দেখা হইল। পদ্মপাদ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া দুঃখিতভাবে কহিলেন "ভগবন্! এই রোদনধ্বনি শ্মশানভূমি হইতে আসিতেছে—নিকটেই শ্মশান। উহা পুত্রহারা জননীর বিলাপ-ধ্বনি।"

তাঁহার কথা শুনিয়া আচার্য্যদেব কহিলেন "চল বৎস! আমি তথায় গমন করিব।" পদ্মপাদ তখন আচার্য্যদেবকে লইয়া শ্মশানাভিমুখে গমন করিলেন।

শ্মশানে আসিয়া আচার্য্য দেখিলেন, একটী রমণী উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে কখন ললাটে ও বক্ষে করাঘাত করিতেছে, কখন বা উন্মত্তের ন্যায় ভূমিতলে মস্তক লুণ্ঠিত করিতেছে। নিকটে এক সুকুমার শিশু মৃত পতিত রহিযাছে! রমণী কখন কখন এই শিশুকে বক্ষে লইয়া তাহার কোমল মুখে চুম্বন দানও করিতেছে। পার্শ্বে এক পুরুষ গালে হাত দিয়া বসিয়া আছে। তাহার চক্ষে জল নাই, শরীরে কোনরূপ চাঞ্চল্য নাই; হৃদয়ের গভীর বেদনায় সে যেন স্তম্ভিত। তাহার শুষ্ক কালিমা-মাখা মুখ দেখিলে

মনে হয়, অসীম শোকাবেগের সহিত সংগ্রাম করিয়া একেবারে অবসন্ন হইলেও, পুনরায় প্রকৃতিস্থ হইবার জন্য সে যেন এক একবার প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে!

আচার্য্য এই দারুণ দৃশ্য দর্শনে চক্ষু মুদিত করিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। যাঁহার হৃদয় মেরুর ন্যায় অচল ও নিবাত নিষ্কম্প সমুদ্রের ন্যায় নিস্তরঙ্গ, যাঁহার অন্তঃকরণ সদা আত্মাতেই অবস্থিত, যিনি সর্ব্বভূতে আত্মা এবং আত্মাতেই সর্ব্বভূত দর্শন করিয়া শোকমোহপরিশূন্য হইয়াছেন, তিনিও আজ নিমেষের তরে মোহিত!—ধন্য বাৎসল্য স্নেহ!—এবং ধন্য ব্রহ্মাণ্ড-জয়ী কাল! তোমরা শঙ্কররূপী আচার্য্য শঙ্করকেও বিচলিত করিলে; তোমা-দের অসাধ্য আর কি আছে!

আচার্য্যের করুণাপূর্ণ শান্ত মূর্ত্তি অকস্মাৎ সম্মুখে দেখিয়া ঐ হতভাগ্য নরনারীর হৃদয়ে কি কোন অভূতপূর্ব্ব অনির্দ্দেশ্য ভাবের উদয় হইল?—কে বলিবে! সেই অস্পষ্ট ভাবের মধ্য হইতে তাহারা কি কোন আশার আলোক পরিস্ফুট হইতে দেখিতে পাইতেছিল? কে বলিবে!

কিন্তু শ্মশানে, মৃত্যু-সম্মুখে, শোকসন্তপ্ত পিতামাতার হৃদয়ে কোন আশার উদয় কখন কি সম্ভবে? সহসা রমণী উন্মাদিনীর ন্যায় মৃত শিশুটীকে লইয়া আচার্য্যের পাদপদ্মে ফেলিয়া দিল, এবং রোদন করিতে করিতে গদ্গদ বাক্যে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল—"ঠাকুর রক্ষা কর, দুখিনীর অঞ্চলের নিধিকে রক্ষা কর, আমি বড় দুখিনী, প্রভু! এই শিশুই আমার সর্ব্বস্ব, তুমি ইহাকে রক্ষা কর।" বলিতে বলিতে সেই শোকাতুরা রমণী আচার্য্যের পাদপদ্ম দুই হস্তে জড়াইয়া ধরিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার স্বামীও আচার্য্য-চরণে পতিত হইল।

আচার্য্য এই প্রাণস্পর্শী দৃশ্যে ব্যথিত হইলেন। তিনি হস্ত দ্বারা সসম্ভ্রমে তাহাদিগকে উঠাইয়া রমণীকে কহিলেন "মা, স্থির হউন, ভগবান্‌কে ডাকুন, তাঁহার ইচ্ছা হইলে আপনার সন্তান এখনও রক্ষা পাইবে।"

পদ্মপাদ আচার্য্যের কথা শুনিয়া চিন্তিত!—ভাবিলেন, গুরুদেব এ কি অসম্ভব কথা বলিতেছেন—এ অঘটন সঙ্ঘটন কখন কি হইতে পারে? জীবের দুঃখ তিনি কখনও সহিতে পারেন না, পরদুঃখ মোচনের জন্যই সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া তিনি সন্ন্যাসী। কিন্তু এই দম্পতির প্রার্থনা কাহারও পূর্ণ করা কি সম্ভবে? ভাবিয়া চিন্তিয়া পদ্মপাদ আচার্য্যের মুখের দিকে চাহিয়া

দেখিলেন, তাঁহার আননে কোনও উদ্বেগ নাই! তিনি সর্ব্বদা যেমন, তেমনি স্থির ধীর, এবং তাঁহার মুখে গাম্ভীর্য্য, দৃঢ়তা, একাগ্রতা ও গভীর শান্তি বিরাজিত! অন্তরের ভক্তি-বিশ্বাস যেন তাঁহার পবিত্র বদন ও সর্ব্ব শরীরে প্রতিভাত হইতেছে! আবার, মণ্ডনকে পরাজয় করিবার কালে অমরকরাজ-প্রসঙ্গের কথা পদ্মপাদের স্মরণ-পথে উদিত হইল। পদ্মপাদ ভীত হইয়া ভাবিলেন, আবার বুঝি তদ্রূপ কিছু ঘটিয়া যায়! সুতরাং গুরুদেবের নিশ্চল মূর্ত্তি দেখিয়া তিনি বিচলিত হইয়া পড়িলেন।

আচার্য্য এদিকে নিমীলিত নেত্রে মনপ্রাণ একাগ্র করিয়া অন্তরের অন্তস্থল হইতে প্রাণময়ের নিকট শিশুর প্রাণ ভিক্ষা করিতেছেন। সংসারের কোন বস্তু লাভ করিবার জন্য যাঁহার মনে কখনও বাসনার উদয় হয় নাই, সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যাঁহার নিকট একমাত্র ওঁকারে পর্য্যবসিত, তিনি আজ কাতরে ভগবচ্চরণে জীবের জীবন ভিক্ষা করিতেছেন! পরদুঃখ মোচনের জন্য ভগবানের দয়া ভিক্ষা করিতেছেন! ভক্তিপূর্ণ স্বার্থগন্ধহীন সে আকুল আহ্বান, জীবের ব্যথায় ব্যথিত হইয়া সর্ব্বসংহারক কালের বিরুদ্ধে সাহসে দণ্ডায়মান প্রাণের সে গভীর উচ্ছ্বাস কি নিষ্ফল হইবে?

কতক্ষণ পরে আচার্য্যদেব ধীরে ধীরে চক্ষু উন্মীলন করিলেন এবং নত হইয়া অতি ধীরে শিশুর মস্তকে হস্ত স্থাপন করিলেন! সেই পদ্মহস্তের স্পর্শ-মাত্র—কি আশ্চর্য্য!—শিশু যেন নিদ্রোত্থিতের ন্যায় চমকিত হইয়া চক্ষু চাহিল!

শিশুকে চক্ষু চাহিতে দেখিয়া তাহার জনক-জননী বিস্ময়ে বিহ্বল হইয়া প্রত্যক্ষ বিষয়েও কিছু ক্ষণ বিশ্বাস করিতে পারিল না; কিয়ৎক্ষণ বিমূঢ়ের ন্যায় বসিয়া রহিল এবং উদাস দৃষ্টিতে কখন আচার্য্যের আনন, কখন পদ্ম-পাদের বদন, আবার কখন বা সেই জীবিত শিশুর সুকুমার মুখখানি দেখিতেই থাকিল!

এদিকে শিশুও জীবিত হইয়া মাতার ক্রোড়ে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইল, এবং ভাবাবেশে অবশ মাতা কোলে লইতেছে না দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে থাকিল! ক্রমে তাহার সেই ক্রন্দন শুনিতে শুনিতে জনক-জননীর সে বিহ্বল ভাব দূর হইল। রমণী তখন পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া আবেগে বক্ষে চাপিয়া ধরিল এবং তাহার চাঁদমুখে শত শত চুম্বন করিতে লাগিল। মাতার সোহাগে শিশুও তখন রোদন ভুলিয়া হাসির লহর তুলিল এবং

প্রাণাধিক প্রিয়তম পুত্রের স্পর্শসুখে জননীর নয়নেও হর্ষাবেগে শতধারা প্রবাহিত হইল। আর, শিশুর সেই পিতা—গভীর পুত্রশোকে যাহার নয়ন এতকাল শুষ্ক ছিল,—সেও এক্ষণে আনন্দের আতিশয্যে বাষ্পগদ্গদকণ্ঠে উন্মত্তের ন্যায় কত কি প্রলাপ বকিতে থাকিল। আচার্য্য এই দৃশ্য দেখিয়া ভাবে প্রেমে পূর্ণ হইয়া মনে মনে ভাবিলেন "ভগবন্! তোমার এ কি অপূর্ব্ব লীলা দেখাইলে প্রভু! তুমি চোর হ'য়ে চুরি কর, আবার রাজা হ'য়ে সাজা দাও! তুমি সর্প হ'য়ে দংশন কর, আবার রোজা হ'য়ে বিষমুক্ত কর! দয়াময়! সকলই তোমার লীলা—শরীরী আমরা, সকলেই কেবল নিমিত্ত মাত্র!"

এইবার আনন্দের আবেগ কিঞ্চিৎ সংযত করিয়া শিশুর পিতামাতা, আচার্য্যদেবকে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাইতে অগ্রসর হইল। কিন্তু বাক্য অপেক্ষা নয়নই তাহাদিগকে ঐ কার্য্যে অধিক সহায়তা করিল। শিশুটীকে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে স্থাপন করিয়া তাহারা কৃতাঞ্জলিপুটে নির্ব্বাক্ নিস্তব্ধ হইয়া তাঁহাকে কেবল দেখিতেই থাকিল! কিন্তু সে দৃষ্টিতে অন্তরের যে শ্রদ্ধা ভক্তি, যে গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশিত হইল, কে তাহা বর্ণনে সক্ষম?

আচার্য্যদেব তাহাদের মনোভাব বুঝিতে পারিলেন এবং আশীর্ব্বাদ করিলেন।

অনন্তর তাহাদের হৃদয়ের আবেগ কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে তিনি তাহাদিগকে ধর্ম্মকর্ম্ম সম্বন্ধে কয়েকটী উপদেশ দিলেন। তাহারাও সেই দিন হইতে সর্ব্বতোভাবে তাঁহার চরণ আশ্রয় করিল।

পদ্মপাদ নিস্পন্দভাবে এতক্ষণ এই সকল ঘটনা দেখিয়া শিবাবতার শঙ্করমূর্ত্তি গুরুদেবকে ভক্তিপূর্ণ অন্তরে কোটি কোটি প্রণাম করিতে লাগিলেন এবং উচ্চকণ্ঠে "জয় শঙ্করাচার্য্যের জয়" বলিয়া আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সেই নরনারীও মহানন্দে আচার্য্যের জয়ধ্বনি করিতে লাগিল।

তখন তাহাদের সেই আনন্দধ্বনি কিয়দ্দূরে অবস্থিত শিষ্যমণ্ডলীর কর্ণগোচর হইল এবং তাঁহারা পদ্মপাদের এই সহসা আনন্দের কারণ নিরূপণ করিতে শ্মশানক্ষেত্রে আগমন করিলেন।

তথায় ঘটনা বুঝিতে তাঁহাদের আর বিলম্ব হইল না এবং সকলেই সমস্বরে আচার্য্যের জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন।

অনন্তর শত শত লোকের উচ্চকণ্ঠ ক্রমে নগরবাসীদের কর্ণে প্রবেশ করিল এবং ঘটনা কি, জানিবার জন্য অনেকেই তথায় উপস্থিত হইল। অনতিবিলম্বে "মৃতের জীবন রক্ষা"র কথা ঘরে ঘরে প্রচারিত হইল এবং সহরের লোকে শ্মশানক্ষেত্র পরিপূর্ণ হইল। সকলেই তখন সাগ্রহে সেই মৃত শিশুকে এবং আচার্য্যদেবকে দেখিতে লাগিল। যাহারা ইতিপূর্ব্বে শিশুর মৃতদেহ স্বচক্ষে দেখিয়াছিল বা মৃত্যুর কথা শুনিয়াছিল, এক্ষণে রমণীর ক্রোড়ে শিশুকে জীবিত দেখিয়া বিস্ময়ে তাহাদের আর বাক্য স্ফুরণ হইল না। শিশুর পিতামাতাও তখন আচার্য্যের প্রতি অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়া তাঁহার অলৌকিক শক্তি এবং অসীম দয়ার কথা পুনঃ পুনঃ সকলকে বলিতে লাগিল এবং সকলেই আচার্য্যদেবের শ্রীচরণ স্পর্শ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল।

অনন্তর সেই জনতা ভেদ করিয়া আচার্য্যদেব তথা হইতে বহির্গত হইলেন এবং রাজপথে আসিয়া পুনরায় অম্বিকাদেবীর মন্দির অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। উপস্থিত নরনারীগণও কলরব করিতে করিতে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে তথায় যাইতে লাগিল।

মন্দিরে উপস্থিত হইয়া আচার্য্য স্নানাদি করিয়া বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিলেন এবং দেবীর গৃহে প্রবেশ করিয়া ষোড়শোপচারে অম্বিকাদেবীর পূজা করিলেন, ও পূজান্তে নিম্নে প্রদত্ত সুললিত স্তোত্রটী পাঠ করিয়া দেবীর চরণে প্রণিপাত করিলেন।

অম্বাষ্টকম্।

চেটী ভবন্নিখিলখেটী কদম্বতরু বাটীষু নাকি পটলী
কোটীরচারুতর কোটী মণীকিরণ কোটী করম্বিত পদা।
পাটীরগন্ধকুচশাটী কবিত্বপরিপাটী মগাধিপসুতা ঘোটী
কুলাদধিকধাটী মুদার মুখ বীটীরসেন তনুতাম্॥ ১ ॥
কুলাতিগামিভয়তুলা বলিজ্বলনকীলা নিজস্তুতিবিধা
কোলাহলক্ষপিতকালামরী কুশলকীলালপোষণ নভাঃ।
স্থূলা কুচে জলদনীলা কচে কলিতলীলা কদম্ব বিপিনে
শূলায়ুধ প্রণতিশীলা বিভাতু হৃদি শৈলাধিরাজতনয়া॥ ২ ॥
যত্রাশযো লগতি তত্রাগজা বসতু কুত্রাপি নিস্তলশুকা
সুত্রামকালমুখ সত্রাশন প্রকরসুত্রাণ কারিচরণা।

ছত্রানিলাতিরয় পত্রাভিরাম গুণমিত্রামরীসমবধূঃ
কুত্রাসহন্মণি বিচিত্রাকৃতিঃ স্ফুরিত পুত্রাদিদাননিপুণা ॥ ৩ ॥
দ্বৈপায়ন প্রভৃতি শাপায়ুধ ত্রিদিবসোপান ধূলিচরণা
পাপাপহস্ব মনুজাপানুলীন জনতাপাপনোদননিপুণা।
নীপালয়া সুরভিধূপালকা দুরিতকূপাদ্‌ দধ্বয়তু মাং
রূপাধিকা শিখরিভূপালবংশমণি দীপায়িতা ভগবতী ॥ ৪ ॥
বালীভিরাত্মতনুতালী সকৃৎপ্রিয় কপালীষু খেলতি ভয-
ব্যালী নকুল্যসিত চুলীভরা চরণধূলীলসন্মুনিবরা
বালীভৃতি শ্রবসি তালীদলং বহতি যালীক শোভিতিলকা
মালী করোতু মম কালী মনঃ স্বপদ নালীক সেবনবিধৌ ॥ ৫ ॥
ন্যঙ্কাকরে বপুষি কঙ্কাদিরক্তপুষি কঙ্কাদিপক্ষিবিষয়ে
ত্বং কামনাময়সি কিং কারণং হৃদয়পঙ্কারিমেহি গিরিজাম্।
শঙ্কাশিলা নিশিতটঙ্কায় মানপদসঙ্কাশমানসমুনো
ঝংকারি মানততিমঙ্কানুপেত শশি সঙ্কাশি বক্ত্র কমলাম্ ॥ ৬ ॥
কুম্বাবতীসমাবিভবা গলেন নবতুম্বাভবীণ সবিধা শাং
বাহুলেয় শশিবিম্বাভিরামমুখ সম্বাধিতস্তনভবা।
অম্বাকুরঙ্গমদজম্বালবোচিরিহ লম্বালকা দিশতু মে
বিম্বাধরা বিনতশম্বায়ুধাদিনকুরম্বা কদম্ব বিপিনে ॥ ৭ ॥
ইন্ধানকীরমণিবন্ধা ভবে হৃদয়বন্ধাবতীব রসিকা সন্ধ্যা-
বতীভুবন সন্ধারণেহপ্যমৃত সিন্ধাবুদারনিলয়া।
গন্ধানুভান মুহুরন্ধালিবীতকচবন্ধা সমর্পয়তু মে
শন্ধাম ভানুমপি সন্ধানমাশুপদ সন্ধানমপ্যগমুতা ॥ ৮ ॥

পদ্মপাদ প্রভৃতিও যথারীতি মায়ের পূজা অর্চ্চনা করিলেন।

আচার্য্য তথায় তিন চারি দিন বাস করিলেন, এবং উপদেশাদি প্রদান করিয়া মূকাম্বিকা-বাসীর আনন্দ বর্দ্ধন করিলেন। তাঁহার অলৌকিক-শক্তি-প্রভাবে ও অমিয় উপদেশে নগরে অদ্বৈতমত স্থাপিত হইল। অতঃপর তিনি শিষ্য-সহ 'শ্রীবলি' অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

ভারতের জীবনব্রত।

(সাণ্ডে টাইম্‌স্‌, লণ্ডন, ১৮৯৬)।

ইংলণ্ডবাসীরা যে ভারতের "প্রবাল উপকূলে*" ধর্ম্মপ্রচারক প্রেরণ করিয়া থাকেন, তাহা ইংলণ্ডের জনসাধারণ বিলক্ষণ অবগত আছেন। বাস্তবিক, "সমগ্র জগতে গিয়া সুসমাচার বিস্তার কর," যীশুখ্রীষ্টের এই আদেশ তাঁহারা এরূপ পূর্ণভাবে প্রতিপালন করিয়া থাকেন যে, ইংলণ্ডীয় প্রধান প্রধান ধর্ম্মসম্প্রদায়গুলির মধ্যে কোনটীই খ্রীষ্টের উপদেশবিস্তারের এই আহ্বানানুযায়ী কার্য্য করিতে পশ্চাৎপদ নহেন। কিন্তু ভারতও যে ইংলণ্ডে ধর্ম্মপ্রচারক পাঠাইয়া থাকেন, এ বিষয় ইংলণ্ডের জনসাধারণ বড় একটা জানেন না।

সেণ্ট জর্জ্জের রোড সাউথ ওয়েষ্টে ৬৩ নং ভবনে স্বামী বিবেকানন্দ অল্প-কালের জন্য বাস করিতেছেন। দৈবযোগে (যদি 'দৈব' এই শব্দটী প্রয়োগ করিতে কেহ আপত্তি না করেন) তথায় স্বামী বিবেকানন্দের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি কি কার্য্য করিতেছেন এবং ইংলণ্ডে আসিবার তাঁহার উদ্দেশ্যই বা কি, এই সকল বিষয়ে কথাবার্ত্তা কহিতে তাঁহার কোনরূপ আপত্তি না থাকায় ঐ স্থানে আসিয়া আমি তাঁহার সহিত ঐ বিষয়ে কথা-বার্ত্তা আরম্ভ করিলাম। তিনি যে আমার অনুরোধ রক্ষা করিয়া আমার সহিত ঐ ভাবে কথোপকথনে সম্মত হইয়াছেন, তাহাতে আমি প্রথমেই বিস্ময় প্রকাশ করিলাম। তিনি বলিলেন,—

"আমেরিকায় বাস করিবার কাল হইতেই এইরূপে সংবাদপত্রের তরফ হইতে সাক্ষাৎ করিতে উপস্থিত ব্যক্তিদিগের সহিত সাক্ষাৎ করা আমার সম্পূর্ণ অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। আমার দেশে ঐরূপ প্রথা নাই বলিয়াই যে আমি, সর্ব্বসাধারণকে যাহা জানাইতে ইচ্ছা করি, তাহা জানাইবার জন্য

* Coral strands —প্রাচীনকালে যখন পাশ্চাত্য জগতের ভারতের সহিত সবিশেষ পরিচয় ছিল না, তখন তাহারা ভারতের সমুদ্রতীরে যথেষ্ট প্রবাল পাওয়া যায়, উহার এই পরিচয়ই উত্তমরূপে জানিত। এই বাক্য সেই ধারণা হইতেই প্রচলিত হইয়াছে।

ভারতেতর দেশে যাইয়া, তথাকার প্রচারের প্রচলিত প্রথাগুলি অবলম্বন করিব না, ইহা কখন যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার চিকাগো সহরে যে 'সমগ্র পৃথিবীর ধর্ম্মমহাসভা' বসিয়াছিল, তাহাতে আমি হিন্দুধর্ম্মের প্রতিনিধি ছিলাম। মহীশূরের রাজা এবং অপর কয়েকটী বন্ধু আমায় তথায় পাঠাইয়াছিলেন। আমার বোধ হয়, আমি আমেরিকায় কিয়ৎপরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছি বলিয়া দাবী করিতে পারি। চিকাগো ব্যতীত আমেরিকার অন্যান্য বড় বড সহরে আমি বহুবার নিমন্ত্রিত হইয়াছি। আমি দীর্ঘকাল ধরিয়া আমেরিকায় বাস করিতেছি। গত বৎসর গ্রীষ্মকালে একবার ইংলণ্ডে আসিয়াছিলাম, এ বৎসরও দেখিতেছেন—আসিয়াছি; ইহা ব্যতীত সেই অবধিই—প্রায় তিন বৎসর—আমেরিকায় রহিয়াছি। আমার বিবেচনায় আমেরিকার সভ্যতা খুব উচ্চ ধরণের। আমি দেখিলাম, মার্কিন-জাতির চিত্ত সহজেই নূতন নূতন ভাব ধারণা করিতে পারে। কোন জিনিষ নূতন বলিয়াই পরিত্যাগ করে না। উহার বাস্তবিক কোন গুণাগুণ আছে কি না, অগ্রে পরীক্ষা করিয়া দেখে—তার পর উহা গ্রাহ্য কি ত্যাজ্য, তাহা বিচার করে।"

"ইংলণ্ডের লোকেরা অন্যপ্রকার,—ইহাই বুঝি আপনার বলিবার উদ্দেশ্য?"

"হাঁ, ইংলণ্ডের সভ্যতা আমেরিকা হইতে পুরাতন—শতাব্দীর পর শতাব্দী যেমন চলিয়াছে, তেমনই উহাতে নানা নূতন বিষয় সংযোজিত হইয়া উহার বিকাশ হইয়াছে। ঐরূপে অনেকগুলি কুসংস্কারও আসিয়া জুটিয়াছে। সেগুলিকে ভাঙ্গিতে হইবে। কিন্তু এখন যে কোন ব্যক্তি আপনাদের ভিতর কোন নূতন ভাব প্রচার করিতে চেষ্টা করিবে, তাহাকেই ঐগুলির দিকে বিশেষরূপে দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে হইবে।"

"লোকে এইরূপ বলে বটে। আমি যতদূর জানিয়াছি, তাহাতে আপনি আমেরিকায় অন্যান্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ন্যায় কোন নূতন ধর্ম্মমত প্রতিষ্ঠা করিয়া আসেন নাই।"

"এ কথা সত্য। সম্প্রদায়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করা আমাদের ভাবের বিরুদ্ধ, কারণ, সম্প্রদায় ত যথেষ্টই রহিয়াছে। আর সম্প্রদায় করিতে গেলে উহার তত্ত্ববিধানের জন্য লোকের প্রয়োজন। এক্ষণে ভাবিয়া দেখুন, যাহারা

সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছে, অর্থাৎ সাংসারিক পদমর্য্যাদা, বিষয়সম্পত্তি, নাম প্রভৃতি সব ছাড়িয়াছে এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞানান্বেষণই জীবনের উদ্দেশ্য করিয়াছে, তাহারা এরূপ কার্য্যের ভার লইতে পারে না। বিশেষতঃ ঐরূপ কার্য্য যখন অপরের দ্বারা চলিতেছে, তখন আবার ঐ ভাবে কার্য্যে অগ্রসর হওয়া নিষ্প্রয়োজন।"

"আপনার শিক্ষা কি ধর্ম্মসমূহের তুলনায় সমালোচন ?"

"সকল প্রকার ধর্ম্মের সারভাগ শিক্ষা দেওয়া বলিলে বরং মৎপ্রদত্ত শিক্ষা-সম্বন্ধে একটা স্পষ্টতর ধারণা হইতে পারে। ধর্ম্মসমূহের গৌণ অঙ্গ-গুলি বাদ দিয়া উহাদের মধ্যে যেটা মুখ্য, যেটা উহাদের মূল ভিত্তি, সেইটার দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করাই আমার কার্য্য। আমি রামকৃষ্ণ পরমহংসের একজন শিষ্য—তিনি একজন সিদ্ধ সন্ন্যাসী ছিলেন, তাঁহার জীবন ও উপদেশ আমার উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। এই সন্ন্যাসিশ্রেষ্ঠ কোনও ধর্ম্মকে কখন সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখিতেন না; তাহাদের ভিতর এই এই ভাব ঠিক নয়, একথা তিনি বলিতেন না। তিনি উহাদের ভালর দিক্‌টাই দেখাইয়া দিতেন। দেখাইতেন, কিরূপে উহাদের অনুষ্ঠান করিয়া উহাদের উপদিষ্ট ভাবগুলিকে আমরা আমাদের জীবনে পরিণত করিতে পারি। কোন ধর্ম্মের সহিত বিরোধ করা, বা তাহার বিপরীত পক্ষ আশ্রয় করা—তাঁহার শিক্ষার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ; কারণ, তাঁহার উপদেশের মূল সত্যই এই যে, সমগ্র জগৎ প্রেমবলে পরিচালিত। আপ-নারা জানেন, হিন্দুধর্ম্ম কখন অপরধর্ম্মাবলম্বীদের উপর অত্যাচার করে নাই। আমাদের দেশে সকল সম্প্রদায়ই শান্তি ও প্রেমের সহিত বাস করিতে পারে। মুসলমানদের সঙ্গে সঙ্গেই ভারতে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় মতামত লইয়া হত্যা অত্যাচার প্রভৃতি প্রবেশ করিয়াছে, কিন্তু তাহাদের আসিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভারতে আধ্যাত্মিক রাজ্যে শান্তি বিরাজিত ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখুন, জৈনগণ যাহারা ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী এবং ঐরূপ বিশ্বাসকে ভ্রান্তি বলিয়া প্রচার করে—তাহাদেরও ইচ্ছামত ধর্ম্মানুষ্ঠানে কেহ কোনও দিন ব্যাঘাত করে নাই; আজ পর্য্যন্তও তাহারা ভারতে রহিয়াছে। ভারতই ঐ বিষয়ে শান্তি ও মার্দ্দবরূপ যথার্থ বীর্য্যের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। যুদ্ধ, অসমসাহসিকতা, প্রচণ্ড আঘাতের শক্তি—এগুলি ধর্ম্মজগতে দুর্ব্বলতার চিহ্ন।"

"আপনার কথাগুলি টলষ্টয়ের * মতের মত লাগিতেছে। ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে এই মত অনুসরণীয় হইতে পারে—সে পক্ষেও আমার নিজের সন্দেহ আছে—কিন্তু সমগ্র জাতির ঐ নিয়মে বা আদর্শে চলা কিরূপে সম্ভবে?"

"জাতির পক্ষেও ঐ মত অতি উত্তমরূপে কার্য্যকরী হইবে। দেখা যায়, ভারতের কর্ম্মফল, ভারতের অদৃষ্ট অপর জাতি সমূহ কর্ত্তৃক বিজিত হওয়া, কিন্তু আবার সময়ে ঐ সকল বিজেতাদিগকে ধর্ম্মবলে জয় করা। ভারত তাহার মুসলমান বিজেতৃগণকে ইতিমধ্যেই জয় করিয়াছে। শিক্ষিত মুসলমানগণ সকলেই সুফি †—তাহাদিগকে হিন্দু হইতে পৃথক্ করিবার

---

* Count Leo Tolstoi —ইনি একজন রুশিয়াদেশবাসী প্রসিদ্ধ পরহিতব্রত চিন্তাশীল লেখক ও সংস্কারক। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে রুশিয়ার মস্কো সহরের ১৩০ মাইল দক্ষিণ ভাগে অবস্থিত এক গ্রামে ইঁহার জন্ম হয় এবং ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার দেহত্যাগ হইয়াছে। প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া ইনি সমগ্র মানবজাতির উপর নিজ নিঃস্বার্থ জীবনের প্রভাব বিস্তার করিয়া গিয়াছেন। দরিদ্র ব্যক্তিগণের উপর তাঁহার সহানুভূতি যে বাস্তবিক আন্তরিক ছিল, ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। ঐ সময় তিনি তাঁহার জমিদারীর অন্তর্গত সমুদয় দাসগণকে মুক্তিপ্রদান করেন এবং কৃষকদিগের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া স্বয়ং তাহাদিগকে অঙ্কন ও সঙ্গীতবিদ্যা এবং বাইবেলের ইতিহাস শিক্ষা দিতে থাকেন। 'অনিষ্টকারীর প্রতি অত্যাচরণ না করিয়া তাহার প্রতি সদ্ব্যবহার কর,' যীশু খ্রীষ্টের এই মহান্ উপদেশ তিনি নিজ জীবনে কার্য্যে পরিণত করিয়াছিলেন এবং তাঁহার গ্রন্থসমূহে এই তত্ত্বের পুনঃপুনঃ প্রচার করিয়া গিয়াছেন। সমগ্র জগতে যুদ্ধ-বিগ্রহ স্থগিত হইয়া যাহাতে সর্ব্বত্র শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, ইহাই তাঁহার জীবনের এক প্রধান লক্ষ্য ছিল। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, তাঁহার সমুদয় সম্পত্তি দরিদ্রগণকে দান করেন, কিন্তু তাঁহার পরিবারবর্গ তাঁহার ঐ সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিতে দেয় নাই। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তাঁহার সমুদয় সম্পত্তি তাঁহার পুত্রকলত্রের হস্তে অর্পণ করিয়া স্বয়ং কৃষকের পরিচ্ছদে অতি সামান্য ভাবে জীবনযাপন করিতে থাকেন। শেষ অবস্থায় তিনি সম্পূর্ণরূপে সংসারের সহিত সকল সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসীর ভাবে বহির্গত হন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল—জীবনের শেষভাগ নির্জ্জনে যথার্থ খ্রীষ্টিয়ানের ন্যায় যাপন করিবেন। গৃহ হইতে বহুদূরবর্ত্তী একটী মঠে কিয়ৎকাল যাপনের পর তিনি আরো অধিক নির্জ্জন স্থানে বাসের জন্য যাত্রা করেন। কিন্তু পথিমধ্যে পথের দারুণ ক্লেশে কোন অপরিচিত রেলওয়ে ষ্টেশনে প্রবল জ্বর ও কফরোগে আক্রান্ত হন। পরিশেষে এই রোগেই তাঁহার দেহত্যাগ হয়। আধুনিক বিলাসিতাপূর্ণ যুগে তিনি যে একজন অনিকল্প ব্যক্তি ছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যথার্থ অহিংসাধর্ম্মের মর্ম্ম তিনিই উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

† ৮২০ খ্রীষ্টাব্দে আবু সৈয়দ আবুলচের প্রতিষ্ঠিত মুসলমান সম্প্রদায় বিশেষ। এই

উপায় নাই। হিন্দু ভাব তাহাদের সভ্যতার হাড়ে হাড়ে বিঁধিয়া গিয়াছে—তাহারা ভারতের নিকট শিক্ষার্থীর ভাব ধারণ করিয়াছে। মোগল সম্রাট্ মহাত্মা আকবর কার্য্যতঃ একজন হিন্দু ছিলেন। আবার ইংলণ্ডের পালা আসিলে তাহাকেও ভারত জয় করিবে। আজ ইংলণ্ডের হস্তে তরবারি রহিয়াছে, কিন্তু ভাব-জগতে উহার উপযোগিতা ত নাইই, বরং উহাতে অপকারই হইয়া থাকে। আপনি জানেন, শোপেনহাউয়ার * ভারতীয় ভাব ও চিন্তা সম্বন্ধে কি বলিয়াছিলেন। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে, অন্ধকারযুগের † পর গ্রীক ও লাটিন বিদ্যার অভ্যুদয়ে যেমন ইউরোপখণ্ডে গুরুতর পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, ভারতীয় ভাব ইউরোপে সুপরিচিত হইলে তদ্রূপ গুরুতর পরিবর্ত্তন সাধন করিবে।"

"আমায় ক্ষমা করিবেন—কিন্তু সম্প্রতিও ইহার বিশেষ কিছু চিহ্ন দেখা যাইতেছে না।"

স্বামীজি গম্ভীর ভাবে বলিলেন,—

"না দেখা যাইতে পারে। কিন্তু একথাও বেশ বলা যায় যে, ইউরোপের সেই প্রাচীন কালের জাগরণের সময়েও অনেকে ‡ কোন চিহ্ন পূর্ব্বে দেখে

সম্প্রদায়ের মতের সহিত মহম্মদের শিক্ষা অপেক্ষা বেদান্তের অদ্বৈতবাদেরই অধিক মিল আছে। ইঁহারা, জীব প্রেমযোগে পরিণামে ভগবানে লয় হয় বলিয়া থাকেন ও তদুপযোগী সাধনাদি করিয়া থাকেন। ইঁহাদের অনেকে আবার সম্পূর্ণ অদ্বৈতবাদী। ত্যাগ বৈরাগ্য ইঁহাদের এক প্রধান সাধন। অনেক পণ্ডিতের মতে ভারতীয় বেদান্তের প্রভাবেই এই মতের উৎপত্তি। মুসলমানগণের ভারতবিজয়ের পর ভারতবাসীর সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসিয়া ঐ মতের যে বিশেষ পুষ্টিসাধন হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

* শোপেন হাউয়ার—জনৈক জর্ম্মন দার্শনিকের নাম। ইনি বিখ্যাত দার্শনিক কান্তের মতানুবর্ত্তী হইয়া তাঁহার মতেরই সবিশেষ বিকাশ করেন বটে, কিন্তু ইঁহার দর্শনে বেদান্তের প্রভাব বিশেষরূপে প্রবেশ করিয়াছে। ইনি উপনিষদের পারস্য অনুবাদের লাটিন অনুবাদ পাঠ করিয়া তৎপ্রতি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হন এবং তিনি যে উহার নিকট বিশেষ ভাবে ঋণী, তাহা বার বার নিজ গ্রন্থে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। ইহার মতে সমগ্র জগৎ এক ইচ্ছাশক্তির বিকাশমাত্র এবং ব্রহ্মচর্য্য সংযমাদি সহায়ে বাসনার বিনাশ করিয়া সেই অপার ইচ্ছা-সাগরে নিজ ক্ষুদ্র ইচ্ছা বিসর্জ্জন করাই মানবজীবনের চরম লক্ষ্য।

† Dark Ages —পঞ্চম হইতে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত যে সময় ইউরোপ অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল।

‡ Renaissance —পঞ্চদশ শতাব্দীর পর হইতে যখন ইউরোপে সাহিত্য শিল্পাদি চর্চ্চার পুনরভ্যুদয় হয় তৎকালই ইতিহাসে এই নামে প্রসিদ্ধ।

নাই, এবং উহার আবির্ভাব হইবার পরও যে উহা আসিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারে নাই। যাঁহারা সময়ের লক্ষণ বিশেষভাবে অবগত, তাঁহারা কিন্তু বেশ বুঝিতে পারিতেছেন যে, একটী মহান্ আন্দোলন আজকাল ভিতরে ভিতরে চলিয়াছে। সম্প্রতি কয়েক বর্ষ ধরিয়া প্রাচ্যতত্ত্বানুসন্ধান অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। বর্ত্তমানে ইহা পণ্ডিতদের হস্তে রহিয়াছে এবং তাঁহারা যতদূর কার্য্য করিয়াছেন, তাহা লোকের নিকট শুষ্ক নীরস বলিয়া বোধ হইতেছে। কিন্তু ক্রমে উহা লোকে বুঝিবে—ক্রমে জ্ঞানালোকের প্রকাশ হইবে।"

"আপনার মতে তবে ভারতই ভবিষ্যতে শ্রেষ্ঠ বিজেতার আসন পাইবে! তথাপি ভারত তাহার ভাবরাজি প্রচারের জন্য ভারতেতর দেশে অধিক ধর্ম্মপ্রচারক প্রেরণ করে না কেন? বোধ করি, যত দিন না সমগ্র জগৎ আসিয়া তাহার পদতলে পড়িতেছে, ততদিন সে অপেক্ষা করিতেছে!"

"ভারত প্রাচীন যুগে ধর্ম্মপ্রচারকার্য্যে একটী প্রবল শক্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ইংলণ্ড খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিবার শত শত বর্ষ পূর্ব্বে বুদ্ধ সমগ্র এসিয়াকে তাঁহার মতাবলম্বী করিবার জন্য ধর্ম্মপ্রচারক পাঠাইয়াছিলেন। বর্ত্তমানকালে চিন্তাজগৎ ধীরে ধীরে ভারতের ভাব গ্রহণ করিতেছে। এক্ষণে সবে ইহার আরম্ভ হইয়াছে মাত্র। বিশেষ কোন প্রকার ধর্ম্ম অবলম্বনে অনিচ্ছুক ব্যক্তিগণের সংখ্যা খুব বাড়িতেছে, আর শিক্ষিত ব্যক্তিগণের ভিতরেই এই ভাব বিস্তৃত হইতে চলিয়াছে। সম্প্রতি আমেরিকাতে যে আদমসুমারি হইয়াছিল, তাহাতে অনেক লোক আপনাদিগকে কোনরূপ বিশেষধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া শ্রেণীবদ্ধ করিতে অস্বীকৃত হইয়াছিল। আমি বলি, সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ই এক মূল সত্যের বিভিন্ন বিকাশমাত্র। হয় সকলগুলিরই উন্নতি হইবে, নয় সবগুলিই বিনষ্ট হইবে। উহারা ঐ এক মূল সত্যরূপ কেন্দ্র হইতে ব্যাসার্দ্ধ সকলের ন্যায় বাহির হইয়াছে, এবং বিভিন্নপ্রকৃতিবিশিষ্ট-মানব-মনের উপযোগী সত্যের প্রকাশস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে।"

"এখন আমরা অনেকটা কাছে আসিতেছি—সেই কেন্দ্রীভূত সত্যটী কি?"

"মানুষের অভ্যন্তরীণ ব্রহ্মশক্তি। প্রত্যেক ব্যক্তিই—সে যতই মন্দপ্রকৃতি হউক না কেন, ভগবানের প্রকাশস্বরূপ। এই ব্রহ্মশক্তি আবৃত

থাকে, মানুষের দৃষ্টি হইতে লুক্কায়িত থাকে। ঐ কথায় আমার ভারতীয় সিপাহীবিদ্রোহের একটী ঘটনা মনে পড়িতেছে। ঐ সময়ে জনৈক মুসলমান বহুবর্ষ ধরিয়া মৌনব্রতধারী জনৈক সন্ন্যাসীকে নিদারুণ আঘাত করে। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে লোকে ঐ আঘাতকারীকে ধরিয়া তাহার কাছে লইয়া গিয়া বলিল, 'স্বামিন্ আপনি একবার বলুন, তাহা হইলেই এ ব্যক্তি নিহত হইবে।' সন্ন্যাসী অনেক দিনের মৌনব্রত ভঙ্গ করিয়া তাঁহার শেষ নিঃশ্বাসের সহিত বলিলেন, 'বৎসগণ, তোমরা বড়ই ভুল বলিতেছ—ঐ ব্যক্তি যে সাক্ষাৎ ভগবান্!' সকলের পশ্চাতে ঐ একত্ব রহিয়াছে—উহাই আমাদের জীবনে শিক্ষা করিবার প্রধান বিষয়। তাঁহাকে গড্, আল্লা, জিহোবা, প্রেম বা আত্মা যাহাই বলুন না কেন, সেই এক বস্তুই অতি ক্ষুদ্রতম প্রাণী হইতে মহত্তম প্রাণী পর্য্যন্ত সমুদয় প্রাণীতেই প্রাণস্বরূপে বিরাজমান। এই চিত্রটী মনে মনে ভাবুন দেখি, যেন বরফে ঢাকা সমুদ্রের মধ্যে কতকগুলি গর্ত্ত করা রহিয়াছে—ঐ প্রত্যেক গর্ত্তটীই এক একটী আত্মা—এক একটী মানুষ-সদৃশ—নিজ নিজ বুদ্ধিশক্তির তারতম্যানুসারে বন্ধন কাটাইয়া—ঐ বরফ ভাঙ্গিয়া বাহির হইবার চেষ্টা করিতেছে।"

"আমার বোধ হয়, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় জাতির লক্ষ্যের মধ্যে একটী বিশেষ প্রভেদ আছে। আপনারা সন্ন্যাস, একাগ্রতা প্রভৃতি উপায়ে খুব উন্নত ব্যক্তি গঠনের চেষ্টা করিতেছেন। আর, পাশ্চাত্য জাতির আদর্শ—সামাজিক অবস্থার সম্পূর্ণতাসাধন করা। সেইজন্য আমরা সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যাসমূহের মীমাংসাতেই বিশেষভাবে নিযুক্ত; কারণ, সর্ব্বসাধারণের কল্যাণের উপর আমাদের সভ্যতার স্থায়িত্ব নির্ভর করিতেছে—আমরা এইরূপ বিবেচনা করি।"

স্বামীজি খুব দৃঢ়তা ও আগ্রহের সহিত বলিলেন,—"কিন্তু সামাজিক বা রাজনৈতিক সর্ব্ববিধ বিষয়ের সফলতার মূল ভিত্তি—মানুষের সত্তা। পার্লিয়ামেণ্ট কর্ত্তৃক বিধিবদ্ধ কোন আইনে কখন জাতিবিশেষ উন্নত বা ভাল হয় না, কিন্তু সেই জাতির অন্তর্গত লোকগুলি উন্নত ও ভাল হইলেই জাতিও ভাল হইয়া থাকে। আমি চীনদেশে গিয়াছিলাম—এক সময়ে ঐ জাতিই সর্ব্বাপেক্ষা চমৎকার সুশৃঙ্খলবদ্ধ ছিল। কিন্তু আজ সেই চীন ছোড়ভঙ্গ কতকগুলা সামান্য লোকের সমষ্টির মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার

কারণ, প্রাচীন কালের ন্যায় ঐ সকল শাসনপ্রণালী পরিচালনা করিবার উপযুক্ত লোকসকল ঐ জাতিতে আর জন্মিল না। ধর্ম্ম সকল বিষয়ের মূলদেশ পর্য্যন্ত গিয়া উহাদের তত্ত্বান্বেষণ করিয়া থাকে। মূলটী যদি ঠিক থাকে, তবে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকলই ঠিক থাকে।"

"ভগবান্ সকলের ভিতর রহিয়াছেন, কিন্তু তিনি আবৃত রহিয়াছেন,—এ কথাটা যেন কি রকম অস্পষ্ট ও ব্যবহারিক জগৎ হইতে অনেক দূরবর্ত্তী বলিয়া বোধ হয়। লোকে ত আর সদা সর্ব্বদা ঐ ব্রহ্মপ্রকাশের দিকে দৃষ্টি করিয়া থাকিতে পারে না।"

"লোকে অনেক সময় পরস্পর একই উদ্দেশ্যে কার্য্য করিয়া থাকে, কিন্তু তাহা বুঝিতে পারে না। এটা স্বীকার করিতেই হইবে যে, আইন, গভর্ণমেণ্ট, রাজনীতি—এগুলি মানব-জীবনের চরম উদ্দেশ্য নহে। ঐ সকল ছাড়াইয়া গিয়া উহাদের চরম লক্ষ্যস্থল এমন একটী আছে—যেখানে আইনের আর কোন প্রয়োজনীয়তা থাকে না। এখানে বলিয়া রাখি, সন্ন্যাসী শব্দটীরই অর্থ—বিধিত্যাগী ব্রহ্মতত্ত্বান্বেষী—কিম্বা সন্ন্যাসী বলিতে নেতিবাদী (নিহিলিষ্ট) ব্রহ্মজ্ঞানীও বলিতে পারা যায়। তবে এইরূপ শব্দ ব্যবহার করিলেই সঙ্গে সঙ্গে একটা ভুল ধারণা আসিয়া থাকে। সকল শ্রেষ্ঠ আচার্য্যগণ একই জিনিষ শিক্ষা দিয়া থাকেন। যীশু খ্রীষ্ট বুঝিয়াছিলেন,নিয়ম-প্রতিপালনই উন্নতির মূল নহে, যথার্থ পবিত্রতা ও চারিত্র্যসম্পন্ন হওয়াই একমাত্র বীর্য্যের নিদান। আপনি যে বলিতেছিলেন, প্রাচ্যদেশের আত্মার উচ্চতর উন্নতিলাভের দিকে এবং পাশ্চাত্যদেশের সামাজিক অবস্থার উন্নতিলাভের দিকে লক্ষ্য—অবশ্য আপনি একথা বিস্মৃত হন নাই বোধ হয় যে, আত্মা দুই প্রকার—কূটস্থ চৈতন্য—যিনি আত্মার যথার্থ স্বরূপ; আর, আভাস চৈতন্য—আপাততঃ যাহাকে আমাদের আত্মা বলিয়া বোধ হইতেছে।"

"বোধ হয়, আপনার ভাব এই যে, আমরা আভাসের উদ্দেশ্যে কার্য্য করিতেছি. আর আপনারা প্রকৃত চৈতন্যের উদ্দেশ্যে কার্য্য করিতেছেন?"

"মন নিজ পূর্ণতর বিকাশের জন্য নানা সোপানের মধ্য দিয়া অগ্রসর হয়। প্রথমে উহা স্থূলকে অবলম্বন করিয়া ক্রমশঃ সূক্ষ্মের দিকে যাইতে থাকে। আরও দেখুন, সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃভাবের ধারণা মানুষে কিরূপে লাভ করিয়া থাকে। প্রথমতঃ উহা সাম্প্রদায়িক ভ্রাতৃভাবের আকারে আবির্ভূত হয়—

তখন উহাতে সঙ্কীর্ণ, সীমাবদ্ধ, অপরকে বাদ দেওয়া ভাব থাকে। পরে ক্রমে ক্রমে আমরা উদারতর ভাবে, সূক্ষ্মতর ভাবে পৌঁছিয়া থাকি।"

"তাহা হইলে আপনি কি মনে করেন, এই সব সম্প্রদায়, যাহা আমরা—ইংরাজেরা—এত ভালবাসি, সব লোপ পাইবে? আপনি জানেন বোধ হয়, জনৈক ফরাসী বলিয়াছিলেন,—'ইংলণ্ড—এদেশে সম্প্রদায় সহস্র সহস্র, কিন্তু সার জিনিষ খুব অল্প।' "

"ঐ সব সম্প্রদায় যে লোপ পাইবে, তৎসম্বন্ধে আমার কোন সংশয় নাই। উহাদের অস্তিত্ব অসার বা গৌণ কতকগুলি বিষয়ের উপরে প্রতিষ্ঠিত। অবশ্য উহাদের মুখ্য বা সার ভাবটী থাকিয়া যাইবে এবং উহার সাহায্যে অপর নূতন গৃহ নির্ম্মিত হইবে। আপনার অবশ্য সেই প্রাচীন উক্তি জানা আছে যে, একটা চর্চ্চ বা সম্প্রদায়বিশেষের ভিতর জন্মান ভাল, কিন্তু আমরণ উহার গণ্ডীর ভিতরে বদ্ধ থাকা ভাল নয়।"

"ইংলণ্ডে আপনার কার্য্যের কিরূপ বিস্তার হইতেছে, অনুগ্রহপূর্ব্বক বলিবেন কি?"

"ধীরে ধীরে হইতেছে—ইহার কারণ আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি। যেখানে মূল ধরিয়া কার্য্য, সেখানে প্রকৃত উন্নতি বা বিস্তার অবশ্যই ধীরে ধীরে হইয়া থাকে। অবশ্য ইহা বলাই বাহুল্য যে, যে কোন উপায়েই হউক, এই সব ভাব বিস্তৃত হইবেই হইবে এবং আমাদের অনেকেব নিকট ঐ সকল প্রচারের যথার্থ সময় উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হইতেছে।"

তার পর স্বামীজির মুখ হইতে কি ভাবে তাঁহার কার্য্য চলিতেছে, তাহার বিস্তারিত বিবরণ শুনিলাম। অনেক প্রাচীন মতের ন্যায় এই নূতন মত বিনামূল্যেই শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। যাঁহারা এই মতাবলম্বী হন, তাঁহাদের স্বেচ্ছাকৃত সাহায্য ও চেষ্টার উপরই ইহা সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া থাকে।

প্রাচ্যদেশীয় বসন-পরিহিত স্বামীজির আকৃতি মনোহর। তাঁহার সরল ও সহৃদয় ব্যবহার দেখিয়া সন্ন্যাস সম্বন্ধে লোকের সাধারণতঃ যে ধারণা, সে সব ভাব কিছুই আসে না। তিনি স্বভাবতঃই প্রিয়দর্শন। উহার সহিত তাঁহার ঐরূপ উদার ভাব, ইংরাজী ভাষায় অসাধারণ অধিকার এবং কথোপকথনের অগাধ শক্তি—তাঁহাকে লোকের নিকট অধিকতর প্রিয় করিয়া তুলিয়াছে। তাঁহার সন্ন্যাসব্রত অর্থে নাম যশ বিষয় সম্পদ পদমর্য্যাদাদি সম্পূর্ণ বিসর্জ্জন করিয়া আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভের জন্য অবিরাম চেষ্টা।

সার কথা।

(মায়া ও মায়ার পাশা।)

[স্বামী সারদানন্দ।]

বিবেকানন্দ স্বামীজি বল্‌তেন, হিঁদুর জাতিবিভাগ এবং কালবিভাগের একটা বড় উদার মানে আছে। হিঁদু বলে, 'মায়া' শক্তিটা—যেটা দিয়ে এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ড তৈয়ারি হচ্চে—সান্ত অর্থাৎ তার একটা শেষ আছে। কিন্তু এই 'শেষ' কথাটার একটু আলাদা মানে। আমরা 'শেষ' কথাটা যে ভাবে বুঝি, সে ভাবে কথাটা ব্যবহার হয়নি। কেননা, আমরা কোন জিনীসের 'শেষ' আছে বল্‌লে বুঝি এই যে, কালে সে জিনীসটা একটু একটু ক'রে পরিবর্ত্তিত হ'য়ে ক্রমে এককালে রূপান্তরিত হ'য়ে যাবে। এই সম্পূর্ণ রূপ-পরিবর্ত্তনটারই আমরা 'বিনাশ' 'মৃত্যু' ইত্যাদি নাম দিয়ে থাকি। জড় জিনীস রূপান্তর হ'লে তার বিনাশ হ'ল, বলি, আর চৈতন্যসংযুক্ত জড় জিনীস—যথা মনুষ্যদেহাদি—রূপান্তর হ'লে বলি 'মরে গেল'। কিন্তু হিঁদু এটা বেশ বুঝে যে, মায়াশক্তিটার সে ভাবে কালে রূপান্তরিত হওয়া অসম্ভব। কেননা, 'কাল' পদার্থটাই ঐ শক্তিপ্রসূত বা উহার কার্য্যবিশেষ। আর কার্য্যটা কখনই এত বড় হ'তে পারে না যে, তার কারণটার উপর ক্ষমতা বিস্তার করে বা কারণটাকে পারবর্ত্তিত করে। মায়ার খেলা আরম্ভ হ'লে পর যখন কালের আরম্ভ, তখন মায়া খেলা গুটুলেই যে কাল শেষ হ'ল, একথা হিঁদু খুব বুঝে। তার মতে মায়াটা যখন কালের পূর্ব্বে বর্ত্তমান, তখন সেটা অনাদি। তবে মায়া সান্তা হ'ল কি ক'রে? মায়ার খেলাটার কালে শেষ না হ'য়ে কিসে শেষ হয়? হিঁদু বলে, শেষ হয় জ্ঞানে। পূর্ণজ্ঞান হ'লে পর মায়ার খেলার আর কিছুমাত্র অনুভব থাকে না। কখনও যে ঐ খেলা হয়েছিল বা হচ্চে বা হবে, এসব কিছুই বোধ থাকে না। সেইজন্য মায়া হচ্চে 'জ্ঞাননাশ্যা'। মায়ার বাইরে গিয়ে দেখ্‌লে, কাল তো দূরের কথা, মায়ারও অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু মায়ার ভিতরে দাঁড়িয়ে মায়ার খেলাটা দেখ্‌লে বুঝা যায় যে, মায়া কখন পাশা ফেল্‌চে ও জগৎটার বিকাশ হচ্চে; আর কখনও পাশা গুটিয়ে হাতে ক'রে আছে ও জগৎটা সঙ্কুচিত হয়ে বীজভাবে রয়েচে। সৃষ্টির সঙ্কোচ ও বিকাশ, সঙ্কোচ ও বিকাশ বার বার

এই ভাবে মায়াশক্তি খেলা কচ্চে! এই সঙ্কোচ ও বিকাশের প্রবাহটা অনাদি অর্থাৎ কালেতে ইহার আরম্ভ হয়নি। ইহার আরম্ভ হয়েচে 'অজ্ঞানে'—নাশ হবে 'জ্ঞানে'! এইজন্ম হিঁদুদর্শন মায়ার খেলার বাইরে যাবার পথটি মাত্র দেখিয়ে দিয়ে ক্ষান্ত থাকে। কেন মায়া খেল্‌চে, খেলাটার উদ্দেশ্য কি, মায়াবীর এ খেলায় লাভ কি? এসব কথা বিচার কর্‌তে দৌড়োয় না। কেননা হিঁদু বহু সহস্র বৎসর ঘটত্ব, পটত্ব ক'রে বুঝেছে, ও সব প্রশ্নের মীমাংসা হয় না। উহা মনুষ্যবুদ্ধির গণ্ডীর বাইরে! ইউরোপীয়েরা সম্প্রতি বলে কৌশলে পয়সা কড়ি রোজগার ক'রে, পরের মাথায় কাঁটাল ভেঙ্গে নিজের উদরপূরণের সচ্ছল বন্দোবস্ত ক'রে ঘটত্ব পটত্ব ক'রবার একটু অবসর পেয়েছে। ওরা এখন teleology of Evolution, Purposive view of creation ইত্যাদি লম্বা চওড়া বাক্য-বিন্যাস ক'রে সৃষ্টির উদ্দেশ্য বার কর্‌তে মিছে মাথা ঘামাক্। ঘামিয়ে ঘামিয়ে কিছু না কর্‌তে পেরে যখন হাত পা এলিয়ে পড়্‌বে, আর তারও বড় দেরি নাই, তখন হিঁদু বল্‌বে "কি, ভাযারও ফলার নাকি?"

হিঁদু শাস্ত্র আর একটা বড় অদ্ভুত কথা বলে। হিঁদুর শাস্ত্র বলে যে, মায়ার পাশা যুগে যুগে একরকমই প'ড়ে থাকে! এখানে যুগ শব্দটি, সৃষ্টির একবার বিকাশ ও সঙ্কোচ ব্যাপক কাল অর্থে ব্যবহার হচ্চে। অতএব পূর্ব্বের কথাটার মানে হচ্চে এই—সে মাযার দ্বারা সৃষ্টির একবার বিকাশ ও সঙ্কোচ হবার সময় ব্রহ্মাণ্ডটা ও তার ভিতরের প্রত্যেক জড়জীবাদির শরীর ও মনগুলোর যেমন গঠন, প্রকাশ, বৃদ্ধি ও পরিণতি হ'য়ে থাকে, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ প্রভৃতি সকল বারের বিকাশ ও সঙ্কোচের সময়ও ঠিক সেই রকম হয়, কিছুমাত্র ভিন্ন হয় না। মাযা নিজে হচ্চে সত্ত্বরজ-স্তমোগুণময়ী, নিজের ভিতরের ঐ তিনটে পদার্থকে ভিন্ন ভিন্ন ভাগে মিশিয়ে জগতের যত কিছু স্থূল ও সূক্ষ্ম পদার্থের সৃষ্টি ক'রে থাকে। এখন কথা হচ্চে, ঐ তিনটে পদার্থের বিভিন্ন ভাবে মিশান স্থূল চক্ষে অনন্ত ব'লে দেখালেও বাস্তবিক অনন্ত কখন হ'তে পারে না। উহা সান্ত হবেই হবে; অর্থাৎ ঐ সকল মিশ্রিত পদার্থের সংখ্যার একটা সীমা আছে। মনে কর, একজন লোক তিনখান পাশা নিয়ে খেল্‌তে বস্‌লো। প্রথমে পড়লো 'ছ তিন নয়,' তার পর পড়্‌লো 'কচে বারো,' তার পর পড়লে৷ 'পোয়া বার' ইত্যাদি। স্থূল দৃষ্টিতে মনে হয়, ঐ তিনখানা পাশা অনন্ত রকমে পড়্‌তে পারে। কিন্তু

একটু ভাব্‌লেই বুঝা যায়, তা নয়। পাশা ক'খানায় ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যার সংযোগ-বিয়োগে এতগুলি রকমারি দানই পড়্‌তে পারে। অনন্তকাল ধ'রে ব'সে ব'সে পাশা ফেল্‌লেও ততগুলি রকমের ভিতর একটি রকম ছাড়া অন্য কোন নূতন রকম কখনও পড়্‌বে না। সেইরূপ, মায়ার পাশা ফেলা হচ্চে, ঐ তিন গুণ বা পদার্থের মিশ্রণে ভিন্ন ভিন্ন স্থূল সূক্ষ্ম, বড় ছোট, ভাল মন্দ, সুন্দর বিকট, দৈবী আসুরী, সাধু অসাধু, ঐশ্বরিক জৈবিক শরীরান্তঃকরণ বিকাশ করা। চৈতন্য পদার্থ 'আত্মা,' নিত্য, এক ও সর্ব্বত্র সমান ভাবে থাক্‌লেও মায়াসৃষ্ট প্রত্যেক শরীরান্তঃকরণের বিভিন্নতার দরুণ, ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশিত দেখায় মাত্র। অতএব সত্ত্বরজস্তমোগুণের বিভিন্ন মিশ্রণে উৎপন্ন শরীরান্তঃকরণের সংখ্যারও একটা সীমা আছে। মায়া অনন্তকাল ধ'রে চেষ্টা কর্‌লেও ততগুলি রকমের শরীরান্তঃকরণ গড়া ছাড়া অন্য কোন নূতন রকমের গড়্‌তে পারেন না! সেইজন্যই হিঁদু বলে "সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ"। অর্থাৎ ঈশ্বর তাঁর মায়াশক্তির দ্বারা বিগত প্রলয়ের পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে যেমন সূর্য্যচন্দ্রমাদি তৈয়ার করেছিলেন, এবারকার সৃষ্টি-বিকাশের সময়ও ঠিক সেই রকম কর্‌লেন। সেইজন্যই হিঁদুর পুরাণে শুন্‌তে পাওয়া যায়, যুগে যুগে ব্যাস, শুক, জনক প্রভৃতি শরীরী আলাদা আলাদা জন্মায়। কিন্তু তাদের শরীরান্তঃকরণের গঠন পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের ব্যাস-শুক-জনকাদির ন্যায়ই হ'য়ে থাকে; কিছুমাত্র বিভিন্ন হয় না। সেইজন্যই আবার পুরাণাদিতে দেখা যায়, একটা সৌরজগতে সৃষ্টির বিকাশ যে ভাবে বর্ণিত, অন্য অন্য সৌরজগতের সৃষ্টিও সেই ভাবে বর্ণিত। সেখানেও ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ও ইন্দ্রাদি দেবতা সকল, সেখানেও সকল বন্দোবস্ত এখানকার মত এবং মায়ার পাশা একই ভাবে পড়্‌চে। সেখানেও ঝগড়া কোঁদল, সেখানেও ভালবাসাবাসি, সেখানেও ছাড়াছাড়ি, সেখানেও পরিণামে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন বা মৃত্যু!

যেখানেই থাক, যে লোকেই যাও, মায়ার পাশা একই রকম পড়্‌চে ও পড়্‌বে এবং ঐ মায়ার ভিতর শরীরান্তঃকরণধারী সকলকে থাক্‌তেই হবে! "আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুনঃ" হে অর্জ্জুন! সর্ব্বোচ্চ ব্রহ্মলোক থেকে পৃথিবী প্রভৃতি সমস্ত লোকই (একই ভাবে) বার বার হচ্চে ও যাচ্চে! এই সত্যটি প্রাণে প্রাণে, "হাড়ে হাড়ে" বোঝার নামই হিঁদু দিচ্চে— 'বৈরাগ্য'। বৈরাগ্যটা হাতী ঘোঁড়া নয়, মানুষের মুখমাত্র না দেখে বনে

বাস করা নয়, বা ভোগবিলাস যথাসম্ভব ছেড়ে ছুড়ে সাদাসিদে চালে জীবনধারণ করাও নয়। বৈরাগ্য হচ্চে, জগতের অনিত্যতাবোধ—এমন 'হাড়ে হাড়ে' ভিতরে ঐ বোধটা সেঁধুনো, যে, রূপরসাদির সুখস্পর্শের ভিতর, শোক দুঃখাদির তীব্র যাতনার ভিতর, নামযশাদি মরীচিকার ভিতর, জগৎ যাহাকে 'ভাল' বলে এবং 'মন্দ' বলে, সে দুটোরি ভিতর সেই অনিত্যকালের অঙ্গুলীর দাগ স্পষ্ট, জলন্ত অঙ্কিত দেখ্‌তে পাওয়া! কাজেই বৈরাগ্য এলে আর মোহ আস্‌তে পায় না, গন্তব্য পথে যেতে যেতে পথের পাশের বাহার দেখে আগিয়ে যেতে ভুল হয় না! কাজেই হিঁদু বলে, ঠিক্ ঠিক্ বৈরাগ্য এলে আর তোমার মা'র নাই! তুমি রাজসিংহাসনে ব'সে রাজদণ্ডের চালনা কর বা ভিক্ষুক হ'য়ে দ্বারে দ্বারে ফিরে বেড়াও, ও দুটোর একটাকেও বড, ছোট ব'লে বোধ হবে না! কাজেই জ্ঞান তোমার 'করতলগত আমলকবৎ' অতি সুলভ হবে! আর জ্ঞান উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে মায়ার খেলাও গুটিয়ে আসবে—মায়ার পারে যা আছে, তার অনুভবও তুমি কর্‌তে পার্‌বে। কিন্তু যতদিন না তা হয়, ততদিন হিঁদু বলে তোমার বর্ণাশ্রমধর্ম্মের ভিতর অধিকার। তার বাহিরে যাবার তোমার সামর্থ্য নাই!

২০শে আষাঢ়।

স্বামী বিবেকানন্দের তিরোভাব উপলক্ষ্যে লিখিত।

আষাঢ় বিংশতি নিশা—এসোনা গো ফিরে আর;
নির্ম্মম নিষ্ঠুর তব করালাস্যে অন্ধকার।
হৃদয়-আরাধ্য ধন, অকালে করি হরণ,
ভিখারী করিলে ধরা—নিবালে স্বর্ণ-দেউটী।
কীনাশ-কিঙ্করী ভবে তব সম নাহি দুটী॥ ১

---

* ১৯০২ খৃষ্টাব্দের আষাঢ় মাসের বিংশতি দিবসে স্বামী শ্রীবিবেকানন্দ দেহ-রক্ষা করেন। ঐ ঘটনা স্মরণ করিয়া বর্ত্তমান সালের ২০শে আষাঢ় এই কবিতাটী রচিত হইয়াছে।

সুমেরুর স্বর্ণচূড়া চকিতে করিলে চূর্ণ,
মধ্যাহ্ন-ভাস্কর গাঢ় আঁধারে আচ্ছাদি তূর্ণ!
রোধিলে বায়ুর বল, সীমাশূন্য নভঃস্থল,
দারুণ তোমার দর্পে ছিন্ন তারা সন্ত্রাসিত।
প্রপঞ্চ তোমার পদে সভয়ে শরণাগত ॥ ২

শ্রীহীন ভূস্বর্গ আজি বেলুড়-মঠ-মন্দির,
অভীমন্ত্রে হুঙ্কারিত পূত মন্দাকিনী-তীর।
শ্রীমন্দিরে দীপ ক্ষীণ, হোমকুণ্ডে অগ্নি লীন,
শরীরী দিক্‌পালগণ চারিদিকে স্তব্ধপ্রায়;
"রামকৃষ্ণ" পুণ্য নাম কে আর কারে শুনায় ॥ ৩

চতুর্দ্দশী-সংক্রমিতা অমাবস্যা সঙ্গে ক'রে,
উলঙ্গিনী নাচ রঙ্গে কেন আজি অন্ধকারে?
নিখিল-অজ্ঞান-ভার, হরিতে আগতি যাঁর,
তাঁরে নিয়ে গেলে ব'লে তাই কি হেন তাণ্ডব?
হরিয়ে পরের ধন—এত কি সাজে গৌরব? ৪

কিঙ্করী-কিঙ্করী তোমা বৃথা আমি করি দোষী;
লীলাপূর্ণ তাই প্রভু অখণ্ডমণ্ডলবাসী।
যুগে যুগে দিতে প্রাণ, জীবহিতে অধিষ্ঠান
নররূপী—নারায়ণ সঙ্গে আসে বার বার।
"পূর্ণমিদং পূর্ণমদঃ" লীলাভঙ্গি চমৎকার ॥ ৫

প্রচণ্ডঝটিকাশান্তে প্রশান্তপ্রকৃতিপ্রায়,
স্তব্ধ এবে ধরা স্মরি কি কাণ্ড ঘটিল হায়!
উৎপাটিত মেরুচূড়া, ভগ্ন বৃক্ষ নগ্ন ধরা,
এখনো জীমূতমন্দ্রে সাগরান্ত চক্রবালে।
বেদান্ত-দুন্দুভি শোন গরজিছে রুদ্রতালে ॥ ৬

এসেছে সময় এবে ভাবিতে শান্ত অন্তরে,
রামকৃষ্ণ সনে বীর সন্ন্যাসী এ কে বিহরে।
স্থূলদর্শী জনগণ, কামকাঞ্চনমগন,
কি সাধ্য বুঝিবে গুপ্ত অগম্য অপার লীলা?
"রামচন্দ্র পরব্রহ্ম" সপ্তঋষি বুঝেছিলা॥ ৭

আসিয়াছে নরদেহে পুনঃ নর-নারায়ণ,
"অন্ধের বিশ্বাস" বলি উপহাসে জ্ঞানিগণ।
কিন্তু উষাগতপ্রায়, তরল তপ্ত প্রভায়,
উদ্ভিন্ন অজ্ঞানতমঃ বিদূরিত অন্ধকার।
জাগো জীব! নাহি আর অবসর ঘুমাবার॥ ৮

জাগিল পশ্চিম, পূর্ব্ব, জাগিল উত্তর, যাম্য;
অধঃ ঊর্দ্ধ সব জেগে হেরিছে ধরম-সাম্য।
অতঃপর না জাগিলে, জানি তুমি হারাইলে
করতলগত রত্ন—মহামূল্য কোহিনুর।
ভাগ্যে না থাকিলে কভু দারিদ্র্য কি হয় দূর? ৯

এই দিনে মহেশ্বর ফেলিয়ে প্রপঞ্চ-দেহ,
স্বস্বরূপে মিশিয়াছে—প্রবেশি অখণ্ড গেহ।
সেদিনের স্মৃতি ল'য়ে, বিজনে আজি বসিয়ে,
ধ্যান-নেত্রে হের হৃদে জ্ঞানবপু বীরেশ্বরে।
ইন্দু-হৃদি-সমুদ্র-মন্থন-উত্থ-সুধাকরে॥ ১০

শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এ।

মায়াবতী-দাতব্য-চিকিৎসালয়।

নিবেদন ও প্রার্থনা।

হিমাচল-বক্ষে আলমোড়া জেলার অন্তঃপাতী স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত মায়াবতী অদ্বৈতাশ্রমের নাম উদ্বোধনপাঠকবর্গের অপরিচিত নহে। সভ্যতার আলোকে বঞ্চিত শ্রমমাত্রজীবী দরিদ্র পর্ব্বতবাসীগণের পীড়া হইলে কি শোচনীয় অবস্থা হয় তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া আশ্রমস্থ সন্ন্যাসীবৃন্দ গত ১৯০৩ খৃষ্টাব্দ হইতে মায়াবতী-দাতব্য-চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। উহা এযাবৎ দক্ষতার সহিত পরিচালিত হওয়ায় অত্রস্থ একটি বিশেষ অভাব পরিপূরণ করিয়া আসিতেছে। এতদিন আশ্রমের দালানের একাংশেই ঔষধাদি বিতরণ ও রোগীর সেবা করা হইত। কিন্তু বহুদূরাগত বিপন্ন কঠিনপীড়াক্রান্ত রোগিগণ চিকিৎসার জন্য আসিলে স্থানাভাববশতঃ তাহাদিগকে কিছুদিন আশ্রমে রাখিয়া উপযুক্ত ঔষধ পথ্যাদি প্রদান ও সেবাশুশ্রূষা করিবার বড়ই অসুবিধা হয়। সময়ে সময়ে দশ পনর বা ততোধিক মাইল দূর হইতে নিঃস্বগ্রামবাসীরা রোগীকে ডুলি বা পিঠে করিয়া এখানে চিকিৎসার জন্য আনিয়া থাকে। কিন্তু দুই তিন দিন মাত্র ঔষধ পথ্য দান ও শুশ্রূষা করার পর আমরা দুঃখিতান্তঃকরণে তাহাদিগকে ফিরাইয়া দিতে বাধ্য হই। ফলে ঐ সকল রোগীর আরাম হইতে দুই তিন গুণ অধিক সময় লাগে। অথবা উপযুক্ত ঔষধপথ্যাদির অভাবে কালকবলে পতিত হয়।

পূর্ব্বোক্ত কারণে চিকিৎসালয়-সংক্রান্ত একটি পৃথক্ গৃহের অভাব আমরা বহুদিন হইতে অনুভব করিয়া আসিতেছি। তন্নিবারণ কল্পে (১) একটি পৃথক্ ঔষধ রাখিবার ঘর (২) রোগীদিগের জন্য একটি পরীক্ষা-গৃহ (৩) রোগীদিগের একটি থাকিবার ঘর (৪) রোগীদিগের ব্যবহারের উপযোগী কিছু আসবাবাদি আবশ্যক। অতি সামান্য রকমে গৃহ নির্ম্মাণ করিলেও দুই হাজার টাকা লাগিবে। তন্মধ্যে এ পর্য্যন্ত ৪৭২॥০ মাত্র চাঁদা উঠিয়াছে; অন্ততঃ আর এক হাজার টাকা উঠিলে তবে নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ করা যাইতে পারে।

হিমাচলস্থ দরিদ্র আতুর নারায়ণগণের পূর্ব্বোক্ত ভাবে সেবার জন্য

আমরা উদ্বোধনের সহৃদয় পাঠকপাঠিকার নিকট ভিক্ষাপাত্রহস্তে উপস্থিত হইয়াছি। দুঃস্থ ও রোগগ্রস্তদিগের কষ্ট প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া যিনি যাহাই দিবেন, তাহাই আদরের সহিত গৃহীত হইবে এবং উদ্বোধন ও প্রবুদ্ধ ভারতে উহার প্রাপ্তিস্বীকার করা যাইবে।

আশ্রম হইতে পূর্ব্বোক্ত সেবাকার্য্য কি ভাবে কতদূর চলিতেছে, পাঠকের তাহা বুঝিবার সুবিধা হইবে বলিয়া এখানে গত ৭ বৎসরের মোট আয়ব্যয়ের তালিকা নিম্নে সংক্ষেপে প্রদত্ত হইল।

	সাধারণের এককালীন দান	মায়াবতী অদ্বৈতাশ্রম ও প্রবুদ্ধ ভারত আফিস হইতে এককালীন দান	মোট আয়	মোট খরচ
১৯০৩ নভেম্বর হইতে ১৯০৬ অক্টোবর পর্য্যন্ত	৪০৯॥৶১৫	১০৩০॥৶১৫	১৪৪০।৶১০	১৪৪০।৶১০
১৯০৬ নভেম্বর হইতে ১৯০৭ অক্টোবর পর্য্যন্ত	১৬৬।৶১০	০	১৬৬।৶১০	৮৬।১০
১৯০৮ ,, ,, ১৯০৮	১১০৲	০	১১০	১১৯৸৶০
১৯০৮ ,, ,, ১৯০৯	১৮৭৸০	০	১৮৭৸০	১০৭॥৶১০
১৯০৯ ,, ,, ১৯১০	৯৭॥৶০	০	৯৭॥৶০	১৩৫॥৶০
১৯০৩ নভেম্বর হইতে ১৯১০ অক্টোবর পর্য্যন্ত	৯৭১॥/১৫	১০৩০॥৶১৫	২০০২।/০	১৮৮৫৲

উদ্বৃত্ত—১১৭।/০

সাহায্যাদি আমার নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় অথবা উদ্বোধন-সম্পাদকের নামে পাঠাইলে চলিবে। ইতি—

(স্বামী) বিরজানন্দ

প্রেসিডেণ্ট, অদ্বৈত আশ্রম, মায়াবতী,

লোহাঘাট পোঃ আফিস,

আলমোড়া।

শ্রীরামানুজ দর্শন।

(৮)

ন্যায়ের অন্যথাখ্যাতিবাদ খণ্ডন।

[শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ।]

"সকল জ্ঞান যথার্থ" এই প্রসঙ্গে তিনটী বিপক্ষের মত খণ্ডন করা হইয়াছে, এক্ষণে চতুর্থ বিপক্ষের মতটী খণ্ডন করা যাইতেছে। ইঁহারা নৈয়ায়িক এবং ইঁহাদিগকে অন্যথাখ্যাতিবাদী বলে।

নৈয়ায়িক বলেন সকল জ্ঞানই যথার্থ নহে, পরন্তু কতকগুলি যথার্থ এবং কতকগুলি অযথার্থ। যে জিনিষটী যে রকম তাহাকে সেই রকম বলিয়া জানা যথার্থ জ্ঞান, এবং যে জিনিষটী যে রকম, তাহাকে অন্য রকম বলিয়া জানা অযথার্থ জ্ঞান বা ভ্রম। শুক্তি দেখিয়া যদি শুক্তি জ্ঞান হয়, তাহা হইলে যথার্থ জ্ঞান এবং শুক্তি দেখিয়া যদি রজত জ্ঞান হয় তাহা হইলে তাহা অযথার্থ জ্ঞান বা ভ্রম।

রামানুজ বলেন—না; শুক্তিতে রজত জ্ঞান হইলেই সে জ্ঞানকে ভ্রম বলা উচিত নহে, উহাকেও যথার্থ জ্ঞান বলিতে হইবে। শুক্তিতে রজত জ্ঞান অন্যথা জ্ঞান নহে।

যাহা হউক এইবার আমরা দুই পক্ষের যুক্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিব। প্রথমতঃ দেখা যাউক ন্যায় মতে জ্ঞান হয় কিরূপে। অবশ্য এস্থলে এই জ্ঞান প্রত্যক্ষ সম্বন্ধীয় জ্ঞান, এবং এই অন্যথা জ্ঞানও প্রত্যক্ষ জ্ঞানেরই কথায় অবতারিত, সুতরাং ন্যায়-মতে প্রত্যক্ষ জ্ঞান যে প্রকারে উৎপন্ন হয় এস্থলে তাহাই আলোচ্য।

ন্যায়-মতে প্রত্যক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন হইতে গেলে প্রথম প্রয়োজন—বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ। যেমন এই লেখনীটীর চাক্ষুষ জ্ঞান স্থলে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সহিত এই লেখনীটীর একটা সংযোগ হওয়া আবশ্যক। তাহার পর দ্বিতীয় প্রয়োজন—চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সহিত মনের সংযোগ। এটী না হইলে আমার লেখনী জ্ঞান হওয়া অসম্ভব; লেখনী দেখিয়াও আমার লেখনী জ্ঞান হয় না। এই সময় মনোমধ্যে লেখনী বস্তুটীর একটী ছাপ পড়ে, কিন্তু তখনও তাহাকে লেখনী বলিয়া বোধ হয় না। বড় জোর তখন যাহা বোধ হয়,

তাহা লেখনীর আকারটাকে লক্ষ্য করিয়া একটা কিছু এইমাত্র বলা যাইতে পারে। ইহার পর তৃতীয় প্রয়োজন—লেখনীজাতির সহিত মনের সংযোগ। এই জাতি পদার্থটী আমাদের মনোরাজ্যের সম্পত্তি, এবং মনের সহিত ইহার সংযোগ ও মনোরাজ্যের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। ন্যায়ের ভাষায় এই সন্নিকর্ষকে অলৌকিক সন্নিকর্ষ বলা যায়। ন্যায় বলেন এই পর্য্যন্ত হইলেই আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান সম্পূর্ণ হয়।

পরন্তু যদি প্রণিধান করিয়া দেখা যায় তাহা হইলে দেখা যায় যে এই জাতিপদার্থের সহিত মনের সংযোগ ঘটিবার পূর্ব্বে, মনোরাজ্যের যাবতীয় জ্ঞানভাণ্ডারের সহিত উক্ত "একটা কিছু" বোধের একটা তুলনা ব্যাপার সংঘটিত হয়—উদ্দেশ্য উক্ত "একটা কিছু" বোধের যেন কোন একটা সদৃশ বোধকে খুঁজিয়া বাহির করা। এইরূপ খুঁজিয়া বাহির করিবার উদ্দেশ্য আবার দুইটী, যথা ;—প্রথম, সাদৃশ্যের নামানানুসারে উহার একটা নামকরণ করা এবং দ্বিতীয়—উহার সম্বন্ধে আরও অধিক জ্ঞান লাভ করা। কারণ যখনই আমরা উহাকে যে জাতির সদৃশ বলিয়া ঠিক করিতে পারি তখনই সেই জাতির অন্যান্যগুণাবলী আমরা তাহাতে আছে বলিয়া জানিতে পারি। এই ব্যাপারগুলি মানব-প্রকৃতিবশে কখন আমাদের জ্ঞাতসারে কখন বা অজ্ঞাত-সারে সংঘটিত হয়। যাহা হউক ইহা যতক্ষণ না হয় ততক্ষণ লেখনী বস্তুটীকে লেখনী বলাই অসম্ভব, ততক্ষণ ইহা "একটা কিছু" এইমাত্র বোধ হয়। এ সময় উপযুক্ত জাতিপদার্থটী যদি মানসপটে আমাদের উদিত না হয় তাহা হইলে তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অথবা বর্ণ প্রভৃতির জাতিপদা-র্থের স্ফুরণ হয় এবং তখন আমরা বলি যে, যাহা দেখা গেল তাহা "লম্বা একটা কাটীর মত," মুখটা সুচাল, রংটা সাদা বা লাল ইত্যাদি। তাহার দ্বারা যে লেখা যায় তজ্জন্য তাহাকে লেখনী বলে, একথা আমাদের মনে কখনই উদয় হইতে পারে না। ফলে সমগ্র বস্তুটীর জাতিপদার্থটী মনে না আসিলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেরও ভিন্ন ভিন্ন জাতিসমূহ মনে আসিতে বাধ্য, নচেৎ তাহাকে "কাটীর মত লম্বা," "সুচাল" প্রভৃতি বলাও অসম্ভব। এই প্রকারে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের তৃতীয় প্রয়োজনটী সাধিত হইলে আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান সম্পূর্ণ হয়, পরন্তু এখানেও এই জ্ঞানের বিশ্রাম নাই ; ইহার পর আমাদের মনে হয় যে আমরা উক্ত প্রত্যক্ষ জ্ঞানে জ্ঞানবান্ এবং তখন উক্ত জ্ঞানাহরণ ব্যাপারের পরিসমাপ্তি ঘটে। এই প্রকারে "আমি অমুক জ্ঞানে জ্ঞানবান্"

এই জ্ঞানোদয়কে ন্যায়ের ভাষায় অনুব্যবসায়, বেদান্তের ভাষায় স্ফুরণ, এবং মীমাংসার ভাষায় প্রাকট্য বলিয়া অভিহিত করা হয়। ইতি পূর্ব্বে এই বিষয়ে আত্মা কখন নিজেকে জ্ঞানবান্ বলিয়া বিবেচনা করেনা।

ন্যায়ের মতে এই জাতিপদার্থটী নিত্য, চিরকালই আছে, কখনও নষ্ট হয় না, মহাপ্রলয়েও ইহার বিনাশ নাই। কোন একটা "ব্যক্তি" (এস্থলে যেমন লেখনী) দেখিলে, এই জাতিপদার্থটী আত্মার সম্মুখীন হয়, এবং তখন সেই ব্যক্তির জ্ঞান জন্মে। কিন্তু সহজ বুদ্ধিতে বোধ হইবে এই জাতি-জ্ঞান আমাদের ক্রমে ক্রমে জন্মে; অর্থাৎ এক প্রকারের একাধিক বস্তু দেখিতে দেখিতে উভয়ের সাদৃশ্য জ্ঞান হইতে এই জাতি-জ্ঞান জন্মগ্রহণ করে। যেমন এক ব্যক্তি প্রথমে একটী গরু দেখিল; এ সময় তাহার মনে ঐ গরুর আকৃতি ও প্রকৃতির ছাপ পড়িল। ছাপটী পড়িবামাত্র, মানবপ্রকৃতির জ্ঞান-লালসা বশে সে তাহার নাম ও অন্যান্য বিষয় জানিবার জন্য লালায়িত হইল। ইহার ফলে সে ব্যক্তি তাহার পূর্ব্ব-পরিচিত যাবতীয় জ্ঞানের সহিত সেই ছাপটীকে মিলাইতে বসিল কিন্তু সে এই প্রথম গরু দেখায় পূর্ব্বপরিচিত কোন জ্ঞানের সহিত সেই ছাপটীকে মিলাইতে পারিল না; অগত্যা তখন সে তাহাকে মনের মধ্যে রাখিয়া দেয়। গরুটী চক্ষুর অন্তরাল হইলেও মনে তাহার পূর্ব্ববৎ গরুর ছাপটী রহিয়া গেল। তাহার পর দুই চারি দিন পরে ঐ ব্যক্তি আবার একটী গরু দেখিল। এসময় এই দ্বিতীয় গরুরও তাহার মনে পূর্ব্ববৎ একটী ছাপ পড়িল। এখন এই ছাপটীকে পূর্ব্ব-জ্ঞানের সহিত পূর্ব্ববৎ মিলাইতে প্রবৃত্ত হইয়া সে দেখিল যে, ইহার মত সে পূর্ব্বে কেবল একটী মাত্র দেখিয়াছে; তখন সে ইহাকে সেই পূর্ব্বদৃষ্ট সেইটাই কি না, ভাবিতে বসে। ইহার ফলে তাহার চক্ষে উক্ত গরু দুইটীর কতকটা সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য জ্ঞান হয়। এই সাদৃশ্য জ্ঞানই ক্রমে জাতিতে পরিণত হয়।

পরন্তু ন্যায় বলিবেন যে, না,—এই জাতিজ্ঞান ওরূপে জন্মে না—উহা নিত্য। কারণ মানবের উক্ত জাতি-অন্বেষণ-প্রবৃত্তিই তাহার প্রমাণ। যেমন, কাহারও যদি টাকা থাকে এবং যদি কাহাকেও তাহার কিছু টাকা দিবার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে সে ব্যক্তি যেমন তাহার পকেট বা বাক্স প্রভৃতি অন্বেষণ করে, কিন্তু তাহার টাকা না থাকিলে যেমন সে ব্যক্তি কোনরূপ অন্বেষণ করে না, তদ্রূপ আমরা যে, কোন কিছু দেখিয়া তাহার জাতি-

অন্বেষণে প্রবৃত্ত হই, তাহাই আমাদের নিকট জাতির অস্তিত্ব-জ্ঞানের পরিচায়ক। যদি বলা যায় যে, যদি আমাদের উক্ত জাতির অস্তিত্ব-জ্ঞান থাকে, তাহা হইলে তদ্বিষয়ে আমরা সর্ব্বদা অবগত থাকি না কেন? কিন্তু তাহার উত্তরে বলা যায় যে, উহা কেবল আমাদের নিকট অজ্ঞানাবরণে আবৃত থাকে, উক্ত জাতির ব্যক্তি দেখিলে, সেই ব্যক্তি তাহার জাতিকে উদ্বোধিত করে বা আকর্ষণ করিয়া মনোমধ্য হইতে বাহির করে। এই উদ্বোধন বা আকর্ষণকে, জ্ঞাতার দিক্ হইতে দেখিতে গেলে, জ্ঞাতার জাতি-অন্বেষণ-ব্যাপার বলা হয়। বস্তুতঃ উক্ত আকর্ষণ বা অন্বেষণে কোন ভেদ নাই। সুতরাং জাতি নিত্য, ইহা জ্ঞানের বৃদ্ধির সঙ্গে মানবমনে উৎপন্ন হয় না। কারণ, যাহা উৎপন্ন হয়, তাহা অনিত্য।

যাহা হউক, এতদূরে আমরা দেখিলাম, ন্যায়মতে প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয় কি প্রকারে; এক্ষণে দেখা যাউক, এই প্রত্যক্ষ জ্ঞানে ভ্রমের স্থান কোথায়?—কি প্রকারে প্রত্যক্ষ জ্ঞানে ভ্রম প্রবেশ করে ইত্যাদি। ইতিপূর্ব্বে এই প্রবন্ধের প্রারম্ভে আমরা দেখিয়াছি যে, ভ্রম বলিতে নৈয়ায়িকগণ 'একে অন্যথা প্রতীতি' বুঝিয়া থাকেন এবং এইজন্যই তাঁহাদিগকে অন্যথাখ্যাতি-বাদী বলে; এক্ষণে দেখা যাউক, এই অন্যথা-প্রতীতি কি প্রকারে ঘটে।

ভ্রমজ্ঞানের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যায় যে, পূর্ব্বোক্ত লেখনী বস্তু দেখিয়া অর্থাৎ প্রত্যক্ষ জ্ঞানে যাহা প্রথম ও দ্বিতীয় প্রয়োজন বলিয়া উক্ত হইয়াছে, সেই প্রযোজনদ্বয় সিদ্ধ হইবার পর যদি মনের সহিত জাতিপদার্থের সংযোগকালে কোন দোষ ঘটে, এক কথায় প্রত্যক্ষ জ্ঞানের যাহা তৃতীয় প্রযোজন, তাহা সিদ্ধ হইবার কালে যদি কোন গোল-যোগ হয়, তাহা হইলে লেখনী দেখিয়া দ্রষ্টার মনে অন্য বস্তুর জ্ঞান উৎপন্ন হয়। যেমন এক ব্যক্তি ইন্দ্রিয়দোষযুক্ত হইয়া অথবা অল্পান্ধকারে একটী রজ্জু দেখিল, দেখিবামাত্র মনে তাহার সেই রজ্জুর আকৃতি-সম্বন্ধে একটী ছাপ পড়িল। এই ছাপটী তাহার নিকট তখন আর কিছুই নহে, পরন্তু একটী সরু লম্বা, হিলিবিলির মত "একটা কিছু" মাত্র। ইহার পর সে ব্যক্তি ঐ জিনিষটার নামও জাতি-নির্ণয়-ব্যাপারে নিযুক্ত হয় এবং এই ব্যাপারে নিযুক্ত হইয়া সে ব্যক্তি যদি রজ্জু-জাতির সহিত ইহাকে তাহার মনোমধ্যে মিলাইতে না পারে, পরন্তু রজ্জুজাতির অনুরূপ সর্পজাতির সঙ্গে মিলাইয়া ফেলে, তাহা হইলে সে ব্যক্তি তখন সেই রজ্জুটাকে রজ্জু না

বলিয়া সাপ বলিয়া বসে। এই প্রকার এক জিনিষকে আর এক জিনিষ বলিয়া বুঝাই ভ্রম, এবং এক জিনিষকে অন্য জিনিষ বলিয়া জ্ঞান করা হয় বলিয়া এই জ্ঞানের অন্যথাখ্যাতি বা অন্যথাপ্রতীতি।

রামানুজ বলেন—"আচ্ছা বুঝা গেল তোমার অন্যথাখ্যাতিবাদ, কিন্তু বল দেখি, তোমার উক্ত অন্যথাপ্রতীতি, কি বস্তুর জ্ঞান-সম্বন্ধে, অথবা বস্তুজ্ঞানজন্য যে ফল উৎপন্ন হয়, সেই ফল সম্বন্ধে, কিম্বা বস্তুর বস্তুত্ব অংশে অভিপ্রেত? নিশ্চয়ই তুমি এই তিন প্রকার ভিন্ন অন্য কোন প্রকারই কল্পনা করিতে পার না; অথবা তোমার যাহা অভিপ্রেত, তাহা এই তিন প্রকারের মধ্যে কোন এক প্রকার; সুতরাং বল দেখি, কোন্ পক্ষটী তোমার অভিপ্রেত?

যদি বল, উক্ত অন্যথাখ্যাতি বস্তুর জ্ঞান-সম্বন্ধেই অভিপ্রেত, অর্থাৎ শুক্তি দেখিয়া রজতজ্ঞানস্থলে রজতাকার জ্ঞানটী শুক্তি বস্তুকে অবলম্বন করিয়া ঘটে, ইত্যাদি; তাহা হইলে বল দেখি, শুক্তি কেন তোমার মনে রজতজ্ঞান উৎপাদন করিবে? বিষয় ও মনের সম্বন্ধ এই যে, বিষয়ের সহিত মন সংযুক্ত হইলে, বিষয় তাহার নিজের আকারই মনে অর্পণ করিয়া থাকে। সুতরাং শুক্তি দেখিলে শুক্তিস্থানীয় বিষয় কেন রজতাকারটী তোমার মনে অর্পণ করিবে? ইহা ত কথনই সঙ্গত হইতে পাবে না। যদি বল পূর্ব্বোক্ত শুক্তি-জাতিজ্ঞানের সহিত মনের সন্নিকর্ষ ব্যাপারে রজত-জাতি-জ্ঞানটী লুকাইয়া শুক্তি-জাতি জ্ঞানের স্থানটী অধিকার করায়, শুক্তি দেখিয়া রজতজ্ঞান জন্মিয়াছে, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি, বল দেখি, এরূপ লুকোচুরি ঘটিবার কারণ কি? শুক্তি দেখিয়া শুক্তিজাতির অন্বেষণ অথবা শুক্তি-ব্যক্তির শুক্তিজাতিকে আকর্ষণ-ব্যাপারটী যদি কোন প্রাকৃতিক নিয়মাধীন হয় বল, তাহা হইলে সে নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটাইবার কারণ কি? আর যদি জ্ঞাতার স্বেচ্ছাধীন বল, তাহা হইলে বল দেখি, কে কোথায় একটা জিনিষকে আর একটা বলিয়া ভুল করিয়া ঠকিতে চাহে? সুতরাং শুক্তিকে রজত বলিয়া বুঝিলে জ্ঞান-সম্বন্ধে অন্যথা-ভাব ঘটে, একথা তোমার স্থান পায় না।

আর যদি দ্বিতীয় পক্ষটী গ্রহণ করিয়া বল যে, শুক্তিতে রজতজ্ঞান "ফল" সম্বন্ধীয় কথা, জ্ঞান বা বস্তুঘটিত ভ্রম নহে, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি, ভ্রম ও যথার্থ জ্ঞানে পার্থক্য কি? "ফল" বলিতে তোমরা সকলে পূর্ব্বোক্ত অনুব্যবসায়,

স্ফুরণ বা প্রাকট্যকে লক্ষ্য করিয়া থাক, আর তোমাদেরই মতে উহা জ্ঞাতৃস্থানীয় আত্মার নিকট বস্তুগত অজ্ঞানাবরণ-নাশরূপ প্রকাশ ভিন্ন অন্য কিছু নহে। ইহা ত ভ্রমকালেও যেরূপ ঘটে, যথার্থজ্ঞানকালেও সেইরূপই ঘটে। বস্তু বা বিষয়প্রকাশ অংশ, ঐ উভয় স্থলেই সাধারণ অংশ; সুতরাং আমি জানিতেছি ইত্যাকার অনুব্যবসায়রূপ ফলের স্থলে ভ্রম ও যথার্থ জ্ঞান দুইটীই সমান হইয়া পড়িতেছে, কুত্রাপি ইহার বৈষম্য দেখা যায় না। অগত্যা বল, তোমার ফল সম্বন্ধে যে অন্যথাখ্যাতিবাদ, তাহাও দাঁড়াইতে পারিতেছে না।

তাহার পর যদি তৃতীয় পক্ষটী অবলম্বন করিয়া বল যে, শুক্তিতে যে রজতভ্রম হয়, তাহা বস্তু-সম্বন্ধীয় কথা,—জ্ঞান বা ফলসম্বন্ধীয় কোন কিছু নহে, তাহা হইলেও তোমার অবস্থা আরও সঙ্কটাপন্ন হইবে। দেখ, শুক্তিতে রজতজ্ঞানকালে শুক্তি-বস্তু-সম্বন্ধে তুমি দুইপ্রকার বিকল্প করিতে পার; যথা,—প্রথম, শুক্তি-বস্তুর সহিত রজত-বস্তুর অভিন্নভাবপ্রাপ্তি এবং দ্বিতীয়, শুক্তি-বস্তুর রজতাকারে পরিণাম; অর্থাৎ প্রথম স্থলে শুক্তি দেখিবামাত্র শুক্তি-বস্তুটী রজত হইয়া যায়, এবং দ্বিতীয় স্থলে শুক্তি দেখিবামাত্র দুগ্ধ যেমন দধি হয়, তদ্রূপ শুক্তি বস্তুটী রজতাকারে পরিণত হয়। এখন যদি ইহাদের প্রথম পক্ষটী গ্রহণ কর অর্থাৎ শুক্তি দেখিবামাত্র শুক্তি বস্তুটী রজত হয়—এই কথা বল, তাহা হইলে বল দেখি, যাহারা স্বরূপতঃ অত্যন্ত ভিন্ন বস্তু তাহাদের এরূপ ঘটনা হয় কেন? বস্তুতঃ একথা তুমিই স্বীকার কর যে, শুক্তি ও রজত স্বরূপতঃ ভিন্ন। আর যদি দ্বিতীয় পক্ষ গ্রহণ কর, অর্থাৎ শুক্তি দেখিবামাত্র শুক্তি বস্তুটী দুগ্ধের দধি হওয়ার ন্যায় রজতাকার ধারণ করে—এই কথা বল, তাহা হইলে ভ্রমের বাধ হওয়া ব্যাপারটী অসম্ভব হয়। যে শুক্তিতে রজতভ্রম হইয়াছিল, তাহাকে আবার শুক্তি বলিয়া বুঝাই ভ্রমের বাধ হওয়া। আর তোমার মতে ভ্রমের বাধ যদি না হয়, তাহা হইলে সে ভ্রমকে ভ্রম বলাই উচিত নহে। যদি বল ভ্রমকালে শুক্তির রজতাকার ধারণ যেমন দুগ্ধের দধি হওয়ার ন্যায় বলা হয়, তদ্রূপ বাধকালেও রজতের শুক্তির আকার ধারণও দুগ্ধ দধি হওয়ার ন্যায় বলিব, তাহা হইলে দেখ, তোমার ভ্রমকালের জ্ঞানও যথার্থ হইয়া দাঁড়াইল, কারণ, দুগ্ধ ও দধি উভয়ই সত্য এবং একই কালে দুগ্ধের দুগ্ধাবস্থা ও দধি-অবস্থা থাকা অসম্ভব। সুতরাং দেখ অন্যথাখ্যাতিবাদ বস্তু অংশে অভিপ্রেত একথাও তোমার থাকিল না।

অগত্যা বল—কি জ্ঞান সম্বন্ধে, কি ফল সম্বন্ধে অথবা কি বস্তুত্ব অংশে, কোন প্রকারেই তোমার অন্যথাখ্যাতিবাদ সিদ্ধ হয় না। অতঃপর টীকা মধ্যে ন্যায়ের বিচারপদ্ধতিঘটিত একটী বিচার আছে, পরন্তু তাহা অত্যন্ত জটিল বলিয়া এস্থলে পরিত্যক্ত হইল। আগামী বারে মায়াবাদীদিগের অনির্ব্বচনীয়খ্যাতিবাদ আলোচনা করিয়া গ্রন্থকারের গ্রন্থোক্ত বিষয়ের অনুসরণ করিব।

---

* সৎ কথা।

সুহৃৎপ্রবর—মহাশয়ের ঐকান্তিক অনুরোধে আজ আমি শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলিবার জন্য প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমার এ বিষয়ে অগ্রসর হওয়া কেবলমাত্র বাতুলতা; কারণ, বিষয়টি অতিশয় গুরুতর এবং আমার নিজের শক্তি নিতান্ত ক্ষীণ। তবে মহাজনের আদেশ উপেক্ষা করিতে সঙ্কুচিত হওযায আজ আমার এই দুঃসাহসিক প্রয়াস। প্রবন্ধে অনেকগুলি ত্রুটি স্থলে স্থলে সংঘটিত হইবার সম্ভাবনা। তজ্জন্য সভ্যমণ্ডলীর নিকট আমার সবিনয় নিবেদন, যেন তাঁহারা নিজেদের সহৃদয়তাগুণে আমাকে ক্ষমা করেন।

প্রায় ১৫ বৎসর পূর্ব্বে একদিন সংবাদপত্রে দেখিলাম, আমেরিকা ইংলণ্ড ইত্যাদি পাশ্চাত্য প্রদেশ সকল পরিভ্রমণ করিযা এবং বহু আয়াসে ঐ সকল জড়বাদী দেশবাসিগণের নিকটে সনাতন হিন্দুধর্ম্মের গৌরব প্রতিষ্ঠিত করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার চিরদিনের প্রিয়তম ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিতেছেন। ঐ দিন হইতে আমার মন তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। ইহার পূর্ব্বে তাঁহার সম্বন্ধে আমার বিশেষ কিছুই জ্ঞান ছিল না। ঐ দিন হইতে তাঁহার বিষয় জানিবার জন্য প্রাণে কেমন একটী ব্যাকুলতা জন্মিয়াছিল। সেই সময় হইতে তাঁহার রচিত নানা ধর্ম্ম-পুস্তক সময় মত পড়িতে আরম্ভ

---

* শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দজির জন্মতিথি উপলক্ষে বহুবাজার রামকৃষ্ণসমিতির সভ্যগণ কর্ত্তৃক একটী মহতী সভা আহূত হইয়াছিল। এই সভাতে সমিতির জনৈক স পূর্ণচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক এই প্রবন্ধটী পঠিত হইয়াছিল।

করিয়াছিলাম। তখন তাঁহার পুস্তকে বিবৃত গুরুতর সমস্যাগুলির যথার্থ মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিবার সামর্থ্য আমাতে আদৌ বর্ত্তমান ছিল না। তত্রাচ ঐ সকল পুস্তক পাঠ করিবার জন্য তখন কেমন একটী ইচ্ছা আমাতে বলবতী ছিল।

আমার অদৃষ্টে কেবলমাত্র ৪।৫ বার স্বামীজির সন্দর্শন লাভ ঘটিযাছিল। কিন্তু তাঁহার সেই তেজোময়ী মূর্ত্তি, তাঁহার সেই দেবদুর্ল্লভ প্রীতিময় সাম্য-ভাব আজও যেন আমার সমক্ষে জাজ্বল্যমান রহিযাছে।

একদিন তাঁহার শ্রীমুখ হইতে শুনিয়াছিলাম—আমার কথা বিশ্বাস কর, কর্ম্মজগতে মনোযোগ দিয়া কর্ম্ম কর, মঙ্গল হইবে—আত্মপ্রসাদ লাভ হইবে। মিথ্যা সত্ত্বগুণের ভাণ করিয়া তমের আশ্রয় লইয়া নিশ্চেষ্ট থাকিও না।

আমার বোধ হয, উপস্থিত কালে সকলেরই এই উপদেশমত কার্য্য করা উচিত। এই অধঃপতনের কালে এই পথই বোধ হয একমাত্র মঙ্গলময় পথ।

স্বামীজির প্রচারিত "সেবাধর্ম্ম" কি সুন্দর ও স্বর্গীয়-ভাব-বিশিষ্ট! ভগবান্ সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছেন। কিন্তু আমরা মোহান্ধ হইয়া তাঁহাকে দেখিতে পাই না। এইজন্য স্বামীজি সাধারণের মঙ্গলের জন্য সর্ব্বদা বলিতেন—জগতের সকল অণু ও পরমাণু-মধ্যে ভগবানের অস্তিত্ব বিদ্যমান আছে, এই জ্ঞানে প্রত্যেক বস্তু দর্শন করিলে সেই করুণাময় ভগবানের দর্শনই লাভ করা হয। সকল শাস্ত্রে বিধি আছে, সর্ব্বদা ভগবানের সেবা জীবনের ব্রত করিবে। আমরা মায়ামুগ্ধজীব, জানিনা কোথায় এবং কিরূপে ভগবানের সাক্ষাৎকার হইবে। কেমনে শাস্ত্র-বাক্য পালন করিব? স্বামীজি সর্ব্বজ্ঞ ছিলেন বোধ হয়। নতুবা কেমন করিয়া তিনি সকলের অসুবিধা নিজে অনুভব করিয়া শাস্ত্রবাক্য কার্য্যকরী করিবার জন্য সরল ভাষায় সকলকেই বুঝাইয়া দিয়াছেন—যখন ভগবান্ সকল জীবের মধ্যেই বিরাজমান, তখন স্বার্থের দিকে দৃষ্টি একটু কম করিয়া জগতের প্রত্যেক জীবের বিধিমত সেবা করিলে ভগবানেরই সেবা করা হয়। ভগবানের পূজা ও সাধনা করিবার ব্যবস্থা সকল ধর্ম্মপুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু পূজা ও

সাধনা অর্থে কি বুঝায়, তাহা আমাদের অনেকের সবিশেষ জানা সম্ভবপর নহে। এইজন্য সাধারণের অবগতির জন্য স্বামীজি বলিয়াছেন—যখন এই বিশ্বজগৎ মঙ্গলময় ভগবানের সৃষ্ট এবং যখন তিনি এই জগৎ হইতে কখনই ভিন্ন নহেন, তখন আপনাকে ভুলিয়া জগতের মঙ্গলের জন্য প্রাণপাত করিলে প্রকারান্তরে তাঁহারই পূজা ও তাঁহারই সাধনা করা হয়।

আজ যদি ভারতবাসী সকলে স্বামীজির এই কল্যাণকর উপদেশ শিরে ধারণ করিয়া ভগবানের সেবায় তৎপর হয়, তাহা হইলে কত বৃথা গণ্ডগোল মিটিয়া যায়, মানবের কি বহুল মঙ্গল সাধিত হয়। জগতে কি এক অপূর্ব্ব শান্তিভাব বিরাজ করে, তাহা ভাবিলেও প্রাণ আনন্দে পুলকিত হয় এবং যিনি এই নবধর্ম্মের প্রবর্ত্তক, তাঁহার চরণে হৃদয় বিকাইতে ইচ্ছা হয়।

স্বাধীনতা সম্বন্ধে স্বামীজির উক্তিগুলি কেমন সুন্দর ও কত উচ্চ-ভাব-বিশিষ্ট! তিনি বজ্রগম্ভীর স্বরে আমাদের সকলকে উত্তেজনা দিবার জন্য বলিয়া গিয়াছেন—সেই স্বাধীন, সেই প্রধান, যিনি ত্যাগী, সংসার-বৈরাগী, ইন্দ্রিয়জয়ী ও শান্তিপ্রয়াসী। সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভে সমর্থ হইলেও যিনি স্বকীয় রিপুগণের ও ইন্দ্রিয়াদির অধীন তিনি কখনই প্রকৃত স্বাধীনতার বিমল সুখ অনুভব করিতে পারেন না।

আমরা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা লাভের জন্য মহাব্যস্ত। সর্ব্ব বিষয়েই এবং সকল সময়েই নিজের প্রাধান্য অটুট রাখিয়া চলিতে চাই। কাহারও কর্তৃত্ব গ্রাহ্য করিতে চাহি না। কিন্তু আমরা যে নিজেরাই নিজেদের কর্ত্তা নহি! সর্ব্বদা যে আমরা নিজেরা নিজ নিজ ইন্দ্রিয়াদির অধীন, তাহা কেহই বুঝিতে চাহি না বা বুঝিবার সামর্থ্যও রাখি না। এরূপ ক্ষেত্রে স্বামীজির প্রচারিত স্বাধীনতার সরল অর্থ যথার্থই সাধারণের সমূহ মঙ্গল সাধন করিয়াছে।

স্বামীজির হৃদয়ে দেশহিতৈষিতা কিরূপ প্রবল ছিল, তাহা তাঁহার নিম্নলিখিত কয়েকটি ছত্র পাঠে সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে। "হে ভারত!

তুমি ভুলিও না—তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী; ভুলিও না, তোমার উপাস্য উমানাথ সর্ব্বত্যাগী শঙ্কর; ভুলিও না, তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন, ইন্দ্রিয়-সুখের—নিজের ব্যক্তিগত সুখের—জন্য নহে; ভুলিও না, তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলি প্রদত্ত; ভুলিও না, তোমার সমাজ সে বিরাট্ মহামায়ের ছায়া মাত্র; ভুলিও না, ভারতের নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর, তোমার রক্ত; তোমার ভাই। হে বীর! সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই, বল—ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশু-শয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্দ্ধক্যের বারাণসী; বল ভাই, ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ; ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ।”

এরূপ স্বদেশপ্রেম এই অধঃপতনের দিনে সাধারণতঃ দৃষ্টিগোচর হয় না। আমরা অজ্ঞ, স্বামীজির জীবিতকালে তাঁহার মহিমা কিছুই বুঝিতে পারি নাই। আজ তাঁহাকে হারাইয়া ভারত একটি মহান্ রত্নহারা হইয়া হাহাকার করিতেছে। যাঁহারা ভারতের কল্যাণের জন্য উপস্থিত যত্নবান্, স্বামীজির আদর্শ তাঁহাদিগের সকলেরই অনুকরণীয়।

ধর্ম্মনিষ্ঠায় স্বামীজি অদ্বিতীয় ছিলেন। ধর্ম্মই তাঁহার জীবনের মূল মন্ত্র ছিল। এই ধর্ম্ম লাভের জন্য তিনি জীবনে কত কত কঠোরতা সহ্য করিয়া গিয়াছেন। এবং পরে এই ধর্ম্মের প্রভাবেই তিনি জগতে কত মহান্ কর্য্যকলাপ সুসম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিতেন,—

ধর্ম্মে লক্ষ্য রাখিয়া জগতে বিচরণ করিলে কখনও পতনের সম্ভাবনা থাকে না। কর্ম্মে কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে হইলে ধর্ম্মই একমাত্র সহায়স্থল। ধর্ম্মের বলেই ভারত জগতে সমুন্নত ছিল। এই ধর্ম্মহীনতার কালেও ধর্ম্মে আমরা এখনও সমগ্র জাতির আচার্য্যের স্থান অধিকার করিতে সক্ষম।

এবংবিধ অশেষপ্রকার অলৌকিক গুণ রাশিতে বিভূষিত ছিলেন বলি-

য়াই আজ স্বামীজিব নাম সকলের মুখে মুখে; তাই ঘরে ঘরে আজ তাঁহার পূজার বিরাট্ আয়োজন। সেইজন্য তাঁহার একখানি প্রতিমূর্ত্তি নিকটে রাখিবার জন্য, তাঁহার রচিত দুই চারিখানি পুস্তক পাঠ করিবার জন্য আজ জনসাধারণের এত আগ্রহ। তাঁহার প্রচাবিত নূতন "সেবাধর্ম্ম" সম্যক্ পরিচালনে সেইজন্যই আজ সকলের এত উৎসাহ। স্বামীজির এই সেবা-মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হইয়া ১২ নং সারপেন্‌টাইন্ লেনস্থিত রামকৃষ্ণ-সমিতির সভ্যগণ কর্ত্তৃক পল্লিমধ্যে অনাথভাণ্ডার নামে একটী দাতব্য ভাণ্ডার সংস্থাপিত হইযাছে, ভাণ্ডারের উদ্দেশ্য দীন দুঃখী ও আর্ত্তজনের সহায়তা করা। ভাণ্ডারটী আজ ৭ বৎসর যাবৎ সুন্দররূপে পবিচালিত হইতেছে। আইস, স্বামীজির স্মৃতিরক্ষার জন্য এই ভাণ্ডারের উন্নতিকল্পে সকলে বদ্ধপরিকর হই; আইস, আজ পুনরায নূতন করিয়া সকলে স্বামীজির সার্ব্বভৌমিক প্রেমমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া মন প্রাণ এক করিযা প্রীতিভরে গাই;—

টুটুক্ পদের মোহ, বংশ-অহঙ্কার,
দ্বেষ হিংসা যা'ক্ চলি,
ঘুচে যাক্ দলাদলি
হউক্ জগৎ মাঝে কর্ত্তব্য সবার,
বিশ্বের মঙ্গল সদা ব্রত সাধনার;
নীচতা হীনতা দৈন্য চলে যা'ক্ দূরে,
টুটুক্ সঙ্কীর্ণ নীতি,
ঘুচুক্ বিষয়াসক্তি,
উঠুক্ মাতিযা সবে পরহিত তরে;
হউক্ স্বরগ-রাজ্য ভুবন ভিতরে।

দেখিতেছি, যে মহাশক্তি একদিন কোন একটী নিভৃত স্থানে সকলের অলক্ষ্যে লুক্কায়িত ছিল, এখন দিন দিন তাহা চারিদিকে প্রসারিত হইয়া পড়িতেছে। শুদ্ধ ভারতবাসী নহে, ক্রমে সমস্ত জগৎবাসী স্বামীজিতে ঐশী শক্তির বিকাশ ধীরে ধীরে অনুভব করিতেছে। আমরা এখনও অনেক পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছি; স্বামীজি সম্বন্ধে সম্যক্ উপলব্ধি কিরূপে লাভ করিব? সময়ে বোধ হয় সকলেই সমস্বরে বলিবেন যে, আমাদের স্বামীজি জ্ঞানে জ্ঞানাবতার শঙ্করাচার্য্যের, কর্ম্মে শ্রীকৃষ্ণ-সখা অর্জ্জুনের, এবং ভক্তিতে দেবর্ষি নারদের সমতুল্য ছিলেন।

যে মহান্ আচার্য্যের বিমল ও পবিত্র ছায়ায় স্বামীজির জ্ঞান বুদ্ধি ও বিবেক বৃদ্ধি পাইয়াছে, যাঁহার মহিমায় স্বামীজি মহিমান্বিত হইয়াছেন, আইস, আজ স্বামীজির জন্মতিথির দিনে সেই পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে একবার স্মরণ করিয়া আমরা সকলে কৃতকৃতার্থ হইয়া যাই। আইস সকলে প্রাণ ভরিয়া একবার সেই দেবতার উদ্দেশে বলি,—

"ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব
ত্বমেব বন্ধুশ্চ প্রভু ত্বমেব।
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব
ত্বমেব সর্ব্বং মম দেবদেব॥"

মানবকে দিবারাত্র কাম ক্রোধ ইত্যাদি রিপুগণের সহিত, সংসারের প্রতিদ্বন্দ্বিতা, স্বার্থপরতা ও নৈরাশ্যের সহিত সংগ্রাম করিতে হয়। এই ঘাত-প্রতিঘাত লইয়াই মনুষ্য-জীবন। এই ভীষণ সংগ্রামে আমরা কখনও বা জয়ী হই, কখনও বা পরাজিত হই। পাপ-প্রলোভনের সহিত সংগ্রামে একবার বা কয়েকবার পরাজিত হইলেই ধর্ম্মজীবন নষ্ট হয় না। পতন ও উত্থান লইয়াই আমাদের জীবন। কিন্তু পতন হইলে যাহাতে আমরা হতাশ ও ভগ্নোদ্যম হইয়া না পড়ি এবং যাহাতে পুনরুত্থানের চেষ্টা আমাদের হৃদয়ে সর্ব্বদা বলবতী থাকে, সেইজন্য স্বামীজি উৎসাহপ্রদ বাক্যে সর্ব্বদা বলিতেন—দেয়ালটা চুরী করে না, গরুটা মিথ্যা কথা কয়না কিন্তু উহারা চিরকাল দেওয়াল বা গরু থাকে। মানুষ জীবনে অনেক ভুল ভ্রান্তি করে কিন্তু তাহাতে ক্ষতি নাই। মানুষই আবার সাধনার দ্বারা দেবতার ঊর্দ্ধে স্থান পাইবার উপযুক্ত হয়। আইস, এই আশ্বাসপ্রদ বাণীর উপর নির্ভর করিয়া আমরা আজ হইতে জগদ্বক্ষে বিচরণ করিতে শিক্ষা করি। এই ঘোরতর জীবনসংগ্রামে কখনও বিজয়ী হইলে যেন আমাদের অহঙ্কার বৃদ্ধি না পায় এবং সংগ্রামে পরাজিত হইলে আমরা হতাশ হইয়া যেন জীবনস্রোতে ভাসিয়া না যাই, যেন করুণা-নিধান বিশ্বপিতা-সন্নিধানে তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করিতে আমাদের বিস্মরণ না হয়। তিনিই আমাদের বল, বুদ্ধি ও ভরসা। তাঁহাতে মতি স্থির করিতে পারিলে এবং তাঁহার ঐশী শক্তিতে শক্তিমান্ হইতে পারিলে—

"দুর্গমে গহনে বাপি কা চিন্তা মরণে রণে।"

মহর্ষি ফ্র্যান্‌সিস্।

চতুর্থ অধ্যায়।

অন্তঃসংগ্রাম ও জয়লাভ।

১২০৬—১২০৯ খ্রীঃ অব্দ।

[শ্রীহরিদাস দত্ত, বি, এ।]

গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া বার্নারডন্ পুত্রের ঐরূপ মানসিক ভাবপরিবর্ত্তন সম্বন্ধে সমুদয় ঘটনা শ্রবণ করিয়া অতীব বিরক্ত হইলেন। পুত্রকে লইয়া সহরশুদ্ধ লোক উপহাসাদি করিবে, এ চিন্তা তাঁহার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল। সেজন্য সহর হইতে তাঁহাকে স্থানান্তরিত করিবার নিমিত্তই তিনি চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইহার অল্পদিন পরেই একদিন সেণ্ট ড্যামেনে যাইয়া তিনি পুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন—"ফ্র্যান্‌সিস্! তুমি যেরূপ ভাবে কার্য্য করিতেছ, তাহাতে ত আমার আর মান সম্ভ্রম কিছুই থাকে না। অতএব তুমি শীঘ্র এখান হইতে অন্যত্র গমন কর। তথায় তোমার যাহা ইচ্ছা হয় করিও, আমি কোনরূপ আপত্তি করিব না।" পূর্ব্বের ন্যায় এবার কিন্তু ফ্র্যান্‌সিস্ পিতার ভয়ে লুকাইয়া থাকিবার চেষ্টা করিলেন না। তিনি তাঁহার সম্মুখে নির্ভয়চিত্তে উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"আপনি যতই চেষ্টা করুন না কেন, কিছুতেই কিন্তু আমাকে আমার সংকল্প পরিহার করাইতে পারিবেন না। আমি যখন দাস্যভাবে ঈশ্বর উপাসনা ও সেবায় আত্মসমর্পণ করিয়াছি, তখন আমি আর আপনার আদেশ প্রতিপালন করিতে বাধ্য নহি। এখন হইতে তাঁহারই আদেশ অনুযায়ী আমি কার্য্য করিব।" পুত্রের ঈদৃশ আচরণে বার্নারডন অতিশয় অসন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন "তুমি জান, তোমার জন্য আমার কত অর্থ ব্যয় হইয়াছে?" এই কথায় ফ্র্যান্‌সিস্ নিজ দ্রব্যাদি বিক্রয় পূর্ব্বক যে অর্থ সংগ্রহ করিয়া নিকটে রাখিয়াছিলেন, তাহাই এখন অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া পিতাকে দেখাইয়া দিলেন। বার্নারডন্ তৎক্ষণাৎ উহা গ্রহণ করিলেন এবং পুত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিবার অভিপ্রায়ে তথা হইতে বিচারালয়ে প্রস্থান করিলেন। বিচারপতিগণ তাঁহার মুখে সকল কথা শুনিয়া ফ্র্যান্‌সিস্‌কে ডাকাইয়া পাঠাইলে ফ্র্যান্‌সিস্ বলিয়া পাঠাইলেন

—"যখন আমি ধর্ম্মসঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছি, তখন আমার উপর আপনাদের আর কোনরূপ অধিকার নাই, এবং আমিও এখন আর আপনাদের আদেশ পালন করিতেও বাধ্য নহি।" তাঁহার এইরূপ উত্তরে বিচারপতিরা যেন একটী বিষম সমস্যা হইতে অব্যাহতি পাইয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন; এবং বার্‌নার্‌ড্‌ন্‌কে প্রধান ধর্ম্মাচার্য্যের নিকটে অভিযোগ করিতে পরামর্শ দিলেন। তিনিও তাঁহাদের ঐ উপদেশ অনুযায়ী কার্য্য করিলেন। কিন্তু ধর্ম্মাচার্য্যের বিচারালয়ে তাঁহার কোনরূপ সুবিধা হইবার আশা ছিল না। কারণ, তাঁহার ইচ্ছা পুত্রকে সহর হইতে নির্ব্বাসিত করা। কিন্তু নিজ সঙ্ঘভুক্ত লোকদের পক্ষ অবলম্বন করিয়া তাহাদিগকে বিপদাপদ হইতে রক্ষা করিতেই যে, ধর্ম্মাচার্য্যেরা স্বভাবতঃ অগ্রসর হইবেন, এ কথাও নিশ্চয়। সেজন্য ইঁহার নিকট হইতে পুত্রের নির্ব্বাসন দণ্ড আশা করা একপ্রকার বিড়ম্বনামাত্র, এ কথা বার্‌নার্‌ড্‌ন্ বেশ বুঝিতে পারিলেন। অতএব পুত্রকে নিজ বিষয়াধিকার হইতে বঞ্চিত করা অথবা তাঁহাকে স্বেচ্ছায় সে স্বত্ব পরিহার করিতে প্রবৃত্ত করান ভিন্ন অধিক কিছু করা যে এস্থলে সম্ভব নহে, এ কথা তিনি বেশ বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু ঐ কার্য্য নিষ্পাদনের জন্য তাঁহাকে কোনরূপ বেগ পাইতেও হয় নাই।

অনন্তর ধর্ম্মাচার্য্যগণ ফ্র্যান্‌সিস্‌কে বিচারালয়ে উপস্থিত হইতে আদেশ করিলেন। তাঁহাদের আদেশ শ্রবণ করিয়া ফ্র্যান্‌সিস্ ভাবিলেন যে, যে অলৌকিক ঘটনাপ্রভাবে তিনি ঈশার শরণাপন্ন হইয়াছেন, সেই নিগূঢ় বিষয়টী আচার্য্যগণসমক্ষে নিবেদন করিবার এতদিনে তাঁহার বিশেষ সুযোগ উপস্থিত হইল। এই কথা ভাবিয়া তিনি অতিশয় আনন্দিত হইলেন। জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে পূর্ব্বে স্বকীয় আচরণে ঈশার প্রতি তিনি যে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, আজি সর্ব্বজনসমক্ষে তাঁহার প্রতি নিজ অটল বিশ্বাস ও আজ্ঞানুবর্ত্তিতার পরিচয় প্রদান করিয়া সেই অপরাধ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবেন, এই কথা ভাবিয়াও তাঁহার হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। তাঁহার বিচার উপলক্ষে এ্যাসিসি নগরে মহা হুলস্থুল পড়িয়া যাইল এবং ধর্ম্মাচার্য্যের বিচারগৃহে অতিশয় জনতা হইল। সকলেই ভাবিল, ফ্র্যান্‌সিস্ উন্মাদ হইয়াছেন।

ধর্ম্মাচার্য্য প্রথমে বিচার্য্য বিষয়টী সর্ব্বসমক্ষে বিবৃত করিলেন। তার পর ফ্র্যান্‌সিসের নিজস্ব যাহা কিছু ছিল, তৎসমুদয় তাঁহাকে ত্যাগ করিতে

উপদেশ দিলেন। ফ্র্যান্সিস্ দ্বিরুক্তি না করিয়া তৎক্ষণাৎ ধর্ম্মাচার্য্যের প্রাসাদমধ্যে একটী গৃহে প্রবেশ করিলেন, এবং কিছুক্ষণপরেই পরিধেয় বস্ত্রাদি হাতে করিয়া সম্পূর্ণ নগ্নদেহে সকলের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার ঈদৃশ আচরণে দর্শকমাত্রেই স্তম্ভিত হইল। তার পর হস্তস্থিত সেই দ্রব্যগুলি এবং তাঁহার নিকট যে সামান্য অর্থ এখনও ছিল, তৎসমুদয় ধর্ম্মাচার্য্যের সম্মুখে রাখিয়া সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"মহাশয়গণ! অনুগ্রহপূর্ব্বক মন দিয়া আপনারা সকলে আমার কথা শ্রবণ করুন। অদ্যাবধি পিট্রোবার্নাবড়ন্ ও আমাতে পিতাপুত্র সম্বন্ধ ছিল। আজ হইতে আমাদের সে সম্বন্ধ ছিন্ন হইল। সামান্য অর্থের জন্য ইনি আমাকে যথেষ্ট কষ্ট দিয়াছেন। সেজন্য ইঁহার অর্থ, এবং পরিধেয় বস্ত্রাদি অপর যাহা কিছু আমি ইঁহার নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছিলাম, তৎসমুদয় দ্রব্য আমি ইঁহাকে প্রত্যর্পণ করিতেছি। এখন হইতে আমি পরমপিতা পরমেশ্বরের সেবায় সম্পূর্ণভাবে আত্মবিনিয়োগ করিতে সংকল্প করিয়াছি; এবং ইহার পর শ্রীভগবানের আরাধনা ও উপাসনা ভিন্ন অন্য কোন কর্ম্ম করিবার আমার আর ইচ্ছা নাই।" উপস্থিত সকলেরই হৃদয় এই ঘটনায় বিচলিত হইল এবং দর্শকবৃন্দ ঐ বিষয় লইয়া জল্পনা করায় বিচারগৃহে গোলমাল হইতে লাগিল। বার্নাবড়ন্ সম্মুখে আসিয়া ঐ বস্ত্রাদি গ্রহণ করিলেন। সে সময় তাঁহার মুখ দেখিয়া কাহারও বোধ হইল না যে, পুত্রের প্রতি তাঁহার কিছুমাত্র স্নেহ আছে। শীতে ও হৃদয়াবেগে কম্পিত-কলেবর, নগ্নদেহ ফ্র্যান্সিস্কে ধর্ম্মাচার্য্য তখন হৃষ্টচিত্তে নিজ গাত্রাবরণমধ্যে টানিয়া লইলেন। বিচারালয়ে এই অদ্ভুত দৃশ্য দর্শন করিয়া দর্শকমাত্রেই মুগ্ধ হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ বিদ্রূপ করিবার অভিপ্রায়ে তথায় আসিয়াছিল, কিন্তু ফ্র্যান্সিসের আধ্যাত্মিকতার প্রবল আগ্রহ ও সরলতা এবং তাঁহার পিতার ঐরূপ কঠোর আচরণের জন্য তাহাদের সে অভিপ্রায় ব্যর্থ হইয়াছিল। অনেকেরই হৃদয়মধ্যে সেদিন ফ্র্যান্সিসের প্রতি সহানুভূতির উদয় হয়। কারণ, লোকে ধর্ম্মবিশ্বাসের প্রাবল্যে এইরূপ আকস্মিক পরিবর্ত্তন হইতে দেখিতে চিরকালই ভালবাসে। অতএব তাঁহার অতীত ও বর্ত্তমান জীবনের এই অদ্ভুত পার্থক্য দর্শন করিয়া নগর-বাসিগণের চিত্ত তাঁহার প্রতিই আকৃষ্ট হইয়াছিল। ফ্র্যান্সিসের সর্ব্বসমক্ষে ঐরূপ নগ্নভাবে আগমন শ্লীলতার বিরোধী বলিয়া কোন কোন ধার্ম্মিক

ব্যক্তির মনে লজ্জা ও বিরক্তিভাবের প্রথমতঃ উদয় করিতে পারে, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ঘটনায় তাঁহার বালসুলভ সরলতা, উদ্দাম আধ্যাত্মিক হৃদয়াবেগ এবং অদ্ভুত চরিত্রশক্তির পরিচয় পাইয়া সকলেই একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল।

যাহা হউক, এই আবেগকৃত উত্তেজনার পর তিনি নির্জ্জনতার অভাব বিশেষরূপে অনুভব করিতে লাগিলেন। এতদিন ধরিয়া অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য ও প্রাণপণ চেষ্টা করিবার পর যে তিনি সাংসারিক সকল বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে সফলমনোরথ হইলেন, এজন্য তাঁহার হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল এবং ঐ আনন্দ প্রাণ ভরিয়া অনুভব করিবার জন্য তিনি অতিশয় উৎসুক হইয়া উঠিলেন। সেজন্য তিনি তখন আর সেণ্ট্-ড্যামেনে ফিরিয়া না যাইয়া নিকটবর্ত্তী নগর-তোরণ দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়া সুবাশিও শৈলের জনশূন্য পথে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বসন্তের প্রথমোন্মেষ। স্থানে স্থানে তুষারস্তূপ এখনও বিদ্যমান। কিন্তু সূর্য্যের উত্তাপ পূর্ব্বাপেক্ষা বর্দ্ধিত হওয়ায় শীতের প্রখরতা আর ক্লেশকর বলিয়া বোধ হইতেছিল না। শান্তিময় প্রাকৃতিক দৃশ্যের অপূর্ব্ব মোহিনীশক্তিগুণে ফ্র্যান্সিসের অন্তরে এক অভিনব আনন্দতরঙ্গ প্রবাহিত হইতে লাগিল। তাঁহার শরীর ও মন শান্তিতে পূর্ণ এবং হৃদয় সমুন্নত ভাবে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সমগ্র দৃষ্ট পদার্থনিচয় যেন অতি সন্তর্পণে তাঁহাকে শান্তি-শীকরে অভিষিক্ত করিতে লাগিল, এবং কোন এক অননুভূত সুখসাগরে তিনি যেন আত্মবিস্মৃত হইয়া অবগাহন করিতে লাগিলেন! তখন তাঁহার মুখ-নিঃসৃত সুখ-সঙ্গীতের উচ্চতানে ঐ নিভৃত বনভূমি প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। এইরূপে সুরভি বসন্তানিল মহানন্দে আঘ্রাণ করিতে করিতে এবং পূর্ব্বাধীত ফরাসী বীরগাথাসমূহ উচ্চৈঃস্বরে গান করিতে করিতে তিনি ক্রমে ঐ অরণ্যানীর গভীরতম দেশে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এ্যাসিসি ও তৎ-পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহের দস্যুতস্করগণ তথায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। তাঁহার সঙ্গীতধ্বনি শ্রবণ করিয়া উহাদের কয়েকজন সহসা তাঁহাকে আক্রমণ করিল। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল "তুমি কে?" তিনি বলিলেন—"আমি রাজাধিরাজের আদেশবাহক; কিন্তু সে কথায় তোমাদের কি প্রয়োজন?" পরিচ্ছদের মধ্যে ফ্র্যান্সিসের তখন একটী ঢিলা জামা মাত্র সম্বল ছিল; উহাও আবার প্রধান ধর্ম্মাচার্য্যের আদেশে তাঁহার উদ্যানরক্ষক তাঁহাকে

দান করিয়াছিল। দস্যুগণ সেই জামাটী তাঁহার নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া তাঁহাকে একটী তুষারপূর্ণ গর্ত্তের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া বলিল "জগদীশ্বরের আদেশবাহকের ইহাই উপযুক্ত স্থান।" দস্যুগণ চলিয়া গেলে তিনি শরীর হইতে তুষারখণ্ড ঝাড়িয়া ফেলিলেন এবং বহু চেষ্টার পর সে স্থান হইতে উদ্ধার-লাভে সমর্থ হইলেন। ঠাণ্ডায় সর্ব্ব দেহ অবশ হইয়া যাইলেও তিনি পুনরায় গান ধরিলেন, এবং ঐ শারীরিক কষ্টরূপ পরীক্ষার মধ্যেও মনে আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। এইরূপে বিপদের ভিতর দিয়াই তিনি ক্রমশঃ ঈশার উপদেশাবলীর প্রকৃত মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে লাগিলেন।

ঐ স্থানের অল্প দূরেই সন্ন্যাসীদের একটী মঠ ছিল। ঐ মঠে প্রবেশ করিয়া ফ্র্যান্‌সিস্‌ আশ্রয়ের বিনিময়ে কোনরূপ কার্য্য করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়া সন্ন্যাসীদের মনে প্রথম নানা সন্দেহের উদয় হইল। অবশ্য দস্যুতস্কর দ্বারা অধ্যুষিত এই নিভৃত স্থানে অপরিচিত এক ব্যক্তির ঐরূপে আগমন করাতে সন্দেহের উদয় হওয়াটী আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। যাহা হউক, সন্ন্যাসীরা তাঁহাকে রন্ধনশালায় কার্য্য করিতে অনুমতি দিলেন বটে, কিন্তু পরিবার জন্য বস্ত্রাদি কিছুই দিলেন না এবং অতি সামান্য খাদ্য দ্রব্যই প্রদান করিলেন। তথাকার ঐরূপ ভাবগতিক দেখিয়া তিনি সে স্থান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন এবং Gubbis অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কারণ, তাঁহার মনে হইল, তথায় পঁহুছিতে পারিলে একজন বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা আছে এবং তাঁহার নিকট কিছু সাহায্যও পাইতে পারেন। পোলেটো হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর যে বিশ্বস্ত বন্ধুটীর সহিত তাঁহার পরিচয় হইয়াছিল, বোধ হয় ইনি তিনিই। বন্ধুটী তাঁহার ঐরূপ বেশ দেখিয়া হাঁটু পর্য্যন্ত লম্বা একটী জামা পরিবার জন্য প্রদান করিয়া নিজবাসে স্থান দিলেন। বন্ধুর সহিত কিছুদিন বাস করিবার পর ফ্র্যান্‌সিস্‌ সেণ্ট্‌ ড্যামেন্‌ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিন্তু তথায় যাইয়া উহার জীর্ণসংস্কারকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে, তিনি কুষ্ঠাশ্রমে যাইয়া তাঁহার পূর্ব্বপরিচিত কুষ্ঠরোগিগণকে আর একবার দেখিয়া যাইবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিলেন। প্রথম যখন তিনি কুষ্ঠাশ্রম পরিদর্শন করেন তখন তাঁহার অবস্থা ও চালচলন বড় লোকের ন্যায় ছিল। এখন তাঁহার ঠিক তাহার বিপরীত অবস্থা—এখন তিনি তাহাদেরই ন্যায় দীন ভিক্ষাব্যবসায়ী! এ অবস্থায়

তাহাদের প্রতি তাঁহার ভালবাসা ও সহানুভূতি পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি হওয়াই স্বাভাবিক। তিনি দীনবেশে রিক্তহস্তে কুষ্ঠাশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার নিকট এক কপর্দ্দকও ছিল না বটে, কিন্তু তথাপি এখন তিনি অমূল্য ধনের অধিকারী হইয়াছেন। এখন তাঁহার হৃদয় কোমল ও প্রকৃতি অতিশয় মধুর হইয়াছে এবং পরদুঃখ দেখিলেই তিনি সহানুভূতিতে অধীর হইয়া উঠিতেছেন! কুষ্ঠাশ্রমে আসিয়া তিনি কুষ্ঠরোগীদের সহিত একত্রে বাস করিতে লাগিলেন এবং অতিশয় স্নেহ ও যত্নের সহিত তাহাদের সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। তাহাদের ক্ষতস্থান গুলি পূর্ব্বে তাঁহার মনে যত ঘৃণার উদয় করিত এখন তদপেক্ষা আরও অধিক যত্নের সহিত তিনি সেগুলি ধুইয়া ও মুছিয়া দিতে লাগিলেন। দেখিতে আসিয়া কেহ তাহাদের কষ্টে কিছুমাত্র সহানুভূতির পরিচয় প্রদান করিলেই যাহারা কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হইত, তাহারা যে এখন তাঁহার ঈদৃশ সহৃদয় আচরণে তাঁহার প্রতি অতিশয় আকৃষ্ট হইয়া পড়িবে এবং তাঁহাকে বিশেষশক্তিসম্পন্ন পুরুষ বলিয়া মনে করিবে, ইহাতে আর বিচিত্র কি? রোগের যন্ত্রণায় কেহ অতিশয় কষ্ট পাইতেছে শুনিয়া যখন তিনি তাহার নিকটে উপস্থিত হইতেন, তখন তাঁহাকে দেখিবা-মাত্র সেই রোগীর সকল যন্ত্রণা দূর হইয়া যাইত অথবা ঐ যন্ত্রণার অনেক উপশম হইত। তাঁহার অলৌকিক স্নেহ, সেবা ও শুশ্রূষার জন্য তাঁহাকে ইহারা নিজ আত্মীয় অপেক্ষাও অধিক ভালবাসিত, এবং সময়ে সময়ে ইহাদের ভালবাসার এমন অদ্ভুত পরিচয় পাওয়া যাইত যে, উহা মনে করিলেও বিস্মিত হইতে হয়। এমন হইয়াছে যে কেহ কেহ মুমূর্ষু অবস্থায় সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়া থাকিবার কালে সহসা জ্ঞান লাভ করিয়া অন্য কোন বাসনা পূরণের অভিপ্রায় প্রকাশ না করিয়া কেবলমাত্র প্রিয়তম বন্ধু ফ্র্যান্সিসের মুখখানি একবার জনমের মত দেখিয়া লইবার জন্যই আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছে। ফ্র্যান্সিস্‌ও তাহাদের জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত যাহাতে সুখময় হয় তদ্বিষয়ে সাধ্যমত চেষ্টা করিতেন। রক্ত মাংসের সম্বন্ধ অপেক্ষা পবিত্র নিঃস্বার্থ ভালবাসার সম্বন্ধ যে চিরদিনই প্রবল ইহার প্রমাণ ফ্র্যান্সিস্ নিজজীবনে বহুবার লাভ করিয়াছিলেন। কুষ্ঠাশ্রমে আসিয়া অবধি তাঁহার বোধ হইতে থাকে যে তাঁহার অবসন্ন হৃদয়ে ধীরে ধীরে নব বলের সঞ্চার হইতেছে। কুষ্ঠ রোগীদের সহানুভূতিতে উৎসাহিত হইয়া তিনি সেণ্ট ড্যামেনে ফিরিয়া যাইলেন এবং পরম আনন্দ ও আগ্রহের সহিত উহার জীর্ণ সংস্কারে প্রবৃত্ত হইলেন।

বসন্ত কালের হাস্যময়ী প্রকৃতির ন্যায় তাঁহার হৃদয়খানি এখন স্ফূর্ত্তিতে ভরিয়া উঠিয়াছিল। এইকাল হইতে তিনি সন্ন্যাসীর বেশে সহরের উন্মুক্ত জনাকীর্ণ স্থান সমূহে নিত্য যাইতে আরম্ভ করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়াই তিনি প্রথমে কতকগুলি স্তোত্র পাঠ করিতেন; তৎপরে সহাস্য বদনে বলিতেন—"মহাশয়গণ! আমি এই মন্দিরটীর জীর্ণ সংস্কার করিতে সংকল্প করিয়াছি। যাঁহারা একার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য আমাকে এক খানি প্রস্তর দান করিবেন তাঁহাকে একটী, যাঁহারা দুইখানি প্রস্তর দিবেন তাঁহাদের দুইটী এবং যাঁহারা তিনখানি প্রস্তর দিবেন তাঁহাদিগকে আমি তিনটী পুরস্কার প্রদান করিব।" তাঁহাকে দেখিয়া এবং তাঁহার কথা শুনিয়া অনেকের ধারণা হইয়াছিল যে তিনি উন্মাদ হইয়াছেন। তাঁহাকে সেজন্য অনেকে নানাপ্রকার উপহাসাদি করিত; আবার বিচারালয়ের সেই ঘটনা স্মরণ করিয়া অনেকের তাঁহার উপর শ্রদ্ধারও উদয় হইত। তিনি কিন্তু ঐরূপ প্রশংসা বা উপহাস বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া নিজ উদ্দেশ্য সাধ্যমত সিদ্ধির জন্য পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। শরীর দুর্ব্বল হওয়ায় কষ্ট হইলেও তিনি অপরের প্রদত্ত প্রস্তরখণ্ড নিজেই স্কন্ধে বহন করিয়া লইয়া যাইতেন। যে ফ্র্যান্সিসের জন্য পূর্ব্বে সেণ্ট্ড্যামেনের পুরোহিত নানারূপে বিপন্ন হইয়াছিলেন সেই ফ্র্যান্সিসের দেব-চরিত্র ও কার্য্য দর্শন করিয়া তাঁহার হৃদয়ে এখন স্নেহের সঞ্চার হইল, এবং তাঁহার শরীরে বলাধান করিবার জন্য তিনি অতি যত্নের সহিত সুন্দর খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া খাওয়াইতে লাগিলেন। ফ্র্যান্সিস্ কয়েক দিনেই ঐ বিষয় জানিতে পারিলেন এবং তাঁহারই জন্য তাঁহার দরিদ্র পুরোহিত বন্ধুর এত ব্যয় অনর্থক হইতেছে মনে করিয়া অতিশয় কুণ্ঠিত হইলেন। তাঁহার ঐ কার্য্যের জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া ফ্র্যান্সিস্ এখন হইতে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া নিজ আহারীয় সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু আহারীয় সংগ্রহ করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। প্রথম দিন ভিক্ষা করিয়া ফিরিয়া আসিয়া ভিক্ষা-লব্ধ দ্রব্য দর্শন করিয়া তিনি নিরুৎসাহ হইয়া পড়িলেন। কিন্তু পরক্ষণেই, ঈশ্বর প্রতি তাঁহার পূর্ণ বিশ্বাস ও নির্ভরতা হয় নাই বলিয়াই তাঁহার মনে ঐরূপ ভাবের উদয় হইতেছে—একথা ধরিতে পারিয়া তিনি বিশেষ লজ্জা বোধ করিতে লাগিলেন। ফলে দাঁড়াইল যে, ঐ সকল ভিক্ষালব্ধ সামান্য দ্রব্য আগ্রহ-সহকারে ভোজনে তাঁহার প্রবৃত্তি জন্মিল।

বাস্তবিক বলিতে গেলে প্রতি মুহূর্ত্তেই তিনি এখন নূতন নূতন পরীক্ষায় পড়িতেছিলেন। মন্দিরে প্রদীপ জ্বালাইবার জন্য তৈল ভিক্ষার্থ একদিন নির্গত হইয়া সহরের মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে তিনি একটী বাটীতে উৎসব হইতেছে দেখিয়া তথায় ভিক্ষা করিতে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার পূর্ব্ব পরিচিত সঙ্গীগণের মধ্যে অনেকেই সেদিন তথায় নৃত্য-গীতাদি আমোদ-প্রমোদে রত রহিয়াছেন একথা তিনি পূর্ব্বে জানিতে পারেন নাই। তাঁহাদের সুপরিচিত কণ্ঠধ্বনি শ্রবণ করিয়া এখন বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিতে তিনি বিশেষ সঙ্কোচ বোধ করিতে লাগিলেন এবং তথা হইতে দূরে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার মানসিক দুর্ব্বলতাই ঐরূপ লজ্জা ও সঙ্কোচের কারণ! বিশেষ লজ্জিত হইয়া তিনি পুনরায় সেই বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন এবং উৎসবগৃহে প্রবেশ করিয়া প্রথমেই নিজ সঙ্কোচের কথা সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশ করিয়া বলিলেন। তৎপরে এত আগ্রহ ও আবেগের সহিত তিনি নিজ উদ্দেশ্য তাঁহাদের নিকট প্রকাশ করিয়া বলিলেন যে তাঁহাদের মধ্যে প্রত্যেকেই তাঁহার সেই পবিত্র অনুষ্ঠানে সাহায্য করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

পিতার ক্রোধই এখন ফ্র্যান্‌সিসের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন পরীক্ষার বিষয় হইয়া উঠিয়াছিল। এ পর্য্যন্ত উহা পূর্ব্বের ন্যায় সমভাবেই প্রবল ছিল; কিছুমাত্র উপশমিত হয় নাই। ফ্র্যান্‌সিস্‌কে ত্যাজ্য পুত্র করিলেও দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া পুত্রের ঐভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করাতে তাঁহার অতিশয় লজ্জা ও অপমান বোধ হইতেছিল। সেজন্য পথে দেখিতে পাইলেই তিনি পুত্রকে ভৎর্সনা ও অভিসম্পাতে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিতেন। কোমল-হৃদয় ফ্র্যান্‌সিস্ পিতার ঈদৃশ আচরণে অতিশয় মনঃক্ষুণ্ণ হইতেন। ক্রমশঃ পিতার ঐরূপ আচরণ তাঁহার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল এবং উহা হইতে অব্যাহতি লাভের আশায় তিনি নিম্নলিখিত উপায়টী উদ্ভাবন করিলেন। একজন অপরিচিত ভিখারীকে পাইয়া তিনি তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"দেখ! বার্নার্ডন্ আমার জন্মদাতা। পথে দেখা হইলেই তিনি আমাকে বাক্যবাণে বিদ্ধ করেন। ইহাতে আমার মনে অতিশয় কষ্ট হয়। আমার মনে হয় সে সময় যদি কেহ আমার প্রতি স্নেহ প্রকাশ করে তাহা হইলে ঐ কষ্টের কিছু লাঘব হইতে পারে। অতএব এইবার দেখা হইলে তিনি যখন আমাকে গালাগালি দিবেন তখন আমি তোমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিব, পিতা! আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন।" এবং সে সময় তুমি আমার গাত্রে একটী ক্রুশ চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া দিয়া আমাকে আশীর্ব্বাদ করিও। এই প্রস্তাবে যদি তুমি সম্মত হও তাহা হইলে আমার ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যের কিয়দংশ আমি তোমাকে প্রদান করিব।"

ক্রমশঃ।

স্বামি-শিষ্য-সংবাদ।

[শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এ।]

মঠে।

আজ কাল স্বামীজি মঠেই অবস্থান করিতেছেন। শাস্ত্রালোচনার জন্য মঠে প্রতিদিনই প্রশ্নোত্তর ক্লাশ হইতেছে। স্বামীজিও প্রায়ই এই ক্লাশে উপস্থিত থাকিতেছেন। স্বামী শুদ্ধানন্দ, বিরজানন্দ ও স্বরূপানন্দ এই ক্লাশের ভিতর প্রধান জিজ্ঞাসু। এইরূপ শাস্ত্রালোচনাকে স্বামীজি "চর্চ্চা" শব্দে নির্দ্দেশ করিতেন এবং ঐরূপে শাস্ত্রবিষয় "চর্চ্চা" করিতে সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণকে বহুধা উৎসাহিত করিতেন। কোন দিন গীতা, কোন দিন ভাগবত, কোন দিন বা উপনিষৎ ও ব্রহ্মসূত্রভাষ্যের আলোচনা হইতেছে। একদিকে যেমন স্বামীজির আদেশে কঠোর-নিয়ম-পূর্ব্বক ধ্যান-ধারণা চলিয়াছে, অপর দিকে তেমনি শাস্ত্রালোচনার জন্য ঐ ক্লাশের প্রাত্যহিক অধিবেশন হইতেছে এবং তাঁহার শাসন সর্ব্বথা শিরোধার্য্য করিয়া সকলেই তৎপ্রবর্ত্তিত নিয়ম অনুসরণ করিয়া চলিতেছেন। এখন মঠবাসিগণের আহার, শয়ন, পাঠ, ধ্যান সকলই কঠোর-বিধি-নিয়ম-বদ্ধ। কাহার কোন দিন ঐ নিয়মের একটু এদিক্ ওদিক্ হইলে নীতিমর্য্যাদাভঙ্গের জন্য সেদিন তাহাকে মঠে ভিক্ষা দেওয়া বন্ধ হইয়া যায়! তাহাকে সেদিন পল্লী হইতে নিজে ভিক্ষা করিয়া আনিতে হয় এবং ঐ ভিক্ষান্ন মঠভূমিতে নিজেই রন্ধন করিয়া খাইতে হয়। স্বামীজির গুরুভ্রাতৃগণের মধ্যে কাহাকে কাহাকেও এক আধ দিন নীতিমর্য্যাদারক্ষাকল্পে ঐরূপ করিতে হইয়াছে। এইরূপে সঙ্ঘগঠনকল্পে স্বামীজির দুরদৃষ্টি কেবলমাত্র মঠবাসিগণের জন্য কতকগুলি দৈনিক নিয়ম করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, কিন্তু ভবিষ্যতে অনুষ্ঠেয় মঠের রীতি-নীতি ও কার্য্যপ্রণালীর সম্যগালোচনা করিয়া তৎসম্বন্ধে বিস্তারিত অনুশাসন সকল লিপিবদ্ধ করিয়াছে। উহার পাণ্ডুলিপি অদ্যাপি বেলুড় মঠে সযত্নে রক্ষিত আছে।

প্রত্যহ স্নানান্তে স্বামীজি ঠাকুরঘরে যান। ঠাকুরের চরণামৃত পান করেন—শ্রীপাদুকা মস্তকে স্পর্শ করেন—এবং ঠাকুরের ভস্মাস্থিসম্পুটিত

কৌটার সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করেন। এই কৌটাকে তিনি "আত্মারামের কৌটা" বলিয়া অনেক সময় নির্দ্দেশ করিতেন। ইতিমধ্যে ঐ "আত্মারামের কৌটাকে" লইয়া এক বিশেষ ঘটনা উপস্থিত হয়। একদিন স্বামীজি উহা মস্তকে স্পর্শ করিয়া ঠাকুরঘর হইতে বাহির হইতেছেন—এমন সময় সহসা তাঁহার মনে হইল "সত্যই কি ইহাতে আত্মারাম ঠাকুর রহিযাছেন? দেখিব, পরীক্ষা করিয়া!" মনে মনে সংকল্প করিলেন "ঠাকুর! যদি তুমি ইহার ভিতর থাকো ত রাজধানীতে উপস্থিত অমুক মহারাজাকে মঠে তিন দিনের মধ্যে আকর্ষণ করিয়া লইয়া আইস।" মনে মনে ঐরূপ বলিয়া ঠাকুরঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন, ঐ বিষয়ে কাহাকেও কিছু বলিলেন না; এবং কিছুক্ষণ পরে ঐ কথা একেবারে ভুলিয়া যাইলেন। পরদিন তিনি কার্য্যান্তরে কয়েক ঘণ্টার জন্য কলিকাতায় যাইলেন। অপরাহ্নে মঠে ফিরিয়া আসিয়া শুনিলেন, সত্যসত্যই ঐ মহারাজা মঠের নিকটবর্ত্তী ট্রাঙ্ক্ রোড্ দিয়া যাইতে যাইতে স্বামীজির অন্বেষণে মঠে লোক পাঠাইযাছিলেন এবং তিনি মঠে নাই শুনিয়া আর মঠ-দর্শনে অগ্রসর হন নাই! সংবাদ শ্রবণ করিবামাত্র স্বামীজির নিজ সংকল্পের কথা মনে উদয় হইল এবং বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে নিজ গুরু-ভ্রাতৃগণের নিকট ঐ বিষয় জ্ঞাপন করিয়া তিনি "আত্মারামের কৌটাকে" বিশেষ সন্তর্পণে পূজা করিতে তাঁহাদিগকে আদেশ করিলেন।

আজ শনিবার; শিষ্য বৈকালে মঠে আসিয়াই স্বামীজির ঐ সিদ্ধসংকল্পের বিষয় অবগত হইয়াছে। স্বামীজিকে প্রণাম করিয়া উপবেশন করিবামাত্র সে জানিতে পারিল, তিনি তখন বেড়াইতে বাহির হইবেন। স্বামী প্রেমানন্দকে সঙ্গে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে বলিয়াছেন। শিষ্যের একান্ত বাসনা, স্বামীজির সঙ্গে যায়—কিন্তু অনুমতি না পাইলে যাইবার সাধ্য নাই। স্বামীজি আলখেল্লা ও গৈরিক বসনের কাণঢাকা টুপী পরিয়া একগাছি মোটা লাঠি হাতে করিয়া বাহির হইলেন—পশ্চাতে স্বামী প্রেমানন্দ। যাইবার পূর্ব্বে শিষ্যের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"চল্, যাবি?" শিষ্য কৃতকৃতার্থ হইয়া প্রেমানন্দের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল।

স্বামীজি কি ভাবিতে ভাবিতে অন্য মনে পথে চলিতে লাগিলেন। এইবার গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক্ রোড্ ধরিয়া আমরা সকলে অগ্রসর হইতেছি। শিষ্য, প্রেমানন্দ মহারাজের সহিত নানা গল্প করিতেছে। প্রেমানন্দ মহারাজকে শিষ্য জিজ্ঞাসা করিতেছে "মহাশয়, ঠাকুর স্বামীজির মহত্ত্ব সম্বন্ধে আপনাদের কি

কি বলিতেন, তাহাই বলুন।" (স্বামীজি তখন কিঞ্চিৎ অগ্রবর্ত্তী হইয়াছেন।)

স্বামী প্রেমানন্দ—কত কি বল্‌তেন, তা তোকে একদিনে কি বল্‌বো। কখনো বল্‌তেন, নরেন অখণ্ডের ঘর থেকে এসেছে। কখনো বল্‌তেন ও আমার শ্বশুরঘর। আবার কখনো বা বল্‌তেন, এমনটী জগতে কখনো আসে নাই—আস্‌বে না। একদিন বলেছিলেন "মহামায়া ওর কাছে যেতে ভয় পায়!" বাস্তবিক উনি তখন কোন ঠাকুর দেবতার কাছে মাথা নোয়াতেন না। ঠাকুর একদিন সন্দেশের ভিতরে ক'রে উঁহাকে জগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ খাইয়ে দিয়েছিলেন। পরে ঠাকুরের কৃপায় সব দেখে শুনে ক্রমে ক্রমে সব মান্‌লেন্।

শিষ্য—আমার সঙ্গে নিত্য কত ফষ্টি নষ্টি করেন। আজ এমন গম্ভীর হ'য়ে রয়েছেন যে, কথা কহিতে ভয় হইতেছে।

প্রেমানন্দ—কি জানিস্—মহাপুরুষেরা কখন কি ভাবে থাকেন—তা আমাদের মনবুদ্ধির অগোচর। ঠাকুরের জীবৎকালে দেখেছি, নরেনকে দূরে দেখে তিনি সমাধিস্থ হ য়ে পড়্‌তেন; যাদের ছোঁয়া জিনীস খাওয়া উচিত নয় ব'লে অন্য সকলকে খেতে নিষেধ কর্ত্তেন, নরেন তাদের ছোঁয়া খেলেও কিছু বল্‌তেন না। কখনো বল্‌তেন "মা, ওর অদ্বৈতজ্ঞান চাপা দিয়ে রাখ্—আমার ঢের কাজ আছে।" এসব কথা কেই বা বুঝ্‌বে—আর কাকেই বা বল্‌বো?

শিষ্য—মহাশয, বাস্তবিকই কখন কখন মনে হয, উনি মানুষ নহেন। কিন্তু—আবার কথাবার্ত্তা, যুক্তি-বিচার করিবার কালে মানুষ বলিয়া বোধ হয়। এমনি মনে হয়, যেন কোন আবরণ দিয়ে সে সময় উনি আপনার যথার্থ স্বরূপ বুঝিতে দেন না!

প্রেমানন্দ—ঠাকুর বল্‌তেন, "ও যখনি জান্‌তে পার্‌বে ও কে, তখনি আর এখানে থাক্‌বে না, চ'লে যাবে। তাই কাজকর্ম্মের ভিতরে নরেনের মনটা থাক্‌লে আমরা নিশ্চিন্ত থাকি। ওকে বেশী ধ্যান ধারণা কত্তে দেখ্‌লে আমাদের ভয় হয়।"

এইবার স্বামীজি মঠা'ভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হইতেছেন দেখিয়া আমরাও ফিরিলাম। ঐ সময়ে তিনি শিষ্যকে বলিলেন "কিরে, তোদের কি কথা হচ্ছিলো?" শিষ্য বলিল—"এই সব ঠাকুরের সম্বন্ধীয় নানা কথা হইতেছিল।"

উত্তর শুনিয়াই স্বামীজি আবার অন্য মনে পথ চলিতে চলিতে মঠে ফিরিয়া আসিলেন এবং মঠের আঁবগাছের তলায় যে ক্যাম্পখাটখানি তাঁহার বসিবার জন্য পাতা ছিল, তাহাতে উপবেশন করিলেন। কিছুক্ষণ পরে স্বামী নির্ম্মলানন্দকে ডাকিয়া বলিলেন, "অমুক তরকারি আজ রাঁধ্‌তে হবে। যা, সব ঠিক্ ঠাক্ কর্‌গে।" স্বামী নির্ম্মলানন্দও স্বামীজির আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া রন্ধনশালায় চলিয়া গেলেন।

এইবার স্বামীজি হাস্যমুখে সকলের সঙ্গে আলাপ করিতে লাগিলেন। শিষ্যকে বলিলেন, "আজ খাওয়া দাওযার পরে তুই আর তুলসী দুজনে "চর্চ্চা" কর্‌বি। আমি শুন্‌তে শুন্‌তে ঘুমিযে পড়্‌বো। বুঝ্‌লি?" শিষ্য স্বামীজির আজ্ঞা নির্ম্মলানন্দ মহারাজকে বলিতে গেল। নির্ম্মলানন্দ শুনিয়া পরিহাস করিয়া বলিলেন, "যাঃ, বাঙ্গালের সঙ্গে আবার বিচার্? তুই আগেই হার মেনে যাবি।" শিষ্যও হাসিতে হাসিতে বলিল "বাঙ্গালের গোঁ ত জানেন—সে কারো কাছে হার মানে না।" এই বলিযা শিষ্য পুনরায় স্বামীজির কাছে ফিরিয়া আসিল।

এই বার স্বামীজি উপরে কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম করিতে যাইলেন। শিষ্য পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইল। স্বামীজি মুখ ধুইযা উপরের বারান্দায বেড়াইতে বেড়াইতে শিষ্যকে বলিতে লাগিলেন—"তোদের বাঙ্গাল্‌ দেশে বেদান্তবাদ প্রচার কত্তে লেগে যা না কেন? শুনেছি, ওখানে ভয়ানক তন্ত্রমত চল্‌ছে। (স্বামীজি তখনো পূর্ব্ববঙ্গে যান নাই।) অদ্বৈতবাদের সিংহনাদে বাঙ্গাল্‌ দেশটা তোলপাড় করে তোল্‌ দেখি। তবে তো জান্‌বো, তুই বেদান্তবাদী। ওদেশে গিয়ে প্রথম একটা বেদান্তের টোল খুলে দে—তাতে উপনিষৎ ব্রহ্মসূত্র এই সব পড়া। ছেলেদের ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা দে। আর বিচার ক'রে তান্ত্রিক পণ্ডিতদের হারিযে দে। শুনেছি, তোদের দেশে লোকে কেবল ন্যাযশাস্ত্রের কচ্‌কচি পড়ে। ওতে আছে কি? ব্যাপ্তিজ্ঞান আর অনুমান এই নিযেই মাসাবধি বিচার চল্‌ছে! আত্মজ্ঞানলাভে তাতে আর কি বিশেষ সহায়তা হয় বল্? এই বেদান্ত-সিদ্ধান্তিত ব্রহ্মতত্ত্বের পঠন-পাঠনা না হ'লে কি আর দেশের উপায আছে রে? তোদের দেশেই হোক্ বা নাগ মহাশয়ের বাড়ীতেই হোক্ (তখন নাগ মহাশযের শরীর নাই) একটা চতুষ্পাঠী খুলে দে। তাতে এই সব সৎ শাস্ত্র পাঠ হবে, আর ঠাকুরের জীবন আলোচনা হবে। ঐরূপ কর্‌লে তোর্ নিজের

কল্যাণের সঙ্গে সঙ্গে কত লোকের কল্যাণ হবে। তোর কীর্ত্তিও থাক্‌বে; বুঝ্‌লি?"

শিষ্য—মহাশয়, আমি নামযশের আকাঙ্ক্ষা রাখি না। তবে আপনি যেমন বলিতেছেন, সময়ে সময়ে আমারও ঐরূপ ইচ্ছা হয় বটে। কিন্তু বিবাহ করিয়া সংসারে এমন জড়াইয়া পড়িয়াছি যে, মনের কথা বোধ হয় মনেই থাকিয়া যাইবে।

স্বামীজি—বে করেছিস্ ত কি হয়েছে? মা বাপ্ ভাই বোন্‌কে অন্ন-বস্ত্র দিয়ে যেমন পালন কচ্ছিস্, স্ত্রীকেও তেমনি কর্‌বি, বাশ্। ধর্ম্ম উপদেশ দিয়ে তাকেও তোর পথে টেনে নিবি। মহামায়ার বিভূতি ব'লে সম্মানের চক্ষে দেখ্‌বি। ধর্ম্ম-উদ্‌যাপনে "সহধর্ম্মিণী" ব'লে মনে কর্‌বি। অন্য সময়ে অপর দশ জনের মত দেখ্‌বি। এইরূপ ভাব্‌তে ভাব্‌তে দেখ্‌বি, মনের চঞ্চলতা একেবারে ম'রে যাবে। ভয় কি?

স্বামীজির সে অভয়বাণী শিষ্য এখনো প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া থাকে।

এইবার আহারান্তে স্বামীজি নিজের বিছানায় উপবেশন করিয়াছেন। সকলের প্রসাদ পাইবার এখনও সময় হয় নাই। সেজন্য শিষ্য স্বামীজির পদসেবা করিবার অবসর পাইয়াছে। স্বামীজি বলিলেন "কৈ, তোদের বিচার হ'লো না?"

শিষ্য—মহাশয়, তুল্‌সী মহারাজ (স্বামী নির্ম্মলানন্দ) এখনো যে আসিলেন না। তাঁহাকে ডাকিয়া আনি।

স্বামীজি—না, আজ থাক্। আর একদিন হবে। এই যে সব ঠাকুরের সন্তান দেখ্‌ছিস্, এরা সব অদ্ভুত ত্যাগী, এদের সেবা ক'রে লোকের চিত্তশুদ্ধি হবে—আত্মতত্ব প্রত্যক্ষ হবে। "পরিপ্রশ্নেন সেবয়া" গীতার উক্তি শুনেছিস্ তো? এদের সেবা কর্‌বি। তা হ'লেই সব হ'য়ে যাবে। তোকে এরা কত স্নেহ করে, জানিস্ তো?

শিষ্য—মহাশয়, ইঁহাদের কিন্তু বুঝা বড়ই কঠিন বলিয়া মনে হয়। এক এক জনের এক এক ভাব!

স্বামীজি—ঠাকুর ওস্তাদ মালী ছিলেন কিনা! তাই হরেক্ রকম ফুল দিয়ে এই সঙ্ঘরূপী তোড়াটি বানিয়ে গেছেন। যেখানকার যেটী ভাল, সব এসে পড়েছে—কালে আরো কত আস্‌বে। ঠাকুর বল্‌তেন, "যে একদিনের

জন্যও অকপট মনে ঈশ্বরকে ডেকেছে, তাকে এখানে আস্‌তেই হবে।” যারা সব এখানে রয়েছে, তারা এক এক জন মহাসিংহ; আমার কাছে কুঁচ্‌কে থাকে ব'লে এদের সামান্য মানুষ ব'লে মনে করিস্ নি। এরাই আবার যখন বাহির হবে, তখন এদের দেখে লোকের চৈতন্য হবে। অনন্ত-ভাবময় ঠাকুরের শরীরের অংশ ব'লে এদের জান্‌বি। আমি এদের ঐ ভাবে দেখি। ঐ যে রাখাল রয়েছে,ওর মত Spirituality (ধর্ম্মভাব) আমারও নাই। ঠাকুর ছেলে ব'লে ওকে কোলে কত্তেন, খাওযাতেন—একত্র শয়ন কর্‌তেন। ও আমাদের মঠের শোভা—আমাদের রাজা। ঐ বাবুরাম, হরি, সারদা, গঙ্গাধর, শরৎ, শশী, খোকা প্রভৃতির মত লোক দুনিযা ঘুরে কোথাও দেখ্‌লুম্ না। এরা প্রত্যেকে ধর্ম্মশক্তির এক একটা কেন্দ্রের মত। কালে ওদের শক্তির সব বিকাশ্ হবে। বুঝ্‌লি?

শিষ্য অবাক্ হইয়া কথাগুলি শুনিতে লাগিল। স্বামীজি আবার বলিলেন—

“তোদেব দেশ্ থেকে নাগ মশায ছাড়া আব কিন্তু কেউ এলোনা। আর দু একজন যারা ঠাকুরকে দেখেছিল—তারা তাঁকে ধর্ত্তে পাল্লে না।”

নাগ মহাশযের কথা স্মরণ করিয়া স্বামীজি কিছুক্ষণের জন্য স্থির হইযা রহিলেন। আজ ৪।৫ মাস তাঁহাব দেহ গিযাছে। স্বামীজি শুনিযাছিলেন, এক সময়ে নাগ মহাশযের বাড়ীতে গঙ্গাব উৎস উঠিযাছিল। সেই কথাটী স্মরণ করিয়া শিষ্যকে বলিলেন—“হ্যাঁরে, ঐ ঘটনাটা কিরূপ বল্ দিকি?”

শিষ্য—আমিও ঐ ঘটনা শুনিযাছি মাত্র—চক্ষে দেখি নাই। শুনিযাছি, একবার মহাবারুণী যোগে পিতাকে সঙ্গে করিযা নাগ মহাশয় কলিকাতা আসিবার জন্য প্রস্তুত হন। কিন্তু লোকেব ভিড়ে গাড়ী না পাইয়া তিন চার দিন নারাযণগঞ্জে থাকিযা বাড়ীতে ফিরিয়া আসেন। অগত্যা সেবার নাগ মহাশয কলিকাতা যাওয়ার সংকল্প ত্যাগ করেন ও পিতাকে বলেন “মন শুদ্ধ হ'লে মা গঙ্গা এখানেই আস্‌বেন।” পরে যোগের সময় বাড়ীর মাটী ভেদ করিয়া এক জলেব উৎস উঠিয়াছিল, এইরূপ শুনি-য়াছি। যাঁহারা দেখিয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকে এখনো জীবিত আছেন। আমার তাঁহার সঙ্গলাভের বহু পূর্ব্বে ঐ ঘটনা ঘটিয়াছিল।

স্বামীজি—তার আর আশ্চর্য্য কি? তিনি সিদ্ধসংকল্প মহাপুরুষ; তাঁর জন্য ওটা হওয়া আমি কিছু আশ্চর্য্য মনে করি না।

বলিতে বলিতে স্বামীজি পাশ ফিরিয়া শুইলেন; কিন্তু তন্দ্রা আসিতেছে না দেখিয়া স্বামী নিত্যানন্দকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন এবং পূর্ব্ববঙ্গের চাল চলন ও ভাষা ইত্যাদি লইয়া কিছুক্ষণ হাস্য পরিহাস করিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরে নিত্যানন্দ নীচে চলিয়া গেলেন এবং স্বামীজিও শয়ন করিয়া একটু তন্দ্রাবিষ্ট হইলেন।

এমন সময় প্রসাদের ঘণ্টা পড়িল এবং শিষ্য অন্যান্য সকলের সমভিব্যাহারে প্রসাদ পাইতে উঠিয়া গেল।

ভারত ও ইংলণ্ড।

(ইণ্ডিয়া, লণ্ডন, ১৮৯৬)

লণ্ডনের ইহা মুরসুমের সময়।* স্বামী বিবেকানন্দ, তদীয় মত ও দর্শনে আকৃষ্ট অনেক ব্যক্তির সমক্ষে বক্তৃতা করিতেছেন ও তাহাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন। অনেক ইংরাজ মনে করেন, ফ্রান্স ঐ বিষয়ে অল্প স্বল্প যাহা কিছু করে, তাহা ছাড়া ধর্ম্মপ্রচারকার্য্যটা বুঝি ইংলণ্ডেরই একচেটিয়া। আমি ঐ কারণে স্বামীজির সহিত তাঁহার সাময়িক বাসস্থান দক্ষিণ বেলগ্রেভিয়াতে সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। ভারতকেই ত হোমচার্জ্জ †, একজন ব্যক্তির হস্তে বিচার ও শাসন-বিভাগের ক্ষমতা থাকা, সুদান ও অন্যান্য যুদ্ধযাত্রার খরচের মীমাংসা প্রভৃতির জন্য ইংলণ্ডের নিকট অনেক নালিশ ফরিয়াদ করিতে হয়—ভারতের আবার ইংলণ্ডকে বলিবার কি আছে, ইহাই জানিবার জন্য আমার আগ্রহ হইল।

স্বামীজি স্থিরভাবে বলিলেন,—

---

* London Season—পাশ্চাত্য দেশের বড় বড় সহরে ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাগণ গ্রীষ্মকালে সহরের বাহিরে বেড়াইতে চলিয়া যান। যে সময়ে সকলেই থাকেন, সেই সময়কেই তথাকার Season বলে।

† Home charge—ভারতের রাজস্ব হইতে প্রতি বৎসর ইংলণ্ডে যে টাকা পাঠান হয়।

"ভারত যে এখানে ধর্ম্মপ্রচারক পাঠাইবেন, ইহা কিছু নূতন ব্যাপার নহে। যখন বৌদ্ধধর্ম্ম নবীন তেজে অভ্যুদিত হইতেছিল,—যখন ভারতের চতুষ্পার্শ্বস্থ জাতিগুলিকে তাহার কিছু শিখাইবার ছিল—তখন সম্রাট্ অশোক চারিদিকে ধর্ম্মপ্রচারক পাঠাইতেন।"

"আচ্ছা, একথা কি জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে, কেন ভারত ঐরূপে ধর্ম্মপ্রচারক প্রেরণ বন্ধ করিয়াছিলেন, আবার কেনই বা এখন আরম্ভ করিলেন?"

"বন্ধ করিবার কারণ, ভারত ক্রমশঃ স্বার্থপর হইয়া দাঁড়াইয়া এই তত্ত্ব ভুলিয়া গিয়াছিল যে, ব্যক্তি কিম্বা জাতি উভয়েই আদানপ্রদানপ্রণালী-ক্রমে জীবিত থাকে ও উন্নতি লাভ করে। ভারত চিরদিন জগতে একই বার্ত্তা বহন করিয়াছে। ভারতের বার্ত্তা আধ্যাত্মিক—অনন্ত যুগ ধরিয়া অভ্যন্তরীণ ভাবরাজ্যেই তাহার একচেটিয়া অধিকার—সূক্ষ্ম বিজ্ঞান, দর্শন, ন্যায়—ইহাই ভারতের বিশেষ অধিকার। প্রকৃত পক্ষে আমার ইংলণ্ডে প্রচারকার্য্যে আগমন—ইংলণ্ডের ভারত-গমনেরই ফল-স্বরূপ। ইংলণ্ড ভারতকে জয় করিয়া শাসন করিতেছে—তাহার পদার্থ-বিদ্যা-জ্ঞান নিজের এবং আমাদের কাযে লাগাইতেছে। ভারত জগৎকে কি দিয়াছে ও দিতে পারে, মোটামুটি বলিতে গিয়া আমার একটী সংস্কৃত ও একটী ইংরাজী বাক্য মনে পড়িতেছে। কোন মানুষ মরিয়া গেলে আপনারা বলেন, সে আত্মা পরিত্যাগ করিল (He gave up the ghost), আর আমরা বলি, সে দেহত্যাগ করিল। এইরূপ, আপনারা বলিয়া থাকেন, মানুষের আত্মা আছে, তাহাতে আপনারা যেন অনেকটা ইহাই লক্ষ্য করিয়া থাকেন যে, শরীরটাই মানুষের প্রধান জিনিষ। কিন্তু আমরা বলি, মানুষ আত্মাস্বরূপ—তাহার একটা দেহ আছে। এগুলি অবশ্য জাতীয় চিন্তাতরঙ্গের উপরিভাগস্থ ক্ষুদ্রবুদ্বুদমাত্র, কিন্তু ইহাতেই আপনাদের জাতীয় চিন্তাতরঙ্গের গতি প্রকাশ করিয়া দিতেছে। আমার ইচ্ছা হইতেছে, আপনাকে সোপেনহাউয়ারের * ভবিষ্যদ্বাণীটি স্মরণ করাইয়া দিই যে, তমোযুগের †

* Schopenhaur —জর্ম্মান দেশীয় জনৈক দার্শনিক। ইনি উপনিষদের পারস্য অনুবাদের লাটিন অনুবাদ পাঠ করিয়া উহার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। তদীয় দর্শন উপনিষদের ভাবে বিশেষরূপে অনুপ্রাণিত।

† Dark Ages :—পঞ্চম হইতে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ইউরোপের অজ্ঞানাচ্ছন্ন কাল।

অবসানে গ্রীক ও লাটিন বিদ্যার অভ্যুদয়ে ইউরোপে যেরূপ গুরুতর পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইয়াছিল, ভারতীয় দর্শন ইউরোপে সুপরিচিত হইলে তদ্রূপ একটা গুরুতর পরিবর্ত্তন আসিবে। প্রাচ্যতত্ত্ব-গবেষণা খুব প্রবল বেগে অগ্রসর হইতেছে। সত্যান্বেষিগণের সমক্ষে নূতন ভাবস্রোতের দ্বার উন্মুক্ত হইতেছে।"

"তবে কি আপনি বলিতে চান, ভারতই অবশেষে তাহার বিজেতৃবর্গকে জয় করিবে?"

"হাঁ, ভাবরাজ্যে। এখন ইংলণ্ডের হস্তে তরবারি—তিনি এখন জড়-জগতের প্রভু। যেমন, ইংলণ্ডের পূর্ব্বে আমাদের মুসলমান বিজেতারা ছিলেন। সম্রাট্ আকবর কিন্তু প্রকৃত পক্ষে একজন হিন্দুই হইয়া গিয়াছিলেন। শিক্ষিত মুসলমানগণের সহিত—সুফিদের সহিত—হিন্দুদের সহজে প্রভেদ করা যায় না। তাহারা গোমাংস ভোজন করে না এবং অন্যান্য নানা বিষয়ে আমাদের আচার-ব্যবহারের অনুসরণ করিয়া থাকে। তাহাদের চিন্তাপ্রণালী আমাদের দ্বারা বিশেষভাবে অনুরঞ্জিত হইয়াছে।"

"তাহা হইলে আপনার মতে দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ সাহেবের অদৃষ্টেও ভবিষ্যতে ঐরূপ হইবে? বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে কিন্তু তাহাকে ইহা হইতে অনেক দূরবর্ত্তী বলিয়াই বোধ হয়।"

"না, আপনি যতদূর ভাবিতেছেন, ততদূর নয়। ধর্ম্মবিষয়ে হিন্দু ও ইংরাজের ভাব যে অনেক বিষয়ে সদৃশ, আর অন্যান্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সহিতও যে হিন্দুর ঐক্য আছে, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান। যদি কোন ইংরাজ শাসনকর্ত্তা বা সিভিলসার্ভ্যান্টের ভারতীয় সাহিত্য, বিশেষতঃ ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে বিন্দুমাত্রও জ্ঞান থাকে, তবে দেখা যায়, উহাই তাঁহার হিন্দুর সহিত সহানুভূতির কারণ হয়! ঐ সহানুভূতির ভাব দিন দিনই বাড়িতেছে। কতকগুলি লোক যে এখনও ভারতীয় ভাবকে অতি সঙ্কীর্ণ—এমন কি, কখন কখন অবজ্ঞাপূর্ণ—দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন, কেবল অজ্ঞানই যে উহার কারণ, ইহা বলিলে কিছু মাত্র অন্যায় বলা হইবে না।"

"হাঁ, ইহা অজ্ঞতার পরিচায়ক বটে! আপনি ইংলণ্ডে না আসিয়া যে আমেরিকায় ধর্ম্মপ্রচারকার্য্যে গেলেন, ইহার কারণ কি বলিবেন?"

"সেটী কেবল দৈব ঘটনা মাত্র—জাগতিক মহামেলার সময়—জাগতিক ধর্ম্মমহাসভা লণ্ডনে না বসিয়া চিকাগোয় বসিয়াছিল বলিয়াই আমাকে তথায় যাইতে হইয়াছিল। কিন্তু বাস্তবিক লণ্ডনেই উহার অধিবেশন হওয়া

উচিত ছিল। মহীশূরের রাজা এবং আর কতকগুলি বন্ধু আমাকে তথায় হিন্দুধর্ম্মের প্রতিনিধিরূপে পাঠাইয়াছিলেন। আমি তথায় তিন বৎসর ছিলাম—কেবল গতবর্ষের গ্রীষ্মকালে আমি লণ্ডনে বক্তৃতা দিবার জন্য আসিয়াছিলাম এবং এই গ্রীষ্মে আসিয়াছি। মার্কিনেরা খুব একটা বড় জাত—উহাদের ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল। আমি তাহাদের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাসম্পন্ন—তাহাদের মধ্যে আমি অনেক সহৃদয় বন্ধু পাইয়াছিলাম। ইংরাজদের অপেক্ষা তাহাদের কুসংস্কার অল্প—তাহারা সকল নূতন ভাবকেই ওজন করিয়া দেখিতে বা পরীক্ষা করিতে প্রস্তুত—নূতনত্ব সত্ত্বেও উহার আদর করিতে প্রস্তুত। তাহারা বিশেষ আতিথেয়ও বটে। লোকের বিশ্বাসপাত্র হইতে সেখানে অপেক্ষাকৃত অল্প সময় লাগে। আমার মত আপনিও আমেরিকার সহরে সহরে ঘুরিয়া বক্তৃতা করিতে পারেন—সর্ব্বত্রই বন্ধু বান্ধব জুটিবে। আমি বোষ্টন, নিউইয়র্ক, ফিলাডেলফিয়া, বাল্টিমোর, ওয়াশিংটন, ডেসমোনিস, মেমফিস এবং অন্যান্য অনেক স্থানে গিয়াছিলাম।"

"আর প্রত্যেক জায়গায় শিষ্য করিয়া আসিয়াছেন?"

"হাঁ, শিষ্য করিয়া আসিয়াছি—কিন্তু কোন সমাজ গঠন করি নাই। উহা আমার কার্য্যের অন্তর্গত নহে। সমাজ বা সমিতি ত যথেষ্টই আছে। তদ্ভিন্ন সম্প্রদায় করিলে উহার পরিচালনার জন্য আবার লোকের দরকার—সম্প্রদায় গঠিত হইলেই টাকার প্রয়োজন, ক্ষমতার প্রয়োজন, মুরুব্বির প্রয়োজন। অনেক সময় সম্প্রদায়সমূহ প্রভুত্বের জন্য চেষ্টা করিয়া থাকে, কখন কখন অপরের সহিত লড়াই পর্য্যন্ত করিয়া থাকে।"

"তবে কি আপনার ধর্ম্মপ্রচারকার্য্যের ভাব সংক্ষেপে এইরূপ বলা যাইতে পারে যে, আপনি বিভিন্ন ধর্ম্মের তুলনায় আলোচনা করিয়া তাহারি প্রচার করিতে চাহেন?"

"আমি প্রচার করিতে চাই—ধর্ম্মের দার্শনিক তত্ত্ব—ধর্ম্মের বাহ্য অনুষ্ঠানগুলির সার যাহা, তাহাই আমি প্রচার করিতে চাই। সকল ধর্ম্মেরই একটা মুখ্য ও একটা গৌণ ভাগ আছে। ঐ গৌণভাগগুলি ছাড়িয়া দিলে যাহা থাকে, তাহাই সকল ধর্ম্মের প্রকৃত ভিত্তিস্বরূপ। উহাই সকল ধর্ম্মের সাধারণ সম্পত্তি। সকলের অন্তরালে একত্ব রহিয়াছে—আমরা উহাকে গড, আল্লা, জিহোভা, আত্মা, প্রেম—যাহা ইচ্ছা নাম দিতে পারি। কিন্তু সেই এক বস্তুই সকল প্রাণীর প্রাণরূপে বিরাজিত—প্রাণিজগতের অতি

নিকৃষ্টতম বিকাশ হইতে সর্ব্বোচ্চ বিকাশ মানব পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র। আমরা ঐ একত্বের উপরেই সকলের বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই; কিন্তু পাশ্চাত্যে—শুধু পাশ্চাত্যে কেন, অন্যত্র সর্ব্বত্রই লোকে গৌণবিষয়গুলির দিকেই বিশেষভাবে দৃষ্টি করিয়া থাকে, ধর্ম্মের বাহ্য অনুষ্ঠানগুলি লইয়া, অপরকে ঠিক নিজের মত কায করাইবার জন্যই পরস্পরের সহিত বিবাদ এবং পরস্পরকে হত্যা পর্য্যন্ত করে। ভগবদ্ভক্তি ও মানব প্রীতিই যখন জীবনের সার বস্তু, তখন এই সকল বিবাদ-বিসম্বাদকে কঠিনতর ভাষায় নির্দ্দেশ না করিলেও আশ্চর্য্য ব্যাপার বলিতে হয়।"

"আমার বোধ হয়, হিন্দু কখন অন্যধর্ম্মাবলম্বীর উপর উৎপীড়ন করিতে পারে না।"

"এ পর্য্যন্ত ত কখন করে নাই। জগতে যত জাতি আছে, তন্মধ্যে হিন্দুই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরধর্ম্মসহিষ্ণু। হিন্দু গভীরধর্ম্মভাবাপন্ন বলিয়া লোকে মনে করিতে পারে যে, যে ব্যক্তি ঈশ্বরে অবিশ্বাসী, তাহার উপর সে অত্যাচার করিবে। কিন্তু দেখুন, জৈনেরা ত ঈশ্বর-বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক বলিয়া মনে করে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন হিন্দুই জৈনের উপর অত্যাচার করে নাই। ভারতে মুসলমানেরাই প্রথমে পরধর্ম্মাবলম্বীর বিরুদ্ধে তরবারি গ্রহণ করিয়াছিল।"

"ইংলণ্ডে এই 'মূল একত্ববাদ' মতকিরূপ প্রচার লাভ করিতেছে? এখানে ত সহস্র সহস্র সম্প্রদায়।"

"স্বাধীন চিন্তা ও জ্ঞানের বৃদ্ধির সহিত ধীরে ধীরে ঐগুলি লোপ পাইবে। উহারা গৌণবিষয়াবলম্বনে প্রতিষ্ঠিত—সেজন্য কখন চিরকাল থাকিতে পারে না। ঐ সম্প্রদায়সমূহ তাহাদের উদ্দেশ্য সাধন করিয়াছে। ঐ উদ্দেশ্য—সম্প্রদায়ান্তর্গত ব্যক্তিবর্গের ধারণানুযায়ী সঙ্কীর্ণ ভ্রাতৃভাবের প্রতিষ্ঠা। এখন ঐ সকল বিভিন্ন ব্যক্তির সমষ্টির মধ্যে যে ভেদরূপ প্রাচীর ব্যবধান আছে, সেগুলি ভাঙ্গিয়া দিয়া ক্রমে আমরা সার্ব্বভৌমিক ভ্রাতৃভাবে পৌঁছিতে পারি। ইংলণ্ডে এই কার্য্য খুব ধীরে ধীরে চলিতেছে—তাহার কারণ সম্ভবতঃ এখনও উপযুক্ত সময় উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু তাহা হইলেও ধীরে ধীরে এই ভাব প্রসারিত হইতেছে। ইংলণ্ড ও ভারতে ঐ কার্য্য করিতে নিযুক্ত রহিয়াছে, আমি তৎপ্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি। আধুনিক জাতিভেদ ভারতের উন্নতির একটী বিশেষ প্রতিবন্ধক। উহাতে সঙ্কীর্ণতা

ও ভেদ আনয়ন করে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিতর একটা গণ্ডী কাটিয়া দেয়। চিন্তার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে উহা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে।”

“কিন্তু কতকগুলি ইংরাজ—আর তাঁহারা ভারতের প্রতি কম সহানুভূতি-সম্পন্ন নন, কিম্বা উহার ইতিহাস সম্বন্ধে খুব অজ্ঞ নন—জাতিভেদকে মুখ্যতঃ কল্যাণকর বলিয়াই মনে করেন। লোকে সহজেই বেশী রকম সাহেবী ভাবাপন্ন হইয়া যাইতে পারে। আপনিই আমাদের অনেকগুলি আদর্শকে জড়বাদাত্মক বলিয়া নিন্দা করেন।”

“সত্য। কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই ভারতকে ইংলণ্ডে পরিণত করিতে বাসনা করেন না। শরীরের অন্তরালপ্রদেশে যে চিন্তা রহিয়াছে, তদ্দ্বারাই এই শরীর গঠিত হইয়াছে। সুতরাং সমগ্র জাতিটী জাতীয় চিন্তার বিকাশ-মাত্র, আর ভারতে উহা সহস্র সহস্র বর্ষের চিন্তার বিকাশ-স্বরূপ। সুতরাং ভারতকে সাহেবী ভাবাপন্ন করা এক অসম্ভব ব্যাপার এবং উহার জন্য চেষ্টা করাও নির্ব্বোধের কার্য্য। ভারতে চিরদিনই সামাজিক উন্নতির উপাদান স্পষ্টভাবে বিদ্যমান ছিল। যখনই শান্তিময় শাসনপ্রণালী সংস্থাপিত হইয়াছে, অমনি উহার অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। উপনিষদের সময় হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত আমাদের সকল বড় বড় আচার্য্যেরাই জাতিভেদের বেড়া ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিয়াছেন। অবশ্য মূল জাতি-বিভাগকে নহে, তাঁহারা উহার বিকৃত ও অবনত ভাবটাকেই ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রাচীন জাতিবিভাগ অতি সুন্দর সামাজিক ব্যবস্থা ছিল—বর্ত্তমান জাতিভেদের মধ্যে যেটুকু ভাল দেখিতে পাইতেছেন, তাহা সেই প্রাচীন জাতিবিভাগ হইতেই আসিয়াছে। বুদ্ধ জাতিবিভাগকে উহার প্রাচীন মৌলিক আকারে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ভারত যখনই যখনই জাগিয়াছে, তখনই তখনই জাতিভেদ ভাঙ্গিবার প্রবল চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু এ কার্য্য চিরকাল আমাদিগকেই করিতে হইবে—আমাদিগকেই প্রাচীন ভারতের পরিণতি ও ক্রমবিকাশ-কল্পে নূতন ভারত গঠন করিতে হইবে; যে কোন বৈদেশিক ভাব ঐ কার্য্যে সাহায্য করে, তাহা যেখানেই পাওয়া যাক্ না কেন, লইয়া আপনার করিয়া লইতে হইবে। অপরে কখন আমাদের হইয়া ঐ কার্য্য করিতে পারিবে না। সকল উন্নতিই ব্যক্তি বা জাতি-বিশেষের ভিতর হইতে হওয়া প্রয়োজন। ইংলণ্ড কেবল ভারতকে তাহার নিজ উদ্ধার সাধনে সাহায্য করিতে পারে—

এই পর্য্যন্ত। আমার মতে অপরে জোর করিয়া ভারতের গলা টিপিয়া তাহার উন্নতি সাধনের চেষ্টা করিলে তাহাতে কোন ফল হইবে না। ক্রীতদাসের ভাবে কার্য্য করিলে অতি উচ্চতম কার্য্যেরও ফলে অবনতিই ঘটিয়া থাকে।"

"আপনি কি ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতি আন্দোলনের (Indian National Congress Movement) দিকে কখন মনোযোগ দিযাছেন?"

"আমি ও বিষযে বেশী মনোযোগ দিযাছি, বলিতে পারি না। আমার কার্য্যক্ষেত্র অন্য বিভাগে। কিন্তু আমি ঐ আন্দোলন দ্বারা ভবিষ্যতে বিশেষ শুভফল লাভের সম্ভাবনা আছে মনে করি এবং হৃদয়ের সহিত উহার সিদ্ধি কামনা করি। উহার দ্বারা ভারতের বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতি লইয়া এক বৃহৎ জাতি বা 'নেশন' গঠিত হইতেছে। আমার কখন কখন মনে হয়, ইউরোপেব বিভিন্ন দেশের অপেক্ষা ভাবতে অধিক বিভিন্ন জাতি নাই। অতীতকালে ইউরোপের বিভিন্ন জাতি সকল ভারতীয় বাণিজ্যাধিকারের জন্য বিশেষ প্রযাস পাইয়াছে, আর এই ভারতীয় বাণিজ্য, জগতের সভ্যতা বিস্তারে একটী প্রবলশক্তিস্বরূপে কার্য্য করিয়াছে। এই ভারতীয বাণিজ্যাধিকার লাভ মনুষ্যজাতির ইতিহাসের একরূপ ভাগ্যচক্রপরিবর্ত্তনকারী বলিযা নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। আমরা দেখিতে পাই, ওলন্দাজ, পর্ত্তুগীজ, ফরাসী ও ইংরাজ—ক্রমান্বযে উহার জন্য চেষ্টা করিযাছে। ভিনিস-বাসীরা প্রাচ্যদেশে বাণিজ্যাধিকারে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া সুদূর পাশ্চাত্য প্রদেশে ঐ ক্ষতিপূরণের চেষ্টা করাতেই যে আমেরিকার আবিষ্কার হইল, ইহাও বলা যাইতে পারে।*"

"ইহার পরিণতি হইবে কোথায়?"

"অবশ্য ইহার পরিণতি হইবে—ভারতের মধ্যে সাম্যভাব স্থাপনে—ভারতবাসী সকলের ব্যক্তিগত সমান অধিকার লাভে। জ্ঞান কয়েকজন শিক্ষিত ব্যক্তির একচেটিয়া সম্পত্তি থাকিবে না। সর্ব্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষার চেষ্টা হইতেছে—পরে বাধ্য করিয়া সকলকে শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত

* ভিনিস ইউরোপের সহিত প্রাচ্যদেশীয় বাণিজ্যের একটী প্রধান কেন্দ্র ছিল। তুর্কেরা ভিনিসবাসীদের প্রাচ্যদেশে গমনাগমনের পথ বন্ধ করিয়া দিবার পর অন্য পথে ভারত জাপান প্রভৃতি স্থানে গমনের একটা চেষ্টা হয়। এই ভারত গমনের পথাবিষ্কারের চেষ্টায়ই দৈবক্রমে আমেরিকা আবিষ্কার।

হইবে। ভারতীয় সর্ব্বসাধারণের মধ্যে নিহিত অগাধ কার্য্যকরী শক্তিকে ব্যবহারে আনিতে হইবে। ভারতের অভ্যন্তরে মহতী শক্তি নিহিত আছে—উহাকে জাগাইতে হইবে।"

"প্রবল যুদ্ধকুশল জাতি না হইয়া কেহ কি কখন বড় হইয়াছে?"

স্বামীজি মুহূর্ত্তমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া বলিলেন,—

"হাঁ—চীন হইযাছে। অন্যান্য দেশের মধ্যে আমি চীন ও জাপানেও ভ্রমণ করিযাছি। আজ চীন একটা ছোড়ভঙ্গ দলের মত হইয়া দাঁড়াইযাছে; কিন্তু উন্নতির দিনে উহার যেমন সুশৃঙ্খলবদ্ধ সমাজগঠন ছিল, আর কোন জাতির এ পর্য্যন্ত সেরূপ হয় নাই। অনেক বিষয়—যাহাদিগকে আমরা আজকাল আধুনিক আখ্যা দিয়া থাকি, চীনে শত শত, এমন কি, সহস্র সহস্র বর্ষ ধরিয়া প্রচলিত ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপে প্রতিযোগিতায় পরীক্ষার কথা ধরুন।"

"চীন এমন ছোডভঙ্গ হইয়া গেল কেন?"

"কারণ, চীন তাহার সামাজিক প্রণালীর অনুযায়ী লোক উৎপন্ন করিতে পারিল না। আপনাদের একটা চলিত কথা আছে যে, পার্লিযামেণ্টের আইনবলে মানুষকে ধার্ম্মিক করিতে পারা যায় না। চীনেরা আপনাদের পূর্ব্বেই ঐ কথা ঠেকিয়া শিখিয়াছিলেন। ঐ কারণেই রাজনীতি অপেক্ষা ধর্ম্মের গুরুতর উপকারিতা আছে। কারণ, ধর্ম্ম সমুদয় বিষয়ের মূল-দেশ পর্য্যন্ত গমন করিয়া থাকে এবং উহা মানবের কার্য্যকলাপের মূল-ভিত্তি লইয়া ব্যাপৃত।"

"আপনি যে ভারতের জাগরণের কথা বলিতেছেন, ভারত কি তদ্বিষয়ে সচেতন?"

"সম্পূর্ণ সচেতন। জগৎ সম্ভবতঃ প্রধানতঃ কংগ্রেস আন্দোলনে এবং সমাজসংস্কারক্ষেত্রে এই জাগরণ দেখিয়া থাকে, কিন্তু অপেক্ষাকৃত ধীর-ভাবে কার্য্য চলিলেও ধর্ম্মবিষয়ে ঐ জাগরণ বাস্তবিকই হইয়াছে।"

"পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য দেশের আদর্শ এতদূর বিভিন্ন! আমাদের আদর্শ সামাজিক অবস্থার পূর্ণতা সাধন বলিয়াই বোধ হয়। আমরা এখন এই সকল বিষয়ের আলোচনাতেই ব্যতিব্যস্ত রহিয়াছি, আর প্রাচ্যেরা সেই সময় সূক্ষ্ম তত্ত্বসমূহের ধ্যানে নিযুক্ত! এখানে পার্লিয়ামেণ্ট সুদানযুদ্ধে ভারতীয় সৈন্যের ব্যয়ভার কোথা হইতে নির্ব্বাহ হইবে, এই বিষয়ের

বিচারেই ব্যস্ত। রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের মধ্যে ভদ্র সংবাদপত্র মাত্রেই গভর্ণমেণ্টের অন্যায় মীমাংসার বিরুদ্ধে খুব চীৎকার করিতেছে, কিন্তু আপনি হয়ত ভাবিতেছেন, ও বিষয়টা একেবারে মনোযোগ দিবারই যোগ্য নয়।"

স্বামীজি সম্মুখের সংবাদপত্রটী লইয়া এবং রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের কাগজ হইতে উদ্ধৃতাংশ-সমূহে একবার চোক বুলাইয়া বলিলেন,—

"কিন্তু এ বিষয় আপনি সম্পূর্ণ ভুল বুঝিয়াছেন। এই বিষয়ে আমার সহানুভূতি স্বভাবতঃই আমার দেশের সহিতই হইবে। কিন্তু ইহাতে আমার একটী সংস্কৃত কিম্বদন্তী মনে পড়িতেছে—"হাতী বেচিয়া এক্ষণে অঙ্কুশের জন্য আর বিবাদ কেন?" ভারতই চিরকাল দিয়া আসিতেছেন। রাজ-নীতিজ্ঞগণের বিবাদ বড় অদ্ভুত। রাজনীতির ভিতর ধর্ম্ম ঢুকাইতে অনেক যুগ লাগিবে।"

"তাহা হইলেও উহার জন্য অতি শীঘ্র চেষ্টা করা ত আবশ্যক?"

"হাঁ, জগতের মধ্যে বৃহত্তম শাসনযন্ত্র সুমহান্ লণ্ডন নগরীর হৃদয়াভ্যন্তরে কোন ভাববীজ রোপণ করা বিশেষ প্রয়োজন বটে। আমি অনেক সময় ইহার কার্য্যপ্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকি—কিরূপ তেজের সহিত ও কেমন সম্পূর্ণভাবে অতি সূক্ষ্মতম শিরায় পর্য্যন্ত উহার ভাবপ্রবাহ ছুটিয়াছে! উহার ভাববিস্তার, চারিদিকে শক্তিসঞ্চালনপ্রণালী কি অদ্ভুত! ইহা দেখিলে সমগ্র সাম্রাজ্যটী কত বৃহৎ ও উহার কার্য্য কি গুরুতর, তাহা বুঝিবার পক্ষে সাহায্য হয়। অন্যান্য বিষয়-বিস্তারের সহিত উহা ভাবও ছড়াইয়া থাকে। এই মহান্ যন্ত্রের অন্তস্তলে কতকগুলি ভাব প্রবেশ করাইয়া দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন, যাহাতে অতি দূরবর্ত্তী প্রদেশে পর্য্যন্ত উহা বিস্তৃত হইতে পারে।"

স্বামীজির আকৃতি বিশেষত্বব্যঞ্জক। তাঁহার লম্বা চওড়া, সুন্দর গঠন, মনোহর প্রাচ্য বেশে আরো সুন্দর হইয়াছে। তিনি বাঙ্গালীর ঘরে জন্মাইযাছেন এবং কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের একজন গ্রাজুয়েট। তাঁহার বক্তৃতাশক্তি অসাধারণ। তিনি কোন প্রকার নোট না লইয়া একেবারে দেড় ঘণ্টা ধরিয়া বক্তৃতা করিতে পারেন, একটী কথার জন্যও বিন্দুমাত্র থামিতে হয় না।

শ্রীবলিতে শঙ্কর।

[শ্রীমতী—]

শ্রীবলি একখানি ব্রাহ্মণ-প্রধান ক্ষুদ্র পল্লী। প্রায় দুই সহস্র ব্রাহ্মণ এখানকার অধিবাসী। ব্রাহ্মণগণ মধ্যে অধিকাংশই অগ্নিহোত্রী এবং স্বধর্ম্মপরায়ণ।

এই স্থানে প্রভাকর নামে এক শাস্ত্রবিৎ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার পাণ্ডিত্য ও ধর্ম্মানুরাগের কথা পল্লীবাসী সকলেই বিদিত ছিলেন এবং এজন্য তাঁহার বেশ সুনামও ছিল।

প্রভাকরের সংসারটী ক্ষুদ্র। একটী ত্রয়োদশ বর্ষীয় পুত্রসন্তান ও তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে লইয়াই তাঁহার সংসার। তাঁহার ধন ধান্য প্রভৃতির কোন অভাব ছিল না। তিনি প্রায় সকল বিষয়েই সুখী কিন্তু একটী কারণে তিনি বড় মনকষ্টে দিন যাপন করিতেন।

ঐ মনকষ্টের কারণ তাঁহার পুত্রটী। কারণ পুত্রটী ত্রয়োদশ বৎসরের হইলেও কথা কহিতে পারিত না। সে সর্ব্বদা জড়ভরতের ন্যায় একস্থানে পড়িয়া থাকিত। বালকস্বভাবসুলভ কোন লক্ষণই তাহার দেখা যাইত না। এজন্য সকলে তাহাকে জড় বলিয়া ডাকিত। একমাত্র সন্তানের এই অবস্থা দেখিয়া পিতা মাতা উভয়েই অত্যন্ত চিন্তিত ও দুঃখিত থাকিতেন।

এক দিন প্রভাকর দ্বিপ্রহরের দারুণ রৌদ্রে অতি দ্রুতবেগে চলিয়াছেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ হইতে বিন্দু বিন্দু ঘাম পড়িতেছে। চিন্তা ও বিরক্তিতে তাঁহার ভ্রূযুগল কুঞ্চিত, মুখমণ্ডল আরক্তিম, মস্তকের শিখা উন্মুক্ত। দেখিলেই বোধ হয় তিনি যেন সেদিন কোনও কারণে বড়ই বিরক্ত ও বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন।

তিনি কিছুদূর গমন করিবার পরই পশ্চাৎ হইতে এক ব্রাহ্মণ তাঁহাকে আহ্বান করিলেন। পথের সকলেই সে আহ্বান শুনিল কিন্তু প্রভাকরের কর্ণে সে ধ্বনি প্রবেশ করিল না। অথবা তিনি তাহা শুনিয়াও শুনিলেন না। তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা বেগে চলিতে লাগিলেন।

ব্রাহ্মণ তখন অপেক্ষাকৃত উচ্চৈঃস্বরে প্রভাকরকে ডাকিতে লাগিলেন এবং ডাকিতে ডাকিতে প্রভাকরের পশ্চাদ্‌গমন করিলেন। এবার প্রভাকর আর না শুনিয়া থাকিতে পারিলেন না,ব্রাহ্মণের আহ্বান আর উপেক্ষা করা চলিল-না। প্রভাকর পশ্চাতে ফিরিয়া দেখেন তাঁহারই প্রিয় সুহৃদ তাঁহাকে

ডাকিতেছেন। তখন তিনি একটু থম্‌কাইয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন "ভায়া, এখন বড় ব্যস্ত, একটু পরে আস্‌ছি।"

এই বলিয়া প্রভাকর পুনরায় গমন করিতে উদ্যত হইলেন। ব্রাহ্মণ কিন্তু ইতিমধ্যে তাঁহার নিকট আসিয়া পড়িলেন এবং অধিকতর আগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভায়া, ব্যাপার কি বলিয়া যাও। শান্ত সমুদ্র সহসা উদ্বেলিত হইল কেন?"

ব্রাহ্মণের বাক্যে প্রভাকর কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইয়া কহিলেন, "আর ভাই, ছেলেটার জন্য জ্বালাতন হইয়াছি, চিত্ত আর স্থির রাখিতে পারা গেল না।"

ব্রাহ্মণ। কেন, আবার কি হ'ল?

প্রভা। নূতন আর কি হবে? নিত্যই যা, আজও তাই; তবে আজ সকালে ব্রাহ্মণী ছেলেটাকে খাবার হাতে দিয়া চণ্ডীমণ্ডপে বসাইয়া রাখিয়াছিলেন; আমি একটা কার্য্যে ওপাড়ায় গিয়াছিলাম; আসিয়া দেখি, ব্রাহ্মণী রন্ধনকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া ছেলের জন্য কাঁদিতে বসিয়াছেন। ব্রাহ্মণী এপাড়া ওপাড়া চারিদিক্ খুঁজিয়া কোথাও তাহাকে পান নাই। আমিও দেখিলাম, গ্রামের মধ্যে কোথাও নাই। এখন একবার পল্লীর বাহিরে দেখ্‌তে যাচ্ছি।

ব্রাহ্মণ। অতদূরে সে কি ক'রে যাবে? আমরা ত দেখিয়াছি, সে এক স্থানেই পড়িয়া থাকে, নিজে ত কোথাও যায় না।

প্রভা। আর ভাই, আমার দুঃখের কথা আর বল কেন? পাড়ার ঐ যে গুটীকতক ধনুর্দ্ধর ছেলে আছে, তাদের উৎপাতে আমি জ্বালাতন হইয়াছি। তারাই বোধ হচ্ছে তাকে কোথায় টেনে নিয়ে গেছে। আজ আবার তার পরণে একখানা নূতন কাপড় ছিল। কাপড়খানা কেউ কেড়ে নিলে কি না, দেখি।

ব্রাহ্মণ। তাহা! বড়ই কষ্টের কথা। চল, আমিও তোমার সঙ্গে যাচ্ছি।

প্রভাকর এইবার মন্থর গতিতে ব্রাহ্মণের সঙ্গে একটু অন্যমনস্ক হইয়া বাজে কথা কহিতে কহিতে পুত্রের সন্ধানে চলিলেন।

তাঁহারা ক্রমে পল্লীর বাহিরে এক বিস্তীর্ণ মাঠে আসিয়া পড়িলেন। এদিক্ ওদিক্ দেখিতে দেখিতে দেখেন, একটী গাছতলায় 'জড়' বসিয়া আছে। নিকটে আসিয়া দেখেন, তিনি যাহা আশঙ্কা করিয়াছিলেন, তাহাই ঠিক—পুত্র উলঙ্গ অবস্থায় উপবিষ্ট।

প্রান্তরমধ্যে বৃক্ষমূলে পুত্রকে এই ভাবে একাকী বসিয়া থাকিতে দেখিয়া প্রভাকর একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন "হা আমার অদৃষ্ট!"

ব্রাহ্মণও জড়ের অবস্থা দেখিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতে করিতে তাহার হাত ধরিয়া প্রভাকরকে কহিলেন,'চল ভায়া, বাড়ী চল, কি করিবে বল, ভগবানের যে কি ইচ্ছা, বুঝা ভার; একটা ছেলে, তাও কিনা জড় ভরত!'

অনন্তর ব্রাহ্মণ পথিমধ্যে প্রভাকরকে অনেক বুঝাইতে লাগিলেন এবং জড়ের সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে গৃহাভিমুখী হইলেন।

কিছুদূর আসিযা ব্রাহ্মণ প্রভাকরকে বলিলেন, "দেখ ভাই, তুমি ছেলের জন্য অনেক চেষ্টাই ত করিয়াছ, কিন্তু একটা চেষ্টা কর দেখি।"

প্রভা। আর কি চেষ্টা করিব। কবিরাজ, বদ্যি, দৈব যাগ যজ্ঞ কিছুই ত বাকী রাখি নাই। ব্রাহ্মণীও দেবতার মানত ও উপবাসাদি করিতেও ত্রুটি করেন নাই। আর কি চেষ্টা করিব?

ব্রাহ্মণ। দেখ ভাই, দক্ষিণপাড়ার শিবতলায় এক সন্ন্যাসী এসেছেন। আমি আজ সকালে তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলাম। শুনিলাম, তিনি এক-জন মহাপুরুষ! দেখেও বোধ হ'ল, তা হ'তে পারে। আমি আজ সন্ধ্যা-কালে আবার তাঁহাকে দেখ্‌তে যাব। তুমিও যদি যাও, সেইজন্যই তখন তোমাকে ডাকিতেছিলাম। তুমি একবার ছেলেটাকে তাঁহাকে দেখাইতে পার?

প্রভা। হ্যাঁ, শুনেছি বটে, আমিও আজ যাব বলিয়া ভাবিতেছিলাম, কিন্তু তিনি কি আমার ছেলেকে ভাল করিতে পারিবেন?

ব্রাহ্মণ। চলই না কেন, ছেলেটাকেও লইয়া চল; দেখ, যদি কিছু হয়।

প্রভাকর তাচ্ছিল্য ভাবে বলিলেন, "আচ্ছা তাই হবে, কাল সকালে যাওয়া যাবে।"

এইরূপ কথা কহিতে কহিতে তাঁহারা বাটীর সন্নিকটে আসিলে ব্রাহ্মণ বিদায় লইলেন। প্রভাকর পুত্রকে লইয়া স্বগৃহে প্রবেশ করিলেন।

ব্রাহ্মণী এতক্ষণ পুত্রের জন্য ঘর বার করিতেছিলেন। এক্ষণে পুত্রকে দেখিয়া তাহাকে ক্রোড়ের দিকে টানিয়া তাহার মুখচুম্বন করিলেন।

প্রভাকর পুত্রের কথা গৃহিণীকে বলিলেন। গৃহিণী তখন ক্ষোভে পাড়ার সেই দুষ্ট বালকদের নিন্দা করিতে লাগিলেন।

একটু বিশ্রামের পর প্রভাকর মধ্যাহ্ন-স্নান-আহ্নিক করিতে বসিলেন। ব্রাহ্মণীও পুত্রকে অন্নব্যঞ্জন খাওয়াইয়া দিতে বসিলেন।

প্রভাকর মধ্যাহ্নের পূজাপাঠ সমাপন করিয়া আহার করিতে বসিলেন এবং ধীরে ধীরে পত্নীকে দক্ষিণপাড়ার সেই সন্ন্যাসীর কথা বলিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণী সন্ন্যাসীর কথা শেষ হইতে না হইতেই বলিলেন, "আহা! আমার বাছাকে একবার তাঁহার নিকট লইয়া চল না? যদি তিনি কিছু ঔষধ দিয়া তাহাকে আরাম করিয়া দেন।" প্রভাকর বলিলেন, "ওগো, আমিও তাই বলিতেছি ত, আমি মনে করিতেছি, কাল সকালেই জড়কে লইয়া যাইব। তুমি উহাকে সকাল সকাল প্রস্তুত করিয়া রাখিও।"

প্রভাকর পুত্রকে লইয়া যাইবেন জানিয়া ব্রাহ্মণী এইবার স্বয়ং একবার সন্ন্যাসীকে দেখিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু প্রভাকর সেদিন তাহাতে আপত্তি করিলেন।

পরদিন প্রাতে ব্রাহ্মণী তাড়াতাড়ি জড়ের প্রাতঃকৃত্য সমাপন করাইলেন এবং একখানি উত্তম বস্ত্র পরাইয়া তাহাকে গৃহের অলিন্দ-মধ্যে বসাইয়া রাখিলেন, অন্যদিনের মত আজ আর চণ্ডীমণ্ডপে তাহাকে বসাইয়া রাখিলেন না; কারণ, ব্রাহ্মণীর ইচ্ছা যে পাড়ার পাঁচজনে যেন একথা জানিতে না পারে।

প্রভাকরও ত্বরাপূর্ব্বক নিজ প্রাতঃকালীন পূজাপাঠ শেষ করিলেন এবং জড়কে লইয়া গমনোদ্যত হইলেন।

এই সময় ব্রাহ্মণী পুনরায় পূর্ব্বদিনের প্রস্তাব উত্থাপিত করিলেন; বলিলেন, "ঠাকুর, একবার আমাকেও লইয়া চল, আমিও তাঁহাকে দেখিয়া আসি।"

কিন্তু প্রভাকর বলিলেন "ব্রাহ্মণি! আজ থাকুক, আজ আমরাই যাই, তুমি কাল যাইও। এখন শুন, রিক্তহস্তে সাধুদর্শনে যাইতে নাই; একটী সুপক্ক শ্রীফল তুমি আমাকে দাও। আর দেরী করিব না।"

অতঃপর প্রভাকর বামহস্তে পুত্রের দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিয়া ও দক্ষিণ হস্তে একটী সুবৃহৎ সুপক্ক শ্রীফল লইয়া সন্ন্যাসীর উদ্দেশে চলিলেন।

উত্তম বস্ত্রখানি পরিয়া জড়ের সুন্দর সুস্থ দেহ অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। ব্রাহ্মণী তাহাকে দেখিয়া মনে মনে ভাবিলেন "আহা! বাছার আমার কার্ত্তিকের মত রূপ, ভগবান কেন এমন করিলেন!" এই ভাবিতে ভাবিতে ব্রাহ্মণী পুত্রের পানে চাহিয়া রহিলেন এবং মনে মনে দুর্গানাম ও সর্ব্বাভীষ্টদাতা

গণেশের নাম জপ করিতে লাগিলেন। যতক্ষণ তাঁহারা দৃষ্টিবহির্ভূত না হইলেন, ততক্ষণ ব্রাহ্মণী তথায় দাঁড়াইয়া রহিলেন।

প্রতিবেশিনী রমণীরা কেহ কেহ ব্রাহ্মণীকে দণ্ডায়মানা দেখিয়া কহিলেন, "হ্যাঁ দিদি, এত সকালে 'জড়কে' সাজিয়ে গুজিয়ে ঠাকুর মশাই কোথায় নিয়ে গেলেন ভাই?"

ব্রাহ্মণী যেন একটু উদাসীন ভাবে "এই এই খানেই" বলিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সব কথা তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইল না, সুতরাং প্রতিবেশিনী-গণও কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। কারণ, তাঁহার ইচ্ছা নয় যে, পাঁচজনে এ কথা জানিতে পারে।

রমণীরা পরস্পরে মুখ চাওয়া চাওয়ি করিয়া একজন অপরকে কহিলেন "মাগীর অহঙ্কার দেখ না, তবু যদি ছেলেটা জন্তু না হইত!" উত্তরে একজন বলিলেন "বোন, জন্তু হইলেও ত বাঁচতুম, জন্তুতেও গলার স্বর বাহির করে, ক্ষুধার সময় খায়, খেলার সময় খেলা করে, তারা সবই বুঝে, শুধু কথাই কহিতে পারে না। এ যে তারও অধম!" তৃতীয়া রমণী বলিলেন "যা বলেছ ভাই; যাক্, ওসব কথা ছাড়িয়া দাও, জড়ের মা শুনিলে আবার দুঃখ করিবে।" এই বলিয়া তাঁহারা যে যাহার কর্ম্মে গমন করিলেন।

প্রভাকর পুত্রসঙ্গে শিবতলায় উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, শিবতলায় বটবৃক্ষমূলে মহা জনতা, যেন কিছু দেখিবার জন্য বহুলোক ঠেলাঠেলি করিতেছে। প্রভাকর বুঝিলেন, এ জনতার কারণ সেই সন্ন্যাসীকে দেখিবার চেষ্টা ভিন্ন আর কিছুই নহে।

যাহা হউক, তিনিও পুত্রকে লইয়া সেই জনতা-মধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং দেখিলেন, এক দিব্যকান্তি যুবক সন্ন্যাসী কতিপয় বয়োবৃদ্ধ সন্ন্যাসী পরিবৃত হইয়া শোভা পাইতেছেন।

যুবক বলিয়া প্রভাকরের মনে সন্ন্যাসী সম্বন্ধে একটু সন্দেহ ও বিস্ময়ের ছায়া পড়িল। তিনি তখন সন্ন্যাসীর ভাবভঙ্গীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া, তাঁহার ভিতরে কি আছে যেন জানিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, সন্ন্যাসীর চক্ষুর দিকে দৃষ্টি পড়িবামাত্র প্রভাকর আর চক্ষু ফিরাইতে পারিলেন না। সন্ন্যাসীর স্থির দৃষ্টি প্রভাকরের বিচারশক্তিকে যেন বিলুপ্ত করিয়া ফেলিল। প্রভাকর মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় সন্ন্যাসীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন।

এইবার প্রভাকর সন্ন্যাসীর সম্বন্ধে জানিবার জন্য আশ পাশের ২।১ জন লোকের কাণে কাণে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তখন সকলেই প্রভাকরের সহিত বেশী কথা কহিতে নারাজ,তাহারা সন্ন্যাসীর নাম ও দুই এক কথায় তাঁহার অসাধারণ মহত্ত্বের কথা বলিয়াই প্রভাকরের কথায় উপেক্ষা প্রদর্শন করিল। সুতরাং সন্ন্যাসী সম্বন্ধে বেশী কিছু প্রভাকর জানিতে পারিলেন না, তবে তাঁহার নাম 'শঙ্করাচার্য্য', এই মাত্র জানিলেন।

প্রভাকর এইবার পুত্র সঙ্গে ধীরে ধীরে জনতা ঠেলিয়া আচার্য্যের একটু সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন। প্রভাকরের আচার্য্যের নিকট যাইবার আগ্রহ দেখিয়া সকলেই তাঁহাদের পথ প্রদান করিল।

আচার্য্যের নিকট আসিয়াই প্রভাকর তাঁহার পাদপদ্মে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন এবং পরে পুত্রটীকেও প্রণিপাত করাইলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, পুত্রটী আর উঠিতে চাহিল না। প্রভাকর তাহাকে উঠাইতে গেলেন, তথাপি পুত্রটী উঠিল না। সে যেন ইচ্ছাপূর্ব্বক অবনতমস্তকে আচার্য্য-পদপ্রান্তে উপবিষ্ট রহিল। প্রভাকর পুত্রের এই প্রকার ভাব দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, এবং আচার্য্যকে লক্ষ্য করিয়া করজোড়ে বলিতে লাগিলেন "মহাত্মন্! কৃপা করিয়া আমার দুর্ভাগ্যের কথা একবার শ্রবণ করুন। প্রভো! আমার এই পুত্রটী ত্রয়োদশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত এ কথা কহিতে সমর্থ হইল না। বালকোচিত চাপল্য বা বয়সের অনুরূপ জ্ঞান বুদ্ধি কিছুরই বিকাশ হইল না। ক্ষুধা তৃষ্ণা শ্রান্তি কিছুই ইহাতে প্রকাশ পায় না। আনন্দ নিরানন্দ সুখ দুঃখ বোধ ইহার নাই। খাওয়াইয়া দিলে খায়, নচেৎ খায় না। ইচ্ছা অনিচ্ছা ইহার কখন দেখা যায় নাই। আজ কেবল আপনার চরণ ত্যাগে ইহার এই প্রথম অনিচ্ছা দেখিতে পাইলাম; নচেৎ ইতিপূর্ব্বে কখনও ইহার কোন অনিচ্ছাও দেখি নাই। ভগবন্! আমাদের দুঃখের কথা কি বলিব, পল্লীর দুষ্ট বালকেরা ইহার খাদ্য কাড়িয়া খায়, বস্ত্র কাড়িয়া লয়, কখন কখন অকারণ প্রহারেও জর্জ্জরিত করে, কিন্তু তথাপি এ বালক রোদন করে না; কোনও আপত্তিও করে না। এই জড় বালককে লইয়া আমরা দিবারাত্রি যাতনাভোগ করিতেছি। একমাত্র সন্তানের এই দশায় আমরা নিয়ত মর্ম্মান্তিক কষ্ট পাইতেছি। কত চিকিৎসা, কত দৈব যাগ যজ্ঞ করিলাম, কিন্তু কিছুতেই ইহার মনুষ্যত্বের কোনও লক্ষণ বিকশিত হইল না। দেব! এক্ষণে আপনার

চরণে আনিয়াছি, আপনার শরণ গ্রহণ করিলাম, আপনি যদি কৃপা করিয়া ইহার একটা উপায় করিয়া দেন। আমি বড় আশা করিয়া আপনার চরণ-প্রান্তে আসিয়াছি, আপনি কৃপা করিয়া এই হতভাগ্যের প্রতি সদয় হউন।"

প্রভাকর পুত্রের কথা বলিতে বলিতে অশ্রুসম্বরণ করিতে পারিলেন না; তাঁহার গভীর মনোবেদনা বন্যাস্রোতের ন্যায় সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া নয়নযুগলের মধ্য দিয়া বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিয়া ফেলিতেছিল। তিনি তখন অঞ্জলিবদ্ধকরে দরবিগলিতনেত্রে পুনঃ পুনঃ আচার্য্যের চরণে মস্তক লুণ্ঠিত করিতে লাগিলেন।

আচার্য্যদেব প্রভাকরকে সস্নেহ বচনে সান্ত্বনা প্রদান করিলেন এবং 'জড়'কে স্নেহভরে স্বহস্তে ভূমি হইতে উঠাইয়া নিজ পার্শ্বে বসাইলেন।

প্রভাকর তখন পুনরায় বলিতে লাগিলেন "ভগবন্! যদিও আমি ইহাকে বেদপাঠ ও অক্ষরপরিচয় করাইতে পারি নাই, তথাপি আমি ইহার উপ-নয়ন-সংস্কার করাইয়াছি।" আপনার নিকট আসিয়া যখন ইহার একটু অবস্থান্তর হইয়াছে, তখন আমার বিশ্বাস, আপনি কৃপা করিলে এই বালক নিশ্চয়ই আরোগ্য লাভ করিতে পারিবে। এই বলিয়া প্রভাকর ক্ষণকালের জন্য একটু নিস্তব্ধ হইলেন।

আচার্য্যদেব এতক্ষণ প্রভাকরের বাক্য শুনিতেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার প্রশান্ত নয়নের উজ্জ্বল দৃষ্টি বালকের উপরই ন্যস্ত ছিল। তিনি যেন তাঁহার সুতীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টির বলে জড়ের হৃদয়ের অন্তস্তল পর্য্যন্ত তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতেছিলেন! তিনি যেন তাহার জন্ম-জন্মান্তরীয় সুকৃত দুষ্কৃত মানস-চক্ষে অবলোকন করিতেছিলেন!

অনন্তর তিনি সস্মিতবদনে বালককে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "ওহে বালক! তুমি কে? তোমার বাসনাই বা কি? কেনই বা তুমি এই জড়ের ন্যায় কার্য্য করিতেছ, প্রকাশ করিয়া বল।"

আচার্য্যদেবের প্রশ্নে প্রভাকরের সেই আজন্ম-জড় বালক নিম্নলিখিত প্রাচীন শ্লোকাবলী আবৃত্তি করিয়া উত্তর প্রদান করিল। যথা :—

"নাহং মনুষ্যো ন চ দেবযক্ষৌ
ন ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রাঃ।
ন ব্রহ্মচারী ন গৃহী বনস্থো
ভিক্ষুর্ন চাহং নিজবোধরূপঃ ॥ ১ ॥

আমি মনুষ্য নহি, দেবতা বা যক্ষও নহি; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য অথবা শূদ্রও নহি; ব্রহ্মচারী, গৃহী, বাণপ্রস্থ বা সন্ন্যাসীও নহি; আমি নিজ-বোধ-স্বরূপ ॥ ১ ॥

নিমিত্তং মনশ্চক্ষুরাদি প্রবৃত্তৌ
নিরস্তাখিলোপাধিরাকাশকল্পঃ।
রবির্লোকচেষ্টানিমিত্তং যথা যঃ
স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা ॥ ২ ॥

আলোকময় সূর্য্য যেমন লোকের গমনাগমনাদি চেষ্টার কারণ, সেইরূপ যিনি আমাদিগের মনশ্চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বৃন্দের চেষ্টার কারণমাত্র, পরমার্থতঃ যিনি অখিলোপাধিশূন্য আকাশ-সদৃশ নিষ্কম্প পদার্থ, আমি সেই নিত্য-প্রবোধস্বরূপ আত্মা ॥ ২ ॥

যমগ্ন্যুষ্ণবন্নিত্যবোধস্বরূপং
মনশ্চক্ষুরাদীন্যবোধাত্মকানি।
প্রবর্ত্তন্ত আশ্রিত্য নিষ্কম্পমেকং
স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা ॥ ৩ ॥

উষ্ণতা যেমন অগ্নির স্বরূপ, সেইরূপ নিত্যজ্ঞান যাঁহার স্বরূপ; যিনি স্বয়ং নিষ্কম্প এবং অদ্বিতীয় পদার্থ, অথচ যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া জড়স্বভাব ইন্দ্রিয়বর্গ নিজ নিজ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়; আমি সেই নিত্যপ্রবোধময় আত্মা ॥৩॥

মুখাভাসকো দর্পণে দৃশ্যমানো
মুখত্বাৎ পৃথক্ত্বেন নৈবাস্তি বস্তু।
চিদাভাসকো ধীষু জীবোঽপি তদ্বৎ
স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা ॥ ৪ ॥

দর্পণের অভ্যন্তরে মুখের প্রতিবিম্ব দেখা যায়, কিন্তু তথায় যথার্থ মুখ হইতে পৃথক্ একটী মুখরূপ বস্তু থাকে না; বুদ্ধিবৃত্তিরূপ দর্পণে যাঁহার সেই প্রকার প্রতিবিম্বরূপ আভাস পতিত হইয়া জীব-নামে কথিত হয়, আমি সেই নিত্যজ্ঞানময় আত্মা ॥ ৪ ॥

যথা দর্পণাভাব আভাসহানৌ
মুখং বিদ্যতে কল্পনাহীনমেকং।
তথা ধীবিয়োগে নিরাভাসকো যঃ
স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা ॥ ৫ ॥

যেমন দর্পণ নষ্ট হইলে দর্পণস্থিত প্রতিবিম্বও নষ্ট হইয়া একমাত্র কল্পনা শূন্য যথার্থ মুখই অবশিষ্ট থাকে, সেইরূপ বুদ্ধির নাশ হইলে যিনি আভাস-রহিত হইয়া অদ্বিতীয়ভাবে বিদ্যমান থাকেন, আমি সেই নিত্যজ্ঞানময় আত্মা ॥ ৫ ॥

মনশ্চক্ষুরাদের্বিমুক্তঃ স্বয়ং যো
মনশ্চক্ষুরাদের্মনশ্চক্ষুরাদিঃ।
মনশ্চক্ষুরাদেরগম্যস্বরূপঃ
স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা ॥ ৬ ॥

যিনি মনশ্চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ হইতে বিমুক্ত এবং স্বয়ং মনশ্চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বর্গের মনশ্চক্ষুঃস্বরূপ, যিনি মনশ্চক্ষুঃ প্রভৃতির অগম্য, আমি সেই নিত্যজ্ঞানময় আত্মা ॥ ৬ ॥

য একো বিভাতি স্বতঃ শুদ্ধচেতাঃ
প্রকাশস্বরূপোঽপি নানেব ধীষু।
শরাবোদকস্থো যথা ভানুরেকঃ
স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা ॥ ৭ ॥

যে অদ্বিতীয় প্রমাণস্বরূপ পদার্থ নির্ম্মল চিত্তে আপনা হইতেই প্রকাশিত হইয়া থাকেন এবং শরাবাদিস্থিত জলে প্রতিবিম্বিত সূর্য্যের ন্যায় যিনি এক হইয়াও নানারূপে প্রতীয়মান হন, আমি সেই নিত্যজ্ঞানস্বরূপ আত্মা ॥৭॥

যথানেকচক্ষুঃপ্রকাশো রবির্ন
ক্রমেণ প্রকাশীকরোতি প্রকাশ্যং।
অনেকা ধিয়ো যস্তথৈকপ্রবোধঃ
স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা ॥ ৮ ॥

যেমন সূর্য্য এক হইয়াও জগতের যাবতীয় চক্ষুকে এক কালেই প্রকাশ করিয়া থাকেন, ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করেন না, সেইরূপ যিনি একমাত্র চেতন হইয়াও জগতের সমস্ত বুদ্ধিকে এককালেই প্রকাশ করেন, আমি সেই নিত্যজ্ঞানময় আত্মা ॥ ৮ ॥

বিবস্বৎপ্রভাতং যথারূপমক্ষং
প্রগৃহ্ণাতি নাভাতমেবং বিবস্বান্।
তথাভাত আভাসয়ত্যক্ষমেকঃ
স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা ॥ ৯ ॥

যেমন চক্ষু সূর্য্যালোকে প্রকাশিত হইয়া দ্রব্যের রূপকে প্রকাশিত করিতে পারে, সেইরূপ সূর্য্যও যাঁহার আলোকে প্রকাশিত হইয়া চক্ষুকেও প্রকাশিত করিয়া থাকেন, আমি সেই একমাত্র নিত্যজ্ঞানময় আত্মা ॥ ৯ ॥

যথা সূর্য্য একোঽপ্স্বনেকশ্চলাসু
স্থিরাস্বপ্যনন্যদ্বিভাব্যস্বরূপঃ।
চলাসু প্রভিন্নাসু ধীষ্বেক এবং
স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা ॥ ১০ ॥

যেমন সূর্য্য এক হইলেও চঞ্চল এবং স্থিরজলস্থ প্রতিবিম্বসমূহ দেখিয়া তাঁহাকে অনেক বলিয়া বোধ হয় এবং তিনি বাস্তবিক তথায় মিলিত না হইলেও সংমিলিত বলিয়া প্রতীতি জন্মে, সেইরূপ যিনি এক হইয়াও চঞ্চল এবং ভিন্ন ভিন্ন বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া অনেক বলিয়া অনুভূত হন, আমি সেই নিত্যজ্ঞানময় আত্মা ॥ ১০ ॥

ঘনচ্ছন্নদৃষ্টি র্ঘনচ্ছন্নমর্কং
যথা নিষ্প্রভং মন্যতে চাতিমূঢ়ঃ।
তথা বদ্ধবদ্ভাতি যো মূঢ়দৃষ্টেঃ
স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা ॥ ১১ ॥

দিবাভাগে আকাশে মেঘ উঠিলে তদ্দ্বারা লোকের দৃষ্টি আবৃত হয়, সূর্য্য আবৃত হন না; কিন্তু যে নিতান্ত অজ্ঞ, সে তখন মনে করে যে, সূর্য্যই মেঘে আবৃত হইয়া নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছেন। সেইরূপ মোহাচ্ছন্ন লোকে নিজ নিজ বুদ্ধির বন্ধবশতঃ যাঁহাকে বদ্ধ বলিয়া মনে করে, আমি সেই নিত্যজ্ঞানময় আত্মা ॥ ১১ ॥

সমস্তেষু বস্তুষ্বনুস্যূতমেকং
সমস্তানি বস্তূনি যন্ন স্পৃশন্তি।
বিয়দ্বৎ সদা শুদ্ধমচ্ছস্বরূপং
স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা ॥ ১২ ॥

যে এক পদার্থ সমস্ত বস্তুতেই অনুবিদ্ধ, অথচ যাঁহাকে সমস্ত বস্তু স্পর্শ করিতে পারে না, যিনি সর্ব্বদা আকাশের ন্যায় শুদ্ধস্বচ্ছস্বরূপ, আমি সেই নিত্যজ্ঞানময় আত্মা ॥ ১২ ॥

উপাধৌ যথা ভেদতা সন্মণীনাং
তথা ভেদতা বুদ্ধিভেদেষু তেঽপি।
যথা চন্দ্রকাণাং জলে চঞ্চলত্বং
তথা চঞ্চলত্বং তবাপীহ বিষ্ণো॥ ১৩॥

হে বিষ্ণো! যেমন স্ফটিকাদি মণি স্বভাবতঃ নির্ম্মল ও শুভ্রবর্ণ হইলেও সন্নিধানস্থিত অন্য কোন রঞ্জিত বস্তুর বর্ণের সংক্রমণ হওয়াতেই রঞ্জিত বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ সন্নিধানস্থিত বুদ্ধির ভেদবশতই তোমার ভেদ কল্পিত হইয়াছে; অথবা যেমন জলের চাঞ্চল্য বশতঃ চন্দ্রেরও চাঞ্চল্য প্রতীত হয়, সেইরূপ বুদ্ধির চাঞ্চল্যে তোমারও চাঞ্চল্য প্রতীত হইয়া থাকে॥ ১৩॥"

প্রভাকরের জড় বালক এই ত্রয়োদশটী শ্লোকে আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া নিস্তব্ধ হইলেন। আচার্য্যদেব ইতিপূর্ব্বেই বালকের অবস্থা বুঝিতে পারিয়াছিলেন; এক্ষণে বালকের মুখে উক্ত আত্মজ্ঞানপ্রদ শ্লোকগুলি শুনিয়া তাঁহার বড়ই আনন্দ হইল। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, আহা! এ বালককে ইহার পিতামাতা আত্মীয় স্বজন চিনিতে না পারিয়া ইহার প্রতি কতই অন্যায় ব্যবহার করিয়াছে; ইহাকে কি করিয়া ইহাদের হাত হইতে নিষ্কৃতি প্রদান করা যায়! আচার্য্য এই প্রকার চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া ক্ষণকাল নিস্তব্ধ রহিলেন। প্রভাকর প্রভৃতি অপর সাধারণ সকলেই তখন বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন। কাহারও মুখে কোন কথা নাই। সকলেই স্তম্ভিত। তাহারা একবার আচার্য্যের প্রতি, একবার জড়ের প্রতি, আবার কখন বা প্রভাকরকে দেখিতে লাগিল।

এই ভাবে কিয়ৎক্ষণ কাটিয়া গেলে আচার্য্যদেব ধীরে ধীরে প্রভাকরকে কহিলেন "মহাশয়, আপনি মহাভাগ্যবান্। আপনার এই পুত্র আজন্ম তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন। আপনি ইহাকে পুত্ররূপে পাইয়া ধন্য হইয়াছেন, জানিবেন। আপনি আর ইহার জন্য দুঃখ করিবেন না। শাস্ত্রানুসারে, এরূপ পুত্র যে কুলে জন্ম গ্রহণ করে, তাহার ঊর্দ্ধ ও অধস্তন চতুর্দ্দশ পুরুষ ধন্য হয়েন। তত্ত্বজ্ঞান এ বালকের আমলকী ফলের ন্যায় করতলগত হইয়াছে, জানিবেন। ইহার জ্ঞাতব্য আর কিছু অবশিষ্ট নাই।

প্রভাকর আচার্য্যদেবের কথা শুনিয়া আনন্দে ও বিস্ময়ে একেবারে আত্মহারা! তিনি আচার্য্যের কথার কি উত্তর দিবেন, তাহা ভাবিয়াই আকুল।

অতএব আচার্য্যের কথায় কোন উত্তর না দিয়া তিনি তাঁহার পাদপদ্মে মস্তক লুণ্ঠিত করিতে লাগিলেন।

ক্রমে দ্বিপ্রহরকাল উপস্থিত হইল। আচার্য্যের ভিক্ষার সময় সন্নিকট দেখিয়া শিষ্যগণ যেন একটু চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। প্রভাকর তাহা বুঝিতে পারিয়া পুত্রকে লইয়া গৃহে ফিরিতে উদ্যত হইলেন।

আচার্য্যদেব প্রভাকরের গৃহগমনের উদ্যোগ দেখিয়া কহিলেন "মহাশয়! একটু অপেক্ষা করুন, আপনার পুত্র সম্বন্ধে আমার কিছু বলিবার আছে।"

প্রভাকর সাগ্রহে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন "ভগবন্! অনুমতি করুন। আমায় কি কিছু করিতে হইবে?"

আচার্য্য বলিলেন "মহাত্মন্! এই পুত্র কখনই গৃহস্থাশ্রমের উপযুক্ত হইবে না, কারণ, এ বালক তত্ত্বজ্ঞানী। সন্ন্যাসাশ্রমই ইহার উপযোগী। সুতরাং ইহাকে লইয়া আপনি কি করিবেন? ইহাকে আমার হস্তে প্রদান করুন।"

সহসা আচার্য্যের মুখে এই অভাবনীয় কথা শুনিয়া প্রভাকর একেবারে চমকিত হইয়া উঠিলেন। তিনি যেন চারি দিক্ অন্ধকার দেখিলেন। আচার্য্য-বাক্য যেন তাঁহার হৃদয়ে শেলসম বিদ্ধ হইল। তিনি আচার্য্যকে কি উত্তর দিবেন, স্থির করিতে পারিলেন না, পরন্তু কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া রহিলেন।

প্রভাকর ইতিপূর্ব্বে পুত্রের ভবিষ্যৎ বিষয়ে মনে মনে অনেক আশা করিতেছিলেন এবং কতক্ষণে ব্রাহ্মণীকে এই শুভ সংবাদ দিবেন বলিয়া মধ্যে মধ্যে ব্যস্ত হইতেছিলেন, কিন্তু আচার্য্যের অনুমতি ব্যতিরেকে আচার্য্য-চরণপ্রান্ত পরিত্যাগ করিতে পারিতেছিলেন না।

এক্ষণে আচার্য্যের এই কথা শুনিয়া তাঁহার ব্রাহ্মণীর কথা মনে পড়িল। তিনি কতকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। পরিশেষে ব্রাহ্মণীর নাম করিয়া একটু সময় ভিক্ষা করিবেন ভাবিয়া তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন "ভগবন্! ইহার গর্ভধারিণীকে কি একবার জিজ্ঞাসা করিতে আমায় আদেশ করিবেন? এইটীই আমাদের একমাত্র সন্তান, ইহাকে লইয়াই আমাদের সংসার ইহাকে ছাড়িয়া আমরা কি করিয়া জীবন ধারণ করিব?"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া প্রভাকরের কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গেল। তিনি তখন আর কিছু বলিতে না পারিয়া বালকের ন্যায় কাঁদিয়া ফেলিলেন।

আচার্য্য প্রভাকরের মনোভাব বুঝিতে পারিলেন। তিনি তখন ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন "আচ্ছা, মহাশয়! অদ্য আপনি পুত্রকে লইয়া গৃহে যা'ন, পরে বিবেচনা করিয়া যাহা হয় করিবেন। আমি ত ২।৪ দিন এই স্থানে থাকিব।"

আচার্য্যের কথায় প্রভাকর যেন দেহে প্রাণ পাইলেন। তিনি যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন এবং আচার্য্যের কথায় সম্মত হইয়া পুত্রকে লইয়া গৃহাভিমুখী হইলেন।

এদিকে ব্রাহ্মণী পতি-পুত্রকে পাঠাইয়া দিয়া অত্যন্ত উদ্‌গ্রীব হইয়া আছেন। তিনি গৃহকর্ম্ম করিতেছেন বটে, কিন্তু মন পড়িয়া আছে সেই শিবতলায়। না জানি সন্ন্যাসী কি বলিবেন, কি করিবেন। যদি সন্ন্যাসী আমার বাছাকে আরোগ্য করিতে না পারেন, অথবা যদি কোন ঔষধ পত্র খাওয়াইয়া হিতে বিপরীত হয়, এই সকল চিন্তায় তাঁহার সময় আর কাটিতেছে না। তিনি একবার বহির্দ্বারে আসিয়া সাগ্রহে পথপানে চাহিতেছেন, একবার গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া ভগবান্‌কে স্মরণ করিতেছেন, আবার কখন বা গৃহকর্ম্ম করিতে করিতে কোনওরূপ শব্দ শুনিলেই উৎকর্ণ হইয়া উঠিতেছেন। এইরূপে প্রায় দ্বিপ্রহর বেলা হইল; তখন তিনি অত্যন্ত অস্থিরভাবে বহির্দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

কতক্ষণ পরে প্রভাকর পুত্রসহ গ্রাম্য পথে দেখা দিলেন, এবং ব্রাহ্মণী দূর হইতে পতি-পুত্রকে দেখিয়া সুস্থির হইলেন। এক্ষণে পুত্রের বিষয় সন্ন্যাসী কি বলিয়াছেন, তাহাই শুনিবার জন্য তিনি ব্যাকুল।

ক্রমে প্রভাকর গৃহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার প্রফুল্ল অথচ গম্ভীর বদন দেখিয়া ব্রাহ্মণীর হৃদয়ে যেন আশার সঞ্চার হইল। তিনি তাড়াতাড়ি পুত্রের চাঁদমুখে চুম্বন করিলেন এবং স্বীয় অঞ্চলে তাহার স্বেদসিক্ত মুখখানি মুছাইয়া দিতে দিতে পতিকে সন্ন্যাসীর কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

প্রভাকর, আচার্য্যের ভিক্ষা প্রার্থনা বা পুত্রের অভাবনীয় চরিত্র, এই দুইটীর কোন্‌টী আগে ব্রাহ্মণীকে বলিবেন, তাহাই ভাবিতেছিলেন। এজন্য ব্রাহ্মণী প্রভাকরকে জিজ্ঞাসার অবসর পাইলেন, এবং প্রভাকরও

আচার্য্যের প্রার্থনাটী গোপন রাখিয়া পুত্রের মহানুভব চরিত্রের কথা বলিলেন। ব্রাহ্মণী আনন্দে অধীর হইয়া পুত্রকে পুনঃ পুনঃ ক্রোড়ে করিয়া চুম্বন করিতে লাগিলেন এবং পুত্রকে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিলেন।

জননী ত্রয়োদশ বৎসর পুত্রকে লালন পালন করিয়াছেন, অথচ কখন তাহার মুখে মধুমাখা 'মা' বুলি পর্য্যন্ত শ্রবণ করেন নাই। তিনি এখন একবার 'মা' বলিয়া ডাকিবার জন্য পুত্রকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কখন বা পুত্রের চিবুক ধরিয়া কখন বা চুম্বন করিয়া পুত্রকে বলেন "বাছা! একবার মা বলিয়া ডাক, আমার প্রাণটা জুড়া'ক্।"

কিন্তু কি আশ্চর্য্য! পুত্র পূর্ব্বের মত জড়ের ন্যায় বসিয়া রহিল, মাতার কোন অনুবোধে কর্ণপাত করিল না। পুত্রের পূর্ব্ববৎ জড়ভাব দেখিয়া ব্রাহ্মণী পতির মুখের দিকে চাহিলেন এবং বলিলেন "হ্যাঁগা কৈ, ছেলে ত কথা কয় না? তুমি কি সত্য বলিতেছ, সাধুর কাছে ছেলে কথা কহিয়াছে?"

প্রভাকরও পুত্রের এই ভাব দর্শনে অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছেন। তিনি ব্রাহ্মণীর কথায় কোন উত্তর না দিয়া স্বয়ং অনেক চেষ্টা করিলেন, অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন, কিন্তু বালক তাঁহার একটী কথারও উত্তর দিল না, পূর্ব্ববৎ মূকের ন্যায় বসিয়া রহিল! তখন তাঁহারা বালকের বিষয়ে হতাশ হইলেন এবং বুঝিলেন, এ বালক তাঁহাদের সঙ্গ চাহে না।

প্রভাকর তখন পুত্র সন্ন্যাসীর নিকট যাহা যাহা বলিয়াছিল, সমুদয় সবিস্তারে ব্রাহ্মণীকে বলিলেন, এবং সন্ন্যাসীর প্রার্থনাটীও প্রকাশ করিলেন।

ব্রাহ্মণী সে কথা শুনিয়া চমকিত হইয়া কহিলেন "সে কি কথা, তাহা আমি কখন দিব না।"

প্রভাকর ধীরে ধীরে কহিলেন, "আমি কিন্তু দিব বলিয়া আসিয়াছি।"

ব্রাহ্মণী ইহা শুনিয়া একেবারে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন এবং পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

প্রভাকর এখন বুঝিলেন, সন্ন্যাসী তাঁহাদের এই জড় বালকটীকে কেন চাহিয়াছেন। তিনি তখন আর কোন কথা না কহিয়া মধ্যাহ্নের নিত্য-কর্ম্মানুষ্ঠানের আয়োজন করিতে লাগিলেন এবং পুত্রটীকে আহারাদি প্রদান করিতে বলিলেন।

ব্রাহ্মণী কিয়ৎক্ষণ কান্নাকাটী করিয়া গৃহকর্ম্মে মনোযোগ দিলেন।

প্রভাকর পূজায় বসিলেন; কিন্তু মনে মনে তাঁহার কেবলই এই চিন্তা উঠিতে লাগিল যে, তিনি পুত্রটীকে সন্ন্যাসীর হাতে দিবেন কি না; আর যদি দেওয়াই স্থির করেন, তবে ব্রাহ্মণীকে কি করিয়া বুঝাইবেন।

ফলে তাঁহার পূজা পাঠ আজ সব শেষ হইল না, যা' তা' করিয়া সারিয়া তিনি চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া বসিলেন।

ব্রাহ্মণী অন্নব্যঞ্জন পাতে দিয়া প্রভাকরকে আহ্বান করিলেন। প্রভাকর 'যাই' 'যাই' করিয়া অনেক দেরীতে গৃহাভ্যন্তরে আসিলেন এবং যৎকিঞ্চিৎ আহার করিয়াই উঠিয়া গেলেন। ব্রাহ্মণী এদিন আর অন্ন গ্রহণ করিলেন না, ঠাকুরের একটু মিষ্টান্ন প্রসাদ খাইয়া জল খাইলেন এবং পতিপার্শ্বে আসিয়া বসিলেন।

প্রভাকর বহুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া স্থির করিলেন, জড়কে সন্ন্যাসীর হস্তেই দিতে হইবে এবং ব্রাহ্মণীকেও বুঝাইতে হইবে। ভাবিলেন, পুত্রস্নেহে অন্ধ হইয়া একজন শাপভ্রষ্ট মহাত্মার ক্ষতি করি কেন? যেখানে তাহার জীবনের পূর্ণ বিকাশ হয়, সেইখানেই সে থাকুক; সে সুখী হইলেই আমাদের সুখ। ভাবিলেন, স্বার্থই সকল অনিষ্টের মূল; ইহা যদি বিসর্জ্জন না করিতে পারিলাম, তাহা হইলে আর মানুষজন্ম লইয়া করিলাম কি? কল্যই প্রাতে জড়কে সন্ন্যাসীর হস্তে সমর্পণ করিব।

প্রভাকর মনে মনে এইটী স্থির করিয়া যেমন ব্রাহ্মণীকে বলিতে যাইবেন অমনি তাঁহার স্বর কম্পিত হইল, কণ্ঠ রুদ্ধ হইল, চক্ষুর্দ্বয় অশ্রুজলে আকুল হইল! তাঁহার মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল! প্রভাকর আবার ক্ষণকালের জন্য নীরব! ব্রাহ্মণী মস্তক অবনত করিয়া মধ্যে মধ্যে অঞ্চল দ্বারা অশ্রুজল মুছিতেছেন; কি বলিবেন, তাহা তিনিও স্থির করিতে পারিতেছেন না। অনেকক্ষণ পরে প্রভাকর আবার হৃদয়ে বল আনয়ন করিলেন এবং ধীরে ধীরে পত্নীকে নিজ ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন।

ব্রাহ্মণী বলিলেন "না দেব! আমি তো প্রাণ থাকিতে জড়কে ছাড়িয়া দিতে পারিব না, তুমি যদি সাধুকে দিব বলিয়া স্বীকার করিয়া থাক, তাহা হইলে আমি তাঁহার নিকট যাইয়া বলিব যে, "আমি জড়কে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিতে পারিব না।"

প্রভাকর তখন পত্নীকে নানাপ্রকারে বুঝাইতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহার

প্রবোধ-বাক্য মাতার স্নেহার্দ্র হৃদয়কে শুষ্ক—কঠিন করিয়া তুলিতে পারিল না। তাঁহার সব উপদেশ ব্রাহ্মণীর আপত্তির নিকট ভাসিয়া গেল।

পরে অনেক তর্কবিতর্কের পর স্থির হইল, পরদিন উভয়েই জড়কে লইয়া সন্ন্যাসীর নিকট যাইবেন; সেখানে যাইয়া যাহা হয়, হইবে।

ব্রাহ্মণী বলিলেন "আমি সন্ন্যাসীকে বুঝাইয়া জড়কে গৃহে ফিরাইয়া আনিব। সে যখন কথা কহিতে পারে জানা গিয়াছে, তখন সে থাকিতে থাকিতে কথা কহিবেই কহিবে। জড় যদি মহাপুরুষই হয়, তাহা হইলে পিতামাতার মনঃকষ্ট দিয়া, তাহার কি সন্ন্যাসী হওয়া উচিত? আমি যে দশমাস দশদিন গর্ভে ধরিলাম, কত কষ্টে লালন পালন করিলাম, তাহাকে কি সন্ন্যাসী করিবার জন্য? বেশ, কল্যই চল, দেখিও, আমি তাহাকে ফিরাইয়া আনিব।"

প্রভাতে ব্রাহ্মণ-দম্পতি পুত্রকে লইয়া সন্ন্যাসীর উদ্দেশে চলিলেন। অন্ধ ব্রাহ্মণী পুত্রের হাত ধরিয়াছেন; প্রভাকর অগ্রে অগ্রে যাইতেছেন। পথে দুই এক জন প্রতিবেশী, তাঁহারা সন্ন্যাসীর নিকট যাইতেছেন শুনিয়া, তাঁহাদের সঙ্গ লইল।

ক্রমে তাঁহারা সন্ন্যাসীর নিকট আসিলেন, এবং সন্ন্যাসীকে যথাবিধি প্রণিপাত করিযা আসন গ্রহণ করিলেন।

আচার্য্যদেব তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ করিয়া প্রভাকরকে বলিলেন "ইনি কি জড়ের জননী? আপনারা কি স্থির করিলেন?"

প্রভাকর করজোড়ে মস্তক অবনত করিয়া বলিলেন "প্রভো। ব্রাহ্মণী জড়কে আপনার হস্তে সমর্পণ করিতে একান্ত নারাজ। এজন্য তিনি স্বয়ং আপনার নিকট আসিয়াছেন। শুনুন, তিনি কি বলেন।"

আচার্য্য তখন জড়-জননীকে সুমিষ্ট সম্ভাষণে বলিতে লাগিলেন "মা! আপনি বড়ই ভাগ্যবতী যে, এরূপ পুত্র গর্ভে ধারণ করিয়াছেন। যে কুলে এরূপ পুত্র সন্তান জন্মে, তাহার চতুর্দ্দশ পুরুষ স্বর্গ ভোগ করেন। আপনার পুত্র আজন্ম তত্ত্বজ্ঞানী, মায়া মোহ সংসার-বন্ধন ইঁহার ছিন্ন হইয়াছে। আপনারা ধন্য যে, আপনারা ইঁহার জনক-জননী হইয়াছেন। কিন্তু মা! এ পুত্র লইয়া আপনারা কি করিবেন? ইনি ত সর্ব্বদাই সমাধিস্থ থাকেন। ইঁহাকে আমাদের হস্তে সমর্পণ করুন।"

জড়ের জননী আচার্য্যের মধুর রূপ ও সুমিষ্ট বাক্য শুনিয়া যেন একে-

বারে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় হইয়া পড়িলেন। তিনি আচার্য্যকে যে সব কথা বলিবেন বলিয়া এতক্ষণ মনে মনে ঠিক করিয়াছিলেন, কে যেন সে সব হরণ করিয়া লইল, তাঁহার মুখে আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না! অশ্রুজলে অঞ্চল ভিজিয়া গেল। তিনি বহু কষ্টে বলিলেন "বাবা! জড় দুঃখিনীর একমাত্র সন্তান, আপনি ইহাকে সংসারী হইতে বলিয়া আমাকে বাঁচান। ইহাকে ছাড়িয়া আমি বাঁচিব না।"

আচার্য্য তখন ঈষৎ হাস্য করিলেন এবং নম্রভাবে বলিলেন "এরূপ তত্ত্বজ্ঞানী পুত্রের জননীর মুখে এরূপ কথা শোভা পায় না। আপনি একবার ভাবুন দেখি, এ সংসারে কে কাহার আপনার? সকলেই নিজ নিজ কর্ম্মবশে দুই দিনের জন্য এখানে আসিয়া পিতা মাতা পুত্র কন্যা প্রভৃতি সম্পর্ক পাতায় ও সময় হইলে চলিয়া যায়। বলুন দেখি মা! আপনি যে আপনার পতি-পুত্রকে এত ভাল বাসেন, তাহা কি তাহারা সুখী হইবে বলিয়া, না আপনি সুখী হইবেন বলিয়া? মা! পরোপকার অপেক্ষা ধর্ম্ম নাই। যাহাতে আপনার পুত্রের যথার্থ মঙ্গল হয়, তাহাই করুন। আচ্ছা, আপনিই আপনার পুত্রকে জিজ্ঞাসা করুন, তিনি কি করিতে চাহেন; তিনি আপনার নিকট থাকিলে সুখী হইবেন, কি আমার নিকট থাকিলে সুখী হইবেন। তিনি যাহা ইচ্ছা করিবেন, আপনি তাহাই করুন।"

এই বলিয়া আচার্য্য জড়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় জড় তখন তাহার জননীকে 'মা' বলিয়া সম্বোধন করিয়া অতি বিনয় নম্র-বচনে বলিল "মা! যদি আপনি যথার্থই আমার মঙ্গল কামনা করেন, তাহা হইলে কৃপা করিয়া আমাকে এই যতিরাজের শরণ গ্রহণ করিতে সম্মতি প্রদান করুন।"

জড়ের মুখে 'মা' বুলি শুনিয়া ব্রাহ্মণীর হৃদয় বিগলিত হইল, শরীর যেন অবশ হইল, তাঁহার বহু দিনের পুত্রের বাসনা আজ চরিতার্থ হইল। তিনি তখন কি এক অপূর্ব্ব ভাবে বিভোর হইয়া পড়িলেন এবং বহু কষ্টে সে ভাব সম্বরণ করিয়া গলায় বস্ত্র দিয়া করজোড়ে আচার্য্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "বাবা, আর আমার কোন বাসনা নাই। আমার পুত্র যদি আপনার নিকট থাকিয়া সুখী হয় ত আপনি তাহাকে গ্রহণ করুন। আপনি আমাদের সকলের আশ্রয় হউন। আমাদের সকলকেই আপনার চরণতলে স্থান দিন।"

আচার্য্য তখন ব্রাহ্মণ-দম্পতীকে নানাবিধ জ্ঞানোপদেশ দিতে লাগিলেন। তাঁহারাও আচার্য্যের বাক্য শুনিয়া আপনাদিগকে চরিতার্থ জ্ঞান করিলেন।

ক্রমে মধ্যাহ্নকাল সমাগতপ্রায় হইল। প্রভাকর পত্নীকে গৃহে আসিতে অনুরোধ করিলেন। ব্রাহ্মণী তখন জড়কে জন্মের মত শেষ বার কোলে লইলেন এবং কয়েক বার তাহার মুখ চুম্বন করিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে পতির অনুগমন করিলেন।

প্রভাকরও পুত্রকে শেষ দেখা দেখিয়া আচার্য্যকে প্রণিপাত করিয়া বিদায় লইলেন। ব্রাহ্মণ-দম্পতি পথে যাইতে যাইতে বার বার পশ্চাৎ ফিরিয়া জড়কে দেখিতে লাগিলেন এবং আচার্য্যের সুমধুর উপদেশ স্মরণ করিতে করিতে গ্রাম-মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

শ্রীরামানুজ-দর্শন।

(৮)

[শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ।]

মায়াবাদ খণ্ডন।

এইবার আমাদের আলোচ্য বিষয়—রামানুজ-মতাবলম্বনে মায়াবাদ বা অনির্ব্বচনীয়-খ্যাতিবাদ খণ্ডন। রামানুজ নিজ সৎখ্যাতিবাদ স্থাপন উপলক্ষে যে পাঁচ প্রকার বিরুদ্ধখ্যাতিবাদ খণ্ডন করিয়াছেন, তন্মধ্যে এই অনির্ব্বচনীয়-খ্যাতিবাদ খণ্ডনই শেষ; সুতরাং ইহারই পরে তিনি নিজ সৎখ্যাতিবাদ স্থাপন করিবেন। রামানুজের মতের বিরুদ্ধ পাঁচ প্রকার খ্যাতিবাদ কি কি, তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি; সুতরাং এস্থলে সে কথা উত্থাপন করিয়া আর প্রবন্ধ দীর্ঘ করিব না; পাঠকবর্গের নিকট নিবেদন, তাঁহারা যেন ইহার পূর্ব্বখণ্ডগুলির প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করেন।

গ্রন্থকার এই অনির্ব্বচনীয় খ্যাতিকে সর্ব্বশেষে খণ্ডন করায় আমরা এই অনির্ব্বচনীয় খ্যাতি সম্বন্ধে একটু আলোক পাইয়া থাকি। ইহাকে সর্ব্বশেষে স্থান দেওয়ায় প্রথমতঃ আমাদের দুইটী কথা মনে হইতে পারে।

প্রথম, হয় ইহা নিতান্ত অপ্রয়োজনীয়, তাই প্রয়োজনীয় সমস্ত কথা বলিয়া সর্ব্বশেষে ইহার বিষয় আলোচিত হইতেছে; দ্বিতীয়, অথবা ইহা সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বলিয়া ইহার বিষয় সর্ব্বশেষে আলোচনা করা হইয়াছে। বস্তুতঃ লোক-মধ্যেও দেখা যায়, একাধিক প্রয়োজনীয় বস্তুকে ক্রমানুসারে সাজাইবার কালে লোকে দুই রকম পথ অবলম্বন করে, যথা—প্রধান প্রয়োজনীয়কে শেষে স্থাপন অথবা তাহাকে প্রথমে স্থাপন। ক্রমের প্রতি লক্ষ্য না থাকিলেই কেবল এই নিয়মের অন্যথা ঘটে। পরন্তু যদি দার্শনিকের চরিত্রের প্রতি দৃষ্টি করা যায়, তাহা হইলে সাধারণতঃই দেখা যাইবে যে, তাঁহারা প্রায়ই ক্রম-প্রিয়, সাধারণের ন্যায় তাহারা ক্রমের প্রতি লক্ষ্যহীন হইয়া থাকেন না।

এখন যদি টীকাকারের দার্শনিক চরিত্র স্মরণ করিয়া তাঁহাকে ক্রমপ্রিয় ব্যক্তিবর্গের অন্তর্ভুক্ত করা যায়, এবং পূর্ব্বোক্ত চারিটী খ্যাতিবাদের যুক্তি-তর্কের প্রতি লক্ষ্য করা হয়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, অনির্ব্বচনীয়-খ্যাতি-বাদটীকে শেষে খণ্ডন করিবার একটী তাৎপর্য্য আছে। পাঠক স্মরণ করিয়া দেখুন, পূর্ব্বোক্ত চারিটী খ্যাতিবাদের খণ্ডনস্থলেই গ্রন্থকার বিপক্ষকে মধ্যে মধ্যে বিচারের এমন একটী একটী স্থলে আনিয়া ফেলিয়াছেন, যাহাতে বিপক্ষের মতকে অনির্ব্বচনীয় বলিয়া তাঁহাকে দোষ দিতে হইয়াছে; কোন কোন স্থলে হয়ত বলিয়াছেন "তাহা হইলে তোমার মতে জগত্তত্ত্ব কিছু ব্যাখ্যাত হইল না" ইত্যাদি। বস্তুতঃ বিপক্ষকে এরূপ দোষে দোষী করা হইতেই কি বুঝা যায় না যে, টীকাকার সকল মতকেই অনির্ব্বচনীয় বাদে আনয়ন করিতে-ছেন, এবং তজ্জন্য এই অনির্ব্বচনীয় বাদটী তাঁহাদের সকলেরই মতের সমালোচনার একটা পরিণতি-বিশেষ; পরন্তু অনির্ব্বচনীয় বাদ হইতে তাঁহা-দের মতের উদ্ভব হয় নাই। এই দৃষ্টিতে অনির্ব্বচনীয় বাদটী সুতরাং পূর্ব্বোক্ত চারিটী মতের অন্তিম মতই হওয়া উচিত।

তাহার পর আর এক কথা। যদি অনির্ব্বচনীয় মতের প্রচারের সময়ের সহিত অপর চারিটী মতের প্রচারের সময়ের পূর্ব্বাপর্য্যভাব বিচার করা যায়, তাহা হইলেও দেখা যাইবে যে, অনির্ব্বচনীয় মতের প্রচার উক্ত চারিটী মতের প্রচারের পর ঘটিয়াছে। যথা—প্রথম, আত্মখ্যাতিবাদমতের প্রচারক যোগাচার বৌদ্ধসম্প্রদায়ের অশ্বঘোষ আচার্য্য, অনির্ব্বচনীয় মতের প্রচারক আচার্য্য শঙ্করের বহুপূর্ব্ববর্ত্তী। তৎপরে দ্বিতীয়, অসৎখ্যাতিবাদ মতের

প্রচারক শূন্যবাদী বৌদ্ধসম্প্রদায়ের নাগার্জ্জুনাচার্য্য উক্ত অনির্ব্বচনীয়-মত-প্রচারকের বহুপূর্ব্ববর্ত্তী। ঐরূপ তৃতীয়, অখ্যাতিবাদ-মতের প্রচারক পণ্ডিত-কেশরী প্রভাকর ভট্টও শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী অথবা সমসাময়িক; পরন্তু কোন মতেই তিনি পরবর্ত্তী নহেন, তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। পরিশেষে চতুর্থ, অন্যথাখ্যাতিবাদ-মতের প্রচারক ন্যায়মতাবলম্বী ন্যায়সূত্রের ভাষ্যকার বাৎসায়ন মুনি এবং বার্ত্তিককার উদ্যোতকরের বহু পরে শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব, তাহা অভিজ্ঞ পাঠকবর্গ অবগত আছেন। সুতরাং এ দৃষ্টিতেও অনির্ব্বচনীয়খ্যাতিবাদ অপর চারিটী বাদের এক প্রকার উৎকর্ষ বলা চলে।

তাহার পর যদি উক্ত চারিটী মতের মধ্যেও পরস্পরের প্রচারের সময় বিচার করা যায়, তাহা হইলেও কেবল ন্যায়মত ব্যতিরেকে উহাদের মধ্যে ক্রম-নিয়মটী অক্ষুণ্ণ দেখা যায়, এবং এইজন্যই বোধ হয় প্রাচীন গ্রন্থে নিম্নলিখিত শ্লোকটী দৃষ্ট হয়। যথা;—

আত্মখ্যাতিরসৎখ্যাতিরখ্যাতিঃ খ্যাতিরন্যথা।
তথাঽনির্ব্বচনীয়খ্যাতিরিত্যেতৎ খ্যাতিপঞ্চকম্॥

অর্থাৎ আত্মখ্যাতি, অসৎখ্যাতি, অখ্যাতি, অন্যথাখ্যাতি এবং অনির্ব্বচনীয় খ্যাতি এই পাঁচটী খ্যাতি। ইত্যাদি।

যাউক, এইবার মূল প্রসঙ্গটীর কথা আলোচ্য। তবে এই মায়াবাদ-খণ্ডনে একটা কথা পূর্ব্ব হইতে বলিয়া রাখা ভাল যে, ইহাতে রামানুজ-মতে মায়াবাদের সমুদায় আপত্তিকর কথার খণ্ডন করা হইবে না, পরন্তু ইহাতে ভ্রমজ্ঞান-সম্বন্ধে যতটা তাঁহার মতে আপত্তিকর বলিয়া বিবেচিত হইবে, ততটাই এস্থলে খণ্ডন করা হইবে; অবশিষ্ট খণ্ডন দেখিবার ইচ্ছা হইলে, রামানুজাচার্য্য-কৃত শ্রীভাষ্য ও বেদার্থসারসংগ্রহ এবং বেদান্ত মহাদেশিক-কৃত তত্ত্বমুক্তাকলাপ গ্রন্থ প্রধানতঃ দেখা কর্ত্তব্য।

যাহা হউক, এক্ষণে পাঠক স্মরণ করুন, আমাদের আলোচ্য বিষয়—"সর্ব্ববিধ জ্ঞানের যথার্থতা"। অর্থাৎ রামানুজ বলেন, সব জ্ঞানই যথার্থ, এমন কোন জ্ঞানই নাই, যাহার "অর্থ" অর্থাৎ "বিষয়" নাই, অথচ সেই বিষয়ের জ্ঞান আছে। লোকে সাধারণতঃ শুক্তিতে রজতজ্ঞান-স্থলে বলিয়া থাকে যে, এ রজতজ্ঞানের বিষয় নাই; কিন্তু রামানুজ বলিবেন, শুক্তিতে রজত-জ্ঞান হইলেও সে রজতজ্ঞান বিষয়শূন্য জ্ঞান নহে, তাহারও বিষয় আছে, এবং সে বিষয়টীও সত্য।

এই প্রসঙ্গে অপর বাদিগণের মত আলোচনা করা হইয়াছে, এক্ষণে মায়াবাদীর মত আলোচ্য। মায়াবাদী বলেন যে, শুক্তিতে রজতজ্ঞানস্থলে রজতজ্ঞানের বিষয় যে রজতপদার্থ, তাহা অনির্ব্বচনীয়-পদবাচ্য। কারণ, তাহাকে "আছে" বলাও যায় না, অথবা তাহাকে "নাই" বলাও যায় না; অর্থাৎ তাহা "সৎ"ও নহে, "অসৎ"ও নহে। যাহা "সৎ" বা "অসৎ" অর্থাৎ যাহা "আছে" বা "নাই", তাহারই পরিচয় আমরা দিতে পারি, তাহারই বিষয় আমরা বলিতে পারি; কিন্তু যাহাকে "আছে" বা "নাই"—এ দুইয়ের কিছুই বলা যায় না, তাহার পরিচয়ও আমরা দিতে পারি না, তাহার বিষয় কোন কথাই আমরা বলিতে পারি না। এইজন্য অনির্ব্বচনীয় অর্থ—যাহার বিষয় বলা কহা চলে না, অর্থাৎ যাহা নির্ব্বচনীয় নহে। কারণ, যাহার বিষয় বলা কহা চলে, তাহা হয় "আছে" না হয় "নাই"।

মায়াবাদীদিগের এই কথাটী তাঁহাদের মতের একটী ভিত্তি। কেবল ভিত্তি বলিলেও বোধ হয় ঠিক বলা হয় না; ইহাকে একপ্রকার মূল ভিত্তি বলিলেই ভাল হয়। কারণ, তাঁহাদের মতে "এক ব্রহ্মই সত্য আর সব মিথ্যা, জীব ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে।" যথা—

"ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীব ব্রহ্মৈব নাপরঃ॥" ইত্যাদি।

জগৎকে মিথ্যা বলিতে গেলেই জগতের জ্ঞানকে ভ্রমজ্ঞান বা শুক্তিতে রজতজ্ঞানের সমান জ্ঞান বলিতে হইবে, অন্য কথায় জগৎকে অনির্ব্বচনীয় বলিয়া প্রমাণ করিতে হইবে। জগৎকে একেবারে নাই বলিয়া মিথ্যা বলিলে তাহাকে মিথ্যা বলা চলিতে পারে না; কারণ, এইরূপে যাহাকে মিথ্যা বলা হয়, তাহাও ত কোন কালে বা কোন দেশে কোন আকারে ছিল, বা আছে, বা থাকিবে; নচেৎ তুমি তাহাকে মিথ্যা বল কি করিয়া? সুতরাং মায়াবাদীর জগৎ মিথ্যা অর্থে জগৎ অনির্ব্বচনীয়, তাহাকে আছে বা নাই কিছুই বলা চলে না, আর এইজন্যই মায়াবাদীর এই অনির্ব্বচনীয় বাদ এত প্রয়োজনীয়, এত আদরণীয়।

মায়াবাদীর মতে শুক্তিতে রজতজ্ঞানস্থলে রজতজ্ঞানের বিষয় যে রজতপদার্থ, তাহার সহিত রজতজ্ঞানের যে সম্বন্ধ, এই জগৎজ্ঞানের বিষয় যে জগৎপদার্থ, তাহার সহিত জগৎজ্ঞানের সেইরূপ সম্বন্ধ। অর্থাৎ শুক্তিতে রজতজ্ঞানস্থলে, রজতজ্ঞানের বিষয় রজতপদার্থটী যেমন "আছে"

বা "নাই" বলিবার যোগ্য নহে বলিয়া অনির্ব্বচনীয়, তদ্রূপ জগৎ-জ্ঞানের বিষয় জগৎপদার্থটী "আছে" বা "নাই" বলিবার যোগ্য নহে বলিয়া জগৎপদার্থটী অনির্ব্বচনীয়। মায়াবাদীর যেমন শুক্তিতে রজতজ্ঞানটী ভ্রম, এবং এই রজতের বিষয়টী অনির্ব্বচনীয়, তদ্রূপ ব্রহ্মে জগৎজ্ঞানটী ভ্রম, এবং এই জগৎজ্ঞানের বিষয় জগদ্বস্তুটী অনির্ব্বচনীয়। শুক্তিতে রজতজ্ঞান হইলে শুক্তি যেমন সত্য, তদ্রূপ ব্রহ্মে জগৎজ্ঞানস্থলে ব্রহ্মও সত্য। শুক্তিতে রজতজ্ঞানস্থলে শুক্তি যেমন "এই" পদবাচ্য ও প্রত্যক্ষযোগ্য, ব্রহ্মে জগৎজ্ঞান-স্থলে তদ্রূপ "ইহা আছে," "উহা আছে," "জগৎ আছে" ইত্যাকার "আছে" অর্থাৎ "সৎ" পদবাচ্য এবং সাক্ষাৎকারযোগ্য। অস্তিত্বজ্ঞানটী সকলেরই প্রত্যক্ষযোগ্য বিষয়, ইহাতে কোন সন্দেহ উঠিতেই পারে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে, মায়াবাদীর অনির্ব্বচনীয় বাদটী মায়াবাদীর পক্ষে কত আবশ্যকীয়।

মায়াবাদীর মতে শুক্তিতে রজতজ্ঞানটী যদি ভ্রম হইল, এবং রজত-জ্ঞানের বিষয় যদি অনির্ব্বচনীয় হইল, তাহা হইলে এখন দেখা যাউক, মায়াবাদীর এরূপ সিদ্ধান্তের হেতু কি? তাঁহারা 'কি' দেখিয়া এরূপ সিদ্ধান্ত স্থির করেন? এই কথাটী বুঝিতে হইলে, ভ্রম কাহাকে বলে, তাহা জানা উচিত। কারণ, ভ্রমের লক্ষণের উপর তাঁহাদের যুক্তিগুলি নির্ভর করে। যদিচ ভ্রম অর্থ কি, তাহা সকলেই বুঝে, এবং ভ্রমের লক্ষণ সাধারণতঃ অনেকপ্রকার কথিত হইয়া থাকে, যথা—(১) যাহা সত্যজ্ঞান বা প্রমাজ্ঞান ভিন্ন, তাহাই ভ্রম, (২) যাহা দেখিয়া যে জ্ঞান হয়, সেই জ্ঞানের বিষয় যদি সেই দৃশ্যমান পদার্থ হইতে পৃথক্ হয়, তাহা হইলে তাহা ভ্রম ইত্যাদি, তথাপি বক্ষ্যমাণ লক্ষণটী জানিবার বিষয়। এ লক্ষণটী এই;—"যে জ্ঞানের বাধ হয়, তাহা ভ্রম।" অবশ্য এস্থলে বাধ হওয়া অর্থ একটু পরিষ্কার করিয়া বলা ভাল; কারণ, এই লক্ষণের মধ্যে "বাধ" শব্দটীর উপরই ইহার অর্থ নির্ভর করিতেছে। "বাধ" মানে যাহাকে যাহা বলিয়া বুঝা যায়, সেই বুঝাটা যদি আমাকে ত্যাগ করিতে বাধ্য হইতে হয় এবং তাহার স্থানে যদি আর একটা বোধকে আনিতে হয়, তাহা হইলে তাহাকে "বাধ" বলে। এক কথায় "এটা এ নয়" এই জ্ঞানকেই বাধ বলে। যেমন শুক্তিটাকে রজত বলিয়া বুঝিলাম, কিন্তু ক্ষণপরে তাহাকে আর রজত বলা চলিল না, তাহাকে শুক্তি বলিয়া বুঝিতে আমি বাধ্য হইলাম,

ইত্যাদি। সুতরাং ভ্রমের এই লক্ষণ অনুসারে যে জ্ঞানের "বাধ" হয়, তাহাই ভ্রম, এবং যাহার "বাধ" হয় না, তাহা ভ্রম নহে। অন্য কথায়, যদি শুক্তিটাকে তুমি রজত বলিয়া বুঝ এবং তাহার কস্মিন্ কালে "বাধ" হয় না অথবা "বাধ" হইবার কোন উপায়ই নাই বল, তাহা হইলে এই লক্ষণানুসারে এই প্রকার শুক্তিতে রজতজ্ঞানটা ভ্রম নহে, উহাও "প্রমা" বা যথার্থ জ্ঞান। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ভ্রমজ্ঞানেরও বাধ না থাকিলে তাহা ভ্রমজ্ঞান নহে।

এখন ভ্রমের বিষয় অনির্ব্বচনীয় কেন বলা হয়, তাহা দেখা যাউক। মায়াবাদী বলেন, শুক্তিতে রজতজ্ঞানস্থলে রজত "সৎ" নহে; কারণ, ভ্রম ও বাধের তাহাতে সম্ভাবনা নাই। শুক্তিতে রজতজ্ঞানের রজত যদি "সৎ" অর্থাৎ অস্তিত্ববিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহাকে ভ্রম কেন বলিবে? অথবা তাহার "বাধ"ই কি করিয়া সম্ভব? অবশ্য এখানে ভ্রম-শব্দের লক্ষণ আমাদের অবলম্বিত শেষ লক্ষণটী নহে, ইহার লক্ষণ পূর্ব্বে যাহা কথিত হইয়াছে, অর্থাৎ "যাহা দেখিয়া যে জ্ঞান হয়, সেই জ্ঞানের বিষয় যদি দৃশ্যমান পদার্থ হইতে পৃথক্ হয়, তাহা হইলে সেই জ্ঞানই ভ্রম" ইত্যাদি লক্ষণটী বুঝিতে হইবে। সুতরাং শুক্তিতে রজতজ্ঞানস্থলে রজতকে সৎ বলা চলে না।

তাহার পর ঐ স্থলে রজতকে যদি অসৎ বল, তাহাও সঙ্গত হয় না। কারণ, তাহা হইলে শুক্তিতে রজতবোধই আদৌ হইতে পারে না, এবং সে প্রকার বোধ না হইলে তাহার "বাধ"ও সম্ভব হয় না। দেখ, "বাধ" হইতে গেলেই কোন একটা জিনিষে "এটা এ নয়" এইরূপ জ্ঞান হওয়া আবশ্যক হয়; সুতরাং রজত না থাকিলে শুক্তিটাকে রজত নয় বল কি করিয়া? এজন্য দেখ, শুক্তিতে রজতজ্ঞানস্থলে রজতকে অসৎ বলা চলে না।

এখন যদি শুক্তিতে রজতজ্ঞানস্থলে রজত "সৎ" বা "অসৎ" কিছুই হইল না, তাহা হইলে শুক্তিতে যে রজতজ্ঞান হয়, সে রজত কি রজত, তাহা ত বলিতে হইবে? মায়াবাদী বলেন, এ রজত অনির্ব্বচনীয় রজত, অথবা ইহা প্রাতিভাসিক রজত, কিম্বা ইহাকে শুক্তিসম্বন্ধীয় অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন রজত বল। এই রজত দেখিয়া লোকে লোভপরবশ হইয়া শুক্তিখণ্ডকেই লইতে প্রবৃত্ত হয়, যত্ন চেষ্টা সবই করে। ইহা যতক্ষণ ভ্রম, ততক্ষণ মাত্র স্থায়ী; ভ্রম বিনষ্ট হইলে ইহাও বিনষ্ট হয়। আর অন্য জিনিষ বিনষ্ট হইলে

যেমন তাহার কোন না কোন রকম কিছু অবশেষ থাকে, ইহার তাহাও থাকে না ; কারণ, সকলেই দেখিয়া থাকে, ভ্রান্ত ব্যক্তির ভ্রম বিনষ্ট হইলে, কিছু দিন বাদে সে ব্যক্তি সেই ভ্রমের কথা একেবারেই ভুলিয়া যায়।

শুক্তিতে রজতবোধের রজতবস্তু যেমন অনির্ব্বচনীয় বা প্রাতিভাসিক অথবা শুক্তিবিষয়ক অজ্ঞান হইতে সমুৎপন্ন, তদ্রূপ ব্রহ্মে জগদ্বোধের জগদ্বস্তুও অনির্ব্বচনীয় বা প্রাতিভাসিক অথবা ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞান হইতে সমুৎপন্ন। এই জগৎ ও জগৎসংক্রান্ত যাবতীয় জ্ঞান বা সুখদুঃখ, সকলই ঐ অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন—ঐ অজ্ঞানেরই পরিণাম। এই যে পাপপুণ্য, কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্য বোধ, ঐ যে সুখদুঃখ জ্ঞান, ঐ যে অমিয়-মাখা মাতৃ-স্নেহ, ঐ যে মধুর দম্পতি-প্রেম, সকলই এই অজ্ঞানের পরিণাম। ঐ যে "ক্ষুদ্র-মহৎ" বোধ, ঐ যে "জীব-ঈশ্বর" জ্ঞান, ঐ যে ভগবানের সৃষ্টি স্থিতি-লয়-কর্ত্তৃত্ব-সামর্থ্য-স্বীকার, ঐ যে ভক্তের ভগবানের প্রতি শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-মধুর প্রেম —এ সকলই ঐ অজ্ঞানের খেলা। এই অজ্ঞান নাশ হইলে জীব জুড়াইতে পারে, ইহা না হইলে জীবের শান্তি নাই।

মায়াবাদীর এই কথায় রামানুজ বলেন যে, না, মায়াবাদীর একথা ঠিক নহে। সকল জ্ঞানই যথার্থ, সকল জ্ঞানের বিষয়ই সত্য, কোন জ্ঞানেরই বিষয় অনির্ব্বচনীয় নহে। দেখ, অনির্ব্বচনীয় শব্দের অর্থ কি? ইহার অর্থ কি বাচ্যত্ব-রাহিত্য বুঝায় না? আর যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে ত সমুদায় ব্যবহারের বিরোধ উপস্থিত হইবে। ব্যবহার-বিরোধ হয়, কেন, বলি ;—মনে কর, মায়াবাদীর মতে জগৎ যদি অনির্ব্বচনীয় হয়, তাহা হইলে রাম শ্যাম হরি শব্দে যাহা বুঝায় তাহাও অনির্ব্বচনীয়, ধন জন ঐশ্বর্য্য বলিতে যাহা বুঝায় তাহাও অনির্ব্বচনীয় ; সুতরাং রামের ধন শ্যামের নয়, হরির পিতা শ্যামের ভাই, এ সকল কথাও অনির্ব্বচনীয়, অর্থাৎ এ সকল কথা নিরর্থক। কিন্তু কে না এই সকল কথার অর্থ বুঝে?—কে না এই প্রকার কথাবার্ত্তার সাহায্যে জগতে নিজ নিজ প্রয়োজন সিদ্ধ করিয়া থাকে? তাই বলি, জগৎপ্রপঞ্চ অনির্ব্বচনীয় হইলে ব্যবহার-বিরোধ অনিবার্য্য ; মায়া-বাদিন্! তোমার অনির্ব্বচনীয় বাদ ঠিক নহে।

তাহার পর আর এক কথা। তুমি যদি জগৎকে অনির্ব্বচনীয় বল, তাহা হইলে তোমার ব্রহ্ম ও জগতে পার্থক্য কি, বল দেখি? তুমি ত ব্রহ্মকেও অনির্ব্বচনীয় বলিয়া থাক, আর এখন জগৎকেও অনির্ব্বচনীয় বলিতেছ ;

তাহা হইলে তোমার ব্রহ্ম ও জগৎ তুল্য পদার্থ নহে কি? কিন্তু ব্রহ্মকে যদি তোমায় জগতের তুল্য পদার্থ বলিতে হয়, তাহা হইলে তোমার ব্রহ্মও বিকারী, পরিণামী, বিনশ্বর এবং মিথ্যা হইয়া দাঁড়াইল। সুতরাং অনির্ব্বচনীয় অর্থে বাচ্যত্ব-রহিতত্ব বলিলে এই দুইটী দোষ অনিবার্য্য।

তাহার পর অনির্ব্বচনীয় অর্থে যদি সত্তা এবং অসত্তা এই উভয় ধর্ম্ম না থাকা বল, তাহা হইলেও তোমার কথা অসঙ্গত। দেখ, শুক্তিতে রজত-জ্ঞানস্থলে রজতপদার্থের ত তুমি তথায় একটা প্রাতিভাসিক-সত্তা-রূপ ধর্ম্ম স্বীকার করিয়া থাক; কিন্তু, তাহা হইলে তোমার অনির্ব্বচনীয়ত্ব রহিল কোথায়? প্রাতিভাসিক সত্তাও ত সত্তা; তুমি শুক্তিতে রজতজ্ঞানের বিষয়-স্বরূপ রজতের প্রাতিভাসিক-সত্তা-রূপ ধর্ম্ম স্বীকার করায়, সত্তা এবং অসত্তা এই উভয় ধর্ম্ম না থাকাকেই অনির্ব্বচনীয়ত্ব বলিতে পার না। সুতরাং দেখ, তোমার অনির্ব্বচনীয় শব্দের এই প্রকার অর্থ অবলম্বনেও শুক্তিতে রজত-জ্ঞানের বিষয়স্বরূপ রজতপদার্থের অনির্ব্বচনীয়ত্ব সিদ্ধ হইল না।

যদি বল, উক্ত সত্তা পদের অর্থ—পারমার্থিক অর্থাৎ স্বাধীন সত্তা, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত অজ্ঞানজনিত সত্তা বা প্রাতিভাসিক সত্তা পদের যে সত্তা, তাহা পারমার্থিক সত্তা নহে; কারণ, তাহা হইলে ব্রহ্মের সত্তাও প্রাতিভাসিক-সত্তা-মধ্যে গণ্য হইয়া যাইতে পারে, অর্থাৎ ব্রহ্ম তাহা হইলে শুক্তিতে রজত-জ্ঞানের রজতপদার্থের মত হইয়া দাঁড়াইবেন—ইত্যাদি—তাহাও বলিতে পার না; কারণ, তুমি ব্রহ্মকে নির্ধর্ম্মক বল, ব্রহ্মের পারমার্থিক সত্তা রূপ কোন ধর্ম্ম স্বীকারই তোমার অভিপ্রেত নহে। সুতরাং দেখ, অনির্ব্বচনীয় অর্থে সত্তা ও অসত্তা এই উভয় ধর্ম্ম না থাকা যদি বল, তাহাও সিদ্ধ হয় না।

এখন যদি বল, অনির্ব্বচনীয় অর্থে "সৎ" ও "অসৎ" ভিন্ন বস্তু বুঝায়, অর্থাৎ যাহা সৎও নহে অসৎও নহে, তাহাই অনির্ব্বচনীয় ইত্যাদি, তাহাও বলিতে পার না। কারণ, এরূপ বস্তুর কোন প্রমাণ নাই। দেখ, সমস্ত বস্তুই প্রতীতি-গোচর; যাহার কোন প্রকারই প্রতীতি নাই, তাহার সম্বন্ধে কি কেহ কোন কথা বলিতে বা ভাবিতে পারে? আর এই প্রতীতি, দেখ, কোথাও সতের আকারে অবস্থিত, যথা—ঘটপটাদি, এবং কোথাও বা অসতের আকারে অবস্থিত, যথা—খরগোসের সিং ইত্যাদি; এতদ্ব্যতীত তৃতীয় প্রকার প্রতীতি ত হইতেই পারে না। সুতরাং তোমার অনির্ব্বচনীয় পদার্থ সৎ-

অসৎ-ভিন্ন, একথা তোমার অসঙ্গত। অনির্ব্বচনীয় পদার্থ যদি সৎ ও অসৎ-ভিন্ন হয়, তাহা হইলে তাহা অনির্ব্বচনীয়ই হইতে পারে না।

আর যাহা প্রতীতির বিরুদ্ধ, তাহাকে যদি প্রতীতির বিষয় বলিয়া স্বীকার করা তোমার অভিমত হয়, তাহা হইলে সমস্ত বস্তুই সকল প্রকার প্রতীতির বিষয় হউক। অর্থাৎ যে ঘট আছে, তাহার সম্বন্ধে "নাই" জ্ঞান হউক, এবং যে খরগোসের সিং নাই, তাহার সম্বন্ধে তোমার "আছে" জ্ঞান হউক। সুতরাং অনির্ব্বচনীয় অর্থে সদসদ্ভিন্ন কিছু, একথাও তোমার দাঁড়ায় না।

এজন্য এখন তুমি দেখিলে, তোমার অনির্ব্বচনীয় শব্দের যতপ্রকার অর্থ হওয়া সম্ভব, সকল প্রকার অর্থ অবলম্বন করিয়াই ইহা সিদ্ধ হয় না। দেখ, অনির্ব্বচনীয় অর্থে বাচ্যত্ব-রাহিত্য ধরিয়া আমরা প্রথমেই বিচার করিলাম, তাহাতে ইহা অসঙ্গত প্রমাণিত হইল; পরে অনির্ব্বচনীয় মানে সত্তা ও অসত্তা এই উভয়ধর্ম্মরাহিত্য বলিয়া আলোচনা করিলাম, সেখানেও অসঙ্গতি প্রকাশ পাইল এবং শেষকালে অনির্ব্বচনীয় অর্থে সদসদ্ভিন্ন কিছু ধরিয়া বিচার করা গেল, তাহাতেও ইহা অসিদ্ধ হইল; সুতরাং তোমার অনির্ব্বচনীয় বাদই ভুল। দেখ, আসল কথাটা হইতেছে এই যে, জগৎপ্রপঞ্চের প্রতীতিও বাধ হয় বলিয়া যদি তাহাকে তুমি একবার সৎ ও একবার অসৎ বলিতে বাধ্য হও, তাহা হইলে জগৎপ্রপঞ্চের যাহা স্বরূপ, তাহা হয় সৎ ও অসতের সম্মিলিত ভাব, অথবা তাহা সদসতের মধ্যে কোন একটী প্রকার হইতে বাধ্য, তাহাকে তুমি সদসদ্ভিন্ন বলিতে সাহস কর কি করিয়া? সদসদ্ভিন্ন যে কেহ কোনরূপেই ধারণার মধ্যে আনিতে পারে না।

তাহার পর, আইস, আর একটা কথা বিচার করি। দেখ, তুমি যে অনির্ব্বচনীয় পদার্থ সিদ্ধ করিতে চাহ, আচ্ছা, অনির্ব্বচনীয় নিজে কি, তাহা কি একবার ভাবিয়াছ? বল দেখি, এই অনির্ব্বচনীয় স্বয়ং "সৎ" বা "অসৎ"? যদি বল ইহা সৎ, তাহা হইলে বল দেখি, তাহা তোমার মতে এই অসত্য জগৎপ্রপঞ্চকে বুঝায় কি করিয়া? তোমার মতেই যদি বলি জগৎপ্রপঞ্চ অসত্য, তাহা হইলে যাহা নিজে "সৎ" পদার্থ, তাহার দ্বারা উক্ত অসত্য পদার্থ কি করিয়া বুঝাইবে? ভাব দেখি, সতের দ্বারা অসত্য বুঝান কি অসঙ্গত নহে? আর যদি বল "অনির্ব্বচনীয় ভাবটা" নিজেই অসৎ পদার্থ, তাহা হইলে তাহাকে লইয়া আমাদের কি উপকার হইতে পারে? বস্তুতঃ

অসৎ পদার্থ লইয়া মারামারি করা কি নিরর্থক নহে? যাহা নাই, তাহা লইয়া বিবাদের ফল কি?

আবার দেখ, শুক্তিতে রজতজ্ঞানস্থলে তুমি যে অনির্ব্বচনীয় রজতের উৎপত্তি স্বীকার কর, আচ্ছা বল দেখি, সে রজত উৎপত্তির প্রতিকারণ কি? ইহার কারণ প্রতীতি বা বোধ—একথা তুমি বলিতে পার না। কারণ উৎপত্তির পূর্ব্বে তাহার ত কোন সম্ভাবনাই দেখা যায় না। কোন কিছু থাকিলে ত তাহার বোধ জন্মিবার কথা; যাহার বোধ জন্মিবে, তাহা যদি পূর্ব্বে না থাকে, তাহা হইলে তাহার বোধ কি করিয়া হইতে পারে? সুতরাং দেখ, তোমার উক্ত অনির্ব্বচনীয় রজত উৎপত্তির কোন কারণই নাই।

যদি বল, উহার কারণ ইন্দ্রিয়সমূহ; তাহাও বলিতে পার না; কারণ, ইন্দ্রিয়গণ কখন নিজে নিজে কোন জ্ঞানের কারণ হইতে পারে না। তাহারা বিষয়ের সহিত সংযুক্ত হইয়াই ত জ্ঞান জন্মাইয়া থাকে।

যদি বল, না—ইন্দ্রিয় উহার কারণ নহে, পরন্তু ইন্দ্রিয়াদিগত দোষই উক্ত অনির্ব্বচনীয় রজত উৎপত্তির প্রতিকারণ, তাহা হইলে বলিব, একথাও তোমার যুক্তিসহ নহে। কারণ সেই দোষ পুরুষকে আশ্রয় করে বলিয়া তাহার দ্বারা শুক্তিতে অনির্ব্বচনীয় রজত উৎপন্ন হইতে পাবে না। দোষের আশ্রয় হইল পুরুষ, আর তোমার রজত উৎপন্ন হইল শুক্তিতে, একথা কি অসঙ্গত নহে?

আর যদি বল, দোষ উহার কারণ নহে, পরন্তু দোষযুক্ত ইন্দ্রিয়ই উহার কারণ, তাহা হইলে বলিব, উক্ত দুষ্ট ইন্দ্রিয়ের স্বকার্য্যভূত যে জ্ঞান, সেই জ্ঞানেই কোনরূপ বিশেষত্ব ঘটিবার কথা, জ্ঞানের বিষয় যে শুক্তি, তাহাতে অনির্ব্বচনীয় রজত কেন উৎপন্ন হইবে?

ইহার পর যদি বল যে, না, উক্ত দোষ ইন্দ্রিয়গত নহে, পরন্তু বিষয়গত, অর্থাৎ শুক্তিতেই এমন একটা দোষ আছে, যেজন্য তাহা অনির্ব্বচনীয় রজত উৎপাদন করিয়া থাকে। তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি, উক্ত দোষ কি কেবল বিষয়েই থাকে, অথবা বিষয় এবং পুরুষ এই উভয়েই থাকে? যদি বল, কেবল বিষয়েই থাকে, তাহা হইলে ভ্রম অসম্ভব; কারণ, তোমার মতে পুরুষই ব্রহ্ম এবং তাহা নির্দ্দোষ। আর যদি বল, না, উক্ত দোষ বিষয় ও পুরুষ উভয়েই থাকে, তাহা হইলে বলিব, উভয়নিষ্ঠ দোষ কেবল বিষয়ে রজত উৎপাদনরূপ কোন কার্য্য উৎপাদন করিতে পারে না। সুতরাং

দেখ, উক্ত দোষ বিষয়গত দোষ নহে। এক কথায়, তোমার কোন কথাই স্থান পাইতেছে না। এইজন্য বলি, তোমার অনির্ব্বচনীয় খ্যাতিবাদটী দুষ্ট-বাদ, ইহা সর্ব্বথা পরিত্যজ্য।

এইরূপে দেখা যাইতেছে, মায়াবাদীর অনির্ব্বচনীয়-খ্যাতি-বাদের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধের আত্মখ্যাতিবাদ, শূন্যবাদী বৌদ্ধের অসৎখ্যাতি-বাদ, প্রভাকর-মীমাংসা-মতাবলম্বীর অখ্যাতিবাদ এবং নৈয়ায়িকের অন্যথা-খ্যাতিবাদ—সকল মতই অগ্রাহ্য ও অনাদরণীয়; সুতরাং এখন অবশিষ্ট যে সৎখ্যাতিবাদ, তাহাই রামানুজের অভিপ্রেত। আগামী বারে আমরা রামানুজাচার্য্য-স্বীকৃত সৎখ্যাতিবাদের কথা বলিব।

ক্রমশঃ।

সমালোচনা।

নির্ব্বাসন-কাহিনী।—শ্রীমনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা প্রণীত, মূল্য ॥•; উত্তম কাগজ, উত্তম ছাপা। নির্ব্বাসনকালে গ্রন্থকর্ত্তা যে ভাবে দৈনন্দিন জীবন যাপন করিয়াছিলেন, পুস্তকখানিতে তদ্বিবরণ অতি বিশদ এবং হৃদয়-গ্রাহী ভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সুখদুঃখময় মানবজীবনে সর্ব্বাবস্থায় অবি-চলিত থাকিতে ঈশ্বর-বিশ্বাস মানবকে যে কতদূর সহায়তা করে, তাহাও পুস্তকখানির সর্ব্বত্র বিশেষ পরিস্ফুট। আশা করি, পুস্তকখানি সর্ব্বত্র আদৃত হইবে।

শাক্য সিংহ।—পণ্ডিত শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ বিরচিত, মূল্য।৵• আনা মাত্র। ভারতগৌরব ভগবান্ বুদ্ধদেবের অমূল্য জীবন সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়া পণ্ডিতজি সাধারণ পাঠকের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। বুদ্ধদেবের জীবন ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে আজকাল নানা আলোচনা চলিলেও, তদ্বিষয়ে যে সকল পুস্তক রচিত হইতেছে, সে সকলে একটি বিশেষ অভাব পরিলক্ষিত হয়। তাঁহার জীবন ও কর্ম্মের সহিত বেদনিহিত হিন্দুর সনাতন ধর্ম্মের যেন কোন সম্বন্ধই নাই, এই ভাবই ঐ সকল পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার সমাধিতে নির্ব্বাণপদবী লাভ এবং বেদোক্ত নির্বিকল্প সমাধিতে ব্রহ্মাদ্বৈতানু-

ভব যে একই পদার্থ, একথা স্বীকৃত দেখা যায় না। পাশ্চাত্য গবেষণা যাহাই বলুক না কেন, ঐ কথা যে বাস্তবিক সত্য, ইহা নিঃসংশয়। পণ্ডিতজি সনাতন বৈদিক ধর্ম্মের সহিত বুদ্ধ-জীবন ও ধর্ম্মের ঐ সম্বন্ধ পুস্তকখানিতে পরিস্ফুট করিয়া সাধারণ পাঠকের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। অল্পকায় হইলেও পুস্তকখানি সারবান্ এবং বিদ্যালয়ে পাঠ্য পুস্তকের ভিতর পরিগণিত হইবার উপযুক্ত।

শিক্ষারত্নম্।—মেট্রোপলিটান্ ইন্ষ্টিটিউসন্ বিদ্যালয়ের সংস্কৃতাধ্যাপক পণ্ডিত দীননাথ বিদ্যারত্ন প্রণীত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন নিয়মানুযায়ী পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত, তৃতীয় সংস্করণ, মূল্য ১৲ টাকা মাত্র। পুস্তকখানির রচনা-কৌশল দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম। ছাত্রগণ ইহা দ্বারা অল্পায়াসেই সংস্কৃত ব্যাকরণে আবশ্যকীয় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া সংস্কৃতে রচনা ও অনুবাদাদি করিতে পারিবে, সন্দেহ নাই। পুস্তকখানিতে অনেকগুলি এমন জ্ঞাতব্য বিষয় লিপিবদ্ধ আছে, যাহা ঐ ধরণের অপরাপর পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায় না। আশা করি, পুস্তকখানি বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের ও সংস্কৃতশিক্ষার্থীদিগের নিকটে বিশেষভাবে আদৃত হইবে।

কৃষ্ণ পান্তি।—শ্রীপ্রিয়নাথ সিংহ প্রণীত, মূল্য ১৲ টাকা। রাণাঘাটের পাল বাবুদের বংশের পূর্ব্বপুরুষ যে একজন অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন, ইহা দেশপ্রসিদ্ধ। অদ্ভুত সততা, উপস্থিত বুদ্ধি, অধ্যবসায় ও একাগ্রতা-মাত্র-সম্বলে তিনি নিরক্ষর হইয়াও কিরূপে অতি নিঃস্ব অবস্থা হইতে ক্রমে প্রভূত ধন ও মানের অধিকারী ও ব্যবহারিক জীবনে অপরের আদর্শস্থানীয় হইয়া উঠিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে অনেক কথা রাণাঘাটের প্রাচীন লোকদিগের নিকট এখনও শুনিতে পাওয়া যায়। গ্রন্থকার ঐ সকল কথা সংগ্রহ ও অনুমান সহায়ে যথাসম্ভব গ্রথিত করিয়া কৃষ্ণ পান্তির চরিত্র ও জীবনের কথঞ্চিৎ আভাষ দিবার প্রয়াস পাইয়াছেন ও অনেকাংশে কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। গ্রন্থখানির সরল রচনা পাঠকের হৃদয়গ্রাহী হইবে বলিয়া বোধ হয়। তবে পুস্তকের ভূমিকাটি একবারেই উপযোগী হয় নাই; এবং ১৭৩ পৃষ্ঠায় ও পরিশিষ্টে কৃষ্ণ পান্তির মনোভাব-সম্বন্ধীয় গ্রন্থকর্ত্তার অনুমানগুলি আদৌ যুক্তিযুক্ত হয় নাই। ঐগুলি না দিলেই ভাল হইত। আশা করি, পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণে গ্রন্থকার ঐগুলির যথাসম্ভব পরিহার করিয়া পুস্তকখানিকে অধিকতর হৃদয়গ্রাহী করিবেন।

প্রেম।—শ্রীহেমেন্দ্রনাথ সিংহ প্রণীত। মূল্য দেড় টাকা। প্রাপ্তিস্থান—৩৬ নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীট, কম্বুলিয়াটোলা, কলিকাতা।

আমি।—মূল্য এক টাকা। জীবন।—মূল্য আট আনা। হৃদয় ও মনের ভাষা।—মূল্য চারি আনা।

উক্ত গ্রন্থকার-প্রণীত আর তিনখানি পুস্তক।

গ্রন্থকার এই কয়েকখানি গ্রন্থে হৃদয়ের ভাষায় নিজ অভিজ্ঞতালব্ধ অধ্যাত্মতত্ত্ব ও বিশুদ্ধ প্রেমের চিত্র অঙ্কিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। আমরা পুস্তক কয়েকখানি পাঠ করিয়া পরম প্রীত ও মুগ্ধ হইয়াছি। 'আমি' গ্রন্থখানিতে প্রেমের বিশুদ্ধভাব যেন আরো পরিস্ফুট হইয়াছে। তবে উহার শেষাংশে ব্রাহ্মণজাতির দোষভাগের তীব্র সমালোচনা স্থান না পাইলেই যেন শোভন হইত। গ্রন্থকার বেদ, উপনিষৎ, পুরাণ, কোরাণ, বাইবেল, এবং প্রাচীন ও আধুনিক অনেক সাধক ও কবিগণের গ্রন্থ হইতে অনেক প্রাণস্পর্শী ভাবরাজি উদ্ধৃত করিয়া পাঠককে উপহার দিয়াছেন। গ্রন্থে উদার ভাবের পরিচয় যথেষ্ট, তবে ক্বচিৎ বোধ হয় পূর্ব্ব সংস্কার বশতঃ 'পৌত্তলিকতা' আদি দুই একটা নিষ্ঠাবান্ হিন্দুর শ্রুতিকটু শব্দ প্রয়োগে ব্রাহ্মগন্ধ ফুটিয়া উঠিয়াছে। মোটের উপর গ্রন্থগুলি খুব ভাল হইয়াছে, এবং আমরা আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া পরমানন্দ উপভোগ করিয়াছি।

বারাণসী-রহস্য।—শ্রীসারদাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য প্রণীত। কেবল দুই পয়সা মাশুল লইয়া বিনামূল্যে বিতরিত। শ্রীবটুকদেব মুখোপাধ্যায় এম এর (অসিধাম, বারাণসী) নিকট প্রাপ্তব্য।

এখানি বারাণসীধামের কোনরূপ বর্ণনা নহে। গ্রন্থকার প্রায় ১৫।১৬ বর্ষ পূর্ব্বে বারাণসীধামে 'সাধু-শুশ্রূষালয' স্থাপন করিবার চেষ্টায অকৃতকার্য্য হইয়া এক্ষণে কাশী রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠায় নিজ উদ্দেশ্য কিয়ৎ পরিমাণে অন্য ভাবে কার্য্যে পরিণত হইয়াছে দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছেন—এই ভাবটী রূপকচ্ছলে হরপার্ব্বতীর কথোপকথন, সাধুগণের শুশ্রূষায় লোকের ঔদাসীন্যে মহাদেবের বারাণসী ত্যাগ, কৈলাসধামে দেবগণের মহতী সভার অধিবেশন ও সভ্যগণ অন্য কোন উপায়ে সাধু-শুশ্রূষালয়ের উদ্দেশ্য সাধন অসম্ভব দেখিয়া রামকৃষ্ণ-শিষ্যগণকে তৎকার্য্যে প্রেরণ প্রভৃতি রূপে বিবৃত হইয়াছে। টিপ্পনী অনাবশ্যক।

শ্রীযোগানন্দ।

জিতেন্দ্রিয়—যোগনিষ্ঠ—সংযমি-প্রধান,
আশৈশব ঊর্দ্ধরেতা—উদার-হৃদয় ;
সাবর্ণ চৌধুরীকুল পবিত্র করিতে—
কে তুমি প্রভাতী তারা উদিলে গগনে ?
নয়নে বিরাগ—ত্যজি কাকবিষ্ঠাসম,
কামিনী-কাঞ্চনাসক্তি—স্নাতক সন্ন্যাসী।
শুদ্ধচেতা—ঊর্দ্ধদৃষ্টি ছায়াপথ পানে,
ক্রীড়াকালে, ছাড়ি বাল্য-সহচরগণে—
যাইতে বাসনা শূন্যে—শুনিনু শ্রীমুখে।
মরতে আইলে যোগী—লীলা-সহচর
অবতার-সঙ্গী তুমি—নিত্য সিদ্ধকোটি।
শ্রীগুরু-বিরহ-দুঃখে বিদগ্ধ-হৃদয়,
অকালে প্রপঞ্চ দেহ ফেলি গঙ্গাতীরে
স্ব স্বরূপে মিশে গেলে—স্বপনের প্রায়।
স্মরি তব পূত মূর্ত্তি— প্রেম পুণ্য গাথা
গলিতাশ্রু ইন্দু পদে নমে বার বার॥

শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এ।

হাজারীবাগ।

[শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এ।]

একখানি পত্র।

ভাই শু—। কার্য্যব্যপদেশে তোমাদের নিকট বিদায় লইয়া হাজারীবাগে আসিয়াছি। এখানে আসিয়াও কিন্তু বেলুড়মঠের সেই জীবন্ত ছবি আর কলনাদিনী গঙ্গার নৃত্য-বিলসন প্রত্যহ দেখিতে পাইতেছি ; আর উদ্বোধনের চিন্তা মাথায় রহিয়াছেন। কি লিখি—কি লিখি করিয়া দিন কাটিতেছিল।

আজ মা সরস্বতী স্কন্ধে চাপিয়াছেন। তাই তোমাকে এ স্থানের কথঞ্চিৎ চিত্র আঁকিয়া পাঠাইতেছি। তুমি পড়িবার পরে উদ্বোধনে দিও।

আজকাল এখানে ভয়ানক বৃষ্টি হইতেছে। আকাশ যেন ভেঙ্গে পড়িয়াছে। জলে জলময়। যে বাগানবাটীতে রহিয়াছি, তাহাতে কেবল ভেকের মক্‌মকি—আর অবিশ্রান্ত জলধারা-সম্পাতের ঝম্ ঝম্ শব্দ। আজ ৪।৫ দিন যাবৎ প্রাতর্ভ্রমণ বন্ধ হইয়াছে। এখানে প্রথম আসিয়া যে অগ্নিবৃষ্টির দুঃসহ জ্বালা সহ্য করা গিয়াছিল, এই কয়দিনের বারিসম্পাতে তাহা ভুলিয়া যাওয়া গিয়াছে। প্রচণ্ড-মার্ত্তণ্ড-করদিগ্ধ বৃক্ষলতা-গুল্ম অবিশ্রান্ত বৃষ্টিসম্পাতে স্নাত ও বায়ুভরে ঈষদান্দোলিত হইয়া যেন বিশ্রান্তিসুখ অনুভব করিতেছে। অথবা স্বভাব-বিপর্য্যয়ের রীতিই এই। গুরুদেব বলিতেন, দ্বন্দ্বাভিঘাতই জীবনীচিহ্ন। শীত গ্রীষ্ম, আলোক আঁধার, সুখ দুঃখ, ভাল মন্দ, জন্ম মৃত্যু লইয়াই প্রপঞ্চ জগতের বিচিত্র অভিব্যক্তি—অনন্ত লম্ফঝম্পাস্ফালন—অযুত পথে প্রকৃতির প্রতিনিয়ত পরিণমন। বাহিরে এই বিচিত্রতা-তরঙ্গ!—শাস্ত্রে বলেন, অপরিণামী সর্ব্বগ আত্মা উহার মূলে, অচল অটল! আশীর্ব্বাদ করিও, যেন সেই আত্মসংস্থ হইয়া এই দুরতিক্রমণীয় দ্বন্দ্বাধ্যাসের পর পারে এজন্মেই চলিয়া যাইতে পারি।

এখানে আসিয়াই দিগ্‌ভুল হইয়াছে। আজ পর্য্যন্তও তাহা দূর হয় নাই। সুতরাং উত্তর-পশ্চিম-জ্ঞান লুপ্তপ্রায়। তবে সূর্য্যদেব সহায়—ইনি দিগ্‌ভ্রান্তি নিরাকরণকল্পে প্রত্যহ উদিত হইয়া পূর্ব্ব-পশ্চিম-জ্ঞান প্রবুদ্ধ করেন বটে, কিন্তু শাস্ত্র বলেন, ভ্রম অনাদি কালে বর্ত্তমান—তাই বোধ হয়, এই ভ্রমও আমাকে ছাড়িয়াও ছাড়ে না। এই দিগ্‌ভ্রম হইতে আমি মায়ার তত্ত্ব খানিকটা বুঝিতে পারিয়াছি। ঠিক জানি, সূর্য্য পূর্ব্বাকাশে উদিত হন—ভ্রমান্ধ সংস্কার কিন্তু সূর্য্যকে দক্ষিণোদিত মনে করিয়া দিতেছে। তদ্রূপ,শাস্ত্র ও গুরু-মুখে শুনিয়া ঠিক জানি যে,আমি শুদ্ধ বুদ্ধ আত্মা, কিন্তু দেহাত্মজ্ঞানে নিত্য বিপরীত ভাবনার অভ্যুদয়!—এইরূপে দেহের ক্ষয়োদয়দৃষ্টিতে—জগদিন্দ্রজালে প্রতারিত জীব আপনাকে "দেহী" মনে করিয়া জনন-মরণ-সঙ্কুল জগতে ধাবিত হইতেছে! এখন বুঝ ভাই, এই দিগ্‌ভ্রান্তিতে মায়ার স্বরূপ কতকটা বুঝা যায় কি না?

কলিকাতা হইতে Grand cord লাইন দিয়া ৮ ঘণ্টায় হাজারীবাগ রোড ষ্টেসনে (বর্ত্তমান নাম সুরিয়া) পৌঁছান যায়। এ লাইনে আমার

পূর্ব্বে কখনো আসা হয় নাই। এই cord lineএর কি শোভা—কি অমিত অধ্যবসায় ও অজস্র অর্থব্যয়ের পরিণাম-ফল! একি আর এদেশী লোকের কর্ম্ম ভাই? এই ডিনামাইটে পাহাড় পর্ব্বত উড়াইয়া দেওয়া—এই শ্বাপদ-সঙ্কুল গভীর অরণ্যানী ভেদ—এই বেগবতী নদীর উপরে লৌহ-সেতু স্থাপন—এই পর্ব্বত-তরঙ্গায়িত প্রদেশের সমতলত্ব সম্পাদন—একি আর আমাদের কর্ম্ম? এ ইংরেজের প্রবল অধ্যবসায় ভিন্ন এদেশে সম্পন্ন হইতে এ পর্য্যন্ত দেখা যায় নাই। ভাবিয়া দেখ, আমাদের বন্ধু মিঃ দে, যশোহর ঝিনেদহ লাইন খুলিতে কত বেগ পাইতেছেন। বোধ হয় এখনো সকল share বিক্রয় হয় নাই—তাও আবার দশ টাকা করিয়া সেযার। আর ইংরেজ ধনিগণ এদেশে টাকা ফেলিয়া সোনা কুড়াইয়া লইতেছে। আমাদের দেশী কোম্পানীর কাগজওয়ালা capitalistদের সেই ব্যঙ্গব্যঞ্জক উদাস উপহাস, আর তাকিয়া ঠেসান দিয়া আলবালে ধূমপান অথবা মটরকারে করিয়া যাইয়া কুস্থানে আমোদপ্রমোদে অর্থ ব্যয়—এই সব লোকের সাহায্য লইয়া যদি ভারতের কর্ম্মক্ষেত্র প্রসার করিতে হয়, তো তাহা কবির কল্পনা। কর্ম্মতৎপর বণিক্‌সম্প্রদায় না উঠিলে কেবল মাত্র হৈ চৈ করিয়া কিছুই হইবে না। চৌর্য্য-দস্যুবৃত্তি-ভাবাপন্ন উৎপথগামী কতিপয় যুবকের দেশহিতৈষণা-ব্রতোদ্‌যাপনের ফল তো চক্ষের সম্মুখেই দেখা গেল! ইহাদের শারীরিক ও মানসিক শক্তি দেশের ধন ধান্য উৎপাদনে নিযুক্ত হইলে দেশের যথার্থ হিতসাধন হইত। যথার্থ ধর্ম্মোপদেশ পাইলে ইহারা ঐরূপ নৃশংস পাপাচরণ হইতে বিরত হইয়া যথার্থ দেশের কাজেও লাগিতে পারিত; এবং ইংরেজের অধ্যবসায়, একনিষ্ঠা এবং সর্ব্বোপরি সমবেত চেষ্টার সাফল্য দর্শন করিয়া তাহাদের কাছে ঐহিক জীবনসংগ্রামের রীতিনীতিগুলিও শিখিতে পারিত। কোথাও কিছু নাই—বলে, উপলখণ্ড দিয়া হিমালয় চূর্ণ করিব। তা কি কখনো হয়—না হইয়াছে?

শক্তির সমীকরণে এই Grand cord লাইনটী তৈয়ারী হইয়াছে। ঐরূপ কত শত লৌহবর্ত্ম যে ভারতের বক্ষে নির্ম্মিত হইয়াছে—কত উদ্যম-অধ্যবসায়ের কেন্দ্রীকরণে যে গিরি-নদী ভেদ হইয়াছে—কে বলিতে পারে? ইংরেজের কাণ্ডকারখানা দেখিয়া অবাক্ হইয়া ভাবি, আমরাও ত মানুষ, তবে ঐরূপ মনুষ্যত্বের পরিচয় দিতে পারি না কেন?

সুরিয়া ষ্টেসন্ হইতে ৪১ মাইল পশ্চিমে হাজারীবাগ অবস্থিত। ষ্টেসনে মানুষের টানা গাড়ী পাওয়া যায়। এই গাড়ীর নাম পুষ্ পুষ্। এদেশে কুলীর অভাব নাই; কুলীর দেশ বলিলেই হয়। দু আনাতে ৬ মাইল গাড়ী টানিয়া লইয়া যাইবে! তাহার উপর একটী পয়সা বক্‌সিস্ করিলে তো কুর্‌নিস্ করিতে করিতে তোমায় রাজা বা বাদ্‌সা ঠাওরাইবে। এই ৪১ মাইল পথ যাইতে ৭।৮ বার কুলি বদ্‌লাইতে হয়। এক একটা আড্ডার কাছে আসিয়া কুলিরা "হুয়া হুয়া" শব্দ করিয়া উঠে। প্রথম আড্ডার কাছে আসিয়া ঐ শব্দে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। মনে করিলাম, বুঝি ডাকাত পড়িয়াছে; তাহার পর জানিলাম, কুলি বদল হইবে!

দিনের উত্তাপক্লান্তিতে পুষ্ পুষ্ গাড়ীতে গা ঢালিয়া ঘুমাইতে ঘুমাইতে আসিয়াছিলাম। সুতরাং গভীর অরণ্যানী বা পর্ব্বতাদির শোভা-সৌন্দর্য্য কিছুই দেখিতে পাই নাই। প্রাতঃকালে জাগিয়া যখন পথ চলিতে লাগিলাম, তখন ৪ ঘণ্টায় অনেকটা দেখিয়া লইয়াছিলাম। পরিপাটী তরঙ্গায়িত প্রশস্ত রাস্তা—দুই পার্শ্বে বিহঙ্গ-কূজিত প্রকাণ্ড বট অশ্বত্থ দেবদারু বৃক্ষাদির স্নিগ্ধ ছায়া—আর দূর চক্রবালে পর্ব্বতের গুরুগম্ভীর অবস্থান দর্শন করিয়া মনে একটা বিশেষ শান্তির ভাব আসিল, কলিকাতার কোলাহল এককালে ভুলিয়া যাইলাম। যেন কোন শান্তিরাজ্যে পঁহুছিতে চলিযাছি, এইরূপ মনে হইতে লাগিল। বেলা ৯ টার সময় হাজারীবাগে পঁহুছান গেল। সহরের প্রবেশ-পথেই এক প্রকাণ্ড অট্টালিকা—পরে জানিতে পারিলাম, ইহা মিশনারীদিগের কীর্ত্তিস্তম্ভ "হাজারীবাগ কলেজ।"

হাজারীবাগ যে জল-হাওয়ার জন্য বিখ্যাত, তাহা নিশ্চয়ই তোমার জানা আছে। বাস্তবিক এমন স্বাস্থ্যকর স্থান বাঙ্গালায় আর দুইটী নাই বলিলেও হয়। এস্থানটী সমুদ্র সমতল হইতে দু হাজার ফিট উপরে। পরিষ্কার বায়ু—পরিষ্কার জল—জলে লৌহের ভাগ অধিক। মৃত্তিকা রক্তাভ—নিকটবর্ত্তী পাহাড়ের পাথরগুলিতে লৌহের অংশ স্পষ্ট দৃষ্ট হয়। এ অঞ্চলে অভ্রেরও বহু খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে; ইংরেজ বণিকেরা সেই অভ্রব্যবসায়ে লক্ষপতি—ক্রোরপতি—হইয়া যাইতেছে। এদেশী কোন কোন উদ্যমশীল লোক এখন ঐ ব্যবসায়ে কিছু কিছু লাভবান হইতেছে; কিন্তু পথপ্রদর্শক ইংরেজ!

হাজারীবাগ স্থানটীর প্রায় চতুর্দ্দিকেই পাহাড়। উত্তরে, "কেনাড়ী"

ছিল। দক্ষিণে, "বামন বেড়" পাহাড়—সহর হইতে প্রায় ৫ মাইল দূরে। পূর্ব্বে, "সীতাগড়া" হিল্—যাহার পাদমূলে বিখ্যাত "পিঞ্জরাপুল" স্থাপিত। এই "সীতাগড়" পাহাড়টা সম্প্রতি কোন খ্যাতনামা ইংরেজ পদ্মার রাজার নিকট হইতে কিনিয়া লইয়াছেন। পশ্চিম চক্রবালে, প্রায় ৩২ মাইল দূরে "সোল্‌তানা" ও "করণপুরা" পর্ব্বতশ্রেণী মেঘের ন্যায় শোভা পাইতেছে। সহরের পূর্ব্বদিকটায় ইংরেজের বসবাস ও কাছারি প্রভৃতি পরি পাটী "বাঙ্গ্‌লা"-গুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত শ্বেতপ্রস্তরখণ্ডগুলির ন্যায় দৃষ্ট হয়। পশ্চিমদিকটা বাঙ্গালীরা অধিকার করিয়া বসিয়াছে। ঐ স্থানের নাম বদম-বাজার (Boddom-Bazar)। এই পশ্চিম দিকটায় গবর্ণমেণ্টের হাঁস্‌পাতাল—দেশী পটারির বা পেয়ালা পিরিক্ তৈয়ার করিবার কারখানা—মধ্যে মধ্যে শিবমন্দির—বহু মস্‌জিদও রহিয়াছে। মধ্যভাগে সহর ১ মাইল ব্যাপী পূর্ব্ব পশ্চিমে বিস্তৃত। খোলার চালার ঘর—মেটে বা পাকা দেয়ালের উপরে। বায়ুকোণে গবর্ণমেণ্টের প্রকাণ্ড জেলখানা, আর চৌর-দুষ্টাদির চরিত্র সংশোধনের জন্য Reformatory স্কুল, দূর হইতে প্রকাণ্ড দুর্গের মত শোভা পাইতেছে। "কেনাড়ী" হিল্ হইতে জেল ও Reformatoryর দৃশ্য অতীব মনোহর। বড় বড় মাঠ দৃষ্টিচক্রবালে যেন মিশিয়া গিয়াছে। গাছ লতা পাতায় প্রকৃতি এই স্থানটী যেন পরিপাটী করিয়া সাজাইয়া দিয়াছেন। মাঠ ঘাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—বেড়াইতে ক্লান্তি বোধ হয় না।

"হাজারীবাগ" নামটার বিশ্লেষণে বহু চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু কোথাও সন্তোষজনক উত্তর পাই নাই। যাহা জানিয়াছি, তাহাই তোমায় লিখিতেছি। মারহাট্টা পল্টন মুসলমানদিগের অধিকার লুণ্ঠন করিতে এই রাস্তায় যাতায়াত করিত বলিয়া প্রবাদ আছে। পূর্ব্বে কোন সময়ে এখানে 'হাজারী' নামে একজন সমৃদ্ধিসম্পন্ন মুসলমান বাস করিতেন। তাঁহার নামানুসারে এই স্থানের নাম "হাজারী চট্টি" বলিয়া কথিত হইত। মারাহাট্টা পল্টন এই হাজারী চটিতে বিশ্রাম করিয়া বাঙ্গালার দিকে অগ্রসর হইত। তাহাদের গতিরোধকল্পে পরে এখানে এক ইংরেজ সেনানিবাস স্থাপিত হয়। এখন যাহাকে ইংরেজদিগের পল্লী (Quarters) বলা হয়, সেখানেই পূর্ব্বে সেনানিবাস (Military cantonment) ছিল। দেখিতে পাওয়া যায়, ঐ পল্লীর ঘরগুলি সবই ঐ উদ্দেশ্য সাধনের মত (Military fashionএ) তৈয়িরি করা। মিরাটেও ঐরূপ ঘর দ্বার দেখিয়াছি। হাজারীবাগের অর্থানুসন্ধান

করিতে যাইয়া কেহ কেহ যে (Garden of thousand trees) সহস্র-বৃক্ষ-সমন্বিত উদ্যান-বিশেষের তথায় অবস্থানের কথা বলিয়া থাকেন, তাহা সম্পূর্ণ কল্পনামূলক। মূলে "হাজারী" নামধেয় কোন মুসলমান্ সেনানায়কের নামানুসারেই যে এই স্থানের নাম হাজারীবাগ হইয়াছে, এইটীই সত্য বলিয়া বোধ হয়।

এই প্রদেশে "রামগড়" নামক স্থানে এক প্রবলপ্রতাপ নরপতি বা ভূম্যধিকারী বাস করিতেন। এই প্রদেশ তাঁহারই অধিকারভুক্ত ছিল। প্রকাণ্ড কেল্লার ভগ্ন স্তূপ এখনো রামগড়ের প্রাচীন স্মৃতি জাগ্রত করে। শুনা যায়,এই রাজা মারাহাট্টাদিগের গতিরোধ করিয়াছিলেন। সেজন্য উহারা তাঁহার পুরী ও কেল্লা অধিকার করিয়া লয়। পলায়িত রাজা "ইচাক্" নামক পর্ব্বতপল্লীতে আসিয়া পুনরায় নূতন রাজধানী স্থাপন করেন। সিপাই বিদ্রোহের পরে তাঁহার ব শধরগণ "পদ্মা" নামক স্থানে যাইয়া বসবাস করিতে থাকেন। রামগড়-রাজের বংশাবলী তদবধি এই "পদ্মা"তেই অবস্থান করিতেছেন। এখন পদ্মার রাজা এই প্রদেশের প্রধান সামন্ত ও ভূম্যধিকারী মাত্র। হাজারীবাগ প্রভৃতি অঞ্চল তাঁহারই জমিদারীর অন্তর্গত।

জনশ্রুতি এইরূপ যে, সিপাই বিদ্রোহের সময় রামগড়ের রাজার কোন কোন লোকে সিপাইদিগকে সাহায্য করেন। সুতরাং তিনি ইংরেজের রোষ-নয়নে পতিত হন এবং রামগড়ের জমিদারী ইংরেজের সাহায্যকারী সামন্তগণের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়। তাঁহারাই এক্ষণে এদেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদার। তবে পদ্মার রাজা এখনও এখানকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জমিদার—পর্ব্বত-প্রান্তরের প্রধান অধীশ্বর; মান-যশও যথেষ্ট।

সিপাই বিদ্রোহের কালে এই হাজারীবাগ অঞ্চলে যে ছোট খাট একটি যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহারও কিছু কিছু প্রমাণ এখানে প্রাপ্ত হওয়া যায়। শুনা যায়, সিপাহীরা এখানকার তোষাখানা লুণ্ঠন করে—যুদ্ধে অল্প বিস্তর ইংরেজ সৈন্য সামন্তও হত হয়। এখানকার মুন্সেফী আদালতের প্রাঙ্গণপার্শ্বে এখনও একজন ইংরেজ সেনানীর গোরস্থান দৃষ্ট হয়। কিন্তু তাহাতে ঐ মৃত ব্যক্তির পরিচায়ক কোন স্মারকলিপি (Inscription) ক্ষোদিত নাই। তবে জনশ্রুতি এই যে, এই গোরস্থানটী সিপাই যুদ্ধে নিহত কোন সেনানীর সমাধি-স্থান।

পূর্ব্বে যে অট্টালিকার বিষয় উল্লেখ করিয়াছি—কতিপয় বন্ধু সমভি-

ব্যাহারে তাহা একদিন দেখিতে গিয়াছিলাম। এই পার্ব্বত্য প্রদেশে এমন সুন্দর ও প্রকাণ্ড প্রাসাদ আর দুইটা দেখা যায় না। কত উদ্যম উৎসাহ ও অর্থব্যয়ে যে এই কলেজবাটী নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহা অনুমান করা যায় না। ইহার মূলে কিন্তু ক্রিশ্চান ধর্ম্মপ্রচারকদিগের অধ্যবসায় (Missionary zeal) বিদ্যমান। কলেজ বাটীতে (Boarding) ছাত্রাবাস-ঘরগুলি দেখিলাম অতি চমৎকার। এক একটী ক'রে ছাত্র এক একটি ঘরে বাস করিতে পায়। (College authority) কলেজের অধ্যক্ষেরা ছেলেদের খাইবার থাকিবার চমৎকার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন। তবে messing (রন্ধন ও ভাঁড়ারের) বন্দোবস্তটা এখনো ছেলেদের হাতে রহিয়াছে—বাড়ীটা সম্পূর্ণ তৈয়ারি হইলে বোধ হয় কলেজের অধ্যক্ষ সে ভারও গ্রহণ করিবেন। কলেজের বর্ত্তমান principal বা অধ্যক্ষের নাম Rev. Murray. ইনি মিষ্টভাষী, প্রগাঢ় পণ্ডিত, অবিবাহিত এবং অশেষ গুণের আধার। কিন্তু Christ ভিন্ন জীবের আর অন্য উপায় নাই—এইটী তাঁহার দৃঢ় ধারণা। এই একান্তনিষ্ঠা ও দৃঢ়বিশ্বাস-বলেই ইনি কর্ম্মবীর—সকলের পূজনীয়। তাঁহার বিশ্বাস ও ভক্তি দেখিয়া মনে হয়—ইনি অধ্যক্ষের যথার্থ উপযুক্ত পাত্র বটেন। তাঁহার সঙ্গে দেখা করিয়া বিদায়-গ্রহণকালে তিনি অভ্যাগতকে জিজ্ঞাসা করেন, "তুমি কি খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী ?" (are you a christian ?) আগন্তুক যদি বলেন, "না" (No) তবে তিনি হাস্যপ্রসন্ন বদনে বলেন—"May the spirit of Christ lead you aright"—"ঈশার শক্তি তোমাকে সৎপথে লইয়া যাউন।" এই ছোটনাগপুর প্রদেশ ইনিই শোভা করিয়া বসিয়া আছেন। ইঁহার নিকট দেশীয় রাজন্য-বর্গ ও রাজকীয় কর্ম্মচারিগণ অবনতশীর্ষ। ইঁহার দেব-চরিত্রে সকলেই মুগ্ধ। ইঁহার সহিত এখনো আমার দেখা করিবার অবসর ও সুযোগ হয় নাই।

এখানকার দোকানপাট প্রায় সবই মারোয়ারীদের হাতে। ব্যবসায়-নিপুণ কর্ম্মতৎপর এমন উৎসাহী লোক ভারতবর্ষে আর দেখা যায় না। যেখানে লাভজনক ব্যবসায়, সেইখানেই মারোয়ারী বণিকগণের আগতি। ইহারা কলিকাতা ও রাঁচি হইতে মাল মসলা আনিয়া লোকের অভাব দূর করিতেছে—সঙ্গে সঙ্গে নিজেরাও ধনবান্ হইয়া যাইতেছে। তবে স্বদেশী আন্দোলনের ফলে এখানেও দুইটী স্বদেশী ব্যবসায়ীর দল (trading

Company) দোকান খুলিয়াছে। তাহাদের দোকানেও জিনীসের বেশ কাট্‌তি—বিশেষ বাঙ্গালী অধিবাসিগণ তাহাদেরই পৃষ্ঠপোষক হইয়াছে। খাবার দাবারের কিন্তু এখানে তেমন সুবিধা নাই। তবে জল হাওয়ার গুণে, যাহা খাইবে, তাহাই শরীরের পোষণ করে। চাল, দাল, নুন, তেল, আলু, ঝিঙ্গে, মাংস—এই মাত্র বাজারে পাওযা যায়। খাঁটি দুধ এখনো টাকায় ১০ সের বিক্রয় হয়। বিশুদ্ধ ঘি টাকা টাকা সের এখনো মিলে। দধি উৎকৃষ্ট। মিষ্টান্ন তেমন ভাল পাওয়া যায় না। তবে বাকুড়া জেলার জনৈক কারিকর সম্প্রতি একটী মিষ্টান্ন-ভাণ্ডার খুলিযাছে। ফরমাইস্ দিলে উৎকৃষ্ট সন্দেশাদি তৈয়ারি করিযা দিতে পারে। বাঙ্গালী ভদ্র লোকেরা কাজকর্ম্মে তাহারই দোকান হইতে ঐ সব তৈয়ারি করিযা লয়। আর যে সব খাবারের দোকান আছে—তাহাতে ভাই, বাঙ্গালীর পোষায় না। সেই কলিকাতায় মেড়ুযাবাদি খোট্টাদের তৈয়ারি মিঠাইয়ের নমুনায় "ছাতু"র নানা রকমারী লাডড্ু।

সহরে এ প্রদেশের আদিম অধিবাসীদের প্রাযই দেখা যায় না। দূর পল্লী হইতে যে সব লোক সহরে আসে, তাহাদের দেখিযা মনে হয়, ইহারা একান্ত হীনবল—হীনবুদ্ধি ও নোংরা। এমন চমৎকার জল-হাওয়ার দেশে ইহাদের শরীর যেন চির-রুগ্ন; উহার প্রধান কারণ, দারিদ্র্য। খাইতে পরিতে পায না। যে সব ব্রাহ্মণ দেখিযাছি—আমার বিশ্বাস ইহারা বাঙ্গালা ও নাগপুরের সীমান্তপ্রদেশের "মিশ্র"জাতি। নাগপুরের ব্রাহ্মণেরা পূর্ব্বে কোন সময়ে এদেশের আদিম অধিবাসীদের স্ত্রীগ্রহণ করিযা থাকিবে। তাহাদের সন্তানসন্ততিগণই ব্রাহ্মণ-নামধারী হইয়া পাঁড়ে, ওঝা, মিছির, ভাট প্রভৃতি রূপে হলকর্ষণ ও রাঁধুনী বামুনগিরি করিয়া অবস্থান করিতেছে। ইহাদের না আছে আচার—না আছে অন্তর্বাহ্য শৌচ। তবে মাছ মাংসটা খায না। ওটা মারহাট্টী চাল, পৈত্রপৈতামহসংস্কার দায়াদরূপে প্রাপ্ত। সীমান্তপ্রদেশে বর্ণসঙ্কর জাতির অভ্যুদয় প্রকৃতির দুর্ল্লঙ্ঘ্য নিয়ম। আর দুই বিভিন্ন জাতির মিশ্রণে—উভয় জাতির দোষের মূর্ত্তিমান্ বিগ্রহস্বরূপ সন্তানসন্ততিগণের শারীরিক ও মানসিক দৌর্ব্বল্য অবশ্যম্ভাবী; এদেশী ব্রাহ্মণেরা যে অন্ত্যক্ষেত্রজ, তাহাতে আমার সংশয় নাই। কারণ, দেশের অবান্তর জাতি অন্ত্যজ। চামার, কামার, কুমার, হাড়ী, ডোম, মেথর, মালী, দোসাদ, কাহার, এই সবই

দেশের আদিম অধিবাসী। একটা পুরুষ কি মেয়ের ফর্‌সা রং নাই। মেয়েগুলি যেন প্রত্যেকে মূর্ত্তিমতী শ্মশানকালী। বেটা ছেলেগুলি—সেই নিমতলা ঘাটের যমকিঙ্কর। অবশ্য, ব্রাহ্মণদের ভিতর সুপুরুষ দেখা যায় বটে, কিন্তু ওটা মাবৃহাট্টী বীজের পরিণতি।

এমন 'সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা' দেশের লোকের পেটে অন্ন নাই—পরণে কাপড় নাই! শতকরা ৮০ জন লোক ছাতু খাইয়া দিন কাটায়। বাজারে ছাতুর দোকানের অবধি নাই। সেই শালপাতার ঠোঙ্গায় জল-সিক্ত ছাতু আর নুন-লঙ্কার সংমিশ্রণ—তাহাই কেমন আস্বাদ করিয়া খায়! দেখিলে অবাক্ হইতে হয়। খাঁটি তেলে ভাজা "ছাতুর পিঠে" ইহাদের নিকট অতি উপাদেয় খাবার। এ দেশের রাজা রাজ্‌ড়াও নাকি উহা উৎকৃষ্ট খাবার বলিয়া মনে করে! উহা দেখিলে হয়ত আমাদের অনেকের ঘৃণার উদয় হইবে। তবে কি জান, "যৎ যস্য প্রীতিঃ তৎ তস্য মধুরং"। জগতের সর্ব্বত্রই এই রীতি।

এইবার নিম্নশ্রেণীর লোকদের কাপড়ের এক অদ্ভুত কাহিনী বর্ণন করিতেছি। একখানা কাপড় কাঁথায় পরিণত না হইলে আর ইহারা বস্ত্রান্তর গ্রহণ করে না। কাঁথায় পরিণমনটা কি করিয়া হয়—এখন তাহাই বলিব। মনে কর, দোকান হইতে হয় বিলাতী, না হয় দেশী একখানা কাপড় লইয়া হলুদের রঙ্গে রঞ্জিত করিয়া উহা পরিল। কি স্ত্রী, কি পুরুষ, সকলেই হলুদে ছোপান কাপড় পরিবে, ইহাই রীতি। খাইতে শুইতে—শৌচে অশৌচে ঐ কাপড় কখনও ছাড়িবে না! এইরূপ, যত কালে না উহার অন্তর্দ্দশা উপস্থিত হইবে! কাপড়খানি যত ছিঁড়িয়া যাইতে লাগিল—ততই তাহার উপর পচা নেকড়ার তালি পড়িতে থাকিল! এইরূপ করিতে করিতে কালে কাপড়খানা যখন ৪।৫ ইঞ্চি পুরু কাঁথা হইয়া দাঁড়াইল, তখন আবার একখানি নূতন কাপড় বাজার হইতে আসিল! তাহার পূর্ব্বে প্রাণান্তেও সেই কাঁথা কেহ ছাড়িবে না! আমাদের রাঁধুনী ব্রাহ্মণ যখন অন্ন-ব্যঞ্জনাদি পরিবেশন করে, তখন ঐ কাঁথার বোট্‌কা গন্ধে নাকে কাপড় দিয়া থাকিতে হয়। এম্‌নি ত সকলে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—তবু বাঙ্গালীর ছোঁয়া খেলে ইঁহাদের জাত যায়! ভাই—এ দেশের আর কি উদ্ধার আছে? ইহাদের জন্মই যেন গোলামী করিতে—শক্তিমান্ লোকদের ভার বহন করিতে। ইহাদের ভিতর বিদ্যা ব্রহ্মণ্য শক্তি ভক্তি

কোনও দিন কেহ যদি জাগ্রত করিতে পারেন, তবেই জানিব, একদিন দেশ জাগিয়া উঠিবে।

এ দেশের নীচ জাতের লোকদের প্রবৃত্তিও অতি নীচ। এক পোয়া চাল, কি এক ছটাক তেল নুন চুরী করিয়াই মহানন্দ। টাকা পয়সা চুরি করিতে কিন্তু কখন সাহস করে না। আমি একদিন কোন লোককে বলিয়াছিলাম, "ওরে, সামান্য তেল নুন্ চুরী করিস্ কেন? বাক্স ভেঙ্গে আমাদের টাকা পয়সা নিতে পারিস্ নে?" কথা শুনে লোকটার মুখ শুকিয়ে গেল।

এ দেশে জন মজুর খুব সস্তা। তিন টাকায় চাকর বামুন পাওয়া যায়। ক্রীতদাসের মত সপরিবারে সে তোমার সেবা করিবে। অত্যন্ত অভাব কি না! একবেলা যে ভাত খাইতে পায়, তাহার "গরবে মেদিনী ঠেকে না পায়।"

এখানে ইংরেজদের গোরস্থান একটা দেখ্‌বার জিনীস। ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের গোর স্থানে catholic cemetary) মর্ম্মর প্রস্তরের মেরীর এক অদ্ভুত প্রতিমূর্ত্তি বর্ত্তমান। উহা দেখিলে তোমার জীবন্ত বলিয়া ভ্রম হইবে। স্থাপত্যবিদ্যার কি অদ্ভুত বিকাশই ইউরোপে হইয়াছে! কলেজ-স্কোয়ারের সেই বিদ্যাসাগরের মূর্ত্তি, যাহা এদেশী লোকেরা করিয়াছে, তাহার তুলনায় এ ত্রিদিবের ছবি। সকল বিষয়ে আমরা কত পশ্চাতেই পড়িয়া রহিয়াছি!

এখানে ব্রাহ্মণেতর জাতের মধ্যে বিবাহের কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। বিধবারা অনায়াসে পত্যন্তর-গ্রহণ করিয়া থাকে - সমাজ তাহা অনুমোদন করে। এই পত্যন্তর গ্রহণের কোন সংস্কার নাই—জ্ঞাতি-স্বজনদের একদিন মাত্র সামাজিক নিমন্ত্রণ দিতে হয়। এমন দুই একটী স্ত্রীলোক দেখা গিয়াছে, যাহারা উপর্য্যুপরি ৪।৫টী পতি গ্রহণ করিয়াছে; প্রত্যেকের ঔরসে ৩।৪টী করিয়া সন্তানও হইয়াছে, তথাচ পুনরায় বিবাহে আপত্তি নাই। এই কারণে এদেশে বেশ্যাবৃত্তি নাই। কিন্তু এই অসঙ্কোচ বিধবা-বিবাহ-প্রথা সমাজের নৈতিকাদর্শের উৎকর্ষতা কি অপকর্ষতা জ্ঞাপক—তাহা বুঝিয়া লইবে!

নদীয়া জেলার অন্তঃপাতী সুবর্ণপুর-নিবাসী হাজারীবাগের প্রথিতনামা উকীল ৺রায় যদুপতি মুখোপাধ্যায় বাহাদুর এখানে সর্ব্বপ্রথমে আগমন

করেন বলিয়া অবগত হওয়া যায়। কার্য্যদক্ষতায় তিনি রাজানুগৃহীত হইয়া "রায় বাহাদুর" উপাধি লাভ করেন। দানশীলতায় তিনি জনসাধারণের আশ্রয়-স্থল ছিলেন। তাঁহার স্বোপার্জ্জিত বিপুল বিত্তের উত্তরাধিকারিগণ এখানকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গণ্যমান্য লোক।

বর্দ্ধমান ও বাঁকুড়া জেলার অনেকগুলি বর্দ্ধিষ্ঠ বাঙ্গালীও এখানে ঘর বাড়ী তৈয়ারি করিয়া স্থায়িরূপে বসবাস করিতেছেন। বিদুষী-কুল-ললামভূতা বঙ্গের ইদানীং কালের শ্রেষ্ঠ কবি মিসেস্ রায় (শ্রীমতী কামিনী সেনজা) এখানে চিরস্থায়িরূপে বাস করিতেছেন। এখানকার প্রাসাদোপম "লরেটো হাউস্" ইনিই ক্রয় করিয়া লইয়াছেন। 'কেনারী' হিল হইতে তাঁহার সুন্দর college খানি কবিত্বের ঘুমন্ত ছবির মত প্রতিভাত হয়। এই বঙ্গললনার দেশব্যাপিনী প্রতিভা স্মরণ করিয়া হৃদয়ে অপার আনন্দের উদয় হয়। মনে হয়, লীলা-খনাবতীর দেশে এখনো প্রতিভাশালিনী রমণী জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন।

এখানে Boddom Bazarএর পাশে "কেশব" হল নামে একটী সাধারণ সভাস্থল আছে। ধর্ম্মপ্রসঙ্গে হেথায় সাধারণের মিলন হয়। কোন আগন্তুক ভদ্রলোকের স্বাগত সম্ভাষণও এই স্থানে সম্পন্ন হয়। এতদ্ব্যতীত সহরে একটী সু-উচ্চ বিষ্ণুমন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। এতদ্দেশীয় কোন হীনবর্ণা অর্থশালিনী রমণী এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাত্রী। এখানেও দুই এক দিন গিয়াছিলাম। এখানে সেবা ভোগরাগের পরিপাটী বন্দোবস্ত আছে। মন্দিরের তত্ত্বাবধান একজন মহান্তের হস্তে। এদেশী মারোয়ারী বণিক্‌গণ ইহার প্রধান পৃষ্ঠপোষক—সুতরাং স্বচ্ছন্দে দেবসেবা চলিয়া যায়। বাঙ্গালীদের প্রতিষ্ঠিত একটি দেবী-মন্দিরও আছে। বাঁকুড়া জেলার কোন ব্রাহ্মণ এই মন্দির স্থাপন করেন—অবশ্য এখানকার বাঙ্গালীরা তাঁহার সাহায্য করিয়াছিলেন। কিন্তু ইদানীং এই মন্দিরের আর্থিক অবস্থা শোচনীয়—ঋণদায়ে দেবী-সেবকগণ দেবীকে বিসর্জ্জন দিয়া স্বদেশে যাইতে উন্মুখ!

মিশনারীরা এখানে ছেলেদের ও মেয়েদের জন্য পৃথক্ পৃথক্ দুইটী বিদ্যামন্দির স্থাপন করিয়াছেন। তাহাতে স্থানীয় ক্রিশ্চানদেরই (Native christian) শিক্ষা দেওয়া হয়। তবে এই সব স্কুলে নিম্নশ্রেণীর ছেলে মেয়েই অধিক দৃষ্ট হয়। উচ্চবর্ণের কোন লোক christian হইয়াছে বলিয়া এ

পর্য্যন্ত শোনা যায় নাই। এতদ্ভিন্ন গবর্ণমেণ্টের জেলা স্কুল এবং বাঙ্গালীদেব স্থাপিত আর একটী নর্ম্মাল স্কুলও রহিয়াছে। শিক্ষাকল্পে বাঙ্গালীরাও এখানে অকাতরে অর্থসাহায্য করেন বলিয়া অবগত হইয়াছি। সহরের দক্ষিণ প্রান্তে মিশনরীরা প্রকাণ্ড একটী হাঁসপাতাল বাড়ী তৈয়ারি করিতেছেন; এই বাড়া নির্ম্মাণকল্পে পদ্মার রাজা বহু অর্থ দান করিয়াছেন।

হাজারীবাগের দক্ষিণে, অল্পাধিক আড়াই ক্রোশ দূরে বিখ্যাত নৃসিংহ দেবের এক মন্দির আছে। এক দিন তাহা দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। ঘন-সন্নিবিষ্ট আম্র-কাননের অন্তরালে ঐ দেবমন্দির দর্শন করিয়া হতাশ হইয়াছিলাম। ভোগ-রাগ-পূজার্চ্চনার কোনই বন্দোবস্ত দেখি নাই। দরিদ্র পূজক ব্রাহ্মণগণ নৃসিংহ দেবের সম্পত্তি নষ্ট করিয়া ইদানীং সকলের দ্বারস্থ হইযাছেন।

পাহাড়ে বেড়াইতে বেড়াইতে কত ভাবেরই মনে উদয হয! এই জীর্ণ শীর্ণ কঙ্কাল-দেহধারী মানুষ-নামধেয় জীবগণেব দুর্দ্দশা স্মরণ করিয়া অজ্ঞাতে অশ্রুপাত হয়। আর ভাবি—এই জাতির কি পুনরভ্যুদয় সম্ভবপর? হল-কর্ষণে দিনপাত করিয়াও ইহারা সামান্য অন্নসংস্থানে অপারগ; সামান্য অশন-বসনের জন্য প্রাণপাতী পরিশ্রম করিয়াও ইহারা তদভাবেই নির্ম্মূল হইতে চলিযাছে! ইহাদের ভিতর শিক্ষা ও জ্ঞানোন্মেষ কল্পে গুরুদেব আমাদিগকে কতই না উপদেশ ও উৎসাহ দিযা গিযাছেন! কিন্তু এই বিরাট কর্ম্মক্ষেত্রে কত সৎসাহসী যুবক জীবনপাতী পরিশ্রম করিলে যে তাঁহার উপদেশ-সাফল্য প্রত্যক্ষ করা যাইতে পাবে, তাহা চিন্তার অতীত বিষয বলিয়া মনে হয়। তবে লোকোত্তর মহাপুরুষগণের চিন্তা কখনো ব্যর্থ হয় না—ইহাই একমাত্র আশা! মহামাযার লীলাখেলা কিছুই বুঝা যায না। হইতে পারে, এই নিদ্রিত কঙ্কালে কালে প্রাণের স্পন্দন অনুভূতি হইবে; হইতে পারে, দুর্লক্ষ্য কোন শক্তিকেন্দ্র হইতে বিদ্যুৎস্পন্দনের অনাবিল গতিপ্রসারে, শত সহস্র স্বার্থহীন কর্ম্মবীরের অভ্যুদয়; হইতে পারে, অনন্ত-শক্তি-কেন্দ্রাধার প্রতিজীবে মহাশক্তির আবির্ভাব; কিন্তু দেখিয়া শুনিয়া মনে হয—এদেশে সেদিন বহুদূরে। অথবা মহামায়া দেশকালপাত্র-বিশেষের অবলম্বনে কখন কি ভাবে জাগিয়া উঠিবেন, তাহা কে বলিতে পারে! তাঁহার ইচ্ছায় স্বেচ্ছা মিশাইয়া চলিয়া যাইতে পারিলেই মানবজন্ম সার্থক হইল। আমার নমস্কার জানিবে। ওঁ নমো নারায়ণায়।

মহাসমাধি।

[স্বামী সারদানন্দ।]

"প্রকৃতিস্ত্বঞ্চ সর্ব্বস্য গুণত্রয়বিভাবিনী।
কালরাত্রিঃ মহারাত্রিঃ মোহরাত্রিশ্চ দারুণা॥" চণ্ডী।

বিগত ৪ঠা ভাদ্র, সন ১৩১৮—ইংরাজী ২১শে আগষ্ট, ১৯১১ খৃঃ—বেলা ১টা ১০মিনিটের সময়, সাধারণের সুপরিচিত মান্দ্রাজস্থ শ্রীরামকৃষ্ণ-মঠের অশেষগুণালঙ্কৃত অধ্যক্ষ এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-মিশনের অন্যতম প্রাচীন প্রচারক রামকৃষ্ণ-গতপ্রাণ স্বামী শ্রীরামকৃষ্ণানন্দ, মহারাত্রির নিবিড় অঞ্চলাবরণে মহাসমাধিতে সুখ-শয়ন লাভ করিয়াছেন!

১৭৮৫শকে স্বামীজি ইহসংসারে আগমন করিয়াছিলেন এবং ১৮৩৩শকে অভয়ধাম প্রাপ্ত হইলেন—অতএব একোনপঞ্চাশ বৎসর মাত্র মনুষ্যলোকে আমাদের সহিত নানা ভাবে বিচরণ করিয়াছেন।

গুরুগতপ্রাণতা, উদ্দেশ্যের একতানতা সেবাপরায়ণতা এবং অনন্ত ত্যাগ ও ঈশ্বরভক্তি একদিকে যেমন প্রিয়দর্শন স্বামীজিকে ভক্তের নিকট আদর্শস্থানীয় করিয়া তুলিয়াছিল, তেমনি অন্যদিকে আবার তাঁহার বিদ্যা, বুদ্ধি, বিনয়, শাস্ত্রজ্ঞান, এবং সহানুভূতি ও সহৃদয়তা তাঁহাকে সংসার-দাবদগ্ধ জীবগণের নিকট আশা ও শান্তিপ্রদ আশ্রয়স্থল-স্বরূপে অবলম্বনীয় করিয়াছিল।

প্রথমে আলবার্ট কলেজে এবং পরে মেট্রোপলিটন কলেজে পাঠকাল হইতেই স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের জীবনে আধ্যাত্মিকতা-লাভের বিশেষ আগ্রহ পরিলক্ষিত হইত। বাল্যকালে পূজাদি পরে, নিত্য নিয়মিত ভাবে বাইবেল ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি গ্রন্থ পাঠ এবং ভক্ত্যাচার্য্য কেশবচন্দ্রের ধর্ম্ম-বক্তৃতা সকলে ও সময়ে সময়ে উপাসনা-মন্দিরে সাগ্রহে যোগদান প্রভৃতি দেখিয়াই বুঝিতে পারা যায়, ঐ পিপাসা তাঁহার প্রাণে ক্রমে ক্রমে কতদূর প্রবল হইতেছিল!

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর, শরৎ ও হেমন্তের মধুর সম্মিলন! পূর্ব্বোক্ত পিপাসার চরম পরিণতিতে স্বামীজিরও দক্ষিণেশ্বরের চিরশান্তিপ্রদ শ্রীগুরু-পাদপদ্মে মিলিত হওয়া!

এই বার অনুরাগের প্রবল ঝটিকায় জীবনের আমূল পরিবর্ত্তন!—প্রথম, শ্রীগুরু-সকাশে বাটী হইতে গমনাগমন, পরে, গৃহত্যাগ ও কাশীপুর উদ্যানে

গুরুগৃহবাস; পরে, ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে শ্রীগুরুর অদর্শনে তাঁহার শ্রীপাদুকার সেবা ও পূজামাত্রাবলম্বনে বরানগর মঠে প্রায় দ্বাদশবর্ষকাল একভাবে অবস্থিতি।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে পূজ্যপাদাচার্য্য স্বামী শ্রীবিবেকানন্দের প্রথম পাশ্চাত্যবিজয় করিয়া মঠে প্রত্যাগমন এবং গুরুভ্রাতাগণের সহায়ে ভারতের নানা স্থানে নানা শুভকার্য্যের লোকহিতায় সংস্থাপন। ঐ বৎসরের শেষ ভাগেই স্বামীজির আদেশ শিরে ধারণ করিয়া স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের মান্দ্রাজে শ্রীরামকৃষ্ণ-মঠ ও মিশনের কেন্দ্র-স্থাপনে গমন। খৃঃ ১৮৯৮—১৯১১, প্রায় চতুর্দ্দশ বৎসর, সাম্প্রদায়িক ভাব-সমাকুল দাক্ষিণাত্যের নানাস্থানে পূজ্যপাদ স্বামী শ্রীবিবেকানন্দের পদানুসরণে শ্রীগুরুনামাঙ্কিত 'যত মত তত পথ রূপ' বিজয়-পতাকা উড্ডীন করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণানন্দের দীর্ঘকাল বাস!

গুরুপদাশ্রিত বীর শ্রীরামকৃষ্ণানন্দের সহায়ে মান্দ্রাজ ও সমগ্র দাক্ষিণাত্যে ঐ কালে কোন্ কোন্ মহৎ কার্য্য সাধিত হইয়াছে?—হে পাঠক, জীবনপাতী পরিশ্রমের ফলস্বরূপ ঐ সকল কার্য্য ও এই দেবোপম জীবনের বিবরণ শ্রীরামকৃষ্ণানন্দের অদর্শনে মুহ্যমান মান্দ্রাজ ও দাক্ষিণাত্য-নিবাসীদিগকে জিজ্ঞাসা কর, দেখিবে, তাহারাই শতমুখে সহস্রমুখে সে সকল কথা বলিতে বলিতে নয়নধারায় বক্ষঃস্থল সিক্ত করিতেছে!

অথবা স্বার্থশূন্যতা, অধ্যবসায় ও উদ্দেশ্যের একতানতা দেখিয়াই যদি বুদ্ধিমান্ তুমি, মনুষ্যজীবন ও তৎকৃত কার্য্যকলাপের গুণাগুণ বিচার করিতে অভ্যস্ত হইয়া থাক, তবে আইস, আমাদের সহিত যোগদান করিয়া অশ্রুজল মোচন করিতে করিতে বল—ঈদৃশ জীবন সংসারে দুর্লভ!—স্বার্থকলুষতাপূর্ণ-পৃথিবীতে উহার আদর নাই দেখিয়াই জগতের আরাধ্য দেব উঁহাকে অল্পকালে নিজ সকাশে সংগ্রহ করিয়া লইলেন।

রোগ দুঃসাধ্য জানিতে পারিয়া তাঁহার গুরুভ্রাতাগণ স্বামীজিকে কলিকাতায় চিকিৎসার্থ আনয়ন করেন। বিগত ২৬শে জ্যৈষ্ঠ তিনি কলিকাতা পৌঁছেন এবং ঐ দিন হইতেই কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার ও কবিরাজগণের হস্তে তাঁহার চিকিৎসার ভার অর্পিত হয়। এইরূপে প্রায় আড়াই মাস কাল কলিকাতা বাগবাজার পল্লীর অন্তর্গত, ১২।১৩নং গোপালচন্দ্র নিয়োগীর লেনস্থ শ্রীরামকৃষ্ণ-শাখা-মঠে রোগের অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিয়া স্বামীজি সমাধিতে দেহরক্ষা করেন। সমাধিতেই যে তিনি দেহত্যাগ করেন, তদ্বিষয়

তাঁহার ঐ কালে সর্ব্বাঙ্গে অসাধারণ বহুক্ষণব্যাপী পুলক দেখিয়াই তদীয় গুরু-ভ্রাতাগণ অনুমান করিয়াছিলেন।

শরীর ত্যাগের পর কলিকাতা হইতে বেলুড় মঠে লইয়া যাইয়া স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের শরীর পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দের সমাধি-মন্দিরের নিকটে অগ্নিসাৎ-করা হইল।—

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবঃ শিষ্যতে॥ হরি ওঁ—শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ।

(মহা-সমাধি)

ভেদিয়া অবনী কেন শোক-ধ্বনি ?
কেন থর থর কাঁপিছে কায় ?
ত্যজিয়া ধরণী, ভক্ত-চূড়ামণি
কে আজ কোথায় চলিয়া যায় ?

'জয় রামকৃষ্ণ' ! 'জয় জগদিষ্ট !'
কাঁপায়ে গগন উঠিছে ধ্বনি !
নগরে, বাহিরে, ভাগীরথী-তীরে
একই মহানাম শ্রবণে শুনি।

ভক্তি-প্রেম-মাখা, জ্ঞান-রাগে ঢাকা
কার ও বিশাল সোণার দেহ !
ফুলের শয্যায় কা'রে ল'যে যায়,
আঁধার করিয়া ধরার গেহ ?

ন্যাসি-শিরোমণি, ভক্ত-বীরাগ্রণী,
শুনা'য়ে গুরুর অমৃত কথা,
রাম-কৃষ্ণ-লোকে, পরম পুলকে,
চলিলে, রাখিয়া স্মৃতির ব্যথা !

অপূর্ব্ব সাধনা, গুরু-আরাধনা,
তোমার সমান জগতে নাই।
ভক্তির প্রবাহ, সাকার বিগ্রহ,
প্রেমোচ্ছ্বাস অত কোথায় পাই।

ছিন্ন করি পাশ জীবন-প্রভাতে,
গুরু-পদে প্রাণ সঁপিলে আসি!
সাধনার বলে, নিরবাণ-পথে,
ভ্রমিয়া লভিলে অমৃত-রাশি!

উষ্ণীষে বাঁধি 'বরফের কণা'
এক ক্রোশ দূরে, শ্রীগুরু পাশে
ল'য়ে গেলে তুমি আশ্চর্য্য ঘটনা।
কেবা পাবে হেন মরত-বাসে!

জন্ম-তিথি-পূজা, সারা দিবানিশি,
কে আর সক্ষম তোমার মত।
সেবিয়া গুরুরে একাসনে বসি,
'সিদ্ধাসন' নামে হ'য়েছ খ্যাত।

জ্যেষ্ঠ গুরু-ভ্রাতা 'বিবেক-আনন্দ'
আজ্ঞা শিরে ধরি, প্রবাসে, দূরে
প্রচারিলে ধর্ম্ম, 'রাম-কৃষ্ণানন্দ'
'রাম-কৃষ্ণ-তত্ত্ব', প্রেমের ভরে। (১)

শেষ অবতার, লক্ষ্মণের মত
চতুর্দ্দশ বর্ষ থাকিয়া রত। (২)
শেষাচার্য্য দেশে গুরু-কার্য্যে রত,
করি প্রাণ-পণ ছিলে হে যতি।

---

(১) "Sri Ramakrishna and His Mission

(২) ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯১১ অব্দ পর্য্যন্ত মান্দ্রাজে 'রামকৃষ্ণতত্ত্ব'-প্রচারে নিযুক্ত ছিলেন। ১৪শ বর্ষ কঠোর পরিশ্রমে শরীর ভগ্ন হইয়া গেল।

উজ্জ্বল সে দেশ তব প্রতিভায়,
'ব্রহ্মবাদী' গায় মহিমা-গান!
জয় রামকৃষ্ণ! জয় সমন্বয়!
চারিদিকে সেথা উঠিছে তান!

'শ্রীকৃষ্ণ-চরিত,' 'রাখাল-বালকে' (৩)
তোমার লেখনী-গৌরব গায়!
সেই কৃষ্ণ-কথা 'সাম্রাজ্য-স্থাপকে' (৪)
তোমার প্রতিভা প্রকাশ পায়!

'পূর্ণত্বের পথ,' 'তত্ত্ব-জীবাত্মার,' (৫) (৬)
'বিশ্ব ও মানব' বেদান্ত কথা,—(৭)
কে আর শুনা'বে নাশি অন্ধকার?
কে আর হরিবে অজ্ঞের ব্যথা!

'রারানুজ'-কথা লিখি 'উদ্বোধনে,' (৮)
আচার্য্য-মহিমা গাহিলে তুমি,
কাঁদে চারিভিতে তোমার বিহনে,
কি তব মহিমা গাহিব আমি!

ভক্তি, নিষ্ঠা, ত্যাগ অপূর্ব্ব তোমার,
কঠোর তপস্যা বিরল নরে!
বুঝেছে যে জন মাহাত্ম্য অপার,
পূজিবে মানসে প্রেমের ভরে!

গুরু-প্রেমাবদ্ধ 'রাম-কৃষ্ণানন্দ,'
গুরুগত-প্রাণ, আদর্শ ঋষি,
অভেদ সম্বন্ধ, গুরু-নামানন্দ,
যাও গুরু পাশে মহর্ষি 'শশী'!

(৩, ৪) "Sri Krishna" the Pastoral and The King Maker নামক পুস্তিকাদ্বয়।

(৫) "Path to Perfection" (৬) "The Soul of Man" নামক গ্রন্থ।

(৭) "The Universe and Man" নামক গ্রন্থ।

(৮) *'রামানুজ-চরিত' নামক বিরাট-চরিতাখ্যান, উদ্বোধনে প্রকাশিত।*

যাও দেব! যাও সেই মহালোকে,
যথা রাম-কৃষ্ণ বিরাজমান!
কীর্ত্তি-গান তব ভরিল ভূলোকে,
দ্যুলোকে জ্যোৎস্না করগো দান!

একবিন্দু প্রেম একবিন্দু জ্ঞান,
তোমার অনন্ত ভাণ্ডার হ'তে,
দিও দয়া ক'রে,-- অধম সন্তান
চলে যেন তব চালিত পথে!

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত।

তুকার ধৈর্য্য।

—:○*○:—

আনন্দ-বিহ্বল অন্তরেতে তুকা,
ফিরি যদি এল ঘরে।
কিসের আনন্দ, পেয়েছ কি ধন?
পত্নী সুধাইল তারে॥
প্রভাত-সময়, ক্ষেত্র হ'তে ইক্ষু
আনিতে গেছিলে তুমি।
রিক্তহস্তে এবে, ফিরিলে যে গৃহে,
দেখেছ কি স্বর্ণভূমি॥
কে দিবে উত্তর, আনন্দ-নেশায়,
আছে তুকা মাতোয়ারা।
পরুষ বচনে সুধাল সাপিনী,
"এ তব কিরূপ ধারা॥
মাঠ হ'তে পথে, ফিরিবার কালে,
বেচে কি আসিলি আক্"।
পুলকে তুকার ঝরিল নয়ন,
বদনে না সরে বাক্॥

"এসেছি বেচিয়া," "কড়ি দে আমায়,"
"কড়ি ত মেলেনি ভাই"।
"কারে দিলি তবে, বল্ শীঘ্র বল্,"
"যার কাছে কড়ি নাই"॥
"মাঠ হ'তে ঘরে ফিরিবার কালে,
অনাহারী জন কত।
মাগিল কাতরে, দিয়াছি তাদের,
বাকি আর ছিল যত॥
কাঁদিল কাতরে, বালকের দল,
দিয়াছি তাদের করে।
শেষ আছে এক, এই নাও প্রিয়ে,
এনেছি তোমার তরে"॥
ক্রোধের আগুন উঠিল জ্বলিয়া,
গেল বুদ্ধি দেহ হ'তে।
সবেগে সে ইক্ষু পড়িল আসিয়া,
অভাগা তুকার মাথে॥
প্রবল আঘাত সহিল না হায়,
কাটিল তুকার শির।
প্রেমধারা সনে শোণিত মিশিল,
হ'ল ইক্ষু দুই চির॥
পর-প্রেম-মদে নাচে যে হৃদয়,
কি হবে আঘাতে তার।
দ্বিগুণ হরষ উথলিল প্রাণে,
ছুটিল প্রেমের ধার॥
না উঠিল হাত, না কাঁপিল বুক,
হাসি কহে তুকা তায়।
"হ'ল ভাল এবে, নাও অর্দ্ধখান,
কাটিতে হবে না দায়"॥

শ্রীশরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

স্বামি-শিষ্য-সংবাদ।

(মঠে দুর্গোৎসব।)

[শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এ।]

বেলুড় মঠ স্থাপিত হওয়ার পর নৈষ্ঠিক হিন্দুগণের মধ্যে অনেকে মঠের আচার-ব্যবহারের প্রতি তীব্র কটাক্ষ করিতেন। বিলাত-প্রত্যাগত স্বামীজি কর্ত্তৃক স্থাপিত মঠে হিন্দুর আচার-নিষ্ঠা সর্ব্বথা প্রতিপালিত হয় না, এবং ভক্ষ্যভোজ্যাদির বাচ-বিচার নাই—প্রধানতঃ এই বিষয় লইয়া নানা স্থানে আলোচনা চলিত এবং ঐ কথায় বিশ্বাসী হইয়া শাস্ত্রানভিজ্ঞ হিন্দুনামধারী ইতর ভদ্র অনেকে তখন সর্ব্বত্যাগী, আব্রাহ্মণচণ্ডালে সমদৃষ্টি, গুণত্রয়াতিক্রান্ত সন্ন্যাসিগণের কার্য্যকলাপের অযথা নিন্দাবাদ করিত। আহিরীটোলা ঘাট হইতে বালী উত্তরপাড়ার চলতি নৌকার আরোহিগণ বেলুড় মঠ দেখিয়াই নানারূপ ঠাট্টা তামাসা, এমন কি,সময় সময় অলীক অশ্লীল কুৎসার অবতারণা করিয়া নিষ্কলঙ্ক স্বামীজির অমলধবল চরিত্র আলোচনাতেও কুণ্ঠিত হইত না। নৌকায় করিয়া মঠে আসিবার কালে শিষ্যও সময়ে সময়ে ঐরূপ তীব্র সমালোচনার হাত হইতে অব্যাহতি পাইত না। শিষ্যের মুখে স্বামীজি কখন কখন ঐ সকল সমালোচনা শুনিয়া বলিতেন, "হস্তী চলে বাজার্ মে, কুত্তা ভুকে হাজার। সাধুন্‌কো দুর্ভাব নহি, যব্ নিন্দে সংসার॥" কখনো বলিতেন, "দেশে কোন নূতন ভাব প্রচার হওয়ার কালে তাহার বিরুদ্ধে প্রাচীনপন্থাবলম্বিগণের অভ্যুত্থান প্রকৃতির নিয়ম। জগতের ধর্ম্ম-সংস্থাপকমাত্রকেই এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইয়াছে।" আবার কখনো বলিতেন, "Prosecution (অন্যায় অত্যাচার) না হইলে জগতের হিতকর ভাবগুলি সমাজের অন্তস্তলে সহজে প্রবেশ করিতে পারে না।" সুতরাং সমাজের তীব্র কটাক্ষ, অশ্লীল সমালোচনাকে স্বামীজি তাঁহার নবভাব-প্রচারের সহায় বলিয়া মনে করিতেন—কখনো উহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতেন না—বা তাঁহার পদাশ্রিত গৃহী বা সন্ন্যাসিগণকে প্রতিবাদ করিতে দিতেন না। পরন্তু সর্ব্বদা সকলকে বলিতেন, "ফলাভিসন্ধিহীন হ'য়ে কার্য্য ক'রে যা, একদিন উহার ফল নিশ্চয়ই ফল্‌বে।" স্বামীজির শ্রীমুখে একথাও সর্ব্বদাই শুনা যাইত, "ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি।"

হিন্দুসমাজের এই তীব্র সমালোচনা স্বামীজির লীলাবসানের পূর্ব্বেই কিরূপে অন্তর্হিত হয়, আজ সে বিষয়েই কিছু লিপিবদ্ধ হইতেছে। ১৯০১ সনের জ্যৈষ্ঠ কি আষাঢ় মাসে শিষ্য একদিন মঠে আসিয়াছে। স্বামীজি শিষ্যকে দেখিয়াই বলিলেন, "ওরে, একখানা রঘুনন্দনের 'অষ্টা-বিংশতি-তত্ত্ব' শীগ্‌গির আমার জন্য নিয়ে আস্‌বি।"

শিষ্য—আচ্ছা, মহাশয়; কিন্তু রঘুনন্দনের স্মৃতি—যাহাকে কুসংস্কারের ঝুড়ি বলিয়া বর্ত্তমান শিক্ষিত সম্প্রদায় নির্দ্দেশ করিয়া থাকে, তাহা লইয়া আপনি কি করিবেন?

স্বামীজি—কেন? রঘুনন্দন তদানীন্তন কালের একজন দিগ্‌গজ পণ্ডিত ছিলেন—প্রাচীন স্মৃতিসকল সংগ্রহ ক'রে হিন্দুর দেশকালোপযোগী নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপ লিপিবদ্ধ ক'রে গেছেন। সমস্ত বাঙ্গালা দেশ তো তাঁর অনুশাসনেই আজ কাল চল্‌ছে। তবে তৎকৃত হিন্দুজীবনের গর্ভাধান হ'তে শ্মশানান্ত আচার-প্রণালীর কঠোর বন্ধনে সমাজ উৎপীড়িত হ'য়েছিল। শৌচ প্রস্রাবে—খেতে শুতে—অন্য সকল বিষয়ের ত কথাই নাই, সব্বাইকে তিনি নিয়মে বদ্ধ কত্তে প্রয়াস পেয়েছিলেন। সময়ের পরিবর্ত্তনে সে বন্ধন বহুকাল স্থায়ী হ'তে পার্‌লে না। দেখ্‌তে পাচ্ছিস্‌ না, সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে, ক্রিয়াকাণ্ড—সমাজের আচার-প্রণালী—সর্ব্বদাই পরি-বর্ত্তিত হ'য়ে যায়। একমাত্র জ্ঞানকাণ্ডই পরিবর্ত্তিত হয় না। বৈদিক যুগেও দেখ্‌তে পাবি, ক্রিয়াকাণ্ড ক্রমেই পরিবর্ত্তিত হ'যে গেছে। কিন্তু উপনিষদের জ্ঞানপ্রকরণ আজ পর্য্যন্তও একভাবে রয়েছে। তবে তার Interpreters (ব্যাখ্যাতা) অনেক হয়েছে—এইমাত্র।

শিষ্য—আপনি রঘুনন্দনের স্মৃতি লইয়া কি করিবেন?

স্বামীজি—এবার মঠে দুর্গোৎসব কর্‌বার ইচ্ছা হচ্ছে। যদি খরচার সঙ্কুলন হয় তো মহামায়ার পূজো কর্‌বো। তাই দুর্গোৎসব-বিধি পড়্‌-বার ইচ্ছে হয়েছে। তুই আগামী রবিবারে যখন আস্‌বি তখন ঐ পুঁথিখানি সংগ্রহ ক'রে নিয়ে আস্‌বি। বুঝ্‌লি?

শিষ্য—যাহা আজ্ঞা।

পর রবিবারে শিষ্য রঘুনন্দনকৃত অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব ক্রয় করিয়া স্বামীজির জন্য মঠে লইয়া আসিল। গ্রন্থখানি আজিও মঠের লাইব্রেরীতে রহিয়াছে। স্বামীজি পুস্তকখানি পাইয়া বড়ই খুসী হইলেন, এবং ঐ দিন হইতে উহা

পাঠ করিতে আরম্ভ করিয়া ৪।৫ দিনেই গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া ফেলিলেন। শিষ্যের সঙ্গে সপ্তাহান্তে দেখা হইবার পর বলিলেন "তোর রঘুনন্দনের স্মৃতি সব প'ড়ে ফেলেছি। যদি পারি তো এবার মাকে রুধির দিয়ে পূজা কর্‌ব। রঘুনন্দনও বলেছেন "নবম্যাং পূজয়েৎ দেবীং কৃত্বা রুধিরকর্দ্দমং"।

শিষ্যের সহিত স্বামীজির উপরোক্ত কথাগুলি ৺পূজার দুই তিন মাস পূর্ব্বে হয়। পরে ঐ সম্বন্ধে আর কোন কথাই মঠের কাহারও সহিত কহেন নাই। পরন্তু তাঁহার ঐ সময়ের চাল চলন দেখিয়া শিষ্যের মনে হইত যে, তিনি ঐ সম্বন্ধে আর কিছুই ভাবেন নাই। পূজার ১০।১২ দিন পূর্ব্ব পর্য্যন্তও মঠে যে প্রতিমা আনয়ন করিয়া এবৎসর পূজা হইবে, একথার কোন আলোচনা বা পূজা সম্বন্ধে কোন আয়োজন শিষ্য মঠে দেখিতে পায় নাই। স্বামীজির জনৈক গুরুভ্রাতা ইতিমধ্যে একদিন স্বপ্নে দেখেন যে, মা দশভূজা গঙ্গার উপর দিয়া দক্ষিণেশ্বরের দিক্ হইতে মঠের দিকে আসিতেছেন! পরদিন প্রাতে স্বামীজি মঠের সকলের নিকট পূজা করিবার সঙ্কল্প প্রকাশ করিলে তিনিও তাঁহার নিকট স্বীয় স্বপ্নবৃত্তান্ত প্রকাশ করিলেন। স্বামীজিও তাহাতে আনন্দিত হইয়া বলিলেন, "যেরূপে হোক্ এবার মঠে পূজা করিতেই হইবে।" তখন পূজা করা স্থির হইল এবং ঐ দিনই একখানা নৌকা ভাড়া করিয়া স্বামীজি, স্বামী প্রেমানন্দ ও ব্রহ্মচারী কৃষ্ণলাল বাগ্‌বাজারে চলিয়া আসিলেন; অভিপ্রায়—বাগ্‌বাজারে অবস্থিত শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর নিকট কৃষ্ণলাল ব্রহ্মচারীকে পাঠাইয়া তাঁহার ঐ বিষয়ে অনুমতি এবং তাঁহারই নামে সঙ্কল্প করিয়া ঐ পূজা সম্পন্ন হইবে, ইহাই প্রার্থনা করা। কারণ, সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীদিগের কোনরূপ পূজা বা ক্রিয়া "সঙ্কল্প" করিয়া করিবার অধিকার নাই।

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী স্বীকৃতা হইলেন এবং মঠের পূজা তাঁহারই নামে "সঙ্কল্পিত" হইবে, স্থির হইল। স্বামীজিও *ঐজন্য* বিশেষ আনন্দিত হইলেন এবং ঐ দিনেই কুমারটুলীতে প্রতিমার বায়না দিয়া মঠে প্রত্যাগমন করিলেন। স্বামীজির পূজা করিবার কথা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল এবং ঠাকুরের গৃহী ভক্তগণ ঐ কথা শুনিয়া ঐ বিষয়ে আনন্দে যোগদান করিলেন।

স্বামী ব্রহ্মানন্দের উপরে পূজোপকরণ সংগ্রহের ভার পড়িল। কৃষ্ণলাল

ব্রহ্মচারী পূজক হইবেন, স্থির হইল। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের পিতৃদেব সাধকাগ্রণী শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় তন্ত্রধারক-পদে ব্রতী হইলেন। মঠে আনন্দ ধরে না। যে জমিতে এখন ঠাকুরের জন্ম মহোৎসব হয় সেই জমির উত্তর ধারে মণ্ডপ নির্ম্মিত হইল। ষষ্ঠীর বোধনের পূর্ব্বদিনে কৃষ্ণলাল, নির্ভয়ানন্দ প্রভৃতি সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণ নৌকা করিয়া মায়ের প্রতিমা মঠে লইয়া আসিলেন। ঠাকুরঘরের নীচের তলায় মায়ের মূর্ত্তিখানি আনিয়া রাখিবামাত্র যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল—অবিশ্রান্ত বারিবর্ষণ হইতে লাগিল। মায়ের প্রতিমা নির্ব্বিঘ্নে মঠে পঁহুছিয়াছে, এখন জল হইলেও কোন ক্ষতি নাই ভাবিয়া স্বামীজি নিশ্চিন্ত হইলেন।

এদিকে স্বামী ব্রহ্মানন্দের যত্নে মঠ দ্রব্যসম্ভারে পরিপূর্ণ। পূজোপকরণের কিছুমাত্র ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় না।—দেখিয়া স্বামীজি আনন্দে অধীর হইয়া স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রভৃতির বিশেষ প্রশংসা করিতে লাগিলেন। মঠের দক্ষিণের বাগানবাটীখানি যাহা পূর্ব্বে নীলাম্বর বাবুর ছিল, একমাসের জন্য ভাড়া করিয়া পূজার পূর্ব্বদিন হইতে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে আনিয়া রাখা হইল। অধিবাসের সান্ধ্যপূজা স্বামীজির সমাধি-মন্দিরের সম্মুখস্থ বিল্বমূলে স্বামীজির আদেশানুসারে সম্পন্ন হইল। তিনি ঐ বিল্ববৃক্ষমূলে বসিয়া পূর্ব্বে একদিন যে গান গাহিয়াছিলেন—"বিল্ববৃক্ষমূলে পাতিয়ে বোধন, গণেশের কল্যাণে গৌরীর আগমন" —ইত্যাদি, তাহা এতদিনে অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হইল।

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর অনুমতি লইয়া ব্রহ্মচারী কৃষ্ণলাল মহারাজ সপ্তমীর দিনে পূজকের আসনে উপবেশন করিলেন। কৌলাগ্রণী তন্ত্রমন্ত্রকোবিদ ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর আদেশে সুরগুরু বৃহস্পতির ন্যায় তন্ত্রধারকের আসন গ্রহণ করিলেন। যথাশাস্ত্র মায়ের পূজা নির্ব্বাহিত হইল। কেবল শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর অনভিমত বলিয়া মঠে পশুবলিদান হইল না বলির অনুকল্পে স্তূপীকৃত মিষ্টান্নের রাশি প্রতিমার উভয়পার্শ্বে শোভা পাইতে লাগিল।

গরীব দুঃখী কাঙ্গাল দরিদ্রদিগকে দেহধারী ঈশ্বরজ্ঞানে পরিতোষ করিয়া ভোজন করান এই পূজার প্রধান অঙ্গরূপে পরিগণিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত বেলুড়, বালী ও উত্তরপাড়ার পরিচিত অপরিচিত অনেক ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণকেও নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল এবং তাঁহারাও সকলে আনন্দে যোগদান

করিয়াছিলেন। তদবধি মঠের প্রতি তাঁহাদের পূর্ব্ববিদ্বেষ বিদূরিত হইয়া তাঁহাদের ধারণা জন্মে যে, মঠের সন্ন্যাসীবা যথার্থ হিন্দুসন্ন্যাসী।

সে যাহাই হউক, মহাসমারোহে দিনত্রয়ব্যাপী মহোৎসবকল্লোলে মঠ মুখরিত হইল। নহবতের সুললিত তান-তরঙ্গ—গঙ্গার পর পারে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। ঢাক-ঢোলের রুদ্রতালে কলনাদিনী ভাগীরথী নৃত্য করিতে লাগিল। "দীয়তাং নীয়তাং ভোজ্যতাং" এই কথা ব্যতীত মঠধারী সন্ন্যাসি-গণের মুখে ঐ তিন দিন আর কোন কথা শুনিতে পাওয়া যায় নাই। যে পূজায় সাক্ষাৎ শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী স্বয়ং উপস্থিত, যাহা স্বামীজির সঙ্কল্পিত, দেহধারী দেবসদৃশ মহাপুরুষগণ যাহার কার্য্যসম্পাদক, সে পূজা যে অচ্ছিদ্র হইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? দিনত্রয়ব্যাপী পূজা নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইল। গরীব দুঃখীর ভোজনতৃপ্তিসূচক কলরবে মঠ এই তিন দিন পরিপূর্ণ হইয়াছিল।

মহাষ্টমীর দিন রাত্রে স্বামীজির সামান্য জ্বর হইয়াছিল। সেজন্য তিনি ঐ দিন পূজায় যোগদান করিতে পারেন নাই। কিন্তু সন্ধিক্ষণে উঠিয়া তিনি জবাবিল্বদলে মহামায়ার শ্রীচরণে বারত্রয় পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া স্বীয় কক্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। নবমীর দিন তিনি সুস্থ হইয়াছিলেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেব নবমীরাত্রে যে সকল গান গাহিতেন, তাহার দুই একটী স্বয়ং গাহিয়াও ছিলেন। মঠে সে রাত্রে আনন্দের তুফান বহিযাছিল।

দশমীর দিন শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর দ্বারা যজ্ঞ দক্ষিণান্ত করা হইল। যজ্ঞের ফোঁটা ধারণ করিয়া স্বামীজি সাক্ষাৎ যজ্ঞেশ্বররূপে প্রতিভাত হইয়াছিলেন। সঙ্কল্পিত পূজা সমাধা করিযা স্বামীজির মুখমণ্ডল দিব্যভাবে পরিপূর্ণ হইয়া-ছিল। দশমীর দিন সন্ধ্যান্তে মায়ের প্রতিমা গঙ্গাতে বিসর্জ্জন করা হইল। এবং তৎপরদিন শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীও স্বামীজিপ্রমুখ সন্ন্যাসিগণকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বাগ্‌বাজারে পূর্ব্বাবাসে প্রত্যাগমন করিলেন।

দুর্গোৎসবের পর স্বামীজি মঠে শ্রীশ্রীলক্ষ্মী ও শ্যামা-পূজাও প্রতিমা আনাইয়া ঐ বৎসর যথাশাস্ত্র নির্ব্বাহিত করেন। ঐ পূজাতেও শ্রীযুক্ত ঈশ্বর চন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় তন্ত্রধারক এবং কৃষ্ণলাল মহারাজ পূজক ছিলেন।

শ্যামাপূজান্তে স্বামীজির জননী মঠে একদিন বলিয়া পাঠান যে, বহুপূর্ব্বে স্বামীজির বাল্যাবস্থায় তিনি "মানত" করিয়াছিলেন যে একদিন স্বামীজিকে সঙ্গে লইয়া কালীঘাটে গিয়া মহামায়ার পূজা দিবেন। অগ্রহায়ণ মাসের

শেষভাগে স্বামীজির শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িলেও, মাতার নিরতিশয় অনুরোধে তিনি একদিন কালীঘাটে যাইতে স্বীকৃত হন। নিজ জননীর সহিত কালীঘাটে পূজা দিয়া মঠে ফিরিয়া আসিবার দিনে শিষ্যের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় এবং তথায় কি ভাবে পূজাদি দেন, তাহাও শিষ্যকে বিশেষভাবে বলেন। সাধারণের অবগতির জন্য তাহাও এস্থলে লিপিবদ্ধ হইল।

স্বামীজি বলিয়াছিলেন—ছেলেবেলায় তাঁহার একবার বড় অসুখ করে। তখন তাঁহার জননী মানত করেন যে স্বামীজি ভাল হইলে কালীঘাটে তাঁহাকে লইয়া যাইয়া মায়ের বিশেষ পূজা দিবেন ও শ্রীমন্দিরে তাঁহাকে গড়াগড়ি দেওয়াইয়া লইয়া আসিবেন। ঐ 'মানতের' কথা এতকাল কাহারো মনে ছিল না। স্বামীজির অসুখ করায় ইদানীং তাঁহার গর্ভধারিণীর ঐ কথা স্মরণ হয় এবং তাঁহাকে ঐ কথা বলিয়া কালীঘাটে লইয়া যান। কালীঘাটে যাইয়া স্বামীজি কালীগঙ্গায় স্নান করিয়া মাতার আদেশে আর্দ্রবস্ত্রে মায়ের মন্দিরে প্রবেশ করেন এবং মন্দিরের মধ্যে শ্রীশ্রীকালীমাতার পাদপদ্মের সম্মুখে তিন বার গড়াগড়ি দেন। তৎপরে মন্দির হইতে বাহির হইয়া সাতবার মন্দির প্রদক্ষিণ করেন। পরে নাটমন্দিরের পশ্চিম পার্শ্বে অনাবৃত চত্বরে বসিয়া নিজেই হোম করেন। অমিত-বলবান্ তেজস্বী সন্ন্যাসীর সে যজ্ঞসম্পাদন দর্শন করিতে মাযের মন্দিরে সেদিন খুব ভিড় হইয়াছিল। শিষ্যের এক বন্ধু কালীঘাটনিবাসী শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় যিনি শিষ্যের সঙ্গে বহুবার স্বামীজির নিকট যাতায়াত করিয়াছিলেন, স্বামীজির ঐ যজ্ঞ স্বয়ং দর্শন করিয়াছিলেন। জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে পুনঃ পুনঃ ঘৃতাহুতি প্রদান করিয়া সেদিন স্বামীজি দ্বিতীয় ব্রহ্মার ন্যায় প্রতীয়মান হইয়াছিলেন বলিয়া গিরীন্দ্রবাবু আজিও বর্ণন করিয়া থাকেন।

মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া স্বামীজি শিষ্যের সঙ্গে দেখা হইবার পর তাহাকে বলিয়াছিলেন, 'কালীঘাটে এখনও কেমন 'উদার' ভাব দেখ্‌লুম। আমাকে বিলাত-প্রত্যাগত "বিবেকানন্দ" ব'লে জেনেও মন্দিরাধ্যক্ষগণ মন্দিরে প্রবেশ কত্তে কোন বাধাই দেন নাই। বরং পরম সমাদরে আমাকে মন্দিরমধ্যে নিয়ে গিয়ে যথেচ্ছা পূজা কর্‌তে সাহায্য করেছিলেন।"

জীবনের শেষভাগে স্বামীজি এইরূপে হিন্দুর অনুষ্ঠেয় পূজা-পদ্ধতির প্রতি আন্তরিক ও বাহ্যিক বহু মান্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন। যাঁহারা স্বামীজিকে

কেবল একজন বেদান্তবাদী বা ব্রহ্মজ্ঞানী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন এই পূজানুষ্ঠান প্রভৃতি তাঁহাদিগের ভাবিবার বিষয়। "আমি শাস্ত্রমর্য্যাদা নষ্ট করিতে আসি নাই—পূর্ণ করিতেই আসিয়াছি"—"I have come to fulfil and not to destroy"—উক্তিটীর সফলতা স্বামীজি নিজ জীবনে বহুধা প্রতিপাদন করিয়া গিয়াছেন। বেদান্তকেশরী শ্রীশঙ্করাচার্য্য বেদান্তনির্ঘোষে ভূলোক কম্পিত করিয়াও যেমন হিন্দুর দেবদেবীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করেন নাই—বহুবিস্তার স্তব স্তুতি রচনা করিয়াছিলেন, স্বামীজিও যে তদ্রূপ পূর্ব্বোক্ত অনুষ্ঠান সকলের দ্বারা হিন্দুধর্ম্মের প্রতি বহুমান প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, ইহা আমরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। রূপে, গুণে, বিদ্যায়, বাগ্মিতায়, শাস্ত্রব্যাখ্যায়, লোককল্যাণকামনায়, সাধনায় ও জিতেন্দ্রিয়তায়, স্বামীজির তুল্য সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বদর্শী মহাপুরুষ বর্ত্তমান শতাব্দীতে আর জন্মগ্রহণ করেন নাই। ভারতের ভবিষ্যৎ বংশাবলী ইহা ক্রমে বুঝিতে পারিবে। আমরা তাঁহার সঙ্গ করিয়া ধন্য হইয়াছি। এই শঙ্করোপম স্বামীজিকে বুঝিবার জন্য আমরা জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে জগতের যাবতীয় নরনারীকে আহ্বান করিতেছি। জ্ঞানে শঙ্কর, সহৃদয়তায় বুদ্ধ, ভক্তিতে নারদ, ব্রহ্মজ্ঞতায় শুকদেব, তর্কে বৃহস্পতি, রূপে কামদেব, সাহসে অর্জ্জুন, এবং শাস্ত্রজ্ঞানে ব্যাসতুল্য স্বামীজির সম্পূর্ণতা বুঝিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। সর্ব্বতোমুখীপ্রতিভাসম্পন্ন শ্রীস্বামীজির জীবনই যে বর্ত্তমান যুগে আদর্শরূপে একমাত্র অবলম্বনীয় তাহাতে আমাদের সন্দেহ নাই। এই মহাসমন্বয়াচার্য্যের সর্ব্বমতসমঞ্জসা ব্রহ্মবিদ্যার তমোচ্ছিন্ন কিরণজালে সসাগরা ধরা আলোকিত হইয়াছে। চক্ষু থাকে তো পূর্ব্বাকাশে এই তরুণারুণছটা দর্শন করিয়া জাগ্রত হও। প্রাণ থাকে তো এই স্পন্দন অনুভব কর। আমরা স্বামীজির দাসানুদাস। তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি অনুধ্যান করিতে করিতে, তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে ভূয়োভূয়ঃ মস্তক অবনত করিতে করিতে জীবনলীলা সাঙ্গ করিতে পারি তো নরজন্ম সার্থক বলিয়া মনে করিব।

স্বামী বিবেকানন্দের সহিত মাদুরায় একঘণ্টা।

(হিন্দু, মান্দ্রাজ, ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৭)

প্রশ্ন। আমার যতদূর জানা আছে, 'জগৎ মিথ্যা' এই মতবাদ পশ্চাদ্লিখিত কয়েক প্রকারে ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে :—

(ক) অনন্তের তুলনায় নশ্বর নামরূপের স্থায়িত্ব এত অল্প যে, তাহা বলিবার নয়।

(খ) দুইটী প্রলয়ের অন্তর্গত কাল অনন্তের তুলনায় ঐরূপ।

(গ) যেমন শুক্তিতে রজতজ্ঞান বা রজ্জুতে সর্পজ্ঞান ভ্রমাবস্থায় সত্য, আর ঐ জ্ঞান মনের অবস্থাবিশেষের উপর নির্ভর করে, তদ্রূপ বর্ত্তমানে এই জগতেরও একটা আপাতপ্রতীয়মান সত্যতা আছে, উহারও সত্যতাজ্ঞান মনের অবস্থাবিশেষের উপর নির্ভর করে, কিন্তু পরমার্থতঃ (চরমে বা পরিণামে) মিথ্যা।

(ঘ) বন্ধ্যাপুত্র বা শশশৃঙ্গ যেরূপ মিথ্যা, জগৎও তদ্রূপ একটা মিথ্যা ছায়ামাত্র।

এই কয়েকটী ভাবের মধ্যে অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনে 'জগৎ মিথ্যা' এই মতটী কোন্ ভাবে গৃহীত হইয়াছে ?

উত্তর। অদ্বৈতবাদীদিগের ভিতর অনেক শ্রেণী আছে—প্রত্যেকটীই কিন্তু (উপরোক্ত) ঐ সকলের মধ্যে কোন না কোন একটী ভাবে অদ্বৈতবাদ বুঝিয়াছেন। শঙ্কর (গ) ভাবানুযায়ী এই মত শিক্ষা দিয়াছেন। তাঁহার উপদেশ এই—এই জগৎ আমাদের নিকট যে ভাবে প্রতিভাত হইতেছে, তাহা সকলেরই বর্ত্তমান জ্ঞানের পক্ষে ব্যবহারিক ভাবে সত্য. কিন্তু যখনই মানবের জ্ঞান উচ্চ আকার ধারণ করে,তখনই উহা একেবারে অন্তর্হিত হয়। সম্মুখে একটা স্থাণু দেখিয়া আপনার ভূত বলিয়া তাহাকে ভ্রম হইতেছে। সেই সময়ের জন্য সেই ভূতের জ্ঞানটী সত্য ; কারণ, যথার্থ ভূত হইলে উহা আপনার মনে যেরূপ কার্য্য করিত, যে ফল উৎপাদন করিত, ইহাতেও ঠিক সেই ফল হইতেছে। যখনই আপনি বুঝিবেন, উহা স্থাণুমাত্র, তখনই আপনার ভূতজ্ঞান চলিয়া যাইবে। স্থাণু ও ভূত—উভয় জ্ঞান একত্র থাকিতে পারে না। একটী যখন বর্ত্তমান থাকে, তখন অপরটী থাকে না।

প্র। শঙ্করের কতকগুলি গ্রন্থে (খ) ভাবটীও কি গৃহীত হয় নাই?

উ। না। অন্য কোন কোন ব্যক্তি শঙ্করের 'জগৎ মিথ্যা' এই উপদেশটীর মর্ম্ম ঠিক ঠিক ধরিতে না পারিয়া উহাকে লইয়া বাড়াবাড়ি করিয়াছেন; তাঁহারাই তাঁহাদের গ্রন্থে (খ) ভাবটীকে গ্রহণ করিয়াছেন। (ক) ও (খ) ভাবদ্বয় অন্যান্য কয়েক শ্রেণীর অদ্বৈতবাদীর গ্রন্থের বিশেষত্ব বটে, কিন্তু শঙ্কর উহাদের অনুমোদন কখনই করেন নাই।

প্র। এই আপাত-প্রতীয়মান সত্যতার কারণ কি?

উ। স্থাণুতে ভূত-ভ্রান্তির কারণ কি? জগৎ প্রকৃত পক্ষে সর্ব্বদাই একরূপ রহিয়াছে, আপনার মনই ইহাতে নানা অবস্থা-বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিতেছে।

প্র। 'বেদ অনাদি অনন্ত' এ কথার বাস্তবিক তাৎপর্য্য কি? উহা কি বৈদিক মন্ত্ররাজির সম্বন্ধে বুঝিতে হইবে? যদি বেদমন্ত্রে নিহিত সত্যকে লক্ষ্য করিয়াই বেদ অনাদি অনন্ত বলা হইয়া থাকে, তবে ন্যায়, জ্যামিতি, রসায়ন প্রভৃতি শাস্ত্রও অনাদি অনন্ত; কারণ, তাহাদের মধ্যেও ত সনাতন সত্য রহিয়াছে?

উ। এমন এক সময় ছিল, যখন বেদের অন্তর্গত আধ্যাত্মিক সত্যসমূহ অপরিণামী ও সনাতন, কেবল মানবের নিকট অভিব্যক্ত হইয়াছে মাত্র—এই ভাবে বেদসমূহ অনাদি অনন্ত বিবেচিত হইত। পরবর্ত্তী কালে বোধ হয় যেন অর্থের সহিত বৈদিক মন্ত্রগুলিই প্রাধান্য লাভ করিল এবং ঐ মন্ত্রগুলিকেই ঈশ্বরপ্রসূত বলিয়া লোকে বিশ্বাস করিতে লাগিল। আরও পরবর্ত্তী কালে মন্ত্রগুলির অর্থেই প্রকাশ পাইল যে, তাহাদের মধ্যে অনেকগুলি কখন ঈশ্বরপ্রসূত হইতে পারে না, কারণ, ঐগুলি মানবজাতিকে—প্রাণিগণকে যন্ত্রণাদান ইত্যাদি নানাবিধ অশুচি কার্য্যের বিধান দিয়াছে, অপিচ উহাদের মধ্যে অনেক আষাঢে গল্পও দেখিতে পাওয়া যায়। বেদ 'অনাদি অনন্ত' একথার যথার্থ তাৎপর্য্য এই যে, উহা দ্বারা মানবজাতির নিকট যে বিধি বা সত্য প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা নিত্য ও অপরিণামী। ন্যায়, জ্যামিতি, রসায়ন প্রভৃতি শাস্ত্রও মানবজাতির নিকট নিত্য অপরিণামী নিয়ম বা সত্য প্রকাশ করিয়া থাকে, আর সেই অর্থে উহারাও অনাদি অনন্ত। কিন্তু এমন সত্য বা বিধিই নাই, যাহা বেদে নাই; আর আমি আপনাদের সকলকেই আহ্বান করিতেছি যে, উহাতে ব্যাখ্যাত হয় নাই, এমন কি সত্য আছে, দেখাইয়া দিন।

প্র। অদ্বৈতবাদীদের মুক্তির ধারণা কিরূপ? আমার জিজ্ঞাসার উদ্দেশ্য এই তাঁহাদের মতে কি ঐ অবস্থায় জ্ঞান থাকে? অদ্বৈতবাদীদের মুক্তি ও বৌদ্ধ-নির্ব্বাণে কোন প্রভেদ আছে কি?

উ। মুক্তিতে একপ্রকার জ্ঞান থাকে, উহাকে আমরা তুরীয় জ্ঞান বা জ্ঞানাতীত অবস্থা বলিয়া থাকি। উহার সহিত আপনাদের বর্ত্তমান জ্ঞানের প্রভেদ আছে। মুক্তি অবস্থায় কোনরূপ জ্ঞান থাকে না, বলা যুক্তিবিরুদ্ধ। আলোকের মত জ্ঞানেরও তিন অবস্থা—মৃদু জ্ঞান, মধ্যবিধ জ্ঞান ও অধিমাত্র জ্ঞান। যখন—আলোক-পরমাণুর কম্পন অতি প্রবল হয়, তখন উহার ঔজ্জ্বল্য এত অধিক হয় যে, উহা চক্ষুকে ধাঁধিয়া দেয়—আর অতি ক্ষীণতম আলোকেও যেমন কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না, উহাতেও তদ্রূপ কিছুই দেখা যায় না। জ্ঞান সম্বন্ধেও তাহাই। বৌদ্ধেরা যাহাই বলুন না কেন, বৌদ্ধ নির্ব্বাণেও ঐ প্রকার জ্ঞান বিদ্যমান। আমাদের মুক্তির সংজ্ঞা অস্তি-ভাবাত্মক, বৌদ্ধ-নির্ব্বাণের সংজ্ঞা নাস্তিভাবদ্যোতক।

প্র। অবস্থাতীত ব্রহ্ম জগৎসৃষ্টির জন্য অবস্থা-বিশেষ আশ্রয় করেন কেন?

উ। এই প্রশ্নটীই অযৌক্তিক, সম্পূর্ণ ন্যায়শাস্ত্রবিরুদ্ধ। ব্রহ্ম 'অবাঙ্মনসগোচরম্,' অর্থাৎ বাক্যের দ্বারা বা মনের দ্বারা তাঁহাকে ধরিতে পারা যায় না। যাহাই দেশ কাল নিমিত্তের অতীত প্রদেশে অবস্থিত, তাহাকেই মানব-মনের দ্বারা ধারণা করিতে পারা যায় না; আর, দেশকালনিমিত্তের অন্তর্গত রাজ্যেই যুক্তি ও অনুসন্ধানের অধিকার। তাহাই যদি হয়, তবে যে বিষয় মানব-বুদ্ধি দ্বারা ধারণা করিবার কোন সম্ভাবনা নাই, তৎসম্বন্ধে জানিবার ইচ্ছা বৃথা চেষ্টা মাত্র।

প্র। দেখা যায়—অনেকে বলেন, পুরাণগ্রন্থ সকলের আপাতপ্রতীয়মান অর্থের পশ্চাতে গুহ্য অর্থ আছে। তাঁহারা বলেন, ঐ সকল গুহ্য ভাবই পুরাণে রূপকচ্ছলে উপদিষ্ট হইয়াছে। কেহ কেহ আবার বলেন যে, পুরাণের মধ্যে ঐতিহাসিক সত্য কিছুমাত্র নাই—উচ্চতম আদর্শসমূহ বুঝাইবার জন্য পুরাণকার কতকগুলি কাল্পনিক চরিত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন মাত্র। এখন জিজ্ঞাস্য এই, বাস্তবিক কি পুরাণের ঐতিহাসিক সত্যতা কিছু আছে, অথবা সেগুলি কেবল দার্শনিক সত্যসমূহের রূপকভাবে বর্ণনা, অথবা মানবজাতির চরিত্র নিয়মিত করিবার জন্য উচ্চতম আদর্শসমূহেরই

দৃষ্টান্ত, কিম্বা উহারা মিল্টন, হোমর প্রভৃতির কাব্যের ন্যায় উচ্চভাবাত্মক কাব্যমাত্র ?

উ। কিছু না কিছু ঐতিহাসিক সত্য সকল পুরাণেরই মূল ভিত্তি। পুরাণের উদ্দেশ্য—নানাভাবে সেই মহান্ সত্যসম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া। আর যদিও তাহাতে কিছুমাত্র ঐতিহাসিক সত্য না থাকে, তথাপি উহারা যে উচ্চতম সত্যের উপদেশ দিয়া থাকে, সেই হিসাবে আমাদের নিকট খুব উচ্চ প্রামাণ্য গ্রন্থ। দৃষ্টান্তস্বরূপ রামায়ণের কথা ধরুন—অনুল্লঙ্ঘনীয় প্রামাণ্য গ্রন্থস্বরূপে উহাকে মানিতে হইলেই যে রামের ন্যায় কেহ কখন যথার্থ ছিলেন স্বীকার করিতে হইবে, তাহা নহে। রামায়ণ বা মহাভারতের মধ্যে যে ধর্ম্মের মাহাত্ম্য ঘোষিত হইয়াছে, তাহা রাম বা কৃষ্ণের অস্তিত্ব-নাস্তিত্বের উপর নির্ভর করে না ; সুতরাং ইঁহাদের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী হইয়াও রামায়ণ-মহাভারতকে মানবজাতির নিকট উপদিষ্ট মহান্ ভাবসমূহ সম্বন্ধে উচ্চ প্রামাণ্য গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করিতে পারা যায়। আমাদের দর্শন উহার সত্যতার জন্য কোন ব্যক্তিবিশেষের উপর নির্ভর করে না। দেখুন, কৃষ্ণ জগতের সমক্ষে নূতন বা মৌলিক কিছুই শিক্ষা দেন নাই, আর রামায়ণকারও এমন কথা বলেন না যে, আমাদের বেদাদি শাস্ত্রে যাহা আদৌ উপদিষ্ট হয় নাই, এমন কিছু তত্ত্ব তিনি শিখাইতে চান। এইটী বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবেন, খ্রীষ্টধর্ম্ম খ্রীষ্ট ব্যতীত, মুসলমানধর্ম্ম মহম্মদ ব্যতীত এবং বৌদ্ধধর্ম্ম বুদ্ধ ব্যতীত তিষ্ঠিতে পারে না, কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম কোন ব্যক্তিবিশেষের উপর একেবারে নির্ভর করে না। আর, কোন পুরাণে বর্ণিত দার্শনিক সত্য কতদূর প্রামাণ্য, তাহার বিচার করিতে হইলে ঐ পুরাণে বর্ণিত ব্যক্তিগণ বাস্তবিকই ছিলেন, অথবা তাঁহারা কাল্পনিক চরিত্রমাত্র, এ বিচারের কিছুমাত্র আবশ্যকতা নাই। পুরাণের উদ্দেশ্য ছিল মানবজাতির শিক্ষা—আর যে সকল ঋষি ঐ পুরাণসমূহ রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহারা কতকগুলি ঐতিহাসিক চরিত্র লইয়া তাঁহাদের ইচ্ছামত যত কিছু ভাল বা মন্দ গুণ তাহাদের উপর আরোপ করিতেন—তাঁহারা এইরূপে মানবজাতির পরিচালনার জন্য ধর্ম্মবিধান দিয়া গিয়াছেন। রামায়ণে বর্ণিত দশমুখ রাবণের অস্তিত্ব -একটা দশমাথাযুক্ত রাক্ষস অবশ্যই ছিল, ইহা- মানিতেই হইবে, এমন কি কিছু কথা আছে ? দশমুখ বলিয়া কোন ব্যক্তি বাস্তবিকই থাকুন, বা উহা কবিকল্পনাই হউক, রামায়ণের মধ্যে এমন কিছু সত্য আছে, যাহা আমাদের

সবিশেষ প্রণিধানের যোগ্য। আপনি এক্ষণে কৃষ্ণকে আরো মনোহর ভাবে বর্ণনা করিতে পারেন, আপনার বর্ণনা আপনার আদর্শের উচ্চতার উপর নির্ভর করিবে, কিন্তু পুরাণে নিবদ্ধ মহোচ্চ দার্শনিক সত্যসমূহ চিরকালই একরূপ।

প্র। যদি কোন ব্যক্তি adept (সিদ্ধ) হন, তবে কি তাঁহার পক্ষে তাঁহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের ঘটনাসমূহ স্মরণ করা সম্ভব ? পূর্ব্ব জন্মের স্থূল মস্তিষ্ক যাহার মধ্যে তাঁহার পূর্ব্বানুভূতির সংস্কারসমূহ সঞ্চিত ছিল—এক্ষণে তাঁহার আর নাই, এ জন্মে তিনি একটী নূতন মস্তিষ্ক পাইয়াছেন। তাহাই যদি হইল, তবে বর্ত্তমান মস্তিষ্কের পক্ষে অধুনা অবর্ত্তমান অপর যন্ত্রের দ্বারা গৃহীত সংস্কারসমূহকে গ্রহণ করা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ?

স্বামীজি। আপনি adept (সিদ্ধ) বলিতে কি লক্ষ্য করিতেছেন ?

সংবাদদাতা। যিনি নিজের গুহ্য শক্তিসমূহের 'বিকাশ' করিয়াছেন।

স্বামীজি। গুহ্য শক্তি কিরূপে 'বিকাশপ্রাপ্ত' হইবে, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। আপনার ভাব আমি বুঝিতেছি, কিন্তু আমার বিশেষ ইচ্ছা যে, যে সকল শব্দ ব্যবহার করিতে হইবে, সেগুলির অর্থে যেন কোন রূপ অনির্দ্দিষ্ট বা অস্পষ্ট ভাবের ছায়ামাত্র না থাকে। যেখানে যে শব্দটী যথার্থ উপযোগী, সেখানে যেন ঠিক সেই শব্দটী ব্যবহৃত হয়। আপনি বলিতে পারেন, গুহ্য বা অব্যক্ত শক্তি ব্যক্ত বা 'নিরাবরণ হয়। যাঁহাদের অব্যক্ত শক্তি ব্যক্ত হইযাছে, তাঁহারা তাঁহাদের পূর্ব্বজন্মের ঘটনাসমূহ স্মরণ করিতে পারেন, কারণ, মৃত্যুর পর যে সূক্ষ্ম শরীর থাকে, তাহাই তাঁহাদের বর্ত্তমান মস্তিষ্কের বীজস্বরূপ।

প্র। অহিন্দুকে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী করা কি হিন্দুধর্ম্মের মূলভাবের অবিরোধী আর চণ্ডাল যদি দর্শন শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করে,ব্রাহ্মণ কি তাহা শুনিতে পারেন ?

উ। অহিন্দুকে হিন্দু করা হিন্দুধর্ম্ম আপত্তিকর জ্ঞান করেন না। যে কোন ব্যক্তি তিনি শূদ্রই হউন আর চণ্ডালই হউন—ব্রাহ্মণের নিকট পর্য্যন্ত দর্শন শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে পারেন। অতি নীচ ব্যক্তির নিকট হইতেও—তিনি যে কোন জাতি হউন বা যে কোন ধর্ম্মাবলম্বী হউন—সত্য শিক্ষা করা যাইতে পারে।

স্বামীজি তাঁহার এই মতের স্বপক্ষে খুব প্রামাণ্য সংস্কৃত শ্লোক সমূহ উদ্ধৃত করিলেন।

এই স্থানেই কথাবার্ত্তা বন্ধ হইল, কারণ, তাঁহার মন্দির দর্শনে যাইবার নির্দ্ধারিত সময় উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি সুতরাং উপস্থিত ভদ্রলোকগণের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া মন্দির দর্শনে যাত্রা করিলেন।

মহর্ষি ফ্র্যান্সিস্।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর] [শ্রীহরিদাস দত্ত বি, এ।

৪র্থ অধ্যায়।

তাঁহার এক সহোদরও তাঁহাকে বিলক্ষণ উপহাস করিতেন। একদিন শীতকালে প্রভাতে উপাসনা-মন্দিরে দুইজনের সাক্ষাৎ হয়। তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার সেই সহোদর একজন বন্ধুর কাণে কাণে বলিলেন—"ওহে! ফ্র্যান্সিস্‌কে বলত, সে যদি পরিশ্রম করে, তাহা হইলে কিছু উপার্জ্জন করিতে পারে।" এই কথা শুনিতে পাইয়া তিনি কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া বলিলেন—"পরম পিতা পরমেশ্বরের সেবায় আমি আমার সমুদয় পরিশ্রম বিনিয়োগ করিব এবং আমার স্থির বিশ্বাস যে, তাহা হইলেই আমার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লাভ হইবে।"

১২০৮ সালের বসন্তকালে সেণ্ট্ড্যামেনের জীর্ণসংস্কার শেষ হইল। এ কার্য্যের জন্য তিনি যে অদ্ভুত অধ্যবসায় ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তিনি সকলের আদর্শস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিলেন। কায করিবার সময় মাঝে মাঝে গান গাহিয়া এবং ভবিষ্যতে তিনি যাহা করিবেন, সেই সকল বিষয় গল্প করিয়া বলিয়া তিনি সকলকে খুব আনন্দ দিতেন। তিনি বলিতেন যে, এই মন্দিরটীর সংস্কারকার্য্যে যাঁহারা সাহায্য করিয়াছেন এবং যাঁহারা তথায় উপাসনা করিতে আসিবেন, জগদীশ্বরের কৃপায় তাঁহাদের সকলেরই প্রভূত কল্যাণ হইবে। এই বিষয় আলোচনা করিতে করিতে তিনি সময়ে সময়ে ঈশ্বরপ্রেমে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিতেন। পরবর্ত্তী কালে তাঁহার এই সকল কথাবার্ত্তা ও ভাবাবেশের বিষয় স্মরণ করিয়া লোকের মনে হইত যে, সন্ন্যাসিনী ক্ল্যারা * ও তাঁহার পবিত্র কুমারীসঙ্ঘ সম্বন্ধে উল্লেখ করাই তখন তাঁহার অভিপ্রায় ছিল। পূর্ব্বোক্ত অনুষ্ঠানে কৃতকার্য্য হইবার পর তিনি

* ইঁহার বিষয় পরে লিখিত হইবে।

এ্যাসিসির পার্শ্ববর্ত্তী মন্দিরগুলির জীর্ণসংস্কারে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ সকলের অধিকাংশেরই অবস্থা অতিশয় শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে আবার সেণ্ট্ পিটার ও সেণ্ট্ মেরিয়ার অবস্থা এতদূর শোচনীয় হইয়াছিল যে, তাহা দর্শন করিয়া ফ্র্যান্সিস্ অতিশয় ব্যথিত হইয়াছিলেন। প্রথমটী সম্বন্ধে ইহা ভিন্ন অন্য কোন কথা জানিতে পারা যায় না। কিন্তু অপরটী পরে, তৎপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্মান্দোলনের প্রথমাবস্থায় তাঁহার আশ্রয়স্থল হইয়াছিল। বহু রাষ্ট্রবিপ্লব ও ভূমিকম্প হইতে রক্ষা পাইয়া এই উপাসনা-মন্দিরটী এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই মন্দিরটী দেখিয়া মনে হয়, এটী প্রকৃতই শ্রীভগবানের চিহ্নিত স্থান। এরূপ পবিত্র ও ভাবোন্মেষকারী স্থান পৃথিবীতে অতীব বিরল। এটী যথার্থই স্বর্গ ও মর্ত্ত্যভূমির পুণ্য সঙ্গমস্থল। মানবের ত্রিতাপনাশিনী কতই না মহতী চিন্তা তথায় অনুধ্যাত হইয়াছে! মহাত্মা ফ্র্যান্সিসের দেবচরিত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে যাঁহারা ইচ্ছা করেন, এ্যাসিসির বিরাট উপাসনা-মন্দিরে তাঁহাদের যাইবার কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু যখন দৈনিক প্রার্থনাদির অবসান হয়, সূর্য্যাস্তকালে যখন সান্ধ্যছায়াগুলি দীর্ঘাকার ধারণ করে, যে সময় হৃদয়হীন পূজাদির অন্তঃসারশূন্য উপকরণসমূহ নৈশ তমিস্রায় অন্তর্হিত হইয়া যায়, এবং সমগ্র মানবজাতি দূরবর্ত্তী মন্দিরোত্থিত মঙ্গলারতিধ্বনি শ্রবণ করিয়া সমাহিতচিত্তে অবস্থান করিতে থাকে, সে সময় সেণ্ট্ মেরিয়া অভিমুখে যাত্রা করিলেই তাঁহাদের এ উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে। এই শান্তিময় স্থানেই ফ্র্যান্সিস্ সন্ন্যাসের কঠোর নিয়ম পালন ও ভগবদারাধনায় জীবন অতিবাহিত করিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। ক্ষুদ্র উপাসনা-মন্দিরটী যাহাতে একেবারে নষ্ট হইয়া না যায়, সেই অভিপ্রায়ে একজন পুরোহিতকে তথায় নিযুক্ত করিয়া যথাবিধি পূজাদির বন্দোবস্ত করাও তাঁহার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তাঁহার এই ইচ্ছা কত দূর কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল, তাহা বলিতে পারি না।

ভবিষ্যতে তিনি যে একজন মহাশক্তিশালী ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক হইয়া উঠিবেন অদ্যাবধি তিনি স্বয়ং তাহার কিছুমাত্র আভাস পান নাই। তাঁহার চরিত্রের একটী প্রধান বিশেষত্ব এই ছিল যে, তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন কোন না কোন সৎকর্ম্মে তিনি নিযুক্ত ছিলেন এবং এতদূর আগ্রহ ও দৃঢ় অধ্যবসায়ের সহিত নিজ অধ্যাত্ম উন্নতি বিধানে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার সমগ্র জীবনে একদিনের জন্যও তাঁহাকে এ বিষয়ে অনবহিত

দেখিতে পাওয়া যায় নাই! এবং সেজন্য তাঁহার উন্নতিও চিরদিনের জন্য অপ্রতিহত হইয়াছিল। একমাত্র মহর্ষি পলের সহিতই তাঁহার এ বিষয়ে সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার এই উন্নতির ইচ্ছা সম্পূর্ণভাবে আন্তরিক ছিল বলিয়াই লোকে উহা দেখিয়া এত বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়া পড়িত। Portiuncula'র জীর্ণসংস্কারে প্রবৃত্ত হইবার কালে তিনি অধিকাংশ সময় সাধন-ভজনে অতিবাহিত করিতেন বলিয়া ঐ বিষয়ে তাঁহার আগ্রহ বাহিরে প্রকাশ পাইত না, কিন্তু যেমন এই সংস্কারকার্য্য শেষ হইল, অমনি কর্ম্ম করিবার ইচ্ছা তাঁহার হৃদয়ে পুনরায় বলবতী হইয়া উঠিল। তাঁহার ধারণাই ছিল যে, যাঁহারা কোনরূপ পরহিতকর কার্য্য না করিয়া কেবলমাত্র আত্মোন্নতি সাধনে চেষ্টা করেন, তাঁহারা অতিশয় স্বার্থপর। ঐরূপে দিনাতিপাত করিয়া তিনি হৃদয়ে তৃপ্তিলাভও করিতে পারিতেন না এবং সেজন্য কেবল মাত্র সাধন-ভজন লইয়াই তিনি এককালে বহুদিন থাকিতে পারেন নাই। এই সময় তাঁহার অবস্থা এত সুন্দর হইয়াছিল যে, যখনই তিনি ক্রুশবিদ্ধ ঈশার অমিয়-মূর্ত্তিখানি স্মরণ করিতেন, তখনই তাঁহার অন্তর ভক্তি ও প্রেমে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত এবং তাঁহার চক্ষের জলে বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইত। কিন্তু ঐরূপ হইবার কারণ তিনি তখন কিছুই বুঝিতে পারিতেন না। পূর্ব্বোক্ত সংস্কারকার্য্য শেষ হইলে দিবসের অধিকাংশ সময়ই তিনি ধ্যান ও ধারণায় অতিবাহিত করিতেন। এই সময় সুবাসিও-শৈলস্থিত মঠ হইতে মহাত্মা বেনিডিক্ট-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মমতাবলম্বী একজন সাধু মধ্যে মধ্যে আসিয়া স্যাণ্টা মেরিয়াতে পূজাদি করিয়া যাইতেন। ফ্র্যান্‌সিসের জীবনে এই সময়টী অতি আনন্দে কাটিয়াছিল। অধ্যাত্ম উন্নতির জন্য তাঁহার এই সময়কার প্রবল আগ্রহ এবং প্রগাঢ় বিশ্বাসের কথা স্মরণ করিলে স্তম্ভিত হইতে হয়।

১২০৯ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারি তারিখে মহাত্মা Mathias'এর জন্মতিথি উপলক্ষে স্যাণ্টা মেরিয়াতে পূজানুষ্ঠান হইতেছিল। সে সময় ফ্র্যান্‌সিস্‌ তথায় উপস্থিত ছিলেন। পুরোহিত যখন তাঁহার দিকে ফিরিয়া ধর্ম্মপুস্তক হইতে ঈশার উপদেশ পাঠ করিতে লাগিলেন, তখন তিনি একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহার হৃদয় এক অপূর্ব্ব মহাভাবে আন্দোলিত হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ পরে তিনি পুরোহিতকে আর বেদীর উপর দেখিতে পাইলেন না!—দেখিলেন, তৎপরিবর্ত্তে তথায় সেণ্ট ড্যামেনের ক্রুশবিদ্ধ ঈশা দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন!—এবং সপ্রেম-নয়নে তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিতেছেন ঃ—

"ফ্র্যান্‌সিস্! যেখানে যাহার সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইবে, সকলকেই বলিও যে, স্বর্গরাজ্যে প্রবেশলাভ করিবার সময় আসন্নপ্রায়! রুগ্ন লোক দেখিলেই তাহাকে রোগ হইতে মুক্ত করিয়া দিও; কুষ্ঠরোগী দেখিলে তাহাদের ক্ষতস্থান পরিষ্কার করিয়া দিও; এবং যদি দেখ যে, কাহাকেও ভূতে পাইয়াছে এবং সেজন্য সে অতিশয় কষ্ট পাইতেছে, তাহা হইলে ভূত ছাড়াইয়া দিও। অহেতুক-কৃপালাভে তুমি নিজে ধন্য হইয়াছ, অতএব সাধ্যমত লোকের সেবা ও উপকার করিতে কৃপণতা করিও না। মন হইতে সঞ্চয়বুদ্ধি একেবারে সমূলে উৎপাটিত করিয়া ফেল। এ কথা স্মরণ রাখিও, পরিশ্রম করিলেই, শরীর রক্ষার্থ যাহা কিছু প্রয়োজন, তাহার কিছুরই অভাব হইবে না।"

এই কথাগুলি ফ্র্যান্‌সিসের দৈববাণী বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। ইহার প্রভাবে তাঁহার চিন্তাপূর্ণ অবসন্ন প্রাণে আশার সঞ্চার হইল—তিনি শান্তিলাভ করিলেন। তিনি বলিয়া উঠিলেন—"এতদিন ধরিয়া শ্রীভগবানের এই আদেশবাণীই আমি আগ্রহসহকারে প্রতীক্ষা করিতেছিলাম; করুণাময়ের কৃপায় আজ আমার সে বাসনা পূর্ণ হইল। আজ হইতে এই আদেশবাণী আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতে চেষ্টা করিব।" সেই মুহূর্ত্তেই তিনি লাঠি, জুতা, কাগজ, টাকাকড়ি—যাহা কিছু নিকটে ছিল সমুদায় দ্রব্য দূরে নিক্ষেপ করিলেন। এই আদেশবাণীর শক্তি তিনি তদবধি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতে লাগিলেন। স্যাণ্টা মেরিয়ার সামান্য বেদীর সম্মুখে দারিদ্র্য, স্বার্থপরিহার ও প্রেমের যে আদর্শ তিনি অদ্য দেখিতে পাইলেন তাহার শক্তিতে শক্তিমান্ হইয়াই তিনি তৎকালিক সর্ব্ববিধ পাপাচরণের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে এবং বীরহৃদয় সাধু পুরুষদিগকে এই অধ্যাত্ম সংগ্রাম প্রকৃত অধিনেতার ন্যায় যথার্থ ভাবে পরিচালনা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

পূর্ব্বভাগ।

অন্তঃ সংগ্রাম ও জয় লাভ ১২০৬—১২০৯ খৃঃ অব্দ।

এ্যাসিসের ন্যায় ক্ষুদ্র নগরেও যে সে সময়ে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় আলোচনা ও আন্দোলন প্রবল ভাবে চলিতেছিল তাহা মহাত্মা ফ্র্যান্‌সিসের জীবনপাঠে

* চতুর্থ অধ্যায়ের শেষ ভাগটী ভ্রমক্রমে ইতি পূর্ব্বে উদ্বোধনে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে পাঠকের নিকট সেজন্য আমরা দোষ স্বীকার করিতেছি। উ—সং।

একটী ঘটনা হইতে জানিতে পারা যায়। সাধারণের অপরিচিত এক ব্যক্তি ঐ সময়ে পথে যাঁহাকেই সম্মুখে দেখিতেন, তাঁহারই কর্ণে "আনন্দ ও শান্তি" এই কথা দুইটী উচ্চারণ করিয়া বেড়াইতেছিলেন। বাগ্‌বিতণ্ডা করিয়াই যাঁহারা চিরজীবন অতিবাহিত করিতে প্রস্তুত ছিলেন না, অথবা মানব-হৃদয় হইতে ধর্ম্মবিশ্বাস ও প্রেম চিরকালের জন্য বিলুপ্ত হউক, এরূপ যাঁহাদের ইচ্ছা ছিল না, তাঁহাদের প্রত্যেকের হৃদয়েই ঐকালে অশান্তি বিরাজিত, এ বিষয় জানিতে পারিয়াই এই অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তি ঐ ভাবে উহা প্রকাশ করিতেছিলেন এবং তাঁহার সরল ও সহজ ভাষায় প্রকাশিত ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধীয় ঐ দুইটী কথা ঐ কালের সমগ্র ইউরোপবাসীর পৌরোহিত্য প্রপীড়িত মনের ভয় ও ভরসা-সূচক প্রতিধ্বনিস্বরূপে প্রতীয়মান হইতে-ছিল। এ কথা শুনিয়া কেহ হয়ত বলিবেন উহা অরণ্যে রোদনের ন্যায়—উহাতে নিশ্চয়ই কোন ফল হয় নাই; কিন্তু তাহা নহে। কারণ, হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে যে ধ্বনি স্বতঃ উত্থিত হয়, তাহা অরণ্যরোদন হইলেও কোন না কোন স্থানে নিজ নিদর্শন স্থায়ী ও অভ্রান্ত ভাবে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়া যায়। পূর্ব্বোক্ত অপরিচিত ব্যক্তির সামান্য ঐ দুইটি কথা মহাত্মা ফ্র্যান্-সিসের হৃদয়-কন্দরে যে সমভাবের প্রতিধ্বনি উত্থাপন করে নাই, এবং তিনি যে উহাকে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াই আহ্বানস্বরূপে গ্রহণ করেন নাই, সে কথা কে বলিতে পারে? স্পোলেটো হইতে অপ্রত্যাশিত ভাবে প্রত্যাগমনের পর হইতে পিতৃভবনে অবস্থান তাঁহার পক্ষে দিন দিন দুরূহ হইয়া উঠিতেছিল। ঐ ঘটনায় তাঁহার পিতার আত্মাভিমানে প্রবল আঘাত লাগিয়াছিল এবং উহাতে তিনি এতদূর ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন যে, তাঁহার পক্ষে উহা বিস্মৃত হওয়া এক প্রকার অসম্ভব হইয়াছিল। পুত্রকে সম্ভ্রান্ত-বংশীয় যুবকবৃন্দের সহিত সম পদবীতে আরূঢ় করিয়া রাখিবার জন্য তাঁহার উচ্ছৃঙ্খলতার আনুকূল্যে তিনি মুক্তহস্তে অর্থব্যয় করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করিতেন না। কিন্তু পথে দরিদ্র দেখিলেই পুত্র যে অযাচিত হইয়াও প্রচুর পরিমাণে দান করিবেন, ইহা তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। এখন হইতে ফ্র্যান্সিস্ সদা সর্ব্বদা গভীর চিন্তায় মগ্ন থাকিতেন এবং নিঃসঙ্গ হইয়া মাঠে মাঠে বেড়াইয়া বেড়াইতেন। এজন্য তাঁহার দ্বারা পিতার কোন কার্য্যে আর কিছুমাত্র সাহায্য হইত না। এই সকল কারণে যতই দিন যাইতে লাগিল, পিতা-পুত্রে মনোমালিন্য ততই ঘনীভূত হইয়া উঠিতে

লাগিল ; এবং সরল-হৃদয়া ও স্নেহময়ী পিতা পতি-পুত্রের বিচ্ছেদ অনিবার্য্য ও আসন্ন বুঝিয়াও উহা নিবারণ করিতে অণুমাত্র সমর্থা হ'ন নাই। যে গৃহে তিনি এখন ভালবাসার পরিবর্ত্তে ভর্ৎসনা ও বিষাদ ভিন্ন অন্য কিছুই পাইতে-ছিলেন না, ফ্র্যান্সিসের তথা হইতে যত শীঘ্র সম্ভব পলায়ন করিবারই ইচ্ছা প্রবল হইতেছিল। পূর্ব্বে জীবনসংগ্রামে যিনি তাঁহার বিশ্বস্ত সহচর ছিলেন, কোনও কারণে বাধ্য হইয়া তিনিও এই সময় তাঁহার সঙ্গ ত্যাগ করায় এই নিরবচ্ছিন্ন নির্জ্জনতা তাঁহার ন্যায় প্রেমিক ও হৃদয়বান সাধকের পক্ষে অতিশয় ক্লেশকর হইয়া উঠিয়াছিল। এ অবস্থা হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য তিনি সাধ্যমত চেষ্টা করিতেন, কিন্তু তাঁহার প্রকৃত ভাব বুঝিতে না পারায় কাহারও নিকট হইতে তিনি সহানুভূতি পাইতেন না ; যাঁহাদের নিকটেই তিনি নিজ মনোগত ভাব প্রকাশ করিয়া বলিতেন, তাঁহারাই তাঁহাকে তখন উপহাস করিতেন। প্রকৃত উন্মত্ত অথবা আসন্ন-উন্মাদ মনে করিয়া তাঁহার প্রতি তাহাদের ঈদৃশ আচরণ তাঁহারা কোনরূপ দোষাবহ বলিয়া মনে করিতেন না। প্রধান ধর্ম্মযাজকের নিকটেও তিনি নিজ মনোগত ভাব প্রকাশ করিযা বলিয়াছিলেন , কিন্তু তিনিও, অসম্বদ্ধ ভাবে প্রকাশিত হওযায় তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিযা উঠিতে পারেন নাই। তাঁহার নিকট ফ্র্যান্সিসের ঐ ভাব কার্য্যে পরিণত হওযা অসম্ভব বলিযাই মনে হইত। আবার উহা প্রচলিত নিয়মাবলীর বিরুদ্ধভাবাপন্ন বলিয়াও লোকের ধারণা হইত। এই সকল কারণে মনুষ্যের নিকট হইতে কোনরূপ আশা করা যুক্তিসঙ্গত নহে—ফ্র্যান্সিসের এরূপ জ্ঞান জন্মে ও বাধ্য হইয়া তিনি সে আশা ত্যাগ করেন এবং প্রার্থনা দ্বারা নিজ উন্নতি সাধনে ও ভগবৎসম্বন্ধীয় জ্ঞান-লাভে যত্নবান্ হ'ন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে তিনি সকলেরই সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হইয়া পড়িতেছিলেন। কিন্তু তাঁহার অন্তর্নিহিত শক্তি অদম্য অনি-বার্য্য ভাবে নিজ অস্তিত্ব প্রকাশ করিবার জন্য অবসর প্রতীক্ষা করিতেছিল।

এ্যাসিসির অন্তর্গত যে সমুদয় উপাসনা-মন্দির ছিল, উহাদের মধ্যে সেণ্ট্ড্যামেনের উপাসনা-মন্দিরটীই তাঁহার অতিশয় প্রিয় ছিল। তাঁহার বাসস্থান হইতে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই পদব্রজে তথায় যাওয়া যাইত। মন্দিরাভিমুখী পথটী প্রস্তরময় ছিল বলিযা লোকের গমনাগমনে যেরূপ পথচিহ্ন পড়িয়া থাকে, তাহাও ঐ মন্দিরে যাইবার পথে দেখা যাইত না। পথটী জলপাই বৃক্ষাবলীর দ্বারা সমাচ্ছন্ন এবং নানাবিধ সুগন্ধে সুরভিত

ছিল। একটী অত্যুচ্চ শৈলশিখরে সংস্থিত ছিল বলিয়া মন্দির হইতে দেব-দারু ও অন্যান্য বৃক্ষাবলীর অন্তরাল দিয়া নিম্নস্থিত সমুদয় সমতল ভূভাগ দেখিতে পাওয়া যাইত। মনে হইত, যেন তরুরাজি এই আড়ম্বরশূন্য মন্দিরটীকে পার্থিব দৃশ্যের অন্তরালে রাখিবার জন্য যত্নবান্ রহিয়াছে। একজন দরিদ্র পুরোহিতের হস্তে উহার ভার ছিল। তাঁহার অবস্থা এতদূর মন্দ ছিল যে, অতি কষ্টে তিনি নিজ আহারীয় মাত্র সংগ্রহ করিতে পারিতেন। *এজন্য* মন্দিরটী ভগ্নাবস্থায় পড়িয়া ছিল। মন্দিরের মধ্যে একটী পাকা গাঁথনির বেদী ভিন্ন অপর কিছুই ছিল না এবং বেদীর পশ্চাদ্ভাগে ভগবদবতার ঈশার ক্রুশবিদ্ধ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। ক্রুশবিদ্ধ ঈশার মূর্ত্তিসকলে ক্ষতস্থান হইতে রুধির-ধারা নির্গত হইতেছে, সচরাচর এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। পিতৃগতপ্রাণ মহাভাববিভাবিত প্রেমিকপ্রবর ঈশার ঈদৃশ মূর্ত্তি দর্শনে দর্শকের মন স্বভাবতঃই দুঃখ ও অব-সাদে অভিভূত হইয়া পড়ে। কিন্তু সেণ্ট ড্যামেনের ঈশামূর্ত্তির প্রশান্ত ও সৌম্য ভাব বর্ণনাতীত! উহাতে মহাযোগী ঈশার নয়নযুগল দুঃখভারে নিমীলিত ছিল না। সে আনত নেত্রে পবিত্র আত্মবিস্মৃতির মহাভাবই অঙ্কিত ছিল। তাঁহার নেত্রদ্বয়ের সে ধীর ও প্রশান্ত ভাব দেখিয়া মনে হইত, যেন তিনি স্পষ্টই বলিতেছেন—"হে দুঃখদগ্ধ জীব! আমার শরণাপন্ন হও।" এই মূর্ত্তির সম্মুখে দাঁড়াইয়া ফ্র্যান্সিস্ একদিন এইভাবে উপাসনা করিতে-ছিলেন—"হে মহান্ ও মহিমাময় প্রভু ঈশা! আপনার অমিত স্বর্গীয় আভা দ্বারা আমার হৃদয়-নিহিত অজ্ঞান-তিমির দূর করিয়া দিন। ভববন্ধন-খণ্ডনকারী দিব্য মূর্ত্তিতে আপনি আমার নয়ন-সম্মুখে আবির্ভূত হউন, এবং যাহাতে আমি সমস্ত কর্ম্ম ভবদায় পবিত্র ইচ্ছানুযায়ী সম্পন্ন করিতে সমর্থ হই, আমাকে এইরূপ শক্তি প্রদান করুন।" অন্তরের সহিত মনে মনে এইভাবে প্রার্থনা করিবার পরেই তাঁহার বোধ হইল, যেন তিনি ঈশার মূর্ত্তি হইতে নিজ দৃষ্টি ফিরাইয়া লইতে পারিতেছেন না। তাঁহার বোধ হইতে লাগিল, যেন তাঁহার অন্তরে ও বাহিরে এক অলৌকিক ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে। পূত-হৃদয় ফ্র্যান্সিসের এই ঘটনায় অন্তরে জীবনীশক্তি সঞ্চারিত হইল এবং বাহ্য-নীরবতার মধ্যে তিনি এক মৃদু-মধুর-ধ্বনি শুনিতে পাইলেন!—সে ধ্বনি তাঁহার হৃদয়ের অন্তস্তল অবধি স্পর্শ করিল, এবং উহার ভাষা ও ভাব চির-দিনের জন্য তথায় অঙ্কিত হইয়া রহিল! ঈশা তাঁহার ভক্তের উপহার গ্রহণ

করিলেন. এবং তাঁহার ইচ্ছা ও কৃপায় নিঃসঙ্গ ফ্র্যান্‌সিসের হৃদয়, তনু ও মন অনির্ব্বচনীয় স্বর্গীয় জ্যোতিঃ ও শক্তিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। এই অপার্থিব ঘটনা তাঁহার জীবনের ভাবী সার্থকতার চরম নিদর্শন। ঈশার সহিত তাঁহার একীভাব পূর্ণতা লাভ করিল। "তিনি আমার, আমি তাঁর" এই নিগূঢ় রহস্যময় বাণী এখন হইতে তিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের মহাপুরুষদের সহিত সমভাবে উচ্চারণ করিবার সামর্থ্য লাভ করিলেন। তিনি ধ্যানানন্দে নিমগ্ন না হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন "ঈশা আমার প্রতি অদ্য যে অহেতুক করুণা ও প্রেমের পরিচয় প্রদান করিলেন এবং যে জীবনী-শক্তিতে অদ্য আমাকে শক্তিমান্ করিলেন, কি উপায়ে আমি তাহার অনুরূপ প্রতিদান দিব ?" ঐ প্রশ্নের উত্তরলাভের জন্য তাঁহাকে অধিকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হয় নাই। যে উপাসনামন্দিরে তাঁহার অধ্যাত্ম জীবনের এইরূপে প্রথমোন্মেষ হইল, তিনি দেখিলেন, সেটী ভগ্নাবস্থায় পতিত ! ভাবিলেন, উহার জীর্ণ-সংস্কার-সাধনই তাঁহার প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য। ঐ দিবস হইতে ক্রুশবিদ্ধ ঈশার স্মৃতি ও যে প্রেম-মাহাত্ম্যে তাঁহার উদ্ধার সাধন হইল, সেই দুইটী বিষয়ই তাঁহার ধর্ম্মজীবন ও অন্তরাত্মার প্রধান অবলম্বনস্বরূপ হইয়াছিল। জীবনে এই প্রথম তিনি ঈশার সহিত প্রত্যক্ষ ও নিগূঢ় সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইলেন। তাঁহার বিশ্বাস ক্রমে শ্রদ্ধায় পরিণত হইল। এখন হইতে তিনি ক্রুশবিদ্ধ ঈশার প্রতি দীর্ঘকাল ধরিয়া শান্ত তন্ময় চিত্তে এবং নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া থাকিতেন। সাধারণ দৃষ্টি হইতে সে দৃষ্টির কতই না পার্থক্য ! প্রথমটী দৃশ্য পদার্থকে কেবলমাত্র দর্শনেন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রহণ করিয়াই ক্ষান্ত থাকে ; অপরটী বালসুলভ সরলতা ও অকৃত্রিমতায় পরিপূর্ণ ! উহাতে বিচারশক্তির কোনরূপ সম্বন্ধই নাই ; উহা যেন হৃদয়ের—প্রাণের শক্তিতে অনুস্যূত ! অথবা ঐ দৃষ্টিতে দৃশ্য পদার্থ বিশ্লেষণের কোনরূপ প্রয়াস নাই ; উহাতে দর্শনেন্দ্রিয়ের সাহায্যে দৃষ্ট পদার্থকে অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে কেবলমাত্র পূর্ণভাবে ধারণ ও আরাধ্যরূপে ঈশার প্রতি তাঁহার সপ্রেম দৃষ্টি এবং ঐরূপ অলৌকিক সম্ভাষণ ক্রমে অবিরাম ও অপ্রতিহত ভাব ধারণ করিয়াছিল। সেণ্ট ড্যামেনের উপাসনা-মন্দিরে ফ্র্যান্‌সিসের পবিত্র জীবনের বাহ্য বিকাশ নূতন ভাবে অনুরঞ্জিত হইয়াছিল এবং তাঁহার অন্তরাত্মা ঐশীভাবে তন্ময়তা প্রাপ্ত হইয়াছিল।

এই সময় হইতে তাঁহার জীবনপথ সর্ব্বতোভাবে সন্দেহ ও সংশয় মুক্ত

হইল। উপাসনা-মন্দির হইতে বাহির হইয়া, তাঁহার নিকট যাহা কিছু অর্থ ছিল তৎসমুদয় তিনি পুরোহিতের হস্তে অর্পণ করিলেন এবং বলিলেন একটী দীপ যেন তথায় প্রতিনিয়ত প্রজ্বলিত থাকে। পরে অতিশয় আনন্দিত চিত্তে এ্যাসিসিনগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। যাহা কিছু তাঁহাকে এখনও অতীতের সহিত সম্বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে সেই সমুদয় বন্ধন ছিন্ন করিয়া তিনি এইবার পিতৃ গৃহ পরিত্যাগ করিবেন এবং উপাসনা-মন্দিরের জীর্ণ-সংস্কারের ভার গ্রহণ করিবেন এইরূপ সংকল্প করিলেন। তাঁহার একটী অশ্ব ও নানা-বর্ণের কতকগুলি পরিচ্ছদ ছিল। বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি সে সমুদয় একত্র করিয়া বাঁধিলেন এবং অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক ফলিনো (Foligno) সহরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এখনকার স্থায় তখনও সহরটী প্রসিদ্ধ এবং স্থানীয় ব্যাপারস্থল রূপে পরিগণিত ছিল। উহার মেলায় আম্ব্রিয়া ও সেবাইন প্রদেশের প্রায় সমুদয় অধিবাসীই যোগদান করিত। ফ্র্যান্সিসের পিতা পূর্ব্বে ব্যবসায় সূত্রে তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া প্রায়ই এখানে আগমন করিতেন। এখানে অনেকের সহিত তাঁহার ঐরূপে পরিচয় ছিল বলিয়া তিনি পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যজাত অতি শীঘ্রই বিক্রয় করিতে পারিয়াছিলেন। এইরূপে অশ্বটী পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া মহা হৃষ্ট চিত্তে তিনি এ্যাসিসি অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ইহা তাঁহার জীবনে অপর একটী প্রসিদ্ধ ঘটনা। কারণ এই ঘটনায় অতীতের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হয় এবং ঐ দিবস হইতে তাঁহার জীবন সম্পূর্ণভাবে বিপরীত পথে ধাবিত হয়। ঈশা যেমন পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়া কৃপা বিতরণে তাহাকে ধন্য করিয়াছিলেন তিনিও তেমনি এইরূপে অসঙ্কোচ ভাবে তাঁহার নিকট আত্ম সমর্পণ করিলেন! উপাসক উপাস্যের অনুরূপ হইয়া দাঁড়াইল। অনিশ্চয়তা, অশান্তি অন্ত-র্বেদনা, কোন অজ্ঞাত শুভের উদ্দেশ্যে হৃদয় মধ্যে আকাঙ্ক্ষা পরিপোষণ, তীব্র অনুতাপ প্রভৃতির পরিবর্ত্তে তাঁহার অন্তরে এখন মধুময় শান্তির উদয় হইল! জননীর দর্শন লাভে পথভ্রান্ত বালকের যেমন মুহূর্ত্তমধ্যে সকল কষ্টের অবসান হয় এবং সে পরমানন্দ লাভ করে এখন হইতে তাঁহারও তেমনই অবস্থা হইয়াছিল।

ফলিনো হইতে তিনি বরাবর সেণ্ট ড্যামেনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আসিবার কালে সহরের মধ্য দিয়া আসা তিনি প্রয়োজনীয় বিবেচনা করেন নাই। এখন তিনি নিজ অভিপ্রায় কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য ব্যস্ত

হইয়া উঠিলেন। ফ্র্যান্‌সিস যখন নিজ দ্রব্যবিক্রয়লব্ধ সমুদয় অর্থ দরিদ্র পুরোহিতের হস্তে অর্পণ করিলেন তখন পুরোহিত তাহার ঐ কার্য্যে নিতান্ত বিস্মিত হইলেন। তিনি ভাবিলেন বোধ হয় পিতা পুত্রে কোনরূপ মনোমালিন্য ঘটিয়া থাকিবে। এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি দান গ্রহণে অস্বীকার করিলেন। কিন্তু তাঁহার নিকট থাকিবার জন্য ফ্র্যান্‌সিস্ এতদূর আগ্রহ প্রকাশ করিলেন যে তিনি তাঁহাকে তথায় বাস করিবার জন্য অনুমতি না দিয়া থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার নিকট যাহা কিছু অর্থ ছিল তাহাতে তাঁহার আর কোনরূপ প্রয়োজন না থাকায় অকিঞ্চিৎকর জ্ঞানে ফ্র্যান্‌সিস্ উহা জানালার নিকটে ফেলিয়া রাখিলেন। এদিকে পুত্রের গৃহ প্রত্যাগমনে বিলম্ব দেখিয়া বারনারডন্ অস্থির হইয়া উঠিলেন এবং চারিধারে অনুসন্ধানের পর শীঘ্রই জানিতে পারিলেন যে ফ্র্যান্‌সিস্ সেণ্ট ড্যামেনে আছেন। এই সংবাদ লাভ করিবার পরই তিনি জানিতে পারিলেন যে তিনি পুত্রকে হারাইয়াছেন। অগত্যা পুত্রকে গৃহে ফিরাইয়া আনিবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিতে দৃঢ়-সঙ্কল্প হইয়া জনকতক প্রতিবেশীর সহিত তিনি পূর্ব্বোক্ত মঠাভিমুখে ক্রুদ্ধচিত্তে সত্বর যাত্রা করিলেন। প্রয়োজন হইলে পুত্রকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য বলপ্রয়োগ করিতেও তিনি এখন প্রস্তুত ছিলেন। পিতার উগ্রপ্রকৃতি ফ্র্যান্‌সিস্ জানিতেন। পিতার অনুচরবর্গের কলরব শুনিবামাত্র তিনি শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন এবং দ্রুতপদে একটী নিভৃত স্থানে যাইয়া লুকাইয়া রহিলেন। আকস্মিক বিপদের আশঙ্কা করিয়া পূর্ব্ব হইতেই তিনি এই স্থানটী ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন। বারনারডন্ তন্ন তন্ন করিয়া সমুদয় স্থান অন্বেষণ করিয়াও পুত্রকে না পাইয়া বিফলমনোরথ হইয়া নিজগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। ঐ নিভৃত স্থানেই ফ্র্যান্‌সিস্‌কে কিছুকাল থাকিতে হইয়াছিল। ঐ সময়টা তিনি অশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে উপাস্যের নিকট নিজ গভীর হৃদয় বেদনা জ্ঞাপন করিয়া এবং যে পথ অবলম্বন করা তাঁহার পক্ষে প্রশস্ত তাহা দেখাইয়া দিবার জন্য তাঁহার নিকট কাতর কণ্ঠে প্রার্থনা করিয়া অতিবাহিত করিয়াছিলেন। পিতৃ অত্যাচারের আশঙ্কা সত্বেও তিনি এইরূপ হৃদয়ে অসীম আনন্দ অনুভব করিয়া ছিলেন এবং কিছুতেই গৃহে পুনরায় প্রত্যাগমন করিতে অভিলাষী হন নাই। কিন্তু এই ভাবে নিভৃতবাস তাঁহার পক্ষে অধিক দিন সম্ভবপর হয় নাই। তিনি মনে মনে ভাবিলেন—বীরহৃদয়

ঈশানুচরের মধ্যে যিনি আপনাকে পরিগণিত করিতে অগ্রসর তাঁহার পক্ষে ঈদৃশ আচরণ কিছুতেই শোভা পায় না। এই রূপ চিন্তা করিবার পরেই একদিন তিনি সাহসে ভর করিয়া পিতার সম্মুখে নিজ দৃঢ় সঙ্কল্প প্রকাশ করিবার অভিপ্রায়ে সহর-মধ্যে গমন করিলেন। গত কয় সপ্তাহ ধরিয়া নির্জ্জন বাস ও মনঃকষ্টের জন্য তাঁহার আকৃতিতে যে বিষম পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছিল তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। মলিন, শ্রীহীন মূর্ত্তিতে এবং ছিন্ন বেশে যখন তিনি গ্রামের বালককুলের ক্রীড়াস্থল বর্ত্তমান (Piazza nuova) নামক স্থানে উপনীত হইলেন তখন বালকেরা তাঁহাকে দেখিয়া ক্রীড়া ত্যাগ করিয়া "পাগল, পাগল" বলিয়া চিৎকার করিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিল। প্রবাদ আছে একজন পাগলে বহু লোককে পাগল করিয়া তুলে। বিশেষতঃ ইটালিতে পাগলকে দেখিয়া পথে বালকেরা কিরূপ উন্মত্তবৎ আচরণ করিয়া থাকে তাহা যিনি নিজ চক্ষে না দেখিয়াছেন তিনি কখন ধারণা করিতে পারিবেন না। "পাগল পাগল" এই কথাটী উচ্চারিত হইবামাত্র বালকেরা ভীষণ চিৎকার করিতে করিতে নিজ নিজ বাটী হইতে পথে বাহির হইয়া পড়ে এবং তাহাদের পিতা মাতারা জানালা হইতে তামাসা দেখিতে থাকেন। বালকেরা ঐ পাগলকে ঘিরিয়া নৃত্য, গীত ও চিৎকার করিতে থাকে এবং তাহার গাত্রে প্রস্তর ও মৃত্তিকা নিক্ষেপ এবং তাহার চক্ষে কাপড় বাঁধিয়া দেয়। যদি সে উহাতে রাগিয়া উঠে তাহা হইলে তাহারা আবার দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত তাহার উপর ঐ রূপ উপদ্রব আরম্ভ করে। উপদ্রবের তাড়নায় কাঁদিয়া ফেলিলে অথবা দীনভাবে কৃপা ভিক্ষা করিলেও তাহার নিষ্কৃতি নাই। তখনও তাহারা উহার ক্রন্দন, দীর্ঘশ্বাস, ও অনুনয়াদির অনুকরণ করিয়া নির্ম্মমভাবে তাহাকে উত্যক্ত করে। সে যাহা হউক পথে বালকদের ঐরূপ গোলমাল শ্রবণ করিয়া বার্নার্ডন্ তামাসা দেখিবার অভিপ্রায়ে বাটীর বাহিরে আসিবামাত্র হঠাৎ তাহাদের কলরবের মধ্যে নিজের ও পুত্রের নাম শুনিতে পাইলেন এবং ফ্র্যান্সিস্‌কে তদবস্থায় দেখিয়া অতিশয় লজ্জিত ও ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি সবেগে পুত্রের নিকট গমন করিয়া ঘাড় ধরিয়া তাহাকে বাটীর মধ্যে লইয়া গেলেন এবং অর্দ্ধ মৃতাবস্থায় তাহাকে একটী ক্ষুদ্র অন্ধকার গৃহে পুরিয়া আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। তৎপরে ভয় প্রদর্শন, নির্ম্মম আচরণ প্রভৃতি নানা উপায়ে পুত্রকে তদীয় সঙ্কল্প পরিত্যাগ করাইতে তিনি

বিশেষ চেষ্টা করিলেন কিন্তু কোনই ফল হইল না। পরিশেষে বিরক্ত হইয়া তিনি তাহাকে বাঁধিয়া এক জায়গায় ফেলিয়া রাখিয়া তাহার উপর আর অধিক অত্যাচার করিলেন না। উহার কিছুদিন পরে বার্ণার্ডনকে কার্য্যানুরোধে অল্পকালের জন্য অন্যত্র যাইতে হইল। পুত্রের প্রতি পিতার অসন্তোষের কারণ ফ্র্যান্‌সিস্‌জননী পিকা ভালরূপই জানিতেন। তাড়নায় কোন রূপ ফল হইবার আশা নাই মনে করিয়া তিনি অন্য উপায় অবলম্বন করিতে মনস্থ করিলেন। ইহাতেও কোন ফল না হওয়ায় এবং পুত্রের কষ্ট আর দেখিতে না পারায় অবশেষে তিনি তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেন। ফ্র্যান্‌সিস্‌ও ঐরূপে মুক্তি লাভ করিয়া বরাবর সেণ্ট্‌ড্যামেনে ফিরিয়া গেলেন।

কর্ম্ম ও সাধনা।

[শ্রীহরিদাস দত্ত বি, এ।]

সর্ব্ববিধ দুঃখের হস্ত হইতে সম্পূর্ণভাবে নিষ্কৃতিলাভ যে মানবমাত্রেরই প্রার্থনীয়, তাহা বোধ হয় অস্বীকার করা যায় না। ধীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ইহাই তাহার সকল উদ্যম ও অনুষ্ঠানের চরম লক্ষ্য। এই নিষ্কৃতিলাভের ইচ্ছা মানবজীবনে এরূপ গভীরভাবে অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছে যে, অনেক সময় আমাদের কর্ম্ম আমাদের অজ্ঞাতসারে ঐ লক্ষ্যের অনুগামী হইয়া থাকে।

সংক্ষেপে বলিতে গেলে দুঃখ দ্বিবিধ—বাহ্য ও অভ্যন্তরীণ; এবং ঐ দুই প্রকার দুঃখ পরস্পর অবিচ্ছিন্নভাবে সংশ্লিষ্ট বলিয়াই বোধ হয়। সেজন্য ইহাদের মধ্যে একটীর নিবৃত্তির প্রতি অনাদর প্রদর্শন অপরটী সম্বন্ধে অহিতকর ফল উৎপাদন করিয়া থাকে। কিন্তু শরীর নশ্বর ও বাহ্য জগতের সহিত উহার সম্পর্ক ক্ষণস্থায়ী এবং আত্মা অবিনশ্বর এই জ্ঞান নিবন্ধন আমাদের পূর্ব্বতন মনীষিগণ অধ্যাত্ম উন্নতি লাভের জন্য তাঁহাদের সমুদয় মানসিক শক্তির প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন এবং বহির্জগত সম্বন্ধে একেবারে ঔদাসীন্যের পরাকাষ্ঠার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তদবধি আমাদেরও প্রতি চিন্তা ও কার্য্যে মহাজনগণের ঐ পদাঙ্ক অনুসরণের একটী প্রয়াস

পরিস্ফুটভাবে পরিলক্ষিত হইয়া আসিতেছে। এ ভাবটী যে অতি উচ্চ ও মহান্, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার প্রকৃত ধারণা লাভ লক্ষের মধ্যে এক জনের পক্ষেও সম্ভব হয় কি না, বলিতে পারি না। অনেকে মুখে ঐ ভাব স্বীকার করিলেও কার্য্যে কিন্তু উহার অতি সামান্য পরিচয় দিয়া থাকেন অথবা দিতে সমর্থ হ'ন। যাঁহারা এই উদার ভাবের উপলব্ধির অভিপ্রায়ে ও আশায় জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হ'ন, অর্থাৎ যাঁহারা সন্ন্যাসের সমুন্নত আদর্শ লক্ষ্য করিয়া দীক্ষিত হইয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায়, অনেকে কপটতায় পরিপূর্ণ। অবশ্য মানবজীবনে এরূপ ঘটনাবলী বিরল নহে, যাহার প্রভাবে চিন্তাশীল ব্যক্তির মনে কোন না কোন সময়ে প্রকৃত বৈরাগ্যের ভাব ক্ষণিক উদয় হয় না; এবং ঐ বৈরাগ্যের শক্তি, ঘটনা ও পাত্র-বিশেষে সময় সময় এতদূর প্রবল হইয়াও থাকে যে, উহার ঐ সাময়িক উত্তেজনা তাহার নিকট অসহ্য বলিয়া বোধ হয়। এরূপ সময়ে সংসার ত্যাগ অথবা সন্ন্যাস গ্রহণ তাহার পক্ষে এক প্রকার অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। কিন্তু পরে প্রকৃতির নিয়মানুসারে ঐ উত্তেজনার উন্মাদিনী শক্তি মন্দীভূত হইলে, ঐরূপ ব্যক্তির অনেকে আবার ঈদৃশ পুণ্যময় জীবনের প্রভাব সহ্য করিতে না পারিয়া ক্রমশঃ ভোগাভিলাষী হইয়া উঠে এবং আশ্রম-বিরুদ্ধ জানিয়া সেই অবিহিত অভিলাষ পরিপূরণের জন্য নানাবিধ অবৈধ উপায়ের সাহায্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়া থাকে। অধ্যাত্ম-পথের নিষ্ঠাবান্ পথিক অতীব বিরল। কারণ, জন্মজন্মান্তর হইতে আমাদিগের মনোবৃত্তি স্থূল বিষয়ে অভ্যস্ত বলিয়া সহসা উহা পরিত্যাগ করিয়া অতীন্দ্রিয় বিষয় আশ্রয় পূর্ব্বক দীর্ঘকাল অবস্থান করিতে সকলের শক্তিতে কুলাইয়া উঠে না। এরূপ ভাবে অবস্থান প্রভূত মানসিক শক্তি ও শিক্ষা-সাধ্য।

অতএব যখন সাধারণ মানবের পক্ষে বহির্জগত সম্বন্ধে নিরপেক্ষভাবে অবস্থান এক প্রকার অসম্ভব, তখন সে সম্বন্ধে উদাসীন ভাব অবলম্বন কোন-রূপে যুক্তিসঙ্গত বিবেচিত হয় না। ঐ বিষয়ে সুদীর্ঘকালব্যাপী উদাসীন-তাই আমাদের জাতীয় সর্ব্বাঙ্গীন অধোগতির অন্যতম মুখ্য কারণ। আমরা আমাদের প্রথিতকীর্ত্তি পূর্ব্বপুরুষগণের উপদেশ ও আদর্শের সারাংশ পরিহার করিয়া কেবল মাত্র উহাদের নীরস ও প্রাণহীন আবরণের প্রতিই মনোযোগী হইয়া উঠিয়াছি। ইহার অবশ্যম্ভাবী অশুভ পরিণাম আমাদের ব্যক্তিগত ও জাতিগত জীবনের প্রতি অঙ্গে অভ্রান্তরূপে প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছে। ঐ

কারণে আমরা দিন দিন দ্রুতপদবিক্ষেপে বিনাশের অভিমুখে বহুকাল ধরিয়া ধাবমান হইতেছিলাম। কিন্তু কোন এক অভাবনীয় মঙ্গল-নিদান ঐশী শক্তির প্রভাবে আমাদের বিনাশাভিমুখী গতির সহসা প্রতিরোধ হইয়াছে। মৃতপ্রায় আমাদের ভিতরে আবার চৈতন্যোন্মেষের ক্ষীণ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

এখন কিছু কাল হইতে কর্ম্মময় জীবনের প্রতি আমাদের অনেকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতেছে। ইহা যে অতিশয় শুভসংশী নিদর্শন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কারণ, ইহাই এখন আমাদের অবনতি প্রতিরোধের একমাত্র প্রতিকার। কিন্তু কর্ম্মময় জীবনে দীক্ষিত হইবার পূর্ব্বে ঐ দীক্ষা গ্রহণের উপযোগিতা লাভ প্রয়োজন। তদ্বিষয়ে অধিকাংশ লোকে এখনও অনবধান। দেখা যায়, সর্ব্বত্র সকল বিষয়েই অনুষ্ঠানের উপযোগী আয়োজনের প্রয়োজন; এবং শিক্ষা ও সাধনা বিনা জগতে কোনও মহৎ কার্য্য কখন সফলতা লাভে সমর্থ হয় নাই। প্রত্যেক মহদনুষ্ঠানের সফলতা আবার অনুষ্ঠানকারী-দের চরিত্রশক্তির উপর বিশেষভাবে নির্ভর করিয়া থাকে এবং শিক্ষাই অনেক সময়ে ঐ চরিত্রশক্তির প্রসবিত্রী। সেজন্য যাঁহারা দেশহিতকল্পে প্রকৃত কর্ম্মময় জীবন যাপন করিতে সমুৎসুক, সর্ব্বপ্রথমে তাঁহাদিগকে শিক্ষা-রূপ সাধনায় সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া তদ্বিষয়ে ব্রতী হইতে হইবে। অধ্যয়ন ও অধ্যাপন এই উভয়বিধ কার্য্যের জন্য কয়েকজন নিষ্ঠাবান্ ও অধ্য-বসায়শীল সাধকের আত্মবিনিয়োগ একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে।

জাতীয় উন্নতির প্রতিষ্ঠা, ব্যক্তিগত উন্নতির উপরেই সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে; এবং ব্যক্তিগত উন্নতি, আমাদের প্রত্যেকের আয়ত্তাধীন হইলেও অতীব আয়াসসাধ্য। আমাদের মধ্যে অনেকেই একপ্রকার লক্ষ্যহীন জীবন যাপন করিয়া থাকে। দীর্ঘকালব্যাপী ব্যাধির ন্যায় এই লক্ষ্যহীনতাই আমাদের ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনের প্রকৃতই প্রাণহানিকর হইয়া উঠিয়াছে। লক্ষ্যহীনতার জন্য আমাদের কোন কার্য্যে শৃঙ্খলা নাই এবং অধ্যবসায়াদি অন্য সকল মানসিক শক্তিগুলি বিলুপ্তপ্রায় হইতে বসিয়াছে। লক্ষ্য স্থিরীকরণই ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনে উন্নতির প্রধান ও প্রথম সোপান-স্বরূপ। লক্ষ্য স্থির করিবার পূর্ব্বে কিন্তু যে বিষয়টী লক্ষ্যরূপে গ্রহণ করিতে এবং যদভিমুখে সাধক তাঁহার মানসিক শক্তিসমূহ জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত অবধি নিরবচ্ছিন্ন অপ্রতিহতভাবে প্রবাহিত করিয়া রাখিতে বাঞ্ছা করেন, তৎ

সম্বন্ধে বিশেষরূপে জ্ঞানলাভ ও উহার উপকারিতা সম্বন্ধে পূর্ণ বিশ্বাসলাভ আবশ্যক। ঐ জ্ঞান এবং বিশ্বাসলাভের জন্যও শিক্ষা ও সাধনার নিতান্ত প্রয়োজন; এবং কিছু কালের জন্য সাধনার অনুকূল অপেক্ষাকৃত নিভৃত স্থানে অবস্থানও বিধেয় বলিয়া বিবেচিত হয়। কারণ, নির্জ্জনতা বাসের সাহায্যেই স্থির, অবিচলিত ও নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করা সম্ভবপর হয় এবং উহার সাহায্যেই চিন্তাসকল ঘনীভূত হইয়া প্রথমে কার্য্যকরী শক্তিরূপে এবং পরে কার্য্যে পরিণতি লাভ করিয়া থাকে। এইরূপে নির্জ্জন-বাসই চিন্তা-শক্তির বিকাশকার্য্যে সহায়তা করে এবং বিকাশপ্রাপ্ত চিন্তাশক্তির সাহায্যে দৃশ্যমান জগতের সহিত মানবজীবনের সম্পর্ক যে ক্ষণস্থায়ী, এ বিষয়ে জ্ঞান-লাভ হইয়া উহার প্রতি মায়া ও মোহপাশ সহজেই ছিন্ন হইয়া যায়। তখন মানব যথার্থ নিষ্কাম হয় এবং নিষ্কামভাবে কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইবার শক্তি ও প্রবৃত্তি লাভ করিয়া থাকে। এই নিমিত্তই পূর্ব্বতন মনীষিগণ সাধকের প্রথমাবস্থায় প্রকৃতিদেবীর চিরশান্তিময় নিভৃত আশ্রমে অবস্থান নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

সাময়িক উত্তেজনার প্রেরণায় যে সমুদয় কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তদ্দ্বারা স্থায়ী মঙ্গলের আশা করা বিড়ম্বনামাত্র। উহা দ্বারা জগতে কখনো যে কোন মহৎ কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে, এরূপ বোধ হয় না। স্থায়ী মঙ্গলকর কার্য্যের জন্য শক্তি সংযত এবং সুপরিচালিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। প্রথমটী অপেক্ষা দ্বিতীয়টী আবার অধিকতর শক্তিসাপেক্ষ। কোনরূপ উন্মাদনার বশবর্ত্তী হইয়া মুহূর্ত্তকালমধ্যে জীবন বিসর্জ্জনের জন্য প্রস্তুত হওয়া অপেক্ষা আজীবন অধ্যবসায় ও সহিষ্ণুতা অবলম্বনপূর্ব্বক বিবিধ বাধা বিঘ্ন স্বীকার করিয়া দেশের প্রকৃত মঙ্গলের উদ্দেশ্যে আত্মোৎসর্গ করা কি মহত্তর ও প্রবলতর শক্তির পরিচায়ক নহে? লক্ষ্য স্থির হইবার পূর্ব্বে আমাদের কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত না হইয়া চরিত্রের উৎকর্ষ-বিধানেই আত্মবিনিয়োগ করা সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। কারণ, মনের ঐরূপ অপরিণত অবস্থায় কার্য্যভার গ্রহণ করিলে কোনরূপ সুফলের আশা করিতে পারা যায় না। সেজন্য পূর্ব্বোক্তভাবে প্রথমে ব্যক্তিগত চরিত্র গঠনে যত্নবান্ হওয়া আমাদের প্রত্যে-কের অবশ্য-পালনীয় কর্ত্তব্য; এবং যাঁহারা স্বদেশ-সেবায় নিষ্ঠার সহিত ব্রতী হইতে অভিলাষী, তাঁহাদের পক্ষে ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন এবং নিজের জন্য অর্থাগমের চিন্তা হইতে নিষ্কৃতি লাভও বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে হয়।

কারণ, শক্তির একলক্ষ্যাভিগ গতি সকল অনুষ্ঠানের সফলতা বিষয়ে অতিশয় অনুকূল।

ভারতের অতীত গৌরব, তৎসন্তানগণের কঠোর আত্মপরিহার ও আদর্শ চরিত্রশক্তির উপর সর্ব্বতোভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়াই, সম্ভবপর হইতে পারিয়াছিল। সেই অমিততেজবিশিষ্ট চরিত্রশক্তির প্রভাবেই তাঁহারা ত্রিংশ কোটি ভ্রাতৃবৃন্দের চিন্তাস্রোত একলক্ষ্যাভিমুখী করিয়া প্রবল ও অব্যাহত বেগে প্রবাহিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং সমগ্র শিক্ষিত জগদ্বাসীর বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া তাঁহাদের অর্ঘ উপহারে জননীর মুখোজ্জ্বল করিতে পারিয়াছিলেন। বর্ত্তমান ভারতের উদীয়মান ও প্রতিভাসম্পন্ন যুবকবৃন্দের জন্য প্রাচীনমনীষিগণপদাঙ্কিত সেই পথ চিরদিনই উন্মুক্ত রহিয়াছে—কেবল যোগ্য ও নিষ্ঠাবান্ সাধকের জন্যই উহা কাল প্রতীক্ষা করিতেছে।

শ্রীরামানুজ-দর্শন।

(৯)

(সংখ্যাতিবাদ স্থাপন।)

[শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ।)

কোন বিষয়ে কোন একটা নূতন মত স্থাপন করিতে হইলে লোকে প্রায়ই প্রথমতঃ সেই বিষয়ে বিরুদ্ধ মতের খণ্ডন করিয়া পরে নিজ মত স্থাপন করে। এতদনুসারে আচার্য্য রামানুজ প্রত্যক্ষ-প্রমাণ-জন্য যাহা যথার্থ জ্ঞান, সেই যথার্থ জ্ঞান সম্বন্ধে নিজ মত স্থাপনের পূর্ব্বে তাঁহার যাবতীয় উল্লেখ-যোগ্য বিরুদ্ধ মতের খণ্ডন করিয়া এক্ষণে নিজ মত স্থাপন করিতেছেন। গত পাঁচ মাসের উদ্বোধনে আমরা যথাক্রমে এই বিষয়টী বর্ণনা করিয়াছি; এক্ষণে তাঁহার মতে যে প্রকার যুক্তি সহকারে সংখ্যাতিবাদ স্থাপন করা হয়, তাহাই আলোচ্য।

ইতিপূর্ব্বে যাহা আলোচিত হইয়াছে তাহা স্মরণ করিতে পারিলে সংখ্যাতিবাদ বলিতে কি বুঝা উচিত, তাহা কাহারও অবিদিত থাকিতে পারে না। তথাপি এস্থলে সংক্ষেপে তাহার পুনরুল্লেখ করিলে বাহুল্য হইবে না। খ্যাতি বলিতে প্রতীতি বা বোধ অথবা জ্ঞান বুঝায়। এই

বোধকে সাধারণতঃ দুইভাগে ভাগ করা হয়, যথা,—যথার্থ জ্ঞান, এবং অযথার্থ জ্ঞান। যাহা যথার্থ জ্ঞান তাহার অপর নাম, প্রমা বা সত্যজ্ঞান এবং যাহা অযথার্থ জ্ঞান তাহার নাম অপ্রমা বা ভ্রমজ্ঞান। যেটী যেরূপ তাহাকে সেই-রূপ বলিয়া বোধ করা বা জানাকে যথার্থ জ্ঞান বলে এবং যেটী যেরূপ তাহাকে সেইরূপ বলিয়া বোধ না করাকে অযথার্থ জ্ঞান বলে। যে কোন জিনিস দেখিয়া যদি আমাদের যথার্থ জ্ঞান হয়, তাহা হইলে সেই জ্ঞানের বিষয় সেস্থলে বর্ত্তমান থাকে, এবং যদি অ যথার্থ জ্ঞান হয়, তাহা হইলে সেই জ্ঞানের বিষয় সেস্থলে বর্ত্তমান থাকে না। যেমন দড়ি দেখিয়া যদি আমাদের দড়ি জ্ঞান হয়, তাহা হইলে সেই দড়ি জ্ঞানের বিষয় যে দড়ি তাহা তখন সে স্থলে বর্ত্তমান থাকে এবং দড়ি দেখিয়া যদি আমাদের সাপজ্ঞান হয়, তাহা হইলে সেই সাপজ্ঞানের বিষয় যে সাপ তাহা তখন সে স্থলে থাকে না। সুতরাং দাঁড়াইতেছে এইরূপ যে, দুই প্রকার প্রত্যক্ষ জ্ঞানের মধ্যে যাহা যথার্থজ্ঞান পদবাচ্য তাহার বিষয় জ্ঞানকালে থাকে, এবং যাহা অযথার্থ জ্ঞান, তাহার বিষয় জ্ঞানকালে থাকে না। এখন যাহারা সৎখ্যাতিবাদী তাঁহারা বলেন যে, জ্ঞানকে যদি কেহ যথার্থ ও অযথার্থ, অথবা প্রমা ও অপ্রমা, কিম্বা সত্য ও ভ্রম ইত্যাদি দুইটীভাগে ভাগ করিতে চাহে, ত তাহারা তাহা করুক তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই, কিন্তু যদি উহাদের লক্ষণ-মধ্যে এ কথা বলা হয় যে, যথার্থ জ্ঞানের বিষয় বর্ত্তমান থাকে এবং অযথার্থ জ্ঞানের বিষয় বর্ত্তমান থাকে না, তাহা হইলে আমরা তাহার প্রতিবাদ করিব। সৎখ্যাতিবাদী রামানুজসম্প্রদায় বলিয়া থাকেন যে, যথার্থ জ্ঞানের বিষয় যেমন জ্ঞান কালে বর্ত্তমান থাকে বা থাকা প্রয়োজন, অযথার্থ জ্ঞানেরও বিষয় তদ্রূপ জ্ঞানকালে বর্ত্তমান থাকে বা থাকা প্রয়োজন। ইহাদের মতে এমন কোন জ্ঞানই হইতে পারে না, যাহার বিষয় নাই বা থাকে না। ঐ যে দড়ি দেখিয়া সাপ মনে করিলে উহাতেও ঐ সাপজ্ঞানের বিষয় যে সাপ, তাহা তখন ঐ দড়িতে ছিল। তুমি ঠিক দড়ি দেখিয়া সাপ মনে কর নাই, তুমি প্রকৃত প্রস্তাবে সাপ দেখিয়াই সাপ মনে করিয়াছ সুতরাং প্রচলিত অযথার্থ জ্ঞানেরও বিষয় বর্ত্তমান থাকে। ইহাই আচার্য্য রামানুজের সৎখ্যাতিবাদের অভিপ্রায়।

বস্তুতঃ রামানুজের যে "মত" তাহাতে এই প্রকার সিদ্ধান্ত স্বীকার না করিলে তাঁহার মতটী দাঁড়াইতেই পারে না। এস্থলে যদি তিনি কোনরূপ

উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া তিনি তাঁহার নিজ সিদ্ধান্তকে অক্ষুণ্ণ না রাখিতেন, তাহা হইলে বৌদ্ধ ও মায়াবাদীদিগের উৎপাতে সমাজ মধ্যে আচার্য্যের আসন তাঁহার আদৌ মিলিত কিনা সন্দেহ,– তাঁহার উপদেশে কেহ হয়ত কর্ণপাতই করিত না। এজন্য আচার্য্য রামানুজ এবং তৎপরবর্ত্তী আচার্য্যগণ এ বিষয়ে অতি দৃঢ়তা সহকারে স্বপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন এবং অতি দক্ষতা সহকারে বিপক্ষের মত খণ্ডন করিয়াছেন।

যাহা হউক এক্ষণে আচার্য্য রামানুজ যেরূপে নিজ সৎখ্যাতিবাদের অনুকূলে যুক্তি দিয়া থাকেন তাহাই দেখা যাউক। রামানুজ বলেন লোকে সাধারণতঃ ভ্রম জ্ঞান বলিতে এই বুঝে যে, যে জ্ঞানের বিষয় সত্য নহে অর্থাৎ কোনস্থলে থাকে না, তাহাই ভ্রম। কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, কোন জ্ঞানের বিষয়ই অসত্য নহে, বা সেই স্থলে থাকে না এরূপ নহে; এবং এই অর্থে ভ্রমজ্ঞান বলিয়া জগতে কিছু নাই বা থাকাই উচিত নহে; ভ্রমজ্ঞানের অর্থ—বিষয় ব্যবহারে বাধা মাত্র। মনে কর তুমি ঝিনুক দেখিয়া রূপা মনে করিলে, এস্থলে এই ঝিনুকে রূপাজ্ঞানটা এই অর্থে ভ্রমপদবাচ্য যে, ইহাকে লইয়া রূপা বলিয়া আমরা ব্যবহার করিতে পারি না, অর্থাৎ হাটবাজারে ক্রয় বিক্রয় করিতে পারি না এইমাত্র। এতদ্ভিন্ন রূপা বলিযা মনে করাটাকে ভ্রম বলা উচিত নহে। সুতরাং ব্যবহারে বাধাই ভ্রমপদের অর্থ।

যদি বল, ঝিনুকে রূপা দেখিবার কালে রূপাজ্ঞানের বিষয়টী (সেই ঝিনুকে আছে বলিয়া) সত্য হইলে, ঝিনুক হইতে রূপা পাওয়া যায় না কেন? তাহার উত্তরে আমরা বলিব যে, ঝিনুক যে সকল উপাদানে প্রস্তুত হইয়াছে, রূপাতেও সেই সকল উপাদান বর্ত্তমান থাকিতে বাধ্য। তোমরা ঝিনুক হইতে রূপা বাহির করিতে জান না বলিয়াই ঐরূপ বলিয়া থাক। বস্তুতঃ ঝিনুকে রূপার উপাদান আছে। দেখ জগতের যাবতীয় পদার্থই পঞ্চীকরণ ব্যাপারের পর উৎপন্ন, এবং এই পঞ্চীকরণ ব্যাপার বশতঃ সকল পদার্থেই সকল পদার্থ বর্ত্তমান থাকিতে বাধ্য। যদি বল পঞ্চীকরণ কি আমরা জানি না, তাহা হইলে বলিতেছি শুন। দেখ, জগতের উৎপত্তির পূর্ব্বে, এই জগৎ এই আকারে থাকে না, তখন ইহার উপাদান—ক্ষিতি, জল, তেজঃ, বায়ু ও আকাশ প্রভৃতি ভূত পাঁচটী অতি সূক্ষ্ম অবস্থায় পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ হইয়া অবস্থান করে। সৃষ্টিকালে

ক্রমে ইহারা পরস্পরে মিশিতে থাকে, এবং এমনভাবে মিশিয়া যায় যে, ঐ পাঁচটীর প্রত্যেক ভূতে নিজের অর্দ্ধাংশ এবং তদ্ভিন্ন অপর চারিটী ভূতের দুই আনা রকম অংশ একত্রিত হইয়া এক একটী করিয়া ভূত উৎপন্ন হয়। এই ভাবে উৎপন্ন ভূত পাঁচটী পূর্ব্ব নাম ত্যাগ করে না, তবে এইমাত্র পার্থক্য হয় যে, পঞ্চীকরণের পূর্ব্বে উহাদিগকে সূক্ষ্ম ক্ষিতি, জল, তেজঃ বায়ু ও আকাশ বলা হয় এবং পঞ্চীকরণের পর উহারা স্থূল ক্ষিতিজল তেজ বায়ু ও আকাশ নামে কথিত হয় এইমাত্র। এই স্থূল পঞ্চভূত উৎপন্ন হইবার পর চন্দ্র, সূর্য্য, পৃথিবী প্রভৃতি নানালোক উৎপন্ন হয়; এবং প্রত্যেক লোকে নানা প্রকার মিশ্রিত দ্রব্য যথা, মাটী, পাথর, সোণা রূপা রূপ জড়বস্তু; স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ, অণ্ডজ ও জরায়ুজ প্রভৃতি প্রাণীসমূহরূপ চেতনবস্তু জন্মে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, তোমার একখণ্ড ঝিনুক, যে পঞ্চীকৃত পঞ্চভূত দ্বারা গঠিত, তোমার আপত্তি সেই পঞ্চীকৃত পাঁচটি ভূতদ্বারা গঠিত। আর তাহা হইলে ঝিনুক দেখিয়া যদি কাহারও রূপা জ্ঞান হয় তাহা হইলে সেই রূপা জ্ঞানের বিষয় নাই একথা আর বলা চলে না।

আর যদি বল, এই পঞ্চীকরণ ব্যাপারটী আমরা মানিতে প্রস্তুত নহি, তাহা হইলে আমরা বলিতে পারি, ইহা না মানিলে তোমার গত্যন্তর নাই। দেখ, এই যে চেতন ও জড়-বস্তুপূর্ণ জগৎ, ইহাকে তুমি তোমার পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়ের গোচর করিয়া থাক বলিয়াই তুমি এই জগতের অস্তিত্ব স্বীকার কর, ইহা যদি তোমার কোন ইন্দ্রিয় গোচরই না হইত, তাহা হইলে কি তুমি ইহার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে? কখনই নহে। সুতরাং তোমার বলিতে হইবে, এ জগতে যত প্রকার জিনিস আছে, সকলকেই পাঁচভাগে ভাগ করিতে পারা যায়, এবং উক্ত পাঁচ প্রকার জিনিষ ছাড়া এখানে আর কিছু নাই। এখন দেখ, এই পাঁচপ্রকার জিনিসই তোমার পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের গোচর পাঁচটী ভূত। যথা চক্ষুরিন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য রূপের আশ্রয় তেজঃ, রসনেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য রসের আশ্রয় জল, ত্বগিন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য স্পর্শগুণের আশ্রয় বায়ু, শ্রবণেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য শব্দগুণের আশ্রয় আকাশ, ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য গন্ধগুণের আশ্রয় পৃথ্বী, সুতরাং জগতের যাহা কিছু তাহাই এই পঞ্চভূতাত্মক।

তাহার পর দেখ, এই পাঁচটী ভূত আমরা পৃথক্ পৃথক্ ইন্দ্রিয়-গোচর করিতে পারি না; যখনই একটী ইন্দ্রিয় গোচর করি, তখনই তাহার সঙ্গে অপর চারিটী ভূতের সত্তা তাহাতে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। যখনই আমরা

রূপ দেখিয়া রূপের আশ্রয় তেজঃপদার্থ ইন্দ্রিয়গোচর করি, তখনই কি উহাতে পৃথ্বী, জল, বায়ু ও আকাশের অংশ উপলব্ধি করি না? কে কোথায় এমন তেজঃ দেখিয়াছে, যাহাতে বায়ু জল,পৃথ্বী ও আকাশের অংশ থাকে না? যাঁহার সামান্যও বিজ্ঞানশাস্ত্রের জ্ঞান আছে, তিনিই একথাটী অতি সহজে বুঝিবেন। অগ্নিকে যদি তেজের দৃষ্টান্ত লওয়া যায় তাহা হইলে সকলেই দেখিয়া থাকে যে, ইন্ধন ব্যতীত অগ্নি জ্বলিতে পারে না এবং উক্ত ইন্ধনেও আবার উক্ত চারিটী ভূতই বর্ত্তমান। তদ্রূপ বায়ু না থাকিলে অগ্নি জ্বলে না, ইহা সামান্য পাচক হইতে বিজ্ঞ পাঠকের পর্য্যন্ত অবিদিত নাই। এ বিষয়টা এতই পরিচিত যে দৃষ্টান্ত দিয়া ইহার সত্যতা প্রমাণ বাহুল্য। যাহা যাউক এতদনুরূপ দৃষ্টান্ত স্মরণ করিলে বেশ বুঝা যায় যে, জগতে উক্ত পাঁচটী মাত্র ভূত থাকিলেও উহাদের প্রত্যেকে অপর চারিটীর সংমিশ্রণে উৎপন্ন হয় নিশ্চিত। সুতরাং তুমি যদি পঞ্চীকরণ মানিব না বল তাহা হইলে তোমার কথা যুক্তিসহ হইতে পারিবে না। অগত্যা তোমার বলিতে হইবে, ঝিনুকে রূপা জ্ঞান হইলে উক্ত জ্ঞানের বিষয় নাই বলিয়া উহা ভ্রম জ্ঞান নহে পরন্তু ব্যবহারের বাধা ঘটে বলিয়া উহা ভ্রম পদবাচ্য।

এখন যদি বল, শুক্তি রজতের দৃষ্টান্ত আমার অভীষ্ট নহে "তাহা হইলে আমি তোমাদের যত প্রকার দৃষ্টান্ত আছে, সেই সকল প্রকার দৃষ্টান্ত লইয়াই একে একে তোমায় দেখাইতেছে—তুমি দেখিবে সকল স্থলেই আমার কথা সত্য, তুমি এমন কোন দৃষ্টান্তই আমায় দেখাইতে পারিবে না যাহাতে আমার "মত" অসত্য বলিয়া প্রমাণিত হইবে। আচ্ছা ধর "স্বপ্ন দর্শন"। তুমি বলিয়া থাক, স্বপ্নদৃষ্ট বিষয় ত থাকে না। অথচ স্বপ্ন দর্শন কালে তাহা সত্য বলিয়া বোধ হয়, সুতরাং স্বপ্ন দর্শন জন্য জ্ঞানকেই বিষয় শূন্য ভ্রম জ্ঞান বলা উচিত। কিন্তু শুন—একথা তোমার ঠিক নহে। স্বপ্নদৃষ্ট বিষয়ও সত্য; উহা মিথ্যা নহে। দেখ, তুমি অবশ্যই বেদ মান। আর আমিও বেদ মানি; এই বেদেই আছে যে, স্বপ্নকালে সেই পরম পুরুষ স্বপ্ন দৃষ্ট রথাদি সৃজন করেন। যথা বৃহদারণ্যকোপনিষদে ৪।৩।১০ মন্ত্রদ্রষ্টব্য। মন্ত্রটী এই;—"নতত্র রথা, ন রথযোগা, ন পন্থানঃ ভবন্তি, অথ রথান্ রথযোগান্ পথঃ সৃজতে..... স হি কর্ত্তা।" ইত্যাদি। লোকে যে সময় স্বপ্ন দেখে সেই সময় সেই স্বপ্ন দৃষ্ট বিষয় ঈশ্বর কর্ত্তৃক সৃষ্ট হয় সুতরাং তাহাও সত্য। যদি বল বেদ আমরা মানিব না, তাহা হইলেও দেখ, স্বপ্নকালে সেই স্বপ্নদৃষ্ট বিষয় ত

মিথ্যা বলিয়া বোধ হয় না, জাগ্রতকালে মিথ্যা হইলেও পুনরায় যদি সেই স্বপ্ন দেখা যায় তাহা হইলেও সেই স্বপ্নদৃষ্ট বিষয় আবার সত্য বলিয়াই বোধ হইবে। আর যদি একথা স্বীকার কর যে, স্বপ্ন অনেক সময় সত্য হয় তাহা হইলে ত তোমার স্বপ্নকে আদৌ মিথ্যা বলাই চলে না। যদি বল কতকগুলি স্বপ্ন মিথ্যা হয় বলিযা বিষয়শূন্য জ্ঞানই ভ্রমপদবাচ্য হইতে ত কোন বাধা হয় না, তাহা হইলে বলিব, যে সকল স্বপ্নে স্বপ্নদৃষ্ট জ্ঞান বিষয়শূন্য বলিয়া আপাততঃ প্রতীয়মান হয়, সেস্থলে আমরা উক্ত বিষয়গুলিকে অন্তর-রাজ্যের সত্য বিষয় বলিয়া থাকি। তাহার পর স্বপ্নে তুমি যাহা দেখ, তাহাও ত তোমার সেই পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়, আর সে বিষয়গুলি ত তুমি জাগ্রতেও দেখিয়া থাক। বল দেখি, স্বপ্নের দৃষ্ট রূপ রস প্রভৃতি কি জাগ্রতের দৃষ্ট রূপ রস হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু? তাহা ত কখনই বলিতে পারা যাইবে না, সুতরাং অগত্যা তোমায় স্বীকার করিতে হইবে যে, স্বপ্নজন্য জ্ঞানও বিষয়শূন্য জ্ঞান নহে এবং তজ্জন্য ভ্রমজ্ঞানের বিষয় নাই বলিয়া ভ্রমজ্ঞানটী ভ্রমপদবাচ্য নহে—উহা ব্যবহারে বাধা ভিন্ন আর কিছুই নহে।

আচ্ছা বেশ, এইবার আর একটী দৃষ্টান্ত লও। ধর, একটী শঙ্খকে পীত বলিয়া দেখা। তুমি বলিবে, কেহ কেহ ন্যাবা-রোগাক্রান্ত হইয়া যখন শঙ্খকে পীত দেখে, তখন তাহার দেখা ভ্রমপদবাচ্য কি না? ইত্যাদি। আচ্ছা এ স্থলেও বিচার করিয়া দেখ দেখি, কি পাওয়া যায়? কে না জানে, যাহার চক্ষু পীতবর্ণ হয়, সেই ব্যক্তিই উক্ত রোগাক্রান্ত বলিয়া বিবেচিত হয়। এখন এ কথা যদি স্বীকার কর, তাহা হইলে কি বলা যায় না যে, উক্ত ব্যক্তির চক্ষুর পীতবর্ণ চক্ষুরশ্মির সহিত মিশিযা শুভ্রবর্ণ শঙ্খও পীত বলিয়া বোধ হয়? সে যখন শঙ্খ দেখে, তখন তাহার চক্ষুমধ্যস্থ পীতবর্ণটী শঙ্খের শুভ্রবর্ণকে আবৃত করিয়া নিজের রূপটাই দেখায় মাত্র। সুতরাং দেখ, এস্থলেও জ্ঞান বিষয়শূন্য হইল না।

যদি বল, স্ফটিকের নিকট রক্তজবা রাখিলে স্ফটিক রক্তবর্ণ দেখায়, এই-টীই আমার বিষয়শূন্য ভ্রমজ্ঞানের দৃষ্টান্ত, তাহা হইলে আমরা বলিব, না—উহার বিষয় ওস্থলে সত্য। কারণ,জবা স্ফটিকের নিকট আনিলে স্ফটিক রাঙ্গা দেখায় এবং অপসারিত করিলে রাঙ্গা দেখায় না। সুতরাং ইহাকে বিষয়-শূন্য জ্ঞান কি করিয়া বলিতে পার? জবাসম্বন্ধবিরহিত হইয়া যদি কখন লাল এবং কখন অন্যবর্ণ দেখা যাইত, তাহা হইলে তোমার পক্ষে কিছু

সুবিধা হইতে পারিত। ফলতঃ তাহা হইল না। মরীচিকায় জলভ্রমকেও তুমি তোমার মতের অনুকূলে লইতে পার না; কারণ, পূর্ব্বোক্ত পঞ্চীকরণ ব্যাপার স্বীকার করিয়া উহাতেও বিষয়ের সত্যতা প্রমাণিত হয়।

তাহার পর যদি দিগ্‌ভ্রমের দৃষ্টান্তটী লও, তাহা হইলে তাহাও আমার মতেরই অনুকূল। কারণ, দিক্ বস্তুটী বস্তুতঃ একটী পদার্থ; সুতরাং সকল দিকের ভিতর সকল দিক্ই থাকিতে বাধ্য। দিক্ বস্তুকে কেহ যখন পরিচ্ছিন্ন করিতে পারে না, তখন এদিক্ ওদিক্ এরূপ ব্যবহারই সঙ্গত নহে। বস্তুতঃ, এদিক্ ওদিক্ ইত্যাকার দিগ্‌ভেদ সিদ্ধ না হইলে তাহার আবার বিষযশূন্যতা কোথা হইতে সিদ্ধ হইতে পারে ?

যদি বল, অলাতচক্র (অর্থাৎ মশাল ঘুরাণ জন্য চক্রাকার) বোধটী বিষয়-শূন্য ভ্রম ইত্যাদি; কিন্তু তাহাও বলিতে পার না; কারণ, মশালটী অত্যন্ত শীঘ্র ঘুরা হয় বলিয়া ঐরূপ দেখায়। বস্তুতঃ শীঘ্রতাবশতঃ অগ্নিকণা তখন চক্রের সর্ব্বত্রই বর্ত্তমান থাকে। সুতরাং এ দৃষ্টান্তও আমার মতানুকূল হইতেছে।

যদি বল, দর্পণে নিজ মুখের প্রতিবিম্বকে আমরা বিষযশূন্যজ্ঞানপদবাচ্য বলিব; কারণ, বাস্তবিক আমার মুখটা কিছু দর্পণমধ্যে চলিযা যায় না। কিন্তু তাহাও বলিতে পার না। কারণ, আমার চক্ষুরশ্মিসমূহ দর্পণে প্রতিহত হইয়া দর্পণকে গ্রহণ করিয়া নিজ মুখকেই আবার গ্রহণ করে, তাই লোকে দর্পণমধ্যে নিজে নিজের মুখ দেখিয়া থাকে। সেখানেও রশ্মিগতির শীঘ্রতাবশতঃ চক্ষুরশ্মিসমূহ দর্পণ ও মুখের মধ্যবর্ত্তী ব্যবধানকে গ্রহণ করিতে পারে না বলিয়া দর্পণেই মুখ দেখা যায়। ফলতঃ দর্পণে মুখ নাই, অথচ তাহা দেখা যায়—এরূপ নহে।

এখন তোমাদের মতে ভ্রমের আর একটি জাতীয় দৃষ্টান্ত অবশিষ্ট আছে; এইটী হইলে তোমাদের মতের সকল জাতীয় দৃষ্টান্তই বিচার করা হইবে। এটী দ্বিচন্দ্র দর্শন; অর্থাৎ নিজে অঙ্গুলি দ্বারা নিজ চক্ষু পীড়ন করিলে যে দুইটী চন্দ্রাকার দর্শন হয়, তাহাই এস্থলে বিচার্য্য। তোমরা বল, এইরূপে যে চন্দ্র দেখা যায়, তাহা বিষযশূন্য জ্ঞান; কারণ, বাস্তবিক চক্ষুর ভিতরে উক্ত চন্দ্রাকার বস্তুদ্বয় নাই, অথচ তাহা দেখা যায়। আচ্ছা, ভাবিয়া দেখ দেখি, এটিই বা কি করিয়া তোমার বিষযশূন্যজ্ঞানপদবাচ্য হয়? বল দেখি, ঐ যে চন্দ্রাকার কিছু তোমরা দেখ, তাহা কি কখন কখন দেখ,

কিম্বা যখনই চক্ষুপীড়ন কর, তখনই দেখ? উত্তরে তোমাদিগকে নিশ্চয়ই বলিতে হইবে—যখনই চক্ষুপীড়ন করা যায়, তখনই উহা দেখা যায়। এখন তাহা হইলে তোমায় বলিতে হইবে যে, চক্ষুর ভিতর এমন কিছু পদার্থ আছে, যাহাকে পীড়ন করিলে ঐরূপ দেখা যায়। তুমি এই পদার্থটীকে গণনার মধ্যে আনিতে চাহ না, কিন্তু আমরা বলি, উহা চক্ষুর মধ্যস্থ এক প্রকার পিত্ত পদার্থ, যাহা উক্ত প্রকার চন্দ্রদর্শনের কারণ। এক কথায় চক্ষুমধ্যে যাহা দেখা যায়, তাহা চক্ষুমধ্যেই আছে, কেবল অঙ্গুলি পীড়নবশতঃ তাহা প্রতীত হয়, এই মাত্র বিশেষ। এখন দেখ, তোমার অঙ্গুলিও সত্য, চক্ষুমধ্যস্থ উক্ত পদার্থও সত্য; সুতরাং উক্ত চন্দ্রাকার বস্তু অসত্য নহে।

এইরূপে দেখ, তোমরা এমন কোনই দৃষ্টান্ত দেখাইতে পার না, যাহার বিষয় সত্য নহে, অথচ তাহার জ্ঞান হইতেছে। তাহার পর পূর্ব্বে যে পঞ্চীকরণপ্রক্রিয়া প্রদর্শন করা হইয়াছে, তাহাও স্মরণ কর; দেখিবে, যাবতীয় জ্ঞানই যথার্থবিষয়ক, কোন জ্ঞানই অযথার্থবিষয়ক নহে। আর, তাহা হইলে প্রস্তাবিত প্রসঙ্গানুসারে বলা যাইতে পারে (৮।৫ মাস পূর্ব্বের উদ্বোধন দ্রষ্টব্য) যে, আমাদের মতে ব্রহ্ম, জীব ও জগৎ সকলই সত্য, কেহই মিথ্যা নহে, অথবা কোনটী সত্য কোনটী মিথ্যা—এরূপ নহে।

আচার্য্য রামানুজ প্রমা অর্থাৎ যথার্থজ্ঞাননির্ণয়প্রসঙ্গে প্রত্যক্ষ প্রমার লক্ষণ নির্ণয় করিয়া ভ্রমজ্ঞানের যে অর্থ নির্দ্ধারণ করিলেন, তাহাতে তাঁহার বিশিষ্ট দ্বৈতবাদের ভিত্তি অতি সুদৃঢ় করা হইল। এই বিষয়টীর প্রতি লক্ষ্য করিলে আমরা বুঝিতে পারিব যে, রামানুজসম্প্রদায় যে ভাবটী লইয়া জগতাদি দর্শন করেন, সেই ভাবটীতেই তাঁহার সিদ্ধান্তের বীজ নিহিত রহিয়াছে। এই ভাবটীই বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার জিনিষ। এই প্রকার ভাবের বিশেষত্ব থাকে বলিয়াই ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বীদিগের মধ্যে এত মতভেদ হয়, এবং যদি কেহ এই মতভেদের কোন মীমাংসাতে উপনীত হইতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে মতভেদের মূলস্বরূপ মতবাদীদিগের বিশেষ বিশেষ ভাবগুলি আমাদের বুঝিতে চেষ্টা করা উচিত।

যাহা হউক, যে মূল অবলম্বন করিয়া আমরা এত কথা বলিলাম, এক্ষণে তাহার একটী যথাযথ অনুবাদ প্রদান করা যাউক; কারণ, যদি কোথাও আমাদের পদস্খলন হইয়া থাকে, তাহা হইলে অভিজ্ঞ পাঠক তাহা অনায়াসে

বুঝিতে পারিবেন। পূর্ব্বে পূর্ব্বে আমরা এই প্রথা অবলম্বন করিয়া এই রামানুজদর্শন নামক প্রবন্ধটী লিখিযা আসিযাছি; কিন্তু পঞ্চখ্যাতি বাদ-প্রসঙ্গে টীকাকাবের কথার তাৎপর্য্যটী পাঠকবর্গের নিকট নিবেদন করিবার ইচ্ছা হওযায গত চারি পাঁচ খণ্ডের উদ্বোধনে এই প্রথাটী অবলম্বন করি নাই। এক্ষণে যখন পুনরায় মূল গ্রন্থের প্রসঙ্গ অবতারিত হইল এবং টীকা-কারের খ্যাতিবাদের কথা শেষ হইয়া গেল, তখন আমরা আমাদের পূর্ব্ব প্রথা আবার অবলম্বন করি। মূল গ্রন্থে গ্রন্থকার উক্ত খ্যাতিবাদের কেবল নাম মাত্র উল্লেখ করিয়াছেন। কেবল টীকাকার মহাশয়ের অনুগ্রহে আমরা এ স্থলে তাহার যথাসাধ্য পরিচয় দিতে সমর্থ হইয়াছি মাত্র।

এই প্রসঙ্গে মূল গ্রন্থের অনুবাদ এই ;—

"ভ্রমাদি প্রত্যক্ষজ্ঞান যথার্থ। যে হেতু অখ্যাতি, আত্মখ্যাতি, অনির্ব্বচনীযখ্যাতি, অন্যথাখ্যাতি এবং অসৎখ্যাতি-বাদিগণের মত স্বীকার না করিয়া সৎখ্যাতি পক্ষ স্বীকার করা হয়।"

"সৎখ্যাতি বলিতে জ্ঞানের বিষয়ের সত্যতা বুঝায়। যদি বল, তাহা হইলে ভ্রমত্ব কি করিয়া সিদ্ধ হয, তাহা হইলে বলি যে, উহা বিষয ব্যবহারের বাধা হইতে সিদ্ধ হয। দেখ, এক্ষণে ইহাই উপপাদন করিতেছি। পঞ্চী-করণপ্রক্রিয়া দ্বারা পৃথিবী আদিতে সর্ব্বত্র সকল ভূতের বিদ্যমানতা স্বীকার্য্য। অতএব শুক্তিকাদিতে রজতাংশের বিদ্যমানতা বশতঃ জ্ঞানবিষয়ের সত্যতা সিদ্ধ হয। সে স্থলে রজতাংশের স্বল্পতা-হেতু তাহার (রজত বলিযা) ব্যবহার হয় না। এইজন্য তাহার জ্ঞানকে ভ্রম বলা হয়। শুক্তির অংশের প্রাচুর্য্য-জ্ঞান হইতে (উক্ত ভ্রমের) নিবৃত্তি হয়। স্বপ্নাদি জ্ঞানও সত্য। সেই সেই পুরুষের অনুভবের যোগ্য বলিযা সেই সেই কালাবসান পর্য্যন্ত পরম পুরুষ (স্বপ্নস্থ) রথাদির সৃষ্টি করিযা থাকেন। একথা শ্রুতি হইতেও জানা যায়। পীত শঙ্খ ইত্যাদি (দৃষ্টান্তে) নযনরশ্মিসমূহ নয়নবর্ত্তী পিত্তদ্রব্যের সহিত সংযুক্ত হইযা শঙ্খাদির সহিত সংমিলিত হয। সেস্থলে পিত্তগত পীতিমা দ্বারা অভিভূত হয় বলিযা (দৃষ্টিশক্তি) শঙ্খগত শুক্লবর্ণ গ্রহণ করিতে পারে না। এই হেতু স্বর্ণানুলিপ্ত শঙ্খের ন্যায় শুভ্র শঙ্খকেও পীত বলিযা বোধ হয। পীতিমা অত্যন্ত সূক্ষ্ম বলিযা স্বনয়ন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া নিজের দ্বারাই গৃহীত হয, অন্য দ্বারা নহে। জবাকুসুমের সমীপবর্ত্তী স্ফটিক মণিও রক্ত বলিয়া গৃহীত হয়। তাহার জ্ঞানও সত্য। মরীচিকাতে জলজ্ঞানও

পঞ্চীকরণপ্রক্রিয়া দ্বারা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সিদ্ধ হয়। পঞ্চীকরণপ্রক্রিয়া পরে বলা হইবে। দিগ্‌ভ্রমও সেই প্রকার। যেহেতু দিঙ্মধ্যে অন্য দিকের বিদ্যমানতা আছে এবং অবচ্ছেদক (ভেদকারক কিছু) নাই বলিয়া দিক্‌ নামক দ্রব্যান্তরই অঙ্গীকার করা হয় না। অলাতচক্রাদিতে শীঘ্রতা-বশতঃ তাহার অন্তরাল প্রদেশ (চক্ষু দ্বারা) গ্রহণ করিতে পারা যায় না বলিয়া তত্তদ্দেশসংযুক্ত তত্তদ্বস্তুরই চক্রাকারে গ্রহণ হয়। তাহাও সত্য। দর্পণাদিতে নিজ মুখাদির প্রতীতিও যথার্থ। নয়নরশ্মিসমূহ দর্পণাদিতে প্রতিহতগতি হইয়া দর্পণাদিকে গ্রহণ করিয়া নিজ মুখাদিকে গ্রহণ করে। সেস্থলেও অতি শীঘ্রতাবশতঃ অন্তরালের গ্রহণ হয় না বলিয়া তাহার সেই প্রকারে প্রতীতি হয়। দ্বিচন্দ্রাদি জ্ঞানাদিতেও অঙ্গুলি সাহায্যে এবং তিমির-রোগাদির দ্বারা নয়নগত তেজের গতিভেদে সামগ্রীভেদ হয় এবং তজ্জন্য দুইটী পরস্পর-নিরপেক্ষ সামগ্রী চন্দ্রদ্বয় গ্রহণের প্রতিকারণ হয়। উক্ত সামগ্রীদ্বয় পারমার্থিক-সত্ত্বা-সম্পন্ন, সুতরাং যে চন্দ্রদ্বয়ের জ্ঞান হয়, তাহারাও সত্য।

আগামীবারে সর্ব্ববিধ জ্ঞানের সবিশেষতা ও শব্দজন্য জ্ঞান প্রত্যক্ষ জ্ঞান নহে, এই বিষয়ে রামানুজ-মত কথিত হইবে।

শৃঙ্গগিরিতে শঙ্কর।

[শ্রীমতী—]

সুদৃশ্য সুরভি চন্দনাদি বিবিধ বৃক্ষরাজি-উপশোভিত নিবিড়-পর্ব্বত-মালা-বেষ্টিত সমতল ক্ষেত্র। ক্ষেত্রমধ্য দিয়া পূর্ব্বোত্তরবাহিনী স্বচ্ছসলিলা উপলগর্ভা তুঙ্গা নদী মনোহর বক্রগতিতে প্রবাহিতা। পূর্ব্বতীরে ক্ষেত্রের এক প্রান্তে দেবোপহার-নৈবেদ্যাকারে উত্তুঙ্গ শৃঙ্গগিরি উন্নতশিরে দণ্ডায়-মান। পূর্ব্বকালে এই পর্ব্বতোপরি মহামুনি বিভাণ্ডকের আশ্রম ছিল। বিভাণ্ডক-তনয় ঋষ্যশৃঙ্গ এখানে তপঃসিদ্ধি লাভ করেন বলিয়া এই স্থানটী আজিও শৃঙ্গগিরি নামে কথিত হয়।

পর্ব্বতের পাদদেশে আচার্য্যদেব-প্রতিষ্ঠিত শৃঙ্গেরী মঠ অবস্থিত। মঠ-

মধ্যে দেবী সরস্বতী শারদা মূর্ত্তিতে বিরাজিতা। আচার্য্য শঙ্কর, যোগী গোবিন্দনাথের নিকট দীক্ষাগ্রহণমানসে যে সময় নর্ম্মদাভিমুখে গমন করেন, সেই সময় পথিমধ্যে তিনি প্রথম এই শৃঙ্গগিরি দর্শন করেন।

চিরেপ্সিত সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার অভিপ্রায়ে বালক শঙ্কর গৃহত্যাগ করিয়া অবিশ্রান্ত পথ চলিতে চলিতে একদিন দ্বিপ্রহরকালে, শ্রান্ত-ক্লান্ত-দেহে এই পর্ব্বতপাদদেশে, তুঙ্গাতীরস্থ এক বৃক্ষমূলে একখণ্ড সুপ্রশস্ত শিলোপরি বসিয়া আছেন। গ্রীষ্মাবসানে বর্ষা সমাগতপ্রায়; তাঁহার শিরোপরি অনন্ত আকাশে মধ্যাহ্নের মেঘমালা, সম্মুখে অসংখ্য শৈলমালা। নব পল্লব ও কুসুমাদি-পরিশোভিত, বৃক্ষলতাদি সমাকীর্ণ পর্ব্বতশ্রেণী দেখিয়া মনে হয়, প্রকৃতিদেবী প্রাবৃটের নবীন সৌন্দর্য্যকে পরাজিত করিবার জন্যই যেন অঙ্গে নানা উজ্জ্বল অলঙ্কার ধারণ করিয়াছেন এবং সেই অতুল সৌন্দর্য্য প্রদর্শনে ব্যগ্র হইয়া এই নিভৃত দেশে অন্য কাহাকেও না পাইয়া বালক শঙ্করকেই আহ্বান করিতেছেন। সুশীতল সমীরণ মধ্যে মধ্যে প্রবাহিত হইয়া বালক শঙ্করের শ্রান্তিদূর করতঃ পর্ব্বতপাদদেশস্থ স্নেহময়ী তুঙ্গা-তটিনীর প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। তুঙ্গাদেবীও যেন সেই অবকাশে নিজ ক্রোড়স্থিত বিচিত্রবর্ণরঞ্জিত মীনকুলের সানন্দ ক্রীড়া প্রদর্শন করাইয়া বালকের চিত্তবিনোদনের চেষ্টা করিতেছেন। আবার কখন বা কল কল শব্দে তাঁহাকে নিজ সন্তানগণ সহ ক্রীড়া করিতে যেন অনুরোধ করিতে-ছেন। এ অদ্ভুত বালক কিন্তু স্বীয় শিথিল দেহ বৃক্ষমূলে হেলাইয়া মুদিত-নয়নেই আসীন রহিয়াছেন! সকল আনন্দাহ্বান উপেক্ষা করিয়া কতদিনে ব্রহ্মবিৎ গুরু গোবিন্দনাথের শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করিবেন, এই চিন্তাতেই নিমগ্ন রহিয়াছেন!

অনেকক্ষণ এইভাবে অতীত হইল। ক্রমে বালক শঙ্কর ক্ষুধিত হইয়া উঠিয়া বসিলেন। উঠিয়া বসিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার ক্ষুধা তৃষ্ণা ক্ষণকালের জন্য অন্তর্হিত হইল। তিনি দেখিলেন, নদীতীরে সূর্য্যকরোত্তপ্ত প্রস্তরোপরে এক বৃহৎ বিষধর তাহার আয়ত ফণা বিস্তার করিয়া কতকগুলি ভেকশাবককে আতপতাপ হইতে রক্ষা করিতেছে!

ঐ অপূর্ব্ব দৃশ্যে তিনি বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, ভগবানের এ কি অপূর্ব্ব লীলা! খাদ্য-খাদক-সম্বন্ধে চিরনিবদ্ধ ক্রূর সর্প কি সত্যই ভেকদিগকে আতপতাপ হইতে রক্ষা করিতেছে? ইহা যে নিতান্ত অসম্ভব! এই ভাবিয়া

তিনি নিবিষ্টমনে তাহাদিগের আচরণ বহুক্ষণ ধরিয়া দেখিতে লাগিলেন এবং পরিশেষে নি:সন্দেহে বুঝিলেন, সর্প বাস্তবিকই ভেকশাবকদিগকে রক্ষা করিতেছে! তখন তিনি উহার হেতু অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া স্থির করিলেন, নিশ্চয়ই ইহা স্থানমাহাত্ম্যের ফল, নিশ্চয়ই পূর্ব্বে এখানে সাধু মহাত্মাগণ তপস্যারত থাকিতেন এবং হয়ত এখনও আছেন, নিশ্চয়ই তাঁহাদের তপঃপ্রভাবে এই স্থানটী এইরূপ হিংসাশূন্য হইয়াছে! তপস্যার ফলে হিংস্র জীব জন্তু যে হিংসা ত্যাগ করে এবিষয়ে শাস্ত্রে ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত রহিয়াছে।

বালক এইবার তাঁহার ঐ অনুমানের সত্যতা সম্বন্ধে কোন নিশ্চিত নিদর্শন পাওয়া যায় কি না দেখিতে গাত্রোত্থান করিলেন। এদিক্ ওদিক্ চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, কিন্তু কোথায়ও কোন মনুষ্যের বসবাসের চিহ্ন দেখিতে পাইলেন না। শঙ্কর তথাপি ক্ষান্ত না হইয়া ঐ স্থানের চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতে লাগিলেন এবং অবশেষে পার্শ্ববর্ত্তী শৃঙ্গগিরির তুঙ্গ স্থলটীতে কেহ যদি থাকে ভাবিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন।

শঙ্করের অনুমান এইবার সত্য হইল। তিনি গিরি শিখরে উঠিয়াই দেখিলেন, একটী পরিত্যক্ত পর্ণকুটীর—যেন এখানে কেহ কখন বাস করিয়াছিল। ক্রমে কুটীরদ্বারে আসিয়া কুটীরমধ্যে চাহিয়া দেখিলেন, চর্ম্মাচ্ছাদিত মনুষ্য-কঙ্কালের ন্যায় একটি মূর্ত্তি যোগাসনে উপবিষ্ট। উহা জীবিত বা মৃত, অথবা পাষাণাদি জড়পদার্থে ঐ ভাবে নির্ম্মিত—এক্ষণে তদ্বিষয়ে তাঁহার সন্দেহের উদ্রেক হইল। তিনি ভাল করিয়া উহা দেখিবার জন্য বহুক্ষণ কুটীরদ্বারে বসিয়া রহিলেন এবং পরিশেষে বুঝিলেন, যোগিবর জীবিত, কিন্তু সমাধিমগ্ন!

বালক শঙ্কর ঐ বিষয়ে স্থিরনিশ্চয় হইয়াও তথায় বসিয়া রহিলেন!—অভিপ্রায়, যোগীর সমাধিভঙ্গে তাঁহাকে এই স্থানের অপূর্ব্ব মাহাত্ম্যের কথা জিজ্ঞাসা করিবেন।

ঐরূপে বি[illegible] অপেক্ষার পর যোগিবরের একবার সমাধিভঙ্গ হইল এবং শঙ্করের প্রতি দৃষ্টি পতিত হওয়ায় শঙ্কর তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া উক্ত স্থানের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। যোগিবর তখন ধীরে ধীরে "ইহা বিভাণ্ডক ও ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রম" এই কথা মাত্র বলিয়া আবার ধ্যাননিমগ্ন হইলেন।

বালক শঙ্করের তখন আনন্দের আর অবধি রহিল না। তাঁহার অনু-

মান সত্য প্রমাণিত হওয়ায় এবং স্থানটী সকল প্রকারে তপস্যানুকূল বুঝিয়া তিনি তখন নানা জল্পনা কল্পনা করিতে করিতে পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিলেন এবং কিঞ্চিৎ কন্দমূল আহরণ করিয়া তদ্দ্বারা সেদিনকার মত ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া অপরাহ্নে উত্তরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

ঐ ঘটনার কিছুকাল পরে এই অলৌকিক বালকই নিজ শিষ্যগণের কল্যাণার্থ এই বৈরভাবশূন্য স্থানে তাঁহার প্রধান মঠ স্থাপন করেন। আমরা সেই কথাই এখন পাঠককে বলিব।

নর্ম্মদাতীরে গুরুপদপ্রান্তে কিছুকাল বাস করিয়া সিদ্ধিলাভের পর শঙ্কর মাহিষ্মতীতে মণ্ডন মিশ্রকে বাদে পরাজিত করেন। মণ্ডন মিশ্রকে স্বমতে আনয়ন করিয়া তিনি মহারাষ্ট্র প্রভৃতি নানাদেশে বেদান্তমত প্রচার করিতে করিতে দক্ষিণদেশাভিমুখে আগমন করিতে থাকেন। দক্ষিণদেশীয় শিষ্যদিগের সুবিধার জন্য এই সময় তিনি এই দেশে একটী মঠ নির্ম্মাণ করা নিতান্ত আবশ্যক বোধ করেন। অনন্তর কোথায় ঐ মঠ নির্ম্মাণ করিবেন, চিন্তা করিতে করিতে সহসা তাঁহার অন্তঃকরণে নর্ম্মদাতীরে গুরু গোবিন্দনাথের নিকট গমনকালে পূর্ব্বদৃষ্ট সর্ব্বতোভাবে বৈরিভাবশূন্য বিভাণ্ডকের আশ্রম শৃঙ্গেরীর কথা উদিত হইল। তিনি তখন সশিষ্যে শৃঙ্গেরী আসিলেন এবং বিভাণ্ডক-আশ্রমের পাদদেশে তুঙ্গাতীরে তাঁহার সর্ব্বপ্রথম মঠ স্থাপন করিলেন। ইহাই আচার্য্যের শৃঙ্গেরী মঠ।

শ্রীবলী হইতে বহির্গত হইয়া আচার্য্যদেব সশিষ্যে শৃঙ্গগিরিতে অবস্থান করিতেছেন।

প্রভাতকাল। তরুণ অরুণ উদিত হইয়া উন্নত পর্ব্বতচূড়ার পার্শ্ব হইতে মঠশীর্ষ আলোকিত করিয়াছে। অন্ধকার যেন তখন মানব-বসতি পরিত্যাগ করিয়া নিবিড় অরণ্যের নিকুঞ্জমধ্যে আত্মগোপনের চেষ্টা করিতেছে। প্রভাতকিরণ দূরে তুঙ্গাবক্ষে পতিত হওয়ায় নদীর জল যেন গলিত সুবর্ণের আকার ধারণ করিয়াছে। হংস হংসী আনন্দে পুলকিত হইয়া নদীবক্ষে যথায় স্থির জল দেখিতেছে, তথায় যাইয়া আহার্য্য সংগ্রহ করিতেছে। বিহগকুল নীড় পরিত্যাগ করিয়া বৃক্ষশাখে বসিয়া মনের আনন্দে মধুর স্বরে নানাপ্রকার কাকলি কূজনে নব রবির অভ্যর্থনা করিতেছে। মঠবাসী সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারিগণ দুই একটী করিয়া স্নানার্থ নদীতীরাভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। দূরবর্ত্তী পার্ব্বত্য গ্রামের গৃহপালিত মেষ মহিষ গাভী প্রভৃতি একটী একটী

করিয়া তুঙ্গাতীরস্থ শষ্পশ্যামলা ক্ষেত্রোপরি দেখা দিতেছে। উষা-সমাগমে প্রাণিবর্গের যেমন ধীরে ধীরে অজ্ঞানতা দূর হইতেছে, অমনি প্রভাতী সমীরণ মৃদু মধুর হিল্লোলে অপূর্ব্ব শান্তি প্রদান করিয়া জগৎবাসীকে সুখী করিতেছে।

ক্রমে মঠবাসিগণ স্নানাহ্নিকাদি নিজ নিজ নিত্যক্রিয়া সমাপন করিলেন। এইবার আচার্য্যদেবের নিকট তাঁহাদের পাঠগ্রহণের সময় উপস্থিত হইল। পদ্মপাদ নদীতটে সুমার্জ্জিত সুবৃহৎ শিলাখণ্ডোপরি একখানি কুশ ও মৃগচর্ম্মনির্ম্মিত আসন বিছাইয়া দিলেন। অল্পক্ষণ পরেই আচার্য্য শঙ্কর ধীরে ধীরে তাহার উপর আসিয়া বসিলেন। শিষ্যগণ তাঁহার চারিপার্শ্বে অপেক্ষাকৃত নিম্নস্থানে আসিয়া বসিলেন। পাঠ আরম্ভ হইবে এমন সময় সহসা পূর্ব্বাপরিচিত এক যুবক আসিয়া নতজানু হইয়া আচার্য্যকে প্রণিপাত করিল; প্রণাম করিয়া মুগ্ধহৃদয়ে অনিমেষনয়নে করজোড়ে আচার্য্যদেবের মুখপানে চাহিয়া রহিল। শিষ্যগণ তাহার ঐরূপ ভাব দেখিয়া বিস্মিত হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিলেন।

আচার্য্য তাহার স্বাভাবিক প্রশান্ত বদন দেখিয়া তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, এবং আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক তাহার শুভ জিজ্ঞাসা করিলেন।

আচার্য্যের মধুরস্বর যেন যুবকের প্রাণে অমৃত সিঞ্চন করিল। সে তখন করজোড়ে বলিল, "ভগবন্! আমি অতি দীন হীন। আমার নাম গিরি। জাতিতে আমি ব্রাহ্মণ, আমি আপনার নিকট আসিয়াছি।"

গিরির বাক্য শুনিয়া আচার্য্যদেব বলিলেন, "বল বৎস, তুমি কি উদ্দেশ্যে এখানে আসিয়াছ? এ শরীর দ্বারা তোমার কি উপকার সাধিত হইতে পারে।"

যুবক আচার্য্যের কথা শুনিয়া যেন হাতে স্বর্গ পাইল। সে তখন বিনীতভাবে কহিল, "ভগবন্! আমি অতি মূর্খ ও স্থূলবুদ্ধি বলিয়া বেদান্তকথিত তত্ত্বজ্ঞানলাভে অসমর্থ। আমার বিদ্যা ও পাণ্ডিত্য কিছুই নাই, আমি ঘোর মূর্খ। দেব! আমি যেখানে গিয়াছি, মূর্খ বলিয়া আমায় সকলেই পরিত্যাগ করিয়াছে। ভগবন্! এক্ষণে আপনার চরণান্তিকে আসিয়াছি। আপনি যদি কৃপা করিয়া আমায় উদ্ধার করেন।"

এই বলিয়া যুবক পুনরায় আচার্য্যের উদ্দেশে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল এবং দরবিগলিত ধারায় অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল।

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য তাহার সরল সুমিষ্ট সত্য কথা ও নিরভিমানিতা দেখিয়া তাহার প্রতি অতীব সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি সস্নেহে তাহাকে বলিলেন, "আচ্ছা বৎস! তুমি এখানেই থাক, ভগবান্ তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন।" অনন্তর আচার্য্য পদ্মপাদকে তাহার থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিতে বলিলেন। পদ্মপাদও আচার্য্যের নিদেশানুসারে গিরির জন্য মঠের মধ্যে একটী স্থান দেখাইয়া দিলেন এবং তাহার আহারাদির জন্য একজন গৃহস্থ সেবককে বলিয়া দিলেন।

অবিলম্বে পদ্মপাদ আচার্য্যচরণে পুনরায় উপস্থিত হইয়া পাঠ শ্রবণ করিতে লাগিলেন। গিরিও কালবিলম্ব না করিয়া পুনরায় আচার্য্যের নিকট আসিলেন ও একস্থানে বসিয়া পাঠ শ্রবণ করিতে লাগিলেন।

গিরির কিছুই বিদ্যা ছিল না; সুতরাং পাঠের তিনি কিছুই বুঝিতেন না। তিনি কেবল ভাবিতেন কি রূপে গুরুদেবের সেবার অধিকারী হইতে পারিবেন। কখন একটু অবকাশ পাইবেন যখন গুরুদেবের কোনরূপ সেবা কার্য্য করিয়া ধন্য হইবেন। কিন্তু প্রথম প্রথম তাঁহার ভাগ্যে উহা বড় একটা ঘটিত না। কারণ, পদ্মপাদাদি শিষ্যগণ সর্ব্বদাই আচার্য্যের নিকট থাকিয়া তাঁহার সেবা করিতেন। তথাপি গিরি ছায়ার ন্যায় আচার্য্যের অনুগমন করিতেন। আচার্য্য বসিলে বসিতেন, উঠিলে উঠিতেন, এবং রাত্রে আচার্য্য প্রভৃতি সকলে নিদ্রিত হইলেও জাগিয়া বসিয়া থাকিতেন। কেবল মধ্য রাত্রে দু এক ঘণ্টা কালমাত্র নিদ্রা যাইতেন।

এইরূপে স্বল্পকাল অতিবাহিত হইতে না হইতেই আচার্য্য একদিন গিরিকে ডাকিয়া সন্ন্যাসমন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন, এবং সেই দিন হইতে পদ্মপাদ প্রভৃতির ন্যায় তাহারও সহিত সদালাপ করিতে লাগিলেন।

গিরি অতি অল্পদিন মাত্র ব্রহ্মচারিরূপে থাকিয়াই সন্ন্যাস-দীক্ষা লাভ করায় পদ্মপাদ প্রভৃতি অপর শিষ্যগণ একটু বিস্মিত হইলেন। তাঁহারা গিরির প্রতি আচার্য্যের ঐরূপ দয়া দেখিয়া নানারূপ চিন্তা করিতেন। কখন ভাবিতেন, আহা! আমরা যদি গিরির মত হইতে পারিতাম, তাহা হইলে আজ গুরুদেব আমাদিগকে কতই কৃপা করিতেন; আমরা এত দিনে গুরুদেবের যেরূপ প্রিয় হইতে পারিয়াছি, গিরি দেখিতেছি, আজ কয় দিনেই তদপেক্ষা অধিক প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে।" কখন মনে করিতেন, বিনীতস্বভাব গিরি মূর্খ বলিয়াই বোধ হয় গুরুদেবের এত

কৃপাপাত্র হইল; আমাদের ঐরূপ মূর্খ হওযাই বাঞ্ছনীয়। আবার কখন বা গিরির প্রতি তাহাদের সন্দেহ হইত। ভাবিতেন—গিরি ত শ্রীশৈলে উগ্রভৈরবের ন্যায় কোন দুরভিসন্ধি হৃদয়ে পোষণ করিয়া আচার্য্যের ঐরূপে চিত্ত হরণ করিতেছে না? কারণ, শ্রীশৈলের ঘটনা তাঁহাদের সকলের বিশেষতঃ পদ্মপাদের অন্তরে সর্ব্বদা জাগরূক ছিল। পদ্মপাদ সেজন্য গিরিব প্রতি সমধিক সন্দেহান্বিত রহিলেন।

এদিকে গিরির আচাব ব্যবহার ও স্বভাব বড় চমৎকার। তিনি মিষ্ট-ভাষী, সর্ব্ব জীবে দয়ালু ও গুরুগতপ্রাণ। প্রত্যহ অতি প্রত্যুষে স্নান, আহ্নিক সমাপন করিযা তিনি পদ্মপাদ প্রভৃতি অপর শিষ্যদের আসিবার পূর্ব্বেই আচার্য্যদেবের শৌচাদির জন্য জল মৃত্তিকাদি এবং মুখ প্রক্ষালনার্থ দন্তকাষ্ঠ লইয়া দণ্ডায়মান থাকিতেন। আচার্য্যেব স্নানকালে সযত্নে তাঁহার হস্তে গাত্রমার্জ্জনী প্রদান করিতেন। বস্ত্রপরিবর্ত্তনকালে শুষ্ক বস্ত্র লইয়া আচার্য্যের নিকট দাঁড়াইযা থাকিতেন। ত্রিসন্ধ্যা আচার্য্য-পরিত্যক্ত বস্ত্র ধৌত করিয়া দিতেন এবং বিশ্রামকালে গুরুদেবের পদ-সম্বাহন করিয়া দিতেন।

গুরুসেবার জন্য গিরির এতাদৃশ আগ্রহ দেখিয়া আচার্য্য ক্রমে ঐ সকল কার্য্যের নিমিত্ত পদ্মপাদাদিকে আর না বলিয়া গিরিকেই সর্ব্বদা আদেশ করিতে লাগিলেন এবং ক্রমে গিরিই ঐরূপে আচার্য্যের সেবার ভার সম্পূর্ণ প্রাপ্ত হইলেন। ইহাতে অন্যান্য শিষ্যেরা গিরির উপর আবার বিরক্ত হইলেন। তাঁহারা ভাবিতে লাগিলেন, গিরির জন্য আমরা কি গুরুসেবা হইতে এককালে বঞ্চিত হইব? আবার তাঁহারা নিজ নিজ পাঠ ও ধ্যান সমাধি প্রভৃতি অভ্যাসের জন্য সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকিতেন। এজন্য গিরিও গুরুসেবার যথেষ্ট অবসর পাইতেন। পদ্মপাদাদি কেহ কেহ তাহাতে মনে করিতেন, গুরুদেবই যখন আমাদিগকে সাধন-ভজনের জন্য আদেশ করিতেছেন, তখন তাহাই আমাদের কর্ত্তব্য। গিরি মূর্খ, সেজন্যই বা গুরুদেব তাহাকে সেবাকার্য্যে রাখিয়াছেন। অন্য সময়ে আবার তাঁহারা অতীত বিষয়ের অর্থ জ্ঞানে এবং নিজ মনকে যথার্থ আয়ত্ত করিতে অসমর্থ হইয়া ভাবিতেন গুরু সেবাই সর্ব্বাভীষ্ট লাভের মূল, গুরুসেবার নিকট নিজ শক্তিবলে স্বাধ্যায় সাধন ভজন প্রভৃতি সকলই বৃথা। অতএব আজি হইতে গুরুদেবের সর্ব্বতোভাবে

শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার সেবাকার্য্যেই প্রধানতঃ ব্যাপৃত থাকিব। তাহার সমুদয় সেবাকার্য্য গিরিকে আর করিতে দিব না।—কিন্তু ঐরূপ ভাবিলেই বা কি হইবে?—গিরি এখন অনেক দূর অগ্রসর। তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া আচার্য্যের সেবাধিকার পূর্ব্বের ন্যায় পুনর্বায় লাভ করা এখন আর সহজ নহে। এখন আচার্য্যও গিরির সেবায় অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। পদ্মপাদ প্রভৃতির মনে হইত, তিনি যেন গিরিকৃত সেবায় অধিকতর সুখী হয়েন। ফলে পদ্মপাদাদি শিষ্যপ্রধানেরা ঐরূপে গিরির প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হওয়ায় গিরি ক্রমে সকলেরই অপ্রিয় হইয়া উঠিলেন।

সরলস্বভাব গিরি কিন্তু পদ্মপাদ প্রভৃতি সকলের প্রতি সমান সম্মান প্রদর্শন করিতেন। নিজে মূর্খ বলিয়া তিনি সর্ব্বদাই অতি কুণ্ঠিত থাকিতেন এবং পদ্মপাদাদির বিরক্ত ভাব কখন কখন বুঝিয়া যথাসাধ্য তাঁহাদের সেবা ও আজ্ঞা পালন দ্বারা তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট রাখিতে চেষ্টা করিতেন।

ক্রমে সূক্ষ্মদর্শী আচার্য্যদেব শিষ্যবর্গের গিরির প্রতি ঐরূপ মনোভাব বুঝিতে পারিলেন। তিনি ভাবিলেন, সন্ন্যাসাশ্রম-বিগর্হিত ঈর্ষাদ্বেষাদিভাব ইহাদের অন্তরে ক্রমে ক্রমে স্থান লাভ করিতেছে, উহার চরমে ইহাদের অবনতি অনিবার্য্য হইবে। অতএব একদিন ইহাদের শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তিনি সহসা ঐ বিষয়ে কাহাকেও কিছু বলিলেন না।

কয়েক দিন গত হইলে, একদিন অপরাহ্ণে আচার্য্যের ভাষ্যব্যাখ্যাকাল উপস্থিত হইল। পদ্মপাদ, সুরেশ্বর, হস্তামলক, চিৎসুখ প্রভৃতি প্রধান শিষ্যসমূহ আচার্য্যদেবের নিকটে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা যথারীতি গুরুদেবকে প্রণিপাত করিয়া নিজ নিজ আসন গ্রহণ করিলেন।

আচার্য্যদেব পাঠার্থ উদ্যত হইয়া দেখিলেন, গিরি তথায় অনুপস্থিত। জিজ্ঞাসায় জানিলেন গিরি নদীতটে গুরুদেবের বস্ত্র প্রক্ষালনার্থ গমন করিয়াছেন। সুতরাং তিনি তাহার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

তাহার বিলম্ব দেখিয়া পদ্মপাদ প্রভৃতি ব্যস্ত হইয়া পাঠ আরম্ভ করিতে অনুরোধ করিলে আচার্য্যদেব বলিলেন, "বৎস! একটু অপেক্ষা কর, এখনই গিরি আসিবে, এখন আরম্ভ করিলে সে সমগ্র বিষয় শুনিতে পাইবে না।"

আচার্য্যদেবের ঐ কথা শুনিয়া পদ্মপাদ ক্ষান্ত হইলেন, কিন্তু বলিলেন, "ভগবন্! সে তো মূর্খ; শাস্ত্রে অনধিকারী; সে এ সমস্ত কিছুই বুঝে না; অতএব সে জন্যই তাহার নিমিত্ত অপেক্ষা করা নিষ্প্রয়োজন ভাবিয়াছিলাম।"

পদ্মপাদের কথা শুনিয়া আচার্য্য মনে মনে একটু হাসিলেন এবং পদ্মপাদের গর্ব্বচূর্ণ মানসে ও গুরুভক্ত গিরির প্রতি করুণা বশতঃ তখনই যোগবলে গিরিকে মনে মনে পরা বিদ্যা প্রদান করিলেন।

এদিকে বস্ত্র প্রক্ষালন করিতে করিতে গিরির হৃদয়ে সহসা কি এক অভূতপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল। তাঁহার হস্ত হইতে বস্ত্র স্খলিত হইল। এতদিন এ জগৎ সংসার তিনি যে চক্ষে দেখিতেছিলেন, আজ তাহা অন্য চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। ইট পাথর গাছপালা আজ তাঁহার নিকট আর সে জিনিষ নাই! আকাশ, আলোক, জল, বায়ু আজ আর তাঁহার নিকট পূর্ব্বদৃষ্ট ভিন্ন ভিন্ন অচেতন পদার্থ নহে! ঐ সকল আজ তাঁহার নিকটে তাঁহার নিজের আমিত্ব মাত্রের দ্বারা গঠিত ও অনুস্যূত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল! জ্ঞান, অজ্ঞান, প্রিয়, অপ্রিয় প্রভৃতি দ্বন্দ্বসমূহ আজ তাঁহার মানসপট হইতে কে যেন একেবারে মুছিয়া দিল! তিনি যেন আর সে গিরি নাই! তিনি যে সকলের কৃপাপাত্র মূর্খ গিরি, তাহা তিনি আজ ভুলিয়া যাইয়া আপনাকে চিৎস্বরূপ আত্মা বলিয়া প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে লাগিলেন।

ঐ ভাবে কিছু ক্ষণ তিনি বিহ্বলের ন্যায় দণ্ডায়মান থাকিয়া পুনরায় পূর্ব্বস্মৃতি লাভ করিলেন। তিনি তখন বুঝিলেন, ইহা তাঁহার প্রত্যক্ষ দেবতা প্রাণনাথ গুরুদেবের কৃপা। তাঁহার পরম দয়াল গুরুকৃপায় তাঁহার মত অধমও উদ্ধার পাইল, অসম্ভবও সম্ভব হইল। তিনি তখন ভক্তি, কৃতজ্ঞতা ও আনন্দে অবশ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার সর্ব্বদেহে পুলক-সঞ্চার হইল, নয়নে দর দর ধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। তিনি তখন সাবধানে গুরুদেবের বস্ত্রখানি লইয়া গুরুদেব সন্নিধানে আগমন করিতে লাগিলেন এবং সমাধি-উল্লাসে তাঁহাতে সহসা কবিত্বশক্তির উদয় হইয়া তাঁহার মুখ হইতে গুরুদেবের উদ্দেশ্যে তোটকচ্ছন্দে একটী সুন্দর স্তোত্র বহির্গত হইতে লাগিল।

"ভগবন্নুদধৌ মৃতিজন্মজলে সুখদুঃখ ঝষে পতিতং পতিতং।
কৃপয়া শরণাগতমুদ্ধর মামনুশাধ্যুপসন্নমনন্যগতিম্॥ ১॥

বিনিবর্ত্ত্য তরীং বিষয়ে বিষমাং পরিমুচ্য শরীরবিবদ্ধমতিং।
পরমাত্মপদে ভব নিত্যরতো জহি মোহময়ং ভ্রমমাত্মমতে ॥ ২ ॥
বিসৃজান্নময়াদিষু পঞ্চসু তামযমস্মি মমেতি মতিং সততং।
দৃশিরূপমনন্তমজং বিগুণং হৃদয়স্থমবেহি সদাহমিতি ॥ ৩ ॥
জলভেদকৃতা বহুতেব রবের্ঘটিকাদিকৃতা নভসোঽপি যথা।
মতিভেদকৃতা নু তথা বহুতা তব বুদ্ধিদৃশোঽবিকৃতস্য সদা ॥ ৪ ॥
দিনকৃৎপ্রভয়া সদৃশেন সদা জনবিত্তগতং সকলং স্বচিতা।
বিদিতং ভবতাঽবিকৃতেন সদা যত এবমতোঽসি সদেব সদা ॥ ৫ ॥

ভগবন্! যে সমুদ্রের মৃত্যু ও জন্মই জলস্বরূপ এবং সুখদুঃখ তন্মধ্যাগত মৎস্যস্বরূপ, আমি সেই ভবসাগরে পতিত হইয়া ব্যথিত হইয়াছি। আপনি করুণা করিয়া এই শরণাগত ব্যক্তিকে উদ্ধার করুন। আমার আর অন্য গতি নাই। আপনার শ্রীচরণপ্রান্তে উপস্থিত, শিক্ষা প্রদান করুন। ১। বিষয়ভোগ হইতে বিষম জীবন-তরী ফিরাইয়া শরীরবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া পরমাত্মার পদে নিত্য রত থাক; আমি আত্মা এই ধারণা স্থির রাখিয়া মোহময় ভ্রম ত্যাগ কর। ২। নিত্য-পরিবর্ত্তনশীল অন্নময় প্রভৃতি শরীরের পঞ্চকোষের প্রতি 'আমি আমার' ইত্যাকার বুদ্ধি একেবারে পরিত্যাগ কর। অনন্তর জন্মমরণশূন্য সকলের দ্রষ্টাস্বরূপে অবস্থিত নির্গুণ পরমাত্মাকে দেখিয়া উহাকেই নিজ যথার্থ স্বরূপ বলিয়া সর্ব্বদা জান ও ঐ জ্ঞান হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে স্থির রাখ। ৩। রবি এক হইলেও জলভেদে বহুরূপে প্রতিবিম্বিত হয়; আকাশ এক হইলেও ঘটাকাশ পটাকাশ-রূপে আধারভেদে তাহাতে প্রভেদ দৃষ্ট হয়; তদ্রূপ তুমিও অদ্বিতীয় অবিকারী এবং দ্রষ্টারূপে সর্ব্বদা বুদ্ধির পারে অবস্থিত হইলেও বহুবুদ্ধিভেদে বহুরূপে প্রতিভাসিত ও অনুভূত হও ॥ ৪। সূর্য্যের প্রভা যেমন সকল বস্তু প্রকাশ করে, চিৎস্বরূপ আত্মাও তদ্রূপ স্বয়ং সর্ব্বদা অবিকৃত থাকিয়া ধনজনাদি সকল বিষয় প্রকাশিত করিয়া রাখিয়াছেন। এইরূপে সদা অবিকৃত বলিয়া আপনাকে যখন দেখিয়াছ, তখন তুমি আপনিই সর্ব্বদা একমাত্র সৎ পদার্থ -এই ধারণা হৃদয়ে স্থির রাখ। ৫।

পদ্মপাদ প্রভৃতি দূর হইতে উক্ত সুললিত স্তোত্র ও মধুর কণ্ঠস্বর শুনিয়া অতিমাত্র বিস্মিত হইলেন এবং কে ঐ সুমধুর স্তোত্র পাঠ করিতে-

ছেন পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিবামাত্র দেখিলেন, গিরি করযোড়ে দরবিগলিত নেত্রে ঐ স্তোত্র পাঠ করিতে করিতে আসিতেছেন। তাঁহার মুখশ্রী তখন এমন অপূর্ব্ব ভাব ধারণ করিয়াছে যে, যে ব্যক্তি তাঁহার দিকে চাহিল, সেই মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় কেবল উহাই একদৃষ্টে দেখিতে থাকিল।

ক্রমে গিরি নিকটে আসিয়া আচার্য্যদেবের পাদপদ্মে পতিত হইলেন এবং তাঁহার চরণোপরি মস্তক লুণ্ঠন করিতে করিতে স্তোত্রপাঠ সম্পূর্ণ করিলেন।

অনন্তর সকলেই মুগ্ধ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, কি আশ্চর্য্য! নিরক্ষর গিরির মুখে এরূপ স্তোত্র কি করিয়া নির্গত হইল! যে আচার্য্যদেবের আশীর্ব্বাদে আজ গিরির হৃদয়ে বিদ্যা স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে, সেই আচার্য্যদেব পর্য্যন্ত বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে গিরির প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। গিরির স্তব শেষ হইলেও সকলে কিছুক্ষণ বিস্ময়ে নিস্পন্দ হইয়া রহিলেন। অনন্তর আচার্য্যদেব গিরিকে হস্ত ধারণ করিয়া উঠাইলেন এবং নিজ পার্শ্বে বসাইলেন। কিন্তু তখনও কাহাকেও কিছু বলিলেন না।

এইবার পদ্মপাদের অন্তরে মহা হুলস্থূল বাধিল। একদিকে বিষম লজ্জা এবং অপর দিকে স্বহৃদয়ে গুরুভক্তির অভাব দেখিয়া নিজের প্রতি নিরতিশয় ঘৃণা তাঁহাকে ব্যথিত করিয়া তুলিল। ইতিপূর্ব্বের সেই গর্ব্বভাব তখন তাঁহার হৃদয় হইতে কোথায় বিদূরিত হইয়া গেল এবং তিনি ও অপর সকলে গিরির প্রতি নিজ নিজ ব্যবহার স্মরণ করিয়া লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইয়া কিছুক্ষণ আচার্য্যদেব ও গিরির দিকে চাহিয়া দেখিতে পারিলেন না, মস্তক অবনত করিয়া বসিয়া রহিলেন। পরিশেষে পদ্মপাদ আর স্থির থাকিতে না পারিয়া আসন ত্যাগ করিয়া গুরুদেবের চরণে পতিত হইলেন ও নিজের হীনতার কথা উল্লেখ করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

আচার্য্য সস্নেহে পদ্মপাদকে তখনই উঠাইলেন, এবং তাঁহাকে উপলক্ষ করিয়া সমুদয় শিষ্যদিগকে সন্ন্যাসিজীবনের ইতিকর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে সদুপদেশ দিয়া শান্ত করিলেন।

বলা বাহুল্য, এই ঘটনার পর শিষ্যবর্গ কিছু দিনের জন্য পাঠ অপেক্ষা গুরুভক্তিসাধনেই অধিক মনোযোগী হইলেন। কারণ, তাঁহারা এখন প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াছিলেন যে, গুরুকৃপা হইলে কিছুই অপ্রাপ্য বা অসাধ্য থাকে না।

গিরি তোটকচ্ছন্দে কবিতা রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া সেই দিন হইতে 'তোটকাচার্য্য' নামে অভিহিত হইলেন।

ইউরোপীয় দর্শনের ইতিহাস।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।] [শ্রীকানাইলাল পাল এম, এ।

গ্রীক দর্শন।

সক্রেটীস।

সোফিষ্টগণের (Sophist) প্রভাবে গ্রীকদেশে দার্শনিক চিন্তার বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। তাঁহাদের আবির্ভাবের পূর্ব্বে গ্রীকদেশবাসীরা তৎকালপ্রচলিত ধর্ম্ম ও দার্শনিক মতে বিশ্বাস রাখিয়া এবং সামাজিক রীতি নীতি সকল পালন করিয়া শান্তিতে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছিল। সোফিষ্টগণই (Sophist) ঐ সকল মতামতের সত্যতা এবং ঐ সকল রীতিনীতির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে, প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া দেশবাসীর মনে ঘোর সংশয় জাগাইয়া তুলিয়াছিলেন। ফলে পূর্ব্ববিশ্বাস শিথিল হইয়া দেশময় একটী অশান্তির ভাব জাগিয়া উঠিয়াছিল। কেবল তাহাই নহে; সোফিষ্টগণ ঐ সংশয় মাত্র উত্থাপন করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, কিন্তু প্রচলিত মতামতের মধ্যে বিরোধ প্রদর্শন পূর্ব্বক, মানুষের পক্ষে পরমার্থজ্ঞানলাভ একান্ত অসম্ভব, একথাও প্রচার করিতে কুণ্ঠিত হন নাই!—ফলে তত্ত্ব-চিন্তা দেশ হইতে এককালে লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছিল।

এখানে একথাও বলা আবশ্যক যে, পূর্ব্ববর্ত্তী দার্শনিকগণ সংস্কার ও বিশ্বাস-বলে অনেক কথা বিনা বিচারে স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহাদের সিদ্ধান্ত সকল যে ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ হইবে ও তাঁহাদের প্রকাশিত মতামতের মধ্যে যে বিরোধ থাকিবে ইহা আদৌ অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু তাঁহাদের ঐ সকল মতামত ভ্রান্ত ও পরস্পর বিরোধী বলিয়া মানবের পক্ষে যথার্থ জ্ঞান লাভ যে অসম্ভব, সোফিষ্টদিগের এ সিদ্ধান্তটি কোন রূপে যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে করা চলে না। কারণ, পূর্ব্ব সংস্কার ও দেশ-প্রচলিত বিশ্বাসের একান্ত বশবর্ত্তী না হইয়াও যুক্তির সাহায্যে বিজ্ঞান-সম্মত পদ্ধতি অবলম্বন পূর্ব্বক ঐ বিরোধের একটা

সু-মীমাংসায় উপনীত হওয়া সম্ভবপর হইতে পারিত। সে যাহাই হউক একথাটি কিন্তু স্থির যে, যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া দার্শনিক চিন্তাস্রোত তখন গ্রীসে প্রবাহিত হইতেছিল, সেটী যথার্থ জ্ঞান লাভের বিশেষ অনুকূল ছিল না; এবং তজ্জন্যই তখন দর্শনের রাজ্যে নানা বিরোধের সৃষ্টি হইয়াছিল। ঐ প্রণালীর আমূল পরিবর্ত্তন সাধন না করিতে পারিলে সত্যলাভের সম্ভাবনা অল্পই হইয়া উঠিয়াছিল। দেশের ঐ অভাব পূরণ করিয়া নূতন প্রণালীতে (method) সত্যানুসন্ধান করিতে শিখাইবার জন্য এই কালে গ্রীসে পুরুষ-সুন্দর সক্রেটিসের অভ্যুদয়।

সংশয় না থাকিলে নির্ণয়ের কোন প্রয়োজন হয় না—এটী দর্শনশাস্ত্রানুমোদিত একটী মূল নিয়ম। তাই দেখি, সোফিষ্টগণের তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গে সক্রেটীসের অভ্যুদয়। পূর্ব্ব হইতেই আমাদের একথাটি মনে রাখা আবশ্যক যে, সক্রেটীস কোন নূতন দার্শনিক তত্ত্ব প্রচার করেন নাই; কিন্তু কিরূপ প্রণালী অবলম্বন করিলে সত্য জ্ঞান লাভ হওয়া সম্ভব, কেবলমাত্র ইহাই নির্দ্দেশ করিয়া যান এবং ঐরূপে তিনিই গ্রীসে দর্শনের মূল ভিত্তি প্রথম স্থাপন করেন। যে পথে যেখানে উপনীত হওয়া যায়, প্রথম হইতে সেই পথ অবলম্বন না করিতে পারিলে কেহই গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে পারে না। সক্রেটীস আবির্ভূত হইয়া এখন পথ নিরূপণ না করিয়া দিলে পরবর্ত্তী কালে প্লেটো (Plato) এবং এ্যারিষ্টটল (Aristotle) গন্তব্য পথে কখনই এতদূর অগ্রসর হইতে পারিতেন না। তাঁহারা সক্রেটীস-প্রদর্শিত মার্গ অবলম্বন করিয়া দর্শনশাস্ত্রকে চিরকালের জন্য যে অক্ষয় ধনে ধনী করিয়া গিয়াছেন, তাহার জন্য সক্রেটীসই সমধিক প্রশংসনীয়, সন্দেহ নাই।

মানবের দৈনন্দিন জীবন ও মানসিক চিন্তাসমূহের মধ্যে একটী ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে; সেজন্য দার্শনিক-বিশেষের মতামতের গভীরতার পরিমাণ করিতে হইলে তাঁহার জীবনী পর্য্যালোচনা করা প্রয়োজন। আবার যে স্থলে তিনি নিজ মতামত পরিষ্কারভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই,সামান্য ভাবে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন মাত্র, সে স্থলে, তাঁহার জীবনী পর্য্যালোচনা করিলেই ঐ মতামত যথাযথ ধরিতে পারা যায়। সক্রেটীস্ নিজ মতামত কোন গ্রন্থ বিশেষে লিপিবদ্ধ করিয়া না যাওয়ায় তাঁহার জীবনীই ঐ বিষয়ে আমাদের প্রধান অবলম্বনীয় হইয়াছে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে আমাদের বিস্তারিত ভাবেই তাঁহার জীবনী আলোচনা করিতে হইবে।

জীবনী।

পেলোপনিসান যুদ্ধের (Peleponesian War) শেষভাগে আন্দাজ ৪৬৯ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে ভাস্কর্য্যবিদ্যানিপুণ সফ্রোনিসিয়াসের (Sophroniseus) ঔরসে ও ফেনারিটের (Phaenarite) গর্ভে সক্রেটীস জন্ম গ্রহণ করেন। ফেনারিট ধাত্রী কার্য্যে সুনিপুণা ছিলেন। দরিদ্রবংশে জন্ম গ্রহণ করায় শৈশবে সক্রেটিসের বিদ্যালাভের বিশেষ সুবিধা হয় নাই। তজ্জন্য অঙ্কশাস্ত্রে, জ্যোতিষশাস্ত্রে ও সঙ্গীতশাস্ত্রেই তিনি সামান্য শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। ভবিষ্যৎ জীবনেও তিনি কোন খ্যাতনামা দার্শনিকের নিকট দর্শনশাস্ত্র রীতিমত শিক্ষা করেন নাই। অতএব দর্শনরাজ্যে তাঁহার চিন্তাসমূহ যে সম্পূর্ণ মৌলিক, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তবে পূর্ব্ববর্ত্তী দার্শনিকগণের মতসমূহ তিনি যে কিছুমাত্র জ্ঞাত ছিলেন না, একথা বলা যুক্তিসঙ্গত নহে। কারণ, নানামতাবলম্বী লোকের সহিত দার্শনিক তত্ত্বসমূহের আলোচনাই যে ঐ জ্ঞানলাভের অন্যতম উপায়, তাহা আর বলিতে হইবে না। সক্রেটীস প্রথম জীবনে পদার্থবিজ্ঞানচর্চ্চাতেই মানবজীবনের উদ্দেশ্যসম্বন্ধীয় সুগভীর তত্ত্বসমূহের যথাযথ জ্ঞান লাভে উহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নিষ্প্রয়োজনীয়তা জানিতে পারিয়া ক্রমে তিনি উহা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করেন। সোফিষ্টগণ প্রচারিত 'সত্য বা তত্ত্বজ্ঞান লাভ অসম্ভব'-রূপ মতবাদের সম্পূর্ণ নিরাকরণ করিয়া তিনি নিজ জীবনের প্রত্যেক কার্য্যেই ঐ জ্ঞানলাভের পরিচয় সর্ব্বসমক্ষে প্রদান করিয়াছিলেন। এইরূপে ঐ জ্ঞানলাভের পন্থা সুগম করিবার জন্য এবং দুঃখশোকপূর্ণ মানবজীবনে তল্লাভ ব্যতীত শান্তি কখনই সম্ভবপর নহে একথা বুঝাইবার জন্যই তিনি যেন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অপরিবর্ত্তনীয় সত্যবস্তুর জ্ঞানলাভ বা আত্মজ্ঞানলাভ করাই তাঁহার মহৎ জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। জীবনে ঐ লক্ষ্য স্থির রাখিয়া তিনি সেজন্য প্রথমে আত্ম পরীক্ষায় মনোনিবেশ করেন। "তুমি কে বা কি পদার্থ তাহাই জ্ঞাত হও—Know thyself"—উহাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান—সুবিখ্যাত ডেলফির মন্দিরে তিনি ঐ কথা দিব্যভাবাবিষ্ট সাধিকার মুখে দেবাদেশরূপে প্রথমে শ্রবণ করেন। তদবধি ঐ আদেশ তাঁহার মনে চিরকালের নিমিত্ত অঙ্কিত হইয়া সদাকাল তাঁহাকে আত্মপরীক্ষায় অভিনিবিষ্ট রাখিয়াছিল! অথবা আত্মরক্ষা দ্বারা আত্মজ্ঞান

লাভ করাই মানব জীবনের চরম লক্ষ্য—এই ধারণা লইয়াই তিনি জন্ম-গ্রহণ করেন এবং পূর্ব্বোক্ত নরাহ্নিত দৈবাদেশ তাঁহার হৃদয়ে ঐ ধারণা বদ্ধ-মূল করিয়া দেয়। এইরূপে পূর্ব্ববর্ত্তী দার্শনিকগণের ন্যায় জগতের সৃষ্টি-রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে চেষ্টা না করিয়া আত্মজ্ঞানলাভের জন্যই নিজ জীবন উৎসর্গ করেন; এবং প্রত্যেক মানবের উহাই লক্ষ্য হওয়া উচিত একথা নিত্য প্রচার করেন।

আবার কেবলমাত্র আপনার সংস্কার, বিশ্বাস বা অনুভূতির উপর নির্ভর করিলে অনেক সময়ে ভ্রমে পড়িতে হয়, এজন্য ঐ সকল অনুভূতি সম্বন্ধে অপরের সহিত আলোচনা করাও একান্ত প্রয়োজনীয়; সক্রেটীস বলিতেন, ঐ উপায়েই পরস্পরের ভ্রমপ্রমাদ দূরিত হওয়া সম্ভব।

সক্রেটীসের ধারণা ছিল, প্রত্যেক মানবের অন্তরে সত্যজ্ঞান নিত্য নিহিত রহিয়াছে। একজন অপরকে ঐ সত্যজ্ঞানবিকাশের সহায়তা করিতে পারে মাত্র। নতুবা তত্ত্বজ্ঞানরূপ রত্ন কেহ কাহাকেও দান করিতে পারে না। সেজন্য তিনি সোফিষ্টদিগের ন্যায় বাক্‌চাতুর্য্য বা কূট তর্কের দ্বারা আপনার মত বা বিশ্বাস অপরের হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়া দিতে চেষ্টা না করিয়া তাহাদিগের সহিত সত্য-সম্বন্ধীয় আলোচনা করিতেই কেবলমাত্র প্রবৃত্ত হইতেন এবং তাঁহাদিগের মতামত বিশ্লেষণপূর্ব্বক সম্যক্ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে তাঁহাদিগকে সহায়তা করিতেন। উহাতে তাঁহাদিগের ভ্রান্ত ধারণা সমূহ ক্রমে ক্রমে দূরীভূত হইয়া তাঁহাদের মনে যথার্থ সত্যলাভের আকাঙ্ক্ষা স্বতঃই জাগিয়া উঠিত। পূর্ব্বোক্ত উপায়ে তিনি অপরের ভিতর সত্য-রত্ন উদ্ধারের সাহায্য করিতেন মাত্র, নতুবা আপনাকে কোনও দিন জ্ঞানদাতা বা শিক্ষক বলিয়া প্রচার করেন নাই। যথার্থ সত্য সম্বন্ধে ঐ ভাবে আলোচনা করাই তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত হইয়াছিল। এই ব্রতে ব্রতী হইয়া অবধি তিনি নিত্য বিদ্যালয়ে রাজপথে হাট মধ্যে সামান্য কোন একটি প্রসঙ্গ লইয়া সাধারণের সহিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেন এবং সেই সামান্য প্রসঙ্গ হইতে ক্রমে ক্রমে উচ্চতর প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়া পরিশেষে তাহাদিগকে যথার্থ সত্য ও আত্মজ্ঞানলাভের পথে পরিচালিত করিতেন। অতএব এরূপ আলোচনা দ্বারা তিনি কেবলমাত্র তাহাদিগের বুদ্ধিবিকাশের সহায়তা করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন না, কিন্তু তাহাদের ধর্ম্মবুদ্ধিকেও সঙ্গে সঙ্গে জাগাইয়া দিতেন।

যথার্থ ধর্ম্ম এবং যথার্থ জ্ঞান অন্যোন্যাশ্রয়ী—Virtue is knowledge ইহাই তাঁহার উপদেশ ছিল।

চিন্তাশীল দার্শনিক বলিয়াই সক্রেটীস জগতে বিখ্যাত। কিন্তু ইতিহাসে তাঁহার স্বদেশপ্রেমেরও আমরা যথেষ্ট পরিচয় পাই। স্বদেশের জন্য তিনি তিন-বার যুদ্ধে যোগদান করেন! ঐ সময়ে যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি যে সহিষ্ণুতা ও সাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা আজিও জগৎকে চমৎকৃত করে! আহার্য্য ফুরাইয়া গিয়াছে বলিয়া সঙ্গীরা সকলে ভীত ও অস্থির; সক্রেটিসের কিন্তু তাহাতে কিছুমাত্র চাঞ্চল্য দেখা যায় নাই। দারুণ শীত; লোকে নানারূপ বস্ত্রাচ্ছাদন করিয়াও মুহ্যমান; সক্রেটিস তখনও অঙ্গে গ্রীষ্মোপযোগী পোষাক মাত্র ধারণ করিয়া পাদুকাশূন্য পদে বরফের উপর দিয়া প্রসন্নমনে চলিযা-ছেন—শীতের তীব্রতায় তাঁহার কোনরূপ কষ্টই যেন হইতেছে না! যুদ্ধে পরাজয় হইয়াছে—সৈন্যগণ ইতস্ততঃ পলায়ন-তৎপর, তিনি কিন্তু কিছুমাত্র ভীত না হইয়া ধীরপাদবিক্ষেপে রণস্থল পরিত্যাগ করিতেছেন! যুদ্ধ-ক্ষেত্রেও তিনি আত্মচিন্তা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়া থাকিতেন না। অথবা সামান্য সৈনিকেরা যেমন যুদ্ধের কোলাহলে উত্তেজিত জযোল্লাসে উন্মত্ত, পরাজয়ে বিষণ্ণ, এবং নিশ্চেষ্টতার সময় নিজ আত্মীয় পরিজনদিগের কথা স্মরণ করিয়া তাম্বুতে সুখশয়নে ও বিনিদ্র হইয়া কালযাপন করে, তিনি ঐ ভাবে সৈনিকজীবন অতিবাহিত করেন নাই।

সক্রেটীসের মত যথার্থ আত্মচিন্তাশীল লোকের পক্ষে ঐ ভাবে জীবন যাপন করা একেবারেই অসম্ভব। সেজন্যই দেখিতে পাই, রণক্ষেত্রের ভীষণ-তার ভিতরেও তাঁহার আত্মচিন্তার ব্যাঘাত ঘটে নাই। শুনা যায়, ঐ কালেও তিনি এক দিন অস্তোন্মুখ সূর্য্যের দিকে দেখিতে দেখিতে আত্ম-ধ্যানে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া এমন গভীরসমাধিমগ্ন হইযাছিলেন যে, অনা-হারে অনিদ্রায় শীতের দারুণ প্রকোপে বার ঘণ্টারও অধিক কাল এক স্থানে একই ভাবে দণ্ডায়মান ছিলেন।—পরে প্রভাতের রবি নিজ কিরণ-ছটায় আবার ধরা আলোকিত করিলে ঐ সমাধি হইতে ব্যুত্থিত হইয়া পরমাত্মার যশোগানে দিঙ্‌মণ্ডল মুখরিত করিয়া স্বকর্ত্তব্যে পুনরায় মনোনিবেশ করিয়া-ছিলেন! অতএব যুদ্ধে এরূপে যোগদান করাতেই আমরা তাঁহার স্বদেশ প্রেমের অতি মাত্র পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া থাকি। কি উপায়ে দেশের যথার্থ কল্যাণ সাধিত হইবে এই চিন্তাই যে, আত্মচিন্তার পরে তাঁহার হৃদয়

বিশেষভাবে অধিকার করিয়া বসিয়াছিল, এবিষয়ের পরিচয়ও আমরা উহাতে বিলক্ষণ পাইয়া থাকি।

একমাত্র জ্ঞানবলেই মানবের সর্ব্ববিধ কল্যাণ যথাযথ নির্দ্ধারিত হইতে পারে। জ্ঞানী ব্যক্তিই কেবলমাত্র দেশের যথার্থ কল্যাণ সাধন করিতে সক্ষম। মূর্খ জনসাধারণের হস্তে দেশের শাসন ভার অর্পিত হইলে কোন দিনও সুফল ফলিবে না। এজন্য এথেন্সের রাজ্যশাসনসমিতিতে যোগদান করিয়া এবং ঐ সমিতির মূর্খ সভ্যগণের মতের বিরুদ্ধে নিত্য দণ্ডায়মান হইয়া সক্রেটীস ঐ সভার সংস্কারকার্য্যেও এক সময়ে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। সে সময়ে তিনি কোনরূপ অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হয়েন নাই। শুনা যায়, আর্গিনুজ (Arginusal) যুদ্ধের পর নিহত সৈনিকদিগের মৃতদেহের সৎকার না হওয়ায় তদপরাধে এথেন্সের নৌ-বাহিনীর অধ্যক্ষ অভিযুক্ত হন। রাজকীয় শাসন-সভায় সক্রেটীস তখন যোগদান করিয়াছিলেন। পূর্ব্বোক্ত বিষয়ে অধ্যক্ষের কোন দোষ নাই জানিতে পারিয়া তিনি সর্ব্বসাধারণের মতের বিরুদ্ধে একাকী অকুতোভয়ে দণ্ডায়মান হইয়া ঐ অধ্যক্ষকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। (Thirty tyrants) ৩০ জন যথেচ্ছাচার শাসনকর্ত্তাদিগের রাজত্বকালেও সক্রেটিসের ঐরূপ নির্ভীকতার পরিচয় পাওয়া যায়। (Leon of salamis) সালামিস সহরের শাসনকর্ত্তা লিওনকে সমধিক প্রতাপশালী হইয়া উঠিতে দেখিয়া ঐ যথেচ্ছাচারিগণ লিওনের মনে রাজ্যবিপ্লবের অভিসন্ধি আছে বলিয়া মিথ্যাপরাধে তাঁহাকে অভিযুক্ত করিয়া সক্রেটিস ও অপর কয়েক জন ব্যক্তিকে তাঁহাকে (Leonকে) ধরিয়া আনিতে আদেশ করে। কেবলমাত্র সক্রেটীসই তখন তাহাদের সেই অন্যায় আদেশ পালন করিতে সাহসের সহিত অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। এই স্বার্থপর অজ্ঞ লোকসকলের সহিত রাষ্ট্রব্যাপারে লিপ্ত হওয়া অপেক্ষা জ্ঞানান্বেষণে ব্যাপৃত থাকা এবং অপরকে সেই কার্য্যে সহায়ত করাই তিনি পরিশেষে শ্রেষ্ঠতর কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার ধারণা হইল যে, ঐ ভাবে অপরের জ্ঞানবিকাশের সহায়তা করিয়া নিজ জীবন যাপন করিলে ক্রমে জ্ঞানী ও ন্যায়পর লোকের সংখ্যা দেশে বৃদ্ধি হইবে এবং ঐ সকল লোক দেশের শাসনসমিতিতে যোগদান করিলে ক্রমে দেশের যথার্থ কল্যাণ সাধিত হইবে ঐ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া এখন হইতে অপরের জ্ঞানবিকাশের সহায়তা করিয়াই তিনি ক্ষান্ত থাকিতেন,

রাষ্ট্র-ব্যাপারে লিপ্ত হইয়া দেশের কল্যাণ সাধনে আর অগ্রসর হইতেন না।

সক্রেটীসের জীবনী সম্বন্ধে আরও কয়েকটী কথা বলিয়া আমরা এ প্রসঙ্গ শেষ করিব।

সক্রেটীস্ (Xanthippe) জানিথিপ্‌কে বিবাহ করেন। কিন্তু তাঁহার সর্ব্বদা কর্কশ ব্যবহার ও মন্দ আচরণে তিনি দাম্পত্য জীবনের কোন সুখই কখনও উপভোগে সমর্থ হন নাই। আশ্চর্য্যের বিষয়, পত্নীর ঐরূপ নিয়ত নিরতিশয় অসদ্ব্যবহারেও তিনি কখন বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া আপন কর্ত্তব্যে ব্যাপৃত থাকিতে পারিতেন।

নিতান্ত দরিদ্রভাবে জীবন যাপন করিয়াও তিনি কোন দিন কোন বিষয়ের জন্য অভাব বোধ করেন নাই। বিত্তাভাব ও দুঃশীলা মুখরা পত্নীর জন্য সংসারে কিছুমাত্র সুখস্বচ্ছন্দতা না থাকিলেও তিনি কোন দিনই মনে অশান্তি ভোগ করেন নাই! তিনি বলিতেন—To want nothing is divine, to want as little as possible is the nearest possible approach to divine life—কোনওরূপ অভাবে পীড়িত না হওয়াই স্বতন্ত্র-স্বভাব দেবতার লক্ষণ; অতএব যাহার যত অভাববোধ অল্প, সে তত দেবত্বের দিকে অগ্রসর হইয়াছে। সকল প্রকার বাহ্য সম্পদ সক্রেটীস অতি তুচ্ছ বোধ করিতেন। বাহ্য প্রকৃতির অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যও তাঁহার চক্ষে মানবের অন্তরে অবস্থিত আত্মার সৌন্দর্য্যের নিকটে সর্ব্বথা পরাভূত বোধ হইত। বাদানুবাদকালে তাঁহার বাক্যে এমন অদ্ভুত মোহিনী শক্তি প্রকাশিত হইত যে, তাহা দ্বারা সকলে এককালে মুগ্ধ হইয়া পড়িত। অনেকে আবার ঐ আকর্ষণের স্রোতে পড়িয়া তাঁহার সঙ্গ-সুখেই সর্ব্বদা কালাতিপাত করিত! ইহারাই পরে Socratic school অথবা সক্রেটীসের ছাত্রবৃন্দ নামে সাধারণে অভিহিত হইত। ইহাদের সম্বন্ধে একথা কিন্তু আমাদিগের সর্ব্বদা মনে রাখা আবশ্যক যে, ইহারা অলৌকিক জীবনের অদ্ভুত আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে গুরুপদে বরণ করিয়া তৎকালে একসূত্রে গ্রথিত হইলেও কোন একটি দার্শনিক মতবিশেষের পোষকতা করিতে একত্র দলবদ্ধ হয় নাই।

— - —

কনখলের রামকৃষ্ণ-সেবাশ্রম।

(রামকৃষ্ণ-মিশন হইতে প্রেরিত)

প্রায় বিশ বৎসর পূর্ব্বে হৃষীকেশের তপোবনে এক ছপ্পরের ভিতর স্বামী বিবেকানন্দ রোগশয্যায় শায়িত। সঙ্গী শুশ্রূষাকারী গুরুভাই দেখিতেছেন, জীবনের আশা অতি অল্প; ভীষণ "তরাই ফিবারে" বা পাহাড়ী জ্বরে এই অপূর্ব্ব জীবন বুঝি অকালে কালতরঙ্গে ডুবিল। রোগীর ঔষধ নাই, পথ্য নাই; জ্বর নামিলে এক বড়ী কুইনাইন মেলে না, দুর্ব্বলতায় ঝিমাইয়া পড়িলে এক বিন্দু উত্তেজক ঔষধ বা 'ষ্টিমুলেণ্ট' নাই। সে বার দৈবযোগে রোগী মৃত্যুমুখ হইতে ফিরিয়াছিলেন, মানবজাতিকে গৌরব-মণ্ডিত করাইতে, জগদ্‌গুরু সন্ন্যাসীকে মানব সমাজ আবার ফিরিয়া পাইল।

কিন্তু নিষ্কাম স্বার্থলেশহীন মহতের যাতনা বহুর কল্যাণে পরিণত হয়; ইতিহাস বারংবার এ সাক্ষ্য দিতেছে। পাঠক, আজ যদি একবার হরিদ্বার কনখলে বেড়াইতে যান, তবে রামকৃষ্ণ-মিশন-সেবাশ্রম দেখিয়া ঐ সত্য হৃদয়ঙ্গম করিবেন।

কনখলে সুস্থ সাধু ব্রহ্মচারীর আহারের ব্যবস্থা বরাবরই আছে, আজও হিন্দুসমাজ সে কর্ত্তব্য ভুলে নাই; কিন্তু রুগ্ন সাধু ব্রহ্মচারী একেবারে নিরুপায়, ঔষধহীন, পথ্যহীন। এই গভীর অভাব মোচন করিবার জন্য ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দের কতিপয় শিষ্য বদ্ধপরিকর হন। তাঁহাদের ক্লান্তিহীন উদ্যম ও অধ্যবসায়ের ফলে তৎকালীন সামান্য পর্ণশালাস্থ দাওয়াইখানা আজ রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে পরিণত, ইহার সেবাকার্য্য কত দূর সফলতা ও পরিসর লাভ করিয়াছে, তাহা নিম্নোদ্ধৃত তালিকা দেখিয়া অনুমান করা যায়:—

বৎসর	মোট রোগি-সংখ্যা	আশ্রমে চিকিৎসিত আশ্রয়প্রাপ্তের সংখ্যা	চিকিৎসামাত্রপ্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা
জুন ১৯০১ হইতে ডিসেম্বর ১৯০২ খ্রীঃ	১০০৪	১৬৪	৮৫০
১৯০৩ খ্রীঃ	৭০২	৭৩	৬৯৯
১৯০৪ খ্রীঃ	২৫০০	৫৬	২৪৪৪
১৯০৫ খ্রীঃ	৩৪৭৭	৭০	৩৪০৭

বৎসর	মোট রোগি-সংখ্যা	আশ্রমে চিকিৎসিত আশ্রয়প্রাপ্তের সংখ্যা	চিকিৎসামাত্রপ্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা
১৯০৬ খ্রীঃ	৪৩৯০	৫৭	৪৩৩৩
১৯০৭ খ্রীঃ	৫৪৮৯	৯২	৫৩৯৭
১৯০৮ খ্রীঃ	৮০০২	৮৮	৭৯১৪
১৯০৯ খ্রীঃ	১০৩৯০	১২০	১০২৭০
১৯১০ খ্রীঃ	৯৫৫০	১১০	৯৪৩৭
মোট সংখ্যা	৪৭৫৫৮	৮৩১	৪৬৭২১

বলা বাহুল্য, সেবা-কার্য্যের এই উন্নতির মূলে যেমন এক দিকে সেবকগণের নিষ্কাম অধ্যবসায়, তেমনি আর এক দিকে সহৃদয় দাতৃগণের বদান্যতা উভয়ই বিদ্যমান। সম্প্রতি সেবাশ্রমে সেবকদিগের আশ্রমাবাস ব্যতীত দুইটি পৃথক বাটী অবস্থিত; একটিতে প্রধানতঃ রুগ্ন, নিরাশ্রয়, চিকিৎসাধীন সাধু-ব্রহ্মচারীদিগকে আশ্রয় দেওয়া হয়, অপরটিতে দাতব্য ঔষধালয় ও অস্ত্রাদি প্রয়োগের গৃহ বর্ত্তমান। ইহা ব্যতীত সুদূরাগত চিকিৎসা প্রার্থীদের থাকিবার একটি সামান্য গৃহও সেবাশ্রমের অন্তর্ভুক্ত।

কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, স্থানাভাববশতঃ কয়েক বৎসর হইতে আশ্রয়প্রার্থী অনেক রোগীকে সেবাশ্রম হইতে ফিরাইয়া দিতে হইতেছে। প্রথমতঃ, গৃহত্রয়বিশিষ্ট রুগ্নাবাসে সংক্রামক রোগগ্রস্তদের জন্য পৃথক্ স্থান নির্দ্দেশ করা সব সময় সম্ভবপর নহে; অথচ সংক্রামকরোগগ্রস্ত আশ্রয়প্রার্থীর সংখ্যা প্রতিবৎসরই বাড়িয়া যাইতেছে। দ্বিতীয়তঃ; বর্ত্তমান রুগ্নাবাসটি প্রধানতঃ সাধু ব্রহ্মচারীদের জন্যই ব্যবহৃত হইতেছে; অথচ হরিদ্বার কনখলের মত তীর্থস্থানে আশ্রয়প্রার্থী সাধারণ রোগীর দাবী সেবাশ্রম কোনও ক্রমেই উপেক্ষা করিতে পারেন না।

কনখলে যক্ষ্মাগ্রস্ত রোগীর সংখ্যাবাহুল্য দেখিয়া ১৯০৬ অব্দে সেবাশ্রম উহাদের পৃথক্‌বাসের জন্য জনসাধারণের দ্বারস্থ হন। বিধাতার আশীর্ব্বাদে ঐ পৃথগাবাস-নির্ম্মাণ আজ প্রায় শেষ হইতে চলিল। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, নির্ম্মাণের ব্যয় সংগৃহীত ৫০০০৲ পাঁচ হাজার টাকারও অধিক হইতেছে; আবাসটী অবশ্য যক্ষ্মারোগচিকিৎসার উপযোগী করিতে ত্রুটি হয় নাই। আশ্রমসেবকগণ নির্ম্মাণ-ব্যয়ের আধিক্যে আজ বিপন্ন হইয়া সাধারণের নিকট

ভিক্ষার্থী; সহৃদয় পাঠক, আপনি কি এ সময় ইঁহাদের সহায় হইতে বিমুখ হইবেন ?

কনখল সেবাশ্রমের কার্য্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও তাহার বর্ত্তমান অভাবের কথা পাঠকদিগকে আমরা জানাইয়াছি। সাধারণ রোগীদের জন্য ও সংক্রামক-রোগীদের জন্য পৃথক্ পৃথক্ রুগ্নাবাস নির্ম্মাণ করার দায়িত্ব হৃদয়বান্ পাঠকগণের উপর সংন্যস্ত। দেশ, কাল ও পাত্র হিসাব করিলে এমন সফল দান আর কি হইতে পারে ? পবিত্র হিমালয়ের পাদমূলে কনখল-প্রদেশে ভারতের জীবনক্ষেত্রে গঙ্গাজননী অবতীর্ণা হইতেছেন; ভারতের যা কিছু অতীত-গৌরব, তাহার মূলে পুণ্য গাঙ্গবারিস্পর্শ বিদ্যমান। কারণ, জীবন-রক্ষার সকল প্রয়োজন সাজাইয়া দিয়া ঐ বারি-স্পর্শই প্রাচীন আর্য্যসভ্যতার নিবাসভূমির নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিল। সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখিলে ঐ সভ্যতার বীজ উত্তরাখণ্ডের হিমগর্ভেই এককালে প্রচ্ছন্ন ছিল এবং গাঙ্গবারি-প্রবাহই ইহার একমাত্র পূজা স্থূল প্রতীক। উত্তরাখণ্ডের দ্বার-স্বরূপ কনখলই আর্য্যজননী গঙ্গার ভারতপ্রবেশ-সঙ্গম। আর পুরাণকথা কত ভাবেই না কনখলের তীর্থত্ব সম্পাদন করিতেছে। হে পাঠক, দান করিবার এমন উপযুক্ত স্থান আর কোথায় পাইবে ? দান-ধর্ম্ম কলির শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া শাস্ত্রে কীর্ত্তিত। বাস্তবিক, ব্যাধিপীড়িত, নিরাশ্রয়, নিঃসম্বল ভারতবাসীদের মধ্যে বিধাতা যাঁহাকে দান করিবার সামান্য অধিকারও দিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে এ অধিকারের যথার্থ মর্য্যাদা রাখা অপেক্ষা আর কি পুণ্য আছে ? আর, এ ক্ষেত্রে দানের পাত্র কে, তাহা কি পাঠক বুঝিয়াছেন ? যে ধর্ম্মরত্ন লাভ করিয়া ভারত পার্থিব সর্ব্ববিধ উন্নতি করতল-গত করিয়াছিল, যে ধর্ম্মরত্নের অধিকারই ভারতভূমির প্রতিষ্ঠার ও বাঁচিয়া থাকিবার একমাত্র হেতুভূত, সেই মহারত্নের সংরক্ষণে যাঁহাদের জীবন উৎসর্গীকৃত, তাঁহারাই, সেই সাধু ব্রহ্মচারিগণই, প্রধানতঃ এ ক্ষেত্রে দানের পাত্র; ইঁহাদের সেবাকার্য্যে ব্রতী হইয়াই সেবাশ্রম কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এখন কার্য্যের পরিসর ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতেছে, তাই সাধারণের দৃষ্টি আরও গভীর ভাবে আশ্রমের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া আবশ্যক। আমাদের এই নিবেদন যে, পাঠকগণের মধ্যে যিনি যাহা পারেন, নিম্নলিখিত যে কোন ঠিকানায় পাঠাইয়া এই পুণ্যকার্য্যের সহায়তা করুন।

( )

স্বামীব্রহ্মানন্দ, প্রেসিডেণ্ট, মঠ, বেলুড়, হাবড়া।

(২)

ম্যানেজার "উদ্বোধন" আফিস্, ১২, ১৩ নং গোপালচন্দ্র নিয়োগীর লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।

(৩)

স্বামী কল্যাণানন্দ, রামকৃষ্ণমিশন-সেবাশ্রম, কনখল, সহারাণপুর জেলা।

শ্রীবৃন্দাবন।

কোথা সে বৃন্দা জগদানন্দা গোপী চন্দনভূষিতা,
সুশীতল নীপ-নিভৃত-কুঞ্জে ব্রজগোপবধূ রুষিতা।
ধীর-সমীর-কম্পিত মৃদু স্বচ্ছবাহিনী যমুনা,
বিমল-শীকর-নিকরানন্দা কুন্দ শেফালী-শোভনা।
চন্দ্র ভূষিতা জ্যোৎস্না নিশিতে হরি-অভিসারে কামিনী,
আর কি আসে গো তমালের তলে মৃদু-মন্থর-গামিনী।
বক্র বর্হ-বিরচিত চূড়া পীত বাসে তনু আবরি,
ব্রজের কাননে নিলাজ কালিয়া আর কি বাজায় বাঁশরী।
তুষার-শুভ্র গোধনবৃন্দ ভাণ্ডীর তরু-বিতানে,
কানুর ইন্দু বদন বাহিয়া আর কি হাঁফালে সঘনে।
আর কি তেমনি নব বসন্তে হোলি উৎসবে ললনা,
রাঙ্গাইয়া দেয় বৃন্দা-বিপিন পূর্ণিত-হৃদি-ছলনা।
বাসক শয্যা রচিয়া রাধিকা শ্যাম-দরশ-লালসে,
আর কি জাগে গো নীরব যামিনী কুঞ্জ-কুটীরে আবেশে।
ছুটে কি যমুনা উজান বহিয়া তীর তরঙ্গে উছলি,
বিহগ গাহে কি কানু-কীর্ত্তন করি অস্ফুট কাকলি।
আর কি যশোদা সুরভির সম আকুল বৎস বিহীনা,
নীলকান্ত দরশ আশায় থাকে গো আর্দ্র-লোচনা।
শ্যাম সঙ্গে সকলি কি তবে লুপ্ত এবে গো গোকুলে,
স্মৃতির উৎস তবু এ বক্ষে দিবানিশি কেন উথলে।

শ্রীফণীন্দ্রনাথ ঘোষ।

কর্ম্ম।

(১)

আছে কি ধরায় হেন বিষম বন্ধন,
কেহ নাহি যাহে পায় ত্রাণ ?
দেহ হ'তে দেহান্তরে যাহার ভ্রমণ
দেব নরে সম বর্ত্তমান।
না মানে শাসন তার,
হেন আছে শক্তি কার,
ক্ষুদ্র নর করে প্রাণ পণ,
ক্রীতদাস সম রয় বাঁধা চিরন্তন।

(২)

ঈশাকার * জীব নর বহুশক্তিমান,
ধন-ধান্য-পূরিত আগার।
সগৌরবে বিজ্ঞানের শয্যায় শয়ান,
অপূরণ কি অভাব তার ?
কি অজ্ঞাত শক্তিবলে,
অকস্মাৎ পদে দ'লে
চূর্ণ করে তার অভিমান !
অলক্ষ্যেতে শক্তিধর কে গো আগুয়ান ?

(৩)

কাল যার ছিল হেথা সম্রাট্-আসন,
জয় যার গীত চারিভিতে,
বৈভবের, বিলাসের আনন্দ নর্ত্তন
উথলিত সদা যার চিতে,

---

* "So God created man in his own image" Genesis-chap 1 verse 27

সে কেন ভিখারিবেশে
চলিল অরণ্যদেশে
কে করে এ ভাগ্য-বিপর্য্যয় ?
অন্তরালে কে সে বলা করে অভিনয় ?

(৪)

সাজে কি নরের হেথা এত অভিমান,
কর্ম্ম-রজ্জু গলে বাঁধা যার ?
কুহকী নাচায় যারে পশুর সমান,
আস্ফালন বৃথায় তাহার !
মনে যা' কল্পনা আনে,
সম্পাদিতে নাহি জানে,
স্রোতে যেন ভাসে তৃণপ্রায়।
কোন্ যাদুকর নরে হাসায় কাঁদায় ?

(৫)

রাজা-প্রজা' পরে আছে সম অধিকার,
বিজ্ঞ অজ্ঞে সমান বাঁধন !
প্রাচীন নবীনে সম প্রভাব বিস্তার।
নারী-নরে সমান তাড়ন।
হে কর্ম্ম, কুহকী বীর,
তব কাছে নত শির
নাহি করে, হেন কেহ নাই !
তব শক্তি সনে যুঝে কারে হেন পাই ?

(৬)

কর্ম্মে নর হয় যোগী, কর্ম্মে যোগভ্রষ্ট।
কর্ম্মে পায় পদবী রাজার !
কর্ম্মে সমুন্নত জীব, কর্ম্মে পুনঃ নষ্ট !
কর্ম্মে দীন ভিখারী ধরার।
কর্ম্মে নর মারে, মরে,
কর্ম্মে নব জন্ম ধরে, *

---

* 'শস্যমিব মর্ত্ত্যঃ পচ্যতে শস্যমিবাজায়তে পুনঃ' কঠোপনিষৎ ১।৬

কর্ম্মে নর পায় পুরস্কার!
কর্ম্মে কটুবাক্য কত, কত তিরস্কার!

(৭)

কর্ম্মে কর্ম্মবীর হ'য়ে জগৎ মাতায়,
কর্ম্মে পুনঃ জড়-আচরণ!
কীর্ত্তি-গাথা সমস্বরে কা'র লোকে গায়,
কর্ম্মে কেহ নিন্দার ভাজন।
সিংহসম নর কত,
কর্ম্মে মেষে পরিণত,
নাহি আর তর্জ্জন গর্জ্জন!
কাপুরুষ হ'য়ে করে অকীর্ত্তি অর্জ্জন!

(৮)

কি কুক্ষণে আদি-নর-কর্ম্ম অনুষ্ঠান,
কে জানিত কর্ম্ম-ফল-কথা?
কর্ত্তা হ'য়ে এবে নর কিঙ্কর সমান,
কর্ম্মসূত্রে পায় কত ব্যথা!
কর্ম্মে কর্ম্ম বেড়ে যায়,
রক্ত-বীজ-জন্ম-প্রায়,
কর্ম্ম-জাল লূতাতন্তু-সম,
শেষহীন অন্তহীন ধাতার নিয়ম!

(৯)

নির্গুণ সগুণ হয় কর্ম্ম-বাসনায়,
কর্ম্মে হয় সৃজন সংহার!
কর্ম্ম-বীজ হ'তে কর্ম্ম-পাদপ জন্মায়,
বীজে পুনঃ বিটপি সঞ্চার!
স্রষ্টা, সৃষ্টি আদি হীন,
কহে শাস্ত্র সুপ্রাচীন;

গুণাতীত গুণে বিজড়িত,
কে বা বুঝে কর্ম্মে কত রহস্য নিহিত !

(১০)

কর্ম্ম-সূত্রে বাঁধি ধাতা এ বিশ্ব-সংসার,
কত খেলা খেলে সে চতুর !
বুঝিতে সে মহাতত্ত্ব শক্তি আছে কা'র ?
প্রেমময় লীলা সুমধুর !
সেই জন মহা জ্ঞানী,
ধন্য বলে তারে জানি,
কর্ম্ম-মর্ম্ম হ'য়ে অবগত,
নিষ্কাম হইয়া যিনি হ'ন কর্ম্মে রত।

(১১)

চেয়ে দেখ অতীতের অতি দূর দেশে,
উদেছিল নর-নারায়ণ !
রথী সনে রণ-ক্ষেত্রে সারথির বেশে
কর্ম্ম-গীতে ভরেছে ভুবন !
সে মহা-সঙ্গীত-রাগে
আজো কোটী নর জাগে,
কর্ম্ম-রস ক'রে আস্বাদন !
কর্ম্ম-মুক্তি অমৃতত্ব করে আকিঞ্চন।

(১২

যোগি-জন-লভ্য তত্ত্ব কুরুক্ষেত্র মাঝে,
যোগেশ্বর যোগের ভাণ্ডার
বিলাইল, বুঝাইল সারথির সাজে
বীর-কার্য্য যুদ্ধ অনিবার !
আসমুদ্র হিমাচল,
চুমিয়া চরণ-তল,

আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তা জগদন্তর্ব্যবস্থিতাঃ ; প্রাণিনঃ কর্ম্মজনিত সংসারবশবর্ত্তিনঃ।
রামানুজ শ্রীভাষ্যোদ্ধৃত প্রাচীন আচার্য্য উক্তি।

হ'ল ধন্য যাঁহারে পূজিয়া,
আজো যাঁর প্রেমে মত্ত কত নর-হিয়া !

(১৩)

জন্ম-মৃত্যু মাঝে বদ্ধ সংসার-কারায়,
হ'য়ে নর কত দুঃখী ছিল !
বার্দ্ধক্যের ক্ষীণতায়, ব্যাধির জ্বালায়,
নর-কুল কত যে কাঁদিল !
ল'য়ে ব্যথা নিজ বুকে,
ফেলি' অশ্রু নর-দুঃখে,
প্রাণসম প্রেয়সী ত্যজিল !
ধরাধামে আত্মত্যাগ দুন্দুভি বাজিল !

(১৪)

ত্যজিয়া রাজ্যের লিপ্সা নরের কল্যাণে,
সঁপিল সে আপন জীবন !
কর্ম্ম-বিজ্ঞানের তত্ত্ব লভি মহাধ্যানে,
প্রচারিল সেই মহাজন।
সেই 'বুদ্ধ' নর-লোকে,
অচঞ্চল সুখে, শোকে,
দেখাইল নির্ব্বাণের পথ !
কর্ম্ম-পারে যা'ন নর চড়ি' কর্ম্ম-রথ !

(১৫)

পুনঃ আসি দিল দেখা জর্দ্দানের তীরে
প্রাকৃত পুরুষ একজন !
প্রচারিল মহা-তত্ত্ব ভাসি অশ্রুনীরে,
ক্রসে ত্যজি অমূল্য জীবন !
ধন্য ধন্য তুমি ধীর,
কর্ম্মজ্ঞ প্রশান্ত বীর,
বুঝাইলে কর্ম্ম-তত্ত্ব-কথা !
ভ্রমান্ধ পাইল দৃষ্টি, শুনিয়া বারতা !

(১৬)

আচার্য্যের রূপ ধরি মন্ত্র-দেশ-মাঝে
এসেছিল জগতের গুরু!
আজো যাঁর অদ্বৈতের সিংহনাদ বাজে,
আজো যাহা জ্ঞানের সুমেরু।
ফুটিল সহস্রদল,
অদ্বৈতের সে কমল
রূপ রস গন্ধ ঢালে কত!
কর্ম্মে চিত্তশুদ্ধি ক'রে আনে জ্ঞান শত।

(১৭)

ধ'রেছিল পুনঃ কে সে সুগৌরাঙ্গ তনু?
নারী-নর অপূর্ব্ব মিলন!
হরিনাম মহা মন্ত্র—সর্ব্ব-কর্ম্ম-অনু,
বিলাইল নরে সেইজন!
শুধু নাম, শুধু প্রেম,
ভক্তির কষিত হেম,
মরি, মরি, কি অপূর্ব্ব কথা।
হরিনাম মহৌষধি হরে কর্ম্ম-ব্যথা!

(১৮)

মহাজন আ'র কত আসিল ধরায়,
কর্ম্ম-কথা করিতে জ্ঞাপন!
নানা মতে নানা ভাবে কর্ম্ম-মর্ম্ম গায়,
করি নর ভ্রম নিরসন!
কারা এরা নরাকারে
আসিয়া নরের দ্বারে,
নব নব কর্ম্ম আচরিয়া,
কর্ম্ম-তত্ত্ব-জ্ঞানে পূর্ণ করে নর-হিয়া?

(১৯)

পুণ্য-ভূমি ভারতের দূর প্রাচ্য ভাগে
আজি পুনঃ কেবা মহাজন ?
জেগে উঠে সুপ্ত ধরা যাঁর প্রেম-রাগে,
ত্যজি দীর্ঘ অলস শয়ন।
কেবা এ আচার্য্য-বর,
কর্ম্মি-কুল ধুরন্ধর,
'জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম্ম-সমন্বয়,'—
প্রচারিল নব তত্ত্ব,—উঠে জয়! জয়!

(২০)

ত্যজিয়া কাঞ্চন কাম, হ'য়ে ধ্যানরত,
কি তপস্যা আচরিলে তুমি!
অনশনে, অনিদ্রায় করি দিন গত,
প'ড়েছিলে শ্যামা-পদ চুমি!
বটতলে বিল্বতলে,
পূত ভাগীরথী কূলে,
যথা দেব করিলে সাধনা।
মহাতীর্থরূপে আজ তাহার গণনা।

(২১)

'কর্ম্ম হ'তে ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মের প্রসার,'
ছিল এই তত্ত্ব সুপ্রকাশ।
মহাজনগণ আসি, করিল প্রচার,
'কর্ম্মে হয় কর্ম্মের বিনাশ'।
যাগ, যজ্ঞ কর্ম্মচয়
কর্ম্মের প্রসূতি হয়;
স্বর্গ আদি উচ্চ লোকে বাস। *
কামনা-রহিত কর্ম্মে কাম্য-কর্ম্ম-নাশ।

* "জানাম্যহং শেবধিরিত্যানিত্যং, ন হ্যধ্রুবৈঃ প্রাপ্যতে হি ধ্রুবং তৎ'। কঠোপনিষৎ ২।১০ বা ১৯

(২২)

ঈশ আরাধনা এক কর্ম্মের লক্ষণ!
শাস্ত্রে কয়, নিষ্কাম সাধনা;
একাগ্রতা, জপ, ধ্যানে তাহার গণন,
সর্ব্ব-ত্যাগে সেই উপাসনা!
কিন্তু ঈশ-কৃপা ভিন্ন, *
কভু নাহি হয় ছিন্ন
সংসার সংশয় জীবের, †
কে জানে হইবে কবে সে লাভ নরের!

(২৩)

কেবা সে সৌভাগ্যবান্ অবনী ভিতরে
যার প্রতি ধাতা দয়াবান?
কামিনী-কাঞ্চন-লোভ ত্যজিয়া অন্তরে
ল'তে চায় সে রত্ন মহান্!
সনাতন শাস্ত্র বলে;—
ঈশ সনে দেখা হ'লে, ‡
টুটে যায় কর্ম্মের বন্ধন।
সে লাভ কি ভাব নর সুলভ এমন? §

(২৪)

তবে কি উপায় নাই সংসারী জীবের,
ছিঁড়িতে এ দৃঢ় কর্ম্ম-পাশ?
করতলগত মুক্তি না হ'বে নরের
রবে চির কর্ম্ম-ক্রীতদাস!

---

* 'সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে' - দেবী-সূক্ত। চণ্ডী।

† "This bondage can only fall off through the mercy of God" Hinduism Vivekananda

‡ "ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে"। মুণ্ডকোপনিষৎ ২।২।৮

§ "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"। মুণ্ডকোপনিষৎ ৩।২।৪

শ্রীগুরুর শিষ্য কয়,
আছে মুক্তি, নাহি ভয়,
জীবে নর কর শিব-জ্ঞান,
জীব-সেবা মহাব্রতে ঢাল মন প্রাণ!

(১৫)

বহুরূপে বহুরূপী সম্মুখে তোমার
চারিদিকে করেন ভ্রমণ,
নরে নরে নারায়ণ বিরাজে ধরার, *
হেথা সেথা কেন অন্বেষণ?
আর্ত্ত, বুভুক্ষিত, দীন,
যোগী, ভোগী, সাধু, হীন
সেবা কর অদ্বৈতের জ্ঞানে! †
কর্ম্ম-পাশ হবে ছিন্ন শিব-সন্নিধানে! ‡

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত।

মহাসমাধি।

(১)

শ্রীরামকৃষ্ণগগনের আর একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের স্নিগ্ধোজ্জ্বল কিরণমালার অমৃতবর্ষণ হইতে ভারত এবং সমগ্র পৃথিবী আজ বঞ্চিত হইয়াছে। স্বামী শ্রীবিবেকানন্দের দ্বারা শ্রীশ্রীউমামহেশ্বরের পরম পদে নিবেদিত, কুমারী নিবেদিতা, শ্রীগুরুসকাশে লোকজনহিতায় যে ব্রতাবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা অক্ষুণ্ণভাবে পূর্ণ করিয়া নিজ শরীর মন অদ্য আহুতি-স্বরূপে

---

* "সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরং" গীতা ১৩।২৮।

"ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ"। ঈশোপনিষৎ ১।

† এবং সর্ব্বেষু ভূতেষু ভক্তিরব্যভিচারিণী। কর্ত্তব্যা পণ্ডিতৈর্জ্ঞাত্বা সর্ব্বভূতময়ং হরিম্॥

‡ The ultimate of happiness should be reached when it becomes universal consciousness

Hinduism—Vivekananda

প্রদানপূর্ব্বক অভয়ধামে গমন করিয়াছেন, এবং তথা হইতে উচ্চতর কার্য্য করিবার অধিকারপ্রাপ্ত হইয়াছেন! নিজ প্রতীক উপহার দানকালে শ্রীগুরু একদিন আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিয়াছিলেন—"তুমি ভারতের ভাবী বংশধরগণের শিক্ষয়িত্রী হও।"—সিষ্টার নিবেদিতাও চতুর্দ্দশবর্ষ ঐ আদেশ কায়মনোবাক্যে বর্ণে বর্ণে পালন করিয়া অদ্য ঈশ্বর কৃপায় জ্বলন্ত জীবন্ত মৃত-সঞ্জীবক ভাব-তনুতে পরিণত হইয়াছেন এবং স্বীয় গুরুর সহিত প্রত্যেক ভারতভারতীর হৃদয় অপূর্ব্বভাবে আলোকিত করিয়া রহিবার এবং সূক্ষ্ম প্রেরণাশক্তিরূপে তাহাদিগকে কল্যাণের পথে নিত্য চালিত করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন! সূক্ষ্মই স্থূলের প্রেরক, মনই জড়ের নিয়ামক—অতএব কে বলিবে, নারীদেহে প্রকাশিতা নিবেদিতারূপ ভাবরাশির কার্য্য এখন হইতে প্রকৃষ্টরূপে আরম্ভ হইল কি না? সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন সাধক জন্ম-মৃত্যুর পারে দেখিয়া ঐ তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া এ গভীর বিষাদেও আনন্দিত হইতে পারেন!—কিন্তু স্বার্থগন্ধমাত্রহীন নিবেদিতার অদর্শনে ব্যথিতপ্রাণ স্থূল দৃষ্টি আমরা এ গভীর বিষাদ-রজনীর অবসান দেখিতে না পাইয়া মুহ্যমান হইয়া পাঠককে জানাইতেছি—

বিগত ২৮শে আশ্বিন শুক্রবার দিবা ৭৷৷০ ঘটিকার সময় ভারতের চির-কল্যাণাকাঙ্ক্ষিণী পরমাত্মীয়া ব্রহ্মচারিণী নিবেদিতা ভূস্বর্গ হিমালয়ের দার্জ্জিলিং সহরে আমাশয় রোগে কিঞ্চিদধিক দুই সপ্তাহকাল যন্ত্রণানুভব করিয়া নশ্বর স্থূল দেহ রক্ষা করিয়াছেন!—হরি ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

(২)

বিগত ১৭শে আশ্বিন শনিবার দিবা ১৷৷০ ঘটিকার সময় কলিকাতার ইণ্টালী পল্লীতে প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামকৃষ্ণ মিসনের শাখার সম্পাদক ভক্তিপ্রাণ শ্রদ্ধাস্পদ দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় শ্রীভগবানের অভয়পদে মিলিত হইয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণগতপ্রাণতা, অপরের সহিত সহানুভূতি এবং অন্যান্য অসংখ্য গুণে ইনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভক্তবৃন্দের হৃদয়ে বিশেষ শ্রদ্ধার স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ভাবরসাপ্লুত তাঁহার কোমলোজ্জ্বল সৌম্য মূর্ত্তিখানির পবিত্র দর্শন এখন হইতে অসম্ভব হইল ভাবিয়া আমরা নিতান্ত ব্যথিত হইয়াছি। শ্রীভগবান্ তাঁহার শিষ্যবর্গকে তাঁহারই ন্যায় উচ্চ পবিত্র লক্ষ্যে জীবন পরিচালিত করিবার শক্তি ও সান্ত্বনা প্রদান করুন!

স্বামি-শিষ্য-সংবাদ।

[শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এ]

গত কল্য শনিবার বিকালে শিষ্য বেলুড় মঠে আসিয়াছে। স্বামীজির শরীর তত সুস্থ নহে। শিলং পাহাড় হইতে সংপ্রতি স্বামীজি প্রত্যাগমন করিয়াছেন। তাঁহার পা ফুলিয়াছে; সমস্ত শরীরেই যেন জলসঞ্চার হইয়াছে। স্বামীজির গুরুভ্রাতৃগণ স্বামীজির জন্য বড়ই চিন্তিত হইয়াছেন। বউবাজারের মহানন্দ কবিরাজ স্বামীজিকে দেখিতেছেন। স্বামী নিরঞ্জনানন্দের অনুরোধে স্বামীজি কবিরাজী ঔষধ খাইতে অগত্যা স্বীকৃত হইয়াছেন। আগামী মঙ্গলবার হইতে জল নুন বন্ধ করিয়া ঔষধ খাইতে হইবে। আজ রবিবার।

শিষ্য জিজ্ঞাসা করিতেছে, "মশায়, এই দারুণ গরমিকাল। তাহাতে আবার আপনি ঘণ্টায় ৪'৫ বার করিয়া জল পান করেন, জল বন্ধ করিয়া ঔষধ খাওয়া আপনার অসহ্য হইবে।"

স্বামীজি ঃ—তুই কি বল্‌ছিস্? ঔষধ খাওয়ার দিন প্রাতে একবার, সংকল্প কর্‌বো। সাধ্যি কি জল আর কণ্ঠের নীচে নাবেন। উনি আর একুশ দিন নীচে নাব্‌তে পার্‌ছেন্ না। বুঝ্‌লি? শরীরটা ত মনেরই খোলস্। মন্ যা বল্‌বে, সেইমত ওকে চল্‌তে হবে। নিরঞ্জনের অনুরোধে আমাকে এটা কর্‌তে হ'লো। ওদের অনুরোধ ত আর উপেক্ষা কত্তে পারিনে।

স্বামী নির্ভয়ানন্দ এই সময় স্বামীজির সেবাশুশ্রূষায় নিযুক্ত। বেলা প্রায় ১০টা। স্বামীজি উপরেই বসিয়া আছেন। শিষ্যের সঙ্গে সহাস্য ও প্রসন্ন বদনে মেয়েদের জন্য যে ভাবী মঠ করিবেন, সে বিষয়ের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন। বলিতেছেন, "মাকে কেন্দ্রস্থানীয়া ক'রে গঙ্গার পূর্ব্বতটে মেয়েদের জন্য একটি মঠ স্থাপন কত্তে হবে। এ মঠে যেমন ব্রহ্মচারী সাধু সব তৈয়িরি হবে, ওপারের মেয়েদের মঠেও তেম্‌নি ব্রহ্মচারিণী সাধ্বী সব তৈয়িরি হবে।

শিষ্য ঃ—মহাশয়, ভারতবর্ষে পূর্ব্বকালে মেয়েদের জন্য ত কোন মঠের কথা ইতিহাসে পাওয়া যায় না? বৌদ্ধ যুগে এইরূপ Nunneryর কথা শুনা

যায় বটে ; কিন্তু উহা হইতে কালে নানা ব্যভিচার আসিয়া পড়িয়াছিল ; ঘোর বামাচারে দেশ পর্য্যুদস্ত হইয়া গিয়াছিল।

স্বামীজি :—তোরা পুরুষ মেয়েতে এতটা তফাৎ ভাবিস্ কেন? একই চিৎসত্তা সর্ব্বভূতে বিরাজ কচ্ছেন। তোরা মেয়েদের জন্য কি করেছিস্? শাস্ত্র ফাস্ত্র ত তোরাই লিখেছিস্। নিয়ম নীতিতে বদ্ধ ক'রে মেয়েদের কেবল maufacturing machine (পুত্র উৎপাদনের কল কারখানার মত) ক'রে তুলেছিস্ বইত নয়! মহামায়ার সাক্ষাৎ প্রতিমা এই সকল মেয়েদের না তুল্লে বুঝি তোদের আর উপায়ান্তর আছে?

শিষ্য :—ওরা ত মায়ার মূর্ত্তি। মানুষের অধঃপাতন জন্যই ওদের সৃষ্টি হইয়াছে। মানুষ জ্ঞানবৈরাগ্যের বিগ্রহ। মেয়েরা ত মায়া দ্বারা আমাদের সে জ্ঞানবৈরাগ্যের আবরণ করিয়া দেয়।

স্বামীজি :—কোন্ শাস্ত্রে এমন কথা আছে যে, মেয়েরা জ্ঞানের অধিকারিণী হবে না? ভট্‌চায্‌ বামুনরা শেষকালে যেমন ব্রাহ্মণেতর জাত্‌কে বেদ পাঠের অনধিকারী ব'লে নির্দ্দেশ কর্‌লে, মেয়েদেরও সেরূপ কর্‌লে। নতুবা বৈদিক যুগে, উপনিষদের যুগে,দেখ্‌তে পাবি—মৈত্রেয়ী, গার্গী প্রভৃতি ব্রহ্মবিচারে ঋষিস্থানীয়া হ'য়ে রয়েছেন। হাজার বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের সভায় গার্গী সগর্ব্বে যাজ্ঞবল্ক্যকে ব্রহ্মবিচারে আহ্বান করেছিলেন। এই সব আদর্শস্থানীয়া মেয়েদের যদি ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকার ছিল, তবে এখনই বা মেয়েদের সে অধিকার থাক্‌বে না কেন? একবার যা ঘটেছে, তা আবার অবশ্য ঘট্‌বে। History repeats itself (ঘটনাসমূহের পুনরাবৃত্তি ইতিহাস প্রসিদ্ধ)।

শিষ্য :—মহাশয়, কথায় বলে "মর্‌বে নারী উড়্‌বে ছাই, তবে নারীর গুণ গাই"।

স্বামীজি :—আবার এই মেয়েদের পূজা ক'রেই সব জাত্‌ বড় হ'য়েছে। যে দেশে—যে জাতে—মেয়েদের পূজা নাই, সে দেশ—সে জাত্‌ কখনো বড় হ'তে পারে নাই, কস্মিন্‌কালে পার্‌বেও না। তোদের জাতের যে এত অধঃপতন ঘটেছে, তার প্রধান কারণ এই সব শক্তিমূর্ত্তির অবমাননা করা! "যত্র নার্য্যস্তু নাভিনন্দন্তে সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ"। যেখানে স্ত্রীলোকের আদর নাই, স্ত্রীলোক নিরানন্দে অবস্থান করে, সে সংসারের—সে জগতের কখন উন্নতির আশা নাই। এইজন্য এদের আগে তুল্‌তে হবে। এদের জন্য আদর্শ মঠ স্থাপন কত্তে হবে।

শিষ্য :—মহাশয়, প্রথমবার বিলাত হইতে আসিয়া আপনি ষ্টার থিয়েটারে বক্তৃতা দিবার কালে তন্ত্রকে কত গালমন্দ করিয়াছিলেন। এখন আবার তন্ত্র-সমর্থিত স্ত্রী-পূজার সমর্থন করিয়া আপনার কথা আপনিই যে বদ্‌লাইতেছেন।

স্বামীজি :—আমি তন্ত্রের বামাচারকে নিন্দা করেছিলুম। মাতৃভাবের নিন্দা করি নাই। ভগবতী জ্ঞানে মেয়েদের পূজা করাই তন্ত্রের অভিপ্রায়। বৌদ্ধধর্ম্মের ঘোর বামাচারে এখনকার তন্ত্রশাস্ত্র influenced (পূর্ণ) হ'য়ে রয়েছে। ঐ সকল বীভৎস প্রথার নিন্দা করেছিলুম—এখনো ত তা করি। যে মহামায়ার দৃশ্যপ্রপঞ্চে, রূপরসাত্মক বাহ্যবিকাশে মানুষ উন্মাদ হ'য়ে চলেছে, সেই মাতৃরূপিণীর কোটি কোটি স্ফুরৎ বিগ্রহ মেয়েদের পূজা কত্তে নিষেধ করি নাই। "সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে।" এই মহামায়াকে প্রসন্না না কত্তে পার্‌লে সাধ্য কি ব্রহ্মা বিষ্ণু তাঁহার হাত ছাড়িয়ে যান্? গৃহলক্ষ্মীগণের পূজাকল্পে—তাদের মধ্যে ব্রহ্মবিদ্যাবিকাশকল্পে এইজন্য মেয়েদের মঠ ক'রে যাবো। বুঝ্‌লি?

শিষ্য :—আপনার উহা উত্তম সংকল্প হইতে পারে, কিন্তু মেয়ে কোথা পাইবেন? সমাজের কঠিন বন্ধনে কে কুলের মেয়েদের স্ত্রী-মঠে যাইতে অনুমতি দিবে?

স্বামীজি :—কেন রে? এখনো ঠাকুরের কত ভক্তিমতী মেয়েরা রয়েছেন। তাদের দিয়ে স্ত্রী-মঠ start (আরম্ভ) ক'রে দিয়ে যাব। "মা ঠাকুরাণী" তাদের central figure (কেন্দ্রস্বরূপ) হ'য়ে বস্‌বেন। আর তোদের স্ত্রী-কন্যারা উহাতে প্রথমে বাস কর্ব্বে। কারণ, তোরা এর উপকারিতা বুঝেছিস্। তার পর চাই কি, তোদের দেখাদেখি কত গেরস্থ এই মহাকার্য্যের সহায়কারী হবে।

শিষ্য :—ঠাকুরের ভক্তেরা এ কার্য্যে অবশ্যই যোগ দিবেন। কিন্তু সাধারণ লোকে এ কার্য্যের সহায় হইবে বলিয়া মনে হয় না।

স্বামীজি :—জগতের কোন মহৎ কার্য্যই sacrifice (ত্যাগ) ভিন্ন হয় নাই। বট গাছের অঙ্কুর দেখে কে মনে কত্তে পারে, কালে উহা প্রকাণ্ড বটগাছ হবে? এখন ত এইরূপে মঠ স্থাপন কর্‌বো। পরে দেখ্‌বি, কত generation (পুরুষ) বাদে এর কদর্ দেশের লোক বুঝ্‌তে পার্‌বে। এই যে বিদেশী মেয়েরা আমার চেলী হয়েছে, এরাই এই কার্য্যে জীবনপাত

ক'রে যাবে। তোরা ভয় কাপুরুষতা ছেড়ে এই মহৎ কার্য্যে সহায় হ'। আর এই উচ্চ ideal (আদর্শ) সকল লোকের সাম্‌নে ধর্। দেখ্‌বি, কালে এর প্রভায় দেশ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌বে।

শিষ্য ঃ—মহাশয়, মেয়েদের জন্য কিরূপ মঠ করিতে চাহেন, তাহার সবিশেষ বিবরণ আমাকে বলুন না। শুনিবার বড়ই উৎসাহ হইতেছে।

স্বামীজি ঃ—গঙ্গার ও পারে একটা প্রকাণ্ড জমি নেওয়া হবে। তাতে অবিবাহিতা কুমারীরা থাক্‌বে, আর বিধবা ব্রহ্মচারিণীরা থাক্‌বে। আর ভক্তিমতী গেরস্থের মেয়েরা মধ্যে মধ্যে এসে অবস্থান কত্তে পাবে। এ মঠে পুরুষদের কোনরূপ সংস্রব থাক্‌বে না। এই মঠের সাধুরা দূর থেকে স্ত্রী-মঠের কার্য্যভার চালাবে। ঐখানে মেয়েদের স্কুল হবে। তাতে ধর্ম্মশাস্ত্র, সাহিত্য, সংস্কৃত, ব্যাকরণ, চাই কি—অল্প বিস্তর ইংরেজীও শিক্ষা দেওয়া হবে। সেলাইয়ের কায, রান্না, গৃহকর্ম্মের যাবতীয় বিধান এবং শিশুপালনের স্থূল বিষয়গুলি শেখান হবে। আর জপ ধ্যান পূজা এসব ত শিক্ষার অঙ্গ থাক্‌বেই। যারা বাড়ী ছেড়ে একেবারে এখানে থাকতে পারে, তাহাদের অন্নবস্ত্রসংস্থান এই মঠ থেকে করা হবে। যারা তা পার্‌বে না, তারাও এই মঠে এসে পড়াশুনা করতে পার্‌বে। চাই কি, মঠাধ্যক্ষের অভিমতে মধ্যে মধ্যে এখানে থাক্‌তে পাবে। মেয়েদের ব্রহ্মচর্য্যকল্পে এই মঠে ব্রহ্মচারিণীরা ইহাদের শিক্ষার ভার নিবে। এই মঠে ৫।৭ বৎসর শিক্ষার পর মেয়েদের অভিভাবকেরা তাদের বিয়ে দিতে পার্‌বে। বা, তাদের মত হ'লে এখানে চিরকুমারীব্রতাবলম্বনে অবস্থান কত্তে পার্‌বে। যাহারা চিরকুমারীব্রত অবলম্বন কর্‌বে, তাহারাই কালে এই মঠের শিক্ষয়িত্রী ও প্রচারিকা হ'যে দাঁড়াবে। এরাই কালে গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে centres (শিক্ষাকেন্দ্র) খুলে মেয়েদের শিক্ষাবিস্তারে যত্ন কর্‌বে। চরিত্রবতী, ধর্ম্মভাবাপন্না ঐরূপ প্রচারিকাদের দ্বারা দেশে ক্রমেই শিক্ষার বিস্তার হবে। ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করা এ মঠেরও ভিত্তি হবে। ধর্ম্মপরতা, ত্যাগ ও সংযম এখানকার ছাত্রীদের অলঙ্কার হবে; আর সেবাধর্ম্ম তাদের জীবনব্রত হবে। এইরূপ আদর্শ জীবন্ দেখ্‌লে কে তাদের না সম্মান কর্‌বে—কেই বা তাদের অবিশ্বাস কর্‌বে? বুঝ্‌লি—তাদের জীবনে এগুলি দেখাতে হবে। তবে ত তোদের দেশে সীতা সাবিত্রী খনা গার্গীর আবার অভ্যুত্থান হবে। প্রাণহীন—স্পন্দনহীন দেশাচারের ঘোরবন্ধনে তোদের মেয়েরা কি

হ'য়ে দাঁড়ায়েছে, একবার ও দেশ দেখে এলে বুঝ্‌তে পাত্তিস্‌। এই দুর্দ্দশার জন্য তোরাই দায়ী। এই মেয়েদের পুনরায় জাগিয়ে তোলাও তোদের হাতে। তাই কাযে লেগে যা। কি হবে ছাই, বেদ বেদান্ত মুখস্থ ক'রে ?

শিষ্য :—মহাশয়, এখানে শিক্ষালাভ করিয়াও যদি মেয়েরা বিবাহ করে, তবে আর তাদের ভিতর আদর্শ জীবন কেমন করিয়া লোকে দেখিতে পাইবে ? এমন নিয়ম হইলে ভাল হয় না কি, যে, যাহারা এই মঠে শিক্ষালাভ করিবে, তাহারা আর বিবাহ করিতে পারিবে না।

স্বামীজি :—তা কি একেবারেই হয় রে ? শিক্ষা দিয়ে ছেড়ে দিতে হবে। তার পর নিজেরাই ভেবে চিন্তে যা হয় করবে। কিন্তু মেয়েদের ১৫ বৎসরের পূর্ব্বে বে করবার বা দেবার নামগন্ধটী থাকবে না। বুঝ্‌লি ?

শিষ্য :—মহাশয়, তাহা হইলে সমাজে ঐ সকল মেযেদের কলঙ্ক রটিবে। কেহই তাহাদের আর বিবাহ করিতে চাহিবে না।

স্বামীজি :—কেন চাইবে না ? তুই সমাজের গতি এখনো বুঝ্‌তে পারিস্‌ নি। এই সব বিদুষী ও কর্ম্মতৎপরা মেয়েদের বরের অভাব হবে না। "দশমে কন্যকাপ্রাপ্তিঃ" সে সব বচনে আর তোর সমাজ চল্‌ছে না— চল্‌বেও না। এখনি দেখ্‌তে পাচ্ছিস্‌ নে ?

শিষ্য :—যাহাই বলুন, কিন্তু প্রথম প্রথম ইহার বিরুদ্ধে একটা ঘোরতর আন্দোলন হইবে।

স্বামীজি :—তা হো'ক্‌ না। ভয় কি ? সৎসাহস সৎকার্য্য এতে বাধা পেলে শক্তি আরো জেগে উঠ্‌বে। যাতে বাধা নাই—প্রতিকূলতা নাই, তাতে মৃত্যুপথে নিয়ে যায়। Struggleই (বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিবার চেষ্টাই) জীবনের চিহ্ন। বুঝেছিস্‌ ?

শিষ্য :—আজ্ঞে হাঁ।

স্বামীজি :—পরমব্রহ্মতত্ত্বে ত আর লিঙ্গভেদ নাই ? আমরা এই "আমি-আমার" planeএ (ভূমিতে) এই লিঙ্গভেদ দেখ্‌তে পাচ্ছি। মন যতটা অন্তর্ম্মুখ হ'তে থাকে ততই ভেদাভেদ-জ্ঞানটা চ'লে যায়। শেষে মন যখন সমরস ব্রহ্মতত্ত্বে ডুবে যায়, তখন আর এটা স্ত্রী, ওটা পুরুষ—এই জ্ঞান থাক্‌বেই না। আমরা ঠাকুরের এ ভাব দেখেছি কি না ? তাই বলি, মেয়ে

পুরুষে বাহ্যিক ভেদ রয়েছে। কিন্তু স্বরূপতঃ কোন ভেদ নাই। তাই বল্‌ছিলুম, এই মেয়েদের মধ্যে একজনও যদি কালে ব্রহ্মজ্ঞা হ'ন, তবে তাঁর প্রতিভাতে হাজারো মেয়ে মানুষ জেগে উঠ্‌বে। দেশের—সমাজের কল্যাণ হবে। বুঝ্‌লি?

শিষ্য:—আহা, এমন করিয়া বুঝাইয়া দিতে আপনার মত আর কাহাকেও দেখি নাই। আজ্‌ আমার চক্ষু খুলিয়া গেল।

স্বামীজি:—এখনি কি খুলেছে? যখন সর্ব্বাবভাসক আত্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষ করবি, তখন দেখ্‌বি, এই স্ত্রী-পুরুষ ভেদজ্ঞান একেবারে লুপ্ত হবে। মেয়েদের পরমানন্দদায়িনী ব্রহ্মরূপিণী ব'লে বোধ হবে। ঠাকুরকে দেখেছি—স্ত্রী মাত্রেই মাতৃভাব—তা যেই হোক্‌ না কেন! দেখেছি কিনা!—তাই এত ক'রে বল্‌ছি। তাই তোদের বলি, মেয়েদের জন্য গ্রামে গ্রামে পাঠশালা খুলে দিতে হবে। তাদের মানুষ কত্তে হবে—তবে কালে তাদের সন্তান সন্ততির দ্বারা দেশের মুখ উজ্জ্বল হবে—বিদ্যা জ্ঞান শক্তি ভক্তি দেশে জেগে উঠ্‌বে।

শিষ্য:—এই আধুনিক শিক্ষায় কিন্তু বিপরীত ফল ফলিতেছে। মেয়েরা সেমিজ গাউন্‌ পরিতে শিখিতেছে। চাল চলন সব বিলাতি ঢঙ্গের হইতেছে। এই শিক্ষায় চরিত্র বিষয়ে কতটা উন্নতি যে হইতেছে, তাহাও বুঝিতে পারা যাইতেছে না।

স্বামীজি:—প্রথম প্রথম অমন্‌টা হ'য়ে থাকে। নূতন idea (ভাব) প্রচারকালে কতকগুলি লোক অমন খারাপ হ'য়ে যায়। তাতে বিরাট্‌ সমাজের কি আসে যায়? কিন্তু যারা এই স্ত্রী-শিক্ষার জন্য উদ্যোগী হয়েছিলেন, তাদের মহাপ্রাণতার কি সন্দেহ আছে? তবে কি জানিস্‌, শিক্ষাই বলিস্‌ দীক্ষাই বলিস্‌—ধর্ম্মহীন হ'লে তাতে গলদ্‌ থাক্‌বেই থাক্‌বে। ধর্ম্মকে centre (কেন্দ্র) ক'রে রেখে এই স্ত্রী-শিক্ষার প্রচার কত্তে হবে। ধর্ম্ম ভিন্ন অন্য শিক্ষাটা secondary (গৌণ) হবে। ধর্ম্মশিক্ষা, চরিত্র গঠন, ব্রহ্মচর্য্যব্রতোদ্‌যাপন এই জন্য শিক্ষার দরকার। এখন যে স্ত্রী-শিক্ষার প্রচার হচ্ছে, তাতে ধর্ম্মটাকেই secondary (গৌণ) করা হয়েছে। তাইতে তুই যে সব দোষের কথা বল্‌লি, সেগুলি হয়েছে। মানুষের কি দোষ্‌ বল? নিজেরা ব্রহ্মজ্ঞ না হলেই বে-চালে পা পড়ে। সকল সৎকার্য্যের প্রবর্ত্তককেই আত্মজ্ঞ পুরুষ হওয়া চাই। নতুবা তার সব কাজেই গলদ্‌ বেরোয়। বুঝ্‌লি?

শিষ্যঃ—আজ্ঞে হাঁ। দেখিতে পাওয়া যায়, এখন এখানে অনেক মেয়েরা নভেল্ নাটক পড়িয়াই সময় কাটায়। বাঙ্গাল দেশে কিন্তু মেয়েরা শিক্ষিতা হ'য়েও নানা ব্রত উদ্‌যাপন করে। এদেশে ঐরূপ দেখি নাই।

স্বামীজিঃ—ওরে ভাল মন্দ সব দেশে সব জাতের ভিতর রয়েছে। তোর কার্য্য হচ্ছে—নিজের জীবনে ভাল কায ক'রে লোকের সামনে example (দৃষ্টান্ত) ধরা। Condemn (নিন্দাবাদ) ক'রে কোন কার্য্য সফল হয না। লোক হ'টে যায। যে যা বলে বলুক, কাকেও contradict (তর্ক করে নিজ পক্ষ সমর্থন) করবি নি। এই মাযার জগতে যা কত্তে যাবি, তাইতেই দোষ থাক্‌বে। "সর্ব্বারম্ভোহি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতঃ।" আগুন থাক্‌লেই ধূম উঠ্‌বে। কিন্তু তাই ব'লে কি নিশ্চেষ্ট হ'যে ব'সে থাক্‌তে হবে? যতটা পাবিস্, ভাল কায ক'রে যেতে হবে।

শিষ্যঃ—ভাল কাযটা কি?

স্বামীজিঃ—যাতে ব্রহ্মবিকাশের সাহায্য করে, তাই ভাল কায। সব কার্য্যই প্রত্যক্ষে না হোক্, পরোক্ষভাবে—আত্মতত্ত্ববিকাশের সহাযকারী ভাবে করা যায। কিন্তু ঋষিপ্রচলিত পথে চল্‌লে এই আত্মজ্ঞান শীগ্‌গির্ ফুটে বেরোয। আর যাকে শাস্ত্রকারগণ অন্যায ব'লে বলেছেন, সেগুলি কল্লে আত্মার বন্ধন ঘটে, জন্মজন্মান্তরে সেই মোহবন্ধন ঘুচে না। কিন্তু সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালেই জীবের মুক্তি অবশ্যম্ভাবী। কারণ, আত্মাই জীবের প্রকৃত স্বরূপ। নিজের স্বরূপ নিজে কি ছাড়্‌তে পারে? তোর ছাযার সঙ্গে তুই হাজার বৎসর লড়াই ক'রেও ছাযাকে কি তাড়াতে পাবিস্? সে তোর সঙ্গেই থাক্‌বে।

শিষ্যঃ—কিন্তু ভাষ্যকারের মতে কর্ম্ম ত জ্ঞানের পরিপন্থী। জ্ঞানকর্ম্ম-সমুচ্চযকে তিনি বহুধা খণ্ডন করিযাছেন।

স্বামীজিঃ—আবার জ্ঞানবিকাশকল্পে কর্ম্মকে আপেক্ষিক সহায়কারী, পরম্পরা পক্ষে সত্ত্বশুদ্ধির উপায় ব'লেও নির্দ্দেশ করেছেন। তবে শুদ্ধ জ্ঞানে কর্ম্মের অনুপ্রবেশও নাই—ভাষ্যকারের এ সিদ্ধান্তের ত আমি আর প্রতিবাদ কচ্ছিনে? ক্রিয়া কর্ত্তা কর্ম্ম বোধ যত কাল মানুষের থাক্‌বে, ততকাল সাধ্যি কি, সে, কার্য্য না ক'রে ব'সে থাকে? অতএব কর্ম্মই যখন জীবের স্বভাব হ'যে দাঁড়াচ্ছে, তখন যে সব কর্ম্ম এই আত্মজ্ঞানবিকাশ-

কল্পে সহায়কারী হয়, সেগুলি কেন ক'রে যা না? কর্ম্ম মাত্রই ভ্রমাত্মক—একথা পারমার্থিক রূপে যথার্থ হ'লেও, ব্যবহারকল্পে তার উপযোগিত্ব আছে। তুই যখন আত্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষ কর্‌বি, তখন কর্ম্ম করা বা না করা তোর ইচ্ছে। সেই অবস্থায় তুই যা কর্‌বি, তাই সৎ কর্ম্ম হবে। তাতে জীবের—জগতের কল্যাণ হবে—ব্রহ্মবিকাশকল্পে তোর শ্বাসপ্রশ্বাসের তরঙ্গ পর্য্যন্ত জীবের সহায়কারী হবে। আর plan (মতলব) এঁটে কর্ম্ম কত্তে হবে না। বুঝলি?

শিষ্য:—আহা, ইহা ঠিক সিদ্ধান্তই বটে। এই মতই যথার্থ বেদান্ত-সিদ্ধান্তিত

স্বামীজি:—তোর আর কি বুঝ্‌বার আছে, স্বচ্ছন্দে জিজ্ঞাসা কর্।

শিষ্য:—মহাশয়, আমি আপনাকে বড় বিরক্ত করি। একে আপনার অসুস্থ শরীর; তাহাতে আপনাকে এতটা কথা কহাইলাম। রাখাল মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) শুনিয়া রাগ করিবেন।

স্বামীজি:—রেখে দে ওদের কথা। তোদের মত জিজ্ঞাসু পেলে আমার কত আনন্দ হয় জানিস্? তোদের ভিতর আত্মবিকাশকল্পে আমি বার বার প্রাণপাত কর্‌বো।

এই কথা হইবার পরেই নীচে প্রসাদ পাইবার ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। স্বামীজি শিষ্যকে প্রসাদ পাইতে যাইতে বলিলেন। শিষ্যও স্বামীজির পাদ-পদ্মে প্রণত হইয়া যাইবার পূর্ব্বে করযোড়ে বলিল,—“মহাশয়, আশীর্ব্বাদ করুন, অদ্যকার কথাগুলি যেন আমার চিরকাল স্মরণ থাকে—আপনার পাদপদ্মে যেন আমার জন্ম জন্ম ভক্তি থাকে—আপনার স্নেহাশীর্ব্বাদে আমার যেন এ জন্মেই ব্রহ্মজ্ঞান অপরোক্ষ হয়।” স্বামীজি শিষ্যের মস্তকে হাত দিয়া বলিলেন “ভয় কি বাবা? তোরা কি আর এ জগতের লোক—না গেরস্থ না সন্ন্যাসী— এই এক নূতন ঢং।”

ক্রমশঃ

পাশ্চাত্য দেশে প্রথম হিন্দু সন্ন্যাসীর প্রচার-কার্য্য ও তাঁহার মতে ভারতের উন্নতির উপায়।

(মান্দ্রাজ টাইম্‌স্‌, ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৭)

গত কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া মান্দ্রাজের হিন্দুসাধারণ, পরম আগ্রহের সহিত জগদ্বিখ্যাত-কীর্ত্তি হিন্দু-সন্ন্যাসিশ্রেষ্ঠ স্বামী বিবেকানন্দের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। সকলের মুখেই তাঁহার নাম এখন শুনা যাইতেছে। মান্দ্রাজের স্কুল, কলেজ, হাইকোর্ট, সমুদ্রতীর, রাস্তাঘাট ও বাজারে শত শত অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করিয়া বেড়াইতেছে, স্বামীজি কবে আসিবেন। মফঃস্বলের অনেক ছাত্র এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থ আসিয়াছিল—পরীক্ষান্তে বাটীতে ফিরিবার জন্য পিতামাতার সাগ্রহ আহ্বান সত্বেও স্বামীজিকে দেখিবার অপেক্ষায় তাহারা এখানে এখনও বসিয়া আছে এবং হোষ্টেলের খরচ বাড়াইতেছে। কয়েক দিনের ভিতরেই স্বামীজি আমাদের নিকট আসিবেন। হিন্দু সাধারণের ব্যয়ে এই মহাপুরুষের বাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট ক্যাস্‌ল্‌ কার্ণানে বিজয়দ্যোতক যে সকল খিলান নির্ম্মিত হইয়াছে ও অন্যান্য যে সমস্ত আয়োজন চলিতেছে এবং মাননীয় জজ সুব্রহ্মণ্য আয়ারের ন্যায় প্রধান প্রধান হিন্দু ভদ্র মহোদয়গণ এই অভ্যর্থনা-ব্যাপারে যেরূপ আগ্রহ দেখাইতেছেন, তাহা দেখিয়া মনে হয়, স্বামীজি মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্যত্র যে প্রকার অভ্যর্থনা পাইয়াছেন, এখানে নিঃসন্দেহ তদপেক্ষা অধিক আদর অভ্যর্থনা পাইবেন। মান্দ্রাজই সর্ব্বাগ্রে স্বামীজির উচ্চ প্রতিভা বুঝিতে পারিয়া তাঁহার চিকাগো যাইবার সমুদয় বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিল। অতএব মাতৃভূমির গৌরব বৃদ্ধির জন্য যিনি এতদূর করিয়াছেন, সেই মহাপুরুষকে—কারণ, তিনি যে একজন মহাপুরুষ, তাহা নিঃসন্দেহ—অভ্যর্থনা করিবার সুযোগ ও গৌরব মান্দ্রাজ এক্ষণে আবার পাইবে। চারি বর্ষ পূর্ব্বে যখন স্বামীজি এখানে পদার্পণ করেন, তখন তিনি প্রকৃত পক্ষে একজন অজ্ঞাতনামা পুরুষ ছিলেন। সেণ্ট টোমের একটী অপরিচিত বাঙ্গালায় তিনি প্রায় দুই মাস কাটাইয়াছিলেন—যত দিন ছিলেন, ধর্ম্মবিষয়ে

কথাবার্ত্তা কহিতেন এবং যাহারা তাঁহার নিকট আসিত, তাহাদিগকে শিক্ষা দিতেন। কয়েকজন বুদ্ধিমান যুবকই তখন তাঁহাকে দেখিয়া বলিয়াছিল যে, তাঁহার ভিতর এমন কিছু শক্তি রহিয়াছে, যাহাতে তাঁহাকে সাধারণ সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ করিবে, যাহাতে তাঁহাকে সমগ্র মানবজাতির নেতৃপদের বিশেষ ভাবে যোগ্য করিয়া তুলিবে। লোকে তখন এই যুবকবৃন্দকে 'বিপথপরিচালিত উৎসাহীর দল', 'কল্পনারাজ্যসঞ্চরণশীল পুনরুত্থানকারীর দল' প্রভৃতি বলিয়া ঘৃণা করিয়াছিল। এখন তাহারা 'তাহাদের স্বামী'কে—তাহারা তাঁহাকে ঐ নামে নির্দ্দেশ করিতেই ভাল বাসে—ইউরোপ-আমেরিকা-ব্যাপী যশ লইয়া তাহাদের নিকট ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া পরম সন্তোষ লাভ করিতেছে। স্বামীজির প্রচারকার্য্য মুখ্যতঃ অধ্যাত্মবিষয়ক। তিনি একথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, আধ্যাত্মিকতার জন্মভূমি ভারতের ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল। বেদান্তোক্ত মহান্ সত্য বলিয়া তিনি যাহা নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, পাশ্চাত্য দেশ যে দিন দিন তাহার অধিকতর আদর করিবে, এসম্বন্ধে তিনি হৃদয়ে প্রবল আশা রাখেন। তাঁহার মূলমন্ত্রই এজন্য—"বিরোধ নহে—সহায়তা," "বিনাশ নহে, পরভাব স্বায়ত্তীকরণ," "প্রতিদ্বন্দ্বিতা নহে, সমন্বয় ও শান্তি।" অন্যান্য ধর্ম্মমতাবলম্বী ব্যক্তিগণের সহিত তাঁহার যতই মতভেদ থাকুক, * * * খুব কম লোকেই একথা অস্বীকার করিতে সাহস করিবে যে, স্বামীজি হিন্দুগণের সদ্গুণের দিকে পাশ্চাত্য জগতের দৃষ্টি খুলিয়া দিয়া দেশের সুসন্তানের কায করিয়াছেন। লোকে চিরকাল তাঁহাকে এই বলিয়া স্মরণ করিবে যে, তিনিই প্রথম হিন্দু সন্ন্যাসী, যিনি সমুদ্র পার হইয়া পাশ্চাত্য দেশে অকুতোভয়ে তাঁহার ধারণানুযায়ী ধর্ম্মসমন্বয়ের বার্ত্তা বহন করিয়াছিলেন।

* * * * * *

আমাদের পত্রের জনৈক প্রতিনিধি স্বামীজির নিকট হইতে পাশ্চাত্য দেশে তাঁহার ধর্ম্মপ্রচারের সফলতার বিবরণ জানিবার জন্য তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। * * * স্বামীজি আমাদের প্রতিনিধিকে অতি ভদ্রভাবে অভ্যর্থনা করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী একখানি চেয়ারে বসিতে বলিলেন। তিনি দেখিলেন, স্বামীজি গৈরিক-বসন-পরিহিত ও তাঁহার আকৃতি ধীর স্থির শান্ত মহিমাব্যঞ্জক। তাঁহাকে দেখিয়া বোধ হইল, যেন যে কোন প্রশ্ন করা হইবে, তাহারই উত্তর দানে তিনি প্রস্তুত। আমাদের প্রতিনিধি সাঙ্কেতিক

লিপি (Short-hand) দ্বারা স্বামীজির কথাগুলি লিখিয়া লইয়াছিলেন, আমরা এস্থলে তাহাই প্রকাশ করিতেছি। * * *

আমাদের প্রতিনিধি জিজ্ঞাসিলেন,

"স্বামীজি, আপনার বাল্যজীবন সম্বন্ধে আমি কি কিছু জানিতে পারি ?"

স্বামীজি * * বলিলেন,—

"কলিকাতায় বিদ্যালযে অধ্যযনকাল হইতেই আমার প্রকৃতি ধর্ম্মপ্রবণ ছিল। জীবনের ঐ কাল হইতেই আমার সকল জিনিষ পরীক্ষা করিয়া লওযা স্বভাব ছিল—শুধু কথায় আমার তৃপ্তি হইত না। উহার কিছু কাল পরেই শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়—তাঁহার সহিত দীর্ঘকাল বাস করিয়া তাঁহার নিকটেই আমি আধ্যাত্মিকতা শিক্ষা করিয়াছিলাম। আমার পিতার (গুরুর) দেহত্যাগের পর আমি ভারতে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলাম এবং কলিকাতায় একটী ক্ষুদ্র মঠ স্থাপন করিলাম। ভ্রমণ করিতে করিতে আমি ঐ সময়ে একবার মাদ্রাজে আসি, মহীশূরের স্বর্গীয রাজা, এবং রামনাদের রাজার সহিত পরিচিত হই ও তাঁহাদের নিকট হইতে পরে সাহায্য লাভ করি।"

"আপনি পাশ্চাত্য দেশে হিন্দুধর্ম্ম প্রচার করিতে যাইলেন কেন ?"

"আমার অভিজ্ঞতা সঞ্চযের ইচ্ছা হইযাছিল। আমার মতে আমাদের জাতীয় অবনতির মূল কারণই—অপরাপর জাতির সহিত না মেশা। উহাই ঐ অবনতির একমাত্র কারণ। পাশ্চাত্যের সহিত আমরা কখন পরস্পরের ভাব তুলনায় আলোচনা করিবার সুযোগ পাই নাই। সেজন্য আমরা চিরকাল কূপমণ্ডুক হইযা রহিযাছি।"

"আপনি পাশ্চাত্য দেশে বোধ হয অনেক স্থানে ভ্রমণ করিয়াছেন ?"

"আমি ইউরোপের অনেক স্থানে ভ্রমণ করিয়াছি—জর্ম্মণি ও ফ্রান্সে ও গিয়াছি, তবে ইংলণ্ড ও আমেরিকাতেই আমার প্রধান কার্য্যক্ষেত্র ছিল। প্রথমটা আমি একটু মুস্কিলে পড়িযাছিলাম। তাহার কারণ, ভারতবর্ষ হইতে যাঁহারা তথায গিযাছেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই ভারতের লোকের বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। আমার কিন্তু চিরকাল ধারণা, ভারতবাসীই সমগ্র জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা নীতিপরায়ণ ও ধার্ম্মিক জাতি, সেজন্য হিন্দুর সহিত অন্য কোন জাতিরই ঐ বিষযে তুলনা করাটা সম্পূর্ণ ভুল। সাধারণে ঐ ধারণা প্রচারের জন্য প্রথম প্রথম অনেকে

আমার ভয়ানক নিন্দাবাদ আরম্ভ করিয়াছিল এবং আমার বিরুদ্ধে নানা মিথ্যাকথারও সৃষ্টি করিয়াছিল। তাহারা বলিত, আমি একজন জুয়াচোর, আমার এক আধটী নয়, অনেকগুলি স্ত্রী ও এক পাল ছেলে আছে! কিন্তু ঐ সকল ধর্ম্মপ্রচারকগণ সম্বন্ধে যতই আমি অভিজ্ঞতা লাভ করিলাম, ততই তাহারা ধর্ম্মের নামে কতদূর অধর্ম্ম যে করিতে পারে, তদ্বিষয়ে আমার চক্ষু খুলিয়া গেল। ইংলণ্ডে ঐরূপ মিশনরির উৎপাত কিছুমাত্র ছিল না—উহাদের কেহই তথায় আমার সহিত লড়াই করিতে আসে নাই। মিষ্টার লাণ্ড আমেরিকায় আমার নামে গোপনে নিন্দা করিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু লোকে তাঁহার কথা শুনিতে চাহিল না। কারণ, আমি তখন লোকের বড়ই প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলাম। আমি যখন পুনরায় ইংলণ্ডে আসিলাম, তখন ভাবিয়াছিলাম, এই মিশনরী তথায় আমার বিরুদ্ধে লাগিবেন, কিন্তু 'টুথ' সংবাদপত্র তাঁহাকে চুপ করাইয়া দিল। ইংলণ্ডের সামাজিক প্রণালী ভারতের জাতিভেদ অপেক্ষাও কঠোরতর। ইংলিশ চার্চ্চের প্রচারকদিগের সকলেরই ভদ্রবংশে জন্ম—মিশনরিদিগের অধিকাংশের কিন্তু তাহা নহে। তাঁহারা আমার সহিত যথেষ্ট সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমার বোধ হয়, প্রায় ত্রিশ জন ইংলিশ চার্চ্চের প্রচারক ধর্ম্মবিষয়ক সর্ব্বপ্রকার বিবাদাস্পদ কূট বিষয়ে আমার সহিত সম্পূর্ণ একমত। কিন্তু আমি দেখিয়াছি, ইংলণ্ডের প্রচারক বা পুরোহিতগণ, ঐ সকল বিষয়ে আমার সহিত মতভেদ হইলেও কখন গোপনে আমার নিন্দাবাদ করেন নাই—ইহাতে আমার আনন্দ ও বিস্ময় উভয়ই হইয়াছিল জাতিভেদ ও বংশপরম্পরাগত শিক্ষার উহাই গুণ।"

"আপনি পাশ্চাত্য দেশে ধর্ম্মপ্রচারে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন?"

"আমেরিকার অনেক লোকে—ইংলণ্ড অপেক্ষা অনেক বেশী লোকে—আমার সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিল। মিশনরিগণের নিন্দা তথায় আমার কার্য্যের সহায়তাই করিয়াছিল। আমেরিকা পৌঁছিবার কালে আমার কাছে টাকাকড়ি বিশেষ ছিল না।—ভারতের লোকে আমার কেবল যাইবার ভাড়াটা মাত্র দিয়াছিল।—তাহা অতি অল্পদিনেই খরচ হইয়া যায়। সেজন্য এখানে যেমন, সেখানেও তদ্রূপ সাধারণের দয়ার উপর নির্ভর করিয়াই আমায় বাস করিতে হইয়াছিল। মার্কিনেরা বড়ই আতিথেয়। আমেরিকার একতৃতীয়াংশ লোক খ্রীষ্টিয়ান। অবশিষ্ট সকলের কোন ধর্ম্ম

নাই, অর্থাৎ তাহারা কোন বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত নহে; কিন্তু তাহাদের মধ্যেই বিশিষ্ট ধার্ম্মিক লোক দেখিতে পাওয়া যায়। তবে বোধ হয়, ইংলণ্ডে আমার যেটুকু কাজ হইয়াছে, তাহা পাকা হইয়াছে। যদি আমি কাল মরিয়া যাই এবং কার্য্য চালাইবার জন্য সেখানে কোন সন্ন্যাসী পাঠাইতে না পারি, তাহা হইলেও ইংলণ্ডের কার্য্য চলিবে। ইংরেজ খুব ভাল লোক। অতি বাল্যকাল হইতেই তাহাকে সমুদয় ভাব চাপিয়া রাখিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। ইংরেজের মস্তিষ্ক একটু মোটা, ফরাসী বা মার্কিনের মত চট্ করিয়া সে কোন জিনিষ ধরিতে পারে না। কিন্তু ইংরাজ ভারি দৃঢ়কর্ম্মী। মার্কিন জাতির এখনও এত অধিক বয়স হয় নাই যে, তাহারা ত্যাগমাহাত্ম্য বুঝিবে। ইংলণ্ড শত শত যুগ ধরিয়া বিলাসিতা ও ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়াছে—সেজন্য তথায় অনেকেই এখন ত্যাগের জন্য প্রস্তুত। প্রথমবার ইংলণ্ডে যাইয়া যখন আমি বক্তৃতা আরম্ভ করি, তখন আমার ক্লাসে বিশ ত্রিশ জন মাত্র ছাত্র আসিত। তথা হইতে আমার আমেরিকা চলিয়া যাইবার পরেও ঐরূপ ক্লাস চলিতে থাকে। পরে পুনবায় যখন আমেরিকা হইতে ইংলণ্ডে ফিরিয়া গেলাম, তখন আমি ইচ্ছা করিলেই এক সহস্র শ্রোতা পাইতাম। আমেরিকায় উহা অপেক্ষাও অনেক অধিক শ্রোতা পাইতাম, কারণ, আমি আমেরিকায় তিন বৎসর ও ইংলণ্ডে এক বৎসর মাত্র কাটাইয়াছিলাম। আমি ইংলণ্ডে একজন ও আমেরিকায় একজন সন্ন্যাসী রাখিয়া আসিয়াছি। অন্যান্য দেশেও ঐরূপে প্রচারকার্য্যের জন্য আমার সন্ন্যাসী পাঠাইবার ইচ্ছা আছে।

"ইংরাজ জাতি বড় কঠোর কর্ম্মী। তাহাদিগকে যদি একটা ভাব দিতে পারা যায়, অর্থাৎ ঐ ভাবটী যদি তাহারা যথার্থ ই ধরিতে থাকে, তবে নিশ্চিত জানিবেন উহা বৃথায় যাইবে না। এদেশের লোকে এখন বেদে জলাঞ্জলি দিয়াছে, সমুদয় ধর্ম্ম ও দর্শন এখন এদেশে রান্নাঘরে ঢুকিয়াছে। "ছুৎমার্গ"ই ভারতের বর্ত্তমান ধর্ম্ম—এ ধর্ম্ম ইংরাজ কোন কালেই লইবে না। কিন্তু আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের চিন্তাসমূহ এবং তাঁহারা দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক জগতে যে অপূর্ব্ব তত্ত্বসমূহের আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহা প্রত্যেক জাতিই গ্রহণ করিবে। ইংলিশ চার্চ্চের বড় বড় মাতব্বর ব্যক্তি সকল বলিতেন, আমার চেষ্টায় বাইবেলের ভিতর বেদান্তের ভাব প্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছে। আধুনিক হিন্দুধর্ম্ম আমাদের প্রাচীন

ধর্ম্মের অবনত ভাব মাত্র। পাশ্চাত্য দেশে আজকাল যে সকল দার্শনিক গ্রন্থ প্রণীত হইতেছে, তাহাদের মধ্যে এমন একখানিও নাই, যাহাতে আমাদের বৈদান্তিক ধর্ম্মের কিছু না কিছু প্রসঙ্গ নাই। হার্ব্বার্ট স্পেন্সরের গ্রন্থে পর্য্যন্তও ঐরূপ আছে। এখন দর্শনরাজ্যে অদ্বৈতবাদেরই কাল পড়িয়াছে—সকলেই এখন উহার কথা কয়। তবে ইউরোপে তাহারা উহাতেও নিজেদের মৌলিকত্ব দেখাইতে চায়। এদিকে হিন্দুদের প্রতি তাহারা অতিশয় ঘৃণা প্রকাশ করিয়া থাকে, কিন্তু আবার হিন্দুদের প্রচারিত সত্য সকলও লইতে ছাড়ে না। অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার একজন পুরা বৈদান্তিক, তিনি বেদান্তের জন্য যথেষ্ট করিয়াছেন। তিনি পুনর্জ্জন্ম-বাদ বিশ্বাস করেন।"

"আপনি ভারতের পুনরুদ্ধারের জন্য কি করিতে ইচ্ছা করেন?"

"আমার মনে হয়, দেশের ইতর সাধারণ লোককে অবহেলা করাই আমাদের প্রবল জাতীয় পাপ এবং তাহাই আমাদের অবনতির একটী কারণ। যতদিন না ভারতের সর্ব্বসাধারণ উত্তমরূপে শিক্ষিত হইতেছে, উত্তমরূপে খাইতে পাইতেছে, অভিজাত ব্যক্তিরা যতদিন না তাহাদের উত্তমরূপে যত্ন লইতেছে, ততদিন যতই রাজনীতির আন্দোলন করা হউক না কেন, কিছুতেই কিছু ফল হইবে না। ঐ সকল জাতিরা আমাদের শিক্ষার জন্য (রাজকর-রূপে) পয়সা দিয়াছে। আমাদের ধর্ম্মলাভের জন্য শারীরিক পরিশ্রমে বড় বড় মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছে। কিন্তু এই সকলের বিনিময়ে তাহারা চিরকাল লাথিই খাইয়া আসিয়াছে। তাহারা প্রকৃত পক্ষে আমাদের ক্রীতদাসস্বরূপ হইয়া আছে। যদি আমরা ভারতের পুনরুদ্ধার করিতে ইচ্ছা করি, তাহা হইলে আমাদিগকে তাহাদের জন্য কার্য্য অবশ্য করিতে হইবে। আমি যুবকগণকে ধর্ম্মপ্রচারক রূপে শিক্ষিত করিবার জন্য প্রথমে দুইটী কেন্দ্রীয় শিক্ষালয় বা মঠ স্থাপন করিতে চাই—একটী মান্দ্রাজে ও অপরটী কলিকাতায়। কলিকাতারটী স্থাপন করিবার মত টাকার জোগাড় আমার আছে। আমার উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য বিদেশীরাই টাকা দিতে প্রতিশ্রুত আছেন।

"উদীয়মান যুবকসম্প্রদায়ের উপরে আমার বিশ্বাস। তাহাদের ভিতর হইতেই আমি কর্ম্মী পাইব। তাহারাই সিংহের ন্যায় বিক্রমে দেশের যথার্থ উন্নতিকল্পে সমুদয় সমস্যা পূরণ করিবে। বর্ত্তমানে অনুষ্ঠেয় আদর্শটীকে

আমি একটী সুনির্দ্দিষ্ট আকারে ব্যক্ত করিয়াছি এবং উহা কার্য্যতঃ সফল করিবার জন্য আমার জীবন সমর্পণ করিয়াছি। যদি আমি ঐ বিষয়ে সিদ্ধিলাভ না করি, তাহা হইলে আমার পরে আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি কেহ ভবিষ্যতে জন্মগ্রহণ করিয়া উহা কার্য্যে পরিণত করিবে। আমি উহার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিব। আমার মতে বর্ত্তমান ভারতের সমস্যা সমাধান একমাত্র দেশের সর্ব্বসাধারণকে তাহাদের অধিকার প্রদানেই সম্পন্ন হইবে। জগতের মধ্যে ভারতের ধর্ম্মই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, অথচ দেশের সর্ব্বসাধারণকে কেবল কতকগুলা ভুয়া জিনিষ দিয়াই আমরা চিরকাল ভুলাইয়া আসিয়াছি। সম্মুখে অনন্ত উৎস প্রবাহিত থাকিলেও, আমরা তাহাদিগকে পয়ঃপ্রণালীর জল মাত্র পান করিতে দিয়াছি। দেখুন না, মান্দ্রাজের গ্রাজুয়েটগণ একজন নিম্নজাতীয় লোককে স্পর্শ পর্য্যন্ত করিবেন না, কিন্তু নিজেদের শিক্ষার সহায়তা-কল্পে তাহার নিকট হইতে রাজকর বা অন্য কোন উপায়ে টাকা লইতে প্রস্তুত। আমি প্রথমেই ধর্ম্মপ্রচারকগণের শিক্ষার জন্য পূর্ব্বোক্ত দুইটী শিক্ষালয় স্থাপন করিতে ইচ্ছা করি—তাহারা সর্ব্বসাধারণকে ধর্ম্ম ও লৌকিক বিদ্যা উভয়ই শিখাইবে। তাহারা এক কেন্দ্র হইতে অন্য কেন্দ্রের বিস্তার করিবে—এইরূপে ক্রমে আমরা সমগ্র ভারতে ছাইয়া পড়িব। আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর প্রয়োজন—নিজের উপর বিশ্বাস-সম্পন্ন হওয়া; এমন কি, ভগবানের বিশ্বাস করিবার পূর্ব্বেও সকলকে আত্মবিশ্বাসসম্পন্ন হইতে হইবে। দুঃখের বিষয়, ভারতবাসী আমরা দিন দিন এই আত্মবিশ্বাস হারাইতেছি। সংস্কারকগণের বিরুদ্ধে আমার ঐজন্যই এত আপত্তি। গোঁড়াদের ভাব অপরিণত হইলেও, তাহাদের নিজেদের প্রতি অধিক বিশ্বাস আছে। সেজন্য তাহাদের মনের তেজও বেশী। কিন্তু এখনকার সংস্কারকেরা ইউরোপীয়দিগের হাতের পুতুল মাত্র হইয়া দাঁড়াইয়া তাহাদের অহমিকার পোষকতাই করিয়া থাকে। অন্যান্য দেশের সহিত তুলনায় আমাদের দেশের জনসাধারণ দেবতা-স্বরূপ। ভারতই একমাত্র দেশ, যেখানে দারিদ্র্য পাপ বলিয়া গণ্য নহে। নীচ বর্ণের ভারতবাসীদেরও শরীর দেখিতে সুন্দর—তাহাদের মনেরও কমনীয়তা যথেষ্ট। কিন্তু অভিজাত আমরা তাহাদিগকে ক্রমাগত ঘৃণা করিয়া আসার দরুণই তাহারা আত্মবিশ্বাস হারাইয়াছে। তাহারা মনে

করে, তাহারা দাস হইয়াই জন্মিয়াছে। তাহাদিগকে তাহাদের অধিকার প্রদান করিলেই, তাহারা তাহাদের নিজের উপর নির্ভর করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইবে। ইতর সাধারণকে ঐরূপে অধিকার প্রদান করাই মার্কিন সভ্যতার মহত্ব। হাঁটুভাঙ্গা, অর্দ্ধাশনক্লিষ্ট, হাতে একটা ছোট ছড়ি ও এক পুঁটলি কাপড় চোপড় লইয়া সবে মাত্র জাহাজ হইতে আমেরিকায় নামিতেছে, এতাদৃশাকার একজন আইরিশম্যানের সহিত তাহার কয়েক মাস আমেরিকায বাসের পরের অবস্থা ও আকারের তুলনা করুন। দেখিবেন, তাহাব তখন সে সভ্য ভাব গিয়াছে—সে সদর্পে বেড়াইয়া বেড়াইতেছে। কারণ—সে এমন দেশ হইতে আসিযাছিল, যেখানে সে আপনাকে দাস বলিয়া জানিত; এখন এমন স্থানে আসিয়াছে, যেখানে সকলেই পরস্পব ভাই ভাই ও সমানাধিকারপ্রাপ্ত।

আপনি বিশ্বাসী হইয়া অপরকে বলিতে হইবে যে, তাহারা প্রত্যেকেই আত্মা, অবিনাশী, অনন্ত ও সর্ব্বশক্তিমান। আমার বিশ্বাস—গুরুর সহিত সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসিয়া গুরুগৃহবাসেই প্রকৃত শিক্ষা হইয়া থাকে। গুরুর সহিত সাক্ষাৎ সংস্পর্শে না আসিলে কোনরূপ শিক্ষাই হইতে পারে না। আমাদের বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কথা ধরুন। পঞ্চাশ বৎসর উহাদেব প্রতিষ্ঠা হইযাছে—কিন্তু ফলে কি দাঁড়াইযাছে? উহারা একজনও মৌলিক ভাবসম্পন্ন ব্যক্তি প্রসব করে নাই। উহারা কেবল মাত্র পরীক্ষাসভ্য রূপে দণ্ডায়মান রহিযাছে। সেজন্য সাধারণের কল্যাণের জন্য আত্মত্যাগের ভাব আমাদের ভিতর উহারা এখনও কিছুমাত্র বিকাশপ্রাপ্ত করাইতে পারে নাই।"

"মিসেস বেসাণ্ট ও থিওজফি সম্বন্ধে আপনার কি মত?"

"মিসেস বেসাণ্ট একজন খুব ভাল স্ত্রীলোক। আমি তাঁহার লণ্ডনের লজে (Lodge) বক্তৃতাগৃহে বক্তৃতা দিতে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম। আমি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাঁহাব বিশেষ কিছু জানি না। তবে আমাদের ধর্ম্মসম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান বড় অল্প। তিনি এদিক্ ওদিক্ হইতে একটু আধটু ভাব সংগ্রহ করিযাছেন মাত্র। সম্পূর্ণভাবে হিন্দুধর্ম্ম আলোচনায় তাঁহাব অবসর হয় নাই। তবে তিনি যে একজন পরম অকপট মহিলা, তাহা তাঁহার পরম শত্রুতেও স্বীকার করিবে। ইংলণ্ডে তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বক্তা বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন। তিনি একজন সন্ন্যাসিনী। কিন্তু

আমি তৎপ্রচারিত "মাহাত্মা" "কুথুমি" প্রভৃতিতে বিশ্বাসী নহি। আমার মত—"তিনি থিওজফিক্যাল সোসাইটীর সংস্রব ছাড়িয়া দিন এবং নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াইয়া যাহা সত্য মনে করেন, তাহা প্রচার করুন।"

সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে কথা পড়িলে স্বামীজি বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে নিজের মত এই ভাবে প্রকাশ করিলেন :—

"আমি এখনও এমন কোন জাতি দেখি নাই, যাহার উন্নতি বা শুভাশুভ অদৃষ্ট তাহার বিধবাগণের পতিসংখ্যার উপর নির্ভর করিযাছে।"

আমাদের প্রতিনিধি জানিতেন, কয়েক জন ব্যক্তি স্বামীজির সহিত সাক্ষাৎকার লাভের জন্য নীচের তলায় অপেক্ষা করিতেছিলেন। সুতরাং তিনি যে সংবাদপত্রের তরফ হইতে এইরূপ উৎপীডন সহ্য করিতে দয়াপূর্ব্বক সম্মত হইয়াছিলেন, তজ্জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া আমাদের প্রতিনিধি এইবার বিদায় গ্রহণ করিলেন।

এখানে বলা যাইতে পারে, স্বামীজির সঙ্গে মিষ্টার ও মিসেস্ এ সেভিয়ার, মিষ্টার টি, জি, হ্যারিসন (কলম্বো নিবাসী জনৈক বৌদ্ধ ভদ্রলোক) এবং মিষ্টার জে, জে, গুডউইন আছেন। প্রকাশ যে, মিষ্টার ও মিসেস্ সেভিয়ার স্বামীজির সহিত এখানে আসিয়াছেন—হিমালয়ে বাসের জন্য। স্বামীজির যে সকল পাশ্চাত্য শিষ্যের ভারতবাসের ইচ্ছা হইবে, তাহাদের জন্য তথায় একটী বাসস্থান নির্ম্মাণ করিবার তাঁহাদের সংকল্প আছে। বিশ বৎসর ধরিয়া মিষ্টার ও মিসেস্ সেভিয়ার কোন বিশেষ ধর্ম্মমতের অনুসরণ করেন নাই। সর্ব্বসম্প্রদায়ের সাধারণ প্রচারকদিগের নিকট তাঁহারা যে সকল মত শুনিতেন, তাহাতে তাঁহাদের সন্তোষ হইত না। স্বামিজী প্রদত্ত কয়েকটী বক্তৃতা শুনিয়াই তাঁহাদের প্রাণে ধারণা হয় যে, তাঁহারা এক্ষণে এমন এক ধর্ম্ম পাইয়াছেন, যাহাতে তাঁহাদের হৃদয় ও বুদ্ধিবৃত্তি উভয়ই তৃপ্ত হইবে। তাহার পর তাঁহারা সুইজারলণ্ড, জর্ম্মনি ও ইটালিতে স্বামীজির সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইয়া এক্ষণে ভারতবর্ষে আসিয়াছেন। মিষ্টার গুডউইন ইংলণ্ডে সংবাদপত্র পরিচালনা করিতেন, চৌদ্দমাস পূর্ব্বে নিউইয়র্কে তাঁহার সহিত স্বামীজির প্রথম সাক্ষাৎ হয়। ক্রমে তিনিও স্বামীজির শিষ্য হইয়া সংবাদপত্রের সংস্রব ত্যাগ করেন। এক্ষণে স্বামীজির সেবাতেই তিনি মন প্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন এবং সাঙ্কেতিক লিপি দ্বারা তাঁহার বক্তৃতা সকল লিখিয়া লইয়া থাকেন।

তিনি বাস্তবিক সর্ব্ব প্রকারেই স্বামীজির শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছেন এবং বলেন, আমি আশা করি, আমরণ স্বামীজির সঙ্গে থাকিব।

শ্রীগুরুঃ শরণম্।

ভগ্নী নিবেদিতা।

শ্রীগুরুমানসপুত্রী—পবিত্র প্রতিমা,
শ্বেতদ্বীপনিবাসিনী—বিদুষী কুমারী,
ভারতের নারীকুল উন্নত করিতে—
জন্মিলে ভগিনি! মর্ত্তে শ্রীগুরু-আদেশে।
প্রাণপাতী পরিশ্রম—দুর্ভিক্ষ, মরকে—
বিদ্যাদানে—তপস্যায়—অদম্য উদ্যমা।
ধন জন আভিজাত্য ছাড়ি অবহেলে
গুরুকার্য্যে দিলে প্রাণ;—পরার্থতৎপরা।
গুরুকৃপারুণ-করে, হৃদয় তোমার—
প্রফুল্ল কমল সম—ফুটিল গৌরবে;
পূজাযোগ্য তাই এবে দেহবৃন্তচ্যুতা;
অনাঘ্রাত ফুল্ল ফুল—গুরু-পদে শোভে।
"নিবেদিত" জীবহিতে "নিবেদিতা" নাম।
জ্ঞানে গার্গী—পূর্ণাহুতি জীবন নিষ্কাম॥

শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

মহর্ষি ফ্র্যান্সিস্।

পঞ্চম অধ্যায়।

ধর্ম্মপ্রচার—১২০৯—১২১০ খৃঃ অব্দ।

পরদিবস প্রাতঃকালেই ফ্র্যান্সিস্ এ্যাসিসি নগরে গমন করিয়া তথায় প্রচারকার্য্যে ব্রতী হইলেন। প্রাণের কথাগুলি তিনি অতি সরল ও সহজ ভাষায় প্রকাশ করিয়া বলিতেন বলিয়া, যিনিই উহা শ্রবণ করিতেন,

তিনিই একেবারে মুগ্ধ হইয়া পড়িতেন। তাঁহার উপদেশাবলী শ্রোতৃবর্গের হৃদয়মধ্যে চিরদিনের জন্য জলন্ত অক্ষরে অঙ্কিত হইয়া যাইত। তিনি প্রথমে অতি সামান্য ভাবে কার্য্য আরম্ভ করেন। পূর্ব্ব হইতেই যাঁহারা তাঁহার নিকট পরিচিত ছিলেন এবং যাঁহাদের বিষয় তিনি ভাল রকমই জানিতেন, প্রথমে তিনি তাঁহাদিগকেই দু'চারিটী মিষ্ট কিন্তু ওজস্বী কথায় ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। তাঁহার উপদেশ শ্রবণ ও সমুন্নত চরিত্র দর্শন করিয়া লোকে বিশেষ ভাবে উপকৃত হইত। নিজ অনুভূতি ও অভিজ্ঞানের বিষয় বলিতেন বলিয়াই তাঁহার কথাগুলি এত অধিক শক্তি-ময় বলিয়া লোকের মনে হইত। মন্দ কর্ম্মের জন্য অনুতাপ, জীবনের ক্ষণিকতা, অনুষ্ঠিত কর্ম্মের ভাবী শুভাশুভ ফল এবং নিষ্কলঙ্ক জীবন প্রভৃতি সাধারণের নিত্যানুষ্ঠেয় বিষয়েই তিনি সাধারণতঃ উপদেশ প্রদান করিতেন।

জগতে অধিকাংশ লোককেই অধ্যাত্ম উন্নতির প্রতি উদাসীন ভাবে অবস্থান করিতে দেখা যায়, এবং প্রকৃত নিষ্ঠাবান্ ও ধর্ম্মপ্রাণ লোক অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। ইঁহারাও আবার অতি অল্প সময়ের জন্যই জীবনে প্রকৃত ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া ধর্ম্মজীবনের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য, ঔদার্য্য ও পবিত্রতা অনুভব করিতে পারেন। এরূপ সত্ত্বেও বিশ্বজনীন প্রেম ও অধ্যাত্ম বিষয়ের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। কারণ, কোন সুন্দর পদার্থ দেখিবামাত্র আমরা স্বভাবতঃ উহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া থাকি এবং অধ্যাত্ম বিষয়ের সংঘর্ষে আমাদের অন্তর্নিহিত সুপ্ত দেবভাব সহসা জাগরিত হইয়া উঠে। এই নিমিত্ত আমরা দেখিতে পাই যে, যখনই কোন স্থানে কোন ধর্ম্মপ্রচারক উঠিয়াছেন, তখনই তাঁহার উপদেশাবলী শুনিবার জন্য সহস্র সহস্র লোক দেশদেশান্তর হইতে কতই না আগ্রহের সহিত তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছে! মানব-হৃদয় অধ্যাত্ম উন্নতি লাভের অপেক্ষায় চিরদিন নিয়ত উন্মুখ রহিয়াছে। তাহারা কেবল হৃদয়বান্ ও নিষ্ঠাবান্ উপদেষ্টার আশায় কাল প্রতীক্ষা করিতেছে। দৈববশে কখনও যদি ঐরূপ আচার্য্য লাভ হয়, তখন তাহারা কোনরূপ দ্বিধা না করিয়া উন্মুক্ত হৃদয়ে তাঁহার চরণতলে সম্পূর্ণভাবে আত্মোৎসর্গ করিয়া নিজেদের ধন্য মনে করিয়া থাকে। তবে সাধারণতঃ

যে ধর্ম্মজীবনের প্রতি আগ্রহের অভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহা কেবল ধর্ম্মোপদেশকদের শক্তির অভাবের জন্য। কেমন করিয়া হৃদয়তন্ত্রী স্পর্শ করিতে হয়, এবং কি উপায়েই বা উহাতে ঝঙ্কার ও মূর্চ্ছনাদি তুলিতে হয়, সে বিষয়ে তাঁহারা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ বলিয়াই আমাদের মধ্যে ধর্ম্ম-জীবনের এরূপ শোচনীয় অবস্থা দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু ফ্র্যান্‌সিস্‌ সম্বন্ধে উপবিউক্ত অভিযোগ আনিতে পারা যায় না—তাঁহার কথা স্বতন্ত্র। কারণ, অধ্যাত্ম উন্নতি লাভের জন্য তিনি সম্পূর্ণভাবে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন বলিয়া অপরকে সেই ভাবে ত্যাগ করিতে বলিবার পূর্ণ অধিকারও তাঁহার ছিল। সংসার ত্যাগ করিবার দুই বৎসরের মধ্যে তাঁহার অদ্ভুত পরিবর্ত্তন দর্শন করিয়া লোকে বিস্মিত হইয়াছিল। যাঁহারা প্রথমে তাঁহাকে উপহাস করিয়া ছিলেন, তাঁহারাই এখন তাঁহার অদ্ভুত পরিবর্ত্তন দর্শনে তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তাঁহার অসাধারণ চরিত্রশক্তির প্রভাবে অনেকেরই অন্তরে তদনুকরণেচ্ছা বলবতী হইয়া উঠিল। এই সময় এ্যাসিসি নগর হইতে সরলহৃদয় একজন যুবক আসিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হ'ন, এবং তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাঁহার আগমনে ফ্র্যান্‌সিসের মনে এই ধারণা হয় যে, তাঁহার ন্যায় জন কতক ভক্তের সাহায্য পাইলে নিকটবর্ত্তী স্থানগুলিতে প্রচারকার্য্যের সুবিধা হইতে পারে।

এ্যাসিসি নগরে অবস্থানকালে Bernardo di Quintavalle নামক একজন ধনবান্‌ ও গণ্যমান্য ব্যক্তি প্রায়ই অতি যত্নের সহিত ফ্র্যান্‌সিসের আতিথ্য সৎকার করিতেন। এমন কি, তাঁহাকে লইয়া তিনি রাত্রে এক ঘরে শয়ন পর্য্যন্ত করিতেন। ফ্র্যান্‌সিসের সহিত যখন তাঁহার এতদূর ঘনিষ্ঠতা ও প্রণয় ছিল, তখন তিনি যে তাঁহার নিকট নিজ অন্তরের কথা প্রকাশ করিয়া বলিবেন, তাহাতে আর বিচিত্র কি? যে মহাপুরুষ তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের আশা ও ভরসা-স্থল ছিলেন, এবং যিনি অন্তরের সহিত তাঁহার মঙ্গল কামনা করিতেন তাঁহার নিকট যখন তিনি নিজ জীবনের নৈরাশ্য, বেদনা, চিন্তা, আশা ও বিশ্বাসমূলক বিষয়গুলি উন্মুক্তহৃদয়ে ও আগ্রহের সহিত প্রকাশ করিতেন, তখন ফ্র্যান্‌সিস্‌ তাঁহার কথা শ্রবণ করিয়া অভিভূত না হইয়া থাকিতে পারিতেন না। একদিন তিনি বিনীতভাবে ফ্র্যান্‌সিস্‌কে বলিলেন—"মহাশয়! অনুগ্রহপূর্ব্বক কল্য আমার বাড়ীতে আপনি রাত্রি যাপন করেন, ইহা আমার বিশেষ অনু-

রোধ। কারণ, আপনার উপদেশানুযায়ী আমার জীবনের একটী গুরুতর বিষয় নিষ্পত্তি করিবার ইচ্ছা আছে।" তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া ফ্র্যান্‌সিস্ অতিশয় আনন্দিতচিত্তে তাঁহার আমন্ত্রণ স্বীকার করিলেন। সমস্ত রাত্রি তাঁহারা ধর্ম্মবিষয়ক আলোচনায় অতিবাহিত করেন। তাঁহারা এতদূর তন্ময়চিত্তে পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন যে, সে সময় নিদ্রার কথা তাঁহাদের একবার মনেও হয় নাই এবং কিরূপে যে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হইয়াছিল, তাহা কিছুমাত্র বুঝিতেও পারেন নাই। ইহারই ফলে বাব্‌নাবুড়ো নিজ সমুদায় সম্পত্তি দরিদ্রদিগকে দান করিয়া ফ্র্যান্‌সিসের কার্য্যে যোগদান করিতে সংকল্প করেন। ফ্র্যান্‌সিস্‌ও তাঁহাকে দীক্ষা গ্রহণ করিতে উপদেশ দিয়া বলিলেন, "দেখুন, আমি নিজে যে ভাবে জীবন অতিবাহিত করিতেছি, এবং যাহা প্রচার করিতেছি, তাহা আমি নিজ ইচ্ছানুযায়ী করিতেছি না; কিন্তু ঈশার আদেশানুযায়ী উহা সম্পাদন করিতেছি।" পরদিন প্রাতঃকালে পিট্রো নামে একজন নব-দীক্ষিত যুবকের সহিত তাঁহারা দুই জনে সেণ্ট্ নিকোলাস্ নামক উপাসনা-মন্দিরাভিমুখে গমন করেন। তথায় প্রার্থনা ও পূজানুষ্ঠানের পর ফ্র্যান্‌সিস বেদীর উপরিস্থিত ধর্ম্মপুস্তকখানি খুলিলেন এবং উহার যে অংশপ্রভাবে তিনি নিজ জীবন-সমস্যা পূরণে সাহায্য পাইয়াছিলেন, ঈশা কথিত সেই অংশটা পাঠ করিয়া তিনি তাঁহাদিগকে শুনাইলেন। উহার মর্ম্মার্থ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

"যদি জীবনে পূর্ণতা লাভের অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে নিজ সমুদয় সম্পত্তি দরিদ্রদিগের মধ্যে বিতরণ কর। ইহা যদি করিতে পার, তবেই প্রকৃত অধ্যাত্ম ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইতে পারিবে। এস, আর কাল বিলম্ব না করিয়া আমার উপদেশানুযায়ী কার্য্যে প্রবৃত্ত হও।" এই কথা বলিয়া ঈশা বার জন শিষ্যকে নিকটে ডাকিলেন এবং তাঁহাদিগকে অপদেবতার উপর প্রভুত্ব ও ব্যাধি আরোগ্য করিবার শক্তি প্রদান করিয়া ধর্ম্মপ্রচার ও রোগীদিগকে আরাম করিবার জন্য চতুর্দ্দিকে প্রেরণ করিলেন। যাইবার সময় সকলকে এই কথা বলিয়া দিলেন—"তোমরা কোন দ্রব্য নিকটে রাখিও না। অর্থ, আহারীয়, যষ্টি, এমন কি একখণ্ড কাগজ পর্য্যন্ত সঞ্চয় করিও না এবং একটীর অধিক গাত্রাবরণও নিকটে রাখিও না। অর্থাৎ সঞ্চয়-প্রবৃত্তিকে মন হইতে সমূলে উৎপাটিত করিতে সদা

সর্ব্বদা যত্নবান্ থাকিও। কাহারও বাটীতে এক রাত্রির অধিক কাল বাস করিও না। যাহারা তোমাদিগকে যত্ন করিবে না, চলিয়া যাইবার সময় তাহাদের প্রতি অসন্তোষের পরিচয় দিয়া যাইও।' শিষ্যগণ তাঁহার আদেশানুযায়ী নগরে নগরে ধর্ম্মপ্রচার এবং রোগীদিগকে আরাম করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ইহার পর ঈশা পুনরায় শিষ্যগণকে বলিয়াছিলেন—"আমার উপদেসানুযায়ী কার্য্য করিবার ইচ্ছা যাহার আছে, তাহাকে সম্পূর্ণরূপে আত্মপরিহার করিতে হইবে এবং নানাবিধ দুঃখ ও ক্লেশ অম্লানবদনে সহ্য করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। কারণ, যিনি নশ্বর দেহের প্রতি যত্ন করিবেন, তিনি অধ্যাত্ম উন্নতি লাভে বঞ্চিত হইবেন। কিন্তু যিনি আমার উপদেশ পালন করিবার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত থাকিবেন, তিনিই অনন্ত জীবনের অধিকার লাভে সমর্থ হইবেন। কেহ যদি সমগ্র জগতের অধীশ্বরত্ব লাভ করেন, কিন্তু আত্মোন্নতি বিধানে পরাঙ্মুখ থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার কোনও মঙ্গল দেখি না।" কিছুদিন পরে ধর্ম্মপুস্তকের এই অংশটী মহর্ষি-ফ্র্যান্সিস্-প্রবর্ত্তিত নব ধর্ম্মসঙ্ঘের মধ্যে আনুষ্ঠানিক মূলসূত্ররূপে গৃহীত হইয়াছিল।

ফ্র্যান্সিসের কথা শেষ হইবামাত্র বার্নার্ডো গৃহে গমন করিয়া নিজ সম্পত্তি দরিদ্রদিগের মধ্যে বিতরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। দানের সংবাদ পাইয়া বহুসংখ্যক দরিদ্র তথায় আসিয়া সমবেত হইল এবং ফ্র্যান্সিস্‌ও অতিশয় আনন্দিতচিত্তে বন্ধুর কার্য্য দেখিতে লাগিলেন। সেণ্ট্-ড্যামেনের উপাসনা-মন্দিরের জীর্ণ-সংস্কার সময়ে সিল্‌ভেষ্টর্ নামে একজন পুরোহিত ফ্র্যান্সিস্‌কে কতকগুলি প্রস্তর বিক্রয় করিয়াছিলেন। এইরূপে প্রচুর অর্থ নির্ব্বিচারে দরিদ্রদিগের মধ্যে বিতরিত হইতে দেখিয়া তাঁহার মনে লোভের উদয় হইল এবং তিনি ফ্র্যান্সিসের নিকট আসিয়া বলিলেন—"মহাশয়! আপনি আমার নিকট হইতে যে প্রস্তর ক্রয় করিয়াছিলেন, তাহার উচিত মূল্য সে সময় আমাকে দেন নাই। সেজন্য আমার যাহা অবশিষ্ট প্রাপ্য, তাহা কি এখন আমায় দিবেন?" পুরোহিতের কথা শ্রবণ করিয়া ফ্র্যান্সিস্ কিছু অসন্তুষ্ট হইলেন। কিন্তু কোন কথা না বলিয়া বার্নার্ডোর নিকট হইতে এক অঞ্জলি অর্থ গ্রহণ করিয়া তিনি তাঁহাকে বলিলেন—"এই নিন্ মহাশয়! এইবার আপনার উচিত মূল্য হইয়াছে ত?"

সিল্‌ভেষ্টার লজ্জাবনতমুখে বলিলেন "আজ্ঞে হঁ্যা!" পুরোহিতের ঈদৃশ ব্যবহারে দর্শকবৃন্দ তাহার প্রতি একেবারে শ্রদ্ধারহিত হইয়াছিল। এই ঘটনাটিতে একদিকে ফ্র্যান্‌সিস্‌ ও বার্‌নার্‌ডো এবং অপরদিকে পুরোহিত সিল্‌ভেষ্টার উভয় পক্ষেরই চরিত্র সুন্দররূপে পরিস্ফুট হইয়া দর্শকবৃন্দের অন্তরে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইয়া যায়। ফ্র্যান্‌সিস্‌-প্রবর্ত্তিত নূতন সন্ন্যাসি-সঙ্ঘ কিরূপ প্রকৃতিসম্পন্ন হইবে, তাহা তাঁহার উপদেশাবলী অপেক্ষা এই ঘটনায় দর্শকবৃন্দ অধিকতর স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারিয়াছিল। অর্থ বিতরণ শেষ হইবামাত্র ইঁহারা Portiuncula য় ফিরিয়া আসেন। তথায় বার্‌নার্‌ডো ও পিট্রো বৃক্ষশাখা দ্বারা বাসোপযোগী দুইটি ছোট ছোট কুটীর নির্ম্মাণ করিলেন এবং ফ্র্যান্‌সিসের ন্যায় ঢিলান জামা তৈয়ার করাইয়া লইলেন। ইটালীর কৃষকেরা অদ্যাবধি যেরূপ পরিচ্ছদ ব্যবহার করে, ইহা অনেকটা সেইরূপ এবং ইহার রঙ্‌ও তদনুরূপ। ইটালীর অন্তর্গত আপিনাইন্‌-পর্ব্বতবাসী মেষপালকেরা আজ পর্য্যন্ত এইরূপ পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া থাকে। ইহার এক সপ্তাহ কাল পরে, ১২০৯ খৃঃ অব্দে ২৩শে এপ্রিল বৃহস্পতিবার এগিডিও নামে একজন নূতন শিষ্য ফ্র্যান্‌সিসের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইনি অতিশয় কোমল প্রকৃতি ছিলেন এবং কোন শক্তিমান্‌ পুরুষের আশ্রয় গ্রহণ করা তিনি নিজের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন বলিয়া বিবেচনা করিতেন। শুদ্ধচিত্ত এগিডিও ফ্র্যান্‌সিসের আশ্রয়ে ও সাহায্যে অশ্রুতপূর্ব্ব আগ্রহের সহিত ভগবদারাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া শীঘ্রই ধ্যানানন্দের অধিকারী হইয়া উঠিলেন।

যে সমুদয় দরিদ্রদিগের মধ্যে তাঁহাদের গতিবিধি ছিল এই নূতন সন্ন্যাসি-সঙ্ঘ তাঁহাদেরই ন্যায় দীনভাবে জীবন যাপন করিতেন। Portiuncula'র উপাসনা-মন্দিরটী তাঁহাদের অতিশয় প্রিয় ছিল। তাই বলিয়া তথায় তাঁহারা এক সময়ে অধিককাল বাস করিতেন না। কিন্তু মধ্যে মধ্যে তাঁহারা সকলে তথায় আসিয়া মিলিত হইতেন। আমব্রিয়া প্রদেশের বর্ত্তমান ভিক্ষা-ব্যবসায়িগণ যেভাবে জীবন যাপন করেন, ইঁহারাও ঠিক সেই ভাবে তখন জীবন যাপন করিতেন। ইঁহারা ইচ্ছানুযায়ী যথা তথা ঘুরিয়া বেড়াইতেন এবং তৃণমঞ্চে,কুষ্ঠাশ্রমে, অথবা উপাসনা-মন্দিরের প্রবেশপথে নিদ্রা যাইতেন। ইঁহারা কবে কোথায় যে থাকিবেন, তাহার কিছুই স্থিরতা ছিল না। ঐ বিষয়ে তাঁহাদের এতদূর অনিশ্চয়তা ছিল যে, যখন এগিডিও তাঁহাদের

সহিত যোগদান করিতে সংকল্প করেন, তখন ফ্র্যান্‌সিসকে খুঁজিয়া বাহির করিতে তাঁহাকে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল, এবং ভগবদিচ্ছানুক্রমেই যেন Rivo Tortoর নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে সহসা একদিন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। এই সকল তরুণবয়স্ক সন্ন্যাসীরা মহা উৎসাহে ও আনন্দে দেশের সর্ব্বত্র ধর্ম্মোপদেশ প্রচার করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তখন গ্রীষ্মকাল সবে মাত্র আরম্ভ হইয়াছে এবং আমব্রিয়ার প্রত্যেক অধিবাসীই ঘাস কাটিবার জন্য ক্ষেত্রে গমন করিতেছে। এই প্রথার এখনও কোনরূপ বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নাই। মে মাসের শেষভাগে Florence Perugia অথবা Rietiর পার্শ্ববর্ত্তী ক্ষেত্রমধ্য দিয়া রাত্রিকালে যাইবার সময় এখনও দেখিতে পাওয়া যায় যে, ঘাস কাটা শেষ হইলে তৃণ-স্তূপের উপর বসিয়া যখন কৃষকেরা সান্ধ্যভোজনের জন্য আয়োজন করিতেছে, তখন বাদ্যকরেরা আসিয়া ক্ষেত্রমধ্যে প্রবেশ করে এবং দু'চারিটা সঙ্গত বাজায়। তাহার পর যখন কৃষকেরা গাড়ীতে ঘাস বোঝাই করিয়া গৃহাভি-মুখে প্রত্যাগমন করে, তখন এই বাদ্যকরেরা তাহাদের পুরোভাগে বাদ্য-ধ্বনিতে চারিদিক্ প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে গমন করে। এই সন্ন্যাসি-গণও মধ্যে মধ্যে ঐরূপ করিতেন। তাঁহারা কাহারও ভারস্বরূপ হইতে ইচ্ছা করিতেন না। বিনা পরিশ্রমে খাদ্যাদি গ্রহণ করিলে পাছে কৃষকদের কষ্ট হয়, সেই আশঙ্কায় দিবসের কিয়দংশ তাঁহারা কৃষকদের কার্য্যে সহায়তা করিয়া অতিবাহিত করিতেন। তত্রত্য অধিবাসিগণের মধ্যে অধিকাংশই দয়ার্দ্রচিত্ত, শান্ত ও ধীর প্রকৃতিসম্পন্ন ছিল। সন্ন্যাসিগণ তাহাদের নিকট নিজ নিজ পরিচয় প্রদান ও জীবনের উদ্দেশ্য যথাযথ বর্ণনা করিয়া শীঘ্রই তাহাদের বিশ্বাসভাজন হইয়া উঠিয়াছিলেন।

সন্ন্যাসিগণ ক্ষেত্রে কৃষকগণের সহিত একত্র কার্য্যও আহারাদি করিতেন এবং রাত্রিকালে শস্যাগারে তাহাদের সহিত একত্র শয়ন করিতেন। পরদিবস প্রাতঃকালে যখন সন্ন্যাসীরা বিদায় গ্রহণ করিতেন তখন কৃষকদের মনে অতিশয় কষ্ট হইত। কৃষকেরা যদিও এখনও ফ্র্যান্‌সিস্ প্রবর্ত্তিত নব ধর্ম্মে দীক্ষিত হয় নাই, তথাপি তাহারা অল্প দিনেই জানিতে পারিয়াছিল যে, তাহাদের বাসস্থানের অনতিদূরে এ্যাসিসি নগরে জন কতক সংসার-ত্যাগী নিষ্ঠাবান্ সন্ন্যাসী বাস করিতেছেন, এবং অতিশয় আগ্রহের সহিত দেশমধ্যে ধর্ম্মস্রোত প্রবাহিত করিতেছেন। মধ্য ইটালির কৃষকবৃন্দ বিনীত

স্বভাব ও দয়ার্দ্রহৃদয় ছিল; সেজন্য ঐ সকল সন্ন্যাসিদিগকে যত্ন ও শ্রদ্ধার সহিত অভ্যর্থনা করিত। কিন্তু কোন সহর মধ্যে যখন তাঁহারা প্রথম প্রবেশ করিতেন, তখন তথায় তাঁহাদিগকে অনেকে উপহাস এবং নানা প্রকারে বিরক্ত করিতে ছাড়িত না।

প্রচারকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ফ্র্যান্সিসের জ্ঞানগর্ভ ও ভক্তিপূর্ণ উপদেশ এবং অদ্ভুত কার্য্যাবলী-প্রভাবে অনেকেরই হৃদয় ভক্তি ও শ্রদ্ধায় অভিভূত হইয়া উঠিয়াছিল। তৎপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্মসঙ্ঘের ইতিহাসে এই সময়টী সর্ব্বাপেক্ষা মধুর ও হৃদয়গ্রাহী বলিয়া মনে হয়। বসন্ত ঋতুর প্রথমোন্মেষ সময়ে অভিনব অঙ্কুরোদ্গম দর্শনে যেমন প্রকৃতি দেবীর অদ্ভুত আভ্যন্তরীণ ক্রিয়াশক্তি ও ভবিষ্যৎ কুসুমৈশ্বর্য্য-বিকাশ-সূচনার পরিচয় লাভ হয়, সেইরূপ এই তরুণবয়স্ক সন্ন্যাসীদের প্রবল আগ্রহ, উদ্যম ও অনুরাগ দর্শনে, ভবিষ্যতে তাঁহাদের দ্বারা যে কি পরিমাণে সুফল প্রসূত হইবে, সে সম্বন্ধে লোকে বেশ ধারণা করিতে পারিয়াছিল। নিষ্কিঞ্চন, দীনবেশ, শূন্যপদ ঐ সকল সন্ন্যাসীদের সদানন্দ-মূর্ত্তি দর্শন করিয়া দর্শক-বৃন্দের মনে ভিন্ন ভিন্ন ধারণার উদয় হইত। কেহ কেহ তাঁহাদিগকে উন্মত্ত বিবেচনা করিত; অপর অনেকে আবার সাধারণ সন্ন্যাসী হইতে তাঁহাদের পার্থক্য দেখিয়া তাঁহাদিগকে বিশেষ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিত। পরিশ্রম অনুযায়ী ফল ফলিত না দেখিয়া কখন কখন সন্ন্যাসীরা ভগ্নোদ্যম হইয়া পড়িতেন। সে সময় নিজ অলৌকিক দৃশ্য দর্শন ও তদ্দর্শনে তাঁহার মনে যেরূপ আশার সঞ্চার হইত, সে সকল বিষয় ফ্র্যান্সিস্ তাঁহাদের নিকট প্রকাশ করিয়া বলিতেন। ইহাতে এই ফল হইত যে, তাঁহার অনুচরবর্গের নিরাশ হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইত এবং তাঁহারা দ্বিগুণ উৎসাহে পুনরায় কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেন। তিনি বলিতেন—"আমি দেখিলাম, বহুসংখ্যক লোক আমাদের দিকে আসিতেছে এবং সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার জন্য আমাদের অনুমতি প্রার্থনা করিতেছে। আমি এখনও যেন তাহাদের পদশব্দ শুনিতে পাইতেছি। ইহাদের সংখ্যা এত অধিক যে, দেখিলাম, যেন ইহারা চারিদিক হইতে সমস্ত পথ জুড়িয়া আসিতেছে!"

নিজ প্রবর্ত্তিত সন্ন্যাসিসঙ্ঘের এই উন্নতির সময় তিনি এ কথা কিন্তু বুঝিতে পারেন নাই যে, পরে ইঁহাদিগকে বহু কষ্ট ও দুঃখ সহ্য করিতে হইবে। কোন বিষয়ে কাহারও উন্নতি ও সিদ্ধি লাভের সম্ভাবনা দেখিলেই

লোকে ঈর্ষাবশতঃ তাহার প্রত্যেক অনুষ্ঠানের বিঘ্ন উৎপাদনে প্রয়াস পাইয়া থাকে—ইহা আবহমান কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। নূতন সন্ন্যাসীরা অতীব নিরীহ-প্রকৃতি ও বিনীতস্বভাব হইলেও, ঐ নিয়মের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারেন নাই। এ্যাসিসি নগরে যাইয়া যখন তাঁহারা দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেন, তখন অনেকেই তাঁহাদিগকে ভিক্ষা না দিয়া তিরস্কার করিয়া বলিত—"তোমরা নিজ নিজ সম্পত্তি নষ্ট করিয়া এখন অপরের অর্থে দিনাতিপাত করিতে অভিলাষী দেখিতেছি। তোমাদের এ কেমন রীতি?" তাঁহাদের কেহ কেহ কখন কখন অনাহারে মৃত্যুমুখেও পতিত হইয়াছিলেন। পুরোহিতেরা তাঁহাদিগকে বিপদ্‌গ্রস্ত করিবার জন্য যে চেষ্টা করেন নাই, এ কথাও বলিতে পারা যায় না। এ্যাসিসি নগরের প্রধান ধর্ম্মযাজক এক দিন ফ্র্যান্‌সিস্‌কে বলিলেন—"মহাশয়! আপনারা ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা যে ভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন, আমার বিবেচনায় উহা আপনাদের পক্ষে অতিশয় কষ্টকর বলিয়া বোধ হয়।" ফ্র্যান্‌সিস্‌ বলিলেন—"মহাশয়! আমাদের যদি অর্থাদি কিছু থাকিত, তাহা হইলে উহা রক্ষা করিবার জন্য আমাদিগকে বিব্রত হইতে হইত। কারণ, অর্থ নানাবিধ অনর্থের মূল; এবং ভগবান্‌ ও আত্মীযবর্গ উভয়ের প্রতি যুগপৎ ভালবাসা কখন সম্ভব হইতে পারে না। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া আমরা পার্থিব বিষয়ের প্রতি উদাসীন ও নিরপেক্ষভাব অবলম্বন করিয়াছি।" এই কথা শুনিয়া ধর্ম্মযাজক আর কোন কথা বলিতে পারিলেন না। কিন্তু পূর্ব্বে তিনি যে ফ্র্যান্‌সিস্‌কে উৎসাহ দিয়াছিলেন, সেজন্য এখন মনে মনে অনুতাপ করিতে লাগিলেন। অপর কিছু বলিতে না পারিয়া তিনি শেষে তাঁহাকে এই উপদেশ দিলেন যে,—"হয় আপনি পৌরোহিত্যপদ গ্রহণ করুন; অথবা সন্ন্যাস গ্রহণ করাই যদি আপনার সংকল্প হয়, তাহা হইলে এই ভাবে ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া পূর্ব্বপ্রতিষ্ঠিত কোন সন্ন্যাসি-সঙ্ঘে যোগদান করুন।"

ফ্র্যান্‌সিস্‌ দেখিলেন, মহা বিপদ উপস্থিত। তিনি বেশ বুঝিতে পারিলেন যে, নিজ অনুচরবর্গ ও পুরোহিতগণের সহিত বিবাদ এখন এক প্রকার অনিবার্য্য। উভয়ের মধ্যে বিশেষ পার্থক্যও ছিল। সন্ন্যাসীরা দরিদ্র ছিলেন ও তাঁহাদের কপর্দ্দক মাত্র সম্বল ছিল না। কিন্তু দরিদ্র হইলেও কাঞ্চনে তাঁহাদের কিছুমাত্র আসক্তি ছিল না। এদিকে পুরোহিত

গণ ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইলেও তাঁহাদের ধনাকাঙ্ক্ষা অতিশয় বলবতী ছিল। উভয়ের মধ্যে এই পার্থক্য যাহাতে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তদভিপ্রায়ে পুরোহিতগণের শত্রুপক্ষীয়েরা ফ্র্যান্সিস্ ও তদীয় অনুচর-বর্গের অতিরিক্ত প্রশংসা করিত। পুরোহিতগণকে অপদস্থ করাই যে তাহাদের ঐ প্রশংসার উদ্দেশ্য ছিল, তাহা ফ্র্যান্সিস্ বেশ বুঝিতেন। এরূপ বিপদের সম্ভাবনা সত্ত্বেও তিনি কিছু মাত্র নিরুৎসাহ হইলেন না; যে ভাবে কার্য্য করিতেছিলেন সেই ভাবেই কার্য্য করিতে লাগিলেন। সমুদয় বাধা, বিঘ্ন ও বিপদ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া পূর্ব্ববৎ উদ্যম ও আগ্রহের সহিত তিনি ধর্ম্মপ্রচার করিতে লাগিলেন। তদীয় অনুচরবর্গ নিজ নিজ সম্পত্তি দরিদ্রগণকে দান করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করায় তাঁহাদের আত্মীয়গণ উহা হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। সেজন্য ইঁহাদের প্রতি তাঁহাদের মহা আক্রোশ জন্মে এবং ইঁহাদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতে ও ইঁহাদের নানারূপ নিন্দাবাদ করিতেও প্রবৃত্ত হ'ন। ক্রমে ইঁহারা সংসারীদের ভয়ের কারণ হইয়া উঠিলেন এবং পাছে তাহাদের সন্তানগণ ইঁহাদের সহিত যোগদান করে, সেই ভয়ে পিতামাতারা সদাই ত্রস্ত থাকিত। এই সকল কারণে সহরের মধ্যে সর্ব্বত্র ইঁহাদের সম্বন্ধে নানাবিধ আলোচনা হইত এবং ইঁহাদের নামে অতিরিক্ত কুৎসা রটাইবারও চেষ্টা হইত। কিন্তু ঐ চেষ্টায় অনেক সময় বিপরীত ফল উৎপন্ন হইতেও দেখা যাইত। কারণ একই রটনা ভিন্নভিন্ন লোকের মুখ হইতে বিভিন্ন প্রকারে উচ্চারিত হইতে শ্রবণ করিয়া উহার সত্যতা সম্বন্ধে লোকে স্বভাবতঃ সন্দিহান হইয়া উঠিত। আবার এমনও হইত যে, তাহাদের উপর এই ভাবে অযথা অতিরিক্ত অত্যাচার হইতেছে দেখিয়া অনেকের হৃদয়ে তাঁহাদের প্রতি সহানুভূতির উদয় হইত। এমন কি অনেকে তাঁহাদের পক্ষ গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতেও প্রবৃত্ত হইত। পুরোহিতগণ কিন্তু ইঁহাদের কার্য্যাবলী কখনই সুনয়নে দেখিতে পারেন নাই। গৃহস্থগণের ভিতর স্বার্থহানির ভয়ে কেহ কেহ ইঁহাদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন সত্য, কিন্তু প্রকৃত ধর্ম্মপ্রাণ লোকেরা ইঁহাদের কার্য্যাবলী ও চরিত্র দর্শন করিয়া বিস্মিত হইতেন এবং মুক্তকণ্ঠে ইঁহাদের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। অতএব যাঁহাদের হস্তে ধর্ম্মপ্রচারের ভার ন্যস্ত ছিল, অথবা ধর্ম্ম সম্বন্ধে জনসাধারণের সহানু-ভূতি আকর্ষণ করা এবং ধর্ম্মভাবে তাঁহাদিগকে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিবার

ভার যাঁহাদের হস্তে সমর্পণ করিয়া লোকে নিশ্চিন্ত ছিল, সেই সকল পুরোহিতবর্গের তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ অসামর্থ্যের পরিচয় এই সময়ে সর্ব্বসমক্ষে অভ্রান্তরূপে প্রকাশিত হইয়া পড়িল; এবং ক্রিশ্চিয়ান সংঘের নেতাদিগের নিকট হইতে অধিকারপ্রাপ্ত না হইলেও স্বতঃপ্রবৃত্ত সন্ন্যাসিগণকে ঐ বিষয়ে এতদূর কৃতকার্য্য হইতে দেখিয়া তাঁহাদের প্রতি পুরোহিতগণের ঈর্ষা ও বিদ্বেষ জন্মিতে লাগিল। পুরোহিতগণ গুপ্তভাবে ইঁহাদের প্রতি বিরুদ্ধাচরণ করিতেন, কিন্তু প্রকাশ্যে ইঁহাদের কার্য্যাবলীর প্রতি সহানুভূতির পরিচয় প্রদানে সযত্ন থাকিতেন। জনসাধারণের চিন্তাশক্তির উপর আধিপত্য বিস্তারের জন্য পুরোহিতগণ নানাবিধ অবৈধ উপায় অবলম্বনে পশ্চাৎপদ হইতেন না; কারণ, উহাতে তাঁহাদের স্বার্থসিদ্ধির সুবিধা হইত।

সমসাময়িক পুরোহিতবর্গের সহিত ফ্র্যান্সিসের মতভেদ যতই বৃদ্ধি পাইতেছিল, ততই দিন দিন তাঁহার হৃদয়মধ্যে প্রকৃত ধর্ম্মভাব বলবান্ ও বদ্ধমূল হইয়া উঠিতেছিল। উপাসনামন্দিরে প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতি ধর্ম্মপুস্তকের অনুমোদিত, এই ভ্রান্ত ধারণার জন্য অনেক সময় তাঁহার মনোমধ্যে ধর্ম্মপুস্তক সম্বন্ধে অশ্রদ্ধা ও অবিশ্বাসের উদয় হইলেও, এক মুহূর্ত্তের জন্যও তিনি উহার বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হন নাই। এইরূপে পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে কঠিন ব্যাধি হইতে মুক্তিলাভের পর তাঁহার হৃদয়ে পার্থিব সুখের প্রতি যখন বিতৃষ্ণা জন্মে, তখন হইতে প্রতিদিনই তিনি শনৈঃ শনৈঃ আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছিলেন।

প্রকৃতি দেবীর নৈসর্গিক শোভা ও সৌন্দর্য্য পুনরায় বসন্ত ঋতুর আগমন ঘোষণা করিল। হাস্যময়ী প্রকৃতির প্রতি অঙ্গেই এখন নূতন জীবনাশক্তির বিকাশ পরিলক্ষিত। সর্ব্বত্রই যেন কেমন এক আনন্দস্রোত প্রবাহিত। ফ্র্যান্সিসের হৃদয়মধ্যে এখন আর কোনরূপ অবসাদের চিহ্ন মাত্র নাই। তাঁহার অন্তর আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। সে আনন্দ নিজে নিজে উপভোগ করিয়া তিনি আর তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেছেন না। অপরকে উহার অংশ প্রদান করিবার জন্য এবং যে উপায়ে তিনি ঐ অমূল্য ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াছেন, তদ্বিষয় জগৎবাসীর নিকট মুক্তকণ্ঠে প্রচার ও ঘোষণা করিতে, তিনি অতিশয় উৎসুক হইয়া উঠিলেন। ঈদৃশ উল্লাস ও অস্থিরতাই বাস্তবিক প্রচারকার্য্যের প্রকৃত প্রেরণাশক্তি। ঐ প্রচারকার্য্যের জন্য কিন্তু তাঁহাকে কিছুদিন ধরিয়া শক্তিসঞ্চয় করিতে হইয়াছিল। এই সময়ে নিজ শিষ্যমণ্ডলীকে তিনি নিম্নলিখিত ভাবে উপদেশ ও আদেশ প্রদান করেন।

"ভাই সকল! একথা যেন আমাদের সর্ব্বদা স্মরণ থাকে যে কেবলমাত্র "নিজ নিজ উন্নতি সাধন অথবা মুক্তি লাভের জন্যই করুণাময় ভগবান আমা-"দের এখানে প্রেরণ করেন নাই। সাধ্যমত অপরকে সাহায্য করা ও তাহার "উন্নতি বিধানে যত্নবান্ হওয়া আমাদের প্রত্যেকের জীবনের অন্যতম মুখ্য লক্ষ্য "হওয়া বিশেষ আবশ্যক। এই উদ্দেশ্য সাধনে উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্ত যে অধিক-"তর কার্য্যকর একথা যেন কখন আমরা বিস্মৃত না হই। নিত্যানুষ্ঠিত অসদা-"চরণের নিমিত্ত জগদ্বাসীগণের হৃদয়ে যাহাতে অনুতাপের উদয় হয়, সে "বিষয়ে আমাদিগকে যত্নবান্ হইতে হইবে। পরমারাধ্য ঈশার অমূল্য "আদেশবাণী যাহাতে তাহাদের মনোমধ্যে প্রতিনিয়ত জাগরূক থাকে, "তদ্বিষয়েও আমাদের লক্ষ্য রাখিতে হইবে। আমাদের জ্ঞান ও শক্তি অল্প, "অতএব কিরূপে আমরা এরূপ দুরূহ কার্য্য করিতে সমর্থ হইব—একথা "ভাবিয়া পশ্চাৎপদ হইলে চলিবে না। সহজ ও সরল ভাষায় এবং "নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে অনুতাপের দ্বারাই শান্তি লাভ হইবে, এ বিষয় দ্বারে দ্বারে "প্রচার করিতে হইবে। ভগবৎকৃপার উপর বিশ্বাস স্থাপন ও নির্ভর করিয়া "এবং তাঁহারই শক্তিতে শক্তিমান্ হইয়া আমাদিগকে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ "হইতে হইবে। এক দিকে বিশ্বাস বিনয় প্রভৃতি সদ্‌গুণসম্পন্ন মানবমণ্ডলী "যেমন আমাদের উপদেশাবলী আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিবে, সেইরূপ অপর-"দিকে আবার বহুসংখ্যক বিশ্বাসহীন, অহঙ্কারী, ঈশ্বর-নিন্দুকগণও আমাদের "নিন্দাবাদে এবং আমাদের কার্য্যে বিঘ্ন উৎপাদন করিতে প্রবৃত্ত হইবে। অতএব "বিনয় ও ধৈর্য্য সহকারে ঐ সকল অত্যাচার সহ্য করিবার জন্য পূর্ব্ব হইতেই "আমরা যেন প্রস্তুত থাকি।" তাঁহার মুখ-নিঃসৃত ঐ সকল কথা শ্রবণ করিয়া শিষ্যগণ উদ্বিগ্ন ও বিচলিত হইয়া উঠিলে তাঁহাদের মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া ফ্র্যান্‌সিস্ পুনরায় বলিলেন—"দেখ, কার্য্য যে দুরূহ, তাহা আমি বেশ "বুঝিতে পারিতেছি। কিন্তু সেজন্য ভয়ের কোন কারণ নাই। কারণ, "আমার স্থির বিশ্বাস যে, অতি শীঘ্রই অনেক সম্ভ্রান্তবংশীয় ও শিক্ষিত লোক "আমাদের এই সদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে আসিবেন। তাঁহারা রাজা-"প্রজা-নির্ব্বিশেষে প্রচারকার্য্যে ব্রতী হইবেন এবং উহার ফলে জগতে বহু-"সংখ্যক লোক ঈশা প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম অবলম্বন করিবে ও তাহাদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইবে।" পরিশেষে তিনি শিষ্যবর্গের প্রত্যেককে আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং নিম্নলিখিত কথাগুলি বলিয়া তাঁহাদিগকে চতুর্দ্দিকে প্রচারে

প্রেরণ করিলেন—"ভাই সকল! অধিক আর কি বলিব, সর্ব্বান্তঃকরণে "পরম পিতার আশ্রয় গ্রহণ কর। তাহা হইলে তিনিও আগ্রহের সহিত তোমাদের ভার গ্রহণ করিবেন।" ইহার পর সন্ন্যাসিগণ তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া অন্যত্র প্রস্থান করিলেন এবং সাধ্যমত গুরূপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতে লাগিলেন। ইতস্ততঃ ভ্রমণকালে যেখানেই তাঁহারা উপাসনা মন্দির অথবা ক্রুশ দেখিতে পাইতেন সে স্থানকেই দিব্য পবিত্র ক্ষেত্র মনে করিয়া তাঁহারা নত শিরে শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন করিয়া এই কথা উচ্চারণ করিতেন—"হে করুণাবতার প্রভু ঈশা। জগতের সকল "উপাসনা মন্দিরে আপনার জয় ও কীর্ত্তি ঘোষিত হউক। কারণ আপনি "অবতীর্ণ হইয়া জগৎবাসীগণকে মহান্ ঐশ্বর্য্যের অধিকারী করিয়াছেন!"

প্রচার করিতে যাইয়া ইঁহাদিগকে মধ্যে মধ্যে নানারূপ অসুবিধা ভোগ করিতে হইত। কেহ বা ইচ্ছাপূর্ব্বক ইঁহাদের কথা শ্রবণ করিত এবং কেহ বা ইঁহাদিগকে উপহাসাদি করিত। অধিকাংশ লোকেই আবার নানাবিধ প্রশ্নে ইঁহাদিগকে অস্থির করিয়া তুলিত। তাহারা জিজ্ঞাসা করিত "মহাশয়! আপনারা কোথা হইতে আসিতেছেন এবং আপনারা কোন্ ধর্ম্মসঙ্ঘেরই বা অন্তর্গত?" এই সকল কারণে ইঁহারা মধ্যে মধ্যে বিরক্ত হইতেন বটে, কিন্তু বাহিরে কোনরূপ বিরক্তির ভাব প্রকাশ না করিয়া বলিতেন—"আমরা এ্যাসিসি নগরে বাস করি। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে আমরা অনেক পাপ করিযাছি; এ জন্মে সেজন্য ঐ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছি। ইহা ভিন্ন আমাদের সম্বন্ধে জানিবার আর কিছুই নাই।" অনেকের আবার ইঁহাদের সম্বন্ধে এইরূপ ধারণা হইত যে হয় ইঁহারা ধর্ম্মের ভাণ করিয়া লোককে ঠকাইতেছে অথবা ইঁহারা উন্মাদ হইয়াছে! এজন্য প্রতারিত হইবার ভয়ে তাহারা তাহাদের বাড়ীতে স্থান দিত না। অনেক সময় এমন হইয়াছে যে, সমস্ত দিবস পরিশ্রম ও ঐরূপ নানাপ্রকার অত্যাচার সহ্য করিবার পর রাত্রিকালে ইঁহারা কোনও স্থানে আশ্রয় না পাইয়া কোন গৃহস্থের বাটী অথবা কোন উপাসনা মন্দিরের প্রবেশ পথে রাত্রিযাপন করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত ঘটনাটী উল্লেখযোগ্য বলিয়া মনে হয়।

ইঁহাদের মধ্যে দুইজন সন্ন্যাসী এই সময়ে ঘুরিতে ঘুরিতে ফ্লোরেন্স নগরে আসিয়া উপস্থিত হ'ন। অনেক চেষ্টা করিয়াও তাঁহারা তথায় রাত্রি যাপনের উপযোগী আশ্রয় লাভে সমর্থ হইলেন না। অবশেষে একটী

গৃহস্থের বাড়ীর নিকট আসিয়া দেখিলেন যে বাহিরে দরজার নিকট একখানি বেঞ্চ্ রহিয়াছে দেখিয়া, তাঁহারা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন —"আজ রাত্রির মত আমরা এখানে বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারিব।" গৃহস্বামিনী তাঁহাদিগকে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতে অনুমতি না দেওয়ায় তাঁহারা বেঞ্চ খানির উপর নিদ্রা যাইবার জন্য বিনীতভাবে অনুমতি চাহিলেন। তিনি অনুমতি দিতে যাইতেছেন এমন সময় তাঁহার স্বামী আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কেন এই দুশ্চরিত্র লোকদের এখানে থাকিতে দিয়াছ?" ইহাতে তাঁহার পত্নী বলিলেন—"বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতে আমি উহাদের নিষেধ করিয়াছি। তবে অদ্যকার রাত্রির মত এই বেঞ্চের উপর নিদ্রা যাইতে অনুমতি দিয়াছি। ইহাতে আমি কোনরূপ ক্ষতির সম্ভাবনা দেখি না। কারণ বাটীর বাহিরে আমাদের এমন কোন দ্রব্য নাই যাহা ইহারা চুরি করিয়া লইয়া যাইতে পারে। তবে যদি বল যে বেঞ্চ্ খানি আছে—তা' এরা কি এমনি অসৎ লোক যে বেঞ্চ্ খানি পর্য্যন্ত চুরী করিয়া লইয়া যাইবে? আমার ত সেরূপ বোধ হয় না।" একে সে সময় প্রচণ্ড শীত, তাহাতে চোর মনে করিয়া কেহ ইঁহাদের কোনরূপ শীতবস্ত্র দেয় নাই, সেজন্য এই উন্মুক্ত স্থানে তাঁহাদিগকে এক প্রকার অনাবৃত দেহে রাত্রি যাপন করিতে হইয়াছিল। দুই চারি দণ্ড নিদ্রা যাইবার পর সন্ন্যাসীদ্বয় ভগবদারাধনা ও ভগবদ্‌কথায় অবিশিষ্ট রাত্রি অতিবাহিত করিয়া নিশাবসানে উপাসনা মন্দিরে গমন করিলেন। উপরিউক্ত স্ত্রীলোকটী সেই উপাসনা মন্দিরে সে সময় উপস্থিত ছিলেন। প্রগাঢ় ভক্তির সহিত তাঁহাদিগকে উপাসনা করিতে দেখিয়া তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—"আমার স্বামীর কথামত ইঁহারা যদি দুশ্চরিত্রই হইতেন তাহা হইলে কি ইঁহারা এত ভক্তিভাবে উপাসনা করিতে পারিতেন!" তিনি এইরূপ ভাবিতেছেন এমন সময় দেখিলেন যে Guido নামে একজন ভদ্রলোক দরিদ্রদিগকে ভিক্ষা দিতেছেন। তিনি এই সন্ন্যাসীদের নিকটে আসিয়া ভিক্ষাদিতে চাহিলে তাঁহারা ভিক্ষা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেন। ইহাতে তিনি বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"যখন আপনারা দরিদ্র তখন অপরের ন্যায় ভিক্ষা গ্রহণে আপনাদের আপত্তি কি? এই কথায় Bernerdo বলিলেন—"আমরা দরিদ্র একথা সত্য। কিন্তু অপর দরিদ্রের ন্যায় দারিদ্রের জন্য আমরা কোনরূপ কষ্ট বোধ করি না। কারণ করুণাময়

ভগবানের কৃপায় আমরা স্বেচ্ছায় দারিদ্র্য স্বীকার করিয়াছি। আর যদিও আমরা ভিক্ষা বৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকি তাহা হইলেও এখন আমাদের কোনরূপ অভাব নাই। অতএব সে জন্য এখন ভিক্ষা গ্রহণের কোন প্রযোজন দেখি না।" ইঁহাদের কথায় তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে পূর্ব্বে ইহাদের প্রচুর অর্থ ছিল। পরে বৈরাগ্যের উদয় হওযায় তাঁহারা সমস্ত বিষযাদি পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক একান্তচিত্তে ভগবদারাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। স্ত্রীলোকটী যখন দেখিলেন যে সন্ন্যাসীরা ভিক্ষা গ্রহণ করিলেন না তখন ইঁহাদের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা জন্মিল এবং তিনি তাঁহাদের নিকট আসিয়া বলিলেন—"আপনারা যদি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার গৃহে পদার্পণ করেন তাহা হইলে আমি কৃতার্থ হইব।" তাঁহার কথা শ্রবণ করিয়া সন্ন্যাসীরা বিনীতভাবে বলিলেন "আপনি আমাদের প্রতি যে দযার পরিচয় দিলেন সেজন্য ভগবান্ আপনার মঙ্গল করুন " কিন্তু তাঁহারা তাঁহার বাড়ীতে যাইলেন না। কিন্তু Guido যখন শুনিলেন যে ইঁহারা কোন স্থানে আশ্রয় পাইতেছেন না তখন তিনি অতি যত্নের সহিত ইঁহাদের দুইজনকে নিজ বাটীতে লইয়া গেলেন এবং বলিলেন—"ভগবানের ইচ্ছায় যখন আপনারা এখানে আসিয়াছেন তখন আপনাদের যতদিন ইচ্ছা এখানে থাকিতে পারেন।" সন্ন্যাসীরা তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিয়া বহুদিন তাঁহার গৃহে বাস করিয়াছিলেন এবং ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি ও ভালবাসা সম্বন্ধে স্থানে স্থানে বক্তৃতা ও উপদেশাদিও ঐ সময়ে দিযাছিলেন। তাঁহাদের আচরণ দেখিয়া ভগবানের প্রতি তাঁহাদের ভক্তি ও ভালবাসার বিশেষ পরিচযও পাওযা যাইত, কারণ, তাঁহারা অপরকে যেরূপ করিতে উপদেশ দিতেন নিজেরাও সর্ব্বদা ঠিক সেইভাবে কার্য্য করিতেন। তাঁহাদের উপদেশ অনুযাযী Guido দরিদ্রদিগকে প্রচুর অর্থ দান করেন। Guido তাঁহাদের প্রতি এইরূপে সদ্ব্যবহার করিলেও অনেকে তাঁহাদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়াছিল। কেবল তাহাই নহে—ভদ্র ও ইতর অনেক লোকেই তাঁহাদের উপর নানারূপ অত্যাচারও করিযাছিল। এমন কি সময়ে সময়ে তাঁহাদের পরিধেয় বস্ত্রাদি ছিঁড়িয়া দেওযা এবং বলপূর্ব্বক তাঁহাদের নিকট হইতে দ্রব্যাদি কাড়িয়া লওযা পর্য্যন্তও হইয়াছিল। পরে দযা করিযা কেহ ঐ দ্রব্যগুলি ফিরাইয়া দিলে ইঁহারা কিছুমাত্র বিরক্তি প্রকাশ না করিয়া সহাস্যবদনে উহা

গ্রহণ করিতেন। কেহ কেহ তাঁহাদের গাত্রে ধূলা কাদা নিক্ষেপও করিত। কেহ বা তাঁহাদের হস্তে পাশা দিয়া তাঁহাদিগকে খেলিতে ডাকিত। আবার কেহ বা কখন কখন তাঁহাদের মাথার টুপি ধরিয়া হিড়্ হিড়্ করিয়া টানিয়া লইয়া যাইত। কিন্তু কোন কথা না বলিয়া ঐ সমুদয় অত্যাচার ইঁহারা নীরবে ও প্রসন্নমুখে সহ্য করিতেন। নানাবিধ উপদ্রব ও অত্যাচারের মধ্যে ইঁহাদিগকে এইরূপে প্রশান্ত ও প্রফুল্লচিত্তে অবস্থান করিতে দেখিয়া, কামিনী ও কাঞ্চনের সহিত ইঁহাদের কোনরূপ সম্পর্ক নাই জানিতে পারিয়া এবং ইঁহাদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি অদ্ভুত ভালবাসার পরিচয় পাইয়া অনেকেই ইঁহাদিগকে ক্রমে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে লাগিল, এবং পূর্ব্বে ইঁহাদের প্রতি অকারণ যে সকল অন্যায়াচরণ করিয়াছিল, তজ্জন্য অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে লাগিল। ইঁহাদের নিকটে আসিয়া যখন তাহারা কৃতাপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিত তখন সন্ন্যাসীরা তাহাদিগকে অন্তরের সহিত ক্ষমা করিয়া বলিতেন "ভগবান্ তোমাদের কৃপা করুন"; পরে তাহাদিগকে ধর্ম্ম-বিষয়ক উপদেশাদি প্রদান করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিতেন।

সন্ন্যাসীরা নানা স্থানে পরের উপকার করিয়া ও ধর্ম্মোপদেশ দিয়া ঐরূপে বেড়াইতে লাগিলেন। কিছুকাল এই ভাবে কার্য্য করিবার পর এ্যাসিসির সহরতলীর অন্তর্গত শান্তিময় অরণ্যমধ্যে গুরুদেবের মুখবিনিঃসৃত অমৃতময় উপদেশাবলী শ্রবণ করিবার জন্য তাঁহারা সকলে উৎসুক হইয়া উঠিলেন। এদিকে ফ্র্যান্সিস ও শিষ্যমণ্ডলীকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন। সন্ন্যাসীরা নানা স্থানে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে থাকিলেও বিশুদ্ধ প্রেমের এমনই অদ্ভুত আকর্ষণী শক্তি যে, তৎপ্রভাবে শিষ্যমণ্ডলী চারিধার হইতে আসিয়া একই সময়ে ফ্রান্সিসের চরণপ্রান্তে উপনীত হইলেন। বহুদিনের পর গুরুদেবের সহিত মিলনের আশায় তাঁহারা তাহার নিকটে আসিবার পূর্ব্বেই সমুদয় পূর্ব্বক্লেশ বিস্মৃত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল।

কামরূপে শঙ্কর।

[শ্রীমতী—]

বেদান্ত-প্রচার-মানসে আচার্য্যদেব এইবার কামরূপে উপস্থিত হই-লেন। ৺কামাখ্যাদেবীর শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করিয়া ষোড়শোপচারে তাঁহার পূজা করিলেন এবং পূজান্তে দেবীর নাটমন্দিরেই সশিষ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

শঙ্কর কামরূপে আসিয়াছেন শুনিয়া নগরের যাবতীয় লোক আচার্য্য-দেবকে দর্শন মানসে দলে দলে আসিতে লাগিল। আচার্য্যদেবও প্রসন্ন মনে সকলের সঙ্গে বাক্যালাপ করিতে লাগিলেন। পণ্ডিতেরা নানাবিধ শাস্ত্রালাপ দ্বারা তাঁহাকে তর্কযুদ্ধে নিযুক্ত করিবার জন্য, কামরূপের শাক্ত সাধকগণ আচার্য্যের ধর্ম্মমত শুনিতে আগ্রহান্বিত হইয়া, বিষয়ী ব্যক্তিগণ আচার্য্যের কৃপায় নিজ নিজ বৈষয়িক অভীষ্ট সিদ্ধ করিবেন বলিয়া এবং স্নেহ-ময়ী অবলা ললনাবৃন্দ আচার্য্যের নিকট নিভৃতে প্রার্থনা করিয়া স্বামি-পুত্রের কল্যাণ সাধনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এইরূপে নিজ নিজ অভীষ্ট লাভ করিবার আশায় আজ বহুসংখ্যক কামরূপবাসী আচার্য্যসমীপে সমুপস্থিত।

দুই এক দিনের ভিতরেই ইহারা সকলে আচার্য্যকে চিনিল। পণ্ডিতগণ আচার্য্যের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা দেখিয়া তাঁহার পদানত হইলেন। শাক্ত-সম্প্রদায়ের অনেকে আচার্য্যের মত গ্রহণ করিলেন, আবার অনেকে আচার্য্যের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে কামরূপ হইতে বিতাড়িত করিতে যত্ন-বান হইলেন। বিষয়াসক্ত গণের কেহ কেহ আচার্য্যের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়াই ক্ষান্ত হইল, আবার অনেকে আচার্য্যের বৈরাগ্য দেখিয়া তাঁহার নিকট হইতে অভীষ্টসিদ্ধির আশা পরিত্যাগ করিল। স্থানীয় জনসাধারণের কৌতুহল এইরূপে পরিতৃপ্ত হইল। এইবার সশিষ্য আচার্য্যকে দেখিবার জন্য দূর দূরান্তর হইতে লোকসমাগম হইতে লাগিল।

কামাখ্যা পর্ব্বতের অনতিদূরে অভিনবগুপ্ত নামে শাক্তসম্প্রদায়ের এক পণ্ডিত বাস করিতেন। তিনি শাক্তসিদ্ধান্তিত, মন্ত্র, তন্ত্র, বিশেষতঃ অভিচারক্রিয়ায় অত্যন্ত নিপুণ ছিলেন।

আচার্য্যের নিকট কামরূপের পণ্ডিতমণ্ডলী পরাজিত এবং বহু শাক্ত অদ্বৈত মত গ্রহণ করিতেছেন শুনিয়া তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলেন।

শাক্তসম্প্রদায়ের ঐরূপ অবস্থা শুনিয়াও অভিনবগুপ্ত এ পর্য্যন্ত আচার্য্য-সমীপে আসেন নাই। তিনি এতদিন তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়াই আসিতে-ছিলেন। কিন্তু নিত্যই শাক্তগণ অদ্বৈত মত গ্রহণ করিতেছে শুনিয়া তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। আচার্য্যের সহিত স্বয়ং একবার বিচার করিবার সঙ্কল্প করিলেন এবং ইহার অল্পকাল পরেই একদিন সশিষ্যে আচার্য্যের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

অভিনবগুপ্তের সহিত আচার্য্যের বিচার আরম্ভ হইল। বুদ্ধিমান অভি-নবগুপ্ত দুই এক কথাতেই বুঝিলেন, আচার্য্য সহজে পরাজিত হইবার পাত্র নহেন; বিদ্যা, বুদ্ধি বা যোগবল কিছুতেই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আচার্য্যকে অপ-দস্থ করা সহজ নহে। তিনি মনে মনে আচার্য্যের প্রতি যার পর নাই অসন্তুষ্ট হইলেন, কিন্তু অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিলে যদি তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হয়, এজন্য নিজ মনোভাব গোপন রাখিলেন এবং কিয়ৎকাল বিচারের পর কপট বিনীত ভাবে আচার্য্যদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন।

অভিনবগুপ্তের পরাজয়ে কামরূপের শাক্তসম্প্রদায় নিতান্ত হীনপ্রভ হইল। এতদিন যাহারা অভিনবগুপ্তের মুখ চাহিয়া আচার্য্যমত গ্রহণ করে নাই, তাহারাও এক্ষণে আচার্য্যের শিষ্য হইতে লাগিল। অভিনবগুপ্ত ক্ষুণ্ণমনে উহা দেখিতে দেখিতে ভাবিতে লাগিলেন—এইরূপে দিন দিন যদি শাক্তগণ অদ্বৈতপন্থা অবলম্বন করিতে থাকে, তাহা হইলে ত প্রকৃত পক্ষে শাক্তসম্প্রদায়ের উচ্ছেদ হইল এবং তাঁহার আচার্য্যের শিষ্যত্ব-গ্রহণ-রূপ কৌশলও ব্যর্থ হইল। অতএব ইতিকর্ত্তব্য স্থির করিয়া তিনি গোপনে এক শিষ্যকে তাঁহার মনোভাবের কথা বলিয়া দিলেন এবং শাক্তদিগকে আচার্য্যের অদ্বৈতমত গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়া পাঠাইলেন।

ইহার পর হইতে শাক্তগণ আর বড় আচার্য্যের নিকট আসিল না। ফলে আচার্য্য বুঝিলেন যে, কামরূপে শাক্তমত আর প্রবল নাই, সুতরাং তাঁহার আগমন সফল হইয়াছে। অভিনবগুপ্তও আচার্য্যকে তাহাই বুঝাইতে লাগিলেন। সুতরাং আচার্য্যদেব কামরূপ ত্যাগের সঙ্কল্প করিলেন, এবং আর অধিক কাল তথায় বাস না করিয়া কামরূপ হইতে বিদায় লইলেন।

কামরূপ পরিত্যাগ করিয়া পথিমধ্যে সহসা তাঁহার গুহ্যদেশে বেদনার সঞ্চার হইল এবং দুই এক দিনের মধ্যেই দেখিতে দেখিতে দারুণ ভগন্দর রোগ দেখা দিল। আচার্য্য প্রথমে কয়েক দিন রোগের কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই। দারুণ যন্ত্রণা সহ্য করিয়াও যথারীতি-শিষ্য-সমভিব্যাহারে পথ চলিতেছিলেন। কিন্তু ক্রমে পীড়া প্রবল হইল এবং তিনি চলৎ-শক্তি-রহিত হইলেন। তখন পদ্মপাদ প্রভৃতি শিষ্যবর্গ সকলে আচার্য্যের অসুস্থতার কথা জানিতে পরিলেন। অগত্যা পথিমধ্যে এক স্থানে অবস্থান করিয়া সকলে তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

গুরুদেবের পীড়া দেখিয়া পদ্মপাদ ভীত হইয়া চিকিৎসক আনয়ন করিতে চাহিলেন, কিন্তু আচার্য্যদেব সে কথা উত্থাপিত করিতেই দিলেন না। তিনি ঈষৎ হাসিয়া সে কথা উড়াইয়া দিলেন।

কয়েক দিন এই ভাবে গত হইল, রোগ কিন্তু কিছু মাত্র উপশম হইল না। অধিকন্তু আচার্য্যদেব ক্রমে উত্থানশক্তিরহিত হইয়া পড়িলেন, এবং রোগের যন্ত্রণা অত্যন্ত বৃদ্ধি হইল। নিয়ত শোণিতস্রাবে আচার্য্যের অম্লান পঙ্কজ-সদৃশ প্রফুল্লানন ম্লান হইল, শরীর শীর্ণ হইল, কমনীয় দেহ কঙ্কালসার হইল; কেবল নয়নকোণে ও অধরপ্রান্তে ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় নিয়ত বর্ত্তমান হাস্যরেখাটী বিলীন হইল না।

গিরি এ সময়ে আচার্য্যের শয্যাপার্শ্বে সর্ব্বদা উপবিষ্ট থাকিয়া প্রাণপণে আচার্য্যের সেবা শুশ্রূষা করিতেন। কিরূপে আচার্য্যদেব একটু সুস্থ হইবেন, কিরূপে তাঁহার যাতনার একটু লাঘব হইবে, গিরি সেই চেষ্টায় সতত ব্যাকুল থাকিতেন। তিনি আহার নিদ্রা ধ্যান ধারণা সমুদয় পরিত্যাগ করিয়া অহর্নিশি গুরুদেবের সেবারত হইলেন। পদ্মপাদ আদি অপর শিষ্যগণও নিয়ত গুরুদেবের নিকটে উপবিষ্ট থাকিতেন। সকলেরই চেষ্টা, কিসে গুরু-দেব একটু আরোগ্য লাভ করেন, কিন্তু বিধাতার বিড়ম্বনা—পীড়া দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেই লাগিল।

এইবার পদ্মপাদ অত্যন্ত ব্যস্ত হইলেন। চিকিৎসক আনয়নের জন্য বার বার আচার্য্যের অনুমতি প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার ব্যাকুলতা দেখিয়া আচার্য্যদেব স্থিরভাবে কহিলেন "বৎস পদ্মপাদ! পাপ ভিন্ন রোগ উপস্থিত হয় না, এবং ভোগ না হইলে কর্ম্মক্ষয় হয় না, সুতরাং এই যন্ত্রণা ভোগ করিয়া আমার পাপক্ষয় হইতেছে। আমার ইহাতে কোন কষ্ট নাই।

কেন ব্যস্ত হইতেছ? ভোগ শেষ হইলে রোগ আপনিই আরোগ্য হইবে, অথবা যদি শরীর পতনই হয়, তাহাতেই বা এত উদ্বেগ কেন?"

পদ্মপাদ গুরুদেবের কথা শুনিলেন,কিন্তু হৃদয় তাঁহার প্রবোধ মানিল না। তিনি গুরুদেবের সহিষ্ণুতা ও শরীরে মমত্বহীনতা দেখিয়া কখন ভাবেন—তিনি তাঁহাকে আর কোনরূপ অনুরোধ করিবেন না,' গুরুদেব যাহা করিতে চাহেন, তাহাই হউক। আত্মারাম গুরুদেবকে অপর সাধারণের ন্যায় নিজ শরীররক্ষার জন্য লালায়িত দেখিলে তাঁহারও অন্তরে কখন প্রীতি হইবে না। কিন্তু আবার যখন দেখেন গুরুদেবের শরীর পতনোন্মুখ তখন ভাবেন—না, যেমন করিয়াই হউক, গুরুদেবকে বুঝাইয়া বৈদ্য আনিয়া চিকিৎসা করাইতে হইবে, তাঁহাকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে।

এইভাবে কয়েক দিন কাটিলে, পাদ্মপাদ স্থির করিলেন, আর কাল বিলম্ব করা উচিত নহে; গুরুদেবের কর্ম্মক্ষয় পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিলে, গুরুদেবকে হারাইতে হইবে। অপরাপর শিষ্যবর্গও তখন আচার্য্যের চিকিৎসার জন্য পদ্মপাদকে চেষ্টা করিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। আচার্য্য অশেষ ধৈর্য্য-সহকারে রোগ যন্ত্রণা সহ্য করিয়া প্রফুল্ল মনে তাঁহাদের সহিত পূর্ব্বের ন্যায় কথোপকথন করিতে থাকিলেও অত্যধিক দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন।

এই অবস্থায় একদিন দেখা গেল, আচার্য্য কাহারও সঙ্গে কথাবার্ত্তা না কহিয়া নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ ভাবে অবস্থান করিতেছেন। শিষ্যবর্গ সেদিন আচার্য্যদেবকে দেখিয়া সাতিশয় ভীত হইলেন; পদ্মপাদ ও গিরি প্রমাদ গণিলেন। কেহ কেহ ভাবিলেন, আচার্য্যদেব বোধ হয় অসহ্য রোগযন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতিলাভের জন্য যোগবলে দেহত্যাগ করিবার ইচ্ছা করিয়াই এরূপ ভাবে অবস্থান করিতেছেন। কেহ ভাবিলেন, আচার্য্যদেব বোধ হয় সমাধিপ্রভাবে রোগযন্ত্রণা বিস্মৃত হইবার আশায় সমাধির আশ্রয় লইতেছেন। কিন্তু সকলেই বুঝিলেন, তাঁহার জীবনের আর বড় আশা নাই।

পদ্মপাদ চিরকালই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তিনি আজ আচার্য্যের বিনানুমতিতেই চিকিৎসক আনিবেন স্থির করিয়া কহিলেন "ভগবন্! অদ্য আমি চিকিৎসক আনয়ন করিব। আমরা আপনার এ অবস্থা আর চক্ষে দেখিতে পারিতেছি না। উপায় থাকিতে এরূপ নিশ্চেষ্ট ভাবে থাকিতে আমরা একান্তই অক্ষম। আপনি আমাদের অপরাধ লইবেন না, আমরা বৈদ্য আনিব।"

পদ্মপাদ এই বলিয়া চিকিৎসক আনয়নে বহির্গত হইলেন। আচার্য্যদেব পদ্মপাদপ্রমুখ শিষ্যবৃন্দের আগ্রহাতিশয় দেখিয়া ঈষৎ হাসিয়া নীরব হইয়া রহিলেন।

পদ্মপাদ যদিও এতদিন কোন চিকিৎসক আনয়ন করেন নাই, তথাপি তিনি লোকপরম্পরায় নিকটে কোথায় ভাল চিকিৎসক পাওয়া যায় তাহার সন্ধান করিয়া রাখিয়াছিলেন, তিনি অবিলম্বে একটী বিচক্ষণ চিকিৎসক আনয়ন করিলেন এবং যথারীতি আচার্য্যদেবের চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন।

বৈদ্য আচার্য্য-সমীপে কয়েক দিন অবস্থান করিয়া যথাসাধ্য উত্তম ঔষধ প্রদান করিতে লাগিলেন। রোগেরও কিঞ্চিৎ উপশম হইল। সকলেই ভাবিলেন, এ যাত্রায় বোধ হয় আচার্য্যদেবের প্রাণরক্ষা হইল। কিন্তু বিধাতার নির্ব্বন্ধ অন্যরূপ: বৈদ্য গৃহে ফিরিবার উপক্রম করিতেছেন এমন সময় রোগ সহসা পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইল। চিকিৎসকের গৃহগমন স্থগিত হইল; তিনি পুনরায় বহু যত্নে ঔষধাদি প্রয়োগ করিতে লাগিলেন।

এবার কিন্তু বৈদ্যের যাবতীয় ঔষধ ব্যর্থ হইতে লাগিল তাঁহার সকল চেষ্টাই বিফল হইল। বৈদ্যবর বুঝিলেন এ রোগ চিকিৎসার অসাধ্য। তথাপি তিনি কিঞ্চিৎ দূরবর্ত্তী দেশ হইতে রাজবৈদ্যকে আনয়ন করিবার পরামর্শ দিলেন। পদ্মপাদ অবিলম্বে রাজবৈদ্য আনয়ন করিলেন এবং দ্বিগুণ উৎসাহে আচার্য্যের চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন।

রাজবৈদ্যের চিকিৎসায় আচার্য্যের কিঞ্চিৎ বিশেষ হইল বটে কিন্তু তাহাও স্থায়ী হইল না, আচার্য্য তখন বৈদ্যগণকে বুঝাইয়া বলিলেন, "আপনারা আর আমার জন্য কষ্ট করিবেন না: এ রোগ ঔষধে সারিবার নহে, নচেৎ আপনাদিগের এরূপ ফলপ্রদ ঔষধ কখন ব্যর্থ হইত না।"

রোগারোগ্য সম্বন্ধে বৈদ্যগণ পূর্ব্বেই সন্দিহান হইয়াছিলেন কিন্তু পদ্মপাদ প্রভৃতির আগ্রহাতিশয়ে চিকিৎসা পরিত্যাগ করেন নাই; এক্ষণে আচার্য্যের বাক্য শুনিয়া তাঁহারা নিতান্ত ক্ষুণ্ণমনে গৃহে গমন করিলেন।

বৈদ্যগণ চলিয়া গেলে পদ্মপাদ প্রভৃতি শিষ্যগণ দুঃখে ম্রিয়মাণ হইলেন। তাঁহারা আচার্য্যের জীবন সম্বন্ধে একেবারে হতাশ হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা এখন দিবারাত্রি আচার্য্যের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া থাকেন। তাঁহাদের হৃদয়ে আর সে উদ্যম নাই উৎসাহ নাই, অন্তরে স্ফূর্ত্তি নাই, বদনে প্রফুল্ল ভাব

নাই, নয়নে জ্যোতিঃ নাই। তাঁহারা যেন আচার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে ক্ষীণতা প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। তাঁহাদের অবস্থা দেখিলে মনে হয়, বুঝি গুরুদেবের দেহান্তে ইঁহাদেরও প্রাণান্ত হইবে।

একদিন পদ্মপাদ অত্যন্ত অনুনয় বিনয় করিয়া আচার্য্যদেবকে কহিলেন "দেব! আপনি একবার দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমারযুগলকে স্মরণ করুন। তাঁহারা নিশ্চয়ই আপনার ব্যাধির প্রতীকার করিবেন। আপনি আমাদের অনুরোধে জগতের হিতের জন্য এ কার্য্য করুন। আমাদের একান্ত অনুরোধ, আপনি এ বিষয়ে আমাদের প্রার্থনা অপূর্ণ রাখিবেন না।"

পদ্মপাদের কাতরতা দেখিয়া আচার্য্যদেব মনে মনে দেবাদিদেব মহাদেবকে ভক্তিভাবে ডাকিতে লাগিলেন এবং তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন। ভক্তের ব্যথায় ব্যথিত হইয়া দেবাদিদেব, আচার্যদেবের আরোগ্য জন্য তৎক্ষণাৎ দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমারযুগলকে প্রেরণ করিলেন।

মহাদেবের আদেশে অচিরে দেববৈদ্য আচার্য্যের সন্নিকটে আবির্ভূত হইলেন এবং কহিলেন "ভগবন্! আপনার এ পীড়া চিকিৎসার অসাধ্য। ইহা কোন চিকিৎসকেই আরোগ্য করিতে পারিবে না। ইহা আপনাকে বিনষ্ট করিবার জন্য দুষ্ট ব্যক্তির অভিচারক্রিয়ার ফল।" দেবকুমারযুগল এই বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

আচার্য্যমুখে দেববৈদ্যের কথা শুনিয়া শিষ্যগণ যার পর নাই বিস্মিত হইলেন; পদ্মপাদ ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন এবং কাহাকেও কিছু না বলিয়া সেই দুষ্ট ব্যক্তির উদ্দেশ্যে পুনরভিচার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

ক্রমে আচার্য্যদেব শুনিলেন, পদ্মপাদ অভিচারে নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি শয্যাগত থাকিয়াই পদ্মপাদকে ঐ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য নানাপ্রকার আদেশ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় গুরুভক্ত পদ্মপাদ গুরুদেবের কোন কথারই প্রত্যুত্তর দিলেন না এবং অভিচারক্রিয়া হইতেও নিবৃত্ত হইলেন না।

যথাসময়ে আরব্ধ কর্ম্ম সমাপ্ত করিয়া তিনি আচার্য্যসমীপে উপস্থিত হইয়া বিনীতভাবে বলিলেন "ভগবন্! এই কর্ম্ম বশতঃ যে পাপ হইবে, তাহাতে আমি নরকে পর্য্যন্ত যাইতে প্রস্তুত হইয়াই এ কার্য্য করিয়াছি; আপনি কেবল আপনার আদেশ লঙ্ঘন জন্য আমার কোন অপরাধ গ্রহণ না করেন, ইহাই আমার প্রার্থনা।"

অনন্তর কয়েকদিনের মধ্যেই অভিনবগুপ্তের শরীরে ভগন্দর রোগ প্রকাশিত হইল। তিনি ক্রমে ক্রমে শয্যাগত হইলেন। এদিকে আচার্য্যদেবও দিন দিন সুস্থ হইতে লাগিলেন। তখন আচার্য্যদেবের উৎকট রোগযন্ত্রণার হেতু কে, তাহা বুঝিতে আর কাহারও বিলম্ব হইল না।

অভিনবগুপ্তের রোগের কথা প্রথমতঃ আচার্য্যের নিকট সকলেই গোপন রাখিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা আচার্য্যের অধিক দিন অবিদিত রহিল না। তিনি তাহা জানিতে পারিয়া পদ্মপাদের কার্য্যের যার পর নাই নিন্দা করিতে লাগিলেন এবং অভিনবগুপ্তের যথাসম্ভব সেবা শুশ্রূষার জন্য কয়েক জন শিষ্যকে আদেশ করিলেন।

অভিনবগুপ্তের রোগ কিন্তু দিন দিন বৃদ্ধি হইতে লাগিল এবং কয়েক দিনের মধ্যেই কামরূপের শাক্তসম্প্রদায়ের একজন প্রধান নেতা মানবলীলা সম্বরণ করিলেন।

ইউরোপীয় দর্শনের ইতিহাস।

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর] [শ্রীকানাইলাল পাল এম, এ।

গ্রীক দর্শন।

সক্রেটীস।

সত্য লাভের পথে জ্ঞানাভিমানই প্রধান অন্তরায়। আমি যাহা জানি তাহাই কেবল মাত্র সত্য, এরূপ ভ্রম ধারণা কাহারও জন্মিলে সে ভ্রম দূর হওয়া সুকঠিন। কোন বিষয়ে যথাযথ জ্ঞান লাভ না করিয়াই যদি আমি মনে করি, আমি সে বিষয়টী সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াছি এবং সেই ধারণা সর্ব্বদা মনোমধ্যে পোষণ করিতে থাকি, তাহা হইলে আমার ঐ ধারণাই আমাকে ঐ বিষয়ক সত্য জ্ঞানে কখন উপনীত হইতে দিবে না। সুতরাং আত্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে যথাযথ যুক্তিপ্রণালী অবলম্বনে সর্ব্বদা আত্মচিন্তায় রত থাকা ও অপরের সহিত আলোচনায় নিজ ধারণাগুলিকে নিত্য পরীক্ষা করা দার্শনিকের সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য। সক্রেটীসের ধারণা ছিল,

মানবের অন্তরেই নিত্য সত্য নিয়ত নিহিত রহিয়াছে ; কিন্তু মলিন কাচ-খণ্ডের অন্তরালে অবস্থিত আলোক যেমন দেখিতে পাওয়া যায় না, সেইরূপ কুসংস্কারপূর্ণ হৃদয়াভ্যন্তরে নিহিত ঐ সত্যও কখন প্রকাশ পায় না ; কিন্তু যুক্তিসহায়ে ভ্রান্ত ধারণা অথবা কুসংস্কাররাশি দূর হইলেই উহা আপনি বিকশিত হয়। এইরূপে আত্মসম্বন্ধীয় সাক্ষাৎ সত্যজ্ঞান লাভ করাই তাঁহার মতে পরম পুরুষার্থ। এই সত্যজ্ঞান এক হিসাবে যেমন আত্মারই উপর নির্ভর করে, সুতরাং বিষয়গত (Subjective) সেইরূপ অন্য হিসাবে উহা আবার কেবল মাত্র ব্যক্তিগত ধারণা নহে অথবা উহার সার্ব্বভৌমিক সত্তা আছে সুতরাং (Objective) বিষয়গত।

পূর্ব্ববর্ত্তী দার্শনিকগণ কেবল মাত্র ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া ও আপনাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভ্রান্ত ধারণা গুলি সংশোধন না করিয়াই আত্মতত্ত্বালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহাদের সিদ্ধান্তগুলিও একদেশদর্শিতা দোষে দুষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। ঐ সকল দুষ্ট সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে বিরোধ দর্শনেই সোফিষ্টগণ সর্ব্বতোভাবে নিরপেক্ষ সত্যের বা আত্ম-তত্ত্বের অস্তিত্ব একেবারে অস্বীকার করেন, এবং মানব মন কেবল মাত্র আপেক্ষিক সত্য গ্রহণে সমর্থ ও ব্যক্তিগত ধারণার উপরে সকল সত্য সর্ব্বদা নির্ভর করে, এইরূপ মত ব্যক্ত করেন। সত্যের সার্ব্বভৌমিকত্বে তাঁহাদের ন্যায় এককালে অবিশ্বাসী না হইয়া পূর্ব্বোক্ত যুক্তিপ্রণালী অবলম্বনে আত্মতত্ত্বানুসন্ধানে সক্রেটীস প্রবৃত্ত হন এবং তদুদ্দেশ্যে প্রথমেই সর্ব্ববিধ পদের "সংজ্ঞা" (Definition) নির্দ্ধারণে সচেষ্ট হন। তিনি বুঝিয়াছিলেন এই সংজ্ঞা নির্দ্দেশ না করিয়া কোনও বিষয়ের দার্শনিক চিন্তায় অগ্রসর হওয়া পণ্ডশ্রম মাত্র। 'ঈশ্বর' বলিতে যদি এক ব্যক্তি অনন্ত জ্ঞানসম্পন্ন সর্ব্বশক্তিমান্ পুরুষবিশেষকে লক্ষ্য করিল এবং অন্য ব্যক্তি গ্রীসদেশ-পূজিত দেব দেবীকে মাত্র লক্ষ্য করিয়া বাদে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে ঐ দুই ব্যক্তির মধ্যে ঈশ্বরস্বরূপ সম্বন্ধে সুমীমাংসা কোন দিনই সম্ভবপর হয় না। জ্ঞানাভিমানী ব্যক্তি সকল এতাবৎকাল সংজ্ঞাসমূহের নির্দ্ধারণ না করিয়া কেবল মাত্র আপনাপন ঐ ঐ বিষয়ক ধারণা লইয়াই পরস্পর বাদে ও সত্য নির্দ্ধারণে অগ্রসর হইতেন ; সুতরাং সত্য লাভের পথ তাঁহাদিগের নিকট এক প্রকার রুদ্ধই থাকিত। সক্রেটীসই প্রথম ব্যক্তিগত ধারণার মধ্য হইতে ভ্রমগুলির সম্যক্ উচ্ছেদপূর্ব্বক যথাযথ যুক্তিপ্রণালী অবলম্বনে

সকল বিষয়ের সংজ্ঞাসমূহের নির্দ্দেশ করতঃ 'তত্ত্বিষয়ক সত্যলাভের প্রবেশ-দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া দেন।

বস্তুবিষয়ক নিজ ধারণাসমূহের পূর্ব্বোক্তভাবে অপরের সহিত আলোচনার ফলে তিনি আরও দেখিতে পাইয়াছিলেন যে, কোন একটী বস্তু বলিতে সাধারণ লোকের তো কথাই নাই, তথাকথিত দার্শনিকগণও ঐ বস্তুটির কোন বা কয়েকটী প্রধান গুণ মাত্রই বুঝিয়া থাকেন। কিন্তু দেখিতে পাওয়া যায়, অনেক সময় বিরুদ্ধধর্ম্মাক্রান্ত বহুগুণরাশি একই বস্তুকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছে। সুতরাং বস্তুবিশেষ বলিতে তাহার কোন বা কয়েকটী গুণ মাত্র বুঝিলেই সেই বস্তুর যথার্থ জ্ঞান লাভ হইল না। ঐ বস্তুসম্বন্ধী যথার্থ জ্ঞান লাভ করিতে হইলে আমাদিগকে মনোমধ্যে সেই বস্তুটীকে এমন এক ভাব (Concept) বা ভাব সংযুক্ত নামের অন্তর্গত করিয়া লইতে হইবে যাহাতে ভবিষ্যতে সেই ভাব বা ঐ নাম স্মরণ করিলে আমরা ঐ বস্তুর সকল গুণের কথাই এককালে স্মরণ করিতে সক্ষম হইব। অতএব কেবল মাত্র আপাতঃ-প্রতীয়মান গুণের সাহায্যে বস্তুটীকে না বুঝিয়া পূর্ব্বোক্তরূপ ভাব বা ভাবসংযুক্ত নামের সাহায্যে বস্তুটিকে হৃদয়ঙ্গম করিলে তবেই যথাযথ জ্ঞান লাভ সম্ভব এবং ঐরূপ ভাব বা নামসমূহের উপরেই আমাদের যথার্থ বস্তুজ্ঞান সর্ব্বদা নির্ভর করে। এই তত্ত্ব প্রচার করিয়া সক্রেটীস ভাব-বাদের (Idealism) বীজ প্রথম বপন করিয়া যান।

কোন পদের সংজ্ঞা নির্দ্ধারণ করিবার বা কোন বস্তু সম্বন্ধে সত্য ধারণায় উপনীত হইবার জন্য সক্রেটীস আলোচনেচ্ছু লোকের সহিত কথোপ-কথনে প্রবৃত্ত হইয়াই যুক্তিপ্রণালী অবলম্বনে প্রতিপক্ষের ভ্রমের পর ভ্রম সংশোধন করিয়া দিয়া তাহার অন্তর্নিহিত সত্য দর্শন করিবার ক্ষমতার সহায়তা করিতেন। এইরূপেই তিনি বিজ্ঞানসম্মত দার্শনিক চিন্তা-প্রণালীর প্রথম প্রবর্ত্তন করিয়া যান। তদবলম্বিত তর্কপ্রণালীকে ইংরাজিতে Dialectical method বলে। নিজে কোন বিষয়ের অভিজ্ঞতার ভাণ না রাখিয়া তিনি ঐরূপ তর্কপ্রণালী অবলম্বনে তথাকথিত পণ্ডিতদিগের পাণ্ডিত্যাভিমানকে সমূলে বিধ্বস্ত করিয়া দিতেন। উহাই সক্রেটীসের শ্লেষপ্রণালী (Socratic Irony) নামে ইতিহাসে কথিত হইয়াছে।

"স্বার্থ সাধনই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য এবং যে উপায়াবলম্বনে ঐ

প্রয়োজন সম্যক্ সাধিত হয়, তাহাই একমাত্র পালনীয়” এই কথা সোফিষ্টগণ ইতিপূর্ব্বে প্রচার করেন। সোফিষ্টদিগের ন্যায সক্রেটীস্‌ও প্রয়োজনের মানদণ্ডে মানবের অবশ্যপালনীয নৈতিক নিয়মগুলির পরীক্ষা করিয়া দেখিতেন; কিন্তু ঐ প্রয়োজন বলিতে তিনি তাহাদিগের ন্যায় কেবল মাত্র ব্যক্তিগত স্বার্থ বুঝিতেন না। তিনি এক উচ্চ আদর্শ নীতির অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন এবং স্বার্থকে উচ্ছেদ করিযা সেই আদর্শ নীতিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতেই সর্ব্বদা সচেষ্ট ছিলেন। তাঁহার মতে ঐ আদর্শ নীতি পালনে জগতের কল্যাণ সাধিত হয এবং ঐ কল্যাণ লাভই (The good) ব্যক্তিগত মানবের জ্ঞান ও কর্ম্মের একমাত্র লক্ষ্য হওযা উচিত। জ্ঞান-বলে ঐ কল্যাণ সম্যক্ নির্দ্ধারিত করিযা দৈনন্দিন কর্ম্মজীবনে তৎ-সাধনে তৎপর হওযাই মানবজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। তিনি বলিতেন— মানবের অন্তর্নিহিত যথার্থ জ্ঞানই ঐ আদর্শ নীতির প্রযোজনীয়তা স্বীকার করে, সুতরাং উহা সর্ব্বথা পালনীয। "ঐরূপ কল্যাণ লাভ কোন্ প্রয়োজন সাধন করে?"—এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন—কল্যাণ নিজেই নিজের উদ্দেশ্য। ঐরূপ সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণকে লক্ষ্য করিয়া অপর সকল কর্ম্ম অনু-ষ্ঠিত হয। কল্যাণ কিন্তু অপর কাহারও কোন উদ্দেশ্য সাধনের অপেক্ষা রাখে না —The good is end in itself.

জ্ঞানের সহিত ধর্ম্মের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ সক্রেটীস দৃঢরূপে হৃদযঙ্গম করিযাছিলেন। জ্ঞান ব্যতিরেকে কোন কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে তদ্দ্বারা কোন প্রয়োজন সাধিত নাও হইতে পারে, এবং যে কর্ম্ম কোন প্রযোজন সাধিত না করে, সে কার্য্যে কেহ প্রবৃত্ত হয না। জ্ঞান কল্যাণের (The good) প্রযোজনীযতা স্বীকার করে সুতরাং জ্ঞানী লোক কখনও অসৎকর্ম্ম করে না। আবার মানুষ নিজের প্রযোজন সাধনে কোন দিন বিরত থাকে না। সুতরাং যথার্থ কল্যাণ কি, তাহা জানিযা কেহ কখন নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারে না। Knowledge is the essence of virtue No one is knowingly bad তিনি আরও বলিতেন এই কল্যাণই মানুষের এক মাত্র প্রার্থনীয বস্তু। ঐ বিষযে কেবল এইটুকু মনে রাখা আবশ্যক যে, আমার অন্তর্নিহিত জ্ঞান দ্বারা সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণ সম্যক্ নির্দ্ধারিত হইলেও উহা নিত্য ও বিশ্বব্যাপী।

সক্রেটীসের মতে ঐরূপ কল্যাণ-লাভেচ্ছাই মানুষকে যথার্থ সুখী করে।

তিনি বলিতেন—(Virtue is one) ধর্ম্মানুশাসন সর্ব্বগত; অর্থাৎ সকল বিষয়ে ধার্ম্মিক না হইয়া কোন এক বিষয়ে ধার্ম্মিক হওয়া যায় না; এবং যাহা জগতের পক্ষে মঙ্গলজনক, তাহাই সুন্দর (The good alone is the beautiful)

ইতিপূর্ব্বে যাহা উক্ত হইল তাহাতেই বুঝা যাইবে মানবের জ্ঞান বিকাশে ও আদর্শ নীতি অনুসারে জীবন যাপনে সহায়তা করাই সক্রেটীসের জীবনের প্রধান কার্য্য বা বৃত্তি ছিল। তাঁহার পিতামাতার জীবনোপায় বা বৃত্তির সহিত তাঁহার ঐ বৃত্তির সাদৃশ্য দেখাইয়া তিনি কখন কখন রঙ্গরস করিয়া বলিতেন যে—ভাস্কর্য্য-বিদ্যানিপুণ তাঁহার পিতা প্রস্তর খণ্ডকে সুসংস্কৃত করিয়া দেবমূর্ত্তিতে পরিণত করিতেন; ধাত্রীবিদ্যাপারদর্শিনী তাঁহার মাতা আসন্নপ্রসবা নারীর সন্তানোৎপাদনে সহায়তা করিতেন, সুতরাং তিনি মানবের কুসংস্কার নিরাকরণ ও অন্তর্নিহিত সত্যস্ফূর্ত্তির পরিস্ফূরণে সাহায্য করিয়া তাঁহার পিতামাতার বৃত্তিরই অনুসরণ করিতেছেন।

ইতিহাসে কথিত আছে, সক্রেটীস নিজ জীবনের সর্ব্ববিষয়ক ইতি-কর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারণস্থলে নিজ ইষ্টদেবতার (Daemonium) নিকট হইতে সাহায্য পাইতেন। তাঁহার বিচারবুদ্ধি তাঁহাকে কর্ম্মবিশেষে প্রবৃত্ত হইতে বলিলেও, এই দেবতা কখন কখন তাঁহাকে ঐ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত থাকিতে বলিতেন। এই দেবতার আদেশেই তিনি রাষ্ট্রব্যাপারে লিপ্ত হইতে নিরস্ত হয়েন এবং নিজ প্রাণদণ্ডাজ্ঞার বিরুদ্ধেও কোনরূপ আপত্তি উত্থাপন করিতে নিবৃত্ত হয়েন।

এইরূপে মানবের অন্তর্নিহিত আত্মজ্ঞানের প্রাধান্য ঘোষণা করিয়া সক্রেটীস গ্রীসদেশে এক নূতন চিন্তাস্রোতের সূত্রপাত করিয়া যান। তাঁহার আবির্ভাবের পূর্ব্বে সাধারণ লোকের দৈবশক্তিতে বিশ্বাস বা দৈব-বাণীর উপর আস্থা লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছিল। তাঁহার অদ্ভুত জীবনালোকেই তাহারা এখন ঐ কুসংস্কার হইতে মুক্ত হইয়া বিজ্ঞানানুমোদিত প্রণালীতে আত্মচিন্তার দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল। এই নূতন চিন্তার প্রবর্ত্তনে সক্রেটীস রাজদ্বারে অভিযুক্ত হন। অপরাধ—(১) তিনি নাস্তিক; প্রচলিত দেবদেবীতে বিশ্বাস করেন না; (২) তিনি এথিনিয়ান যুবক-দিগের মন ভ্রমপূর্ণ যুক্তিবলে কলুষিত করিয়াছেন। এই অপরাধের জন্ম

তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। তিনি আপনার নিরপরাধ প্রমাণ করিবার জন্য প্রচলিত আইন কানুন বা কূট তর্কের আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু যথার্থ বীরের ন্যায় নিজকৃত কার্য্যসমূহ সর্ব্বসমক্ষে ন্যায়সঙ্গত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন মাত্র। আত্মার অবিনাশিত্ব সম্বন্ধে দৃঢ়-নিশ্চয় হইয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে তিনি কিছুমাত্রও কুণ্ঠিত হন নাই। (Festival of Doria) ডোরিয়া উৎসবের জন্য তাঁহার প্রাণদণ্ড একমাস কাল স্থগিত ছিল। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি নিজ আত্মীয় ও শিষ্য-বর্গের সমক্ষে আত্মার অমরত্ব সম্বন্ধে এক সুদীর্ঘ আলোচনা করেন (Platoর Phaedo গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। পরে আত্মীয়স্বজনগণের নিকট হইতে প্রসন্নমনে বিদায় গ্রহণ করিয়া এবং তাঁহার শরীরপাতের জন্য তাঁহাদিগকে শোক করিতে নিষেধ করিয়া তিনি অবিচলিতচিত্তে বিষ (hemlock) পানে ইহধাম পরিত্যাগ করেন। (Xenophanes জেনোফেনিস্ প্রণীত (Memorabalia) মেমোরেবেলিয়া ও (Plato) প্লেটো প্রণীত কথোপকথন (Dialogue) পুস্তকই সক্রেটীস সম্বন্ধীয় সকল বিবরণের ভিত্তিস্বরূপ। কারণ, (Aristotle) এ্যারিষ্টটল্ ঐ বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা (Plato) প্লেটোর উক্তিকেই সমর্থন করে মাত্র। ঐ উভয়ের বিবরণমধ্যে আবার কিঞ্চিৎ ভেদ পরিলক্ষিত হয়। জেনোফেনিসের মতে সক্রেটীস একজন নীতি-কোবিদ্ ধর্ম্মোপদেষ্টা মাত্র; কিন্তু প্লেটো তাঁহাকে সূক্ষ্মদর্শী গভীর চিন্তা-শীল দার্শনিক বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার উভয় শিষ্যের মধ্যে ঐরূপ মত ভেদ থাকায় ইউরোপীয় দর্শনের ইতিহাসের লেখকগণ আপনাপন রুচি অনুসারে সক্রেটীসকে নানা বর্ণে অঙ্কিত করিতে ত্রুটি করেন নাই। কেহ কেহ Xenophanesএর মতের পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছেন, কেহ বা Platoর উক্তিই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা ঐ উভয় দলের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য করিতে চেষ্টা করিয়া উপরোক্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিলাম। আমাদের মনে হয়, প্লেটোর মত সূক্ষ্ম দার্শনিক সক্রেটীস-প্রচারিত মতামতের গভীরতা যতদূর হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, যুদ্ধব্যবসায়ী জেনোফেনিস্ তত-দূর সক্ষম হইয়াছিলেন কি না, সন্দেহ। পূর্ব্ব পূর্ব্ব দার্শনিকগণের ন্যায় সক্রেটীস জগৎসৃষ্টির কোন ব্যাখ্যা করেন নাই এবং আদি কারণের অনুসন্ধান হইতে নিবৃত্ত হইয়া আত্মানুসন্ধানেই নিযুক্ত ছিলেন। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান চর্চ্চাও তিনি সবিশেষ অনুমোদন করিতেন না। এই সকল

কারণেই বোধ হয়, কেহ কেহ তাঁহাকে কেবল মাত্র নীতি-উপদেষ্টা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

"নমো ভগবতে শ্রীরামকৃষ্ণায়।"

সিষ্টার নিবেদিতা।

(মহাপ্রস্থান।)

"ওখানে গগনে কাল ছিল এক তারা,
কে জানে কেমনে আজ কোথা' হ'ল হারা?
বারিধি-বিপুল-কূলে বালুকা বিস্তার,
কে জানে কোথায় গেল এক কণা তার!"

(সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার)

আজ কয়েক মাস ধরিয়া আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে বঙ্গীয় হিন্দুসমাজে নানা আধিদৈবিক উৎপাত ক্রমান্বয়ে উপস্থিত হইতেছে। বঙ্গের সাহিত্যাকাশ হইতে পর পর 'ইন্দ্র' 'চন্দ্র' পাত হইতেছে। নানা ভাষার বিশ্বকোষ মহামনীষা সম্পন্ন হরিনাথ অকালে লোকান্তরিত হইলেন। কিছু দিন না গত হইতে হইতেই পুনরায় পণ্ডিতাগ্রগণ্য বঙ্গের বেদান্তাধ্যাপক ও প্রচারক কালীবর বেদান্তবাগীশ পরলোক যাত্রা করিলেন। বঙ্গীয় রাজন্যবর্গের অন্যতম খ্যাতনামা কুচবিহারাধিপতি ও উত্তর পাড়ার কুমার রাজেন্দ্রনাথ মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। চিকিৎসক-কুল-ভূষণ কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত এবং মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ বিজয়রত্ন আমাদের ত্যাগ করিলেন। আবার সেদিন তারা মা'র সুসন্তান তারা পীঠের সেই অত্যদ্ভুত বামা ক্ষেপা তারাপদে প্রয়াণ করিতে না করিতেই ভক্তশিরোমণি স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ রামকৃষ্ণ-লোকে গমন করিলেন। সকলে আক্ষেপ করে, যেমনটী যায়, তেমনটী আর হয় না! যাহা হারাই, তাহা আর পাই না! এ কথা সম্পূর্ণ না হউক, অনেকটা যথার্থ। কারণ, কে বলিবে বঙ্গমাতার পূর্ব্বোক্ত মুখোজ্জ্বলকারী সন্তানগণের ন্যায় মহাত্মাগণকে পাইয়া আবার কবে আমরা গৌরবান্বিত হইব? কিন্তু হায়! বঙ্গাকাশে এ দুর্ভাগ্য রজনীর এবার কি

আর অবসান নাই? পূর্ব্বোক্ত মহাত্মাগণের স্থান কালে পূর্ণ হইতে পারে, কিন্তু যে মহোজ্জল রত্ন আমরা আজ হারাইয়াছি, তাহার স্থান কি আর কখন পূর্ণ হইবে? বহু সৌভাগ্যের ফলে উদিত হইয়া যে স্নিগ্ধোজ্জল শুকতারা গত চতুর্দ্দশ বর্ষ ধরিয়া কান্তমধুর দীপ্তিদান করিয়া বাঙ্গালীর মনে বহুতর আশাবাণী জাগাইতে জাগাইতে আজ অকস্মাৎ অস্তমিত হইল, ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা কখন কোন কালে যে তাহার অনুরূপ আর একটী দেখিতে পাইবে না, ইহা সুনিশ্চিত। কারণ, ইনি বঙ্গে জন্ম গ্রহণ না করিলেও যথার্থই বাঙ্গালী—ভারতে শরীর-পরিগ্রহ না করিলেও ত্যাগ, তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য এবং সর্ব্বোপরি ভারত-প্রেমে আমাদের অপেক্ষাও ভারতের নিজস্ব বস্তু। বাঙ্গালী হারাইয়া হয়ত আবার তাদৃশগুণসম্পন্ন বাঙ্গালী পাইব, ভারতবাসী হারাইয়া হয়ত কালে আবার কোনও দিন তদনুরূপ ভারতবাসী পাইব, কিন্তু ভারতেতর দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াও এমন ভারত-প্রেমিকা, বঙ্গীয়-রমণীকুল-সম্ভূতা না হইয়াও এমন বাঙ্গালীর সমবেদনা-ভাগিনী ও আদর্শ হিন্দু-রমণীর ন্যায় এমন বঙ্গাঙ্গন-চারিণী, লোকহিত-ব্রত-ধারিণী, ব্রহ্মচারিণী নিবেদিতার ন্যায় ভগিনী আর আমরা কখনও পাইব না। বিদেশী হইয়াও ভারত এবং বঙ্গ-হিতৈষী উন্নতমনা পুরুষ ও মহাশয়া মহিলা আমরা ইতিপূর্ব্বে অনেকানেক পাইয়াছি, কিন্তু বিদেশ হইতে বহু যত্নে সমাহৃত ও শ্রীভগবানের মহাপূজায় সম্যক নিবেদিত হইয়া ভারতপ্রেমে এমন পূর্ণভাবে উৎসর্গীকৃত প্রফুল্ল-পারিজাত-সদৃশ জীবনকে ভারতের নিজস্ব বলিতে আমাদের সৌভাগ্যে আর কখন ঘটিবে কি না, সন্দেহস্থল।

সিষ্টার নিবেদিতার ন্যায় বিদুষী, মহীয়সী মহিলা অনুসন্ধানে অতিঅল্প-সংখ্যকই এ জগতে দেখিতে পাওয়া যায়। 'মিস্ মারগারেট্ নোব্‌লে'র পিতা স্কট্‌লণ্ড-নিবাসী এবং মাতা আয়র্লণ্ড-নিবাসিনী ছিলেন। ইনি লণ্ডনে শিক্ষালাভ করিয়া স্বল্পকালেই সুপণ্ডিতা বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁহার শিক্ষানুরাগ এত প্রবল ছিল যে, উচ্চশিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে তিনি ইউরোপীয় তিন চারিটী প্রধান ভাষা যত্নে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। জগদ্বি-শ্রুত ধর্ম্মবীর স্বামী বিবেকানন্দের সহিত তিনি লণ্ডনে ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে পরিচিতা হয়েন। এই পরিচয়ই ক্রমে ঘনীভূত হইয়া তাঁহাকে ঐ মহাপুরু-ষের শিষ্যত্ব গ্রহণে এবং ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন করিয়া ঈশ্বরোদ্দেশে জীবন যাপনে

নিয়োজিত করে। শুধু তাহাই নহে, এই পরিচয়ই তাঁহাতে ভারতের জাতীয় উন্নতিকল্পে জীবনোৎসর্গের বাসনা জাগরিত করিয়া দেয়। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দের লণ্ডন ত্যাগের পূর্ব্বেই যে তিনি ঐ মহাপুরুষের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তদ্বিষয় সিষ্টার স্বয়ংই লিখিয়াছেন ;—

"The time came, before the Swami left England, when *I addressed him as "Master" I had recognised the heroic fibre of the man, and desired to make myself the servant of his love for his own people*" ঐ সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য তিনি স্বামী বিবেকানন্দের ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তনের অনতিকাল পরে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে ভারতে আগমন করিয়া শ্রীগুরুর পাদপদ্মে পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করেন। উহার অল্পদিন পরেই তিনি স্বামীজি কর্ত্তৃক ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানে দীক্ষিতা হইয়া গুরুপ্রদত্ত 'নিবেদিতা' নাম গ্রহণ করেন। স্বীয় চরিত্র মাধুর্য্যে ও ঔদার্য্যে এখন হইতে তিনি শীঘ্রই কলিকাতার আপামর সাধারণের সম্মানীয়া ও শ্রদ্ধাস্পদা হইয়া উঠেন এবং স্বেচ্ছায় হিন্দুললনার ন্যায় অন্তঃপুরচারিণী থাকিয়া কলিকাতার হিন্দু গৃহস্থগণের প্রতিবাসিনীরূপে বাগবাজারস্থ বসুপাড়া-পল্লীতে গত চতুর্দ্দশ বৎসর কাল প্রায় নিয়ত বাস করিয়া আসিতেছিলেন। এই স্থানে তিনি হিন্দুনারীগণের শিক্ষাকল্পে যত্নপরায়ণ হইয়া আমেরিকার দু'একটী সহৃদয়া মহিলার সাহায্যে স্থানীয় বালিকা ও বয়স্থা কন্যাগণের জন্য একটী শিক্ষালয় পরিচালনা করিতেছিলেন। ছাত্রীগণ উহাতে সদ্বংশজাতা মহিলা শিক্ষয়িত্রীগণ কর্ত্তৃক শিক্ষিতা হয়েন। পুরুষ মাত্রেরই উহাতে প্রবেশ অধিকার নিষেধ। সাহিত্য ও লঘু অঙ্কন-শাস্ত্রের আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে ভগবৎ স্তোত্রাদিপাঠ ও নানা শিল্পকার্য্যের শিক্ষা এই বিদ্যালয়ে কোনওরূপ বেতনাদি গ্রহণ না করিয়া নিয়মিতভাবে দেওয়া হইয়া থাকে। দুঃখের বিষয় এই বিদ্যালয়ের প্রধান পৃষ্ঠপোষিকা শ্রীমতী ওলি বুল নাম্নী মহিলা সম্প্রতি লোকান্তরিত হওয়ায় উহার কার্য্যকারিতা কথঞ্চিৎ মন্দীভূত হইয়া আসিয়াছে।

ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি ভগ্নী নিবেদিতা বাঙ্গালীর সহিত মিলিয়া মিশিয়া বাঙ্গালীভাবেই থাকিতে ভাল বাসিতেন। প্রাচ্য ঢঙ্গে আড়ম্বর মাত্র হীন সামান্য পরিচ্ছদে ভূষিতা রুদ্রাক্ষধারিণী এই দেবীমূর্ত্তিকে পল্লীতে ইতস্ততঃ

ভ্রমণ করিতে দেখিলে মনে হর্ষ ও বিস্ময়ের যুগপৎ সমাবেশ হইত। শুধু বেশ-ভূষায় দৈন্য স্বীকার করিয়া নহে,তিনি নিজ গুরুর জন্মভূমি ভারতের,বিশেষতঃ বাঙ্গালীর জন্য তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব দান করিয়া আমাদের সেবা ও সাহায্যব্রতেই সম্পূর্ণভাবে জীবনোৎসর্গ করিয়াছিলেন। প্লেগ নামক মহাব্যাধির প্রকোপে যখন সমগ্র কলিকাতাবাসী সন্ত্রাসিত ও বিপর্য্যস্ত তখন এই দেবী-সদৃশী পর-দুঃখকাতরা সহৃদয়া মহিলাকে কতবারই না আমরা রোগশয্যা-পার্শ্বে শুশ্রূষা ও পরিচর্য্যা-পরায়ণা হইয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছি। স্বীয় জীবনের মমতা এককালে বিসর্জ্জন দিয়া রোগীর আত্মীয় স্বজনকে রোগীর নিকট হইতে সরাইয়া দিয়া মহাসংক্রামক-ব্যাধিগ্রস্ত রোগীকে কোলে করিয়া যখন তিনি বসিয়া থাকিতেন, তখন কে না বলিত, তুমি যথার্থই করুণাময়ী দেবী "a ministering angel thou !" তাই বলিতেছি,যথার্থই ভগিনী নিবেদিতা মহাপুরুষকর্ত্তৃক ভগবৎকার্য্যে সম্প্রদত্তা হইয়া আমরণ ঐ ভাবেই জীবন যাপন করিয়াছেন।

তীর্থাদি পরিভ্রমণে ধর্ম্ম ও পবিত্রতা লাভ হয়, এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া ভারতবর্ষের নানা তীর্থাদি পর্য্যটন করা তাঁহার অন্যতম সাধনা ছিল। আজকাল আমরা যেমন সচরাচর রেলপথে বারাণসী বা পুরুষোত্তমাদি-ক্ষেত্রে বেড়াইতে বা বায়ুপরিবর্ত্তনে যাই, তাঁহার তীর্থভ্রমণ সেরূপ ছিল না। তীর্থের পথ দুর্গম বা সুগম হউক, তাহাতে তাঁহার নিকট কিছুই আসিয়া যাইত না। হিমগিরির কঠোর চূড়াসমূহ উল্লঙ্ঘন করিয়া তিনি কাশ্মীর প্রদেশের অমরনাথ ও গাড়োয়াল প্রদেশস্থ বদরিকেদার প্রভৃতি দুর্গম ও মহাকষ্টসাধ্য তীর্থাদিতে সানন্দে গমন করিয়াছিলেন। এইরূপে তীর্থ-মাহাত্ম্য অনুভব ও ধর্ম্ম লাভের জন্য তিনি প্রাণপণে বহু আয়াস স্বীকার করিতেন। আবার নানা ঐতিহাসিক তত্ত্বোদ্ঘাটনে ঐ সকল তীর্থের প্রাচীনতার প্রমাণ সংগ্রহেও তিনি সবিশেষ যত্ন করিতেন। হিন্দু সাধকের ন্যায় কুণ্ডাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া ঐ ধুনীর সমক্ষে ধ্যানপরায়ণা হইয়া তাঁহার বসিয়া থাকিবার কথা আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত আছি। হিন্দুর নিত্য ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রথাগুলি তিনি প্রগাঢ় শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন এবং ধ্যান ধারণা জপ তপের ন্যায় নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠানেও ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করা যাইতে পারে, একথা পূর্ণভাবে বিশ্বাস করিতেন। পরদুঃখকাতরা নিবেদিতা পল্লীস্থ অনাথা সহায়হীনা হিন্দু-বিধবাগণকে ও দারিদ্র্যপ্রপীড়িত সাধারণ

নরনারীগণকে সদাসর্ব্বদা গোপনে কতই না সাহায্য দান করিতেন! এই সকল দুঃখমোচনানুষ্ঠানে তাঁহার কত সময়ই না ব্যয় হইত! নানা নূতন উপায় উদ্ভাবন করিয়া, শিল্পকার্য্যের সহায়ক নানা যন্ত্রাদি ক্রয়করিয়া এই সকল অসহায়াগণকে শিল্পশিক্ষা দেওয়া তাঁহার এক প্রধান কার্য্য ছিল। তাহারা তাঁহার সহাযে আপন আপন শক্তি ও অনুরাগানুসারে শিল্পকলা শিক্ষা করিয়া নিজ নিজ অভাবমোচনোপযোগী অর্থোপার্জ্জনে সক্ষম হইত। সময়ে সময়ে সিষ্টার স্বয়ংই তাঁহাদের শ্রমশিল্পজাত দ্রব্যাদি ক্রয করিতেন, আবার কথন কথন ঐ সকল অন্যত্র বিক্রয় করাইযা দিয়া তাহাদিগকে উৎসাহ ও সাহায্য দান করিতেন। বাগবাজার পল্লীর অনেক সম্ভ্রান্ত অথচ নিঃস্ব ভদ্রমহিলা এই ভাবে তাঁহার কৃপায় আপন আপন আর্থিক অভাব মোচনে সক্ষম হইযাছেন।

চরিত্রের বিশুদ্ধতা ও অমাযিকতার কথা স্মরণ করিযা নিবেদিতাকে ঋষি-কন্যা আখ্যা দিলেও অত্যুক্তি হয না। নিবেদিতা যে বিদুষী ও উচ্চশিক্ষিতা ছিলেন, একথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কিন্তু তাঁহার অসাধারণ বিবিদিষা ও শিক্ষা নিজ পার্থিব উন্নতিসাধনের দিকে কখন নিয়োজিত হয নাই। শিক্ষার উদ্দেশ্য যদি মানবমনে প্রকৃত মনুষ্যত্বের বীজসমূহ রোপন করা হয়, তাহা হইলে ভগিনী নিবেদিতা যথার্থই উচ্চশিক্ষাসম্পন্না ছিলেন। নিঃস্বার্থতা গুণে যদি মনুষ্যত্ব দেবত্বের স্থানভাগী হইতে সক্ষম হয, তাহা হইলে, ভগিনী নিবেদিতা মানবী হইয়াও যথার্থই দেবী পদবী অধিকার করিয়াছিলেন। নিরভিমানিতাই যদি যথার্থ পাণ্ডিত্যের পরিচাযক হয, তাহা হইলে বলিতে হইবে, নিবেদিতার ন্যায সুপণ্ডিত সংসারে বিরল।

মিশনরী-কুহকে পড়িয়া ভারতবাসী কেহ কেহ যেমন ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিযা থাকেন, ভগিনী নিবেদিতা জগৎবিশ্রুত বাগ্মী স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতায় বিমোহিত হইযা সে ভাবে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করেন নাই। তীক্ষ্ণ-বিবেকবুদ্ধিসম্পন্না, ন্যায ও সত্যানুরাগিণী, মহাতেজস্বিনী এই ইংরাজ মহিলা অতি সন্দিগ্ধ মনে ও সতর্কতার সহিত যুক্তি ও গবেষণা দ্বারা প্রত্যেক বিষয় সম্যক্‌রূপে পরীক্ষা করিয়া তবে স্বামীজিপ্রচারিত হিন্দুধর্ম্মের তত্ত্ব-সমূহে ধীরে ধীরে হৃদযের গভীর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা দান করিয়াছিলেন। তিনি নিজে ঐ বিষয়ে যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা এখানে উদ্ধৃত করিলে মন্দ হইবে না।

"But his system as a whole, I, for one, viewed with suspicion, as forming only another of those theologies which if a man should begin by accepting, he would surely end by transcending and rejecting And one shrinks from the pain and humiliation of spirit that such experiences involve." এইরূপে ভয়ে ভয়ে আলোচনা আরম্ভ করিলেও পরিশেষে হিন্দুধর্ম্মানুগত সত্য ও অপার সৌন্দর্য্য অনুভবে তিনি মুগ্ধা হইয়াছিলেন।

এইবার তাঁহার সমাজত্যাগের কথা। আমাদের সমাজ ত্যাগ তাঁহার ত্যাগের তুলনায় যে কত দূর অকিঞ্চিৎকর তাহা বলা দুঃসাধ্য। উচ্চকুল-সম্ভূতা ও উচ্চশিক্ষিতা ইংরাজ মহিলার পক্ষে সত্যের অনুরোধে স্বীয় প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া, কৈশোর ও যৌবনের দৃঢ়াঙ্কিত স্মৃতি-রাশি অপসৃত করিয়া, ধনৈশ্বর্য্য ও লীলা বিলাসের কেন্দ্রভূমি ইউরোপ এবং ইউরোপীয় সভ্যতা উপেক্ষা করিয়া ও স্বীয় পরমপ্রেমাস্পদ আত্মীয় স্বজনাসক্তি বিস্মৃত হইয়া আপাত-দৃষ্টিতে জঘন্য, মহামারি-হাহাকার-পরিপূর্ণ, ভোগমাত্রৈক-বিহীন, দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত, অস্থিকঙ্কালসার-নরনারী-বেষ্টিত এই ভারতবর্ষে আসিয়া দারিদ্র্যব্রতাবলম্বনে লোকহিতের জন্য কাল যাপন করা কত কঠিন, কত কষ্টকর, তাহা ভাবিয়া দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। *ধন্য ভগিনী নিবেদিতা, ধন্য তোমার ত্যাগ, ধন্য তোমার কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা!* তুমি যে ভাবে হিন্দুধর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলে, অহিন্দুকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াও তুমি যে ভাবে হিন্দুকে আপনার করিয়া লইয়া তাহার সহিত মিশিয়াছিলে এবং হিন্দুসমাজের বিজাতি-বিদ্বেষ নাশ করিবার নিমিত্ত তুমি যে ভাবে সর্ব্বস্বত্যাগিনা ও ব্রহ্মচারিণী হইয়া ঐ বিদ্বেষ-বহ্নিতে, নিজ অসাধারণ সহিষ্ণুতা ও বুদ্ধিমত্তার গুণে শান্তিবারি সেচন করিয়া গিয়াছ, অদ্যাবধি কোনও বিদেশীয় নরনারী তাহা করেন নাই বা করিতেও সক্ষম হয়েন নাই। তোমার 'Lambs among Wolves" (Missionaries in India) নামক অপূর্ব্ব সন্দর্ভ পাঠে ইউরোপীয় সভ্যজগৎ চমৎকৃত, নিন্দুক-দল লাঞ্ছিত ও হিন্দুধর্ম্ম গৌরবান্বিত. তুমি বিশ্ব-প্রসবিনী জগদম্বার সেবিকা হইয়া আপনাকে মহিমান্বিতা জ্ঞান করিতে। বিশ্বেশ্বরী জগজ্জননী মহাকালীর উপাসনায় তোমার প্রেমাশ্রু ঝরিত। তুমি মৃণ্ময়ী দেবীমূর্ত্তিতে অখণ্ড সচ্চিদানন্দময়ীর আবির্ভাব দেখিয়া শক্তিপূজার যথার্থ তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম

করিয়াছিলে এবং হিন্দুর মূর্ত্তিপূজার স্বপক্ষে তীক্ষ্ণ খড়্গ ধারণ করতঃ, "Kali Worship" ও "Kali the mother" নামক প্রবন্ধদ্বয়ে ঐ বিষয়ের বিরোধী মতসমূহ খণ্ডন করতঃ হিন্দুর স্বধর্ম্মনিষ্ঠা প্রতিপন্ন করিয়াছ। তোমার "Cradle Tales of Hinduism" ও "The Web of Indian Life" বিদ্বেষিগণের চক্ষুঃশূল হইয়াও অনেকানেক ভারতানভিজ্ঞের জ্ঞান চক্ষু উন্মীলন করিতেছে। "An Indian Study of Love and Death" নামক পুস্তিকায় তোমার হৃদয়ে সৌন্দর্য্য ও মহাপ্রাণতা যে কতদূর ছিল তাহা বিলক্ষণ উপলব্ধি হয়। তোমার "Glimpses of Famine & Flood in Eastern Bengal" নামক সন্দর্ভে কত কথাই না কৌশলে লিপিবদ্ধ করিয়া দুর্ভিক্ষ নিবারণের প্রকৃত সন্ধান প্রদান করিয়াছ। "The Indian World," "The Indian Review," "Prabuddha Bharat" এবং 'The Modern Review" নামক মাসিক পত্রসমূহে তুমি যে সকল জ্ঞানগর্ভ, সূক্ষ্মদৃষ্টি ও গবেষণা পূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশ করিযাছ, তৎপাঠে কত লোকেরই মন না আলোকিত হইযাছে!

আবার আর এক বিষযে তোমার অভাবনীয অনুরাগের পরিচয় পাইয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি। সেটী তোমার শিল্পসৌন্দর্য্যানুরাগ। তোমার এই অদৃষ্টপূর্ব্ব শিল্পানুরাগ বিশিষ্ট শিল্পীরও অনুকরণীয। ভারতীয নানা কলা-শিল্পের সৌন্দর্য্যে মোহিত হইযা তুমি যে ভাবে তাহাদের জীবন্ত ব্যাখ্যা করিযা গিয়াছ, কয় জন শিল্পী আজ তেমন ভাবে শিল্প-সৌন্দর্য্যের ধ্যান-পরাযণ থাকিয়া প্রকৃত তত্ত্বের সন্ধান দিতেছেন? ভারতের নানা তীর্থাদি ও পুরাতন গ্রাম, নগর, গিরিগুহাদিতে গমন করিয়া এবং স্বয়ং না যাইতে পারিলে তথায় লোক প্রেরণ করিয়া, Camera সাহায্যে প্রাচীন স্থাপত্যের ও শিল্পসৌন্দর্য্যের প্রতিকৃতি উঠাইযা আনিয়া প্রাচীন শিল্পকলা সমূহের সৌন্দর্য্য বুঝিতে ও বুঝাইতে তুমি কতই না কৌতুহল ও আনন্দ প্রকাশ করিতে!

আবার সাহিত্যবিভাগে গ্রন্থরচনায় সুপরামর্শদানে কত বাঙ্গালী গ্রন্থকারকেই না তুমি সাহায্য করিয়াছ! গ্রন্থবর্ণিত বিষয় সম্বন্ধে গ্রন্থকারদিগের নিজ জ্ঞানাতিরিক্ত সম্পদ-সাহায্য দানে ও সময়ে সময়ে তাঁহাদের গ্রন্থের কতকাংশ নিজে লিখিয়া দিয়া তুমি প্রচ্ছন্নভাবে তাঁহাদিগকে যে কত সাহায্য করিয়াছ, তাহা প্রকাশ করা যায় না। তোমার

বক্তৃতা, নিবন্ধ ও সন্দর্ভাদি পাঠে অসাধারণ সূক্ষ্ম দৃষ্টি, ও গবেষণার সহিত লোকহিতৈষণার অপূর্ব্ব সমাবেশ দেখিয়া কে না মুগ্ধ হয়? কে না হৃদয়ের শ্রদ্ধা তোমায় ঢালিয়া দেয়? তোমার হিন্দুধর্ম্মানুরাগ দেখিয়া তোমার স্বদেশবাসিগণ অনেক সময়ে তোমার উন্নত মনের উদারভাবসমূহ বুঝিতে সক্ষম হয় নাই, কিন্তু তোমার চরিত্রের মাধুর্য্যে তাহারাও মোহিত ও চমৎকৃত। কিন্তু তোমাব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি, তোমার চিত্তসৌন্দর্য্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি, তোমার গুরুপূজাভিনয়ের অন্তিম পুষ্পাঞ্জলি, "The Master as I saw him." বাঙ্গালীর নিত্যপূজ্য আদরের ধন, ত্যাগ-বৈরাগ্য ও ভগবভক্তির অনন্ত মূর্ত্তি এবং স্বদেশপ্রেমিকগণের শীর্ষস্থানীয় তোমার গুরু তোমায নিজ কার্য্যে নিয়োজিত করিবার সময় তোমাকে অভয় দান করিয়া বলিয়াছিলেন, চিরকাল আমি তোমার সহায়তা করিব—"I shall stand by you unto death"—তাঁহার শ্রীমুখ-নিঃসৃত ঐ মহাবাক্যই যে তোমার হৃদয়ে সদাসর্ব্বদা জাগরূক থাকিয়া সারা জীবন তোমাকে সকল কার্য্যে অদম্য উৎসাহে উৎসাহিত করিয়া রাখিত একথা তোমার অলৌকিক জীবন এবং ঐ অপূর্ব্ব গ্রন্থ দেখিয়াই উপলব্ধি হয়। তুমি নিজ নাম-স্বাক্ষরকালে লিখিতে "Sister Nivedita of Ram-krishna Vivekananda"; তোমার জীবনালোচনা করিলে মনে হয়, যথার্থই শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ চিরদিনের জন্য তোমার অন্তরের অন্তরতম দেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তুমি তাঁহাদেরই। ভক্ত ও ভগবান্ যদি অভেদ হয়, তবে তুমিও তোমার উপাস্য শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সহিত অভেদ-পদবী লাভ করিয়াছ। তোমার "The Master as I saw him" গ্রন্থ যিনি পাঠ করিবেন, তিনিই তোমার গুরু শ্রীস্বামী বিবেকানন্দের অলৌকিক জীবনের কথা হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাঁহার চরণতলে ভক্তি ও শ্রদ্ধার অঞ্জলি দান করিতে অগ্রসর হইবেন। শুধু তাহাই নহে, গুরুমাহাত্ম্যপ্রচারের সঙ্গে সঙ্গে তোমার ঐ অমূল্য গ্রন্থ, তুমি স্বয়ং কতই যে মহৎ ছিলে, তাহাও সাধারণের হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিবে। দারজিলিঙের গিরিশৃঙ্গে তোমার নশ্বর মায়িক দেহ সেদিন ভস্মসাৎ হইল; ধর্ম্মজীবনের কঠোর সাধনায় ও লোকহিতৈষণার অতিরিক্ত পরিশ্রমে তোমার কুসুমসুকোমল দেহ বিশুষ্ক হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল—হিমালয়শৃঙ্গে, মহাদেব-অঙ্গে, নিবেদিতার পূর্ণ নিবেদন হইল!—কিন্তু ভগবৎ রাজ্যে ইংরাজি ভাষার মত

দিন অস্তিত্ব থাকিবে, ততদিন তোমার অদ্ভুত জীবনের মহত্তা মহিমা ভারতে কীর্ত্তিত হইবে এবং ভারতবাসীর অন্তঃকরণে, বিশেষতঃ বঙ্গবাসীর মনোমন্দিরে তোমার কর্ম্মময়ী পবিত্র জীবনগাথা চিরকাল গীত হইয়া তোমার মধুময়ী স্মৃতি জাগরিত করিয়া রাখিবে। তোমার চরমকালীন শেষ বাণী "The boat is sinking, but I shall yet see the Sunrise", তুমি যে শ্রীগুরুর কৃপায় মৃত্যুঞ্জয়ত্ব লাভ করিয়াছিলে, তাহাই আমাদিগকে স্মরণ করাইযা দিতেছে! আমরা তোমাকে বার বার প্রণাম করিয়া শ্রীগুরুসমীপে কৃতাঞ্জলিপুটে ইহাই প্রার্থনা করি যেন আমরা তোমারই ন্যায় সর্ব্বতোভাবে লোকহিতায় আত্মনিবেদন করিতে পারি! *

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত।

শ্রীরামানুজদর্শন।

(১০)

[শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ।]

আচার্য্যমতে যাহাকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলা হয়, সেই প্রত্যক্ষ প্রমাণের নির্ণয়-প্রসঙ্গে সমস্ত জ্ঞানই সত্য ও সবিশেষ-বিষয়ক, ইহা পূর্ব্ববর্ত্তী প্রবন্ধগুলিতে অতি যত্নে প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই দুইটী বিষয় আচার্য্যমতের একপ্রকার মূলভিত্তি। আচার্য্যের সম্প্রদায় এই দুইটী বিষয়ের জন্য বিশেষ আগ্রহ করিয়া থাকেন, কারণ, এই দুইটী বিষয়ে যদি তাঁহারা বাদীর নিকট দুর্ব্বল হইয়া পড়েন, তাহা হইলে তাঁহাদের বিশিষ্টাদ্বৈত বাদটীই দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে এবং প্রকারান্তরে দ্বৈতবাদী ও অদ্বৈতবাদীদিগের বিজয় ঘোষিত হইবে। রামানুজাচার্য্যপ্রচারিত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ব্যতীত এদেশে দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদেরই প্রচার অধিক, সুতরাং এস্থলে যে রামানুজসম্প্রদায় বিশেষ সাবধান হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? এক কথায় এই দুইটী বিষয়ই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের সহিত দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদের মূলগত ভেদ।

এই বিষয় দুইটীর কথা যদিও ইতিপূর্ব্বে সবিস্তারে কথিত হইয়াছে, তথাপি উপসংহারমুখে একবার ইহাদের পুনরালোচনা করিলে মন্দ হইবে

* বিগত ৬ই কার্ত্তিক ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিবস ৺রায় নন্দলাল বসু মহাশয়ের ভবনে বাগবাজার বাসীর অনুষ্ঠিত সিষ্টার নিবেদিতার শোক-সভায় পঠিত।

না। গ্রন্থকারও ঠিক এই উদ্দেশ্যে এই বিষয় দুইটীর পুনরুল্লেখ করিয়াছেন।

প্রথম—সমস্ত জ্ঞানই সত্য। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, আমাদের যে কোন জ্ঞান হয় তাহাই সার্থক, তাহারই বিষয় আছে। বিষয় নাই অথচ জ্ঞান হইতেছে, এরূপ কোন মিথ্যাজ্ঞান আমাদের হয় না। ঘট, পট, বাটী, ঘর, দুয়ার অথবা শুক্তিতে রজত, রজ্জুতে সর্প প্রভৃতি যাহারই জ্ঞান আমাদের হয়, তাহারা সকলেই আছে, বা হইবে বা ছিল—এককথায় তাহারা সকলই সত্য। এ বিষয়ে রামানুজমত এই প্রকার হওয়ায় ইহার ফল হইল এই যে, ব্রহ্ম বা ভগবান্ যেমন সত্য পদার্থ, এ জগৎ সংসারও তদ্রূপ সত্য পদার্থ, এ জগৎ সংসারের কিছুই মিথ্যা নহে। এখন এ জগৎ সংসার ও ঈশ্বর প্রভৃতি সকলই সত্য হইলে বৌদ্ধ এবং অদ্বৈতবাদীদিগের মতের সহিত রামানুজমতের আসল পার্থক্য প্রতিষ্ঠিত হইল।

দ্বিতীয়—সকল জ্ঞানই সবিশেষ-বিষয়ক অর্থাৎ কোন জ্ঞানই নির্ব্বিশেষ-বিষয়ক নহে। সবিশেষ-বিষয়ক মানে এই যে, যখনই আমাদের কোন জ্ঞান হয়, তখনই সেই জ্ঞানের বিষয় সবিশেষ হয়,—অর্থাৎ গুণ ও আকৃতি প্রভৃতি জাতি বিশিষ্ট হইয়া প্রতীয়মান হয়। কোন একটা কিছু দেখিলাম, অথচ তাহার কোন গুণ বা তাহার আকৃতি প্রভৃতি কিছুই দেখিলাম না, এরূপ কোন জ্ঞান আমাদের হয় না। যখনই যে কোন জ্ঞান আমাদের হয়, তখনই তাহার গুণ ও আকৃতি প্রভৃতিরও জ্ঞান সেই সঙ্গে সঙ্গে হইতে বাধ্য। এই গুণ ও আকৃতির জ্ঞান হয় বলিয়াই সকল জ্ঞানেই "ভেদজ্ঞানও" বর্ত্তমান থাকে, আর সকল জ্ঞানেই ভেদজ্ঞান থাকে বলিয়াই, অভেদজ্ঞানই অসম্ভব। সুতরাং যাহাদের মতে অদ্বৈত ব্রহ্ম-জ্ঞান সম্ভব বলিয়া কথিত হয়, তাহাদের সে মতটা একেবারেই ভুল।

আমরা যে প্রাচীন গ্রন্থখানি অবলম্বন করিয়া এই রামানুজ দর্শন লিখিতেছি, তাহার গ্রন্থকার এই বিষয়টী ইতিপূর্ব্বে যতটুকু বলিয়াছেন, এস্থলে উপসংহারমুখে তাহার পুনরালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া তৎসম্বন্ধে অনেক নূতন কথার অবতারণা করিয়াছেন। অবশ্য উপসংহারমুখে নূতন কথার অবতারণা করা ঠিক নহে, পরন্তু গ্রন্থকার এ দোষে দোষী হইলেও তিনি যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা অতি প্রয়োজনীয় এবং নিতান্ত

সূক্ষ্ম। এজন্য আমরা এস্থলে উহ' সবিস্তারে পাঠকবর্গকে উপহার দিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

গ্রন্থকার এতদুদ্দেশ্যে প্রবৃত্ত হইয়া প্রথমে নৈয়ায়িকের আপত্তি-খণ্ডন-প্রসঙ্গে যাহা বলিযাছেন, তাহাই এক্ষণে আলোচ্য। নৈয়ায়িক বলেন—জ্ঞান মাত্রই যে সবিশেষ-বিষয়ক অর্থাৎ ভেদবিশিষ্ট, তাহার প্রমাণ নাই, যেহেতু মনে কর, আমি চক্ষু বুজাইযা ভাবিতেছি, এমন সময যদি আমার অজ্ঞাতসারে আমার চক্ষুর সম্মুখে কেহ একটী পুষ্প লইয়া ধরে, এবং আমি চক্ষু চাহিবামাত্র উহা যদি কেহ অতি শীঘ্র অপসারিত করে, তাহা হইলে উক্ত পুষ্প সম্বন্ধে আমার যেমন পুষ্প বলিযাই জ্ঞান হয না পরন্তু একটা কিছু যেন আমার চক্ষুর সম্মুখ দিযা চলিয়া গেল বলিয়া বোধ হয়, তদ্রূপ সকল বিষয়েরই প্রথমজ্ঞানস্থলে উহাকে একটা কিছু বলিয়া জ্ঞান হয়; সে সময় তাহার কোন গুণ বা আকৃতি প্রভৃতির জ্ঞান আমাদের হয়না, সুতরাং দেখ, প্রত্যক্ষজ্ঞান মাত্রই যে ভেদবিশিষ্ট জ্ঞান হয, তাহার কোন প্রমাণ নাই। ইত্যাদি।

ইহার উত্তরে কিন্তু একজন রামানুজী বলিবেন যে না, তাহা নহে ; কারণ, যদি সকল জ্ঞানই প্রথমাবস্থায ঐরূপ নির্ব্বিশেষ বলিয়া স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে উক্ত পুষ্পটীর যে কোন প্রকার রূপ ও আকৃতি আছে, তাহা তোমার কোন কালেই জ্ঞানগোচর হইতে পারে না। পুষ্পজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার রূপ ও আকৃতির জ্ঞান হয় বলিযাই পুষ্পটী আমাদের জ্ঞানগোচর হয়। পুষ্পটীর রূপ ও আকৃতি প্রভৃতি যদি একসঙ্গে আমাদের জ্ঞানগোচর না হইত, তাহা হইলে উহাকে পুষ্প বলিয়া কোন কালে আমা-দের জ্ঞান হইত না। অগ্রে পুষ্পটীকে "কোন কিছু" বলিয়া একটা জ্ঞান হয়, তৎপরে তাহার রূপ ও আকৃতির জ্ঞান হয়, এরূপ স্বীকার করিলে ক্ষণভেদ স্বীকার করা হইল, আর ক্ষণভেদ স্বীকার করিলে দুই ক্ষণের দুইটী জ্ঞান একটী বস্তুবিষযক কি করিয়া হইতে পারে, অন্যকথায় সেই জ্ঞান দুইটীকে কি করিয়া একটী বিষয়ে সংযুক্ত করিতে পারা যাইতে পারে ? যেহেতু তাহা হয় না, সেই হেতু পুষ্পটীকে রূপবান্ বা আকৃতিবিশিষ্ট বলিয়া বোধ করা অসম্ভব। সুতরাং বল, রূপ ও আকৃতি-বিশিষ্ট পুষ্পটীই প্রথম হইতে জানিতেছ।

যদি বল, ক্ষণভেদ সত্ত্বেও দুইটী জ্ঞান একবিষয়ক হইতে পারে, যেমন

একটা ঘট দেখিয়া যদি কেহ মনে মনে 'ঘট' এই শব্দটী পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিতে থাকে এবং সেই ঘটের উপর দৃষ্টি আবদ্ধ রাখে, তাহা হইলে যেমন ঘটজ্ঞানের একটী ধারা বহিতে থাকে তদ্রূপ "একটা কিছু" জ্ঞানটী থাকিতে থাকিতেই রূপ ও আকৃতি জ্ঞানের বিষয়টী পরক্ষণেই তাহারই উপর স্ফূর্ত্তি পায় এজন্য একবিষয়ক দুইটী জ্ঞান সম্ভব, তাহা হইলে বলিব, তোমার এই ক্ষণভেদ স্বীকার নিষ্প্রয়োজন, কারণ তোমার রূপ ও আকৃতি জ্ঞান উক্ত একটা কিছু জ্ঞানের একটী অংশবিশেষ হইয়া দাঁড়াইতেছে। সুতরাং স্বীকার কর, তোমার নির্ব্বিশেষ জ্ঞানের অংশই সবিশেষ জ্ঞান; অর্থাৎ সকল জ্ঞানই সবিশেষ-বিষয়ক।

যদি বল, যাহা যাহার উপর স্ফূর্ত্তি পায়, যাহা যাহার অংশ বা অঙ্গবিশেষ, তাহা তাহার আধার বা অংশী ও অঙ্গীর সহিত অভিন্ন হইতে পারে না, তাহা হইলে বলিব যে, উহা হইতে ভিন্নও থাকিতে পারে না। কৈ, কে কোথায় কোন্ জিনিষের রূপ বা আকৃতিকে তাহা হইতে অন্যত্র দেখিয়াছে—বলুক দেখি? যেহেতু তাহা কেহ কখন দেখে নাই, সেই হেতু বস্তু ও তাহার রূপ এবং আকৃতি প্রভৃতি সেই বস্তু হইতে ভিন্ন এবং অভিন্ন উভয়ই; অথবা অন্য কথায়, তাহা বিশেষণ-বিশিষ্ট বা সবিশেষ-বিষয়ক।

যদি বল, পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্তে হঠাৎ অতিশীঘ্র পুষ্পটী যখন চক্ষুর সম্মুখ দিয়া চলিয়া যায়, তখনও পুষ্পটীর রূপ ও আকৃতি কেহ দেখে না, তখন ত উহা একটা কিছু বলিয়াই প্রত্যক্ষ হয়, এবং তৎপরে যদি তখন তখনই দ্বিতীয়বার ঐরূপ করা হয়, তাহা হইলে তখন তাহার রূপ বা আকৃতি সম্বন্ধে একটা জ্ঞান জন্মে, ঐরূপ এই ব্যাপার যতবার করা যাইবে, ততবারই উহার রূপ বা আকৃতিজ্ঞান স্পষ্ট হইতে থাকিবে; সুতরাং "একটা কিছু" জ্ঞানের পর যে রূপ ও আকৃতির জ্ঞান হয়, অর্থাৎ "একটা কিছু" জ্ঞান হইতে রূপ ও আকৃতি-জ্ঞান পৃথক্ থাকিতে পারে, ইহা ত প্রত্যক্ষসিদ্ধ বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে—তাহা হইলে বলিব যে, আমরা অনুমান দ্বারা উক্ত জ্ঞানদ্বয়কে একসঙ্গে হয় বলিয়া প্রমাণিত করিব; যথা, যেহেতু একই বস্তুতে "রূপ ও আকৃতিজ্ঞান" এবং "একটা কিছু জ্ঞান" ইত্যাদি দুইটী জ্ঞান হয়, সেই হেতু "একটা কিছু জ্ঞান" সকল অবস্থাতেই রূপ ও আকৃতিবিশিষ্ট জ্ঞান ইত্যাদি।

যদি বল, প্রত্যক্ষ প্রমাণ, অনুমান-প্রমাণ অপেক্ষা বলবান্, তাহা হইলে আমরা বলিব যে, এই অনুমান উক্ত প্রত্যক্ষের বিরোধী নহে বলিয়া এই প্রত্যক্ষ এ স্থলের অনুমান অপেক্ষা বলবান্ হইতে পারে না। যে স্থলে কোন একটা কিছু প্রত্যক্ষ-প্রমাণানুসারে একরূপ হইতেছে, কিন্তু অনুমান-প্রমাণানুসারে যে সিদ্ধান্ত হয় তাহা তাহার বিরুদ্ধে যাইতেছে, সেস্থলে প্রত্যক্ষ-প্রমাণ, অনুমান-প্রমাণ অপেক্ষা বলবান্ হইতে পারে। আর যদি তুমি এইস্থলেই উক্ত প্রত্যক্ষ ও অনুমানকে পরস্পর-বিরোধী বলিতে চাহ, তাহা হইলে তোমাকেই দেখাইতে হইবে যে, দ্রব্যের গুণ দ্রব্য ছাড়া অন্যত্রও থাকে,—কিন্তু তাহা তুমি পারিবে না। কারণ, কেহ কখন এরূপ দেখে নাই। অথচ আমি দেখাইব যে, ঐ পুষ্পটী দেখিয়া যখন আমার "একটা কিছু" জ্ঞান হইযাছিল, তখন উহা যে ক্ষুদ্রাকার এবং পর্ব্বতাকার নহে, তাহাও আমার জ্ঞান হইয়াছিল। কারণ, ঐভাবে পুষ্পটী সহসা আমার চক্ষুর সম্মুখে দিয়া অতিবেগে লইযা যাইবার পর যদি একটী উহার সহস্রগুণ বৃহত্তর বস্তু ঐভাবে লইযা যাওযা হয, তাহা হইলে উক্ত দুইটী বস্তুর আকৃতি ও রূপ প্রভৃতি স্পষ্ট না বোধ হইলেও ক্ষুদ্র ও বৃহদাকার সম্বন্ধে আমার জ্ঞান নিশ্চযই হইবে। মোট কথা এই যে, যাহা নির্ব্বিশেষ জ্ঞানের বিষয, তাহাই যদি পরে সবিশেষ জ্ঞানের বিষয হয়, তাহা হইলে তাহাতে যদি কোনরূপ "বিশেষ" আদতেই না থাকিত, তাহা হইলে উহা যে নির্ব্বিশেষ জ্ঞানের বিষয় হইযাও পরে সবিশেষ জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে, একথাই বলা চলে না। যাহা যাহাতে নাই, তাহা তাহাতে প্রকাশিত হইতে পারে না। সুতরাং বল, সকল জ্ঞানই সকল অবস্থাতেই সবিশেষ-বিষয়ক বা ভেদবিশিষ্ট।

এখন যদি বল, সকল প্রকার জ্ঞানের বিষয গুণ ও আকৃতি প্রভৃতি জাতিবিশিষ্টরূপে প্রতীযমান হয বলিয়াই সকল জ্ঞানে যে ভেদ বর্ত্তমান থাকে,তাহার প্রমাণ কি ? তাহা হইলে শুন ;—একথা সকলেই স্বীকার করেন যে, যাহা যদ্বিশিষ্ট হয, তাহা তদ্ভিন্ন হইতে বাধ্য। যেমন জলের শীতল গুণ ও তরল আকার প্রভৃতি এবং জল,স্বয়ং কখন এক বা অভেদ পদার্থ হইতে পারে না, তদ্রূপ গুণ ও আকৃতি বিশিষ্ট জ্ঞানের যে "বিষয়," তাহা তাহার গুণ ও আকৃতির সহিত অভিন্ন বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। আর যেহেতু এই গুণ ও গুণী এক নহে, সেই হেতু সকল জ্ঞানের বিষয়েই ভেদ থাকিতে বাধ্য।

এস্থলে যদি বল, সকল জ্ঞান ভেদবিশিষ্ট বলিলে ঘট, পট প্রভৃতি বহু স্বতন্ত্র বিষয় স্বীকার করিতে হয়,সুতরাং যখন তোমার ব্রহ্মতত্ত্বের জ্ঞান হইবে, তখন উক্ত নিয়মানুসারে সেই তত্ত্বে ভেদ থাকিবে বলিয়া ব্রহ্মাতিরিক্ত বস্তু তোমায় স্বীকার করিতে হইবে, এবং তাহা স্বীকার করিলে তোমার বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদ থাকে কোথায় ? অর্থাৎ দ্বৈতবাদ আসিয়া পড়িবে। কারণ দেখ,ভেদ কথাটা আমরা কখন ব্যবহার করি ? আমরা যখন বলি "ঘট—পট—নহে," "ঘট—পট হইতে ভিন্ন," "ঘটে, ও পটে ভেদ আছে" ইত্যাদি, তখনই আমরা ভেদ শব্দটা কোন না-কোন রকমে ব্যবহার করিয়া থাকি। সুতরাং দেখ দেখি, কোন একটা কিছুকে ভেদবিশিষ্ট বলিতে গেলেই তদ্ভিন্ন একটা-না-একটা কিছুর আবশ্যক হয় কি না ? আর যেটা আবশ্যক হয় সেইটাতেই পূর্ব্বোক্ত পদার্থের ভেদ থাকে কি না ? যেমন "ঘট—পট হইতে ভিন্ন"বলিলে ঘটের যে ভেদ তাহা পটে থাকে, এবং পট—ঘট হইতে ভিন্ন বলিতে গেলে পটের যে ভেদ তাহা ঘটে থাকে; সুতরাং ঘটে অবস্থিত যে পটভেদ, তাহা পটের বিরোধী বা প্রতিযোগী এবং ঘটের অনুকূল বা অনুযোগী, ঐরূপ পটে অবস্থিত যে ঘটভেদ তাহা পটের অনুযোগী বা অনুকূল এবং ঘটের বিরোধী বা প্রতিযোগী। অগত্যা তোমায় স্বীকার করিতে হইবে যে, যখনই কোন কিছুকে ভেদ বিশিষ্ট বলা হইবে তখনই সেই ভেদের জন্য সেই ভেদের বিরোধী বা প্রতিযোগী একটা কিছু স্বীকার করা আবশ্যক হইবে; উহা স্বীকার না করিলে আদতেই ভেদ স্বীকার করা সম্ভব হইতে পারিবে না। এক কথায় বলিতে গেলে এই বলিতে হইবে যে, যদি ঘটকে ভেদ-বিশিষ্ট বলিতে ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে উক্ত ভেদের প্রতিযোগী ঘট ভিন্ন আর একটী বস্তু স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং দেখ, সকল জ্ঞানকে ভেদবিশিষ্ট বলিলে স্বতন্ত্র বহু বস্তুর স্বীকার করিতে বাধ্য হইতে হয় এবং তজ্জন্য বিশিষ্টা দ্বৈতবাদের পরিবর্ত্তে দ্বৈতবাদই আসিয়া দাঁড়ায়।

তাহার পর দেখ, তোমার মতে শুধু কি এই দোষ ? না, তাহা নহে, আরও আছে। দেখ, এই ভেদ যদি তুমি স্বীকার কর, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি, এই ভেদ তোমার থাকে কোথায় ? আচ্ছা বল দেখি, ভেদবিশিষ্ট ঘটে, ভেদটী কি ঘটের স্বরূপ অথবা ঘট হইতে ভিন্ন ? যদি বল উহা ঘটের একটা স্বরূপ, অর্থাৎ ঘটজ্ঞান হইলে উহার জ্ঞান হইয়া যায়, তাহা হইলে বল দেখি ঘটজ্ঞান হইলে কি তোমার যাবতীয় পদার্থের জ্ঞান হয় ? কারণ ঘটে যে ভেদ থাকে তাহাত ঘটভিন্ন সমুদয় পদার্থের বিরোধী বা প্রতিযোগী। কিন্তু যেহেতু তাহা হয় না, অর্থাৎ উক্ত ঘটে অবস্থিত ভেদের কোন নির্দ্দিষ্ট প্রতিযোগীর (যেমন পটবস্তুর) জ্ঞান যেহেতু ঘট-ভেদ-জ্ঞানকালে হয় না,সেই হেতু,ভেদটীকে ঘটের একটা স্বরূপ বলিতে পার না। আর ভেদকে বস্তুর স্বরূপ বলিলে প্রতিযোগীর অপেক্ষাই থাকিল না। কিন্তু পূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি, ভেদ বলিতে গেলেই প্রতিযোগীর অপেক্ষা থাকে। তাহার পর এখন যদি "ভেদকে," ঘট হইতে ভিন্ন বলিতে চাহ, তাহাও বলিতে পার না, কারণ

"ভেদ" যদি ঘট হইতে ভিন্ন হয়, তাহা হইলে তোমাকে উক্ত ঘটবস্তুর প্রতিযোগীভেদে অবস্থিত আর একটি ভেদ স্বীকার করিতে হইল, এবং উক্ত দ্বিতীয় ভেদে প্রথম ভেদের প্রতিযোগী আর একটী তৃতীয় ভেদ স্বীকার করিতে হইল, এইরূপে ইহার অন্ত পাওয়া দুর্ঘট হইবে, ন্যায়ের ভাষায় ইহা অনবস্থা দোষে দুষ্ট হইয়া পড়িবে। সুতরাং ভেদকে ঘট হইতে ভিন্ন স্বীকার করিয়া ভেদের নির্ণয় করা অসম্ভব। আর যদি বল বস্তুর জ্ঞান হইতে গেলে যেমন উহাতে জাতি প্রভৃতির জ্ঞান হয়, তদ্রূপ তদ্দ্বারা ভেদেরও জ্ঞান হয়, তাহা হইলেও দোষ; কারণ, তাহা হইলে জাতিজ্ঞানে ভেদের জ্ঞান এবং সর্ব্বত্র ভেদের জ্ঞানে জাতির জ্ঞান হয় বলিয়া উহাতে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ ঘটিবে। আর যদি এরূপ না হয়, তাহা হইলে "এটা পট নহে বলিয়া ইহা যে ঘটজাতীয়" এরূপ কোন জ্ঞানেই উপনীত হওয়া যায় না। সুতরাং দেখ, ভেদকে বস্তুর স্বরূপ বলিলে নিস্তার নাই! যদি তুমি সকল জ্ঞানই সবিশেষ বিষয়ক বলিয়া তাহাদিগকে ভেদবিশিষ্ট বল, তাহা হইলে তোমার কথায় নানা দোষ প্রবেশ করিবে।

এই সকল নৈয়ায়িকের কথা শুনিয়া এক জন রামানুজী যাহা বলেন তাহা এই।—রামানুজী বলেন—যে, নৈয়ায়িকের অভিমত উক্ত ভেদ আমাদের অভিমত ভেদ নহে। আমরা ভেদ বলিতে "ঘট—পটনহে," "ঘট—পট হইতে ভিন্ন" এরূপ কোন কথা ব্যবহার করি না। আমরা ভেদ বলিতে "জাতি" বুঝিয়া থাকি, আর এই "জাতি" এস্থলে গুণ ও আকৃতিকে বুঝায়। ভেদের এইরূপ অর্থ করিলে প্রতিযোগীর অপেক্ষা থাকে না এবং প্রতিযোগীর অপেক্ষা না থাকিলে তোমার উক্ত অনবস্থা বা অন্যোন্যাশ্রয় নামক কোন প্রকার দোষই ঘটিতে পারে না।

যাহা হউক এতক্ষণ নৈয়ায়িক গণের আপত্তি খণ্ডন করিয়া এই পর্য্যন্ত সিদ্ধ হইল যে, সকল জ্ঞানই প্রথমাবধি সবিশেষ বিষয়ক। নৈয়ায়িকগণ যে সকল জ্ঞানের প্রথমাবস্থায় নির্ব্বিকল্প বা নির্ব্বিশেষ জ্ঞান স্বীকার করিয়া থাকেন, তাহা রামানুজ-মতে ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত হইল, সুতরাং নৈয়ায়িককে অবলম্বন করিয়া যদি কেহ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান স্বীকারের প্রয়াসী হন, এই প্রসঙ্গে তাঁহার সে প্রয়াস ব্যর্থ করা হইল। পরন্তু এতদ্দ্বারাই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞানবাদীর সকল কথা খণ্ডন করা হইল না, কারণ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান বাদী মায়াবাদীর মত অবলম্বন করিয়া নিজমত স্থাপন করিতে পারেন। মায়াবাদীরা বলেন যে, নির্ব্বিশেষ জ্ঞান, নৈয়ায়িকের মতানুযায়ী সকল জ্ঞানের প্রথমে হয়, একথা আমরাও বলি না; আমরা বলি, নির্ব্বিশেষ জ্ঞান সকল জ্ঞানের শেষে হইতে পারে বলিয়া উহা অসম্ভব নহে। এজন্য এক্ষণে এ অংশে মায়াবাদীর মতটী খণ্ডন করা আবশ্যক।

মায়াবাদী বা অদ্বৈতবাদী বলেন, লৌকিক প্রয়োগে "তুমিই সেই দশম পুরুষ", এই দৃষ্টান্তে এবং বৈদিক প্রয়োগে "তত্ত্বমসি অর্থাৎ "তুমিই সেই ব্রহ্ম" এই শব্দ জ্ঞান হইতে নির্ব্বিশেষ প্রত্যক্ষ জ্ঞান হওয়া সম্ভব ও তাহা

সত্য। ইহাদের এই দুইটি দৃষ্টান্তে দুইটী গল্প আছে। এই গল্প দুইটী এস্থলে না বলিলে ইহার মর্ম্ম বুঝা যাইবে না।

প্রথম গল্পটী এই,—একদিন পরস্পরের অপরিচিত দশজন অশিক্ষিত পথিক একত্রে সন্তরণ করিয়া একটী নদী পার হয়। নদী পার হইয়া একজনের মনে হইল "আমরা দশ জনেই ত এ পারে আসিয়াছি—কেহ জলে ডুবিয়া যায় নাই ত?" এই বলিয়া সে ব্যক্তি সাধারণতঃ লোকে প্রথমেই যেরূপ করে, সেইরূপে আপনাকে বাদদিয়া গুণিয়া দেখে যে, নয়জন মাত্র রহিয়াছে। তখন তাহার দেখাদেখি অপর সকলেও নিজেকে বাদ দিয়া গুণিয়া দেখিল। সকলেই দেখিল, সত্যই নয়জন রহিয়াছে; সুতরাং একজন নিশ্চয়ই জলে ডুবিয়া মরিয়াছে। ইহার পর তাহারা সকলেই যার পর নাই দুঃখিত হইয়া নদীতীরে বসিয়া শোক প্রকাশ করিতে লাগিল। এমন সময় অন্য একজন ব্যক্তি হঠাৎ সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়, এবং উক্ত দশজন ব্যক্তিকে একত্রে বসিয়া শোক প্রকাশ করিতে দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করে। কারণ শুনিয়া নবাগত ব্যক্তিটী গুণিয়া দেখে যে, তাহারা দশজনই রহিয়াছে; এবং তখন সে তাহাদিগকে বলিল, "না তোমরাত দশ-জনই রহিয়াছ, তবে কেন শোক করিতেছ।" ইহাতে পথিকগণের মধ্যে একজন পূর্ব্ববৎ নিজেকে বাদ দিয়া গুণিয়া দেখাইল এবং বলিল, "এই দেখ, দশজন নাই; নয়জনই রহিয়াছে।" এই দেখিয়া নবাগত ব্যক্তিটী একে একে বাকি নয়জনকে গুণিয়া তাহাকে বলিল "তুমিই সেই দশম পুরুষ।" ইত্যাদি।

দ্বিতীয় গল্পটী ছান্দোগ্য উপনিষদের শ্বেতকেতুর গল্প। ইহাতে পিতা আরুণি শ্বেতকেতুকে ব্রহ্ম কি নানা প্রকারে বুঝাইয়া শেষে বলেন, "বৎস শ্বেতকেতু, তুমিই সেই (ব্রহ্ম)" ইত্যাদি।

এই গল্প দুইটী হইতে দেখা যায় যে, "তুমিই সেই দশম পুরুষ" বা "তুমিই সেই (ব্রহ্ম" এই প্রকার বাক্যজন্য যে জ্ঞান হয়, তাহাতে অদ্বৈতবাদীর মতে কোন বিশেষের প্রত্যক্ষ হয় না, অর্থাৎ উহা নির্ব্বিশেষ প্রত্যক্ষ নামে অভিহিত হয়। কারণ, "আমি" বলিতে লোকে "আমি" এই প্রকার জ্ঞান মাত্রকেই বুঝে; এই জ্ঞানের সঙ্গে কোন আকৃতি বা কোন গুণ প্রভৃতি যে বুঝিতেই হইবে, এমন কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই; 'আমি' জ্ঞানে আমি ভিন্ন কোন কিছুর জ্ঞানই প্রয়োজন হয় না। আমি ভিন্ন অপর সবজ্ঞানই আমি-জ্ঞান সাপেক্ষ। অগ্রে আমি-জ্ঞান, তাহার পর আমি-ভিন্নের জ্ঞান হয়। আর এই যে 'দশম পুরুষ জ্ঞান" ইহাতেও কেবল সেই দশম ব্যক্তি মাত্রেরই জ্ঞান হয়, ইহাতে তাহার কোন গুণ বা আকৃতির উপর লক্ষ্যের আবশ্যকতা নাই। দৃষ্টান্তমধ্যেও সকলে সকলের অপরিচিত ছিল, পরিচয়ের মধ্যে কেবল তাহারা দশজন এইমাত্র তাহারা জানিত; এমন কি দশজনের কোন্ ব্যক্তিটী জলে ডুবিয়াছে, তাহাও তাহাদের মধ্যে কাহারও জ্ঞান নাই, সুতরাং দৃষ্টান্ত হইতে দশম পুরুষের কোন গুণ বা আকৃতির কথাই উঠিতে পারে না। ঐরূপ "তুমি সেই

(ব্রহ্ম)” এই বৈদিক প্রয়োগে কেবল “সেই” পদবাচ্য একটী সত্তা মাত্রেরই জ্ঞান হইবার কথা; কারণ উক্ত গল্পমধ্যে এক অদ্বিতীয় সর্ব্বকারণ ব্রহ্মের কথাই বলা হইয়াছে, যাহা এক অথচ সর্ব্বকারণ তাহাতে কোন কিছু স্বীকার করিলেই একত্বের বা অদ্বিতীয়ত্বের হানি হইতে বাধ্য। অগত্যা ইহাতেও কোন বিশেষের জ্ঞানের আবশ্যকতা নাই। আর যদি কেহ এই বৈদিক প্রয়োগের অন্য প্রকার অর্থ করিয়া দ্বৈত বা বিশিষ্টাদ্বৈত বাদ স্বীকার করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করে এবং লৌকিক ব্যবহারে নির্ব্বিশেষ জ্ঞানের দৃষ্টান্ত নাই বলিবার জন্য প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে অদ্বৈতবাদী তখন উক্ত “দশম পুরুষ জ্ঞান”কে লৌকিক ব্যবহারে নির্ব্বিশেষ জ্ঞানের দৃষ্টান্তস্বরূপ গ্রহণ করেন।

মায়াবাদীর এই প্রকার কথায় একজন রামানুজী বলিবেন,—“তত্ত্বমসি” বা “তুমি সেই দশম পুরুষ” এই বাক্য হইতে যে জ্ঞান হয়, তাহাকে নির্ব্বিশেষ জ্ঞান বলা যাইতে পারে না—এস্থলে “আমি দশমত্ব বিশিষ্ট” বা “আমি ব্রহ্ম ধর্ম্মাক্রান্ত”—এইরূপে প্রতিভাত হয়। কারণ “আমি দশম পুরুষ” বলিয়া অথবা “আমি ব্রহ্ম” বলিয়া যদি আমাকে বুঝিতে হয়, তাহা হইলে দশমত্ব ও ব্রহ্মত্ব আমার ধর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইতেছে। যেহেতু আমি-জ্ঞানে দশমত্ব ও ব্রহ্মত্ব জ্ঞান আশ্রয় লইয়া থাকে। অবশ্য যদি “আমি জ্ঞান ও “দশমত্ব জ্ঞান” বা “ব্রহ্মত্ব জ্ঞান” অপর কিছুকে এক সঙ্গে আসিয়া আশ্রয় করিত, তাহা হইলে একদিন তোমার কথা মানিয়া দুইটীর অভেদ সম্বন্ধ স্বীকার করিতে পারিতাম। তাহার পর আবার দেখ, বর্ত্তমান কালের আমি জ্ঞানের সহিত পূর্ব্বদৃষ্ট দশম পুরুষের অভিন্ন ভাব বুঝাইতেছে বলিলেও উক্ত দশম পুরুষ জ্ঞানে পূর্ব্বদৃষ্ট কালের সম্বন্ধ থাকিয়া যায়, এবং “আমি জ্ঞানে” বর্ত্তমান কালের সম্বন্ধ অনিবার্য্য হয়। এজন্য এই প্রকার অভেদ জ্ঞান কখনই নির্ব্বিশেষ জ্ঞান হইতে পারে না। আর যদি “তুমি দশম পুরুষ” বলিলে লোকের দশম পুরুষের জ্ঞানটী প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়, তাহা হইলে “তুমি ধার্ম্মিক” বলিলে ধর্ম্মপদার্থটীও তোমার প্রত্যক্ষ হউক, কিন্তু তোমার মতেই ধর্ম্মপদার্থটী প্রত্যক্ষযোগ্য পদার্থই নহে। ধর্ম্মের অস্তিত্ব সকলকেই অনুমান দ্বারা বুঝিতে হয়। সুতরাং ধর্ম্মও যেমন প্রত্যক্ষ হয় না তদ্রূপ এস্থলে দশম পুরুষত্ব প্রত্যক্ষ হয় না।

যদি বল, ধর্ম্ম প্রত্যক্ষ যোগ্য পদার্থ নহে বটে, কিন্তু দশম পুরুষত্বটী প্রত্যক্ষযোগ্য পদার্থ, সুতরাং দশমপুরুষত্ব প্রত্যক্ষ হইবে কিন্তু ধর্ম্ম প্রত্যক্ষ হইবে না, তাহা হইলে বলিব সে সময়ের দশম পুরুষ এখন ত আর নাই, কালবশে উহারও পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে, সুতরাং তাহা আর কি করিয়া প্রত্যক্ষ হইতে পারে?

যদি বল, আমার আমিও ত সেই সঙ্গে সঙ্গে সমান পরিবর্ত্তন হইয়াছে, সুতরাং কালের উভয়সাধারণ অংশটুকু লইয়া সবিশেষত্ব স্বীকার করিয়া লাভ কি? আর আমিত্ব বা কেবল মাত্র দশমপুরুষত্ব অনুভবে কালেরই

বা আবশ্যকতা কোথায়? তাহা হইলে বলিব যে, যখন বর্ত্তমান কালের আমিকে সেই দশম পুরুষ বলিয়া বুঝিতে বলা হইতেছে তখন আমিতে বর্ত্তমান কালের বিশেষত্ব এবং উক্ত দশম পুরুষে অতীত কালের বিশেষত্ব থাকিতে বাধ্য। সুতরাং উভয়ই সবিশেষ হইল এবং ইহাদের জ্ঞানও সবিশেষ জ্ঞান হইল।

তাহার পর আর এক কথা;—ধর্ম্ম যদি প্রত্যক্ষযোগ্য নহে বলিয়া উহার প্রত্যক্ষত্ব অস্বীকার কর, তাহা হইলে "ঐ পর্ব্বতের ওপারে অগ্নি আছে" এই কথা শুনিয়া লোকের অগ্নি প্রত্যক্ষ হউক। এস্থলে অগ্নি ত প্রত্যক্ষ যোগ্য পদার্থ, ধর্ম্মের মত প্রত্যক্ষের অযোগ্য পদার্থ নহে। এখানে অগ্নি যেমন চক্ষুর অন্তরালে রহিয়াছে উক্ত দশম পুরুষত্বও তদ্রূপ তোমার মনশ্চক্ষের সম্মুখে ভাসিতেছে না। যে একজন দশম ব্যক্তি মরিয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে, তাহার দশমত্ব তখন তোমার মনশ্চক্ষের সম্মুখে ভাসমান হওয়া কি এক প্রকার অসম্ভব ব্যাপার নহে? আর বৈদিক প্রযোগে "তত্ত্বমসির" ব্যাখ্যার জন্য যদি তুমি এই দশম পুরুষের ঘটনাটীকে দৃষ্টান্ত স্বরূপে গ্রহণ কর, তাহা হইলে যেহেতু উহাতে উক্ত অসঙ্গতিদোষ রহিয়াছে সেইহেতু ইহার সাহায্যে তুমি উক্ত বৈদিক তত্ত্বমসি বাক্যেরও নির্ব্বিশেষ প্রত্যক্ষত্ব স্বীকার করিতে পার না।

আমাদের মতে "তুমি সেই (ব্রহ্ম)" মানে তুমি ও ব্রহ্ম এক অভিন্ন বস্তু নহে, পরন্তু তুমি ব্রহ্মের অংশ ও ব্রহ্মজাতীয় বস্তু। যেমন অগ্নি ও অগ্নিকণা। সুতরাং দেখা গেল পূর্ব্বে যেমন নৈয়ায়িকের অভিমত নির্ব্বিশেষ জ্ঞান অসিদ্ধ, তদ্রূপ অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিকেরও অভিমত নির্ব্বিশেষ জ্ঞান অসিদ্ধ।

এইরূপে গ্রন্থকার এতদূরে প্রত্যক্ষ প্রমাণ সম্বন্ধে যাহা বক্তব্য তাহা যে বিশেষ দক্ষতার সহিত বর্ণনা করিলেন তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। ইহার পর তিনি বিপক্ষ দ্বৈতবাদী এবং অদ্বৈতবাদীদিগের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, এবং এই মন্তব্যটী দেখিলে বোধ হয় যে তাঁহারা দ্বৈতবাদী নৈয়ায়িক অপেক্ষা অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিকের মত নিরাকরণে বিশেষ যত্নবান্। ইনি এস্থলে অদ্বৈত মতের বিখ্যাত গ্রন্থকার বেদান্তপরিভাষাকারের এতৎসংক্রান্ত কতিপয় কথা উত্থাপন করিয়া তাহার নিরাসসংবাদ মাত্র ঘোষণা করিয়াছেন, কিন্তু যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহার খণ্ডন করেন নাই। এই প্রবন্ধের শেষে গ্রন্থকারের কথার অনুবাদমধ্যে পাঠক বর্গ তাহা লক্ষ্য করিতে পারিবেন। পরন্তু নৈয়ায়িক সম্বন্ধে বলিতে বলিতে তাহার সকল অংশই যে পরিত্যাজ্য নহে তাহা বলিয়া, তাহাদের উপর কিঞ্চিৎ শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতেই গ্রন্থকারের গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদটী শেষ হইয়াছে।

এক্ষণে পাঠক বর্গের সুবিধার জন্য গ্রন্থকারের গ্রন্থের যে অংশ অবলম্বন করিয়া এত কথা বলিলাম তাহার যথাযথ অনুবাদ দিবার চেষ্টা করিলাম।

"এই হেতু সকল জ্ঞানই সত্য এবং সবিশেষবিষয়ক। নির্ব্বিশেষ বস্তুর গ্রহণই হয় না। এবম্ভূত প্রত্যক্ষ ভেদবিশিষ্টকেই প্রথম হইতে গ্রহণ করে। ভেদ জিনিষটা ব্যবহার কালেই প্রতিযোগীর অপেক্ষা রাখে, স্বরূপে নহে। এজন্য অনবস্থা ও অন্যোন্যাশ্রয় দোষ ও হয় না। উপর্য্যুপরি অপেক্ষার নাম অনবস্থা। পরস্পর অপেক্ষার নাম অন্যোন্যাশ্রয়।"

আচ্ছা 'তুমিই দশম' এটাও কেন প্রত্যক্ষ নহে—এরূপ যদি বল তাহা হইলে বলি, না তাহা নহে। 'তুমি' এই পদের প্রত্যক্ষত্ব সত্ত্বেও, "আমি দশম" ইহাতে বাক্যজন্যতা থাকে। যদি "আমি দশম" এই বাক্যের প্রত্যক্ষবিষয়ত্ব বল, তাহা হইলে 'তুমি ধার্ম্মিক" এই বাক্য জন্যও প্রত্যক্ষত্ব হউক। আর যদি ইহা হয় বল, তাহা হইলে অতিপ্রসঙ্গদোষ হইবে। অতএব "তত্ত্বমসি" এই বাক্যের অপরোক্ষজ্ঞানকত্ব সিদ্ধ হয় না।

"এতদূরে সিদ্ধ হইল, প্রত্যক্ষ প্রমা করণই প্রত্যক্ষ প্রমাণ। 'আর প্রমা ও আত্মচৈতন্য এক ; চৈতন্য ত্রিবিধ যথা, অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন চৈতন্য, অন্তঃকরণবৃত্তি কর্ত্তৃক অবচ্ছিন্ন চৈতন্য, এবং বিষয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্য ; যখন এই তিনটীর একতা ঘটে—তখন সাক্ষাৎকার হয় ; ঐ সাক্ষাৎকার নির্ব্বিশেষ-বিষয় হইয়া অভেদকেই গ্রহণকরে' —এই প্রকার কুদৃষ্টিকল্পনা নিরস্ত হইল। আর নির্ব্বিকল্পক মানে নাম জাতি-আদি-যোজনাহীন, "এটা কিছু" এই প্রকার বস্তুমাত্র অবগাহি জ্ঞান—ইত্যাকার যে নৈয়ায়িক মত, তাহাও নিরস্ত হইল।

'যদি বল, কাণাদ ও পাণিণীয় সকল শাস্ত্রের উপকারক,' এইরূপ যে একটা কথা আছে, তাহা সত্বেও গৌতম মত নিরাস করা হইল—একথা বলা কি সঙ্গত ? তাহা হইলে বলি, শুন—আমরা সর্ব্বাংশে তাঁহাদের মত নিরাস করি নাই। তাঁহাদের মতে যাহা যুক্তিযুক্ত, তাহা আমরা স্বীকার করি। পরনির্ম্মিত তড়াগে যেমন লোকে নিজ নিজ প্রয়োজন সিদ্ধ করে, আমরাও তদ্রূপ করি। আর অপরে যেমন উক্ত তড়াগের পঙ্ক গ্রহণ করে না, আমরাও তদ্রূপ করি না। এই জন্য আমরা ন্যায়-বৈশেষিকের পরমাণুর কারণতা, বেদের পৌরুষেয়তা ঈশ্বরের আনুমানিকত্ব, জীবের বিভুত্ব, এবং সামান্য, সমবায় ও বিশেষ প্রভৃতির পদার্থত্ব স্বীকার করিয়া থাকি ; আর উপমানাদির পৃথক্ প্রামাণ্য কল্পনা, সংখ্যা-পরিমাণ-পৃথকত্ব-পরত্ব-অপরত্ব—গুরুত্ব দ্রব্যত্বাদির পৃথক্‌গুণত্ব কল্পনা, দিকের দ্রব্যত্ব কল্পনা, ইত্যাদ সূত্রকারদিগের বিরুদ্ধ প্রক্রিয়া আমরা স্বীকার করি না। এজন্য আমাদের মতে কোন বিরোধ নাই।" ইতি শ্রীমন্মহাচার্য্যের প্রথম দাস শ্রীনিবাস দাস বিরচিত যতীন্দ্র মত দীপিকার প্রথম অবতার সমাপ্ত।

আগামী বারে অনুমান প্রমাণ সম্বন্ধে আচার্য্য রামানুজ স্বামী যাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহাই কথিত হইবে।

ক্রমশঃ।

স্বামি-শিষ্য-সংবাদ।

[শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এ।]

(গঙ্গাবক্ষে।)

শিষ্য আজ বৈকালে কলিকাতার গঙ্গাতীরে বেড়াইতে বেড়াইতে দেখিতে পাইল, কিছুদূরে একজন সন্ন্যাসী আহীরিটোলার ঘাটের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। তিনি নিকটস্থ হইলে, শিষ্য দেখিল সাধু আর কেহ নয়—তাহারই গুরু স্বামী শ্রীবিবেকানন্দ!—স্বামীজির বামহস্তে শালপাতার ঠোঙ্গায় চানাচুর ভাজা; বালকের মত উহা খাইতে খাইতে স্বামীজি আনন্দে পথে অগ্রসর হইতেছেন! ভুবনবিখ্যাত স্বামীজিকে ঐরূপে পথে পথে চানাচুর ভাজা খাইতে দেখিয়া শিষ্য অবাক্ হইয়া তাঁহার নিরভিমানিতার কথাই ভাবিতে লাগিল! পরে তিনি সম্মুখস্থ হইলে শিষ্য তাঁহার চরণে প্রণত হইয়া তাঁহার হঠাৎ কলিকাতা আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল।

স্বামীজি:—একটা দরকারে এসেছিলুম্। চ' তুই মঠে যাবি? চারটী চানাচুর ভাজা খা না? বেশ নুন ঝাল আছে।

শিষ্য হাসিতে হাসিতে প্রসাদ গ্রহণ করিল ও মঠে যাইতে স্বীকৃত হইল।

স্বামীজি:—তবে একখানা নৌকা ছাখ্।

শিষ্য দৌড়িয়া নৌকা ভাড়া করিতে ছুটিল। ভাড়া লইয়া মাঝিদের সহিত দর দস্তুর চলিতেছে এমন সময় স্বামীজিও তথায় আসিয়া পড়িলেন। মাঝি মঠে পৌঁছাইয়া দিতে আট আনা চাহিল। শিষ্য দুই আনা বলিল। "ওদের সঙ্গে আবার কি দর দস্তুর কচ্ছিস্" বলিয়া স্বামীজি শিষ্যকে নিরস্ত করিলেন এবং মাঝিকে "যাঃ, আট আনাই দিব" বলিয়া নৌকায় উঠিলেন। ভাটার প্রবল টানে নৌকা অতিধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল এবং মঠে পঁহুছিতে প্রায় দেড় ঘণ্টা লাগিল। নৌকামধ্যে স্বামীজিকে একাকী পাইয়া শিষ্য তাঁহাকে নিঃসঙ্কোচে সকল বিষয় জিজ্ঞাসা করিবার বেশ সুযোগ লাভ করিল। এই বৎসরের ২০ শে আষাঢ়েই স্বামীজি স্বরূপ সম্বরণ করেন। ঐ দিনে গঙ্গাবক্ষে স্বামীজির সহিত শিষ্যের যে কথোপকথন হইয়াছিল তাহাই অদ্য পাঠকগণকে উপহার দেওয়া যাইতেছে।

ঠাকুরের বিগত জন্মোৎসবে শিষ্য তাঁহার ভক্তদিগের মহিমা কীর্ত্তন

করিয়া যে স্তব ছাপাইয়া ছিল, তৎসম্বন্ধে প্রসঙ্গ উঠাইয়া স্বামীজি শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

স্বামীজিঃ—তুই তোর রচিত স্তবে যাদের যাদের নাম করেছিস কি ক'রে জান্‌লি তাঁরা সকলেই ঠাকুরের সাঙ্গোপাঙ্গ?

শিষ্যঃ—মহাশয়, ঠাকুরের সন্ন্যাসী ও গৃহী ভক্তদিগের নিকট এতদিন যাতায়াত করিতেছি; তাঁহাদেরই মুখে শুনিয়াছি ইঁহারা সকলেই ঠাকুরের ভক্ত।

স্বামীজিঃ—ঠাকুরের ভক্ত হতে পারে। কিন্তু সকল ভক্তেরা তো তাঁর (ঠাকুরের) সাঙ্গোপাঙ্গের ভিতর নয়। ঠাকুর কাশীপুরের বাগানে আমাদের ব'লেছিলেন "মা দেখাইয়া দিলেন এরা সকলেই এখানকার লোক নয়।" স্ত্রী ও পুরুষ উভয় ভক্তদের সম্বন্ধেই ঠাকুর সে দিন ঐরূপ বলেছিলেন।

অনন্তর ঠাকুর নিজ ভক্তদিগের মধ্যে যে ভাবে উচ্চাবচ শ্রেণী নির্দ্দেশ করিতেন সেই কথা বলিতে বলিতে স্বামীজি ক্রমে গৃহস্থ ও সন্ন্যাস জীবনের মধ্যে যে কতদূর প্রভেদ বর্ত্তমান, তাহাই শিষ্যকে বিশদরূপে বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন।

স্বামীজিঃ—কামিনী-কাঞ্চনের সেবাও করচে—আর ঠাকুরকেও বুঝচে!!! একি কখনো হয়েছে? না হতে পারে? ও কথা কখনো বিশ্বাস করবিনি। ঠাকুরের ভক্তদের ভিতর অনেকে এখন "ঈশ্বর কোটি" "অন্তরঙ্গ" ইত্যাদি বলে আপনাদের প্রচার করছে! তাঁর ত্যাগ বৈরাগ্য কিছুই নিতে পাল্লেনা, অথচ বলে কিনা তারা সব ঠাকুরের অন্তরঙ্গ ভক্ত! ওসব কথা ঝেঁটিয়ে ফেলে দিবি। যিনি ত্যাগীর "বাদসা" তাঁর কৃপা পেয়ে কি কেউ কখন কাম-কাঞ্চনের সেবায় জীবন যাপন কত্তে পারে?

শিষ্যঃ—তবে কি মহাশয় যাঁহারা দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই ঠাকুরের ভক্ত নন্?

স্বামীজিঃ—তা কে বল্‌ছে? সকলেই ঠাকুরের কাছে যাতায়াত ক'রে spiritualityর (ধর্ম্মানুভূতির) দিকে অগ্রসর হয়েছে হচ্ছে ও হবে। তবে কি জানিস্? সকলেই কিন্তু তাঁর অন্তরঙ্গ নয়। ঠাকুর বলতেন অবতারের সঙ্গে কল্পান্তরের সিদ্ধ ঋষিরা দেহ ধারণ ক'রে জগতে আগমন করেন। তাঁরাই ভগবানের সাক্ষাৎ পার্ষদ। তাঁদের দ্বারাই ভগবান্ কার্য্য করেন বা

জগতে ধর্ম্মভাব প্রচার করেন। এটা জেনে রাখবি অবতারের সাঙ্গোপাঙ্গ একমাত্র তাঁরাই, যাঁরা পরার্থে সর্ব্বত্যাগী—যাঁরা ভোগসুখ কাকবিষ্ঠার ন্যায় পরিত্যাগ ক'রে "জগদ্ধিতায়" "জীবহিতায়" জীবনপাত করেন। ভগবান্ ঈশার শিষ্যেরা সকলেই সন্ন্যাসী। শঙ্কর, রামানুজ, শ্রীচৈতন্য ও বুদ্ধদেবের সাক্ষাৎ কৃপাপ্রাপ্ত সঙ্গীরা সকলেই সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী। এই সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীরাই গুরু পরম্পরা ক্রমে জগতে ব্রহ্মবিদ্যা প্রচার ক'রে আসছেন। কোথায় কবে শুনেছিস্ কাম কাঞ্চনের দাস হয়ে মানুষ, মানুষকে উদ্ধার কত্তে বা ঈশ্বরলাভের পথ দেখিয়ে দিতে পেরেছে? বেদ বেদান্ত ইতিহাস পুরাণ সর্ব্বত্র দেখতে পাবি সন্ন্যাসীরাই সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশে লোকগুরুরূপে ধর্ম্মের উপদেষ্টা হয়েছেন। History repeats itself—যথা পূর্ব্বং তথা পরে—এবারও তাই হবে। মহাসমন্বয়াচার্য্য ঠাকুরের কৃতী সন্ন্যাসী-সন্তানগণই লোকগুরুরূপে জগতের সর্ব্বত্র পূজিত হচ্ছে ও হবে। ত্যাগী ভিন্ন অন্যের কথা ফাঁকা আওয়াজের মত শূন্যে লয় হ'যে যাবে। মঠের যথার্থ ত্যাগী সন্ন্যাসিগণই ধর্ম্মভাব রক্ষা ও প্রচারের মহাকেন্দ্র স্বরূপ হবে। বুঝ্লি?

শিষ্যঃ—তবে ঠাকুরের গৃহস্থ ভক্তেরা যে তাঁহার কথা নানাভাবে প্রচার করিতেছেন, সে সব কি সত্য নয়?

স্বামীজিঃ—ও সব partial truth (আংশিক সত্য।) যে, যেমন আধার, সে ঠাকুরের ততটুকু নিয়ে তাই আলোচনা কচ্ছে। ও সব মন্দ নয়। তবে তাঁর ভক্তের মধ্যে এরূপ যদি কেহ বুঝে থাকেন যে তিনি যা বুঝেছেন বা বল্ছেন তাই একমাত্র সত্য তবে তিনি দয়ার পাত্র। ঠাকুরকে কেহ বলছেন তান্ত্রিক কৌল, কেহ বলছেন চৈতন্যদেব 'নারদীয় ভক্তি, প্রচার কত্তে জন্মেছিলেন। ও সব কথায় কান দিবিনি। তিনি যে কি—কত কত পূর্ব্বগ অবতারগণের জমাট বাঁধা ভাবরাজ্যের রাজা তা এই জীবনপাতী তপস্যা ক'রেও একচুল বুঝ্তে পার্লুম না। তাই তাঁর কথা সংযত হ'য়ে বল্তে হয়। যে যেমন আধার, তাকে তিনি ততটুকু দিয়ে ভরপূর করে গেছেন। তাঁর ভাব সমুদ্রের উচ্ছ্বাসের একবিন্দু ধারণা কর্ত্তে পেলে মানুষ তখনি দেবতা হ'য়ে যায়। সর্ব্বভাবের এমন সমন্বয় জগতের ইতিহাসে আর কোথাও কি খুঁজে পাওয়া যায়? এই থেকেই বোঝ্ তিনি কে দেহ ধ'রে এসেছিলেন। অবতার বল্লে তাঁকে ছোট করা হয়। তিনি যখন তাঁর সন্ন্যাসী ছেলেদের বিশেষ উপদেশ দিতেন, তখন অনেক

সময় নিজে উঠে চারিদিক খুঁজে দেখ্‌তেন কোন গেরস্থ সেখানে আস্‌ছে কি না। যদি দেখ্‌তেন কেহ নাই বা আস্‌ছে না তবেই জলন্ত ভাষায় ত্যাগ তপস্যার মহিমা বর্ণন কত্তেন। সেই সংসার বৈরাগ্যের প্রবল উদ্দীপনাতেই তো আমরা সংসারত্যাগী উদাসীন।

শিষ্য :—গৃহস্থ ও সন্ন্যাসীদের মধ্যে তিনি এত প্রভেদ রাখ্‌তেন?

স্বামীজি :—তা তাঁর গৃহীভক্তদেরই জিজ্ঞাসা ক'রে দেখিস্‌না। বুঝেই ত্থাখ্‌না কেন—তাঁর যে সব সন্তান ঈশ্বর লাভের জন্য ঐহিক জীবনের সমস্ত ভোগ ত্যাগ ক'রে, পাহাড়ে পর্ব্বতে, তীর্থে আশ্রমে তপস্যায় দেহপাত কর্‌ছে, তারা বড়—না যারা তাঁর সেবা বন্দনা স্মরণ মনন কচ্ছে অথচ সংসারের মায়া মোহ কাটিয়ে উঠ্‌তে পার্‌ছেনা তারা বড়? যারা আত্মজ্ঞানে জীবসেবায় জীবনপাত করতে অগ্রসর, যারা আকুমার উর্দ্ধরেতা, যারা ত্যাগ বৈরাগ্যের মূর্ত্তিমান্ চলৎবিগ্রহ তারা বড—না যারা মাছির মত একবার ফুলে ব'সে পরক্ষণেই আবার বিষ্ঠায় বস্‌ছে তারা বড়। এসব নিজেই বুঝে ত্থাখ্‌না।

শিষ্য:—কিন্তু মহাশয় যাঁহারা তাঁহার (ঠাকুরের) কৃপা পাইয়াছেন তাঁহাদের আবার সংসার কি? তাঁহারা গৃহে থাকুন বা সন্ন্যাস অবলম্বন করুন উভয়ই সমান, আমার এইরূপ বলিযা বোধ হয়।

স্বামীজি :—তাঁর কৃপা যারা পেয়েছে তাদের মন, বুদ্ধি কিছুতেই আর সংসারে আসক্ত হ'তে পারে না। কৃপার test (পরীক্ষা) হচ্ছে কামকাঞ্চনে অনাসক্তি। এ যদি কারো না হ'য়ে থাকে তবে সে ঠাকুরের কৃপা কখনই ঠিক্ ঠিক্ লাভ করে নাই।

পূর্ব্ব প্রসঙ্গ এইরূপে শেষ হইলে শিষ্য অন্য কথার অবতারণা করিয়া স্বামীজিকে জিজ্ঞাসা করিল, মহাশয়, আপনি যে দেশ বিদেশে এত পরিশ্রম করিয়া গেলেন ইহার ফল কি হইল?

স্বামীজি :—কি হয়েছে তার কিছু কিছু মাত্র তোরা দেখ্‌তে পাবি। কালে পৃথিবীকে ঠাকুরের উদার ভাব নিতে হবে তার সূচনা হয়েছে। এই প্রবল বন্যামুখে সকলকে ভেসে যেতে হবে।

শিষ্য :—আপনি ঠাকুরের সম্বন্ধে আরও কিছু বলুন। ঠাকুরের প্রসঙ্গ আপনার মুখে শুনিতে বড় ভাল লাগে।

স্বামীজি :—এই ত কত কি দিনরাত শুন্‌ছিস্। তাঁর উপমা তিনিই। তাঁর কি তুলনা আছে রে?

শিষ্য ঃ—মহাশয়, আমরা ত তাঁহাকে দেখিতে পাই নাই। আমাদের উপায় ?

স্বামীজি ঃ—তাঁর সাক্ষাৎ কৃপাপ্রাপ্ত এই সব সাধুদের সঙ্গলাভ ত করেছিস্। তবে আর তাঁকে দেখ্‌লিনি কি করে বল্‌বো। তিনি তাঁর ত্যাগী সন্তানদের মধ্যে পূর্ণভাবে বিরাজ কর্‌ছেন। তাদের সেবা বন্দনা করলে কালে তিনি reveal (প্রকাশ) হবেন। কালে সব দেখ্‌তে পাবি।

শিষ্য ঃ—আচ্ছা মহাশয় আপনি ঠাকুরের কৃপাপ্রাপ্ত অন্য সকলের কথাই বলেন। আপনার নিজের সম্বন্ধে ঠাকুর যাহা বলিতেন সে কথাত কোনদিন কিছু বলেন না।

স্বামীজি ঃ—আমার কথা আর কি বল্‌বো ? দেখ্‌ছিস্ তো—আমি তাঁর দৈত্যদানার ভিতরকার একটা কেউ হবো। তাঁর সাম্‌নেই তাঁকে গাল মন্দ করতুম্—তিনি শুনে হাস্‌তেন।

বলিতে বলিতে স্বামীজির মুখমণ্ডল স্থির গম্ভীর হইল। গঙ্গার দিকে শূন্যমনে চাহিয়া কিছুক্ষণ স্থিরভাবে বসিয়া রহিলেন। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা হইল। নৌকাও ক্রমে মঠে পৌঁছিল। স্বামীজি তখন আপন মনে গান ধরিয়াছেন "কেবল আসামাত্র হলো—সন্ধ্যাবেলা ঘরের ছেলে ঘরে নিয়ে চলো।" ইত্যাদি।

গান শুনিয়া শিষ্য স্তম্ভিত হইয়া স্বামীজির মুখপানে তাকাইয়া আছে।

গান সমাপ্ত হইলে স্বামীজি বলিলেন "তোদের বাঙ্গালদেশে সুকণ্ঠ গায়ক জন্মায় না। মা গঙ্গার জল পেটে না গেলে সুকণ্ঠ হয় না।"

এইবার ভাড়া চুকাইয়া স্বামীজি সশিষ্য নৌকা হইতে অবতরণ করিলেন এবং জামা খুলিয়া মঠের—পশ্চিম বারিন্দায় উপবিষ্ট হইলেন। স্বামীজির গৌরকান্তি এবং গৈরীক বসন সন্ধ্যার দীপালোকে যেন জ্যোৎস্না বিস্তার করিতে লাগিল।

ক্রমশঃ

ইংলণ্ডে ভারতীয় ধর্ম্মপ্রচারকের প্রচার কার্য্য।

[লণ্ডন হইতে প্রকাশিত একো নামক সংবাদ পত্র, ১৮৯৬]

* * * বোধ হয় নিজের দেশে হইলে স্বামীজি গাছতলায়, বড়জোর কোন মন্দিরের সন্নিকটে থাকিতেন; নিজের দেশের কাপড় পরিতেন ও তাঁহার মাথা নেড়া থাকিত। কিন্তু লণ্ডনে তিনি ওসব কিছুই করেন না। সুতরাং আমি যখন স্বামীজির সহিত দেখা করিলাম, দেখিলাম, তিনি অপরাপর লোকের ন্যায়ই বাস করিতেছেন। পোষাকও অন্যান্য লোকেরই মত—তফাৎ কেবল যে, তিনি গেরুয়া রঙের একটা লম্বা জামা পরেন। তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, লণ্ডনের রাস্তায় যে সব ছোটলোকের ছেলে মেয়েরা ঘুরিয়া বেড়ায়, তাঁহার পোষাক তাহাদের একেবারেই পছন্দ হয় না, বিশেষতঃ, পাগড়ি পরিলে ত আর রক্ষা নাই। তাহারা তাঁহাকে দেখিয়া যাহা বলে, সে সব কথা উল্লেখ যোগ্য নহে।

আমি প্রথমেই ঐ ভারতীয় যোগীকে তাঁহার নাম খুব ধীরে ধীরে বানান করিতে বলিলাম।

* * * * * * *

"আপনি কি মনে করেন, আজ কাল লোকের অসার ও গৌণ বিষয়েই অধিক দৃষ্টি?"

"আমার ত তাহাই মনে হয়—অনুন্নত জাতি সমূহের মধ্যে এবং পাশ্চাত্য প্রদেশের সভ্য জাতিদের মধ্যে যাহারা অপেক্ষাকৃত কম শিক্ষিত, তাহাদের মধ্যেও এই ভাব। আপনার প্রশ্নের ভাবে বোধ হয়, ধনী ও শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে অন্য ভাব। বাস্তবিক কিন্তু তাহা নহে, ধনী লোকেরা হয় ঐশ্বর্য্য ভোগে মগ্ন অথবা আরো অধিক ধনসঞ্চয়ের চেষ্টায় ব্যস্ত। তাহারা এবং সংসারকর্ম্মে ব্যস্ত অনেক লোকে, ধর্ম্মটাকে একটা অনর্থক বাজে বা মিছে জিনিষ মনে করে, আর তাহারা সরল ভাবেই একথা মনে করিয়া থাকে। চলিত ধর্ম্ম হচ্ছে দেশ হিতৈষিতা আর লোকাচার। লোকে বিবাহের সময় বা কাহারও সমাধি দিবার সময়েই কেবল ধর্ম্ম মন্দিরে (চার্চ্চে) যায়।"

"আপনি যাহা প্রচার করিতেছেন, তাহার ফলে কি লোকের চার্চ্চে গতি বিধি অধিক হইবে?"

"আমার ত তাহা বোধ হয় না; কারণ, বাহ্যিক অনুষ্ঠান বা মতবাদের সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই। ধর্ম্মই যে মানব জীবনের সর্ব্বস্ব এবং সমুদয়ের ভিতরই যে ধর্ম্ম আছে, তাহাই দেখান আমার জীবন ব্রত। * * * আর এখানে ইংলণ্ডে কি ভাব চলিতেছে? ভাব গতিক দেখিয়া বোধ হয় যে, সোস্যালিজম * বা অন্য কোনরূপ লোকতন্ত্র, তাহার নাম যাহাই দিন না কেন, শীঘ্র প্রচলিত হইবে। লোকে অবশ্য তাহাদের সাংসারিক প্রয়োজনীয় বিষয় গুলির আকাঙ্খা মিটাইতে চাহিবে। তাহারা চাহিবে—যাহাতে তাহাদের কায পূর্ব্বাপেক্ষা কমিয়া যায় যাহাতে তাহারা ভাল খাইতে পায় এবং অত্যাচার ও যুদ্ধবিগ্রহ একেবারে বন্ধ হয়। কিন্তু যদি এদেশের সভ্যতা বা অন্য কোন সভ্যতা ধর্ম্মের উপর, মানবের সাধুতার উপর প্রতিষ্ঠিত না হয়, তবে তাহা যে টিকিবে, তাহার নিশ্চয়তা কি? এটী নিশ্চিত জানিবেন যে, ধর্ম্ম সকল বিষয়ের মূলদেশ পর্য্যন্ত গিয়া থাকে। যদি ঐটী ঠিক থাকে, তবে সব ঠিক হইল।"

"কিন্তু ধর্ম্মের সার দার্শনিক ভাব লোকের মনে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া ত বড় সহজ ব্যাপার নহে। লোকে সচরাচর যে সকল চিন্তা ও ভাব লইয়া থাকে, তাহারা যে ভাবে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করে, তাহার সঙ্গেত উহার অনেক ব্যবধান।"

"সকল ধর্ম্ম বিশ্লেষণ করিলেই দেখা যায়, প্রথমাবস্থায় লোকে ক্ষুদ্রতর সত্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে, পরে তাহা হইতেই তদপেক্ষা বৃহত্তর সত্যে উপনীত হয়; সুতরাং অসত্য ছাড়িয়া সত্যলাভ হইল, এটী বলা ঠিক নয়। সমুদয় সৃষ্টির অন্তরালে এক বস্তু বিরাজমান, কিন্তু লোকের মন অতিশয় ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। 'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি।'—"যথার্থ বস্তু একটীই—জ্ঞানিগণ উহাকে নানারূপে বর্ণনা করিয়া থাকেন।'' আমার বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, লোকে সঙ্কীর্ণতর সত্য হইতে ব্যাপকতর সত্যে অগ্রসর হইয়া থাকে। সুতরাং অপরিণত বা নিম্নতম ধর্ম্মসমূহও মিথ্যা নহে, সত্য;

* Socialism—পাশ্চত্য দেশীয় একটী প্রবল মত। এই মতে ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে সকলের সম্পত্তি একত্র থাকা এবং তাহাতে সকলের সমান অধিকার হওয়া উচিত।

তবে উহাদের মধ্যে সত্যের ধারণা বা অনুভূতি অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট বা অপকৃষ্ট—এই মাত্র। * * * *
লোকে ধীরে ধীরে ইহা বুঝিতে পারে। এমন কি, ভূতোপাসনা পর্য্যন্ত সেই নিত্য সত্য সনাতন ব্রহ্মেরই বিকৃত উপাসনা মাত্র। ধর্ম্মের অন্যান্য যে সকল রূপ আছে, তাহাদের মধ্যেও অল্প বিস্তর সত্য বর্ত্তমান। সত্য কোন ধর্ম্মেই পূর্ণরূপে বর্ত্তমান নাই।"

"আপনি ইংলণ্ডে এই যে ধর্ম্ম প্রচার করিতে আসিয়াছেন, তাহা আপনারই উদ্ভাবিত কি না এ কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?"

"উহা আমার কখনই নহে। আমি রামকৃষ্ণ পরমহংস নামক জনৈক ভারতীয় মহাপুরুষের শিষ্য। আমাদের দেশের কতকগুলি মহাত্মার মত তিনি বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন না বটে, কিন্তু অতিশয় পবিত্রাত্মা ছিলেন—এবং তদীয় জীবন ও উপদেশ বেদান্তদর্শনের ভাবে বিশেষরূপে অনুরঞ্জিত ছিল। বেদান্তদর্শন বলিলাম—কিন্তু উহাকে ধর্ম্মও বলিতে পারা যায়, কারণ, প্রকৃত পক্ষে উহা ধর্ম্ম ও দর্শন উভয়ই। সম্প্রতি 'নাইনটিন্থ সেঞ্চুরি' পত্রের একটী সংখ্যায় অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার মদীয় আচার্য্যদেবের যে বিবরণ লিখিয়াছেন, তাহা অনুগ্রহ পূর্ব্বক পড়িয়া দেখিবেন। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে হুগলি জেলায় শ্রীরামকৃষ্ণের জন্ম হয়, আর ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার দেহ ত্যাগ হয়। কেশব চন্দ্র সেন এবং অন্যান্য ব্যক্তির জীবনের উপর তিনি প্রবল প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। শরীর ও মনের সংযম অভ্যাস করিয়া তিনি আধ্যাত্মিক জগতে গভীর অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার মুখ সাধারণ লোকের মত ছিল না—উহাতে বালকবৎ কমনীয়তা, গভীর নম্রতা এবং অদ্ভুত প্রশান্ত ও মধুর ভাব প্রকাশ পাইত। কেহ তাঁহার মুখ দেখিয়া বিচলিত না হইয়া থাকিতে পারিত না।"

"তবে কি আপনার উপদেশ বেদ হইতে গৃহীত?"

"হাঁ, বেদান্তের অর্থ বেদের শেষভাগ, উহা বেদের তৃতীয় অংশ—উহার নাম উপনিষদ্। প্রাচীন ভাগে যে সকল ভাব বীজাকারে অবস্থিত দেখিতে পাওয়া যায়, সেই বীজগুলিই উহাতে সুপরিণত হইয়াছে। বেদের অতি প্রাচীন ভাগের নাম সংহিতা—উহা অতি প্রাচীন ধরণের সংস্কৃত ভাষায় রচিত—যাস্কের নিরুক্ত নামক অতি প্রাচীন অভিধানের সাহায্যেই কেবল উহা বুঝা যাইতে পারে।"

"আমাদের—ইংরাজদের—বরং ধারণা, ভারতকে আমাদের নিকট হইতে অনেক শিক্ষা করিতে হইবে। ভারত হইতে ইংরাজ যে কিছু শিখিতে পারে এ সম্বন্ধে সাধারণ লোক একরূপ অজ্ঞ বলিলেও হয়।"

"তা সত্য বটে। কিন্তু পণ্ডিতেরা অতি উত্তমরূপই জানেন, ভারত হইতে কতদূর শিক্ষা পাওয়া যাইতে পারে, আর ঐ শিক্ষা কতদূরই বা প্রয়োজনীয়। আপনি দেখিবেন, ম্যাক্সমূলার, মোনিয়র উইলিয়াম্‌স, স্যার উইলিয়ম হাণ্টার বা জর্ম্মান প্রাচ্যতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা ভারতীয় সূক্ষ্মতত্ত্ব বিজ্ঞানকে অবজ্ঞা করেন না।"

* * * * * *

স্বামীজি ৩৯নং ভিক্টোরিয়া ষ্ট্রীটে বক্তৃতা দিয়া থাকেন। সকলেই ইচ্ছা করিলে বক্তৃতা শুনিতে আসিতে পারেন, কাহারও আসিবার বাধা নাই, আর প্রাচীন "প্রেরিত দিগের যুগে"র * মত এই নূতন শিক্ষা বিনামূল্যে প্রদত্ত হইয়া থাকে। এই ভারতীয় ধর্ম্ম প্রচারকর্তার দেহের গঠন অসাধারণ সুন্দর। ইংরাজী ভাষায় তাঁহার সম্পূর্ণ অধিকার আছে বলিলে যথার্থ বর্ণনা করা হয়। * * *

সি, এস, বি।

মহর্ষি ফ্র্যান্সিস্।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর] [শ্রীহরিদাস দত্ত বি, এ।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ধর্ম্মসঙ্ঘ প্রবর্ত্তন।

গ্রীষ্মকাল ১২১০ খৃঃ অব্দ।

অনুচরবর্গের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া ফ্র্যান্সিস্ নিজ সঙ্ঘের জন্য কতকগুলি নিয়ম প্রস্তুত করিতে মনস্থ করেন, এবং রোম নগরে যাইয়া উহা পোপের দ্বারা অনুমোদন করাইয়া লইতে অভিলাষী হ'ন। অনেকের

* Apostolic Age —যে সময়ে Apostles (যীশু খৃষ্টের দ্বাদশ শিষ্য) বা প্রেরিতগণ এবং তাঁহাদের শিষ্যগণ ধর্ম্ম প্রচার কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন।

ধারণা যে ভগবদাদেশ না পাইয়া ফ্র্যান্‌সিস্‌ কোন কর্ম্মই করিতেন না। কিন্তু এ ধারণা যে কতদূর ভ্রান্ত তাহা তাঁহার কার্য্যাবলী বিচার করিয়া দেখিলেই বেশ বুঝিতে পারা যায়। কারণ যাঁহারা প্রকৃত পক্ষে এইরূপ ভাবে আদিষ্ট হইয়া কার্য্য করেন তাঁহাদের স্থির বিশ্বাস হয় যে তাঁহারা যে কার্য্য করিবেন তাহাতে কখনই বিফল মনোরথ হইবেন না এবং সেজন্য অকৃতকার্য্যতার বিষয় তাঁহাদের মনে একবারও উদয় হয় না এবং কার্য্যের ফলাফল সম্বন্ধে কোনরূপ চিন্তাও তাঁহাদের মনোমধ্যে স্থান পায় না। কিন্তু ফ্র্যান্‌সিস্‌ যে এইভাবে কার্য্য করিতেন তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং আমরা দেখিতে পাই যে তিনি অতিশয় বিনয়ী ছিলেন এবং উপাসনার সময় ভগবৎকৃপা ও আদেশ লাভ যে সম্ভব এরূপ বিশ্বাস তাঁহার থাকিলেও তিনি কোন কার্য্য করিতে সংকল্প করিবার পর সে সম্বন্ধে বারবার নানারূপ চিন্তা ও বিচারাদি না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। আমরা আরও দেখিতে পাই যে তিনি অদম্য উৎসাহ ও দৃঢ় অধ্যবসায়ের সাহায্যেই প্রভূত ধর্ম্মোন্নতি বিধানে সমর্থ হইয়াছিলেন। কেহ কেহ এমন কথাও বলিয়া থাকেন যে তিনি স্বপ্নাবস্থায় শক্তিলাভ করিতেন। এরূপ বলিলে তাঁহাতে দেবভাবের আরোপ করা হয় সত্য, কিন্তু উহাতে মানব সমাজ উপকৃত না হইয়া বরং ক্ষতিগ্রস্ত হয় বলিয়াই মনে হয়; এবং তাঁহার অলৌকিক জীবনের প্রকৃত রহস্যটুকু নষ্ট করা হয়। বরং তাঁহার জীবনী পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে তিনি সকল বিষয়েই সাধ্যমত চেষ্টাদি করিতেন এবং উহার প্রমাণ স্বরূপ ইহা বলা যাইতে পারে যে তাঁহার জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত অবধি প্রয়োজন অনুসারে নিজ শিষ্যসঙ্ঘের নিয়মাবলী তিনি অসঙ্কোচে পরিবর্ত্তিত করিয়াছিলেন।

যে নিয়মাবলী তিনি প্রথমে পোপের নিকট অর্পণ করিয়াছিলেন তাহা কাহারও বিশেষ জানা নাই। তবে সে সম্বন্ধে এইমাত্র জানিতে পারা যায় যে উহা ধর্ম্ম পুস্তক (Bible) হইতে গৃহীত এবং অতি সরলভাষায় লিখিত হইয়াছিল। এগার জন শিষ্যের সহিত তিনি Portiuncula নামক উপাসনা মন্দির হইতে রোম নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। সে সময় ফ্র্যান্‌সিস্‌ ভিন্ন অপর সকলেরই চিত্ত অতিশয় প্রসন্ন এবং নিজেদের প্রতি তাঁহাদের বিশ্বাসও প্রবল ছিল। কিন্তু ফ্র্যান্‌সিসের চিত্ত অতিশয় চিন্তাভারাক্রান্ত ছিল বলিয়া তিনি শিষ্যগণের ভার নিজে না লইয়া নিজেদের মধ্যে একজনের উপর সমর্পণ করিতে ইচ্ছা করেন। এই অভিপ্রায়ে তিনি তাঁহাদের সম্বোধন

করিয়া বলিলেন—"আমাদের মধ্যে একজনকে মনোনীত করিয়া তাঁহাকে ঈশার প্রতিনিধিরূপে আমাদের গ্রহণ করিতে হইবে। এবং এই যাত্রাকালে তাঁহার ইচ্ছা ও আদেশ অনুযায়ী আমাদের সকলকেই কার্য্য করিতে হইবে।" এই প্রস্তাব অনুযায়ী সকলে বার্ণার্ডনকে মনোনীত করিলেন। তাঁহারা ভগবৎপ্রসঙ্গ ও অধ্যাত্মবিষয়ক আলোচনায় মহা আনন্দে সমুদয় পথ অতি-বাহিত করিলেন। পথে তাঁহাদের কোনরূপ কষ্ট পাইতে হয় নাই কারণ, যখনই আবশ্যক হইয়াছিল তখনই লোকে তাঁহাদিগকে সাদরে আশ্রয় প্রদান করিয়াছিল ও তাঁহাদের সমুদয় অভাব দূর করিয়াছিল। এই নিমিত্ত তাঁহাদের ধারণা হইয়াছিল যে ভগবান্ তাঁহাদের প্রতি সুপ্রসন্ন আছেন এবং সমুদয় বিপদাপদ হইতে তাঁহাদিগকে রক্ষা করিতেছেন। ফ্র্যান্সিস্ কিন্তু যে উদ্দেশ্যে যাত্রা করিতেছেন তৎসম্বন্ধেই দিবানিশি চিন্তা করিতেন এবং সে সময় তিনি যে সকল স্বপ্ন দেখিতেন তাহার অর্থ যথার্থ ভাবে বুঝিবার প্রয়াসেই ব্যাপৃত থাকিতেন। এক দিন তিনি স্বপ্ন দেখিলেন যে তিনি একটী পথে বেড়াইতেছেন এবং ঐ পথের পার্শ্বে একটী মনোহর প্রকাণ্ড বৃক্ষ রহিয়াছে। বিস্মিত চিত্তে বৃক্ষটী দেখিতে দেখিতে তিনি যেন নিরতিশয় দীর্ঘকায় হইয়া উঠি-লেন এবং বৃক্ষের শাখাগুলিও ঐ সময়ে নত হইয়া পড়ায় তিনি সেগুলিকে স্পর্শ করিতে লাগিলেন! নিদ্রাভঙ্গের পর স্বপ্নের বিষয় মনে করিয়া তিনি অতিশয় আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার এই স্থির বিশ্বাস জন্মিল যে পোপের নিকট তিনি সাদরে অভ্যর্থিত হইবেন।

রোম নগরে পহুঁছিয়া ফ্র্যান্সিস্ দেখিলেন, এ্যাসিসিনগরের প্রধান ধর্ম্ম-যাজক Guido তথায় রহিয়াছেন। পরস্পর সাক্ষাতে তাঁহারা উভয়েই কিছু বিস্মিত হইয়াছিলেন। এই ঘটনা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে ফ্র্যান্সিস্ ইহার পূর্ব্বে নিজ অভিপ্রায় Guidoর নিকট প্রকাশ করেন নাই। Guido তথাচ পোপের মন্ত্রীসভার সভ্যগণের নিকট তাঁহাদের কার্য্যসিদ্ধি বিষয়ে চেষ্টা করিবেন বলেন। কিন্তু ফ্র্যান্সিসের কার্য্যসিদ্ধির জন্য ইনি যে বিশেষ কোনরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন এরূপ বোধ হয় না। অথবা তাঁহার চেষ্টায় ফ্র্যান্সিস্ ও তদীয় শিষ্যবর্গের বিশেষ কোন উপকার সাধিত হয় নাই। ফ্র্যান্সিস্ অতি সামান্য বিষয়ের জন্য প্রার্থী হইয়াই পোপের নিকট আসিয়া-ছিলেন—কোনরূপ বিশেষ সুবিধা লাভের উদ্দেশ্যে নহে। শাস্ত্রের (বাই-বেলের) উপদেশানুযায়ী তাঁহার ও তদীয় শিষ্যবর্গের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ

বিষয়ে পোপের অনুমোদন লাভ করাই তাঁহার একান্ত ইচ্ছা ছিল। Guido তাঁহাদিগকে পোপের মন্ত্রীসভার জনৈক সভ্যের নিকট লইয়া যান। সভ্যটী কিন্তু ইতি পূর্ব্বেই ইঁহাদের সম্বন্ধে সমুদয় সংবাদ লইয়াছিলেন। তিনি কথা-বার্ত্তায় এমন ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন যে তাঁহাদের যাহাতে উপকার হয় সেজন্য তিনি সাধ্যমত চেষ্টা করিবেন। উপাসনার সময়েও তাঁহাদের বিষয় উল্লেখ করিতে তিনি অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐরূপ বিশ্বস্ত-ভাবে কথাবার্ত্তার পরেও কয়েক দিবস ধরিয়া তিনি তাঁহাদিগকে নানারূপে পরীক্ষা করিয়াছিলেন, এবং পরিশেষে সে সময়কার বিশেষ একটী ধর্ম্মসঙ্ঘে যোগদান করিতে তাঁহাদিগকে উপদেশ দিয়াছিলেন! ফ্র্যান্‌সিস্ তাঁহার ঐ প্রস্তাবের যুক্তিপূর্ণ অতিসুন্দর উত্তর প্রদান করিলেও বিষম সমস্যায় যে পড়িয়া-ছিলেন ইহাতে সন্দেহ নাই। কারণ উক্ত সভ্যের উপদেশ তিনি অগ্রাহ্য বা অবহেলা করিতেছেন এরূপ ভাব প্রকাশ কারতে যেমন তাঁহার ইচ্ছা ছিল না সেইরূপ অন্যদিকে আবার যাহা তিনি নিজ জীবনের কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন এবং যদনুযায়ী কার্য্য করিবার ইচ্ছা তাঁহায় হৃদয়ে বিশেষরূপে বলবতী ছিল তাহার বিরুদ্ধে তিলমাত্র কার্য্য করিতেও যে তাঁহার প্রবৃত্তি নাই একথা প্রকাশ করাও তাঁহার মনোগত ছিল। তাঁহার কথা শুনিয়া সভ্যটি পুনরায় বলিলেন—"মহাশয়! আপনি যে ভাবে কার্য্য করিতে সংকল্প করিয়াছেন তাহা কঠোর অধ্যবসায় ভিন্ন সিদ্ধ হওয়া সম্ভব নহে। এবং প্রথমাবস্থায় আপনাদের যেরূপ আগ্রহ ও উৎসাহ আছে কিছুদিন পরে আর সেরূপ থাকিবে কি না বলা যায় না। অতএব ঈদৃশ কঠিন সংকল্প পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমার উপদেশ মত কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হউন।" কিন্তু ফ্র্যান্‌সিস্ তাঁহার কথায় কিছুমাত্র বিচলিত হন নাই এবং নিজ জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাঁহার মনে অনুমাত্রও সন্দেহের উদয় হয় নাই। সভ্যটী শেষে তাঁহাকে স্বমতে আনিতে না পারিয়া নিজেই তাঁহার নিকট পরাভব স্বীকার করিলেন এবং ফ্র্যান্‌সিসের উপর তাঁহার শ্রদ্ধার উদয় হইল। তাঁহাদের বিনীত স্বভাব ও সরল ধর্ম্ম বিশ্বাস দর্শন করিয়া তাঁহার ইহা ধারণা হইয়াছিল যে প্রচলিত ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহাদের মনে কোন প্রকার বিরুদ্ধভাব নাই। পরিশেষে তিনি বলিলেন—"মহাশয়! আমি আপনাদের বিষয় পোপের নিকট নিবেদন করিব এবং আপনাদের উদ্দেশ্য যাহাতে সিদ্ধ হয় সেজন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিব।" এই ঘটনার পরেই তিনি পোপের নিকট যাইয়া বলেন—"প্রভু!

একজন অতিশয় উন্নত মহাপুরুষের এখানে আগমন হইয়াছে। তিনি ধর্ম্ম পুস্তকের আদেশ অনুযায়ী জীবন যাপন করিতে ইচ্ছা করেন এবং প্রতি কার্য্যে সেই আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতে অভিলাষী। ঐ বিষয়ে আপনার আদেশ তিনি প্রতীক্ষা করিতেছেন। আমার বিশ্বাস ভগবান্ ইহাঁর দ্বারা সমগ্র জগৎ অভিনব ধর্ম্মভাবে আন্দোলিত করিবেন।" পরদিবস তিনি, ফ্র্যান্‌সিস্ ও তাঁহার অনুচরবর্গকে পোপের নিকট লইয়া গেলেন। পোপ্ তাঁহাদের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতির পরিচয় প্রদান করিলেন বটে কিন্তু তিনিও, পূর্ব্বকথিত সভ্যটী যে ভাবে উপদেশ দিয়াছিলেন, সেই ভাবেই তাঁহাদের উপদেশ দিলেন। তিনি তাহাদের সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"প্রিয় বৎসগণ! তোমরা যে ভাবে জীবন যাপন করিতেছ তাহা আমার বিবেচনায় অতিশয় কঠোর বলিয়া বোধ হইতেছে। তোমাদের যেরূপ তীব্র বৈরাগ্য দেখিতেছি তাহাতে তোমাদের পক্ষে সকলই সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু তোমাদের পরবর্ত্তী সন্ন্যাসিগণের বিষয়ও ত আমাকে ভাবিয়া দেখিতে হইবে। তাহাদের মধ্যে সকলেই যে তোমাদের ন্যায় বিবেক ও বৈরাগ্যবান্ হইবে তাহা ত আর বলা যায় না।" ইহার পর দু'চারিটী মিষ্ট কথায় তিনি তাঁহাদের বিদায় দিলেন। তাঁহাদের প্রার্থনা সম্বন্ধে তিনি তখনি কোনরূপ নিষ্পত্তি না করিয়া বলিলেন যে তাঁহার সভার সদস্যগণের সহিত ঐ বিষয় পরামর্শ করিয়া যাহা বলিবার পরে বলিবেন। সর্ব্বশেষে ফ্র্যান্‌সিস্‌কে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়া তিনি এই কথা বলিলেন—"আপনি যে উদ্দেশ্যে এখানে আসিয়াছেন সে সম্বন্ধে শ্রীভগবানের কি ইচ্ছা তাহা জানিবার জন্য তাঁহার নিকট সরল ভাবে প্রার্থনা করুন।" পোপের ঈদৃশ আচরণে ফ্র্যান্‌সিস্ অতিশয় চিন্তিত হইলেন। তিনি কথাবার্ত্তায় যথেষ্ট স্নেহ ও সহানুভূতির পরিচয় প্রদান করিয়াও কি নিমিত্ত যে প্রকৃত কার্য্য সম্বন্ধে এত বিলম্ব করিতেছেন তাহার কারণ ফ্র্যান্‌সিস্ কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। তিনি বিষণ্ণ চিত্তে মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—"আমার যাহা বলিবার ছিল তাহা বলিয়াছি অধিক বলিবার আর কিছুই নাই। এখন কার্য্যসিদ্ধির শেষ উপায় দেখিতেছি ভগবানের নিকট প্রার্থনা।" ঐদিন উপাসনাকালে একটী গল্প তাঁহার মনে উদয় হইয়াছিল; সেই গল্পটীই তিনি এখন পোপের নিকট বিবৃত করিলেন। গল্পটী এই :—কোন বনে একটী পরম রূপবতী দরিদ্র স্ত্রীলোক বাস করিতেন। এক রাজা তাঁহার রূপে মুগ্ধ হইয়া সুন্দর

সন্তান লাভের আশায় তাঁহাকে বিবাহ করেন। রাজার ঔরসে সেই স্ত্রীলোকটীর গর্ভে অনেকগুলি সন্তানের জন্ম হয়। পুত্রেরা বড় হইলে তাহাদের জননী একদিন তাহাদের সকলকে ডাকিয়া বলিলেন "দেখ, তোমরা রাজার পুত্র। তাঁহার সভায় তোমরা যাও, তাহা হইলে তিনি তোমাদের সমুদয় অভাব দূর করিবেন।" জননীর কথামত পুত্রেরা রাজদরবারে যাইয়া উপস্থিত হইলে রাজা তাহাদের সুন্দর মূর্ত্তি দর্শন করিয়া অতিশয় প্রশংসা করিলেন এবং তাহাদেব আকৃতিতে নিজ সাদৃশ্য দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমরা কাহার পুত্র?" তাহারা যখন বলিল "রাজন্! আমরা অরণ্যবাসিনী দরিদ্রাজননীর সন্তান" তখন তিনি মহা আনন্দিত চিত্তে তাহাদিগকে হৃদযে ধরিয়া আলিঙ্গন করিযা বলিলেন "বৎসগণ! তোমাদেব ভয়ের কোন কারণ নাই, যেহেতু তোমরা আমারই সন্তান। বহুসংখ্যক অপরিচিত ব্যক্তি যখন আমার অন্নে নিযত প্রতিপালিত হইতেছে, তখন তোমাদের সকল অভাব যে আমি দূর করিব সে কথা কি আর বলিতে হইবে!" রাজা তৎপরে সকল সন্তানগুলিকেই তাঁহার নিকটে পাঠাইবার জন্য পূর্ব্বোক্ত স্ত্রীলোকটীকে বলিয়া পাঠাইলেন। এই উপাখ্যানটী বলিবার পর তিনি পোপ্‌কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "পরম পূজনীয পিতঃ! আমি এই উপাখ্যান কথিত স্ত্রীলোক স্থানীয এবং জগদীশ্বর কৃপা পূর্ব্বক আমাকে অধ্যাত্ম সৌন্দর্য্যে ভূষিত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহাও তাঁহার ইচ্ছা যে আমার বহু সংখ্যক শিষ্য জুটিবে। রাজরাজেশ্বর আমাকে বলিযাছেন যে পাত্রাপাত্রনির্ব্বিশেষে সকলেরই অন্নের সংস্থান যখন তিনি করিয়া থাকেন তখন আমার জনকতক শিষ্যের ভারও যে তিনি আনন্দের সহিত গ্রহণ করিবেন এ বিষয়ে আব বিচিত্রতা কি?

এরূপ সরলতা ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞতার নিকট অবশেষে পোপ্‌কেও পরাভব স্বীকার করিতে হইযাছিল। তিনি বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে এই বিনয়ের মূর্ত্তিস্বরূপ ভিক্ষাব্যবসায়ী সন্ন্যাসীটী সামান্য লোক নহেন। ইনি নিশ্চয় সাক্ষাৎ ঈশ্বর প্রেরিত মহাপুরুষ। জগতে এমন কোন শক্তি নাই যাহা ইহাঁর কার্য্য প্রতিরোধ করিতে পারে। এই দীনবেশধারী সন্ন্যাসী সম্বন্ধে মহাত্মা পিটারের সমুন্নত পদবীতে অধিরূঢ় এবং জগতে ঈশার প্রতিনিধিস্বরূপ পরিগণিত পোপের ধারণা হইল যে ইহাঁর ধর্ম্ম বিশ্বাস অটল, অচল, এবং ইহাঁকে আশ্রয় করিয়া ঈশাপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের একটী সুন্দর

অভিনব শাখার উদ্ভব হইবে। ফ্র্যান্সিস্ ও তদনুচরবর্গ যেরূপ কঠোর-ভাবে দিনাতিপাত করিতে সংকল্প করিয়াছিলেন তাহাতে পোপের ধারণা হইয়াছিল যে ভবিষ্যতে ইহাঁরা খাদ্যাভাবে নিশ্চয়ই মৃত্যুমুখে পতিত হইবেন। কিন্তু ফ্র্যান্সিসের মুখে উপরি উক্ত উপাখ্যানটী শ্রবণ করিয়া তাঁহার সে ধারণা পরিবর্তিত হইয়া গেল। উপরি উক্ত ঘটনা হইতে অপর একটী বিষয়ও স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। ফ্র্যান্সিসের ঐরূপ আচরণে আমরা বেশ বুঝিতে পারি যে তিনি বিনয়ী ও নিরীহ প্রকৃতিবিশিষ্ট ছিলেন বলিয়া দুর্ব্বলচেতা ছিলেন না। কারণ ধর্ম্মসম্বন্ধে তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা সত্ত্বেও তিনি একথা বেশ বুঝিয়াছিলেন এবং আবশ্যক হইলে সর্ব্ব সমক্ষে উহা বলিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না যে তাঁহারাই ঈশা প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের অন্তরঙ্গ ভক্ত ও সাধক এবং পুরোহিতগণ উহার বহিরঙ্গ লোক মাত্র। ফ্র্যান্সিসের উত্তর জীবনেও ঐরূপ অদ্ভুত নির্ভীকতা সম্বন্ধে আমরা যথেষ্ট প্রমাণ পাইব।

কিছুদিন পরে একটী ধর্ম্মসভা আহ্বান করিয়া ফ্র্যান্সিসের আবেদন সম্বন্ধে পোপ মন্ত্রীগণের সহিত পরামর্শ করিলেন। সভামধ্যে জনকতক সভ্য এই মত প্রকাশ করিলেন যে ইহাঁরা যে ভাবে কার্য্য করিতে সংকল্প করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণরূপে মানবশক্তির অতীত এবং প্রচলিত ধর্ম্মপদ্ধতি হইতে সর্ব্বতোভাবে স্বতন্ত্র। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে একজন উহার প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন"আপনারা যাহা বলিতেছেন তাহাই যদি সত্য হয় অর্থাৎ ধর্ম্ম পুস্তকের (Bible) উপদেশ ও আদেশ অনুযায়ী আদর্শ জীবন যাপন করা যদি আমরা অসম্ভব বলিয়া মনে করি তাহা হইলে আমরা কি ঈশানিন্দাপরাধে অপরাধী হইব না?" কথাগুলি শ্রবণ করিয়া পোপ স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন ঐ ব্যক্তি সত্য কথাই বলিয়াছেন। তখন তিনি ফ্র্যান্সিসের আবেদন অনুমোদন করিলেন এবং তাঁহাকে স্থানীয় ধর্ম্মযাজকদিগের অনুমোদিত ভাবে সর্ব্বত্র ধর্ম্ম-প্রচার করিতেও অনুমতি প্রদান করিলেন। পরক্ষণেই কিন্তু তিনি আবার তাঁহাদিগকে বলিলেন—"আমার ইচ্ছা আপনারা একজন অধ্যক্ষের অধীনে থাকিয়া কার্য্য করেন। কারণ তাহা হইলে তাঁহার সহিত আপনাদের সকল প্রকার কার্য্যাবলী সম্বন্ধে পুরোহিতগণের পরামর্শ ও আলোচনা করিবার সুবিধা হইবে।" পোপের অভিপ্রায় অনুসারে সকলেই তখন ফ্র্যান্সিস্‌কেই অধিনেতা স্বরূপে নির্ব্বাচন করিলেন। এই সামান্য ঘটনার পর হইতেই ফ্র্যান্সিস্-প্রবর্ত্তিত সন্ন্যাসীসঙ্ঘ প্রকৃত প্রস্তাবে সৃষ্টি হইল।

ফ্র্যান্‌সিসানুচর সন্ন্যাসিগণ এপর্য্যন্ত স্বাধীনভাবে ভগবদ্‌ প্রেমোন্মত্ত হইয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে অভিনব ধর্ম্মভাব প্রচার করিয়া বেড়াইলেও কোনরূপ তর্ক বিচার না করিয়া পূর্ব্ব কথিতভাবে পোপের অধীনতা স্বীকার করিয়া লইয়া ছিলেন। এই অধীনতা স্বীকারের ফলে তাঁহারা বর্ত্তমানে উপকৃত হইলেও ভবিষ্যতে প্রচলিত ধর্ম্মভাবের বিরুদ্ধাচরণ করা তাঁহাদের পক্ষে আর সম্ভবপর হয় নাই। পরে এই অক্ষমতা তাঁহাদের পক্ষে অতিশয় ক্লেশকর হইয়া উঠিয়াছিল এবং সন্ন্যাস গ্রহণের পর হইতে এই ঘটনার পূর্ব্বাবধি কেবল প্রথম কযেক বৎসরই যে তাঁহারা প্রকৃত ভাবে ধর্ম্ম পুস্তকের (Bible) উপদেশ অনুসরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন সে কথাও ইঁহারা পরে বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

পোপের আদেশ শ্রবণ করিয়া ফ্র্যান্‌সিস্‌ তাঁহার পদপ্রান্তে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন এবং সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। পোপ ও তাঁহাদের সকলকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলি-লেন "ভাই সকল! আমি তোমাদিগকে আনন্দিত মনে বিদায দিতেছি এবং জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছি তিনি তোমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন। পরমপিতা পরমেশ্বরের আদেশ অনুযায়ী তোমরা প্রত্যেক নর নারীর হৃদয়ে অনুষ্ঠিত পাপ কর্ম্মের জন্য অনুতাপ প্রবৃত্তি উত্তেজিত করিতে প্রয়াসী হও ইহাই আমার একান্ত ইচ্ছা। ভবিষ্যতে তোমাদের সংখ্যা ও কর্ম্মের প্রসার বৃদ্ধি পাইলে আমাকে যথাসময়ে সংবাদ দিতে ভুলিও না। কারণ তাহা হইলে আমি তোমাদের অভাব ও প্রার্থনাদি পূরণ করিয়া তোমাদের কার্য্যের সহায়তা করিতে পারিব।" ঈদৃশ শিষ্টাচরণ সত্ত্বেও ইঁহাদের উদ্দেশ্য ও ধর্ম্মবিশ্বাস সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিবার পূর্ব্বে তাঁহাদের সম্বন্ধে কোনরূপ মতামত প্রকাশ করা পোপের ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু রোমীয় ভাষা তাঁহাদের অতি সামান্যই জানা ছিল বলিয়া ফ্র্যান্‌সিস্‌ ও তদনুচরবর্গ তাহা বুঝিতে পারেন নাই। এখন হইতে ইঁহারা যে বন্ধনে শৃঙ্খলিত হইলেন ভাষা বৈচিত্র নিবন্ধন ইঁহারা প্রথমে তাহা বুঝিতে পারেন নাই। পোপের মন্ত্রীসভা কিন্তু ইঁহাদের প্রতিজ্ঞার উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন নাই। সেজন্য মন্ত্রীসভার একজন সভ্যকে ইঁহাদের মস্তক মুণ্ডন করাইবার জন্য প্রেরণ করা হইয়াছিল। এই অনুষ্ঠানে ইঁহারা স্পষ্টভাবে পোপের অধীনতা স্বীকার করিয়া লইলেন। এই স্বাধীনতা-

নাশের জন্য ইহাঁদের মধ্যে অনেককেই পরে চক্ষের জল ফেলিতে হইয়াছিল, এবং উহার পুনরুদ্ধারের জন্য পরে অনেককে প্রাণ পর্য্যন্তও বিসর্জ্জন করিতে হইয়াছিল।

ইউরোপীয় দর্শনের ইতিহাস।

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।]

গ্রীক দর্শন।

সক্রেটীক সম্প্রদায়।

সক্রেটীসের ন্যায় প্রতিভাসম্পন্ন দার্শনিক যে তাঁহার সমসাময়িক চিন্তাশীল লোকের উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়া তাহাদের মানসিক চিন্তার স্রোত নূতন পথে প্রবর্ত্তিত করিবেন ইহা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। যে কেহ তাঁহার সহিত যে কোন বিষয়ের তত্ত্বালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহারই ক্রিয়াকলাপ ও মতামতে সক্রেটীসের প্রভাব বেশ পরিলক্ষিত হয়।

ইতিহাসে দেখিতে পাই কোন দার্শনিক বিশেষের মতামত সুপ্রণালীতে যথাযথ লিপিবদ্ধ হইয়া সুরক্ষিত থাকিলেও সেই সকল মত পরবর্ত্তিকালে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে, এমন কি মতস্থাপয়িতার অভিপ্রেত অর্থের বিরুদ্ধ অর্থে, অনেক স্থলে গৃহীত হইয়াছে। সক্রেটীসের চিন্তার ফল যখন সেরূপ ভাবে সুরক্ষিত হয় নাই তখন পরবর্ত্তিকালে তাঁহার মত যে ভিন্ন ভিন্ন লোকে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে গ্রহণ করিবে ইহাতে আর বিচিত্র কি? আমরা দেখিয়াছি তিনি সকল প্রকার দার্শনিক চিন্তার এক নূতন সাধারণ প্রণালী উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের দার্শনিক তত্ত্বান্বেষু ব্যক্তিগণের ঐ পথ অবলম্বনে তত্তৎ বিষয়ের মূলতত্ত্বে পৌঁছিতে পারা সম্ভব, ইহাই মাত্র তিনি নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছিলেন। যথার্থ জ্ঞানলাভই মানব জীবনের চরম উদ্দেশ্য, সর্ব্বসাধারণের মঙ্গলাচরণই একমাত্র শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম—এই সকল তত্ত্ব তিনি প্রচার করিয়াছিলেন সত্য;—কিন্তু ঐ সত্য কোন্ পদার্থ, ঐ মঙ্গলের স্বরূপ কি প্রকার, এ সকল প্রশ্নের সুমীমাংসা তাঁহার নিকট হইতে পাওয়া যায়

নাই। তবে তিনি ইহা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিতেন যে তাঁহার উদ্ভাবিত পন্থা অবলম্বনে ঐ সকল প্রশ্নের সদুত্তর নিশ্চয় মিলিবে। সে যাহা হউক দেখিতে পাওয়া যায় তাঁহার দার্শনিক মত সমূহ যথাযথ লিপিবদ্ধ না থাকায় তাঁহার শিষ্য সম্প্রদায় ঐ সকল মত বিভিন্ন অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন।

সক্রেটীসের জীবনী পাঠে জানিতে পারা যায় ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি-বিশিষ্ট লোক সমূহ ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের তত্ত্বান্বেষণে তাঁহার নিকটে উপদেশ লাভ করিতে আসিয়া উপস্থিত হইত। জ্ঞানী কর্ম্মী, ত্যাগী সংসারী, ধনী নির্ধন পণ্ডিত মূর্খ সকলেই তাঁহার নিকট সমভাবে সমাদর লাভ করিত। ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার জিজ্ঞাস্য থাকিত এবং জিজ্ঞাসুব্যক্তি যে প্রসঙ্গ উত্থাপন করিত তিনি সেই বিষয়েই তাহার সাহত আলোচনায় ব্যাপৃত হইতেন। ঐ সকল ব্যক্তিদিগের ভিতর যাহারা নিজ নিজ ভ্রমপ্রমাদ বুঝিতে পারিয়া সক্রেটীসের মীমাংসা সংশয়রহিত চিত্তে গ্রহণ করিত তাহারাই তাঁহার শিষ্যশ্রেণী মধ্যে পরিগণিত হইত। ঐ শিষ্যবর্গের মধ্যে সমধিক প্রতিভাশালী শিষ্যগণই পরে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় স্থাপন করেন। অতএব নিজ নিজ সামর্থ্য অনুসারে তাঁহারা সক্রেটীসের "মত" যতটুকু আয়ত্তাধীন করিতে সক্ষম হইযাছিলেন ততটুকু মাত্রই পরিস্ফুট ও লিপিবদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইযাছিলেন। আবার ঐরূপ করিতে যাইযা তাঁহারা সক্রেটীসের পূর্ব্ববর্ত্তী দার্শনিকগণ তত্তৎবিষয়ে যে মতামত প্রকাশ করিয়া গিয়াছিলেন তাঁহার উল্লেখ না করিয়া অগ্রসর হইতে পারেন নাই। অনেকেই কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী দার্শনিকগণের মতের সহিত সক্রেটীস-প্রচারিত তত্ত্বের সামঞ্জস্য সাধন করিতে অগ্রসর হইয়া সক্রেটীসের মতামতের বিশেষত্বের প্রতি লক্ষ্য হারাইযা ফেলিয়াছিলেন। কারণ, যে সার্ব্বভৌমিক ভাব সক্রেটীসের বিশেষত্ব বলিয়া বুঝিতে পারা যায তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে সেই উদার ভাবটী কোথাও সর্ব্বাঙ্গীন লক্ষিত হয় না। দেখা যায তাঁহারা সকলেই অল্পবিস্তর একদেশদর্শী।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে সক্রেটীস বলিতেন সত্য লাভ ও সাধারণের মঙ্গল সাধনই মানব জীবনের উদ্দেশ্য। আবার তাঁহার মতে জ্ঞান ব্যতীত ঐরূপ মঙ্গল সাধন একেবারে অসম্ভব ; সুতরাং জ্ঞানের সহিত ঐ মঙ্গলের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। দেখা যায়, সত্য ও মঙ্গলের স্বরূপ নির্দ্ধারণ করিতে যাইয়াই তাঁহার শিষ্যগণ ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী হইয়া ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া

পড়েন। এক সম্প্রদায় ঐ মঙ্গলের কেবল মাত্র সর্ব্বপ্রকার উপাধি-রহিত নিরপেক্ষ ভাবটীর (abstract idea) প্রতি লক্ষ্য নিবদ্ধ রাখিয়া উহার তত্ত্ব-বিচারে প্রয়াসী হইয়াছিলেন, অপরে নিরপেক্ষ মঙ্গলের সত্ত্বা স্বীকার করিলেও বাস্তব কর্ম্ম জগতে উহার বিকাশ কিরূপে কতদূর হইতে পারে সেই তত্ত্ব অন্বেষণেই ব্যাপৃত হইয়াছিলেন ; অপর আর এক সম্প্রদায় আবার যাহা ইহ-জীবনে সুখপ্রদান করিতে সক্ষম তাহাই একমাত্র মঙ্গলজনক বলিয়া ঘোষণা করিয়া মঙ্গলের নিরপেক্ষ সত্ত্বার অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া উহার আপেক্ষিক (relative,) সত্ত্বামাত্রের তত্ত্বান্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং সক্রেটীসের শিষ্য সম্প্রদায়কে মোটামুটী তিনভাগে বিভক্ত করা চলে। যথাঃ—(Megorian school) মেগারা সম্প্রদায় (Cynic School) সিনিক সম্প্রদায় ও ((Cyreanic School) সিরিয়ানিক সম্প্রদায়।

সক্রেটীস-শিষ্যের মধ্যে জেনোফেনিসের (Xenophane) নাম প্রথমই উল্লেখযোগ্য। কিন্তু দার্শনিক হিসাবে তাঁহার কোন খ্যাতি নাই। তিনি তৎকৃত পুস্তকের (memorabilia) স্থানে স্থানে নিজ গুরুর মতামতের উল্লেখ মাত্র করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু গুরুপ্রদর্শিত নীতি-পথ অনু-সরণে ও তৎপ্রচারিত মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনে তৎকালে তাঁহার সমকক্ষ কেহ ছিলেন কি না সন্দেহ। তিনি চিন্তাশীল দার্শনিক ছিলেন না ; সুতরাং সক্রেটীসের দার্শনিক চিন্তার ফল সম্যক পরিস্ফুট করিতে সক্ষম হন নাই, কিন্তু তিনি নীতিজ্ঞানসম্পন্ন চরিত্রবান্ পুরুষ বলিয়া তৎকালে বিশেষ প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন এবং সক্রেটীসের কর্ম্মজীবনের ভাব কতক অংশে যে তাঁহাতে প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। যাহা হউক দার্শনিক বলিয়া তাঁহার প্রতিপত্তি না থাকায় আমরা তাঁহার বিষয় বিস্তারিত ভাবে লিপিবদ্ধ করিতে বিরত হইলাম।

মেগারা সম্প্রদায়।

ইউক্লিডস্ (Euclides)।

সক্রেটীসের মৃত্যুর পর রাজদণ্ড ভয়ে তাঁহার শিষ্যগণ এথেন্স পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রস্থান করেন। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ পরে আবার এথেন্সে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। এই সকল শিষ্যগণের মধ্যে

দার্শনিক হিসাবে (Euclides) ইউক্লিডসের নাম প্রথম উল্লেখযোগ্য। ইনি মেগারা নগরে আন্দাজ ৪৫০—৪৪০ খৃঃ পূঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। জ্যামিতিক শাস্ত্র প্রণেতা ইউক্লিড্স্ পৃথক ব্যক্তি, এটী এখানে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। এথেন্স ও মেগারা নগরবাসিদিগের মধ্যে শক্রতা থাকায় রাজাদেশে ঘোষিত হয় যে মেগারা নগরবাসী কেহ এথেন্সে প্রবেশ করিলে প্রাণ-দণ্ডে দণ্ডিত হইবে। এরূপ আদেশ স্বত্বেও (Euclides) ইউক্লিডস্ সক্রেটীসের প্রতি অত্যধিক অনুরাগবশতঃ সন্ধ্যার পর গোপনে ছদ্মবেশে এথেন্স প্রবেশপূর্ব্বক গুরু সমীপে উপস্থিত হইতেন এবং তাঁহার নিকটে উপদেশ লাভ করিয়া নিজেকে ধন্য জ্ঞান করিতেন। ইনি প্রথম জীবনে ইলিয়াটিক দর্শনে আকৃষ্ট হইয়া ঐ দর্শন বিশেষভাবে অধ্যয়ন করেন। সক্রেটীসের নিকট উপদেশ লাভের ফলে তিনি ইলিয়াটিক দর্শনের সিদ্ধান্ত সমূহের এক নূতন ব্যাখ্যা প্রদান করেন। সক্রেটীসের মৃত্যুর পর ইনি মেগারা নগরে এক সম্প্রদায় স্থাপন করেন এবং সেই সম্প্রদায়ই উপরোক্ত মেগারা সম্প্রদায় বলিয়া খ্যাত। ইঁহার তিরোভাবের পরে এই সম্প্রদায়ের দার্শনিকগণ কূট তর্কজালে প্রতিপক্ষকে বিধ্বস্ত করিতে প্রয়াস পাইতেন বলিয়া কথিত আছে। সম্প্রদায় স্থাপয়িতা (Euclides) ইউক্লিড্স কিন্তু সোফিষ্টদিগের ন্যায় ঐ প্রণালী স্বয়ং কখনও অবলম্বন করেন নাই।

ইন্দ্রিয় নিরপেক্ষ জাতিসামান্যের জ্ঞানকেই (concepts) একমাত্র সত্যজ্ঞান বলা যায়, সক্রেটীসের এই সিদ্ধান্ত ইউক্লিড্স দর্শনের মূলে বর্ত্তমান। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বস্তুর বাহ্যবিকাশ মাত্রই আমাদের জ্ঞানগম্য হয়। ঐ বাহ্য বিকাশ ঐ বস্তুর লক্ষণ বা আকৃতিগত পরিণাম বা পরিবর্ত্তন পরম্পরা মাত্র। কিন্তু ঐ পরিবর্ত্তনের অন্তরালে বস্তুর যে অপরিবর্ত্তনীয় বা অপরিণামী সত্তা বর্ত্তমান তাহা ইন্দ্রিয়ের জ্ঞানের বিষয় নহে। একমাত্র জাতিত্ব জ্ঞানই (conceptions) বস্তুর ঐ অপরিবর্ত্তনীয় স্বরূপটীকে প্রকাশ করিতে সক্ষম। এইরূপে বস্তুর যথার্থ স্বরূপ ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতির অন্তর্গত হইলেও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পরিবর্ত্তন ব্যতিরেকে কোন বস্তুই আমাদের নিকট প্রকাশিত হইতে পারে না। অতএব বস্তু সমূহের ঐরূপ পরিবর্ত্তন বা পরিণাম ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় হওয়ায় ঐ পরিণামকে এককালে মিথ্যা বলা যায় না। ইলিয়াটিক দর্শন ইতিপূর্ব্বে বস্তুর পরিণামকে এককালে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছিল এবং বস্তুর অপরিণামী যথার্থ

স্বরূপের জ্ঞান অসম্ভব বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিল। সক্রেটীস জাতি-সামান্যলব্ধ জ্ঞানকেই একমাত্র সত্য জ্ঞান বলিয়া সিদ্ধান্ত করায় (Euclides) ইউক্লিড্‌স যে ঐ উভয়ের সিদ্ধান্তকে একীভূত করিয়া পূর্ব্বোক্তরূপে গ্রহণ করিবেন ইহা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। এখন যদি বস্তুর অপরিণামী স্বরূপই অনুভূতির বিষয় হয় এবং তাহাই যদি বস্তুর যথার্থ সত্তা হয় তবে ঐ অপরিণামী সত্তা কিংস্বরূপ? দেখা যায় সক্রেটীস মঙ্গলকে সর্ব্বোচ্চ স্থান প্রদান করিয়াছিলেন। আবার তাঁহার মতে ঐ মঙ্গলের সহিত জ্ঞানের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, এবং ঐ মঙ্গল ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির নিকট ভিন্ন ভিন্ন নহে, অথবা, উহা একরূপ—"virtue is one"। সুতরাং ইউক্লিড্‌সের মতে ইলিয়াটীক দর্শনে অনির্দ্দেশ্য বলিয়া স্বীকৃত বস্তুর অপরিবর্ত্তনীয় সত্তার স্থান যে এই মঙ্গল (The good) পূরণ করিবে ইহা কিছুই অস্বাভাবিক নয়। সুতরাং ইউক্লিডস ঐ সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া প্রচার করিয়াছিলেন, যে "মঙ্গলই একমাত্র স্বাধীন অপরিণামী বস্তু সত্তা, উহাই একমাত্র সৎপদার্থ। এই সৎপদার্থই intelligence, reason or God জ্ঞান, বুদ্ধি, পরমাত্মাদি ভিন্ন ভিন্ন নামের একমাত্র লক্ষ্য। সক্রেটীসের মতে নৈতিক আদর্শ সকল মানবের পক্ষে এক হইলেও ব্যবহার ভেদে ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হয়। ইউক্লিড্‌স ও প্রচার করিয়াছিলেন (The good) মঙ্গলের স্বরূপ মূলে একরূপ হইলেও ব্যবহার কালে উহার ভেদ দৃষ্ট হয়। এই মঙ্গল এক অদ্বিতীয় সুতরাং অমঙ্গলের অস্তিত্ব অসম্ভব। আমরা জানি হিন্দুদর্শনে সৎবস্তু মঙ্গলস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ ও প্রেমস্বরূপ বলিয়া উক্ত হন। সুতরাং ইউক্লিড্‌সকে পূর্ব্বোক্ত-রূপে মঙ্গলস্বরূপ (The good) জ্ঞানস্বরূপ বা পরমাত্মার সিদ্ধান্ত করিতে দেখিয়া উভয় দর্শনের সাদৃশ্যের কথা ভাবিয়া আমরা বিস্মিত হই।

বিরুদ্ধবাদীর সিদ্ধান্তগুলির (conclusions) ভ্রমপ্রমাদ প্রদর্শন করিয়া সত্য নির্ণয়ের চেষ্টা করাই ইউক্লিড প্রবর্ত্তিত বাদের প্রণালী ছিল। তিনি সক্রেটীসের ন্যায় মূল প্রতিজ্ঞার (Premises) অন্তর্গত ভ্রমপ্রমাদ সংশোধন করিতে প্রয়াসী হইতেন না। উদাহরণ (analogy) সাহায্যে কোন বিষয় প্রমাণ করিতে চেষ্টা করা তিনি ন্যায় বিরুদ্ধ মনে করিতেন। এই উভয় বিষয়ে তদবলম্বিত বাদপ্রণালীর সহিত সক্রেটীসের বাদপ্রণালীর পার্থক্য দৃষ্ট হয়।

ইউক্লিডের মতে বস্তুর গুণ বা শক্তি বলিয়া যাহা অভিহিত হয় তাহা

প্রকাশকাল ব্যতীত অন্য সময়ে বর্ত্তমান থাকিতে পারে না; যথা—capacity does not exist beyond the time of its exercise. যাহা বর্ত্তমান তাহাই সত্য—what is actual is alone possible যাহা এক্ষণে বর্ত্তমান নহে বা যাহা হইবার সম্ভাবনা আছে তাহার অস্তিত্ব পূর্ব্বে বর্ত্তমান থাকা অসম্ভব। কারণ হইবার সম্ভাবনা বলিতে পরিবর্ত্তন বা পরিণাম বুঝায় এবং পরিণাম কখনই বস্তুর অপরিণামী স্বরূপে বিদ্যমান নাই।

গঙ্গাতীরে শঙ্কর।

(শ্রীমতী—)

অভিনব গুপ্তের মৃত্যুর পর আচার্য্যদেব অতিশীঘ্র নিরাময় হইলেন। শরীরে একটু বল পাইয়াই তিনি পুনরায় পদব্রজে পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করিলেন। গিরি ও পদ্মপাদের ইচ্ছা ছিল, আচার্য্যদেব আরও কিছুদিন এখানে বিশ্রাম করেন এবং শরীরে পূর্ব্বের ন্যায় বলাধান হইলে তবে যাত্রা করেন, কিন্তু একস্থানে অনেক দিন বিলম্ব করিলে অন্যান্য শিষ্য ও ভক্তগণের নানা প্রকার অসুবিধা হইতে পারে ভাবিয়া আচার্য্যদেব তাঁহাদের ইচ্ছা পূর্ণ করিলেন না। আচার্য্যকে পদব্রজে যাইতে উদ্যত দেখিয়া তাঁহার কয়েক জন ধনী শিষ্য শিবিকারোহণে গমন করিবার জন্য তাঁহাকে বিশেষ অনুরোধ করিতে লাগিলেন. কিন্তু 'সন্ন্যাসীর শিবিকারোহণ নিষিদ্ধ' বলিয়া তিনি তাহাতে অসম্মত হইলেন এবং সশিষ্যে ধীরে ধীরে পদব্রজেই গমন করিতে লাগিলেন।

দুর্ব্বল শরীর বলিয়া আচার্য্যদেব পূর্ব্বের ন্যায় দ্রুত গতিতে অগ্রসর হইতে পারিলেন না। পূর্ব্বে যে পথ তিনি একদিনে অতিক্রম করিতেন আজ কাল তাহা অতিক্রম করিতে তিন চারি দিন লাগিল। ইতিপূর্ব্বে শিষ্যগণ পথ চলিবার কালে পরস্পরে নানারূপ বিচার ও তর্ক করিতে করিতে উচ্চ কোলাহলে পথ চলিতেন এবং আচার্য্যদেবের উহা বিরক্তি-কর হইতে পারে ভাবিয়া তাঁহার একটু অগ্র পশ্চাৎ গমন করিতেন। এবারে তাঁহারা সকলে আচার্য্যদেবকে বেষ্টন করিয়া নিঃশব্দে গম্ভীর ভাবে চলিতে

লাগিলেন এবং পাছে আচার্য্যদেব তাঁহাদের দ্রুতগতি দেখিয়া দ্রুত গমনে উদ্যত হন, এই জন্য মধ্যে মধ্যে এক এক বার দাঁড়াইতে লাগিলেন। গিরি ও পদ্মপাদ চলিতে চলিতে কখন কখন আচার্য্যদেবকে অধিকতর মৃদুগমনে অনুরোধও করিতে লাগিলেন।

এইরূপে আচার্য্যদেব ক্রমে বঙ্গদেশের গঙ্গাতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; এবং বিশ্রাম করিবার অভিপ্রায়েই হউক, অথবা শোভা দেখিয়াই হউক, একটী বালুকাময় নির্জ্জন স্থান লক্ষ্য করিয়া তিনি অতীব মনোরম বলিয়া অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, পদ্মপাদ ঐ স্থানেই তাঁহার কিছু দিন থাকিবার সুব্যবস্থা করিতে লাগিলেন।

আচার্য্যদেব এস্থানে আসিয়া সর্ব্বদাই সমাধিমগ্ন হইয়া থাকিতেন। অধ্যাপনা বা উপদেশাদিতে বড় মনোযোগ দিতেন না, অথবা শিষ্যগণের সহিত বাক্যালাপও অধিক সময় করিতেন না। সমাধি ভিন্ন অন্য সময়েও মৌন ভাবেই অবস্থান করিতেন এবং গভীর নিশীথে প্রায়ই একাকী গঙ্গাতীরে বালুকাপরি উপবিষ্ট থাকিতেন। পদ্মপাদ প্রভৃতি তাঁহার এইরূপ ভাব দেখিয়া কিছু বিস্মিত হইলেন, কিন্তু কোনও কারণ নির্ণয় করিতে পারিলেন না। আচার্য্যদেবকে দর্শন করিবার জন্য এসময় যে সকল ব্যক্তি আগমন করিতেন, পদ্মপাদ সুরেশ্বর প্রভৃতি শিষ্যগণই উপদেশাদি দিয়া তাঁহাদের যথোচিত সৎকার করিতেন। এইরূপে কয়েক দিন অতিবাহিত হইল।

এক দিন আচার্য্যদেব সন্ধ্যাকালে পূর্ব্বোক্তরূপে গঙ্গাতীরে একাকী উপবিষ্ট আছেন। শিষ্যবৃন্দ জাহ্নবীতীরে আসিয়া সায়ংকৃত্য সমাপন করিয়া একে একে প্রস্থান করিয়াছেন।

নিশীথের নির্জ্জনতায় গঙ্গাতীর আচ্ছন্ন হইল। নিশাচর প্রাণীগণও ক্রমে নীরব হইল। কেবল বিশ্বপ্রকৃতি হইতে উত্থিত নাদধ্বনি এখন সাধকের প্রণবজপের সহায় হইবার জন্যই যেন ক্রমে স্ফুটতর হইয়া উঠিল। আচার্য্যদেব সমাধিমগ্ন হইবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় সহসা তাঁহার মানস নয়নে এক অপূর্ব্ব জ্যোতি আবির্ভূত হইল। সমাধির পথে জ্যোতি দর্শন বিঘ্ন জানিয়া আচার্য্যদেব সে জ্যোতিকেও ব্রহ্মদৃষ্টিতে আত্মমধ্যে বিলীন করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্য এ জ্যোতি ক্রমেই যেন স্বতন্ত্রতা অবলম্বন

করিতে লাগিল, ক্রমেই যেন বর্দ্ধিত হইয়া এক অদৃষ্টপূর্ব্ব পুরুষে পরিণত হইল। এবার আর আচার্য্যদেব উদাসীন থাকিতে পারিলেন না; তিনি তাহাতে আর ব্রহ্মভাবনা না করিয়া তাহার গতিবিধি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন এবং দেখিলেন এপুরুষ যেন কোন এক যোগী বিশেষ, তাঁহাকে কিছু বলিবার জন্যই যেন তাঁহার অভিমুখে আসিতেছেন। তিনি তখন কৌতুহলের বশবর্ত্তী হইয়া নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখিলেন, সত্যসত্যই একটী জ্যোতির্ম্ময় দেহধারী পুরুষ তাঁহার সম্মুখে অবস্থান করিতেছেন!

আচার্য্যদেবের দেবদর্শন এই প্রথম নহে সুতরাং ঐরূপ দেখিয়া ভীত বা বিস্মিত হইলেন না। কেবল মনে মনে এই আলোচনা করিতে লাগিলেন যে, এই দিব্যদেহধারী কে? কেনই বা আমার নিকট আসিতেছেন?

আচার্য্যদেব দেখিলেন—যোগীবরের মুখমণ্ডল প্রফুল্ল, তাম্রবর্ণ শ্মশ্রু আবক্ষবিলম্বিত, মস্তকের নিবিড় জটাভার পৃষ্ঠদেশ আচ্ছন্ন করিয়া বক্ষোপরি পতিত, গৌরকান্তি, ললাটে ভস্ম ও ত্রিপুণ্ড্র রেখা, বাম হস্তে কমণ্ডলু, দক্ষিণ হস্তে জপ মালা, গলদেশে রুদ্রাক্ষ মালা, বাহুতে রুদ্রাক্ষবলয় এবং পরিধানে গৈরিক বসন। ভাবিলেন—ব্যাস তনয় পরম যোগী শ্রীশুকদেব কি তাঁহাকে সাক্ষাৎ দর্শন দিয়া চরিতার্থ করিতে আসিয়াছেন?

আচার্য্যদেব আসন ত্যাগ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং করজোড়ে মস্তক অবনত করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে প্রণিপাত করিলেন। যোগীবর প্রত্যুত্তরে দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিয়া আচার্য্যদেবকে নীরবে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

আচার্য্যদেব তখন নিজ আসন প্রদর্শন করাইয়া তাঁহাকে তদুপরি উপবেশন করিতে অনুরোধ করিলেন। যোগীবর উপবেশন করিলে আচার্য্যদেব অতি বিনীত ভাবে স্বয়ং বালুকোপরি উপবিষ্ট হইলেন। যোগীবর কহিলেন "বৎস শঙ্কর, তোমার সর্ব্বাঙ্গীন কুশল ত? গোবিন্দ পাদের শুশ্রূষা করিয়া তাঁহার নিকট হইতে ব্রহ্ম বিদ্যা লাভ করিতে পারিয়াছ ত?"

যোগীবরের ঐরূপ সম্ভাষণ ও প্রশ্নে তাঁহাকে চিনিতে আচার্য্যদেবের আর বাকি রহিল না। গুরু গোবিন্দপাদের নিকটে তাঁহার পরম গুরু গৌড়পাদের কথা তিনি অনেক বার শুনিয়াছিলেন; তিনিই এখন আমার সম্মুখে—ইঁহারই দর্শন লাভ করিবার জন্য এক সময়ে আমার হৃদয়ে বলবতী ইচ্ছা হইয়াছিল—ভগবৎ কৃপায় আজ পরম গুরুর শ্রীপাদ-

পদ্ম দর্শন করিয়া ধন্য হইলাম," এইরূপ ভাবিয়া আচার্য্যদেবের হৃদয়ে ভক্তির উৎস ছুটিল। তিনি পুনরায় দণ্ডায়মান হইয়া নিজ পরম গুরুর উদ্দেশে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। তাঁহার নয়নে অশ্রুধারা বহিতে লাগিল এবং মস্তক যেন সেই শ্রীপাদপদ্মে লুণ্ঠিত হইয়াই থাকিতে চাহিল। গৌড়পাদ সস্নেহে আচার্য্যের হস্তধারণ করিয়া ভূতল হইতে উঠাইলেন এবং অতি নিকটে নিজের সম্মুখে তাঁহাকে বসাইলেন। বসিয়াও আচার্য্যের সে ভক্তি-বিহ্বল ভাব সম্যক অপনীত হইল না। ভক্তির আবেগে তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া রহিল। মহামুনি গৌড়পাদ তাঁহার এতাদৃশ ভাব দেখিয়া যার পর নাই প্রীত হইলেন এবং পুনরায় আচার্য্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "বৎস, আমি তোমার প্রতি বড়ই প্রসন্ন হইয়াছি। বল বৎস, তোমার কিছু প্রার্থনা আছে কি না?"

আচার্য্যদেব ভক্তি গদ্‌গদ কণ্ঠে অত্যন্ত বিনয় সহকারে কহিলেন "ভগবন্, আজ আমার নয়ন সার্থক হইল, আমি আজ ধন্য হইলাম; আজ যখন আমি ভগবান্ গৌড়পাদের চরণ দর্শনে সক্ষম হইয়াছি, তখন আর আমার প্রার্থনীয় কিছুই নাই। ভগবন্, আপনাকে বার বার নমস্কার করি।"

দূরদেশাগত কৃতী সন্তানের দর্শনে এবং তাহার ভক্তিপূর্ণ ব্যবহারে পিতার হৃদয় যেমন স্নেহরসে গলিয়া যায় আজ গৌড়পাদেরও তদ্রূপ অবস্থা। যে ব্রহ্মবিদ্যা পুনরুদ্ধারের মানসে তিনি ভগবৎ সমীপে অবতার-কল্প শক্তি সম্পন্ন সৎশিষ্যের জন্য প্রার্থনা করিয়া পূর্ব্বে বহুদিন স্থূলশরীরে অপেক্ষা করিয়াছিলেন এবং পরিশেষে নিজ শিষ্য গোবিন্দ পাদকে যাঁহার আগমনের অপেক্ষায় থাকিতে বলিয়া নশ্বর স্থূল শরীর পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, আজ সেই শঙ্করাবতার শঙ্করাচার্য্যকে দর্শন করিয়া এবং তাঁহার এতাদৃশ ভক্তিপূর্ণ ব্যবহারে তিনি আনন্দে আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। তিনি আচার্য্যকে বলিলেন—"বৎস শঙ্কর! শিবাবতার শঙ্করাচার্য্যকে দর্শন করিয়া আমিও আজ ধন্য হইলাম। বৎস আমারও নয়ন সার্থক হইল। তুমি আমার প্রিয়তম শিষ্য গোবিন্দ নাথের প্রাণাধিক শিষ্য, সুতরাং তুমি আমার প্রিয় হইতে প্রিয়তর। বৎস! তোমার অলৌকিক ক্ষমতা, দিগন্তব্যাপী যশোরাশি, অতুলনীয় পাণ্ডিত্য, দেবতাকল্প চরিত্র আমাকে যেন বিমুগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে। তাই বৎস! তোমাকে একবার দেখিবার জন্য আমি তোমার নিকট আসিলাম। বল বৎস! তোমার কোন প্রার্থনীয় আছে কিনা।"

মহাযোগী গৌড়পাদের মুখে স্বীয় প্রশংসা বাক্য শুনিয়া আচার্য্যদেব সঙ্কুচিত হইলেন এবং মস্তক অবনত করিয়া মৌনভাবে রহিলেন। তাঁহার এই ভাব দেখিয়া গৌড়পাদ পুনরায় কহিতে লাগিলেন "প্রিয়তম! এক্ষণে তোমার সংবাদ কি? বল তোমার সাধনার কোন বিঘ্ন নাই ত? গোবিন্দনাথের হৃদয়নিহিত সমুদায় বিদ্যা তোমার হৃদয়গত হইয়াছে ত? হৃদয়ে অপার আনন্দ এবং শান্তিলাভ করিয়াছ ত? তুমি অষ্টাঙ্গযোগে পারদর্শী হইয়া কাম ক্রোধাদি রিপু সকলকে সমূলে নিপাত করিতে সক্ষম হইয়াছ ত? তুমি ব্রহ্মবিদ্যা প্রচারের জন্য অনুগত শিষ্য সমূহ প্রাপ্ত হইযাছ ত? বল বৎস! আমার নিকট তোমার কিছু প্রার্থনীয় বা জ্ঞাতব্য আছে কি না? তোমাকে আমার অদেয় কিছুই নাই।"

গৌড়পাদের এরূপ সদয় বাক্যে আচার্য্যদেবের হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইল। তিনি বিনীত শান্তভাবে বলিলেন "ভগবন্, গুরুকৃপাই এদাসের একমাত্র প্রার্থনীয়; পরম গুরুদেবকে যখন এতাদৃশ প্রসন্ন দেখিলাম, তখন আর এ দাসের অপর কি প্রার্থনীয় থাকিতে পারে?"

আচার্য্যের কথায় গৌড়পাদ আরও প্রীত হইলেন। তিনি বুঝিলেন তাঁহার শিষ্যের চিত্ত সদাই ব্রহ্মতত্ত্বে নিমগ্ন; সুতরাং অজ্ঞানীর মত তিনি অপর কি আর চাহিবেন?

অনন্তর ভগবান গৌড়পাদ আচার্য্যের ব্রহ্মবিদ্যা কতদূর দৃঢ় হইয়াছে জানিবার জন্য আচার্য্যকে বলিলেন "বৎস! তুমি কি আমার মাণ্ডুক্য-কারিকা দেখিয়াছ? তোমার মুখে উহার একটু ব্যাখ্যা শুনিতে ইচ্ছা হইযাছে।"

গৌড়পাদের অভিপ্রায বুঝিয়া আচার্য্যদেব বিনীতভাবে বলিলেন "ভগবন ইতিপূর্ব্বে এ দাস উহার একটী ভাষ্য রচনা করিতে সাহসী হইয়াছিল। যদি অনুমতি করেন তাহা হইলে উহার কোন স্থান হইতে কিঞ্চিৎ আবৃত্তি করি।"

তাঁহার কথা শুনিয়া যোগীবর একটু বিস্মিত হইলেন এবং নিজকৃত মাণ্ডুক্যকারিকার কয়েকটী প্রধান প্রধান স্থল ব্যাখ্যা করিতে বলিলেন। আচার্য্যদেব শ্রুতিধর ছিলেন। তিনি উক্ত স্থলের যে ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন তাহা যথাযথ আবৃত্তি করিলেন এবং ক্রমে কারিকার প্রায় সমুদায় ভাষ্যই গৌড়পাদকে যথাযথ শুনাইলেন।

গৌড়পাদ নিজ কারিকার ভাষ্য শুনিয়া অতীব সন্তুষ্ট হইয়া সাহ্লাদে বলিলেন, "বৎস শঙ্কর! তুমি যথার্থই শঙ্করের অবতার! শঙ্করাবতার বলিয়া ত্রিজগতে পরিচিত হইবার যথার্থই তুমি যোগ্য! জ্ঞানগুরু স্বয়ং শঙ্কর ভিন্ন এরূপ নির্ম্মল ভাষ্য লিখিতে আর কাহার সাধ্য আছে? ধন্য তোমার পাণ্ডিত্য, ধন্য তোমার বিচক্ষণতা, ধন্য তোমার সূক্ষ্মদৃষ্টি! তুমি আমার কারিকার অত্যন্ত গুহ্য আশয় পর্য্যন্ত প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছ! বৎস! আমি তোমার উপর সাতিশয় প্রীত হইয়াছি। তোমাকে বর প্রদান করিবার জন্য আমার হৃদয় অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছে, তুমি শীঘ্র বর গ্রহণ কর। তোমার গুরু দর্শন সফল হউক।"

আচার্য্যদেব অত্যন্ত বিনীতভাবে কহিলেন "ভগবন্, আপনাকে দর্শন করিয়াই আমি চরিতার্থতা লাভ করিয়াছি। আমি আর অন্য কি বর প্রার্থনা করিব? তথাপি আপনার সন্তুষ্টির জন্য আমি এই বর প্রার্থনা করিতেছি যে আমার চিত্ত যেন নিয়ত সেই অদ্বয় চিন্ময় সত্যস্বরূপ ব্রহ্মতত্ত্বে বিলীন থাকে। ইহা ভিন্ন আমার মনে অন্য প্রার্থনাও যেন কখন উদিত না হয়।"

আচার্য্যের প্রার্থনা শুনিয়া গৌড়পাদ ঈষদ্ হাস্য করিয়া বলিলেন "বৎস! তুমি তোমার যোগ্য প্রার্থনাই করিয়াছ। আমি আশীর্ব্বাদ করি তোমার যেন তাহাই হয়।"

এই বলিয়া তিনি আচার্য্যের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন, এবং আচার্য্য যেমন তাঁহাকে প্রণিপাত করিলেন অমনি অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

গৌড়পাদাচার্য্যের অন্তর্ধানের পরেও আচার্য্যদেব কিয়ৎক্ষণ তথায় বসিয়া রহিলেন। তিনি তাঁহার পরম গুরুদেবের মহিমা স্মরণ করিতে করিতে অপূর্ব্ব ভাবে বিভোর হইয়া রহিলেন। সেইরূপ, সেই বেশ, সেই সস্নেহ ভাব, সেই যোগসিদ্ধি তাঁহার চিত্ত পটে পুনঃ পুনঃ উদিত হইয়া তাঁহাকে অপূর্ব্ব আনন্দে সমাহিত করিয়া ফেলিল।

রাত্রি গভীর হইল তথাপি আচার্য্যদেব ফিরিতেছেন না দেখিয়া পদ্মপাদ প্রভৃতির চিত্ত চঞ্চল হইল। তাঁহারা আর অপেক্ষা করিতে না পারিয়া নিঃশব্দে আচার্য্য সমীপে উপস্থিত হইলেন; অভিপ্রায়, তাঁহাকে কিঞ্চিৎ দুগ্ধপান করাইয়া শয়ন করিতে অনুরোধ করিবেন। কারণ তাঁহার দুর্ব্বল শরীরে আবার যদি কোন পীড়া উপস্থিত হয়।

তাঁহারা তথায় কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া আচার্য্যদেবের সমাধিভঙ্গের কোন লক্ষণ না দেখিয়া আশঙ্কিত হইলেন। অনন্তর পরস্পর পরামর্শ স্থির করিয়া পদ্মপাদ আচার্য্যদেবের শ্রীঅঙ্গ স্পর্শ করিলেন। পদ্মপাদের স্পর্শে ও প্রেমাহ্বানে আচার্য্যের সমাধি ভঙ্গ হইল।

তিনি নয়ন উন্মীলন করিয়া পদ্মপাদ ও গিরিকে সম্মুখে দেখিয়া বসিতে ইঙ্গিত করিলেন।

অনন্তর আচার্য্যদেব সস্মিতবদনে পদ্মপাদকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "বৎস পদ্মপাদ! আজ এক অপূর্ব্ব কথা শুন। ভগবান্ গৌড়পাদ আজ আমায় দর্শন দিয়াছেন! আমার অনেক দিনের বাসনা আজ পূর্ণ হইয়াছে। রাত্রি অধিক হইযাছে এক্ষণে চল,কল্য তোমাদের সবিস্তারে ঐ বিষয় বলিব।"

এই বলিয়া আচার্য্যদেব পদ্মপাদের হস্তধারণ করিয়া গঙ্গাতীর ত্যাগ করিলেন। পরদিন আচার্য্যদেব পদ্মপাদ, সুরেশ্বর, গিরি, হস্তামলক প্রভৃতি শিষ্যগণের নিকট ভগবান্ গৌড়পাদের কৃপা ও দর্শনের কথা সবিস্তারে বলিলেন। শুনিয়া সকলে বিস্মিত ও আনন্দিত হইয়া হৃদয়ে অপূর্ব্ব প্রীতি অনুভব করিতে লাগিলেন।

এখানে কয়েক দিন এইভাবে বাস করিবার পর একদিন গৌড় দেশীয় কয়েকজন বিখ্যাত পণ্ডিত আচার্য্যকে দর্শন করিতে আসিলেন। তাঁহারা আচার্য্যের সহিত শাস্ত্রালাপ করিয়া অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিলেন। কথাপ্রসঙ্গে ইঁহাদের মধ্যে একজন বলিলেন "ভগবন্ শুনিযাছি, কাশ্মীরে শারদাপীঠে যে সকল পণ্ডিতমণ্ডলী বাস করেন তাঁহারা বাদে অপরাজেয়। স্বয়ং শারদা দেবী তাঁহাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন। যদি কেহ তাঁহাদিগকে পরাজিত করিতে পারেন, তাহা হইলে স্বয়ং শারদাদেবী তাঁহাকে 'সর্ব্বজ্ঞ' উপাধি প্রদান করিয়া থাকেন। আপনি যদি তথাকার পণ্ডিতগণকে পরাজিত করিতে পারেন তাহা হইলে ব্রহ্মবিদ্যা প্রচারে জগতে কেহ আর কোনও বাধা আপনাকে প্রদান করিতে পারিবে না। শুনিয়াছি তথাকার শারদাকুণ্ডের জল পান করিলে অতি মূর্খও সর্ব্বজ্ঞত্ব লাভ করিয়া থাকে। ইচ্ছা হয়, আপনি একবার তথায় গমন করেন।"

আচার্য্যদেব ঐ কথা শুনিয়া তখনি কোনও কথা না বলিলেও, ভারতে ব্রহ্মবিদ্যা দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য পরিণামে কাশ্মীরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

শ্রীমতী—

পূজা-ফুল।

হৃদয়ে দিয়াছ আঁকি   জীবনে মরণে দেবি
অমৃত সে কথা—
নিবেদিতা, ভগবৎ-   পাদপদ্মে চিরতরে
তুমি নিবেদিতা।
প্রেম, পবিত্রতা দিয়ে   সাধনার ছবি খানি
গড়েছিল বিধি।
রত্নাকর-হৃদয়েতে   মিলাইয়া গেল সে যে
অতলের নিধি!
সেফালি তাঁহারি তরে   ফুটেছিল তরুপরে
চরণে অর্পিতা,—
নিবেদিতা, ভগবৎ-   পাদপদ্মে চিরতরে
তুমি নিবেদিতা!

রয়েছে হৃদয়ে আঁকা   তোমার সে ছবি খানি
চির প্রেমময়ী,
তপস্যা শরীর ধরে'   এসেছিলে ধরাপরে,
তপস্বিনি অয়ি!
কি যে সে সরল হাসি   স্বর্গের অমৃত রাশি
সে কি ভুলিবার!
ভালবাসা দিয়ে গড়া   কি যে সে প্রতিমা খানি
চিন্ময়ি, তোমার!
স্বর্গের সে প্রীতি রাশি,   সেই দৃষ্টি সেই হাসি
আনন্দ-নির্ঝর।
দেহের আধার ছাড়ি   আজিকে মিশিয়া আছে
ভরি চরাচর!
নিষ্ঠা মূর্ত্তিমতী হয়ে   এসেছিলে দীক্ষা লয়ে
সার্থক সাধনা!
গুরু-পাদপদ্ম-তলে   একেবারে মিশাইলে
গুরু-গত-প্রাণা!

নয়নে যে অশ্রু বয় নহে এতো শোকে নয়,
শোক কি সে আর ?
বাহির ছাড়িয়া আজ তোমারে পেয়েছি দেবি
অন্তর মাঝার !

গগনে বারিদ-থরে যে বিদ্যুৎ আলো করে
নিমেষে লুকায়,
জড় নয়নের আগে নিরঞ্জন জ্যোতি কভু
প্রকাশ কি পায় ?

ভালবাসা মূর্ত্তি ধরে নাহি রহে চির তরে
প্রাণের সে ধন !
অরূপা, তোমার রূপে আজিকে ভরিয়া গেছে
নিখিল ভুবন !

আজি যে তোমার তরে নয়ন সলিলে ভরে
তাই যেন বয়।
আজি যে তোমার তরে পাষাণ গলিয়া ঝরে
হোক্ সে অক্ষয় !

তোমার চরণ ধুলি তাই আজ লয়ে তুলি
মাখি সব গায়,
প্রাণে লয়ে দিবানিশি পূজা করি, ভালবাসি
—প্রাণ যাহা যায়।

ত্যাগ মন্ত্রে দীক্ষা লয়ে, তুমি যে ঠেলিলে বাধা
—সমাজ সংসার,
শ্রীগুরু চরণাশ্রিতা ! সর্ব্বাশ্রয় ছেড়ে এলে—
গৃহ, পরিবার !

রাখি তব পদতলে সেই মন্ত্রে দাও দীক্ষা
অয়ি সন্ন্যাসিনি,
নিখিল-কল্যাণ তরে ব্রতী কর স্বার্থপরে,
কল্যাণ-রূপিণি !

জপমন্ত্র করে লয়ে　　জপেছিলে দিবানিশি
ভারত, ভারত!
যাচিয়া লইয়াছিলে　　প্রভুর চরণ তলে,
তোমার সে ব্রত!
পুণ্যব্রতে, গুরুব্রতে,　　ব্রত আজ হল পূর্ণ
পূর্ণ-মনোরথ!
ভারতে মিশাযে গেছ　　পেয়েছ প্রাণের মাঝে
তোমার ভারত!
শিষ্যা তব পদপ্রান্তে,　　সেই ব্রতে ব্রতী কর
ভালে দিয়া টিকা,
আত্মদানে, বিশ্বপ্রেমে　　জ্বাল চিত্তে চিরদীপ্তি
হোমানল শিখা!
এ আধারে কর আলো　　এস সাধনার পথে
দীপ-স্বরূপিণি!
সংসার-সমর মাঝে　　এস গো অপরাজিতা
চির-বিজয়িনি!
এস ত্যাগ, এস প্রীতি,　　এস পুণ্যময়ী স্মৃতি
চিত্তে বিজড়িতা।
এস পূর্ণ-তান বীণা!　　রামকৃষ্ণপদে লীনা
চির নিবেদিতা!

জনৈকা ছাত্রী।

স্ত্রীশিক্ষা-সমস্যা।

স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারকল্পে স্বামী বিবেকানন্দের একটী প্রধান অবলম্বন ছিলেন সিষ্টার নিবেদিতা। অক্ষয় উদ্যমের প্রতিমা তাঁহার সেই পূতমূর্ত্তি আজ অকস্মাৎ কর্ম্মমঞ্চ হইতে অপসারিত হওয়ায়, স্ত্রীশিক্ষাসমস্যা যেন নবীন প্রভাবে আমাদের চিত্তক্ষেত্র অধিকার করিতেছে। কে বলিতে পারে, মহাপ্রয়াণকালে তাঁহার শিক্ষাব্রতৈকনিষ্ঠ হৃদয়ের করুণ উদ্বেগ অন-

ক্ষিত স্পন্দনে এই জটিল সমস্যাকে আমাদের হৃদয়াভ্যন্তরালে ঐরূপে জাগাইয়া গিয়াছে কি না?

বর্তমান শিক্ষাসমস্যায় মীমাংসার বিষয় প্রধানতঃ দুইটী :—কি শিখাইতে হইবে, এবং কে শিখাইবে। কি শিখাইতে হইবে, এ প্রশ্নের স্থূলভাবে একটা উত্তর দেওয়া খুবই সহজ। বিদ্যার ভিন্ন ভিন্ন প্রচলিত বিভাগ যে অধুনা সর্ব্বদেশেই শিক্ষণীয় বিষয়, এ কথা সকলেই জানেন। কিন্তু 'কি শিখাইতে হইবে' এ প্রশ্নের এরূপ অর্থ এখানে অভিপ্রেত নহে।

কি শিখাইতে হইবে বলিতে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যকেই লক্ষ্য করিয়াছি। শিক্ষা শিক্ষার্থীকে কি শিখাইবে, তাহা মোটামুটি এক কথায় বলা যায়। কারণ, শিক্ষাদানের একটা অভীপ্সিত ফল সব দেশেই নির্ণয় করা থাকে। কি শিখাইতে হইবে, এ প্রশ্নের উত্তর এক একটা দেশ বা সমাজ, এক এক রকমে দিয়াছে ও দিতেছে। প্রত্যেক দেশ বা সমাজের এক একটা 'জাতীয়' বা সার্ব্বজনীন লক্ষ্য আছে। এই লক্ষ্য অবলম্বনে সেই দেশ বা সমাজটী গড়িয়া উঠিয়াছে। প্রত্যেক দেশে ব্যক্তিগত জীবনকে ঐ জাতীয় লক্ষ্য সাধনের যথাসম্ভব অনুকূল ও সহায়ক করাই তদ্দেশপ্রচলিত শিক্ষার উদ্দেশ্য। মনে কর, যেরূপেই হউক রাজনীতিক একতার দ্বারা ঐহিক প্রতিপত্তিলাভই একটা দেশের জাতীয় লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে; ইহার ফলে, সেই দেশে এমন শিক্ষা প্রচলিত হইবেই হইবে যদ্দ্বারা সেখানকার লোক রাজনীতির সূত্র ভাঁজিয়া অতি সহজেই ঐহিক উন্নতির পথ দেখিয়া লইতে পারিবে।

তবেই বুঝা যাইতেছে যে, আমাদের দেশে কি শিখাইতে হইবে, এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলেই প্রথমে দেখিতে হইবে, আমাদের জাতীয় লক্ষ্য কি। আমাদের দেশেও যে একটা সনাতন, সার্ব্বজনীন লক্ষ্য রহিয়াছে এ বিষয় কোনও সংশয় হইতে পারে না। যে শুভ ঘটনায় আমাদের জাতীয় জীবনের সূত্রপাত, অতীতে যতদূর দৃষ্টি যায় চাহিয়া দেখ, উহা আর কিছুই নয়,—ব্রহ্মোপলব্ধি। আমাদের আদিম সমাজস্রষ্টারা ঐ উপলব্ধিকেই পরমার্থ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন; অন্য সর্ব্ববিধ অর্থ বা কাম্য বিষয়ের চরম সার্থকতা এই পরমার্থলাভে। এই পরমার্থের অনুশীলন হইতেই আমরা ভাষা, সমাজ, সাহিত্য, বিজ্ঞানাদি সমস্ত পাইয়াছিলাম। আবার যাহা কিছু মনুষ্যোচিত সম্ভোগার্থে পাইয়াছিলাম, সে সকলই ঐ

পরমার্থের অনুশীলনে পর্য্যবসিত হইত। পরমার্থের অনুশীলনই একাধারে আমাদের জাতীয় জীবনের উৎস ও লক্ষ্য।

কথাটি সত্য হইলে, আমাদের দেশে প্রকৃত শিক্ষার গতি কিরূপ হওয়া উচিত তাহা নির্ণয় করা শক্ত নয়। যে শিক্ষার দ্বারা সংসারের সকল ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীর জীবনকে পরমার্থানুশীলনের সম্পূর্ণ অনুকূল করা যায়, সেই শিক্ষাই আমাদের দেশের প্রকৃত শিক্ষা।

এখন বুঝিয়া দেখিতে হইবে কিরূপ শিক্ষার দ্বারা সংসার-সুলভ সর্ব্ববিধ কর্ম্মের মধ্যে পরমার্থানুশীলন করিবার যোগ্যতা শিক্ষার্থী সুনিশ্চিতরূপে লাভ করিতে পারে।

দেহ ধারণ করিয়া মানুষ আপনাকে দুই প্রকার আবেষ্টনের মধ্যে নিহিত দেখিতে পায়; একটী পঞ্চভূতের ও অপরটী জীব-রাজ্যের। জীব ও পঞ্চভূতের সহিত যোগাযোগই তাহার জীবনের সর্ব্বব্যাপক ভিত্তি। এই যোগাযোগকে এক কথায় ব্যবহার বলা যায়। অতএব সম্যক্ ব্যবহারই শিক্ষার আশু লক্ষ্য; অর্থাৎ, পরমার্থপর ব্যবহার শিখাইবার জন্যই আমাদের দেশে শিক্ষার প্রচলন হইয়াছিল এবং এখনও হওয়া আবশ্যক।

প্রশ্ন হইতে পারে,পাশ্চাত্য শিক্ষানুমোদিত ব্যবহার কি পরমার্থপর নহে? বুঝিয়া দেখ, জড়পদার্থ ও জীবজগতের সহিত কিরূপ ব্যবহার পাশ্চাত্য-শিক্ষায় অভিপ্রেত। মানুষে মানুষে যে ব্যবহার বা যোগাযোগ উপস্থিত হয়, পাশ্চাত্যমতে তাহার সম্বন্ধসূত্র sense of right বা স্বাধিকারবোধ। পাশ্চাত্য জগতে সমাজনীতি, রাজনীতি, চারিত্রনীতি, ব্যবহারশাস্ত্রাদি সমস্তই মানুষের প্রতি মানুষের অধিকার নির্ণয় করিতেই ব্যস্ত। আমার বা তোমার অপরের কাছে কি প্রাপ্য, অপরের উপর কি দাবী, ইহার নির্ণয় করাই স্বাধিকারতত্ত্বের তাৎপর্য্য। কি সামাজিক, কি রাজনীতিক, কি গার্হস্থ্য সকল প্রকার সম্বন্ধের বিচারই এই পাওনা-গণ্ডা, দাবী-দাওয়া রূপ হিসাবের উপর প্রতিষ্ঠিত। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হইলে এইরূপ হিসাবের ভাবটী হাড়ে হাড়ে প্রবেশ করে, তাই আমাদের দেশে আধুনিক সর্ব্ববিধ সংস্কারান্দোলনে পাশ্চাত্যশিক্ষায় সুশিক্ষিত সংস্কারকগণ অধিকার-নির্ণয়কেই মূলসূত্ররূপে অবলম্বন করিতেছেন। তাঁহাদের ধুয়া এই যে, "যাহার যাহা অধিকার কেন সে তাহা পাইবে না।"

মানুষে মানুষে যে যোগাযোগ বা আদানপ্রদান, তন্মধ্যে আদানের উপর

বেশী ঝোঁক দেওয়াই স্বাধিকারনীতির তাৎপর্য্য; ইহার ফলে ভেদকেই সত্য ও নিত্যরূপে মানবসমাজে আসন দেওয়া হয়। কিন্তু মানুষকে অভেদের দিকে লইয়া যাওয়াই পরমার্থপরতার অবশ্যম্ভাবি ফল। অতএব স্বাধিকার-নীতির সহিত পরমার্থপরতা কোনমতেই খাপ খায় না। সেই জন্য দেখিতে পাই, পাশ্চাত্য রাজনীতিক্ষেত্রে বা সমাজে ধর্ম্মভাবকে প্রতিষ্ঠিত করা কত কঠিন। পাশ্চত্য জীবনপটে প্রেমের অভেদভাবরূপ রং ধরাইবার চার্চ্চ-কৃত শত চেষ্টা তাই যুগে যুগে বিফল হইয়া যাইতেছে।

কিন্তু জীবে জীবে ব্যবহারিক আদানপ্রদানে যদি আদানের উপর বেশী ঝোঁক না দিয়া প্রদানের উপর বেশী ঝোঁক দেওয়া যায়, তবে ফল অন্যরূপ দাঁড়ায়। একজনের উপর আর একজনের কি দাবী তাহার হিসাব না করিয়া যদি একজনের প্রতি আর একজনের কি দেয় সেই হিসাবের উপর নির্ভর করিয়া সর্ব্ববিধ সম্বন্ধ নির্ণয় করা হয়, তবে স্বাধিকার-নীতির হাত এড়াইয়া স্বধর্ম্ম-নীতির উপর সমাজ পরিবার প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা করা চলে। আদান প্রদানের মধ্যে আদানের উপর দৃষ্টি রাখা যেমন রজোগুণের কাজ, প্রদানের উপর দৃষ্টি রাখা তেমনি সত্ত্বগুণের কাজ। একটী হইল ভোগ-দৃষ্টি, অপরটী ত্যাগ-দৃষ্টি। ভোগ-দৃষ্টি হইতে স্বাধিকার-তত্ত্ব, এবং ত্যাগদৃষ্টি হইতে স্বধর্ম্মতত্ত্বের উদ্ভব। আমাদের দেশের প্রাচীন জীবনজাল এই স্বধর্ম্মতত্ত্ব অবলম্বনে রচিত হইয়াছিল, সেজন্য সংহিতায় পুরাণে, ইতিহাসে সর্ব্বত্রই সমাজের বিভিন্ন অঙ্গের কি স্বধর্ম্ম তাহারই পুনঃ পুনঃ উল্লেখ দেখা যায়।

পাশ্চাত্য ব্যবহারনীতিজ্ঞ দার্শনিকগণ স্বীকার করিয়াছেন যে right বা স্বাধিকার ও duty বা স্বধর্ম্ম একই ঢালের এপিট আর ওপিট; স্বাধিকার দিয়া যে সম্বন্ধের নির্ণয় হয়, স্বধর্ম্ম দিয়াও সেই সম্বন্ধের নির্ণয় করা চলে। অতএব এ আশঙ্কা কাহারও হইতে পারে না যে স্বাধিকার-বোধ আধুনিক জগতে সর্ব্ব ব্যবহারের যেমন মূলসূত্র হইতে পারে, স্বধর্ম্মবোধ সেরূপ পারে না।

জীব-রাজ্যের সমস্ত ব্যবহারে যেমন দুই রকম হিসাব প্রচলিত হইতে পারে দেখিলাম, পদার্থ রাজ্যেও ঠিক সেইরূপ। ভোগদৃষ্টি ও ত্যাগদৃষ্টি উভয়কেই পঞ্চভূতের উপরও প্রয়োগ করা চলে। পঞ্চভূতের সহিত আদানপ্রদানে কেবল আদায়ের দিকে নজর রাখা যেমন চলে, প্রদানের দিকে নজর রাখাও

তেমনি সম্ভব। পাশ্চাত্য শিক্ষা পঞ্চভূতকে কেবলই ভোগ্যরূপে ব্যবহার করিতে শিখায়, ভারতীয় শিক্ষা পঞ্চভূতে পরমার্থতত্ত্বের অধিষ্ঠান অনুভব করিতে শিখায়। পঞ্চভূত ত জীবের ভোগ জুটাইবেই,—পাশ্চাত্য সেই ভোগবিধানের পারিপাট্য ও উৎকর্ষ লইয়াই ব্যস্ত; প্রাচ্য সেই ভোগ বিধানে পরমার্থের বিধাতৃত্ব অনুভব করিতে ও তদুদ্দেশে হৃদয়ের পূজা ও শ্রদ্ধা দিতে ব্যগ্র।

এইবার আমরা বুঝিতে পারিব, শিক্ষা ব্যবহারকে কিরূপে পরমার্থ-পর করিতে পারে। এইবার বুঝিতে পারিব, পাশ্চাত্যের পাঠশালায় পড়িয়া, আমরা কেন এতদিন বিকৃত ব্যবহার শিক্ষা করিতেছি, কেন জাতীয় লক্ষ্য হইতে পদে পদে ভ্রষ্ট হইতেছি। শিক্ষণীয় বিষয়ের পরিবর্ত্তন ত দরকার নাই, আধুনিক জগতে প্রচলিত সকল বিদ্যার আলোচনাই সকল দেশের পক্ষে বাঞ্ছনীয় ও শুভপ্রদ,—কিন্তু আমাদের জাতীয় শিক্ষার যে একটা সনাতন ভাব রহিয়াছে, তাহাতে মর্ম্মান্তিক আঘাত দেওয়া কখনই হিতকর নয়। সবিচার শিক্ষাদান কি সম্ভব নহে? অর্থাৎ, শিক্ষাদান কালে জীবে জীবে অথবা জীবে জড়ে সম্বন্ধ বিচার যখন সর্ব্বদাই করিতে হইবে,তখন আমাদের জাতীয় Standpoint বা সিদ্ধান্তটী আমরা কি শিক্ষার্থীদিগকে সঙ্গে সঙ্গে বুঝাইয়া রাখিতে পারি না? আমাদের নিজেদের কোটে দাঁড়াইয়া, আমরা কি পাশ্চত্য জগতের পাঠ গ্রহণ করিতে পারি না? এই প্রশ্নের উত্তরেই শিক্ষা-সমস্যার প্রথমাংশের মীমাংসা নিহিত।

কি শিখাইতে হইবে, এ প্রশ্নের উত্তর,—জাতীয় লক্ষ্যের অনুকূল সম্যক ব্যবহার। পাশ্চত্য শিক্ষা আমাদের ব্যবহারকে যে কতদূর বিকৃত করিয়া দিয়াছে, তাহা আমাদের আদর্শের তুলনায় অনেকেই ভাবিয়া দেখেন নাই। স্বাধিকার-বোধ উগ্রমূর্ত্তি ধরিয়া সমাজে, গৃহে গৃহে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে, ক্রমাগতই কলহ ও আক্রোশের সৃষ্টি করিতেছে, দেশের সর্ব্বত্রই Right বা স্বাধিকার বজায় রাখিবার হুড়াহুড়ি পড়িয়া গিয়াছে, অথচ সর্ব্বত্রই স্বধর্ম্ম কাঁদিয়া ফিরিতেছে। আবার সামাজিক, পারিবারিক সমস্ত সমস্যাই আমরা ভুল দৃষ্টিতে পরীক্ষা করিতেছি। ফলে কোন মীমাংসাই কার্য্যে পরিণত হইতেছে না। যে মন স্বদেশীয় ও বিদেশীয় ভাবের খিচুড়ীতে পরিপুষ্ট, তাহার দ্বারা, মীমাংসাত দূরের কথা, সমস্যাই যথাযথ বুঝিতে পারা দায়; কথায় বলে, যে সরষে দিয়ে ভূত তাড়াবে, সেই সরষেতেই ভূতের

অধিষ্ঠান। সেই জন্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে ব্যবহারের মূলসূত্রে যে প্রভেদ রহিয়াছে তাহা দেখাইতে হইল।

ব্যবহার-দৃষ্টির এই তারতম্য প্রথমতঃ সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। ত্যাগ ও স্বধর্ম্মের সূত্র প্রয়োগ করিতে করিতে যে দেশের সমাজ ও শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে, সে দেশের বর্ত্তমান চিন্তায়, সাধনায়, শিক্ষায় স্বাধিকার ও ভোগের সূত্রকে প্রচলিত করিয়া আমরা একেবারে পথহারা ও বিপন্ন হইযা পড়িতেছি। এখন একমাত্র উপায় আবার সনাতন ব্যবহারে প্রতিষ্ঠিত হইবার ঐকান্তিক চেষ্টা। প্রকৃত জাতীয় শিক্ষার প্রচলন এই চেষ্টার প্রধান অঙ্গ।

জাতীয় শিক্ষা অর্থে আমরা বুঝিয়াছি, সমস্ত বিদ্যার তত্ত্বগুলিকে আমাদের সনাতন পরমার্থৈকনিষ্ঠ ব্যবহার-দৃষ্টিতে শিক্ষা দেওয়া। ভারতের একটা আপনার কোট আছে,—সেটা তাহার নিতান্ত নিজস্ব কোট; এই নিজের কোটে দাঁড়াইয়া আধুনিক সমস্ত মনুষ্যোচিত কর্ম্মে আমাদিগকে যোগ দিতে হইবে। কোন মতেই এ কোট ছাড়িলে চলিবে না,—ছাড়িলেই পথ হারাইতে হবে। ভারতের ছাত্রদিগকে ছেলে বেলা থেকে এই কোটটীর সন্ধান দিতে হবে। তাহা হইলেই বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা দেশের সনাতন লক্ষ্যটী ধারণা করিবে ও সমস্ত ব্যবহারে উহা বজায় রাখিতে শিখিবে।

কি শিখাইতে হইবে—এ প্রশ্নের একটা মোটা মোটি উত্তর পাওয়া গেল; এখন প্রশ্ন এই যে—কে শিখাইবে। এক কথায় ইহার উত্তর এই যে পরমার্থৈকনিষ্ঠ ব্যবহার শিখাইতে পরমার্থৈকনিষ্ঠ শিক্ষকের আবশ্যক। জাতীয় শিক্ষার প্রচলনে যোগ্য শিক্ষকের আবশ্যকতা কোন ক্রমেই অস্বীকার করা যায় না; শিক্ষাদানের আর সকল রকম ব্যবস্থাকে ঐ মূলভিত্তির উপর দাঁড় করাইতে হইবে। পাঠ্য পুস্তক কিরূপ হইবে বা কিরূপ স্থানে বিদ্যালয়ের স্থাপনা হইবে, এ সমস্ত আসল কথা নহে,—সুবিধা ও সুযোগ হিসাবে নির্ব্বাচ্য; কিন্তু কিরূপ শিক্ষকের হাতে শিক্ষার ভার অর্পিত হেই ইহাই প্রধান বিবেচ্য বিষয়।

আমাদের বর্ত্তমান সঙ্কটে সুশিক্ষার ভার প্রকৃত ভাবে কে গ্রহণ করিতে পারেন? কে প্রতিক্ষণে আপনার আদর্শ-জীবনের প্রভাবদ্বারা শিক্ষার্থীর মনকে, ভোগতৎপর পাশ্চাত্য ব্যবহার-ক্ষেত্র হইতে দেশের সনাতন পরমা-

নৈষ্ঠিকনিষ্ঠ ব্যবহার ক্ষেত্রে আকৃষ্ট করিয়া আনিতে পারেন? কে শিক্ষণীয় প্রত্যেক তত্ত্বকে প্রকৃত ব্যবহার-দৃষ্টিতে দেখিতে ছাত্রকে শিখাইয়া দিতে পারেন? যাহার নিজেরই সে দৃষ্টি নাই, সে অপরকে চক্ষু দিতে পারে না। শুধু ভারতবর্ষের অতীত গৌরব বুঝাইলেও চলিবেনা, অথবা শুধুই ভারতীয় প্রাচীন শাস্ত্র ও বিদ্যাদির আলোচনা করাইলেও চলিবে না। সকল কর্ম্মক্ষেত্রে আমরা সনাতন চরিত্র-মহিমা দেখিতে চাই,—পাণ্ডিত্য বা আচারনিষ্ঠতা ত বাহিরের কথা।

শিক্ষক-সমস্যার প্রকৃত মীমাংসা স্বামী বিবেকানন্দ বারম্বার দেখাইয়া দিয়াছেন। তিনি বলিতেন পরমার্থের ঐকান্তিক অনুশীলনের জন্য যাহারা জীবন উৎসর্গ করিয়াছে, এখন সেই ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ কর্ম্মযোগিদিগকে দেশের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিতে হইবে। কারণ, দেশের শিক্ষাদান কার্য্য আজ কাল এতদূর সঙ্কটাপন্ন, যে ঐ কার্য্যে যাহারা প্রধান ব্রতী, দুনৌকায় পা রাখা তাহাদের পক্ষে আর সম্ভব নহে,—সংসার-সংগ্রাম হইতে তাহাদিগকে অবসর লইতেই হইবে। দ্বিতীয়ত আমাদের জাতীয় শিক্ষাতরণীর দাঁড় যিনিই ধরুণ না কেন, উহার হাল পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের ন্যায় এখনও সর্ব্বত্যাগী ব্রহ্মনিষ্ঠের হাতে সংন্যস্ত থাকা উচিত।

স্ত্রীশিক্ষার কথায় সমগ্র শিক্ষাসমস্যার কথা সহজেই আসিয়া পড়ে। আমাদের দেশে কিরূপ ভিত্তির উপর স্ত্রীশিক্ষার প্রচার হওয়া বাঞ্ছনীয় তাহা পাঠক দেখিলেন। স্বদেশীয় ও বিদেশীয় নূতন নূতন নানাবিধ আদর্শের প্রবল সংঘর্ষ ও ঝঞ্ঝাবাত হইতে অন্তঃপুরকে আড়ালে রাখিবার ভাব হিন্দু সমাজের যেন মজ্জাগত হইয়া গিয়াছে; এজন্য আগ্রহদীপ্ত সংস্কারকের হাতে তাহাকে অনেক অপবাদ ও লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইতেছে। ভাঙ্গা খুবই সহজ, গড়া বড় শক্ত। এ পর্য্যন্ত দেশের সনাতন ব্যবহারভিত্তি বজায় রাখিয়া নারীচরিত্র গড়িয়া তুলিবার পথ কে দেখাইতে পারিয়াছেন? সেই প্রকৃত পথের নির্ণয় হউক, দেশের অন্তঃপুর কখনই পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবে না,—সমাজ গঠনে আমাদের সহায় হইবে। আদর্শ হিন্দু নারী দেবীভাবে মণ্ডিতা; তাঁহার চরিত্রের সংযম, কমনীয়তা, পরার্থপরতা, ও ত্যাগনিষ্ঠা চিরপ্রসিদ্ধ। পাশ্চাত্যশিক্ষাপ্রসূত উগ্র স্বাধিকার-অভিমান ঐ চরিত্রকে যে কতদূর বিকৃত করিতে পারে, তাহা কল্পনা করা কঠিন নহে। স্ত্রীশিক্ষা-প্রচারের উদ্যোগে আমাদের জাতীয় লক্ষ্যকে, আমাদের সনাতন পরমার্থৈক-

নিষ্ঠ ব্যবহারকে, সেই জন্য আরও দৃঢ়ভাবে প্রতিপদক্ষেপে আশ্রয় করিতে হইবে।

বিগত মাসের উদ্বোধনে "স্বামি-শিষ্য-সংবাদে" স্ত্রীশিক্ষা-প্রচার সম্বন্ধে স্বামিজীর মতামত পাঠক পড়িয়া দেখিয়াছেন। ঐ মতের প্রতিপোষক রূপে বর্ত্তমান প্রবন্ধে কতক গুলি যুক্তির অবতারণা করা হইল। স্বামিজী-সংকল্পিত স্ত্রীমঠ যদিও দেশে এখনও গড়িয়া উঠে নাই, তথাপি নিবেদিতাপ্রমুখা শিষ্যা-গণের সহায়ে তিনি স্ত্রীশিক্ষা-প্রচারের পত্তন করিয়া গিয়াছেন। যদি দেশের লোক তাঁহার স্ত্রীশিক্ষাপ্রচারচেষ্টার প্রতি সম্যক্ ভাবে একদিন আকৃষ্ট হন, তবে উহার বৃত্তান্ত সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে প্রকাশ করা যাইবে। ভারতে শিক্ষাদান ক্ষেত্রে সন্ন্যাসীর স্থান কোথায়, এ সম্বন্ধে স্বামিজীর মতামত ভবিষ্যতে বিশদভাবে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

প্রাচীন ভারতে জড়বাদ।

(স্বামী-সর্ব্বানন্দ।)

বিধাতার সৃষ্টিরাজ্যে সকল পদার্থই বৈচিত্র্যের নানাপ্রকার ফুল্ল শোভনে শোভমান হইয়া অপূর্ব্ব সজ্জায় সমুজ্জ্বল। এই 'নানার' সমষ্টিভূত বিগ্রহেই সেই বিরাট পুরুষ অধিষ্ঠিত—শুধু অধিষ্ঠিত কেন, উহাতেই তাঁহার দেবতনু বিনির্ম্মিত। স্বভাবতত্ত্ব আলোচনা করিলে মনে হয়, এই বিচিত্রতাই বাস্তবিক পরিণামী জগৎপ্রপঞ্চের জীবনী শক্তি, এই বৈচিত্র্যের পূর্ণোদ্ভাসনেই তাহাদের পরম সার্থকতা। আবার যদি জিজ্ঞাসা কর সৃষ্টভূতে ঐ বৈচিত্র্যের চরম উৎকর্ষ কোথায়, তবে মনস্তত্ত্ব অবশ্য বলিবেন উহা মানব প্রকৃতিতে;—মনরূপ সমুদ্রের তটে দাঁড়াইয়া একবার দেখিলেই বোধ হইবে যথার্থই মানব প্রকৃতি অনন্তের ছায়া বক্ষে ধারণ করিয়া অনন্ত ভাবে কোন এক অনন্ত পদার্থের দিকে ছুটিয়াছে! একটী মানব প্রকৃতিই বৈষম্যের কি অনন্ত উৎস!—চিত্তের কত অগণ্য লহরী!—প্রত্যেক লহরীই না আবার কত নূতন রঙ্গে রঞ্জিত!—অথচ সকলগুলি মিলিয়া ব্যক্তিগত মনুষ্যত্বের বিশেষত্ব প্রকাশেই নিযুক্ত!

তথাপি দেখিতে পাওয়া যায় অদ্ভুত বৈচিত্র্যবিজড়িত এই মানব প্রকৃতি বিশেষ বিশেষ বিভাগে বিশ্লেষণ করিবার একবারে অযোগ্য নহে এবং অন্যান্য পদার্থের সহিত তুলনায় সমগ্র মানব প্রকৃতিই যে গুণ ভেদে সমজাতীয় এক প্রকারের পদার্থ তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় উহার কোনটি ভাবপ্রবণ, কোনটি কর্ম্মপ্রবণ, আবার কোনটি যুক্তিপ্রবণ।

কল্পনার নিভৃত কুঞ্জে নিবদ্ধ হইয়া অতীন্দ্রিয় ভাবরাজ্যে বিচরণ করিতেই কোন কোন মানব ভালবাসেন। তাঁহাদের মন স্বতঃই ভাবময়। তাঁহারা দেখেন জগতের বাস্তব ঘটনাপ্রবাহের পারে বাহ্যেন্দ্রিয়ের অগম্য এক অনন্ত-বিস্তৃত ভাবরাজ্য সদা বিদ্যমান। তাহা চক্ষে দেখা যায় না, কর্ণে শুনা যায় না, হস্তেও স্পর্শ করা যায় না, কিন্তু তাহার সত্তা অত্যন্ত বাস্তব। অনন্তে সম্মিলিত সেই ভাবরাজ্য হইতে অপূর্ব্ব অস্ফুট আলোক আসিয়া ভাবুকের হৃদয়ে অসীম চিত্তপ্রসাদ যে প্রদান করে ইহা নিশ্চয় প্রাণে প্রাণে অনুভব করা যায়। সে জন্য ইহাঁরা মস্তিষ্ক অপেক্ষা হৃদয়কেই অধিক প্রত্যয় করেন, প্রত্যক্ষ হইতে অপ্রত্যক্ষকেই অধিক ভালবাসেন, তর্ক ছাড়িয়া বিশ্বাসেই অধিক আস্থাবান। এইরূপ প্রকৃতিগত লোকের ভিতর হইতেই মানব সমাজে কবীন্দ্রমণ্ডলীর উৎপত্তি। আবার জগৎ-বিলোড়নকারী ভক্তবীর সমূহ এবং অতীন্দ্রিয়তত্ত্ববিদ্, সংশ্লেষিক দার্শনিককুলও ঐরূপ লোকের ভিতর হইতেই উদয় হন। ঐরূপ প্রকৃতিবান লোকের ভিতর হইতেই প্রাচীন ভারতে ঋষি সংঘের আবির্ভাব; ঐ ভাববিভোর মনীষিগণই বাস্তব জগতের সকল কার্য্যাকার্য্যের পারে বাক্যমনের অতীত এক সনাতন বস্তুর অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ভাবমুখে অবস্থিত তাঁহারাই বলিয়াছিলেন, সত্য যুক্তির অগম্য, "বাঙ্মনাতীত", কেবল হৃদয়ে হৃদয়ে অনুভবসাধ্য। তাঁহারা তর্ককে নিন্দা করিয়া বলিয়াছিলেন "নৈসা মতি তর্কেন আপনেয়া"; প্রাকৃত কর্ম্মেতে অনজ্ঞা দেখাইয়া বলিয়াছিলেন "ন কর্ম্মণা, ন প্রজয়া ধনেন, ত্যাগেনৈকেন অমৃতত্বমানশু"।

আবার যে সকল মানব কর্ম্মপ্রবণ, তাঁহাদের প্রাণ কর্ম্মে—দৃষ্টি অনাদি অনন্ত উচ্ছ্বাসশীল কার্য্যজগতে। কবির প্রফুল্ল ভাবতরঙ্গে গা ভাসাইবার অবকাশ তাঁহাদের নাই; এবং বৃথা তর্কযুক্তিতেও কালক্ষয় করিতে তাঁহারা চাহেন না। তাঁহারা চাহেন অনন্ত উত্তেজনা, অটল সহিষ্ণুতা, এবং অক্ষয় শক্তি। অতীতের উপর বর্ত্তমানকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ভবিষ্যৎ জগৎ রচনা করিতে অথবা ঐহিকের উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া পারত্রিকের সৌধচূড়া উঠাইতে তাঁহারা একেবারে উদাসীন। তাঁহাদের অপার আনন্দ কর্ম্মচক্রের গতি নিরীক্ষণে,--পরম সন্তোষ, কর্ম্মক্ষেত্রের ভূকর্ষণে। ইন্দ্রিয়নিচয়ের উপর অটুট-বিশ্বাসবান্ হইয়া উহাদের সম্যক পরিচালনেই তাঁহারা একান্ত আগ্রহবান্। এই কর্ম্মঠ মানবপ্রকৃতির ভিতর হইতেই জগতের বিখ্যাত কর্ম্ম-

বীরগণের উৎপত্তি। এইরূপ প্রকৃতির মনুষ্যের ভিতর হইতেই প্রাচীন ভারতের যাজ্ঞিককুলের উদ্ভব।

তৃতীয় প্রকৃতির মানব যুক্তিপ্রবণ। তাঁহারা চাহেন সমগ্র জগৎকে নিজ বিচার পাশে বাঁধিয়া রাখিতে; অথবা যুক্তিদণ্ডে বিশ্বমন্থন করিয়া পরম সত্যের উদ্ধার করিতে। তাঁহারা মানবের মনোবৃত্তিগুলির মধ্যে এক যুক্তিবৃত্তিরই প্রাধান্য স্বীকার করিয়া অপর বৃত্তিসমূহকে যুক্তিরই দাস করিয়া রাখিতে চাহেন। ইঁহারা অতীন্দ্রিয় বস্তুর অস্তিত্ব সহজে গ্রাহ্য করিতে প্রস্তুত নহেন; প্রমাণ প্রমেয়ের সাহায্যে যতদূর লওয়া চলিতে পারে, ততদূরই গ্রহণ করেন। যাহা অযৌক্তিক, যাহা যুক্তির অসাধ্য বা প্রমাণাস্পর্শী ইঁহাদের নিকট তাহার অস্তিত্ব নাই। ফলতঃ দর্শনসাপেক্ষ বস্তু লইয়া বিশ্লেষণ দ্বারা তত্ত্বান্বেষণে অগ্রসর হওয়াই ইঁহাদের অনন্য প্রথা। এইরূপ প্রকৃতিবিশিষ্ট লোকের ভিতর হইতেই বিখ্যাত তর্কশাস্ত্রপ্রণেতা এবং বৈশ্লেষিক তার্কিকশ্রেণীর উদয় হয়। এইরূপ লোকের ভিতর হইতেই বৈজ্ঞানিক জড়বাদীদের জন্ম।

যখন প্রাচীন ভারতের সুরম্য তপোবনে—বেদান্তের ধীর গম্ভীর নিনাদ শ্রুতিগোচর হইতেছিল, যখন ভারতাকাশ আচ্ছন্ন করিয়া পর্য্যন্তকল্প যজ্ঞধূম যাজ্ঞিককুলের স্পর্দ্ধা দিক্‌দিগন্তে বহন করিতেছিল, যখন শুভ্র-শৃঙ্গ হিমাচলে, মহার্ণবের গভীর কল্লোলে, উদার-বিস্তৃত গগনে, বাহ্যান্তর বিশ্বের সর্ব্বত্রই অনন্তবিগ্রহের বিরাট মূর্ত্তির সন্দর্শনে ভারতের আরণ্যকগণ প্রেমপূর্ণ অর্চ্চনায় নিমগ্ন ছিলেন, তখন ভারতের সেই আধ্যাত্মিক ঐকতানের মধ্যে ক্ষীণ অথচ সুস্পষ্টস্বরে একটী বিজাতীয় সুর শুনিতে পাওয়া গিয়াছিল; বীণার তারসমন্বয়ের ভিতর একটী তার যেন বিভিন্ন ভাবে স্পন্দিত হওয়ায় বিভিন্ন সুরের উৎপত্তি হইতেছিল। উহা অন্য কিছুই নহে, কেবল কতিপয় জড়বাদীর প্রতিদ্বন্দ্বিতার নির্ভীক আস্ফালন।

নির্ভীকতা ভারতীয় দার্শনিককুলের অনন্য সাধারণ স্বভাব। ঐ বিষয়ে তাঁহারা জগতের অন্যান্য দার্শনিকসম্প্রদায়ের সহিত অতুলনীয়। তাঁহারা যাহা সত্য বলিয়া বুঝিতেন, তাহা তারস্বরে জগতের নিকট ঘোষণা করিতেন। আধুনিক দার্শনিকদের ন্যায় নিজমতের দোষাদোষ প্রচ্ছন্ন রাখিবার জন্য ভাষার কূটকৌশলে উহাকে আবদ্ধ রাখা তাঁহারা ঘৃণিত বলিয়া বিবেচনা করিতেন, অথবা, ঐরূপ করা তাঁহাদের সরলপ্রকৃতির সম্পূর্ণ

অপরিজ্ঞাত ছিল। তাই দেখিতে পাই নাস্তিকপ্রধান বৃহস্পতি এবং তৎশিষ্য চার্ব্বাক প্রভৃতি নাস্তিকগণ নির্ভীক হৃদয়ে নানা আস্তিক দার্শনিক সম্প্রদায়ের সহিত সতত সংগ্রামে বদ্ধপরিকর। যখন আধ্যাত্মিকতার বিপুলগর্জ্জন আর্য্যাবর্ত্তের প্রাণে প্রাণে মন্দ্রিত হইতেছিল, তখনও আমরা শুনিতে পাই—

ন স্বর্গো নাপবর্গো বা নৈবাত্মা পারলৌকিকঃ।
নৈব বর্ণাশ্রমাদীনাং ক্রিয়াশ্চ ফলদায়িকাঃ॥
অগ্নিহোত্রং ত্রয়ো বেদাস্ত্রিদণ্ডং ভস্মগুণ্ঠনম্।
বুদ্ধিপৌরুষহীনানাং জীবিকা ধাতৃনির্ম্মিতা॥

অর্থাৎ—স্বর্গও নাই, মুক্তিও নাই, এবং আত্মার পারলৌকিক অস্তিত্বও নাই। এই বর্ণাশ্রম ধর্ম্মকেও অভিষ্টফল প্রদান করিতে দেখা যায় না। অগ্নিহোত্র, বেদত্রয়, ত্রিদণ্ড কিম্বা ভস্মবিলেপনরূপ কার্য্যসকল বিধাতা বুদ্ধি ও পুরুষত্ববিহীন লোকের জন্যই উপজীবিকাস্বরূপে সৃজন করিয়াছেন।

নাস্তিক লোকায়তদিগের প্রাচীন জড়বাদ বর্ত্তমান যুগে অতি হেয় গবেষণা বলিয়া বোধ হইতে পারে। কিন্তু যিনি প্রাচীন আর্য্যগণের মানস প্রবাহের বিচিত্র তরঙ্গভঙ্গিমা দর্শন করিয়া আনন্দ অনুভব করেন এবং তাঁহার ইতিবৃত্ত পর্য্যবেক্ষণে যত্নশীল হয়েন তাঁহার নিকট ইহার একটি সাফল্য আছে।

আর্য্যগণের প্রাচীনতম গ্রন্থ বেদের সংহিতাভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া উপনিষদ ভাগ পর্য্যন্ত, দার্শনিকতত্ত্ব হিসাবে আমরা যাহা দেখিতে পাই তাহা সিদ্ধান্ত বাক্যমাত্র, সকল গুলিই "নিগম" বলিয়া গৃহীত। অর্থাৎ ঋষিগণ সাধনাপ্রভাবে সিদ্ধান্তিত চরম সত্যের সাক্ষাৎকার পাইতেন; অথবা এ কথাও বলিতে পারা যায় যে তাঁহারা আধ্যাত্মিক বিষয়ের আলোচনা করিতে করিতে এক প্রকার আকস্মিক ভাবে ঐ সিদ্ধান্তগুলিতে উপনীত হইতেন। যাহাই হউক সত্যগুলি তাঁহাদের সাধনবলে মানস পটে উদ্ভাসিতই হউক কিম্বা তাঁহারা আকস্মিক ভাবে উহাতে উপনীতই হউন, এ কথা নিশ্চিত, যে ধারাবাহিকভাবে যুক্তি তর্কের দ্বারা কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার প্রথা তখনও তাঁহাদের মধ্যে অপরিজ্ঞাত ছিল। সে জন্যই আমরা দেখিতে পাই, কি সংহিতায়, কি ব্রাহ্মণে,

কি আরণ্যকে, সর্ব্বত্রই পরম নিরু সত্যগুলি ছিন্নসূত্রে মণিহারের ন্যায় অসংলগ্ন ভাবে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। পরে কাঠক প্রভৃতি অপ্রচলিত আধুনিক উপনিষদে আবার দেখিতে পাই, ঐ সিদ্ধান্তগুলিই কিছু সংযত ভাবে গ্রথিত, অথচ তর্কযুক্তির নিন্দাও উহাতে ইঙ্গিতে করা রহিয়াছে। যথা, কাঠকে বলিয়াছেন "নৈষামতি তর্কেন আপনেয়া" (এ রূপ মতি তর্কের দ্বারা হয় না)। আবার পরে দার্শনিক যুগে বেদান্তাদি ষড়্দর্শনে দেখি যে দার্শনিকগণ ঐ সিদ্ধান্তগুলিই বুঝাইতে প্রমাণ প্রমেয়ের চূড়ান্ত করিয়া ছাড়িয়াছেন। ইহা দ্বারা স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, বৈদিক-যুগে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ তাঁহাদের সিদ্ধান্ত গুলি নিগম বলিয়া জনসমাজে চালাইয়া আসিতেছিলেন এবং জনসাধারণও "তথাস্তু" বলিয়া ঐ সকল গ্রহণ বা বিশ্বাস করিতেছিল। কিন্তু ঋষিগণের চিন্তাতরঙ্গ জনসাধারণের মনের উপর যথার্থভাবে আঘাত করিয়া যখন তাহাতে ঘাত প্রতিঘাত উৎপন্ন করিল তখন সে সংঘাতে তাহাদের মনও হিল্লোলিত হইয়া তাহাদের মনঃশক্তির ক্রমবিকাশ হইতে লাগিল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে মানব মনের প্রকৃতি ত্রিধা-বিভাজ্য। অতএব তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা ভাবপ্রবণ ছিলেন তাঁহারা পূর্ব্ব-ঋষিগণের বাক্য নিগমসিদ্ধ বলিয়া মানিয়া লইলেন, এবং তাহার প্রচারে যত্নশীল হইলেন। আর তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা যুক্তিপ্রবণ, তাঁহারা সেই সিদ্ধান্তগুলির প্রতি সন্দিহান হইয়া তাহার বিশ্লেষণে নিযুক্ত হইলেন। ফলে দাঁড়াইল এই যে, যুক্তিপক্ষীয়দের মধ্যে অনেকে নাস্তিক হইয়া উঠিলেন এবং উহার প্রতিবিধানের আবশ্যকতা আসিয়া পড়িল ঐ "আস্তিক" সমাজের উপর। আস্তিক সমাজ এই সকল নাস্তিকদিগের বিপক্ষে আপন মত প্রতিষ্ঠাপনের নিমিত্ত উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং নাস্তিককুল মানবপ্রকৃতির অন্তর্গত যুক্তিবৃত্তির উপরই দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া আপনাদিগকে সুরক্ষিত বিবেচনা করিতেছে দেখিয়া তাহাদের সহিত প্রতিদ্বন্দিতায় বিপরীত তর্ক যুক্তিই প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া স্থির করিলেন। ভারতে আধ্যাত্মিক শাস্ত্রের ভিতর দর্শন বা তর্কশাস্ত্রের এইরূপেই প্রথম উদ্ভাস এবং প্রকৃত দর্শনশাস্ত্রের এইরূপেই প্রথম উন্মেষ। বৈদিক যুগের শেষভাগে ভারতে আধ্যাত্মিকজগতে পূর্ব্বোক্তরূপে যে একটী যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছিল এবং ঐ বিপ্লবের ফলস্বরূপেই যে আমরা ভারতের প্রাচীন দর্শনসমূহ প্রাপ্ত হইয়াছি তাহা বেশ অনুমিত হয়। পরে আর একবার ঐরূপ বিপ্লব

উপস্থিত হইয়াছিল বৌদ্ধযুগে, উহারই ফলে আমরা পূর্ব্বযুগের সূত্রাকার-নিবদ্ধ ষড়দর্শনগুলির পুনর্বিবৃত্তি এবং বহু অসাধারণ ধীসম্পন্ন মনীষিগণ কর্ত্তৃক ঐ সকলের সুস্পষ্ট ভাষ্য, ব্যাখ্যা ও সন্দীপনী প্রাপ্ত হইয়াছি। এইরূপে বৈদিক সিদ্ধান্তযুগের অবসানেই ভারতে আধ্যাত্মিক জগতে বিপ্লবের প্রবল বাত্যা সজোরে প্রবাহিত হইয়া সমাজের চিত্তসমুদ্র নানা ভাবে নানা দিকে তরঙ্গায়িত হইয়া উঠে, এবং ফলস্বরূপে বৈশেষিক, ন্যায়, মীমাংসা, সাংখ্য, পাতঞ্জল ও বেদান্তরূপ ষড়বিধ দর্শনশাস্ত্র উত্তাল তরঙ্গের আকার ধারণ করে। কিন্তু ঐ সকল সুপরিচিত তরঙ্গমালার মধ্যে চার্ব্বাকদর্শন নামক আর একটী তরঙ্গ যে কতদূর মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছিল এবং উহা যে কতদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত লাভ করিয়াছিল আমরা এতকাল পরে তাহার স্বল্পমাত্র পরিচয়ই পাইয়া থাকি। ভারতের ঐ সপ্তম দর্শন 'লোকায়তিক' নামেও অনেক স্থলে অভিহিত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত সপ্ত দর্শনের মধ্যে মীমাংসা ও বেদান্তের সম্যক প্রভাবই এখনও ভারতের সর্ব্বত্র পরিলক্ষিত হয়।

সাংখ্য ও পাতঞ্জল কিছুকাল স্বতন্ত্রভাবে থাকিয়া অবশেষে বেদান্ত-শরীরেই মিলিত হইয়াছে; এবং ন্যায় ও বৈশেষিকের অস্তিত্ব দর্শনরাজ্যে ফল্গুনদীর ন্যায় অন্তঃশীলা হইয়া পড়িয়াছে—অনুসন্ধিৎসু পণ্ডিতগণকে এক প্রকার মাটি খুঁড়িয়াই এতদুভয়ের অস্তিত্ব ও পূর্ব্বপ্রভাব অনুমান করিতে হইতেছে। প্রবন্ধের আলোচ্য ভারতের সপ্তম দর্শনটি আবার মরুসরিতের ন্যায় প্রস্রবণাভাবে শুষ্কসিকতা মাঝে পড়িয়া নিজ অস্তিত্ব হারাইয়া এককালে বিলুপ্ত হইয়াছে। দেখা যায় উত্তর মীমাংসা ব্যতিরিক্ত অপর পাঁচটি দর্শন মন, বুদ্ধি পর্য্যন্ত সমগ্র জগতের উপাদানকে জড় বলিয়া নির্দ্দেশ করেন এবং আত্মার ন্যায় ঐ জড়ের নিত্যত্ব ও অজত্ব স্বীকার করেন। পরন্তু তাঁহারা সকলেই জড়াতিরিক্ত এক চেতন বস্তুকে, জড়ের ঈশিতা বা প্রবর্ত্তক স্বরূপে ধরিয়া লইয়াছেন। এই হেতু এক মাত্র বার্হস্পত্য বা চার্ব্বাক দর্শনই প্রকৃত জড়বাদ বলিয়া প্রাচীন ভারতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। দুঃখের বিষয় জড়বাদী লোকায়তিকদিগের কোন গ্রন্থই এখন আর পাওয়া যায় না। ইহাদের মতের যৎসামান্য মাত্রই কেবল মাধবাচার্য্যের "সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ," বেদান্ত সূত্রের ভাষ্য, "প্রবোধ চন্দ্রোদয়" নাটক প্রভৃতি কতকগুলি পরবর্ত্তী কালের গ্রন্থে আমরা উল্লিখিত দেখিতে পাই। লোকায়তিকদিগের নামোল্লেখ কিন্তু

প্রায় সকল প্রাচীন গ্রন্থেই ভূরিশঃ বিদ্যমান। ঐ সকল গ্রন্থ হইতেই আমরা বুঝিতে পারি যে ঐ মতের আদিপ্রতিষ্ঠাতা বৃহস্পতিনামা কোন ব্যক্তি; এবং বৃহস্পতির সূত্রই চার্ব্বাক দর্শনের প্রধান গ্রন্থ। অধুনা এই বৃহস্পতি-সূত্র সম্পূর্ণ লুপ্ত; বৃহস্পতির কতিপয় উক্তি সায়ণ তাঁহার সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে উদ্ধৃত করিলেও বুঝা যায় সে গুলি নিশ্চয়ই বৃহস্পতির মূল সূত্র হইতে ভিন্ন। কারণ উহার সকলগুলিই সূত্রাকারে না হইয়া শ্লোকাকারে নিবদ্ধ। আমাদের অনুমান সায়ণ উহা মূল সূত্রের শ্লোকাকারে নিবদ্ধ কোন কারিকাগ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

ভাস্করাচার্য্য কিন্তু তাঁহার বেদান্ত সূত্রের ৩।৩।৫৩ ভাষ্যে বৃহস্পতি-সূত্রের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে তাঁহার সময় পর্য্যন্তও ঐ সূত্রাকার গ্রন্থের প্রচার ছিল। মৈত্রায়ণী উপনিষদেও আমরা বৃহস্পতির নাম দেখিতে পাইয়া থাকি। বৃহস্পতি সেখানে ইন্দ্র-পুরোহিত। ইন্দ্রের মঙ্গলের জন্য অসুরদিগকে তাহাদের ধ্বংসের কারণ নাস্তিকবাদ শিক্ষা দিতেছেন। যথা—"বৃহস্পতীর্বৈ শুক্রো ভূত্বা ইন্দ্রস্য অভযায়াসুরেভ্য ক্ষয়ায়েমামবিদ্যামসৃজত্তয়া শিবমশিবমিত্যুদ্দীশন্ত্যশিবং শিবমিতি। বেদাদি-শাস্ত্র-হিংসকধর্ম্মাভিধ্যানমস্তিতি বদন্তি।" পরে বৃহস্পতি এই দলের নেতৃত্বের অপবাদ প্রাপ্ত হইলেন; এবং বার্হস্পত্য অর্থে জড়বাদী হইয়া দাঁড়াইল। বৃহস্পতির পরে চার্ব্বাক নামক কোন লোক এই মতের লোক সকলের নেতা হইয়াছিলেন। মহাভারতে এই চার্ব্বাক অসুর বলিয়া আখ্যাত হইয়াছেন। সায়ণমাধব চার্ব্বাক দর্শনের কথা বলিতে গিয়া প্রথমেই বলিযাছেন "অথ কথং পরমেশ্বরস্য নিঃশ্রেয়সপ্রদত্বমভিধীয়তে বৃহস্পতিমতানুসারিণা নাস্তিক-শিরোমণিনা চার্ব্বাকেণ দুরোৎসারিতত্বাৎ" অর্থাৎ—ঈশ্বর মুক্তিপ্রদান করেন এ কথা কিরূপে বলা যাইতে পারে? বৃহস্পতিমতানুগামী নাস্তিক শিরোমণি চার্ব্বাক ও কথা খণ্ডন করিয়াছেন। "প্রবোধ চন্দ্রোদয়" নাটককার কৃষ্ণমিশ্রযতি তদাপ্রচলিত প্রবাদ অনুসারে "মহামোহ" মুখে চার্ব্বাকের বিষয় এইরূপ কহিয়াছেন—"সর্ব্বথা লোকায়তমেব শাস্ত্রং যত্র প্রত্যক্ষমেব প্রমাণং পৃথিব্যপ্তেজোবায়বস্তত্বানি, অর্থকামৌ পুরুষার্থৌ ভূতান্যেব চেতয়ন্তে। নাস্তি পরলোকঃ। মৃত্যুরেবাপবর্গঃ তদেতদস্মদভিপ্রায়ানুবন্ধিনা বাচস্পতিনা প্রণীয় চার্ব্বাকায় সমর্পিতম্। তেন চ শিষ্যোপশিষ্যদ্বারেণাস্মিংল্লোকে বহুলীকৃতং তন্ত্রম্।"

অর্থাৎ—"লোকায়তদিগের শাস্ত্রই যথার্থ শাস্ত্র। তাঁহাদের মতে প্রত্যক্ষই এক মাত্র প্রমাণ। পৃথিবী, জল, বায়ু এবং তেজ এই চারই আদি তত্ত্ব। অর্থ এবং কাম এই বর্গদ্বয়ই পরম পুরুষার্থ, মনুষ্য ভূতগণ দ্বারাই চেতনা প্রাপ্ত হয়। পরলোক নাই। মৃত্যুই মোক্ষ। আমাদের অভিপ্রায়ে অনুবদ্ধ বাচস্পতি (বৃহস্পতি) এই শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া চার্ব্বাককে অর্পণ করিয়াছিলেন। চার্ব্বাক আপন শিষ্য ও উপশিষ্যগণ দ্বারা এই তন্ত্রের বহুল প্রচার করিযাছেন"। অতএব দেখা যাইতেছে নাস্তিকবাদ ভারতে বহু প্রাচীন কাল হইতেই প্রচলিত ছিল; এমন কি, ঋগ্বেদের সূক্ত গুলি একটু অনুধাবন করিয়া পড়িলে দেখিতে পাওয়া যায় সেই প্রাচীনতম বৈদিক যুগের প্রাক্কালেও এই মতের ক্ষীণ আভাস কতকগুলি ঋকে অস্ফুটভাবে প্রদত্ত হইয়াছে। যথা, অগ্নিকে এক স্থানে বলা হইতেছে যে "আমাদের বিদ্বেষকারীরা শত্রুদিগের সহিত মিলিত হইয়াছে, তুমি তাহাদের দহন কর" (১)। কোথাও বা দেবনিন্দুকগণকে দেশ হইতে চলিয়া যাইতে বলা হইতেছে (২)। আবার কোন স্থলে বা যে সমস্ত মনুষ্য ইন্দ্রের অস্তিত্বে সন্দিহান তাহাদিগকে ভয় দেখাইয়া তাঁহার প্রতি বিশ্বাসবান্ হইতে বলা হইতেছে (৩)। আবার এক স্থানে, দেববিহীন শত্রুগণের সহিত ইন্দ্র বৃহস্পতি সহাযে যুদ্ধ করিতেছেন, ইহারও উল্লেখ আছে (৪)। ঐরূপ আরও অনেক স্থানে আছে।

বৃহস্পতির পরে তৎমতাবলম্বী চার্ব্বাক যখন এই নাস্তিক বাদ প্রচার করিতেছিলেন, তখন এই মত নিশ্চয়ই যে জনসাধারণে বহুল আদর লাভ করিয়াছিল তাহার আর সন্দেহ নাই। চার্ব্বাকদর্শনের "লোকায়ত" নামটি ঐ কথাই জ্ঞাপন করিতেছে, সায়ণও কহিয়াছেন "তস্য চার্ব্বাকমতস্য লোকায়তমিত্যন্বর্থমপরং নামধেয়ম্।" অর্থাৎ এই চার্ব্বাকমতের অপর একটি নাম "লোকায়ত"। এই জড়বাদী কামশাস্ত্র অজ্ঞলোক মাঝে যে আদরণীয় হইবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি! চার্ব্বাকমতে আত্মা অপর কিছু বস্তু নহে,—ক্ষিতি, অপ, তেজ এবং বায়ুরূপ (আকাশ নয়, কারণ ইহা অদৃশ্য অপ্রত্যক্ষ) ভূতচতুষ্টয়ের সংযোগে উদ্ভূত দেহবস্তুই আত্মা বা চৈতন্য। উহা ভূতগণের মিশ্রণে আবির্ভূত হইয়া তাহাদের লয়েই লয় প্রাপ্ত হয়। যথা—"তদিহ বিজ্ঞানঘন এবৈতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তানি এব অনুবিনশ্যতি।" চৈতন্যবান্ দেহই আত্মা, কারণ দেহাতিরিক্ত আত্মার

(১) ঋগ্বেদ সংহিতা ১।১২।৫, (২) ঋঃ সং ১।৪।৫, (৩) ঋঃ সং ২।১২।৫,(৪) ঋঃ সং ৮।৯৬।১৫।

অস্তিত্বের কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই। যথা—"তচ্চৈতন্যবিশিষ্ট দেহ এবাত্মা দেহাতিরিক্ত আত্মনি প্রমাণাভাবাৎ।" প্রত্যক্ষ প্রমাণই একমাত্র স্বীকার্য্য; অপর প্রমাণনিচয় জ্ঞানের উপায় নহে, কারণ, উপমানাদি আর সকল প্রমাণই মনঃপ্রসূত। যথা—"তদেতন্মনোরাজ্যজৃম্ভনম্"। চার্ব্বাক মতে অনুমান প্রমাণ কখনই ব্যাপ্তি জ্ঞানের উপায় হইতে পারে না। কারণ, তাহাতে, বস্তুবিশেষের ইহা কারণ, ঐ কারণের আবার ইহা কারণ ইত্যাদি রূপে অনন্ত কারণ-প্রবাহ চলিতেই থাকে, সেই হেতু ইহাতে অনবস্থা ও দ্যোঃস্থ প্রসঙ্গ দোষ আসিয়া পড়ে। শাব্দিক প্রমাণও চার্ব্বাক মতে গ্রাহ্য নহে। কারণ, কণাদির মতানুসারে উহাও অনুমানের অন্তর্ভুক্ত। যথা—"নাপ্যনুমানং ব্যাপ্তিজ্ঞানোপায়ঃ। তত্র তত্রাপ্যেবমিত্যনবস্থাদোঃস্থ্য প্রসঙ্গাৎ। নাপি শব্দ স্তদুপায়ঃ কানাদমতানুসারেণানুমান এবান্তর্ভাবাৎ।" অতএব ঐ মতে প্রত্যক্ষ প্রমাণেতর প্রমাণসাধ্য অদৃষ্টাদিও অসিদ্ধ। যদি বল তবে এই বৈচিত্র্যাত্মক জগৎ-রচনার কারণ কি? তাহার প্রত্যুত্তরে চার্ব্বাক বলেন স্বভাব হইতেই ইহার উৎপত্তি। তিনি বলেন—

অগ্নিরুষ্ণো জলং শীতং সমস্পর্শস্তথাঽনিলঃ।
কেনেদং চিত্রিতং তস্মাৎ স্বভাবাত্তদ্ব্যবস্থিতিঃ॥

অর্থাৎ—অগ্নির উষ্ণতা, জলের শীতলতা, অনিলের সমস্পর্শতা কাহার দ্বারাই বা এই সকল বৈচিত্র্যের সৃজন হইবে? এক মাত্র স্বভাব হইতেই এই সকলের ঐরূপ অবস্থিতি বা ব্যবস্থা হইয়া থাকে। চার্ব্বাক বলেন ইহ জগতে যাহা প্রত্যক্ষসাধ্য তাহাই প্রামাণিক ও সত্য, এতদ্ব্যতিরিক্ত বেদাদি সকলই "ধূর্ত্ত প্রলাপ মাত্র।" অতএব—

অত্র চত্বারি ভূতানি ভূমিবার্য্যনলানিলাঃ।
চতুর্ভ্যঃ খলু ভূতেভ্যশ্চৈতন্যমুপজায়তে॥
কিণ্বাদিভ্যঃ সমেতেভ্যো দ্রব্যেভ্যো মদশক্তিবৎ।
অহং স্থূলঃ কৃশোঽস্মীতি সমানাধিকরণ্যতঃ॥
দেহঃ স্থৌল্যাদিযোগাচ্চ স এবাত্মা ন চাপরঃ।
মম দেহোঽয়মিত্যুক্তিঃ সম্ভবেদৌপচারিকী॥

অর্থাৎ ভূমি, বায়ু, বারি এবং অনল এই চারি ভূত বিদ্যমান। এই ভূত চতুষ্টয়ের দ্বারা চৈতন্য উদ্ভূত হন। যেরূপ কিণ্ব প্রভৃতি বস্তুর সমষ্টিতে সুরার মাদকশক্তির উৎপত্তি হয়, ভূতচতুষ্টয়ের সংযোগে চৈতন্যের উৎ-

পত্তিও তদ্রূপ। লোকে বলিয়া থাকে "আমি স্থূল," "আমি কৃশ" ইত্যাদি; এই স্থৌল্যাদি দেহের ধর্ম্ম; সেই জন্য এই দেহই আত্মা, আত্মা অপর কিছুই নহে। তবে যে বলে "আমার দেহ," সেটা ঔপচারিকী, যেমন রাহুর শির।

এইরূপে যখন ইহা নিষ্পন্ন হইল যে এই চৈতন্যবিশিষ্ট দেহই আত্মা, শরীরের সহিত ঐ আত্মার উৎপত্তি ও নাশ হয়, এবং দেহত্যাগেই মোক্ষ হয়, তখন চার্ব্বাকমতাবলম্বিদিগের নিকটে কায়জ সুখলাভই যে কাল ক্রমে পরম পুরুষার্থ বলিয়া গৃহীত হইবে, তাহা আর বিচিত্র কি! দেখিতেও পাওয়া যায় তাহাদের দৃষ্টিতে সংসার অনন্ত সুখের বিলাস ভূমি—দুঃখ কেবল সেই সুখটুকু উজ্জ্বল করিয়া দিবার জন্য—যেমন প্রেমের মধুরতা শতগুণে ফুটাইয়া দিবার জন্যই বিরহ, ভোগের সুখ তীব্র করিতেই উপোষণ,সফলতার আনন্দের চরম পরিপোষক বিফলতা; আলোকের পরম বিরামস্থান ছায়া।

সে জন্যই দেখিতে পাওয়া যায় কালে চার্ব্বাকমতাবলম্বিদিগের দ্বারা প্রচারিত হইতেছে—

ত্যাজ্যং সুখং বিষয়সঙ্গমজন্ম পুংসাং।
দুঃখোপসৃষ্টমিতি মূর্খবিচারণৈষা॥
ব্রীহীঞ্জিহাসতি সিতোত্তমতণ্ডুলাঢ্যান্।
কো নাম ভোস্তুষকণোপহিতান্ হিতার্থী॥

অর্থাৎ—মূর্খরাই এইরূপ বিচার করে যে, বিষয়সঙ্গজ সুখ মানুষের ত্যাগ করা উচিত; কারণ, উহাতে দুঃখের অংশ মিশ্রিত আছে। নিজ হিতার্থী কোন্ মনুষ্য তুষ ও ধূলি সমাচ্ছন্ন বলিয়া উত্তম শ্বেত তণ্ডুলের দ্বারা পরিপূর্ণ ধানকে ত্যাগ করে?

চার্ব্বাক মতাবলম্বিদিগের পূর্ব্বোক্ত মতসকলের আলোচনা করিলে আমরা বেশ বুঝিতে পারি লোকায়তিককুল ধর্ম্মজগতে নাস্তিকতার সংঘর্ষ উপস্থিত করিয়া কিরূপে আস্তিক্যবুদ্ধির প্রতিষ্ঠা আরও দৃঢ় করিয়াছিল। তাহাদের অলীক ঐহিক সুখবাদ পারমার্থিক সুখের তৃপ্তিকে লোকের মনে শতগুণে ফুটাইয়া তুলিয়াছিল, এবং তাহাদের বিকৃত জড়বাদই আমাদের আধ্যাত্মিক শাস্ত্রের পূর্ণোৎকর্ষপ্রাপ্তির বিশেষ সহায়ীভূত হইয়াছিল। এই রূপে দার্শনিক যুগের প্রারম্ভে প্রাচীন ভারতে প্রাকৃতিক নিয়মাধীন হইয়াই বিকৃত জড়বাদোৎপত্তিও কিছুকাল পুষ্টি লাভ করিয়া, গৌণভাবে ভারতের মঙ্গল সাধন করতঃ অন্তে কালের করাল গর্ভে মিলাইয়া গিয়াছিল।

শ্রীরামানুজ-দর্শন।

(১১)

[শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ।]

কোন একটা কিছু বলিতে গেলে প্রমাণ সহিত বলিতে পারিলেই ভাল হয়। যে ব্যক্তি প্রমাণ দেখাইয়া তাহার বক্তব্য বলে, লোকে তাহার কথা বিশ্বাস করে এবং তাহাকে বেশ একটা পাকা লোক বলিয়া মনে করে। শ্রীরামানুজ-মতের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়া আমাদের গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস দাস মহাশয় যে, কেবল ঠিক সেই পথটী অবলম্বন করিয়াছেন তাহা নহে, পরন্তু তিনি যাহাকে "প্রমাণ" বলিয়া বুঝেন, তাহাও বুঝাইয়া দিয়া তিনি তাহার বক্তব্য বলিতে আরম্ভ করিতে চাহেন। লোকে প্রমাণপূর্ব্বক কথা বলিলেই প্রশংসনীয় হয়, ইনি কিন্তু কেবল তাহাই করিয়া নিশ্চিন্ত হন নাই. ইনি তাঁহার অভিপ্রেত প্রমাণ কি, তাহারও পরিচয় দিয়া যে অত্যধিক প্রশংসার্হ হইতেছেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? যাহা বলিতে হইবে তাহার প্রমাণের পর্য্যন্ত আলোচনা করায় একটা মহৎ লাভ এই যে, যদি পাঠকের সহিত প্রমাণ সম্বন্ধে তাহার কোন মতভেদ থাকে, তাহা হইলে তাহা পাঠক পূর্ব্ব হইতে অবগত হইতে পারিবেন, এবং ভবিষ্যতে যখন তিনি তাহার প্রমেয় সম্বন্ধে বলিতে আরম্ভ করিবেন তখন পরস্পরে পরস্পরকে বুঝিতে কোন গোলযোগ হইবে না। বস্তুতঃ, অভিজ্ঞ পাঠকবর্গ অবগত আছেন যে, দার্শনিকগণের পরস্পরে যে মতভেদ হয় তাহার কারণ, অধিকাংশ স্থলেই, পরস্পর পরস্পরকে না বুঝা। ফলতঃ গ্রন্থকার এই পদ্ধতি অবলম্বন করায় যে বিশেষ বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

যাহা হউক, এই অভিপ্রায়ে গ্রন্থকার ইতিপূর্ব্বে তাঁহার স্বীকৃত ত্রিবিধ প্রমাণের মধ্যে প্রথম প্রমাণ অর্থাৎ প্রত্যক্ষ প্রমাণের কথা বলিয়াছেন. এক্ষণে তাঁহার মতে অবশিষ্ট প্রমাণ দুইটীর কথা আলোচ্য। উক্ত প্রমাণ দুইটীর মধ্যে দ্বিতীয় প্রমাণটী অনুমান। যথার্থ জ্ঞান লাভ করিতে হইলে যেমন প্রত্যক্ষ প্রমাণের আবশ্যকতা আছে, তদ্রূপ অনুমান প্রমাণেরও আবশ্যকতা আছে। প্রত্যক্ষ প্রমাণ ব্যতীত যেমন আমাদের জীবন যাত্রা

নির্ব্বাহ হওয়া অসম্ভব, অনুমান প্রমাণ ব্যতীত আমাদের জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ হওয়াও সেইরূপ অসম্ভব। প্রত্যক্ষের মত অনুমানেরও আবশ্যকতা থাকে বলিয়া আচার্য্য রামানুজ ইহাকে যথার্থ জ্ঞানলাভের উপায় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং আমাদের অবলম্বিত গ্রন্থের গ্রন্থকার, প্রমাণ বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া, প্রত্যক্ষ প্রমাণ বর্ণনা করিয়াই যে, অনুমান প্রমাণের বর্ণনা করিবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? বস্তুতঃ উক্ত গ্রন্থে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে গ্রন্থকার কেবল এই অনুমান প্রমাণের কথাই বলিয়াছেন।

পরন্তু এই অনুমান-প্রমাণ-প্রসঙ্গে গ্রন্থকার যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে সচরাচর যাহাকে ন্যায়শাস্ত্র বলিয়া লোকে নির্দ্দেশ করে, তদ্ভিন্ন অন্য কোন নূতন কথা দেখা যায় না। দুই একটী সামান্য বিষয়ে অল্প বিস্তর মতভেদ ভিন্ন গ্রন্থকার প্রায় সর্ব্বত্রই ন্যায় শাস্ত্রের সহিত একমত; আর ন্যায় শাস্ত্রের সহিত একমত হওয়ায়, প্রত্যক্ষ প্রমাণে যেমন গ্রন্থকার বহু প্রয়োজনীয় স্থলে অন্যান্য দার্শনিকগণের সহিত ভিন্ন মত হইয়া ছিলেন, এস্থলে তাঁহাকে সেরূপ হইতে হয় নাই। অনুমান প্রমাণ সম্বন্ধে অধিকাংশ দার্শনিকই প্রায় ন্যায় শাস্ত্রের সহিত বিরোধ করেন নাই, সুতরাং এ অংশে তাঁহাদের সহিত রামানুজ মতের কোন বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত না হইবারই কথা। গ্রন্থকার অনুমান প্রমাণ সম্বন্ধে ন্যায়ের কথা বলিলেও তাঁহার বর্ণনা দেখিলে তাঁহাকে প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। তিনি এ সম্বন্ধে স্থূল স্থূল প্রায় যাবতীয় কথাই অতি সংক্ষেপে সরল ভাষায় বেশ দক্ষতার সহিত বলিতে পারিয়াছেন। যাঁহারা আমাদের ন্যায়শাস্ত্রের দুই একখানি প্রবেশিকা পুস্তকও পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা ইহা পাঠ করিলে বিশেষ আনন্দিত হইবেন সন্দেহ নাই। পরন্তু আজকাল সাধারণতঃ যেরূপ শিক্ষা লাভ করা হয়, তাহাতে এরূপ প্রবেশিকা-পুস্তক পাঠেও অনেকেরই সুযোগ হয় না, অগত্যা গ্রন্থকার অনুমানপ্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছেন তাহাতে যে অনেকে একটুও আনন্দ পাইবেন তাহা আশা করা যায় না। এজন্য আমরা এস্থলে আর উহার আলোচনা করিলাম না। অবশ্য যদি উহাতে রামানুজ-সিদ্ধান্তানুকূল কোন নূতন কথা থাকিত তাহা হইলে আমরা এস্থলে তাহা পরিত্যাগ করিতাম না। মানুষ-প্রকৃতি বশে আমরা যে ন্যায় বুদ্ধি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি, এবং আজকালকার শিক্ষায় সেই বুদ্ধি যতটা পরিমার্জ্জিত হয়, তৎসহায়েই উপস্থিত আমরা রামানুজাচার্য্যের দার্শনিক মত যতটা বুঝিতে পারিব

তাহাই এক্ষেত্রে যথেষ্ঠ। ভগবদিচ্ছায় যদি আমাদের প্রবন্ধগুলি কখন পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় তাহা হইলে এ অংশটী তথায় সবিস্তারে লিপিবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিব।

রামানুজ-দর্শন-প্রসঙ্গে যদিও আমরা অনুমান প্রমাণ সম্বন্ধে এস্থলে আলোচনা করিলাম না, তথাপি তাঁহার স্বীকৃত তৃতীয় প্রমাণটী এস্থলে আলোচনা করা আবশ্যক। এই তৃতীয় প্রমাণটী শাব্দ প্রমাণ। এই শাব্দ প্রমাণ সম্বন্ধে কিছু না বলিয়া রামানুজ সিদ্ধান্তের সম্বন্ধে আলোচনা করা উচিৎ বিবেচনা করি না। ইহাতে অন্যান্য মতের সহিত রামানুজ মতের অল্পবিস্তর অথবা অবশ্যবিবেচ্য কোন পার্থক্য না থাকিলেও ইহাতে অনেক জ্ঞাতব্য আছে। আর তাহার পর শাব্দ প্রমাণটীও একটী অতীব প্রযোজনীয় প্রমাণ। বৈদান্তিকগণের মতে ইহা এমন কি প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমাণ হইতেও শ্রেষ্ঠ। প্রত্যক্ষ যেমন অনুমানের তুলনায় শ্রেষ্ঠ তদ্রূপ ইহা প্রত্যক্ষ ও অনুমান উভয়ের তুলনাতেই শ্রেষ্ঠ। প্রত্যক্ষ যে অনুমান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তাহা বুঝিতে হইলে এইটুকু স্মরণ করিলেই যথেষ্ঠ যে, অনুমান প্রমাণ প্রত্যক্ষ-মূলক, অতএব প্রত্যক্ষে যদি ভুল হয়, অনুমানে অবশ্যই ভুল হইতে বাধ্য। দুরস্থ পর্ব্বতে ধূম দেখিয়া যদি বহ্নি অনুমান করা হয়, তাহা হইলে তাহা যদিচ অনিবার্য্যরূপে সত্য, তথাপি এই সত্যতা প্রত্যক্ষের উপরই নির্ভর করে। কারণ, পর্ব্বত গাত্রে মেঘ দেখিয়া যদি মেঘকেই ধূম মনে করিয়া বহ্নি অনুমান করিতে যাই, তাহা হইলে তাহা কখনই সত্য অনুমান হইতে পারে না। অথচ কে না জানে যে পর্ব্বতগাত্রের মেঘে ও ধূমে অনেক সময় দ্রষ্টার ভ্রম হইয়া থাকে। এজন্য প্রত্যক্ষ অনুমান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রমাণ।

এখন দেখা যায়, শাব্দ প্রমাণ এই প্রত্যক্ষ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। কারণ, ইহা অভ্রান্ত পুরুষের প্রত্যক্ষ করা এবং পরীক্ষা করা জ্ঞান। সকলেই জানেন, অনেক সময় আমরা, পাছে আমাদের প্রত্যক্ষ ভুল হয়, এজন্য অনেক জিনিষ অপর পাঁচ জনকে দেখাইয়া লইয়া থাকি। অল্পালোকে হঠাৎ একটা দড়ি দেখিলে, অনেক সময় উহা সাপ কিনা নির্ণয় করিবার জন্য অপর পাঁচ জনকে আমরা ডাকিয়া দেখাই; আমরা অনেক সময় আমাদের নিজের প্রত্যক্ষকে বিশ্বাস করি না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যাঁহারা পরহিতপরায়ণ অভ্রান্ত পুরুষ বলিয়া পরিচিত, তাঁহাদের প্রত্যক্ষলব্ধ

ও পরীক্ষাসিদ্ধ জ্ঞান রাশি যে, আমরা আমাদের প্রত্যক্ষীকৃত জ্ঞান হইতে অনেক সময় বেশী আদর করিব তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? অধিক কি এইরূপ আদর করা যে কেবল ঔচিত্যবোধেই আমরা করিয়া থাকি তাহা নহে, পরন্তু আমরা আমাদের প্রকৃতিবশতঃই করিয়া থাকি। সত্যানুসন্ধিৎসু মাত্রেই যেমন নিজে সকল জিনিষ প্রত্যক্ষ এবং পরীক্ষা করিয়া থাকেন তদ্রূপ অপর বিশ্বস্ত ব্যক্তিবৃন্দ কি বলিয়া থাকেন তাহাও জানিবার জন্য উদ্যোগী হন। এক কথায় শাব্দ প্রমাণ ব্যতীত আমাদের সময় সময় এক পা চলাও অসম্ভব হয়। বালক যদি পিতামাতার কথায় বিশ্বাস না করিয়া নিজে সব পরীক্ষা করিয়া লইয়া চলিবার চেষ্টা করিত, তাহা হইলে তাহার জীবন যৌবনে পদার্পণ করিতে পারিত কিনা সন্দেহ। অধিকন্তু সকলেই দেখিয়া থাকিবেন যে, বালক নিয়তই পিতামাতাকে "এটা কি, ওটা কি" জিজ্ঞাসা করিয়া—তাঁহাদিগকে জ্বালাতন পর্য্যন্ত করিয়া থাকে। তাহারা তখন পিতামাতার কথায় অবিশ্বাস করিয়া পরীক্ষা করিতে যায় না। তাহারা তখনই পরীক্ষা করে, যখন তাহারা দেখে যে, তাহাদের পিতামাতার কথা দুই চারিটা ভুল হইতেছে, অথবা যখন তাহার পিতামাতা তাহাকে কতকটা বলিতে পারেন এবং কতকটা বলিতে পারেন না। এই সব কারণে শাব্দ প্রমাণ প্রত্যক্ষ ও অনুমান হইতে শ্রেষ্ঠ। প্রকৃত প্রস্তাবে বৈদান্তিকগণ, এই জীবজগতাত্মক বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের এক মূল-তত্ত্ব-নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইয়া শাব্দকেই মুখ্য প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

আর বস্তুতঃ এই বিশ্বের মূল অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, শাব্দ প্রমাণ স্বীকার ব্যতীত উপায়ও নাই। কারণ যদি কেহ বলে যে, এই বিশ্ব এককালে লয় হয় বা ইহার মূল একটীমাত্র পদার্থ, তাহা হইলে, যে প্রত্যক্ষ ও অনুমানরূপ প্রমাণবাদী, সে ব্যক্তি উক্ত দুই প্রমাণ সাহায্যে কখনই কোন নিঃসন্দিগ্ধ জ্ঞানে উপনীত হইতে পারিবেন না। কারণ প্রত্যক্ষ প্রমাণ বাদীর পক্ষে বিশ্বের লয় বা উৎপত্তি দর্শন অসম্ভব। এমন কি অন্য গ্রহ নক্ষত্রের লয় বা উৎপত্তি দেখিয়া যদি এই পৃথিবীর উৎপত্তি বা লয় মানিতে হয়, তাহা হইলে অনেকের শতবর্ষ পরমায়ুর মধ্যে কোন গ্রহ-নক্ষত্রের লয় বা উৎপত্তি দর্শন অনেক সময়ই সম্ভব হয় না। আর যদি অনুমান সাহায্যেই উহা স্থির করিবার প্রয়াস হয়—তাহা হইলেও তাহা সম্ভব নয়, কারণ সমগ্র বিশ্বের লয় বা উৎপত্তি প্রভৃতি অনুমান করিতে হইলে উহার অংশীভূত

পদার্থের উৎপত্তি বা লয় দেখিয়া উহার লয় বা উৎপত্তি অনুমান করিতে হইবে। কিন্তু কোন কিছুর অংশের কোন ধর্ম্ম দেখিয়া, উহার সমগ্রে সেই ধর্ম্ম কল্পনা করিলে সব সময় ঠিক নাও হইতে পারে। কে বলিতে পারে যে, এই বিশ্বের একটা ভাঙ্গিয়া একটা গড়িতে গড়িতে অনন্তকালই এই ভাবে চলিয়া যাইবে না? ব্রহ্মাণ্ডের যে কোন পদার্থ দেখিয়াই যদি অনুমান করা হয় যে, উহারও মূল কোনরূপ অব্যক্তরূপ বা পরমাণুরূপ পদার্থ ছিল তাহা হইলে, তখনই বলা যাইতে পারে যে, না—তাহা নহে, ইহা এইরূপই বরাবর চলিয়া আসিতেছে। উভয় পক্ষেরই যুক্তি, বুদ্ধিমান ব্যক্তি সমভাবেই প্রদর্শন করিতে সমর্থ। অগত্যা এস্থলে অতীন্দ্রিয়-সূক্ষ্ম-দর্শী মহাত্মাগণের কথা গ্রহণ করিতে হয়। পূর্ব্বকালে যাঁহারা অন্যান্য গ্রহনক্ষত্রের ধ্বংসাদি দেখিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রত্যক্ষীকৃত জ্ঞান সাহায্যে উক্ত অনুমানকে সহজেই সত্য বলিতে পারা যায়। এজন্য সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মূলতত্ত্ব সম্বন্ধীয় জ্ঞান লাভ করিতে হইলে শাব্দ প্রমাণ ব্যতীত উপায় নাই। এরূপ স্থলে প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রভৃতিকে এই শাব্দের অনুগত করিয়া প্রয়োগ করিতে পারিলে তবে অভিপ্রেত সিদ্ধ হইবার কথা, অন্যথা নহে। একজন বৈজ্ঞানিক যদিও একদিন শাব্দকে অগ্রাহ্য করিতে পারেন, কিন্তু একজন দার্শনিক কখনই ইহাকে অগ্রাহ্য করিতে পারেন না।

অবশ্য এস্থলে সহজেই আপত্তি তুলিতে পারা যায় যে, যদি আমাদের পক্ষে বিশ্বের আদি অন্ত দেখা অসম্ভব বলিয়া ইহার মূল নির্ণয়ে অপরের প্রত্যক্ষীকৃত জ্ঞানের শরণ লওয়া আবশ্যক হয়, তাহা হইলে উক্ত অপর ব্যক্তিরও বিশ্বের আদি অন্ত দেখা অসম্ভব হইবে না কেন? আমরা যদি বিশ্বের আদি অন্ত দেখিতে গেলে মরিয়া যাইতে বাধ্য হই, এবং তজ্জন্য আমাদের উহা দেখা অসম্ভব হয়, তাহা হইলে অপরের পক্ষেও কি উহা অসম্ভব নহে? কথাটী সত্য। কিন্তু যাঁহারা সর্ব্বত্র সত্যবাদী সত্যদর্শী, অভ্রান্ত বলিয়া জনসমাজে প্রথিত হইয়াছেন, তাঁহারা যদি কোন কৌশলে এ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করেন এবং জন সমাজে প্রচারিত করেন, তাহা হইলে, তাহা অবিশ্বাস করিবার কারণ কি? যদি বল এস্থলে সম্ভবাসম্ভব বিচার করিয়া তাহার কথা আমাদের গ্রহণ করা উচিত, তাহা হইলে বলিতে পারা যায়, যে আমরা যতক্ষণ তাঁহাদের সেই কৌশল অবগত না হই ততক্ষণ তাঁহাদের কথায় অবিশ্বাস করা চলে না। ধর, যদি কেহ স্বপ্ন দেখে যে,

অমুক বংশে এই সময়ে একটী সন্তান জন্মিবে যিনি জগতে অতুল কীর্ত্তি রাখিয়া যাইবেন এবং যদি উহা সত্য হয়, এবং যদি ঐ ব্যক্তি এই প্রকারে সুদূর অতীত ও ভাবষ্যতের অনেক কথা বলিতে পারে ও তাহা যদি সব সত্য হয়, তাহা হইলে তাহার মুখে জগতের আদি অন্তের কথা শুনিলে কি অসম্ভব বলিয়া সহজে উড়াইয়া দেওয়া চলে? বস্তুতঃ যে দেশে এতাদৃশ যোগী ঋষির ছড়াছড়ি ছিল, যে দেশে এখনও তাঁহাদের মত শক্তি লাভের উপায় গ্রন্থমধ্যে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, এবং যে উপায় অবলম্বন করিয়া এখনও কেহ কেহ অনুরূপ শক্তি অল্পবিস্তর লাভ করিয়া থাকেন, সে দেশে এ কথার প্রতিবাদ আর বেশি শোভা পায় না।

এইবার দেখা যাউক, রামানুজমতে শাব্দ প্রমাণ কিরূপ? রামানুজ বলেন যাহা অনাপ্ত কর্ত্তৃক কথিত হয় নাই এতাদৃশ বাক্যজন্য জ্ঞানই শাব্দ জ্ঞান, এবং এই জ্ঞান যদ্দ্বারা হয় তাহাই শাব্দ প্রমাণ। রামানুজ সম্মত এই যে লক্ষণটী কথিত হইল ইহার ভিতর অনেক গূঢ় রহস্য আছে। যাহা অনাপ্ত কর্ত্তৃক কথিত হয় নাই এমন শব্দকে শাব্দ প্রমাণ বলায় প্রকারান্তরে বলা হইল যে, যাহা কেবল আপ্তজন কর্ত্তৃক কথিত তাহাই যে শাব্দ প্রমাণ তাহা নহে, পরন্তু যাহা আপ্ত অপুরুষ কর্ত্তৃক লব্ধ তাহাও শাব্দ প্রমাণ। এখন যেরূপে উক্ত লক্ষণ হইতে এইরূপ অর্থটী লাভ হইল তাহা এই;—আপ্ত শব্দের অর্থ বিশ্বাসযোগ্য অভ্রান্ত পুরুষ। যাহা আপ্ত নহে তাহাই অনাপ্ত। এখন আপ্ত-ভিন্নই অনাপ্ত হওয়ায়, অনাপ্ত বলিতে পুরুষ এবং অপুরুষ বা পুরুষ ভিন্নকেও বুঝাইয়া যাইতেছে। সুতরাং অর্থ হইতেছে যাহা বিশ্বাসযোগ্য পুরুষ কর্ত্তৃক কথিত এবং যাহা বিশ্বাসযোগ্য অপুরুষ পদবাচ্য পদার্থ হইতে লব্ধমাত্র তাহাও শাব্দ প্রমাণ মধ্যে গণ্য। অনাপ্ত পদ হইতে বিশ্বাসযোগ্য "পুরুষ" ও "পুরুষ ভিন্ন" দুইই পাওয়া গেল, এবং "কথিত হয় নাই" এই বাক্য হইতে "কথিত" ও "লব্ধ" এই দুইটী ভাবই পাওয়া গেল। "কথিত হয় নাই" এই বাক্যটী যখন অনাপ্ত পুরুষের সহিত অন্বয় করা যায় তখন বিশ্বাসী পুরুষ কর্ত্তৃক কথিত এইরূপ অর্থ হয়, এবং কথিত হয় নাই যখন অনাপ্ত অপুরুষের সহিত অন্বয় করা যায় তখন "অপুরুষ লব্ধ" বা "অপৌরুষেয়" এইরূপ অর্থ পাওয়া যায়। গ্রন্থকার শাব্দ লক্ষণটীকে "অনাপ্ত কর্ত্তৃক কথিত নহে" এই প্রকারে লিপিবদ্ধ করায় যে বিশেষ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিলেন তাহা পাঠকবর্গ বুঝিতেছেন। যাহা হউক ইহার

ফলে দাঁড়াইল যে, যদি কোন অভ্রান্ত ও বিশ্বাসযোগ্য পুরুষ স্বয়ং প্রত্যক্ষ ও পরীক্ষা করিয়া যাহা সত্য বলিয়া জনসমাজে প্রচার করেন তাহাও শাব্দ প্রমাণ এবং যাহা অনাদি কাল হইতে লোকমুখে জ্ঞানগাথারূপে চলিয়া আসিতেছে তাহাও শাব্দ প্রমাণ। যাঁহারা কেবল অভ্রান্ত পুরুষের প্রত্যক্ষীকৃত উপদেশকেই শাব্দ প্রমাণ বলিতে চাহেন যথা—বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতিগণ, তাঁহাদের মতটীও সুতরাং অগ্রাহ্য করা হইল। কারণ বৌদ্ধ জৈনগণ বুদ্ধ ও মহাবীরের প্রত্যক্ষীকৃত জ্ঞানকেই শাব্দ প্রমাণের আসন দিয়া থাকেন এবং উক্ত অপৌরুষেয় জ্ঞানগাথাকে শাব্দ প্রমাণ বলেন না। পক্ষান্তরে কেবল অভ্রান্ত পুরুষেরই কথাকে শাব্দ প্রমাণের লক্ষণ নহে বলায়, ইহাও বলা হইল যে, যে কোন অভ্রান্ত পুরুষের কথা যদি সেই অনাদি-কাল-প্রথিত জ্ঞানগাথার সহিত অবিরুদ্ধ হয় তাহা হইলে তাহার কথা শাব্দপ্রমাণ হইবে। এতদ্দ্বারা, যে সকল মহাপুরুষ উক্ত অনাদিকালপ্রথিত জ্ঞানগাথার অনুকূলে কোন কিছুকে সত্য বলিয়া প্রচার করেন তাহাও শাব্দপ্রমাণ মধ্যে পরিগণিত করা হইল। অভিজ্ঞ পাঠক অবশ্যই বুঝিতে পারিতেছেন, উপরিউক্ত অনাদিকাল প্রথিত জ্ঞানগাথা পদার্থটী কি? ইহাই সেই বেদ, যে বেদ হিন্দু আস্তিকসম্প্রদায়মাত্রেই সাদরে শিরে স্থাপন করিয়া থাকেন। আস্তিক হিন্দু দার্শনিক সম্প্রদায়ের মতে এই বেদ অনাদিকাল হইতে বিদ্যমান, এই বেদকে শাব্দপ্রমাণের আসন দিবার জন্য রামানুজ স্বামী শাব্দপ্রমাণের লক্ষণে ঐরূপ কৌশল-পূর্ণ বাক্য প্রযোগ করিয়াছেন। এই বেদ ব্যক্তি-বিশেষের রচিত নহে, এই বেদ বুদ্ধিকৌশলে উদ্ভাবিত নহে, ইহা আদিপুরুষ ব্রহ্মা ভগবানের নিকট লাভ করিয়াছিলেন। পুত্র যেমন পিতার নিকটে জ্ঞানলাভ করে, রোগী যেমন বৈদ্যের নিকটে স্বাস্থ্যবিধান গ্রহণ করে, শিষ্য যেমন গুরুর নিকট জ্ঞানোপার্জ্জন করে ব্রহ্মা তদ্রূপ ভগবানের নিকট ইহা লাভ করিয়াছিলেন। ইহা ব্রহ্মার রচনা নহে। আর ব্রহ্মার রচনা নহে বলিয়া যে ইহা ভগবানের রচনা বলিতে হইবে তাহাও নহে, ইহা ভগবানেরও রচনা নহে। ভগবান যেমন নিত্য ইহাও তদ্রূপ নিত্য, ভগবানের যেমন কোনকালে লয় বা বিকৃতি হয় না ইহারও তদ্রূপ লয় বা বিকৃতি হয় না। ভগবানের জ্ঞানই বেদ, বেদই ভগবান।

উপরে যাহা বলা হইল তাহা শাব্দ প্রমাণের একটী লক্ষণ, আগামীবারে রামানুজ-সম্মত আর একটী লক্ষণ আলোচনা করিব।

ভাঙ্গা ও গড়া।

সমাজে ভাঙ্গা-গড়া সবসময়ই চলিয়াছে। মানুষ সূক্ষ্মের জন্যই স্থূলকে লইয়া নাড়াচাড়া করে,—কখন গড়ে, কখন ভাঙ্গে। সূক্ষ্মভাবকে স্থূল ব্যবহারে পরিণত করা, স্থূলের দ্বারা সূক্ষ্মকে সম্ভোগ করা, সূক্ষ্মের দ্বারা স্থূলকে বজায় রাখা,—এ সমস্তই মানুষের জীবনচেষ্টার অঙ্গ। যখন সূক্ষ্মের সহিত স্থূলের স্বাভাবিক সংযোগ বা সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, যখন স্থূলের দ্বারা আর সূক্ষ্মের সম্ভোগ হয় না, যখন প্রাণস্বরূপ সূক্ষ্মের অভাবে স্থূলকে আর বজায় রাখা যায় না,—তখন স্থূলকে ভাঙ্গিয়া আবার নূতন করিয়া গড়িতে হয়।

আমাদের দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই একটা তুমুল ভাঙ্গাভাঙ্গি আরম্ভ হইয়াছিল। ধর্ম্ম সমাজ ও শিক্ষা এই ত্রিবিধ ক্ষেত্রেই সকল রকম স্থূল প্রতীক বা Symbol লইয়াই বিষম টানাটানি আরম্ভ হইয়াছিল। এই ধ্বংসনীতির মূলে কেবল যে বৈদেশিক শিক্ষাই বিদ্যমান ছিল, তাহা নহে। এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে সে সময় অধিকাংশ স্থলেই মানব-জীবনে স্থূল সূক্ষ্মের সহিত স্বাভাবিক সংযোগ হারাইয়া ফেলিয়াছিল,—আপনার সার্থকতা প্রতিপন্ন করিতে অক্ষম হইয়াছিল। তৎকালে যদি আমাদের সমাজে সে সংযোগ সুরক্ষিতই থাকিত, তবে পাশ্চাত্য সংযোগকৌশলে মুগ্ধ হইয়া দেশের শিক্ষিত লোক সেই দিকে ধাবিত হইবে কেন? আশ্রিত পুষ্পে মধু পাইলে ষট্‌পদ পুষ্পান্তরে উড়িয়া যায় না। সমাজহৃদয়ে অকারণ চাঞ্চল্য আসে না।

কিন্তু বিপদ এ স্থানে ঘনাইয়া উঠে নাই। যুগে যুগে স্থূল সূক্ষ্মের সহিত সংযোগ হারায়, আবার যুগে যুগে মহাপুরুষ আসিয়া জীবনব্যাপী সাধনের দ্বারা ঐ সংযোগ স্থাপিত করেন। দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় স্থূলকে ভাঙ্গিবার জন্য যে উদ্যতহস্ত হইলেন, উহাতেও বিপদের আশঙ্কা ছিল না। কিন্তু তাঁহারা স্থূল ও সূক্ষ্মের সংযোগবিধি পাশ্চাত্যের নিকট শিক্ষা করিয়া, পাশ্চাত্যের যুক্তিঅস্ত্রে যে স্থূলকে আঘাত করিতে লাগিলেন, ইহাই বিপদের সূচনা। এই বিপদপাতের কালকে অনুকরণের যুগ বলা যায়। এই অনুকরণের যুগে বিদেশীয় ব্যবহার, বিদেশীয় Symbols বা প্রতীক নিচয় আমাদের ধর্ম্মে সমাজে ও শিক্ষায় বহুল পরিমাণে স্থান পাইল।

এখন অনুকরণের যুগ বিগতপ্রায়।** বিদেশীয় শিক্ষাদীক্ষাকে দেশে প্রবর্ত্তিত করাই যে আমাদের প্রকৃত সাধনা নহে, একথা অধিকাংশ স্থলেই হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। এখন সমস্যা এই যে আমাদের জীবনের অধুনাতন সর্ব্ববিধ সাধনাক্ষেত্রে ভাঙ্গাগড়া কি ভাবে চলিবে,—কোন খানে স্থূলকে ভাঙ্গিয়া গড়িতে হইবে, কোনখানেই বা সূক্ষ্মের সহিত উহার প্রাচীন সংযোগসূত্রকেই অবলম্বন করিতে হইবে। ভাঙ্গিতে বা গড়িতে গেলেই যাঁহারা পূর্ব্বে গড়িয়াছিলেন, সেই প্রাচীন আচার্য্যদিগের অভিপ্রায় ও কৌশল শিখিয়া লইতে হইবে, যে দৃষ্টিতে তাঁহারা মানুষ ও জগৎকে বুঝিয়াছিলেন, যে মূলসূত্র তাঁহারা প্রয়োগ করিয়াছিলেন, যে জ্ঞানভূমিতে দাঁড়াইয়া তাঁহারা কর্ম্মজাল রচনা করিয়াছিলেন,- আজ ভাঙ্গিতে বা গড়িতে গেলেই, সেই দৃষ্টি, সেই মূলসূত্র, সেই জ্ঞানভূমি আমাদিগকেও অবলম্বন করিতে হইবে। এতদুর যাইতে যাহারা নারাজ, সংস্কারকনামে তাহারা আর কলঙ্কারোপ করিবের না।

যে শক্তিকেন্দ্র হইতে এই গভীর সমস্যার মীমাংসা হইবে, সে শক্তি-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখনও দেশের লোক বুঝুক বা নাই বুঝুক, যে সাধনার সাধক হইয়া আমাদের প্রাচীন সমাজ বিশ্বমঞ্চে আবির্ভূত হইয়াছিল, যে সাধনার সাধক হইয়া প্রাচীন সমাজ মনুষ্যোচিত সর্ব্ব কর্ম্মবিভাগেই একদিন শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল, আমাদের চক্ষের সম্মুখে সংক্ষেপে একটী জীবনলীলায় সেই সাধনার পূর্ব্বানুবৃত্তি (recapitulation) হইয়া গিয়াছে। আমাদের সমক্ষে প্রাচীন সনাতনে পরিণত হইয়াছে; তাই যে শক্তিভাণ্ডার আজ উদ্ঘাটিত, উহা হইতে শক্তি আহরণ করিবার যোগ্যতা থাকিলে, সমস্ত সমস্যারই মীমাংসা করা আজ আর সুদূর-পরাহত নহে।

কিন্তু আহারীয় প্রস্তুত থাকিলেই যে সঙ্গে সঙ্গে সব সময় ক্ষুধার উদ্রেক হইবে, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। আমাদের বর্ত্তমান জীবনপ্রবাহ যে চারিদিকেই সমস্যাসঙ্কুল হইয়া উঠিয়াছে, ইহা সকলেই জানেন; কিন্তু তীব্র প্রয়োজনবোধ যতদিন না আমাদের সাম্প্রদায়িক অভিমান ও বিলাসপ্রিয়-তাকে খর্ব্ব করিতেছে ও অনুসন্ধিৎসাকে পূর্ণমাত্রায় উদ্রিক্ত করিতেছে, ততদিন মীমাংসার পথ থাকিতেও আঁধারে করসঞ্চালন যেমন চলিতেছে, তেমনই চলিবে।

শুধু তাহাই নহে, বর্ত্তমান সাহিত্যে বিরোধের আক্রোশ-আস্ফালনও

যথেষ্ট লক্ষিত হয়। অনেকে আছেন, যাঁহারা ভাঙ্গিয়া বিলাতী ছাঁচে গড়িতে না চাহিলেও, গড়িবার ছাঁচ সুনির্ণীত হইবার পূর্ব্বেই ভাঙ্গিয়া নিশ্চিন্ত হইতে চাহেন। হাতের খোলা খড়্গ ইহারা এখনও কোষস্থ করিতে পারেন নাই। তাই যখন সংস্কারের আবশ্যকতা সর্ব্ববাদীসম্মত, যখন দেশের লোক গড়িবার পথ নির্ণয়ে নিবিষ্টচিত্ত, তখনও এই ভঙ্গপন্থীদের বিদ্রূপবাণের বিরাম নাই।

অধ্যাত্মসাধনায় মতভেদ বা পন্থানৈক্য যে কখন ঘুচিবে, তাহা নহে। আমাদের প্রাচীন সাধনপথে অনেক স্থলেই স্থূল ও সূক্ষ্মের সংযোগ ছিন্ন হইয়াছিল, আবার সে সংযোগ গড়িয়া উঠিতেছে। আমাদের আধ্যাত্মিক অবনতির সময় মূর্ত্তি, গুরু, মন্ত্র বা বেদসম্বন্ধীয় প্রচলিত ব্যবহারকে যে আমরা সার্থক করিতে পারি নাই, অপাত্রে পড়িয়া একদিন যে সমস্তই নিরর্থক হইতেছিল, তাহা আমরা স্বীকার করি। কিন্তু যোগ্যপাত্রে উহারা আজও পূর্ণমাত্রায় সার্থক হয় দেখিয়া যদি আমরা সিদ্ধান্ত করি যে স্থূল ভাঙ্গিতে গিয়া ঐ সমস্ত ভাঙ্গিবার প্রস্তাব নিতান্তই অর্ব্বাচীনতা, তবে ভঙ্গপন্থী আমাদের কৈফিয়ৎ সহস্রবার চাহিতে পারেন, তাহাতে কাজ অগ্রসর হইবে, কিন্তু তীব্র বিদ্রূপবর্ষণে কাজ অগ্রসর হয় না।

মনে করুন, কোনও মনীষী আপনার সাধন পথে ইষ্টমূর্ত্তি, গুরু, মন্ত্র বা বেদের অপরিহার্য্যতা অনুভব করেন না। তাঁহাকেও অস্বীকার বা পরিহার না করিয়া আত্মীয় ভাবা ও অভয়* দেওয়াই আমাদের সনাতন পদ্ধতি, বিদ্রূপ করা নহে। কিন্তু তিনি যদি ইষ্টমূর্ত্তি, গুরু, মন্ত্র, বা বেদের প্রকৃত বা সার্থক সাধনচেষ্টায় আমাদের সহিত যোগদান করেন না বলিয়া তৎসম্বন্ধীয় ব্যবহারকে ব্যঙ্গরসের প্রকৃষ্ট অনুশীলনক্ষেত্ররূপে নির্দ্দিষ্ট করেন, তবে অনুমান করা অসমীচীন নহে যে এই ভাঙ্গা-গড়ার যুগে তিনি গঠনপ্রয়াসীদের সহায় না হইয়া ভঙ্গপন্থারূপেই পরিচিত হইতে চাহেন।

ধর্ম্ম সাধনায় অনুষ্ঠানবাহুল্য নিন্দনীয় হইতে পারে সন্দেহ নাই। কিন্তু

---

* "কেউ ব'লছে সাকার, কেউ বলছে নিরাকার। আমি বলি, যার সাকারে বিশ্বাস, সে সাকারেই চিন্তা করুক। যার নিরাকারে বিশ্বাস, সে নিরাকারেই চিন্তা করুক। তবে এই বলা যে, মতুয়ার বুদ্ধি (dogmatism) ভাল নয়।"

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, ২য় ভাগ।

বিশেষ পাত্রে যাহা বাহুল্য, অপর পাত্রে তাহাই অবশ্যানুষ্ঠেয় হইতে পারে; শাস্ত্রের মর্ম্ম এই রূপ; সেই জন্যই অধিকারি-ভেদে ব্যবস্থা। স্পষ্টই বুঝা যায় যে অনুষ্ঠানবিরল "দাদাঠাকুরদের"* তন্ত্রে, কেবল যাহারা প্রাক্তন বা পূর্ব্ব সাধনার ফলে কবির প্রাণ পাইয়াছেন, তাহাদেরই অধিকার। কিন্তু সেই অধিকার 'দাদাঠাকুরের, মত ম্লেচ্ছবাহুর বলে, গায়ের জোরে, নির্ব্বিশেষে সংক্রামিত করিতে গেলে, ভাঙ্গাই সার হয়, গড়া আর হয় না। তাই দাদাঠাকুর গঠনপ্রণালীর ফাঁকা ইঙ্গিতই দিয়াছেন, কিছু গড়িয়া যান নাই; যাহা অচল ছিল, তাঁহাকে ভাঙ্গা হইয়াছে, কিন্তু সচল করা হয় নাই।

কিন্তু আমাদের সমস্যা ভাঙ্গাভাঙ্গি লইয়া ততটা নহে, যতটা পুনর্গঠন লইয়া। কিরূপে গড়িতে হইবে তাহা বুঝিলে, কিরূপে ভাঙ্গিতে হইবে তাহাও নিশ্চিতরূপে বুঝা যাইবে। আমাদের ধর্ম্ম সমাজ শিক্ষা প্রভৃতি কিরূপে গড়িয়া তুলিতে হইবে তাহা যে দিন নিঃসংশয়িতরূপে বুঝিব, সে দিন আমাদের সংস্কারকার্য্যে একদিকে যেমন দৃঢ়তা ও দক্ষতা আসিবে অপর দিকে তেমনই শ্রদ্ধা সম্ভ্রম ও চাঞ্চল্যহীনতারও উদয় হইবে।

মৃত্যু।

(মৃত্যু সম্বন্ধে সিষ্টার নিবেদিতার মন্তব্য পাঠকবর্গের প্রনিধানযোগ্য হইবে, সন্দেহ নাই। তাঁহার কাগজপত্রের মধ্যে এতৎসম্বন্ধীয় একটী ক্ষুদ্র রচনা পাওয়া গিয়াছে ও "মডার্ণ রিভিউ" পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। উহারই অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল। উঃ-সঃ)

কাল রাত্রে ভাবিয়া দেখিলাম যে এই সমগ্র জড়সত্তার অন্তরে ওতপ্রোত হইয়া যেন আর একটী সত্তা বিদ্যমান; গভীর ধ্যান, বা চিৎ বা আর যা নামই দাও, মৃত্যু অর্থে ঐ সত্তাকেই বুঝায়। এক স্থান হইতে স্থানান্তরে প্রযাণ বলিতে যাহা বুঝায়, উহা তা নহে, কারণ এই সত্তা জড় নয় বলিয়া দেশরূপ আধার ইহার নাই। ক্রমশ দেহবুদ্ধির নিরসনে গভীর হইতে গভীরতর স্তরে মগ্ন হইতে হইতে ঐ সত্তাভূমিতে পৌঁছানই মৃত্যু।

* কবিবর রবীন্দ্র নাথের "অচলায়তনে" উল্লিখিত।